আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ

ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ

# ইসলামের পারিবারিক আইন

প্রথম খণ্ড

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ

الموسوعة الفقهية

ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ

# ইসলামের পারিবারিক আইন

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.amarboi.org

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ

(ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ)

# ইসলামের পারিবারিক আইন

## দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ
(ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ)
ইসলামের পারিবারিক আইন
দ্বিতীয় খণ্ড

বি আই এল আর এল এ সি-১১

ISBN : 978-984-90208-1-3

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর : ২০১৩

© : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Website : www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স বিভাগ

মুদ্রণ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

দাম : ৬৫০ টাকা $ 30

Islamer Paribaric Ain [Vol-2] (AL-Mawsuatul Fiqhiyah), Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 650 $ 30

www.amarboi.org

## সম্পাদনা পরিষদ

| | |
|---|---|
| ড. আবদুল জলীল | সভাপতি |
| প্রফেসর মুহম্মদ ইসলাম গণী | সদস্য |
| প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক | সদস্য |
| মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের | সদস্য |
| শহীদুল ইসলাম | সদস্য সচিব |

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# প্রকাশকের কথা

কুয়েত সরকারের ওয়াক্ফ ও ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'আল-মাওসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ' নামে পঞ্চাশ খণ্ডে ইসলামী আইনের ওপর বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছে। এই বিশ্বকোষে ইসলামী ফিক্হ-এর যাবতীয় পরিভাষা ও তার বিষয়কে আরবী বর্ণের ক্রমানুসারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে এটিই সম্ভবত ফিক্হের ওপর সর্ববৃহৎ গবেষণাধর্মী কাজ। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' এই বিশ্বকোষ পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। মূল কাজের অগ্রবর্তী নমুনা হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান থেকে মাওসূ'আহ্র কতিপয় নির্বাচিত ভুক্তির বিষয়ভিত্তিক সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। গত বছর ৩৫টি ভুক্তির সমন্বয়ে 'ইসলামের পরিবারিক আইন' শিরোনামে সংকলনের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। এবছর ১৮টি ভুক্তির সমন্বয়ে 'ইসলামের পারিবারিক আইন' শিরোনামে ২য় খণ্ডে অবশিষ্ট ভুক্তিগুলোর অনুবাদ প্রকাশিত হলো। আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা আশা করি, প্রথম খণ্ডের মতোই এটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, ইসলামী আইনের গবেষক এবং আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে এবং গবেষকদের জন্য ইসলামী আইন গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং প্রথম খণ্ডটির অনুরূপ সমাদৃত হবে। বিশেষ করে আইনচর্চা ও আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ পরিবার বিষয়ক ইসলামী আইনের দালিলিক প্রমাণ ও প্রধান মাযহাবগুলোর সঠিক ভাষ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। ফলে বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং আইনচর্চা ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অনেকের মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত হবে। সেই সাথে ইসলামের অনুসারী ও দাওয়াত-কর্মীদের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হবে। ফলে সমাজে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন সহজতর হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের নবজাগরণকে সামনে রেখে দেশবাসীকে ইসলামী আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের প্রকাশ। সুধী মহলে এ প্রয়াস আদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের সঠিক বিধান জানা ও তা প্রয়োগে উদ্যোগী হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

**(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম)**
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# মুখবন্ধ

বিশ্বব্যাপী 'আইনের শাসন' আজ এক পরম কাঙ্খিত বস্তু। সুবিচার মানবজাতির একান্ত কাম্য বিষয়। আইনের শাসন মানে আইন থাকবে সবার উর্ধ্বে এবং চলবে তার নিজস্ব গতিতে। আইনের চোখে ছোট-বড় সবাই থাকবে সমান। ক্ষমতা, আভিজাত্য, অর্থ বা অন্য কিছুর প্রভাব আইনের গতি রোধ করবে না। সুবিচার অর্থ হলো, দুর্বলতম ব্যক্তির অধিকার পাইয়ে দেয়ার দায় কাঁধে নেয়া এবং সবলের অন্যায় প্রতিহত করা। জুলুম ও অপরাধ দমন করা এবং সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য কেবল বিচারব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। শুধু আইন আইনের শাসন নিশ্চিত করে না। আইন ও বিচার থাকলেও অনেক সময় সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুনীতি ও সদ্ভাবের বিকাশ সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে আইন ও বিচারব্যবস্থা একটি জরুরী ব্যবস্থাপত্র মাত্র। মূল কাজটি হচ্ছে, সকল নাগরিকের মাঝে আইন মানার মানসিকতা তৈরি করা।

সহজাত ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, শান্তিপ্রিয়তা, মানবিক চেতনা, বিবেচনাবোধ ইত্যাদি মানুষকে সৎ থাকতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে বড় সহায়ক হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষকে খোদাভীতির দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয় এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার চিন্তা তার মধ্যে কঠিন দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও আরো অনেক প্রেরণাদায়ক বিষয়ও মানুষের মধ্যে বিচার-বিবেচনা ও নৈতিকতার শক্ত ভিত গড়ে দিতে পারে। আর তখনই কেবল এ মানুষটি থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। বিচার ও শাসনকার্যেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার জন্য নৈতিকতার প্রেরণা অপরিহার্য। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' গণমানুষের মধ্যে এই নৈতিক প্রেরণা জাগ্রত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ন্যায়বোধ ও নৈতিকতা জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠা করা। গণমানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হলে তারা আইন মানার জন্য প্রস্তুত থাকে। ফলে আইনের প্রয়োগ সহজ হয়। তখন স্বপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ আইন পালন করে এবং অন্যকেও আইন মানতে উজ্জীবিত করে। আইনভঙ্গের প্রবণতা নিম্নতম মাত্রায় চলে আসে।

www.amarboi.org

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ইদানীং বাংলাদেশেও অপরাধের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে ও হচ্ছে। এসব অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ নৈতিক অবক্ষয় ও তার ক্রম-বিস্তার। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়ঙ্কর রূপ প্রতিভাত হচ্ছে। অপরাধ বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে মামলা, বাড়ছে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এবং প্রতিদিন নতুন নতুন মামলা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মামলার জট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অপরদিকে বিচার সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সংশয় ও হতাশা। জেলখানায় কয়েদি ও হাজতিদের সংখ্যা বর্তমানে ধারণ ক্ষমতার বাইরে। সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। উপর্যুক্ত যাবতীয় সমস্যা নিরসনকল্পে আমরা মনে করি, ইসলামী বিচারব্যবস্থার দিকে ফিরে আসার সময় এসেছে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সুন্নাহ মোতাবেক শাসক, বিচারক, আইনজীবী, বাদী, বিবাদী, সাক্ষীসহ সর্বস্তরের নাগরিকদের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তিকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপর্যুক্ত পাহাড়সম সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

আল্লাহর বিধান সকল মুসলিমের জন্য অবশ্য পালনীয়। ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। দেশ, জাতি ও মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমরা আমাদের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশে ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং ইসলামী আইন ও বিচারের মাধ্যমে জনগণের ন্যায় ও সুবিচার পাওয়ার অধিকার সহজতর করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৫ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার কর্মসূচির অন্যতম অংশ হচ্ছে, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা ও প্রকাশনা। সংস্থাটি 'ইসলামী আইন ও বিচার' নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা এবং 'Journal of Islamic Law & Judiciary' নামে একটি ষান্মাসিক জার্নাল প্রকাশ করে আসছে, যা সুধীমহলে সাদরে গৃহীত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই সাথে আইনবিষয়ক পুস্তক প্রকাশের কাজও জোরদার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সংস্থা ইসলামী আইনসংক্রান্ত কয়েকটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশ করেছে। আরবী ভাষায় ৫০ খণ্ডে সমাপ্ত 'আল-মাওসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ' একটি সুবিশাল প্রকাশনা। এটিই মুসলিম বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ফিকহী প্রকাশনা। আমরা এই বিশাল সাগর থেকে গত বছর 'ইসলামের পারিববারিক আইন' নামে পরিবার-বিষয়ক ৩৫টি ভুক্তির সমন্বয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছি, যা বোদ্ধামহলে বিপুল

www.amarboi.org

সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আরো ১৮টি ভুক্তির সমন্বয়ে 'ইসলামের পারিবারিক আইন' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। বাংলা ভাষায় দালিলিক প্রমাণসহ ইসলামী আইন-বিষয়ক প্রকাশনা অপ্রতুল। যাও আছে সেগুলোর অধিকাংশই ফিক্‌হের পাঠ্য গ্রন্থাদির অনুবাদ, যেগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্যও নয়। বাংলাদেশের মাদ্‌রাসাগুলোর পাঠ্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। এ পুস্তকটিতে প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর বক্তব্য দলীল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত পাঠকসমাজ এখানে সব মাযহাবের ভাষ্য দলীল প্রমানসহ একসাথে পাবেন।

ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে 'আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ' যেমন অনন্য অবদান তেমনি এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ 'ইসলামী ফিক্‌হ্ বিশ্বকোষ'ও হবে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ ও অপূর্ব সংযোজন। সংকলনটি ত্রুটিমুক্ত করতে আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা থাকলেও হয়তোবা অগোচরে কোন জায়গায় অস্পষ্টতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুহৃদ ও সচেতন পাঠকবৃন্দ বিষয়টিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদের অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। ইন্‌শাআল্লাহ।

আমাদের জ্ঞানসাধনার জগৎ এ ধরনের অনবদ্য অবদানে সমৃদ্ধ হোক, আলোক অন্বেষী শিক্ষিত প্রজন্ম খুঁজে পাক সাফল্যের ঠিকানা, ইসলামী আইন-বিচার ও কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার সুনাম আধুনিক সমাজে প্রচারের কাজে নিয়োজিত 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে সাফল্যের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করুক–গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকাশনার শুভ মুহূর্তে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে এটাই আমাদের প্রার্থনা।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে

**শহীদুল ইসলাম**

সদস্য সচিব

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ অনুবাদ প্রকল্প

ও

সহকারী নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.amarboi.org

# ইসলামের পারিবারিক আইন
## (দ্বিতীয় খণ্ড)
## যাঁরা অনুবাদ করেছেন

| | |
|---|---|
| প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক | শিক্ষাবিদ, গবেষক, অনুবাদক |
| ফয়সল আহমদ জালালী | মুহাদ্দিস, অনুবাদক |
| মুহাম্মদ রুহুল আমিন | গবেষক, প্রবন্ধকার |
| নাজমুল হুদা সোহেল | গবেষক, অনুবাদক |
| শফিকুল ইসলাম গওহরী | মুহাদ্দিস, অনুবাদক |
| মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান | গবেষক, অনুবাদক |
| আনোয়ার শাহ | গবেষক, অনুবাদক |
| শহীদুল ইসলাম | গবেষক, সম্পাদক, অনুবাদক |

www.amarboi.org

# সূচিপত্র

০১. শিশুর নামকরণ : تسمية ........................................ ১৩
০২. শিশুর জন্য আকীকা : عقيقة ........................................ ২৯
০৩. রক্তপিণ্ড : علقة ........................................ ৩৭
০৪. স্তন্যদান : رضـــاع ........................................ ৪১
০৫. শিশুর লালন পালন : حضانة ........................................ ৬১
০৬. স্বামী-স্ত্রীর যৌথ জীবন যাপন : عشرة ........................................ ৮৯
০৭. খোরপোষ : نفقة ........................................ ১০৩
০৮. স্ত্রীর অবাধ্যতা : نشوز ........................................ ১১৯
০৯. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার : بر الوالدين ........................................ ১৬৯
১০. সেবা : خدمة ........................................ ১৮৭
১১. নারীর যোনিপথে বাধা : قرن ........................................ ১৯৫
১২. পুরুষের যৌন অক্ষমতা : عنة ........................................ ১৯৭
১৩. তালাক : طلاق ........................................ ২১৫
১৪. তালাকের ক্ষমতা প্রদান : تفويض طلاق ........................................ ২৯৩
১৫. তালাক প্রত্যাহার (রাজআহ্) : رجعة ........................................ ৩০৫
১৬. খুলা : خلع ........................................ ৩২৫
১৭. লি'আন : لعان ........................................ ৩৬৫
১৮. ইদ্দত : عدة ........................................ ৩৯৯
১৯. উত্তরাধিকার : إرث ........................................ ৪৭৯

www.amarboi.org

# শিশুর নামকরণ (تَسْمِيَةٌ)

**সংজ্ঞা :** التَّسْمِيَةُ শব্দটি سَمَّى -এর মাসদার। মাদ্দা হলো (سَمَا)। অভিধানে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে سَمَا يَسْمُو سُمُوًّا অর্থাৎ উর্ধ্বে উঠা। বলা হয় : سَمَتْ هِمَّتُهُ إِلَى مَعَالِي الأُمُورِ যখন সে ইজ্জত ও মর্যাদা কামনা করে। আর প্রতিটি উর্ধ্বের বস্তুকেই বলা হয় سَمَاءٌ

আর (الاِسْمُ), যা السُّمُوُّ থেকে উদ্‌গত। অর্থ উচ্চতা, প্রাধান্য। আবার বলা হয় : الاِسْمُ مِنَ الْوَسْمِ অর্থাৎ اِسْم শব্দটি وَسْم থেকে উদ্ভূত যার অর্থ চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য, আলামত বা নিদর্শন।[১]

আস-সিহাহ অভিধানে বলা হয়েছে : سَمَّيْتُ فُلَانًا زَيْدًا এবং سَمَّيْتُهُ بِزَيْدٍ (আমি অমুককে যায়েদ নামে অভিহিত করেছি) একই অর্থে ব্যবহৃত। আর أَسْمَيْتُهُ ও একই অর্থে ব্যবহৃত; আর هَذَا سَمِيُّ فُلَانٍ বলা হয় যখন কারো নাম তার নামের অনুরূপ হবে। আল্লাহ তাআলার বাণী– هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا 'তুমি কি তার সমগুণসম্পন্ন কাউকে জানো'?[২] অর্থাৎ, এমন নজীর যা তার নামের উপযুক্ত।[৩]

ফকীহগণের মতে التَّسْمِيَةُ শব্দটি আরো কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– بِسْمِ الله বিসমিল্লাহ্ বলা, নবজাতক বা অন্য কারো নিশানসূচক নাম রাখা, চুক্তিতে বিনিময় নির্ধারণ করা যেমন–মোহর, পারিশ্রমিক, মূল্য এবং নাম দ্বারা কোনো কিছু নির্দিষ্ট করা যা অস্পষ্টতার বিপরীত।

## সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ

**ক. التَّكْنِيَةُ আত-তাকনিয়া :** التَّكْنِيَةُ শব্দটি كَنَّى (নূনকে তাশদীদ যোগে) এর মাসদার। অর্থাৎ, সে তার জন্য উপনাম নির্ধারণ করেছে। যেমন– অমুকের পিতা ও অমুকের মাতা।[৪] উপনামসংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম 'কুনিয়াত' (كنية)।

**খ. التَّلْقِيبُ আত্-তালকীব :** التَّلْقِيبُ (আত-তালকীব) শব্দটি لَقَّبَ (কাফে তাশদীদ যোগে) এর মাসদার। اللَّقَبُ শব্দ الأَلْقَاب এর একবচন। আর তা হলো প্রশংসা বা নিন্দার্থে যা প্রচলিত। এর অভিধানিক অর্থ : পার্থক্যকারী

১. আল মিসবাহুল মুনীর, ধাতু سمو
২. সূরা মারয়াম, ৬৫।
৩. জাওহারী, আস-সিহাহ শব্দমূল ঐ।
৪. আল কামূসূল মুহীত, মাদ্দাহ كنى

www.amarboi.org

কোনো উপাধি। অপছন্দনীয় ডাকনাম দেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ : وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ "তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না।"

যদি এই উপাধি দ্বারা পরিচয় দেওয়া উদ্দেশ্য হয় তবে তা নিষিদ্ধের আওতায় পড়বে না। যেমন পূর্বকালের কোনো কোনো ইমামকে পরিচয় দেওয়া হয় : الأَعْمَش (ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন) الأَخْفَش (দিবান্ধ), الأَعْرَج (খোঁড়া) ইত্যাদি উপনামে। নাহুবিদগণ তাদের গ্রন্থসমূহে কুনিয়াত, লকব ও ইসম এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

তাদের মতে কুনিয়াত হলো, প্রত্যেক مُرَكَّب إِضَافِي (সম্বন্ধসূচক যৌগিক বাক্য) যার প্রথমে أَبٌ অথবা أُمٌّ রয়েছে। যেমন, أَبُو بَكْر আবু বকর রা. এবং নবী স.-এর কন্যা أُمّ كُلْثُوم উম্মে কুলসুম। 'আল-আবহারী' আল-আ'যুদ এর পাদটীকায় ইস্‌ম ও লাকব এর মধ্যে পার্থক্য করে বলেন, আল-ইসম (নাম) নির্দিষ্ট সত্তাকে বুঝায় এবং আল-লাকাব (উপাধি) গুণসহ সত্তাকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে সম্মানীত করতে অথবা অপমান করতে লকব বা উপাধিকে নির্বাচন করা হয়।[৫]

নবজাতকের নামকরণের আলোচনায় কুনিয়াত ও লকবের বিধান আসবে।

## তাসমিয়া (নামকরণ)-এর বিধান

**প্রথমত : তাসমিয়া বা বিসমিল্লাহ বলা :** এর পূর্ণরূপ হলো : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এর সাথে অনেক বিধান সংশ্লিষ্ট। যেমন, অজু ও গোসলের পূর্বে, নামাযের মধ্যে, জবেহ আরম্ভ করা, শিকারের জন্য কুকুর প্রেরণ বা তীর নিক্ষেপ করা এবং খানা খাওয়া, সহবাস অথবা টয়লেটে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা। বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম 'বাসমালাহ' (بسملة)।

**দ্বিতীয়ত : নবজাতক বা অন্য কিছুর নামকরণ অর্থে তাসমিয়া :** ফকীহগণ তাদের আলোচনায় তাসমিয়া দ্বারা নবজাতক বা অন্য কারো চিহ্নসূচক নামকরণ বুঝিয়েছেন। এই অর্থে তা হলো নির্দিষ্ট কোনো জিনিসের পরিচয় প্রদান। কেননা সে অস্তিত্বে আসার সময় নাম অজানা ছিল এবং তার এমন কিছু ছিলো না, দ্বারা তার পরিচয় দেওয়া যেত।

## নামকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান

### ক. নবজাতকের নামকরণ

ইবনে আরাফা উল্লেখ করেছেন, মূলনীতির দাবি হলো, নামকরণ করা ওয়াজিব। আর এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই যে, নামকরণের ক্ষেত্রে মাতার তুলনায় পিতা অগ্রগণ্য। যদি পিতা-মাতা নামকরণে মতভেদ করেন তবে পিতা অগ্রাধিকার পাবে।[৬]

---

৫. আত-তাসরীহ আ'লাত তাওদীহ, খ. ১, পৃ. ১২০, আল হালাবী সম্পা.।

৬. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৬, আন-নাজাহ সং; তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ.১০৬।

www.amarboi.org

**খ. নামকরণের সময়**

মালেকী মাযহাব মতে, নবজাতকের নামকরণ করার সময় হলো, জন্মের সপ্তম দিন আকীকার পশু জবেহ্ করার পর যদি নবজাতকের আকীকা দেয়া হয়। আর যদি অভিভাবকের দারিদ্র্যের কারণে তার আকীকা না হয় তবে তারা যখন চাইবে তার নাম রাখবে।

'আল-হাত্তাব' বলেন, আল-মাদখাল গ্রন্থের নিফাস অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'যদি নবজাতকের আকীকা দেয়া হয় তবে আকীকার পশু জবেহ্ করা পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে তার নাম নথিভুক্ত করবে না। সপ্তম দিন পর্যন্ত তার নামকরণের সুযোগ থাকবে। যখন আকীকার পশু জবেহ্ হবে তখন তার নামকরণ করবে।' আর যদি অভিভাবকের দারিদ্র্যের কারণে নবজাতকের পক্ষ থেকে আকীকা না হয় সেক্ষেত্রে তারা যখন ইচ্ছা তার নাম রাখতে পারবে।

ইবনে আরাফা বলেন, মূলনীতি অনুযায়ী নামকরণ করা ওয়াজিব। ইবনে কাসেম শুনেছেন, জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখা হয়।

ইবনে রুশ্দ এ হাদীস "সপ্তম দিনে নবজাতকের পক্ষ থেকে জবেহ্ করা, মাথা মুণ্ডানো এবং নামকরণ করা হবে"[৭] সম্পর্কে বলেন, অন্য একটি হাদীসের দ্বারা এ হাদীসে আরো সুযোগ রয়েছে। সে হাদীসটি হলো : রাসূলুল্লাহ স. বলেন, 'আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইবরাহীমের নামানুসারে আমি তার নামকরণ করেছি'।[৮]

আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে তার জন্মের দিন সকালেই নবী স.-এর নিকট আনা হলো। তিনি তার তাহনীক করলেন (খেজুর বা অন্য কোনো মিষ্টিদ্রব্য মুখে চিবিয়ে জিহ্বা দিয়ে তা শিশুর মুখে দেয়া), তার জন্য দুআ করলেন এবং তার নামকরণ করলেন'।[৯]

নামকরণ করতে সাত দিনের বেশি দেরি করা নিষেধ। প্রথম হাদীসের বক্তব্য এভাবে ধরে নিলে পরবর্তী হাদীসগুলির বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ইমাম

---

৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত নবী (স) নবজাতকের সপ্তম দিনে নামকরণ করা, তার ময়লা দূর করা এবং আকীকা করার নির্দেশ দিয়েছেন।' হাদীসটি ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন (খ. ৫, পৃ. ১৩২, আল হালাবী সম্পা.), তার মতে এটি হাসান।

৮. হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক রা. সূত্রে ইমাম মুসলিম (খ. ৪, পৃ. ১৮০১, আল হালাবী) উদ্ধৃত করেন।

৯. হাদীসটি ইমাম বুখারী (খ. ৯, পৃ. ৫৮৭, আল সালফিয়্যা) ও ইমাম মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১৬৮৯, আল হালাবী) উদ্ধৃত করেন।

www.amarboi.org

মালেক র. এর মতের ভিত্তিতে ইবনে হাবীব বলেন, সপ্তম দিনের আগে যে কোনো সময় নবজাতকের নামকরণ করার সুযোগ রয়েছে। তবে এর মধ্যেই তা হতে হবে।[১০]

শাফেয়ী মাযহাব মতে, জন্মের সপ্তম দিনে নবজাতকের নামকরণ করা মুস্তাহাব। যেমনটি ইমাম নববী 'আর রওজা'য় উল্লেখ করেছেন। তবে এর আগে নামকরণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তাদের কেউ কেউ এরূপ না করা পছন্দ করেছেন। আর অকালপ্রসূত ভ্রূণ এবং যে শিশু সাত দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে তার নাম রাখা পরিত্যাগ করা যাবে না।[১১]

বুখারী শরীফে উদ্ধৃত কিছু সহীহ হাদীস অনুযায়ী নবজাতকের আকীকা করার ইচ্ছা না থাকলে নামকরণ জন্মদিনেই হতে পারে। আর অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকীকা করার ইচ্ছা থাকলে নামকরণ হবে সপ্তম দিনে।[১২]

নামকরণের সময়ের ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবের দু'টি বর্ণনা রয়েছে :

১. সপ্তম দিনে নামকরণ করা।
২. জন্মের দিনেই নামকরণ করা।

কাশশাফুল কিনা গ্রন্থকার বলেন, হযরত সামুরা রা. এর হাদীস অনুযায়ী জন্মের সপ্তম দিনে নবজাতকের নামকরণ করতে হবে। নবী স. বলেন :

كُل غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بعَقِيقَته ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابعه ، وَيُسَمَّى فِيه ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ .

"প্রত্যেক শিশুই তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তাই তার পক্ষ থেকে জন্মের সপ্তম দিনে (পশু) জবেহ করতে হবে, সেদিন নামকরণ করা এবং তার মাথা মুণ্ডন করা হবে"।[১৩]

নামকরণ করা পিতার দায়িত্ব। সুতরাং তার বর্তমানে অন্য কেউ নবজাতকের নামকরণ করবে না।[১৪]

---

১০. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৬; হাশিয়াতুল আদাবী আলা শারহি আবিল হাসান লি রিসালাতি ইবনে আবী যায়দ, খ. ১, পৃ. ৫২৫।

১১. রাওদাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ২৩২, আল-মাকতাবুল ইসলামী সং; হাশিয়াতু কালইয়ুবী, খ. ৪, পৃ. ২৫৬, আল-হালাবী সং।

১২. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৯, পৃ. ২৭৩, দারুস-সাদের সং; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৪, দারু ইহয়ায়িত তুরাছ আল-আরাবী সং; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ১৩৯, আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা সং।

১৩. হাদীসটি নাসায়ী (খ. ৮, পৃ. ১৬৬, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা) ও হাকেম (খ. ৪, পৃ. ২৩৭, দায়েরাতুল মারেফ আল-উসমানিয়্যা) উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১৪. কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৫-২৬, আন-নাসর সং।

www.amarboi.org

'আর-রিআয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, জন্মের দিনেই নামকরণ করা যাবে। দলীল মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ স. এর পুত্র ইবরাহীমের জন্মের ঘটনা। তা হলো রাসূলুল্লাহ স. বলেন, আজ রাতে আমার এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। অতঃপর আমি আমার পিতা ইবরাহীমের নামানুসারে তার নাম রেখেছি ইবরাহীম।'[১৫]

ইবনে আবেদীন ও হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফতোওয়ায়ে আলমগীরী'এর গ্রন্থকার নামকরণের আলোচনায় তার সময়ের কথা উল্লেখ করেননি'।[১৬]

ইবনুল কাইয়িম বলেন, যদি বাস্তবতা এই হয় যে, নামকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো জিনিসের পরিচয় প্রদান করতে হবে, তাহলে সেটি অস্তিত্বে আসার দিনেই তার নামকরণ জায়েয। কেননা নামঅজ্ঞাত কোনো কিছু অস্তিত্বে আসার সময় তার পরিচয় দেওয়ার মতো কিছু থাকে না। আর তারীফ বা পরিচয় প্রদান তিনদিন পর্যন্ত অথবা আকীকার দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ। এর আগে বা পরে করাও বৈধ। এক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যাপকধর্মী।[১৭]

### গ. অকালপ্রসূত ভ্রূণের নামকরণ

'আস-সিক্‌ত' বা অকালপ্রসূত ভ্রূণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন ছেলে বা মেয়ে সন্তান যে মেয়াদ পূর্ণের আগেই তার মায়ের পেট থেকে বের হয়ে যায় এবং তার সুস্পষ্ট আকৃতি থাকে। বলা হয় । سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سُقُوطًا সন্তানটি তার মায়ের পেট থেকে স্খলিত হয়েছে।' তাকে যেরযোগে سِقْطٌ 'সিক্‌ত' বলা হয়। আভিধানিকভাবে এটি যবর-পেশও দিয়ে পড়া হয়। ফকীহগণ অকালপ্রসূত ভ্রূণের নামকরণের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি'-প্রণেতা বলেন, যে মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবে ইমাম আবু হানীফার মতে তার নামকরণ করা হবে না। এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ র. ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুসারে অকালপ্রসূত ভ্রূণের নামকরণ করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী র.-এর মতে নামকরণ করা হবে। যেমনটি ইমাম নববী 'আর রাওজা' গ্রন্থে বলেছেন, সিক্‌ত বা অকালপ্রসূত ভ্রূণের নামকরণ করা পরিত্যাগ করা যাবে না। আন-নিহায়া গ্রন্থমতে, রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে এমন অকালপ্রসূত ভ্রূণের নামকরণ করা মুস্তাহাব।[১৮]

---

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২৬৮-২৬৯, আল আমীরিয়্যা সং; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা ৫৩৬২, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা সং।

১৭. তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৮৮।

১৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩৬২; হাশিয়াতুল আদাবী আলা শারহি আবিল-হাসান লি রিসালাতি ইবনে আবি যায়েদ, খ. ১, পৃ. ৫২৫; রাওদাতুত্ তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ২৩২; কালয়ূবীর



www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে ইবনে কুদামা বলেন, যদি সে ছেলে নাকি মেয়ে পরিষ্কার বুঝা না যায় তবে ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এমন কোনো নাম রাখা যেতে পারে। এটি মুস্তাহাব। কেননা নবী স. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمُّوا أَسْقَاطَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَسْلَافُكُمْ 'তোমরা তোমাদের অকালপ্রসূত ভ্রূণদের নামকরণ করো, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের পূর্বসূরী'।[১৯]

বলা হয়, এজন্য তাদের নামরণ করা হবে, যাতে কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকা যায়। যদি প্রসূত ভ্রূণটি নারী না-কি পুরুষ তা জানা না যায় তবে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এমন একটি নাম রাখা হবে। যেমন সালামা, কাতাদা, সু'আদ, হিন্দ ইত্যাদি।[২০]

## জন্মের পর মৃত্যুবরণকারী নবজাতকের নামকরণ

ফকীহগণের মতে, যে নবজাতক জন্মের পর এবং নামকরণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে তার নামকরণ করা হবে। বিস্তারিত বর্ণনায় হানাফীগণ বলেন, সে চিৎকার করলে তার জন্য বড়দের বিধান আরোপ করা হবে এবং তার সকল অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে।[২১] মালেকী মাযহাব মতে, জন্মের পর মৃত্যুবরণকারীর নামকরণ করা জায়েয।[২২] শাফেয়ী মাযহাব মতে, সাতদিন পূর্ণ হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করলে নামকরণ করা যাবে। আর রাওজা গ্রন্থে ইমাম নববীও অনুরূপ বলেছেন। 'মুগনী আল-মুহতাজ'-প্রণেতা বলেন, নামকরণের আগে মৃত্যুবরণ করলে তার নাম রাখা মুস্তাহাব।[২৩] হাম্বলী মাযহাবমতে, জন্মের পর মৃত্যুবরণকারীর নামকরণ করা জায়েয। কেননা তারা অকালপ্রসূত ভ্রূণের নামকরণ জায়েয বলেছেন। তারা আরো বলেন, এটি মুস্তাহাব। সুতরাং তাদের নিকট জন্মের পর মৃত্যুবরণকারীর নামকরণ করা জায়েয; বরং অগ্রগণ্য।[২৪]

---

হাশিয়া, খ. ৪, পৃ. ২৫৬; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৯, পৃ. ৩৭২; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৪, দারু ইহয়ায়িত তুরাছ আল আরাবী; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ১৩৯।

১৯. হাদীসটির অন্য পাঠ سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থকার বলেন, ইবনে আসাকির বাখতারী বিন উবাইদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রা. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আল-বাখতারী দুর্বল (আল-কানয, খ. ১৬, পৃ. ৪২৩, আর রিসালাহ সং)

২০. ইবনে কুদামাহ আল মুগনী, খ. ২, পৃ. ৫২৩, রিয়াদ সং।

২১. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ১, পৃ. ১৪১, খ. ৫, পৃ. ২৬৮।

২২. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৬; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ২২৪, দারুল-মা'রিফা সং; হাশিয়াতুল আদাবী আলা শারহির রিসালাহ, খ. ১, পৃ. ৫২৫।

২৩. রাওদাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ২৩২; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৪।

২৪. ইবনে কুদামা আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ৫২৩।'

www.amarboi.org

## যেসব নাম রাখা উত্তম

নামকরণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, সব নামই জায়েয যদি সেটি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো বর্ণনা না থাকে, যার বিবরণ পরে আসবে। আল্লাহ অথবা তাঁর বিশেষ নামসমূহের যে কোনো একটির দিকে সম্বন্ধযুক্ত দাসসূচক সব নাম দ্বারা নামকরণ করা মুস্তাহাব। কেননা ফকীহগণ এভাবে নামকরণ করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন, আল্লাহর নিকট নবীদের নামসমূহ সবচে' বেশি প্রিয়।[২৫]

সহীহ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। যেমন ইমাম মুসলিম তার 'সহীহ' গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন–

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ "তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান"।[২৬]

আবু দাউদ তার সুনানে আবুল জুশামী রা. থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন– তোমরা নবীদের নামে নাম রাখো। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান, সবচেয়ে খাঁটি হারেস ও হাম্মাম এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হারব ও মুররা।[২৭]

ইবনে আবেদীন তার হাশিয়াতে আল-মুনাবী থেকে বর্ণনা করে বলেন, সাধারণভাবে আবদুল্লাহ নাম সব নাম থেকে এমনকি আবদুর রহমান থেকেও উত্তম। আর এ দু'টির পর সর্বোত্তম নাম মুহাম্মদ তারপর আহমাদ তারপর ইবরাহীম।

সংখ্যাগরিষ্ঠ (জমহুর) ফকীহগণের মতে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত সব দাসসূচক শব্দ দ্বারা নামকরণ যেমন : আবদুল্লাহ অথবা আল্লাহর বিশেষ নামসমূহের যে কোনো একটির দিকে সম্বন্ধযুক্ত শব্দ দ্বারা নামকরণ করা মুস্তাহাব। যেমন আবদুর রহমান, আবদুল গফুর।[২৮]

---

২৫. তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৮৯।

২৬. হাদীসটি ইমাম মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১৬৮২, আল-হালাবী) উদ্ধৃত করেছেন।

২৭. হাদীসটি আবু দাউদ উদ্ধৃত করেছেন (খ. ৫, পৃ. ২৩৭, সম্পাদনা ইজ্জত উবাইদ দা'আস)। ইবনে কাত্তান একে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন, যেমনটি উল্লেখ রয়েছে আল মুনাবী এর ফাইদুল কাদীর গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ২৪৬, আল মাকতাবুত তিজারিয়া সং)।

২৮. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৬; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৯, পৃ. ৩৭৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৬।

www.amarboi.org

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান, এ বিষয়ে হানাফী মাযহাব জমহুরের সাথে একমত। তবে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-প্রণেতা বলেন, 'কিন্তু বর্তমান যুগে এসব নাম ছাড়া অন্য নাম রাখা উত্তম। কেননা সাধারণ মানুষ ডাকার সময় এসব নাম ছোট করে ফেলে'[২৯]

ইবনে আবেদীন আদ্‌দুররুল মুখতার এর ওপর লিখিত হাশিয়ায় বলেন, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান দ্বারা নামকরণ উত্তম হওয়া নিঃশর্তভাবে নয়। যারা দাসত্বসূচক নামকরণে আগ্রহী তাদের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। কারণ তারা অতীতে আবদে শামস ও আবদুদ দার নাম রাখত। সুতরাং সে কারণেই আল্লাহর নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নামের প্রাধান্য বর্ণিত হয়েছে। তাই বিষয়টি আল্লাহর নিকট সব নাম থেকে মুহাম্মদ ও আহমাদ নাম সবচেয়ে প্রিয় হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা তিনি তাঁর নবীর জন্য তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামই পছন্দ করেছেন। এটিই সঠিক।[৩০]

আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত নামকে তাসগীর (ছোটকরণ) এর মাধ্যমে পরিবর্তন করা জায়েয নেই। ইবনে আবেদীন বলেন, আর আমাদের যুগে বিষয়টি প্রচলিত। সাধারণ মানুষ আবদুর রহীম, আবদুল করীম বা আবদুল আযীয নামসমূহ থেকে আল্লাহর নামকে তাসগীরের ياء -কে তাশদীদ-যোগে যথাক্রমে رُحَيِّم (রুহায়্যেম) كُرَيِّم (কুরায়্যেম) ও عُزَيِّز (উযায়্যেয) বলে ডাকে।[৩১] আবদুল কাদেরকে ডাকে কুয়াইদের। ইচ্ছাকৃত এরূপ ডাকা কুফরী।

'আল মুনইয়া' গ্রন্থে রয়েছে, কেউ আবদুল আযীয বা অনুরূপ আসমাউল হুসনা এর যে কোনো একটির সাথে সম্পর্কিত নামের শেষে ইচ্ছাকৃত ও অবজ্ঞা করে তাসগীর যোগ করলে সেটি কুফরী। আর যদি সে না বুঝে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করে তাহলে কুফরির হুকুম আরোপিত হবে না। যে ব্যক্তি তার কাছ থেকে এরূপ শুনবে তার দায়িত্ব তাকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া। তাদের কেউ কেউ আবদুর রহমান নামকে رَحْمُوْنْ (রাহমুন) নামেও ডাকে।[৩২] নবীদের নামে নামকরণের বিধান নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশের মতে, তাতে দোষ নেই। এটাই সঠিক। 'তুহফাতুল মুহতাজ' গ্রন্থকার বলেন, নবী বা

---

২৯. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ৫, পৃ. ৩৬২।

৩০. ইবনে আবেদীন এর হাশিয়া, খ. ৫, পৃ. ২৬৮।

৩১. আমাদের দেশে এসব নামের 'আবদু' অংশ বাদ দিয়ে রহিম্মা, করিম্মা ও আইজ্জা ইত্যাদি বিকৃত উচ্চারণে ডাকতে দেখা যায়।

৩২. ইবনে আবেদীন এর হাশিয়া,খ. ৫, পৃ. ২৬৮।

www.amarboi.org

ফেরেশতাদের নামে নামকরণে কোনো দোষ নেই; বরং আমাদের নবী স.-এর নামে নামকরণে ফজীলতের বর্ণনা এসেছে।[৩৩]

এ সম্পর্কে আল আতাবী বর্ণনা করেন, মক্কাবাসীরা বলাবলি করত– 'কোনো ঘরে মুহাম্মদ নাম দেখলেই সেখানে কল্যাণ দেখা যায় অথবা তাদের রিজিক দেয়া হয়।'[৩৪]

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী 'কাশশাফুল কিনা'–প্রণেতা উল্লেখ করেছেন, 'নবীদের নামে নামকরণ করা উত্তম।'[৩৫] বরং সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব বলেছেন, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- 'আল্লাহর নিকট নবীদের নাম সবচেয়ে প্রিয়।'

অন্যান্য ফকীহগণ নবীদের নামে নামকরণকে অপছন্দ করেছেন। এ মতটি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর বলে বর্ণনা করা হয়।

'তুহফাতুল মাওদূদ'-প্রণেতা বলেন, এ মতের প্রবক্তা সম্ভবত নবীদের নামসমূহকে রাগ বা অন্যের ক্ষেত্রে খারাপ সম্বোধন ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।

সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব বলেন, আল্লাহর নিকট নবীদের নাম সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তারিখে ইবনে খায়ছামাতে রয়েছে, 'হযরত তালহা রা. এর দশজন সন্তান ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের নাম ছিল নবীদের নামে। আর হযরত যুবাইর রা. এর দশজন সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকের নাম শহীদদের নামে রাখা হয়। অতঃপর তালহা রা. তাকে বললেন, আমি নবীদের নামে তাদের নামকরণ করেছি আর তুমি শহীদদের নামে তাদের নামকরণ করেছ। তখন যুবাইর রা. তাকে বললেন, কেননা আমি আশা করি আমার সন্তানরা শহীদ হবে। কিন্তু তোমার সন্তানরা নবী হবে এ আশা তুমি করতে পার না।'[৩৬]

আবু দাউদ তার সুনানে আবুল জুশামী রা. থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যা নবীদের নামে নামকরণ করাকে জায়েয প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ 'তোমরা নবীদের নামে নামকরণ করো'।[৩৭]

ইমাম বুখারী কর্তৃক তার 'আস-সহীহ'-এ উদ্ধৃত হযরত জাবের রা.-এর একটি হাদীস আমাদের নবী মুহাম্মদ স. এর নামে নামকরণ করাকে জায়েয প্রমাণ করে। তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল।

---

৩৩. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৯, পৃ. ৩৭৩।
৩৪. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৬।
৩৫. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৬; তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ১০০।
৩৬. তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ১০০-১০১।
৩৭. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

অতঃপর সে তার নাম রাখল কাসেম। লোকেরা বলল, নবী স.-কে জিজ্ঞেস করা ছাড়া তার কুনিয়াত (উপনাম)-এ আমরা কুনিয়াত রাখব না। অতপর নবী স. বললেন, سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي 'তোমরা আমার নামে নাম রাখো; কিন্তু আমার কুনিয়াত দ্বারা কুনিয়াত রেখো না'[৩৮]

**অপছন্দনীয় নামসমূহ**

এমন সব শব্দ দ্বারা নামকরণ করা মাকরুহে তানযীহি যার অনুপস্থিতিকে অশুভ মনে করা হয়। যেমন– রাবাহ (লাভ), আফলাহ (সফল), নাজাহ (কৃতকার্য), ইয়াসার (সচ্ছলতা) ও এ জাতীয় নাম। এই নাম ও এর অনুরূপ নামসমূহের অনুপস্থিতিকে অশুভ লক্ষণ মনে করা হয়। পুত্রের নাম রাবাহা (লাভ) রেখেছে এমন ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার কাছে কি রাবাহ (লাভ) আছে? সে বলবে, না বাড়িতে লাভ নেই। বস্তুত এটি অশুভ মনে করার রাস্তা তৈরী করে দেয়।[৩৯]

ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে উদ্ধৃত করেন যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন–

لاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا وَلاَ أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ تَقُول : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَلاَ يَكُونُ ، فَيَقُول : لاَ

'তোমার সন্তানের নাম ইয়াসার (সচ্ছলতা), রাবাহ (লাভ), নাজীহ (সফল) বা আফলাহ (অধিক কৃতকার্য) রেখো না। কারণ তুমি অবশ্যই বলবে, অমুক কি আছে? সে না থাকায় (উত্তরদাতা) বলবে, নেই'।[৪০]

উমর রা.-এর একটি হাদীস অনুযায়ী তা হারাম নয়-

إِنَّ الأَذِنَ عَلَى مَشْرَبَةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ يُقَال لَهُ : رَبَاحٌ

'রাসূলুল্লাহ স.-এর পান-সামগ্রীর অনুমতি দানকারী একজন খাদেম ছিল, যাকে রাবাহ বলা হতো'।[৪১] হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, 'একদা রাসূলুল্লাহ স. ইয়ালা (শ্রেষ্ঠ), বারাকাহ (বরকত), আফলাহ (সফল), নাফে (উপকারী) ও এ জাতীয় অন্যান্য নামকরণ করা নিষিদ্ধ করতে চাইলেন। এরপর আমি তাঁকে এ

৩৮. ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৫৭১।

৩৯. আল-ফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যা শারহুল আযকার আন-নাওয়াইয়্যা, খ. ৬, পৃ. ১১০ (প্রকাশক, আল মাকাতাবাতুল ইসলামিয়্যা); ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২৬৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ১৩৯; মাতালিবু উলিন-নুহা, খ. ২, পৃ. ৪৯৪।

৪০. হাদীসটি ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন (খ. ৩, পৃ. ১৬৮৫, আল হালাবী সম্পা.)

৪১. হাদীসটি ইমাম মুসলিম উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে উদ্ধৃত করেছেন (খ. ২, পৃ. ১১০৬, আল হালাবী সম্পা.) আরো দ্রষ্টব্য মাতালিবু উলিন-নুহা, খ. ২, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫।

www.amarboi.org

বিষয়ে চুপ থাকতে দেখেছি। তিনি কিছুই বলেননি। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তা নিষেধ করেননি। এরপর হযরত উমর রা. তা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন কিন্তু তা পরিহার করেছেন।'

আর সেসব নামও মাকরূহ, যা মানুষ অপছন্দ করে এবং যা থেকে বিরক্তির উদ্রেক হয়। যেমন–হারবুন (যুদ্ধ) মুররাতুন (তিক্ত), কালবুন (কুকুর), হায়্যাতুন (সাপ)।[৪২]

মালেকীগণ স্পষ্ট বলেছেন, মন্দ সকল নামই রাখা নিষিদ্ধ। 'মাওয়াহিবুল জালীল' গ্রন্থকার বলেন, হারব (যুদ্ধ), হুয্ন (দুশ্চিন্তা) ও জিরার (ক্ষতি) ইত্যাদি খারাপ নাম রাখা নিষিদ্ধ।[৪৩]

'মুগনী আল মুহতাজ' গ্রন্থকার বলেন, মন্দ নামসমূহ মাকরূহ। যেমন– শয়তান, জালেম, শিহাব (অগ্নিশিখা), হিমার (গাধা), কালব (কুকুর) ইত্যাদি।[৪৪]

হাম্বলীগণের মতে, অহংকারীদের নামে নামকরণ করা মাকরূহ। যেমন–ফেরাউন ও শয়তানদের নামসমূহ। 'মাতালিবু উলিন-নুহা' গ্রন্থে এসেছে, হারবুন (যুদ্ধ) শব্দে নামকরণ করা অপছন্দনীয়।[৪৫]

নবী কারীম স. ব্যক্তি, স্থান, গোত্র ও পাহাড়সমূহের জন্য নিকৃষ্ট নাম অপছন্দ করতেন।

ইমাম মালেক 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে ইয়াহয়া বিন সাঈদ র. থেকে উদ্ধৃত করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ স. একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী প্রসঙ্গে বলেন– কে এর দুধ দোহন করবে? তখন একব্যক্তি দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বলল, মুররাহ (তিক্ত)। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, বসো। অতঃপর বললেন, কে এর দুধ দোহন করবে? তখন আরেক ব্যক্তি দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমার নাম কি? সে বলল, হারব (যুদ্ধ)। রাসূল স. তাকেও বললেন, বসো। অতঃপর বললেন, কে এর দুধ দোহন করবে? তখন একব্যক্তি দাঁড়াল। রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বলল, য়াঈশ (স্বচ্ছন্দ)। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি দুধ দোহন করো।[৪৬]

---

৪২. শারহুল আযকার, খ. ৬, পৃ. ১১১।

৪৩. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৬।

৪৪. মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৪।

৪৫. মাতালিবু উলিন-নুহা, খ. ২, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৮।

৪৬. হাদীসটি ইমাম মালেক 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন (খ. ২, পৃ. ৯৭৩, আল হালাবী)। য়াঈ'শ আল ফারী রা.-এর হাদীস এ হাদীসের সনদ সহীহ (ইবনে হাজার এর 'আল-ইসাবা', খ. ৩, পৃ. ৬৬৯, আস-সাআ'দা প্রেস)। আরো দ্রষ্টব্য, মুয়াত্তা মালেক' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তানবীরুল হাওয়ালিক, খ. ৩, পৃ. ১৪০-১৪১, আল মাশহাদুল হুসাইনী সং।

www.amarboi.org

**ফেরেশতাদের নামে নামকরণ**

অধিকাংশ আলেমের মতে, জিবরাঈল, মীকাঈল ইত্যাদি ফেরেশতার নামে নামকরণ করা দূষণীয় নয়। তবে ইমাম মালেক র. এরূপ নামকরণ অপছন্দ করেছেন। আশহাব বলেন, ইমাম মালেককে জিবরাঈল আ.-এর নামে নামকরণের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি তা অপছন্দ করেছেন। বিষয়টি তার কাছে ভালো লাগেনি। কাজী আয়াজ বলেন, কিছু আলেম ফেরেশতাদের নামে নামকরণকে উত্তম বলে মনে করেন। এ মতটি হারেস বিন মিসকীন এর। আর অন্যরা একে মুবাহ্ বা বৈধ বলেছেন।[৪৭]

**যেসব নাম রাখা হারাম**

আল্লাহ্ তাআলার সাথে নির্দিষ্ট নামসমূহ দ্বারা নামকরণ করা হারাম। যেমন– খালেক, কুদ্দুস, অথবা যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা ছাড়া অন্য কারো সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাও হারাম। যেমন মালিকুল মুলুক, সুলতানুস সালাতীন, হাকিমুল হুক্কাম ইত্যাদি। এ বিষয়ে সকল ফকীহ্ একমত।[৪৮]

ইবনুল কাইয়িম আল্লাহ্ তাআলার সাথে নির্দিষ্ট নামসমূহ উল্লেখ করেছেন : আল আহাদ, আস-সামাদ, আল খালেক, আর রায্যাক, আল-জাব্বার, আল-মুতাকাব্বির, আল আউয়াল, আল আখের, আল বাতেন ও আল্লামুল গুয়ূব।[৪৯]

মালিকুল মুলুকসহ আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলার সাথে নির্দিষ্ট নামসমূহ দ্বারা নামকরণ করা হারাম হওয়ার দলীল হচ্ছে : ইমাম বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত আবু হুরায়রা রা.-এর একটি হাদীস। বুখারী শরীফের পাঠ হলো, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন :

أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ক্রোধ উদ্রেককারী ও বিরক্তিকর হবে সেই ব্যক্তির নাম, যার 'মালিকুল আমলাক' নাম রাখা হয়েছে।"[৫০]

আর সহীহ্ মুসলিম এর পাঠ হলো–

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ : رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ ، لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللهُ –[৫১]

---

৪৭. তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৯৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৫।
৪৮. হাশিয়াতু ইবনে আবদীন, খ. ৫, পৃ. ২৬৮; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৬; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৪; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৬-২৭।
৪৯. তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৯৮।
৫০. বুখারী (আল-ফাতহ, খ. ১০, পৃ. ৫৮৮; মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৬৮৮)।
৫১. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৬৮৮।

www.amarboi.org

আর যেসব বহু অর্থবোধক নাম আল্লাহ তাআলা ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তা দ্বারা নামকরণ করা জায়েয। যেমন আলী, রশীদ ও বাদী।

ইবনে আবেদীন বলেন, বাহ্যত তা জায়েয, যদিও (নির্দিষ্টসূচক) আলিফ-লাম দ্বারা চিহ্নিত থাকে। আল হাসকাফী বলেন, আমাদের ক্ষেত্রে তা এক অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে অন্য অর্থে।[৫২]

হাম্বলী মাযহাব মতে, যেসব নাম নবী স. ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তদ্বারা নামকরণ করা হারাম। যেমন : سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ আদমসন্তানের নেতা, সায়্যেদুন নাস (মানবজাতির নেতা), সায়্যেদুল কুল্ল (সকলের নেতা) ইত্যাদি। কেননা এ জাতীয় নাম শুধু নবী কারীম স. এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[৫৩]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্বন্ধযুক্ত দাসসূচক সকল শব্দ দ্বারা নামকরণ করা হারাম। যেমন আবদুল উয্যা, আবদুল কাবা, আবদুদ্দার, আবদুল আলী, আবদুল হুসাইন অথবা আবদু ফুলান (অমুকের দাস)।

এটি হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত। হাশিয়া ইবন আবিদীন-এ উল্লিখিত হয়েছে আবদু ফুলান নাম রাখা যাবে না। 'মুগনী আল মুহতাজ' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে আবদুল কাবা ও আবদুল উয্যা দ্বারা নামকরণ করা জায়েয নেই।

'তুহফাতুল মুহতাজ' এ বলা হয়েছে, শিরকের বিভ্রান্তির কারণে আবদুন্নবী, আবদুল কা'বা, আবদুদ দার, আবদু আলী অথবা আবদুল হুসাইন নামকরণ করা হারাম। অনুরূপ আশঙ্কা থাকায় জারুল্লাহ, রফীকুল্লাহ এবং এ জাতীয় শব্দে নামকরণ হারাম গণ্য করা হয়েছে।

কাশ্শাফুল কিনা গ্রন্থে এসেছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসসুলভ সকল নাম হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত হয়েছেন। যেমন : আবদুল উয্যা, আবদু আমর, আবদু আলী, আবদুল কাবা এবং এ জাতীয় নামসমূহ। অনুরূপভাবে আবদুন্নবী, আবদুল হুসাইন ও আবদুল মাসীহ।[৫৪]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্বন্ধযুক্ত দাসসুলভ সকল শব্দ দ্বারা নামকরণ হারাম হওয়ার দলীল হলো, ইবনে আবী শায়বা বর্ণিত হাদীস, যা তিনি ইয়াযীদ

---

৫২. তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ১০০০; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২৬৮; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৩৬২; মাওয়াহিবুল জালীল, পৃ. ৩, পৃ. ২৫৭।

৫৩. কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭; মাতালিবু উলিন-নুহা, খ. ২, পৃ. ৪৯৪।

৫৪. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২৬৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৫; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ১০, পৃ. ৩৭৩; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭ তুহফাতুল মাওদূদ, পৃ. ৯০।

www.amarboi.org

ইবনে মিকদাম ইবনে শুরাইহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা হানী ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– 'একদা নবী স. এর কাছে একটি প্রতিনিধি গোত্র আগমন করল, তিনি শুনতে পেলেন তারা 'আবদুল হাজার' নামে কাউকে আখ্যায়িত করছে। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বলল, 'আবদুল হাজার'। এরপর রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি তো আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা)'।[৫৫] ইবনুল কাইয়িম বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয় কীভাবে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসসুলভ নাম হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত হলেন? অথচ নবী স. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত যে, তিনি বলেন

تَعسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ، تَعسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةَ ، تَعسَ عَبْدُ الْقَطِيفَة

'আবদুদ্ দীনার ও আবদুদ দিরহামের ধ্বংস হোক, আবদুল খামীসার ধ্বংস হোক, আবদুল কাতীফা এর ধ্বংস হোক'।[৫৬]

তিনি আরো বলেন– أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ . . . أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 'আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আবদুল মুত্তালিব এর পুত্র'।[৫৭]

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, রাসূলুল্লাহ স. এর বাণী– 'আবদুদ দীনার ধ্বংস হোক' দ্বারা নাম বুঝানো হয়নি; বরং যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে দীনার ও দিরহামের গোলাম বানিয়ে ফেলেছে এর দ্বারা তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ও তার প্রতি বদদুআ করা হয়েছে। কেননা সে তার প্রতিপালক আল্লাহর দাসত্বের তুলনায় এ দুয়ের দাসত্বকেই অধিক পছন্দ করেছে। তিনি মূল্য ও পোশাক-পরিচ্ছদও উল্লেখ করেছেন। আর এ দু'টি হলো ভিতর ও বাইরের সৌন্দর্য। তাঁর বাণী 'আমি আবদুল মুত্তালিব এর পুত্র'-নাম বিষয়ক নয়। বরং ব্যাপার হলো, সেই নামটি জানিয়ে দেয়া যদ্বারা ব্যক্তি পরিচিত, অন্য কেউ নয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় দেয়ার জন্য এরূপ সংবাদ দেয়া হারাম নয় আর ইখবার (সংবাদ প্রদান) এর ক্ষেত্র ইনশা (গঠন করা) এর তুলনায় অধিক বিস্তৃত।[৫৮]

## নাম পরিবর্তন ও সুন্দর করা

নাম পরিবর্তন করা সাধারণভাবে জায়েয এবং সেটি সুন্দর করা সুন্নত। আর খারাপ নামকে ভালো নাম দ্বারা পরিবর্তন করা সুন্নত। ইমাম আবু দাউদ তার

---

৫৫. হাদীসটি ইবনে আবী শায়বা উদ্ধৃত করেছেন (খ. ৮, পৃ. ৬৬৫, দারুস সালাফিয়্যা সম্পা.) হাদীসটির সনদ সহীহ (ইবনে হাজার আল-ইসাবা, খ. ৩, পৃ. ৫৯৬, আস সাআদা প্রকাশনী)।

৫৬. হাদীসটি ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন (আল-ফাতহ, খ. ১১, পৃ. ২৫৩, আস সালাফিয়্যা সং)।

৫৭. হাদীসটি ইমাম বুখারী (আল-ফাতহু, খ. ৬, পৃ. ৬৯, আস-সালাফিয়্যা) ও ইমাম মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ২৪০০, আল-হালাবী) বারা ইবনে আযেব রা. এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেন।

৫৮. তুহফাতুল মাওদূদ, খ. ৯০, পৃ. ৯১; কাশ্‌শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭।

www.amarboi.org

সুনানে আবুদ-দারদা রা. থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন- 'কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও তোমাদের পিতার নামানুসারে ডাকা হবে। তাই তোমাদের নামসমূহ সুন্দর করো।[৫৯]

ইমাম মুসলিম তার সহীহ্ গ্রন্থে ইবনে উমর রা. থেকে উদ্ধৃত করেন, উমর রা. এর এক কন্যার নাম ছিল আসিয়া অর্থ- অবাধ্য নারী। এরপর রাসূল স. তার নাম রাখেন জামীলা (সুন্দরী)।[৬০]

ইমাম বুখারী র. তার সহীহ গ্রন্থে আবদুল হামীদ ইবনে জুবাইর ইবেন শায়বা র. থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'আমি একদা সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব র.-এর কাছে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন, একদা তার দাদা হায্ন রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে গেলেন । তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম হায্ন (বিষণ্ন)। রাসূলুল্লাহ স. বললেন বরং তুমি সাহ্ল (স্বাভাবিক)। সে বলল, আমার পিতা যে নাম রেখেছেন আমি তা পরিবর্তন করব না। ইবনে মুসায়্যাব বলেন, এখনো পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বিষণ্নতা বিরাজমান।[৬১]

যে নাম পবিত্রতা বা প্রশংসা নির্দেশ করে, নবী কারীম স. তা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি 'বাররা' নামকে জুয়াইরিয়্যা বা যয়নব নামে পরিবর্তন করেছেন।[৬২]

আবু দাউদ বলেন, 'নবী স. আল-আস, আযীয, উতলা, শয়তান, আল-হাকাম, গুরাব, হুবাব ও শিহাব নাম পরিবর্তন করে 'হিশাম' রেখেছেন। তিনি 'হারব' (যুদ্ধ) নাম পরিবর্তন করে সিল্ম (শান্তি), মুদতাজি (অস্থির)-কে মুনবাইছ (সক্রিয়), আফরা নামক ভূমিকে খাজরাহ (সবুজ), শি'বুদ জলালাহ (ভ্রষ্ট জনপদ)-কে শিবুল হুদা হিদায়াতের জনপদ), যেনাকারিণীর সন্তানকে সচ্চরিত্রার সন্তান, পথভ্রষ্টের সন্তানকে সচ্চরিত্রতার সন্তান নামে নামকরণ করেছেন'।[৬৩]

---

৫৯. হাদীসটি আবু দাউদ উদ্ধৃত করেছেন (খ. ৫, পৃ. ২৩৬, সম্পাদনা, ইযযত উবাইদ দা'আস)। এর সনদে আবুদ-দারদা ও বর্ণনাকারীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে (মুখতাসারুস সুনান লিল মুনযিরী, খ. ৭, পৃ. ২৫১, দারুল মারিফা সংস্করণ)।

৬০. হাদীসটি ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন (খ. ৩, পৃ. ১৬৮৭, আল হালাবী সং)।

৬১. হাদীসটি ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন (ফাতহুলবারী, খ. ১০, পৃ. ৫৭৫, আস সালাফিয়্যা)।

৬২. হাদীসটি ইমাম বুখারী, উদ্ধৃত করেছেন (ফাতহুলবারী, খ. ১০, পৃ. ৫৭৫) মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৬৮৭।

৬৩. হাদীসটি আবু দাউদ তার সুনানে উল্লেখ করেছেন (খ. ৫, পৃ. ২৪১, সম্পাদনা ইযযত উবাইদ দা'আস)। তিনি বলেন, সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি এর সনদ পরিহার করেছি। আরো দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ এর ব্যাখ্যা, যেমন আওনুল মা'বুদ (খ.·১৩, পৃ. ২৯৮-২৯৯, আস সালাফিয়্যা সম্পা.)।

www.amarboi.org

এক নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। বরং খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখা বাঞ্ছনীয়, যাকে শরীয়ত উৎসাহ দিয়েছে। আর হাম্বলী মাযহাব মতে, একাধিক নামকরণ করাও জায়েয।[৬৪]

## স্বামী ও পিতাকে শুধু নাম ধরে ডাকা

হানাফী মাযহাব মতে, কোনো ব্যক্তির জন্য তার পিতাকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে সরাসরি নাম ধরে ডাকা অপছন্দনীয়। বরং এমন শব্দে ডাকা উচিৎ যাতে সন্তান ও স্ত্রীর ওপর তাদের মর্যাদা প্রকাশ পায়।

শাফেয়ীগণ বলেন, যা তাদের গ্রন্থ মুগনী আল-মুহতাজ ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির সন্তান, ছাত্র ও সেবকের জন্য সুন্নত হলো, তাকে নাম ধরে না ডাকা।[৬৫]

'মাতালিবু উলিন-নুহা' গ্রন্থ অনুযায়ী হাম্বলী মাযহাবের অভিমত হলো, নিষিদ্ধ গর্ব-অহংকার জেগে উঠার আশঙ্কায় মনিব তার গোলামকে 'হে আমার দাস'! এবং বাঁদীকে 'হে আমার দাসী'! বলে সম্বোধন করবে না। অনুরূপ বিভ্রান্তি থাকলে গোলাম তার মনিবকে 'হে আমার রব'! এবং হে 'আমার মাওলা'! বলেও সম্বোধন করবে না।[৬৬]

–নাজমুল হুদা সোহেল

---

৬৪. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২৬৮; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৬; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬-২৭।

৬৫. মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৯৫; তুহফাতুল মুহতাজ এর ওপর সারওয়ানীর হাশিয়া, খ. ৯, পৃ. ৩৭৪; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ২৩৫।

৬৬. মাতালিবু উলিন-নুহা, খ: ২, পৃ. ৪৯৬।

www.amarboi.org

# শিশুর জন্য আকীকা (عَقِيقَة)

## আকীকার পরিচয়

الْعَقِيقَةُ : আকীকা শব্দটি আরবী। এটি উন্নত মানের লাল পাথরের টুকরা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই পাথর লাল না হয়ে কখনও কখনও স্বচ্ছ ও সাদা কিংবা হলুদ রঙেরও হতে পারে। আকীকা শব্দটি আবার মানব কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় গজানো লোম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আবার আকীকা মানে জবেহকৃত ঐ প্রাণী, যা সন্তান জন্মের পর তার মাথার চুল কামানোর দিন জবেহ করা হয়।

বলা হয়, 'আক্কা ফুলানুন য়ায়িক্কু বা য়াউক্কু' عق فلان يعق أو يعق : সে তার সন্তানের চুল কামালো। 'ওয়া আক্কা ফুলানুন আন মাওলিদিহি ইয়াইক্কু বা ইয়াউক্কু' وعق فلان عن فولوده يعق أو يعق : সে তার সন্তানের পক্ষ থেকে জবেহ করল।[১]

## ইসলামের পরিভাষায়

مَا يُذَكَّى عَنِ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى بِنِيَّةٍ وَشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ . অর্থাৎ নিয়তের সাথে নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে সন্তান জন্মলাভের জন্যে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ যে পশু জবেহ করা হয় তাকে 'আকীকা' বলে। শাফেয়ী মাযহাবের কোনো কোনো আলেম উল্লিখিত অর্থে আকীকা শব্দের ব্যবহারকে অপছন্দ করেন। তারা মনে করেন, একে আকীকা না বলে নাসীকা বা যাবীহা বলা ভালো।[২]

## আকীকা শব্দের সমার্থক বা সংগতিপূর্ণ শব্দ

**ক) الأُضْحِيَّةُ। আল উজহিয়্যাহ :** উজহিয়্যাহ বলতে, কোরবানীর দিবসগুলোতে নির্দিষ্ট শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে যা জবেহ করা হয় তাকে বুঝায়।

আকীকা এবং উজহিয়্যাহ উভয়টিই আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য করা হয়। তবে আকীকা দেয়া হয় পিতা-মাতাকে সন্তানদান আর সন্তানকে জীবনদানের জন্য আল্লাহ তাআলার

---

১. আল কামুসুল মুহীত, আল মুজামুল ওয়াসীত।

২. তুহফাতুল মুহতাজ বি হাশিয়াতিশ শিরওয়ানী, খ. ৮, পৃ. ১৬৪-১৬৫; নিহায়াতুল মুহতাজ আর-রাশীদী ও শুবরামালিসী এর পাদটীকা, খ. ৮, পৃ. ১৩৭; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ২, পৃ. ৪৯২।

www.amarboi.org

কৃতজ্ঞতা এবং তার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। এজন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ধার্য করা নেই। বছরের যখনই সন্তান ভূমিষ্ঠ হোক না কেন আকীকা দেয়া যাবে। কিন্তু উজহিয়্যাহ হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং বেঁচে থাকার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ কোরবানীর দিবসগুলিতে পশু জবেহ করা। আর কোরবানীর দিনগুলোতেই তা জবেহ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়।

খ) اَلْهَدْيُ আল হাদী : হজ্জে তামাত্তো বা অনুরূপ কোনো কাজ করার কারণে কোরবানীর দিবসগুলোতে মক্কার হারাম এলাকায় যে পশু জবেহ্ করা হয় তাকে 'হাদী' বলে।

আকীকা ও হাদী এই অর্থে সমার্থবোধক যে, দু'টোতেই আল্লাহর সন্তুটি আছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে, আকীকার ক্ষেত্রে কোনো সময় ও স্থানের বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু হাদীর ক্ষেত্রে সময় ও স্থানের বাধ্যবাধকতা আছে। তা মক্কার হারাম এলাকা এবং কোরবানীর দিবসগুলোতে না হলে হবে না।

**আকীকার বিধান**

শাফেয়ী মাযহাব মতে আর হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ মতে, আকীকা দেয়া সুন্নাতে মুআক্কাদা।[৩]

হানাফী মাযহাব মতে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তার নাম রাখা, মাথা কামানো এবং চুল পরিমাণ স্বর্ণ দান করার পর আকীকা করা মুবাহ্। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ আকীকা দেয়া সাওয়াবের কাজ।[৪]

মালেকী মাযহাব মতে, আকীকা দেয়া মানদুব।[৫] আর তাদের দৃষ্টিতে মানদুব সুন্নাতের চেয়ে কিছুটা কম মর্যাদার।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ আকীকা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে দলীল হিসেবে অনেকগুলো হাদীস পেশ করেন।[৬] যেমন, সামুরা বিন জুনদুব রা.-এর বর্ণিত হাদীস, তাতে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ

---

৩. নিহায়াতুল মুহতাজ বি হাশিয়াতুর রুশীদী ওয়াশ শুবরামালিসী, খ. ৮, পৃ. ১৩৭; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ২, পৃ. ৪৯২; আল মাজমু লিন নববী, খ. ৮, পৃ. ৪৩৫।

৪. আল বাদায়ে, খ. ৫, পৃ. ৫৯; ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২১৩।

৫. আশ শারহুল কাবীর লিদ দারদীর বি হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ১২৬।

৬. নিহায়াতুল মুহতাজ আর-রাশীদী ও শুবরামালিসী, খ. ৮, পৃ. ১৩৭; আল-মাজমুলিন-নববী, খ. ৮, পৃ. ৪৩৫।

www.amarboi.org

"শিশুর যথাযথ বিকাশ হয় না যতক্ষণ না তার আকীকা দেয়া হয়। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিন জবেহ করা হবে।"[৭]

অন্য এক বর্ণনায় আছে :

كُل غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِه تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى . "প্রত্যেক শিশুর যথাযথ বিকাশ হয় না, যতক্ষণ না তার আকীকা দেয়া হয়। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিন জবেহ করা হবে, তার চুল কামানো হবে এবং তার নাম রাখা হবে।"[৮]

## আকীকা শরীয়তের একটি বিধান হওয়ার হিকমত

আকীকা শরীয়তের একটি পারিবারিক আইন হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, আকীকার মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা হয়, আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের প্রকাশ ঘটানো হয়। বংশপরম্পরা সাব্যস্ত হয়েছে মর্মে মানুষকে জানান দেয়া হয়।

## মৃতের পক্ষ থেকে আকীকার হুকুম

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৭ম দিন আসার আগেই যদি শিশু মারা যায় তবে তার পক্ষ থেকে আকীকা দিতে হবে কি-না, সে ব্যাপারে শাফেয়ীদের অভিমত হলো, জীবিত থাকার ন্যায় মৃতের পক্ষ থেকেও আকীকা দেয়া মুস্তাহাব। আর হাসান আল বসরী ও হানাফীদের মতে, মৃতের পক্ষ থেকে আকীকা দেয়া মুস্তাহাব নয়।[৯]

## মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে আকীকার বিধান

অধিকাংশ ইসলামী আইনজ্ঞের মতে, ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে যেমনটি আকীকা দেয়া হয়ে থাকে, তেমনি মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকেও আকীকা দেয়া শরীয়তের বিধান। কারণ, উম্মে কারয আল খুযাইয়্যাহ থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স. কে আকীকা সম্পর্কে বলতে শুনেছি :

عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"ছেলে শিশুর পক্ষ থেকে দুইটি স্বাস্থ্যবান ভেড়া-ছাগল আর মেয়ে শিশুর পক্ষ থেকে একটি ভেড়া-ছাগল আকীকা হিসেবে জবাই করতে হবে।"[১০]

## কার পক্ষ থেকে আকীকা দিতে হবে ?

শাফেয়ী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, ভূমিষ্ঠ সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব যার ওপর অর্পিত থাকে তিনি শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা দিবেন। তিনি স্বীয়

---

৭. তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ১০১; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

৮. আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ২৬০; আল হাকেম, খ. ৪, পৃ. ২৩৭; হাকেম বলেন, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ, ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত।

৯. আল মাজমূ লিন নববী, খ. ৮, পৃ. ৪৪৮।

১০. তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৯৭; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

www.amarboi.org

সম্পদ থেকে আকীকা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের সম্পদ থেকে আকীকা দিতে পারবেন না। যার ওপর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেই তিনি যদি কোনো শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা দিতে চান, তবে ঐ ব্যক্তির থেকে অনুমতি নিতে হবে যার উপর ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত।

প্রসঙ্গত, হযরত হাসান ও হুসাইন রা.-এর বাপ-মা জীবিত থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ স. স্বীয় অর্থে তাঁর নাতীদ্বয়ের জন্য আকীকা দিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত।[১১] তাঁর এ বিষয়টি দলীল হিসেবে গ্রহণ করে উল্লিখিত বিধানে কোনো ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। কারণ, হতে পারে রাসূলুল্লাহ স. তাদের পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে হাসান ও হুসাইনের জন্য আকীকা দিয়েছিলেন। আবার এও হতে পারে যে, তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর অর্পিত ছিল।

শাফেয়ীদের মতে, যদি কোনো সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় আর তার পক্ষ থেকে ইতোপূর্বে আকীকা না হয়ে থাকে, তবে সে নিজের আকীকা নিজেই দেয়ার ব্যবস্থা করবে।[১২]

তাদের দৃষ্টিতে যিনি আকীকা দিবেন তার কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে আকীকা দিতে হবে। আর তা হলো, তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। স্বাবলম্বী হওয়ার অর্থ হলো, ৬০ দিনের মধ্যে নিজের এবং যার জন্য ভরণপোষণ বহন করা তার দায়িত্ব তাদের সকলের ভরণপোষণের পর আকীকা দেয়ার মতো অতিরিক্ত সম্পদ থাকা। যদি ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাবলম্বী হন তবে তার জন্য আকীকা দেয়া সুন্নত হবে না।[১৩] মালেকী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, শুধুমাত্র পিতার ওপর আকীকার দায়িত্ব বর্তায়।[১৪]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ সুস্পষ্টভাবে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা হলো, পিতা আকীকা দিতে অস্বীকার করলে কিংবা মারা গেলে অন্য কেউ আকীকা দিবে। অন্যথায় পিতার উপরই আকীকা দেয়ার দায়িত্ব বর্তায়। যদি পিতা ছাড়া অন্য কেউ আকীকা দেয় তাহলে তা মাকরূহ হবে না, তবে তাকে আকীকা বলা যাবে না। হযরত হাসান ও হুসাইন রা.-এর পক্ষ থেকে রাসূল সা.-এর আকীকা

---

১১. আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ২৬০; হাফেজ ইবনে হাজার এর সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন (ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৫৮৯)।

১২. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ১৩৭; তুহফাতুল মুহতাজ বি হাশিয়াতিশ শিরওয়ানী, খ. ৮, পৃ. ১৬৬।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. আশ শারহুল কাবীর লিদ দারদীর বিহাশিয়াতিদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ১২৬।

www.amarboi.org

আদায়ের হিসেব ভিন্ন। কারণ, তিনি মুমিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের চেয়েও অগ্রাধিকারযোগ্য।

হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হবিদগণ আরো বলেন যে, পিতা যদি সচ্ছল নাও হন তবে কর্জ করে তা করার মতো ক্ষমতা থাকলে কর্জ করে আকীকা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ইমাম আহমদ র. বলেন, যদি সে (পিতা) আকীকা দেয়ার মতো সম্পদের অধিকারী না হওয়ার কারণে ধার কর্জ করে আকীকা দেয়, তবে আশা করি আল্লাহ তাআলা তার সহায়তা করবেন। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি সুন্নত জীবিত করেছেন।[১৫]

**আকীকা করার সময়**

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, মায়ের পেট থেকে সন্তান পরিপূর্ণভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে আকীকা দেয়ার সময় আরম্ভ হবে। সম্পূর্ণভাবে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে আকীকা দেয়া যাবে না। আর দিলেও তা হবে সাধারণ যবেহ। আর হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, আকীকা দেয়ার সময় হল সন্তানের বয়স যখন সপ্তম দি... পৌঁছে। ৭ম দিনের আগে আকীকা দিলে তা আদায় হবে না। আকীকা হবে কি... না-এ ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলেও সকল ফকীহর ঐকমত্যে সপ্তম দিন... দেয়া মুস্তাহাব। জমহুর আলেমের ঐকমত্যে সন্তান যদি রাতে জন্মগ্র... সে রাত গণনায় আনা হবে না। পরের দিন থেকে হিসেবে করে স... দিতে হবে। আর সন্তান যদি দিনের বেলা জন্মগ্রহণ করে ত... করেছে ঐ দিনকে প্রথম দিন ধরে সপ্তম দিন আকীকা দিতে...

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, যদি কোনো স... তবে ঐ দিনকে গণ্য করা যাবে না। অর্থাৎ ঐ দি... থেকে সপ্তম দিন আকীকা দিতে হবে। আ... তার পূর্বে জন্মে তবে ঐ দিনকে ধরে... বলেন, সপ্তম দিন পার হয়ে গেলে ত... মাযহাবের আলেমদের মতে, পি... প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বাকি ...

---

১৫. মাতালিবু উলিন নুহা, ...
১৬. আল মাজমূ, খ. ৮, ...
১৭. আশ শারহুল কাবীর লি...
১৮. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, ...
৮, পৃ. ১৬৬।

৩—

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হবিদের মতে এবং মালেকীদের একটি দুর্বল মতে, যদি সপ্তম দিন আকীকা আদায় করতে না পারে তবে চতুর্দশ দিন, আর যদি তাও দিতে না পারে তবে একবিংশ দিনে আকীকা দেয়া সুন্নত। হযরত আয়েশা রা. থেকে এমনটি বর্ণিত আছে।[১৯]

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, আকীকা দেরি করে দিলেও তার সময় শেষ হয়ে যায় না। তবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দেরি না করা মুস্ত াহাব। এরপরও যদি দেরি করে তবে তখন তা আদায় করার দায়িত্ব আর পিতার ওপর থাকবে না; বরং তা সন্তানের নিজের দায়িত্বে বর্তাবে। সে ইচ্ছে করলে নিজের আকীকা নিজে দিবে আর না চাইলে নাও দিতে পারে। আল কাফাল আশশাশী নিজের আকীকা নিজের দেয়াটা ভালো মনে করেন।[২০]

### যা দ্বারা আকীকা করা বৈধ এবং যা দ্বারা মুস্তাহাব

যেসব চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ সেসব চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা আকীকা করা বৈধ। আর তা হল, উট, গরু, ছাগল-ভেড়া। তা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আকীকা বৈধ হবে না। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের সকল আলেম এবং মালেকীদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে এটি।[২১] মালেকীদের অগ্রাধিকার না পাওয়া মত অনুযায়ী ছাগল বা ভেড়া ব্যতীত আকীকা দেয়া যাবে না।

শাফেয়ী মাযহাবের ফিক্‌হবিদের মতে, পরিমাণ ও বয়সের ক্ষেত্রে তাই প্রযোজ্য হবে যা কে কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তাই ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ ছাগল [বা] ভেড়া, আর উট ও গরুর ক্ষেত্রে এক সপ্তমাংশ দ্বারা আকীকা দেয়া যাবে।

[মা]লেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে উট ও গরু দ্বারা আকীকা দিলে [পূর্ণ] একটি উট বা গরু দিতে হবে। অংশবিশেষ দ্বারা হবে না।[২২]

[শাফে]য়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে,[২৩] ছেলে শিশুর জন্য ২টি [সমা]ন ছাগল-ভেড়া এবং মেয়ে শিশুর জন্য একটি ছাগল-ভেড়া আকীকা দেয়া [মুস্তাহাব।] কারণ, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা.

---

... খ. ৭, পৃ. ৫২৮; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ১২৬; আল মুগনী, খ. ১১, পৃ. ১২১।
... খ. ৮, পৃ. ৪৩১; রওদাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ২২৯।
... খ. ৮, পৃ. ৪৪৭; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ১৬৭; আল-বাদায়ে, খ. ৫, ...াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২১৪; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ২, পৃ. ...হুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ১২৬।
...র, খ. ২, পৃ. ১২৬; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ২, পৃ. ৪৮৯।
... খ. ৮, পৃ. ১৩৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ২, পৃ. ৪৮৯।

www.amarboi.org

তাদেরকে ছেলের জন্য দু'টি এবং মেয়ের জন্য একটি স্বাস্থ্যবান ছাগল আকীকা দেয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন।[২৪]

আর ছেলে শিশুর পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা দিলে তা আদায় হবে। কারণ, হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা. হাসান ও হুসাইন রা.-এর প্রত্যেকের জন্য একটি করে খাশি আকীকা দিয়েছিলেন।[২৫]

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফিকহবিদের মতে,[২৬] সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা দিতে হবে। হযরত ইবনে উমর রা. এমনটি করেছেন বলে প্রমাণিত। হযরত হাসান ও কাতাদা রহ. বলেন, মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে আকীকা দেয়ার প্রয়োজন নাই।[২৭]

জমহুর উলামা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, সাধারণত পশু জবাই করার ক্ষেত্রে যে সব শর্ত প্রযোজ্য, আকীকার ক্ষেত্রেও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। তবে 'আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া ইলাইকা হাযিহি আকীকাতু ফুলান اللهم لك و إليك هذه عقيقة فلان (ফুলানের স্থলে যার পক্ষ থেকে আকীকা দেয়া হবে তার নাম) বলা মুস্তাহাব।[২৮]

আর উল্লিখিত দুআটি বলা মুস্তাহাব এ জন্যে যে, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে আকীকা দেয়ার সময় বলেছেন, তোমরা বল, "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া ইলাইকা হাযিহি আকীকাতু ফুলান"।[২৯]

### আকীকার গোশত রান্না করার বিধান

অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে, আকীকার গোশত সদকা না দিয়ে রান্না করা মুস্তাহাব। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন :

السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنِ الْغُلَامِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، تُطْبَخُ جُدُولاً وَلَا يُكْسَرُ عَظْمًا ، وَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ وَذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ .

"সুন্নাত হচ্ছে, সন্তান জন্মের সপ্তম দিন ছেলে শিশুর পক্ষ থেকে দুইটি আর মেয়ে শিশুর পক্ষ থেকে একটি স্বাস্থ্যবান ছাগল জবেহ করা, তবে হাড্ডি ফেলে না দিয়ে ভালোভাবে রান্না করা, তারপর তা নিজেরা ভক্ষণ করা, অন্যদের খাওয়ানো, প্রতিবেশীদের হাদিয়া দেয়া"।[৩০]

---

২৪. তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৯৭; (তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

২৫. ইতোপূর্বে হাদীসটির বরাত বর্ণিত হয়েছে।

২৬. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২১৩; আশ শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ১২৬।

২৭. আল মাজমূ, খ. ৮, পৃ. ৪৪৭।

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. বায়হাকী, খ. ৯, পৃ. ৩০৪; ইমাম নববী এর সনদকে হাসান বলেছেন, আল মাজমূ, খ. ৮, পৃ. ৪২৮।

৩০. ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি গরীব (আল মাজমূ, খ. ৮, পৃ. ৪২৮), বায়হাকী, খ. ৯, পৃ. ৩০২।

www.amarboi.org

হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, আকীকার গোশত কিছু পাক করা আর কিছু পাক না করে হাদিয়া দেয়া বৈধ।[৩১]

ফকীহগণ আকীকা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সন্তানের নাম রাখা, তার মাথা মুণ্ডানো, কানে কী বলা হবে তা, তাহনীক করা, মুসলমানী করানো ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট পরিভাষার অধীনে তার বিস্তারিত আলোচনা হবে।

- ড. নুরুল্লাহ মাদানী

৩১. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২১৩।

www.amarboi.org

# রক্তপিণ্ড (عَلَقَةٌ)

## আলাকা (الْعَلَقَةُ) বা জমাটবাধা রক্তের বিধান

পারিবারিক জীবনের সাথে আলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামী আইন বিশ্বকোষের আলোকে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

## আলাকার (الْعَلَقَةُ) পরিচয়

আল-আলাকা (الْعَلَقَةُ) শব্দটি আরবী। এটি আলাক (عَلَق) শব্দের মুফরাদ বা একবচন। আলাক শব্দের অর্থ দম (الدَّمُ) বা রক্ত। কেউ কেউ বলেন, আলাক এমন রক্ত, যা ঘন ও জমাট হওয়ার কারণে পরস্পর লেগে থাকে, বিচ্ছিন্ন হতে চায় না।[১] কেউ বলেন, একদম শুকিয়ে যাবার পূর্বে জমাট অবস্থায় রক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন : ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

"এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি।"[২]

আল মিসবাহুল মুনীর-প্রণেতা বলেন, আলাকা হল বীর্য যা জরায়ুতে পৌঁছার পর একটি পর্যায় পার হলে ঘন ও জমাট রক্তে পরিণত হয়। তারপর আরেকটা পর্যায় পার হলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় যাকে মুজগাহ্ বলা হয়।[৩]

শাব্দিক দিক থেকে আলাকা বলতে যা বুঝায় পরিভাষায়ও তাকেই আলাকা বলে।[৪]

## আলাকার সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য শব্দ

### ক) আন নুতফা (النُّطْفَةُ)

নুতফা (النُّطْفَةُ) শব্দের অর্থ হল সামান্য পানি। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল পরিচ্ছন্ন পানি তা পরিমাণে কম হোক কিংবা বেশী হোক। ভাষাবিদ ফাইউমী বলেন, নুতফা হলো, পুরুষ ও মহিলার বীর্য। শব্দটির বহুবচন হলো নুতুফ ও নিতাফ (نُطَفٌ وَنِطَافٌ)।[৫]

আল কুরআনে আল্লাহ বলেন : أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى

"সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না?"[৬]

---

১. আল মাগরিব লিল মুতরাযী।

২. সূরা আল মুমিনুন, ১৪।

৩. আল মিসবাহুল মুনীর।

৪. আল কুরতুবী, খ. ১২, পৃ. ৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ১, পৃ. ২২৮।

৫. লিসানুল আরব; আল মিসবাহুল মুনীর।

৬. সূরা আল কিয়ামাহ, ৩৭।

www.amarboi.org

**পারিভাষিক অর্থ**

পরিভাষায় নুতফা বলতে পুরুষের পানি বা বীর্যকে বুঝায়।[৭]

আলাকা এবং নুতফার মধ্যে সম্পর্ক হলো, নুতফা থেকেই আলাকা তৈরী হয়।

**খ) আল মুজগা (الْمُضْغَةُ)**

মুজগা (الْمُضْغَةُ) শব্দের শাব্দিক অর্থ, গোশ্‌তের এতটুকু এক টুকরা যা চিবিয়ে খাওয়া যায়। এখান থেকে বলা হয়, মানুষের মধ্যে দু'টো গোশ্‌তের টুকরা বা মুজগা আছে। যদি সে দু'টি পরিশুদ্ধ হয় তবে গোটা শরীর পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। তা হলো, মন বা কলব এবং লিসান বা জিহ্বা। মুজগা শব্দটির বহুবচন হলো মুজাগ। একটি হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন :

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا دَمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ : بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

"তোমাদের প্রত্যেকে তার মায়ের গর্ভে ৪০ দিন অবস্থান করার পর একটি রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আলাকা হিসেবে চল্লিশদিন অবস্থানের পর তা গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়। এমনিভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে আল্লাহ তাআলা একজন ফিরিশতাস্তাকে চারটি নির্দেশ দিয়ে পাঠান। তার রিযক, তার বয়স, সে জান্নাতী বা জাহান্নামী। এগুলি নির্ধারিত হওয়ার পর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়।"[৮]

শাব্দিকভাবে মুজগাহ শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে পরিভাষায়ও তা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৯]

আলাকা ও মুজগাহ শব্দের মধ্যে সম্পর্ক হলো আলাকা থেকেই মুজগাহ সৃষ্টি হয়।

**গ) আল-জানীন (الْجَنِينُ)**

জানীন শব্দটি جَنَّ শব্দ মূল থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হল পর্দা বা ঢেকে থাকা। বলাহয় : جَنَّ الشَّيْءَ يَجُنُّهُ جَنًّا: তাকে ঢেকে ফেলল। এ জন্য জিনকে জিন বলা হয়। কারণ, জিন মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকে, ঢাকা থাকে। এসব বিবেচনায় গর্ভের সন্তানকে জানীন বলে। কেননা তা মায়ের পেটে আচ্ছাদিত থাকে।

সন্তান যতক্ষণ মায়ের গর্ভে অবস্থান করে ততক্ষণ তাকে জানীন বলে। জানীন শব্দের বহুবচন হলো, আজিন্নাহ বা আজনূন (اجنة و اجنون)। আলাকা ও

---

৭. তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ১২, পৃ. ৬; তলাবাতুত তালাবা, পৃ. ২১।

৮. বুখারী ফাতহুল বারীসহ, খ. ১১, পৃ. ৪৭৭; মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৩৬।

৯. তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ১২, পৃ. ৬।

www.amarboi.org

জানীন শব্দের মধ্যে সম্পর্ক হলো, জানীন এর অনেকগুলো ধাপের একটি ধাপ হলো আলাকা।[১০]

## আলাকা সম্পর্কিত বিধি-বিধান

### আলাকার স্খলন ঘটানো

মায়ের গর্ভধারণের পর তা চল্লিশ দিনে আলাকায় পরিণত হয়। এই আলাকা এর এ্যাবুলেশন বা এম আর/ডিএন্ড সি অপারেশনের মাধ্যমে কিংবা বর্তমানে হোমিও প্যাথ ওষুধের মাধ্যমে তার স্খলন ঘটানো বৈধ কি-না সে ব্যাপারে ফিকহবিদগণ বিভিন্ন ধরনের মত দিয়েছেন।

অধিকাংশ ফিকহবিদ তথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতে, গর্ভধারণের পর তা যখন আলাকায় পরিণত হয় অর্থাৎ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, সে অবস্থা যে কোনো উপায়ে হোক না কেন গর্ভস্খলন করা তথা গর্ভপাত করা হারাম। মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা দারদীর বলেন, জরায়ুতে বীর্য ধারণ করার পর তা চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগে বের করাও জায়েয নাই। শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ইবনে হাজার হাইছামী এহইয়া থেকে আযল অধ্যায়ে বর্ণিত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলেন যে, আলাকার স্খলন ঘটানো হারাম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতবহ। কারণ, আলাকা জরায়ুতে স্থির হওয়ার পর তা রূহ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। আবু ইসহাক আল মারওয়াযী বলেন, গর্ভধারণের পর বীর্য এবং জমাটবাধা রক্তপিণ্ড বা আলাকা স্খলন করা বৈধ।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আলাকায় রূপ নিলে সন্তান হওয়ার বিষয়টি স্থিতিশীলতা পায়। তাই আলাকা স্খলন করার জন্য কোনো পন্থা ব্যবহার করা বা ওষুধ সেবন বৈধ নয়। তবে গর্ভধারণের পর নুতফা বা বীর্যস্খলন করা বৈধ। কারণ, তা এখনও সন্তান হিসেবে স্থিতিশীলতা অর্জন করেনি। হতে পারে এর মাধ্যমে সন্তান জন্মই নেবে না।[১১]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ মনে করেন, গর্ভে সন্তান যদি আলাকা পর্যায়ে উন্নীত হয় তবু তার স্খলন করা মুবাহ। এমনকি তারা বলেন যে, ১২০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তেমন কিছু হয় না। তাই তার পূর্বে গর্ভপাত করা মুবাহ। ইবনে আবেদীন বলেন, তাদের শর্তহীন বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত ১২০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে স্ত্রীর জন্যে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে গর্ভপাত ঘটানো জায়েয হওয়ার বিষয়টি স্থগিত করার কোনো সুযোগ নাই।

---

১০. লিসানুল আরব, আল মুগরিব, হাশিয়াতুশ শিবলী আলা তাবয়ীনিল হাকাইক, খ. ৬, পৃ. ১৩৯।

১১. আশ শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ২৬৬-২৬৭; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৮৬; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ১, পৃ. ২৬৭।

www.amarboi.org

ফিক্‌হবিদ আলী ইবনে মুসা হানাফী বলেন, জরায়ুতে বীর্য ধারণ করলে জীবন পেয়েছে বলে মনে করতে হবে। যেমনটি হারাম এলাকায় ডিম শিকারের ক্ষেত্রে ধরে নিতে হয়। ইবনে হিব্বান বলেন, হানাফী মাযহাবে গর্ভপাতকে মুবাহ্ বলার বিষয়টি সাধারণভাবে না নিয়ে ওযরশত জায়েয বলে মনে করতে হবে। অথবা মুবাহ্ বলার অর্থ এও হতে পারে যে, ১২০ দিনের মধ্যে গর্ভপাত করলে মানুষ হত্যা করার গুনাহ্ হবে না।[১২]

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতে, আলাকায় পরিণত হওয়ার পর গর্ভপাত ঘাটালে ভ্রূণ হত্যার দায় হিসেবে গুররা (৫টি উট বা তার মূল্য দেয়া) ওয়াজিব হবে না। কারণ, আলাকায় কোনো আকৃতি বা রূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে না।[১৩]

**আলাকার স্খলন ঘটালে আবশ্যকরূপে যে বিধান বর্তাবে**

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতে, মায়ের গর্ভে ধারণকৃত বীর্য আলাকায় পরিণত হলেও তাকে হামল বা গর্ভধারণ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে না। ফলে ঐ অবস্থায় কোনো মহিলাকে নেফাস অবস্থায় আছে বলে ধরা যাবে না। আর সে কারণে স্বামী তাকে তালাক দিয়ে থাকলে গর্ভবতী হিসেবে যে ইদ্দত পালন করতে হয় তা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না।

অবশ্য মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতে আলাকার অবস্থাকে হামল বা গর্ভাবস্থা ধরা হবে। ফলে, আলাকার স্খলন ঘটালে মহিলাকে নিফাস অবস্থায় আছে বলে ধরা হবে। আর গর্ভবতী নারীর ন্যায় তার জন্য ইদ্দত প্রযোজ্য হবে।[১৪]

- ড. নুরুল্লাহ মাদানী

১২. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩৮০।

১৩. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৭৮; হাশিয়াতুদ-দাসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৬৮; আসনাল-মাতালিব, খ. ৪, পৃ. ৯১; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৮০২।

১৪. আল বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৬; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ১, পৃ. ২০১; আশ শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ৬৭২; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ১, পৃ. ৩৩৮; হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী, খ. ৮, পৃ. ১০৬; হাশিয়াতু উমায়রা আলাল মুহাল্লা, খ. ১, পৃ. ১০৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ১, পৃ. ২১৯; আল ইনসাফ, খ. ৭, পৃ. ৪৯২ ও খ. ৯, পৃ. ৮১।

www.amarboi.org

## স্তন্যদান (رَضَاعٌ)

**সংজ্ঞা :** আভিধানিকভাবে الرَّضَاعُ শব্দের 'রা' যের ও যবর উভয়ভাবে পড়া যায়। এটি মাসদার। যেমন- رَضَعَ أُمَّهُ يَرْضَعُهَا (যের বা যবর যোগে), সে তার মায়ের স্তন্য পান করেছে। অর্থাৎ সে তার স্তন্য অথবা ওলান চুষেছে ও তার দুধপান করেছে। যিনি তার সন্তানকে স্তন্যদান করেন তিনি দুধমাতা (مُرْضِعَةٌ), আর ঐ সন্তান হলো, দুগ্ধপায়ী (رَضِيعٌ)।

পরিভাষায় স্তন্যদান হলো, নারীর দুধ অথবা তার দুগ্ধজাত কোনো কিছু নিম্নে উল্লিখিত কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে শিশুর পেটে পৌঁছা।[১]

### সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

(الْحَضَانَةُ) **আল-হাদানা :**

**২. আভিধানিক অর্থ :** কোনো কিছু মিলানো, যা হিদন (الْحِضْنُ) থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ পার্শ্বদেশ এরূপ নামকরণের কারণ হলো, শিশু পালনকারিণী পালিতকে তার পার্শ্বদেশে মিলিয়ে রাখে।[২]

**পরিভাষায় :** এমন কাউকে তত্ত্বাবধান করা, যে নিজের কাজকর্ম ও নিজের প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয়।[৩]

শিশুর পরিচর্যাকারী কখনো দুধমাতা এবং কখনো অন্য কেউ হতে পারে।

### স্তন্যদান বৈধতার দলীল

এটি বৈধ হওয়ার মূল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্যদান করবে"।[৪]

তিনি আরো বলেন- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে"।[৫]

---

১. মুজামুল ওয়াসীত, আল মিসবাহ ও ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪০৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৭২; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪১৫, এসব গ্রন্থে এ জাতীয় আরো কিছু সংজ্ঞা রয়েছে।

২. আল মিসবাহুল মুনীর।

৩. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৪৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৮৭।

৪. সূরা বাকারা, ২৩৩।

৫. সূরা তালাক, ৬।

www.amarboi.org

## স্তন্যদানের বিধান

### প্রথমত : দুধ পান করানোর হুকুম

ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী দুধপানের বয়স এবং এর চাহিদা থাকা পর্যন্ত শিশুকে দুধ পান করানো ওয়াজিব।[৬]

কার ওপর এটি ওয়াজিব– তা নিয়ে তারা মতপার্থক্য করেছেন। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেন, নিজ সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করানো পিতার ওপর ওয়াজিব, মাতার ওপর ওয়াজিব নয়। স্বামী তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না, সে নীচু কিংবা অভিজাত যাই হোক  না কেন এবং সে সন্তান পিতার বন্ধনে থাকুক কিংবা তার থেকে মুক্ত (তালাকপ্রাপ্তা) থাকুক। তবে পিতা সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য সে ছাড়া অন্য কাউকে না পেলে অথবা শিশু অন্য কারো দুধ গ্রহণ না করলে অথবা পিতা বা শিশুর সম্পদ না থাকার কারণে সে নির্দিষ্ট হলে শিশুর মায়ের জন্য স্তন্যদান ওয়াজিব। কিন্তু শাফেয়ীগণ বলেন, অন্য কাউকে পাওয়া গেলেও শিশুকে শালদুধ (Colostrum) পান করানো মাতার ওপর ওয়াজিব। শালদুধ হলো সন্তান প্রসবের পর যে দুধ হয়। কারণ শিশুরা এর মুখাপেক্ষী। এর স্থায়িত্বের সময়কাল জানার বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৭]

হানাফীগণ বলেন, এ বিষয়টি মাতার ওপর দীনদারির ভিত্তিতে ওয়াজিব, বিচারের ভিত্তিতে নয়।[৮]

মাতৃদুগ্ধ পান করানো পিতার ওপর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে জমহুরের দলীল হলো আল্লাহর বাণী– وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

"তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তবে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্যদান করবে"।[৯]

তাদের মতপার্থক্য করাই অনমনীয় হওয়া। ইবনে কুদামা বলেন, মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করার বিষয়টি কয়েকটি সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। হয় সন্তানের অধিকারের জন্য অথবা স্বামীর অধিকারের জন্য অথবা উভয়ের অধিকারের জন্য বাধ্য করা হতে পারে। স্বামীর অধিকারের নামে এরূপ করা জায়েয নেই। কেননা, স্বামী তার অন্য স্ত্রীর সন্তানকে স্তন্যদান করতে এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেকে সেবা করার জন্য তাকে বাধ্য করার অধিকার রাখে না। সন্তানের

---

৬. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬২৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২২২; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৪৫; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৭৫; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৫।

৭. আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৪৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২২১-২২২।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. সূরা তালাক, ৬।

www.amarboi.org

অধিকার বিবেচনায়ও তা করা যাবে না। কেননা এটি যদি সন্তানের অধিকার হত তাহলে বিচ্ছেদের পরও তা আবশ্যক হত। অথচ এরূপ কথা কেউ বলেননি। এছাড়াও যেহেতু সন্তানকে দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা পিতার ওপর আবশ্যক, তাই ভরণপোষণ অথবা বিচ্ছেদ পরবর্তী বিষয়ের ন্যায় নির্দিষ্টভাবে পিতার উপরই সে দায়িত্ব বর্তাবে। আর তাদের উভয়ের জন্যও এরূপ করা জায়েয নেই। কেননা সামঞ্জস্যহীন দু'টি বিষয়ের বিধান পরস্পরের সাথে একীভূত করা যায় না। এছাড়াও যদি তা উভয়ের অধিকার হত তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদের পরও সে বিধান সাব্যস্ত হত। আর আল্লাহ্ তাআলার বাণী–

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ 'মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে স্তন্যপান করাবে।'[১০] সমঝোতা ও পারস্পরিক নমনীয় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১১]

মালেকীগণ বলেন, বিনা পারিশ্রমিকে স্তন্যদান করা মাতার ওপর ওয়াজিব, যদি তার সমপর্যায়ের মাতাগণ এরূপ স্তন্যদান করে এবং সে পরোক্ষভাবে হলেও পিতার বন্ধনে থাকে। যেমন– রাজয়ী তালাক। বায়েন (অপ্রত্যাহার্য) তালাক হলে সেটি পিতার দায়িত্ব। যেই সম্ভ্রান্ত নারীর সমপর্যায়ের মাতাগণ স্তন্যদানে অভ্যস্ত নন তার ওপর স্তন্যদান ওয়াজিব নয়, যদি না অন্য কাউকে না পাওয়ার কারণে মাতা এজন্য নির্দিষ্ট হয়ে যান। তাদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী–

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

"মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে স্তন্যপান করাবে।"

তারা আরো বলেন, আয়াতের সার্বজনীনতা থেকে 'যার সমপর্যায়ের মহিলারা স্তন্যদান করে না।' তাকে পৃথক করা হয়েছে একটি ফিক্হী মূলনীতির ভিত্তিতে। সেটি হলো– الْعَمَلُ بِالْمَصْلَحَةِ 'কল্যাণ অনুযায়ী কাজ করা।' কেননা উরফ (প্রথা) হলো, মাতাকে স্তন্যদানের দায়িত্ব না দেওয়া। আর তা শর্তের অনুরূপ।[১২]

**স্তন্যদানের ক্ষেত্রে মাতার অধিকার**

মাতা তার সন্তানকে স্তন্যদান করতে চাইলে তাকে সুযোগ দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। জমহুরের মতে, এক্ষেত্রে সে তালাকপ্রাপ্তা হোক কিংবা পিতার (বিবাহ) বন্ধনে, যাই থাকুক না কেন। কেননা আল্লাহর বাণী– لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا 'কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া হবে না।'[১৩]

---

১০. সূরা বাকারা, ২৩৩।
১১. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬২৭।
১২. আল ফাওয়াকেহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১০০; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৫।
১৩. সূরা বাকারা, ২৩৩।

www.amarboi.org

আর সন্তানকে স্তন্যদান করা হতে তাকে বাধা দেওয়া তার জন্য কষ্টদায়ক। আর এজন্যও যে তিনি সন্তানের ব্যাপারে অধিক সহানুভূতিশীল ও স্নেহময়ী। এছাড়া তার দুধ সন্তানের জন্য অধিক স্বাস্থ্যকর ও উপযোগী। শাফেয়ীদের একটি মতে, স্বামী চাইলে তাকে দুধ পান করানো থেকে বিরত রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে সন্তান স্বামীর নিজ ঔরসজাত বা অন্য কারো হোক না কেন। অনুরূপ অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও সে তাকে বাধা দিতে পারে।[১৪]

**স্তন্যদানের মজুরি গ্রহণে মাতার অধিকার**

মাতা তার স্তন্যদানের জন্য প্রচলিত মজুরি দাবি করতে পারে। তাই সে সন্তানের পিতার বন্ধনে থাক কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হোক। কেননা আল্লাহর বাণী–

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

'যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে'।[১৫] শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবরও এই মত।[১৬]

হানাফীগণ বলেন, যদি সে পিতার বন্ধনে অথবা ইদ্দত পালনরত থাকে তাহলে মজুরি দাবি করতে পারবে না। কেননা পিতার ওপর তার জীবিকা প্রদান ওয়াজিব করার মাধ্যমে স্তন্যদান করাকে আল্লাহ তার ওপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী–

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।'[১৭]

সুতরাং তার বন্ধনে থাকা অবস্থায় বা ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় জীবিকাই মজুরির স্থলাভিষক্ত। তবে মাতা তার বন্ধনে বা ইদ্দত পালনরত না থাকলে মজুরি জীবিকার স্থলাভিষিক্ত হবে না। আর এজন্যও যে, পিতার পক্ষ থেকে ভরণপোষণ না থাকা সত্ত্বেও তালাকে বায়েন বা অপ্রত্যাহার্য তালাকপ্রাপ্তার ওপর বিনামূল্যে স্তন্যদান বাধ্যতামূলক করা তার জন্য ক্ষতিকর। তাই বিচ্ছেদের পর স্তন্যদানের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। আল্লাহ্ বলেন–

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا "কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না"।[১৮] যদি মাতা প্রচলিত মজুরির চেয়ে অতিরিক্ত দাবি করে এবং পিতা দুধ

---

১৪. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬২৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২২২; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৪৫; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৬; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৭৫-৬৭৬।

১৫. সূরা তালাক, ৬

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. সূরা বাকারা, ২৩৩।

১৮. সূরা বাকারা, ২৩৩।

www.amarboi.org

পান করানোর জন্য বিনামূল্যে বা প্রচলিত মূল্যে অন্য কাউকে পেয়ে যায় তাহলে সন্তানকে তার কাছ থেকে কেড়ে আনা পিতার জন্য বৈধ। কেননা সে অতিরিক্ত দাবি করায় তার অধিকার রহিত হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে- وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى "তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তবে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্যদান করবে"।[১৯]

পিতা যদি দুধ পান করানোর জন্য মাতার দাবিকৃত পরিমাণের চেয়ে কম না পায় তবে তার স্তন্যদানের অধিকার রহিত হবে না। কেননা মজুরির ক্ষেত্রে সে অন্যান্যদের সমতুল্য হওয়ায় তার অধিকার বেশি। তাদের প্রত্যেকে একই পরিমাণ মজুরি দাবি করলেও অনুরূপ বিধান।[২০]

মালেকীগণ বলেন, যদি মাতার সমপর্যায়ের নারীগণের মধ্যে স্তন্যদানের প্রচলন থাকে এবং সে পিতার বন্ধনে থাকে তাহলে স্তন্যদানের বিনিময়ে মজুরি দাবি করতে পারবে না। কেননা এটি তার ওপর শরীয়ত ওয়াজিব করেছে। অন্যদিকে যে অভিজাত মাতার সমপর্যায়ের নারীগণের মধ্যে স্তন্যদানের প্রচলন নেই এবং যে পিতা থেকে মুক্ত, তালাকপ্রাপ্তা-সে মজুরি দাবি করতে পারবে। যদিও সে স্তন্যদানের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় অথবা পিতা বিনামূল্যে দুধ পান করানোর জন্য অন্য কাউকে পেয়ে যায়।[২১]

**দ্বিতীয় : স্তন্যদান উদ্ভূত বিধানাবলি**

স্তন্যদানের ভিত্তিতে আত্মীয়তার কিছু বিধান উদ্ভূত হয় :

**ক.** বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া। তাই উক্ত নারী মুসলমান অবস্থায় দুধ পান করাক অথবা কুফরি অবস্থায়। কেননা রাসূলুল্লাহ স. এর বাণী–

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

'স্তন্যদানের কারণে তা হারাম হয়ে যায় যা বংশগত আত্মীয়তার কারণে হারাম হয়'।[২২] পরবর্তীতে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

**খ.** মাহরাম সাব্যস্ত হওয়া। সুতরাং তার প্রতি তাকানো, নির্জনে থাকা জায়েয এবং তাকে স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হয় না।

এছাড়া আত্মীয়তার বিধানসমূহ যেমন মিরাস, ভরণপোষণ, দাসের ক্ষেত্রে মালিকানাভুক্ত হলে মুক্ত হয়ে যাওয়া, কিসাস রহিত হওয়া, সম্পদ চুরির কারণে হাত

---

১৯. সূরা তালাক, ৬।

২০. আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৫৫; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬২৭; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৭৫।

২১. হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৬; আল ফাওয়াকেহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১০১।

২২. হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ২৫৩, আস সালাফিয়্যা) ও ইমাম মুসলিম (১০৭২, আল হালাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেন।

www.amarboi.org

না কাটা, সন্তানের ঋণের কারণে বন্দি না হওয়া, সম্পদ বা জীবনের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি স্তন্যদানের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় না। এ ব্যাপারে ফকীহগণের ঐকমত্য রয়েছে।[২৩]

## হারাম সাব্যস্তকারী স্তন্যদান এবং হারাম হওয়ার দলিল

হারাম সাব্যস্তকারী স্তন্যদানের তিনটি ভিত্তি (রুকন) রয়েছে :

১. স্তন্যদানকারিণী : اَلْمُرْضِعُ
২. দুগ্ধপায়ী : اَلرَّضِيعُ
৩. দুধ : اَللَّبَنُ

**প্রথমত : স্তন্যদানকারিণী :**

যে স্তন্যদানকারিণীর দুধের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় তা কিছু শর্ত সাপেক্ষে :

১. স্তন্যদানকারী নারী হওয়া। সুতরাং পুরুষের দুধ দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হবে না, তা দুর্লভ হওয়া এবং শিশুর খাদ্য হিসেবে উপযোগী না হওয়ার কারণে। পশুর দুধ দ্বারাও তা হবে না। তাই দু'টি শিশু কোনো পশুর দুধ পান করলে তারা সম্পর্কে দুধ ভাই হবে না। কারণ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক মাতৃত্ব-সম্পর্কের শাখা। আর এরূপ স্তন্যপানের মাধ্যমে মাতৃত্বই প্রমাণ হয় না, ভ্রাতৃত্ব তো দূরের কথা।[২৪]

২. হানাফী ও শাফেয়ীগণ এজন্য তার মধ্যে জন্মদানের সম্ভাব্যতা থাকার শর্ত দিয়েছেন। অর্থাৎ, মাসিকের বয়স তথা নয় বছর হওয়া। নয় বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ছোট মেয়ের স্তনে দুধ এলেও তা পানের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হবে না। তবে কেউ এই বয়সে পৌঁছার পর তার দুধ পানের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হবে। কারণ মাসিকের মাধ্যমে বালেগ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও তার মধ্যে বালেগ হওয়ার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। আর স্তন্যদান নসবের অনুবর্তী হওয়ায় এক্ষেত্রে সম্ভাবনাই যথেষ্ট। মালেকীগণ এই শর্ত আরোপ করেননি। তাই তাদের মতে, সহবাসের অনুপযোগী ছোট মেয়ের দুধও মুহাররিম বা নিষিদ্ধকারী হতে পারে।[২৫]

## মৃত নারীর দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া

জমহুরের মতে জীবিতের দুধের মতো মৃত নারীর দুধ দ্বারাও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয়। কেননা এমন অবস্থায় স্তন্যপান করা হয়েছে যখন তার গোশত পয়দা হয় এবং

---

২৩. আসনাল মাতালিব, পৃ. ৩, পৃ. ৪১৫; কালয়ুবী, খ. ৪, পৃ. ৬২; রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৩; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৩৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৪২।

২৪. রাওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৩; আল কালয়ুবী, খ. ৪, পৃ. ৬২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৭২; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪০৩; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫০২।

২৫. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৭২; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪০৩; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫০২।

www.amarboi.org

তার অস্থি সংযোজিত হয়। তাই সে জীবিত থাকার মতোই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। এ কারণেও যে, জীবন্ত ও নাপাকি ছাড়া জীবিতাবস্থায় স্তন্যপান ও মৃত অবস্থায় স্তন্যপানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং এর কোনো প্রভাব নেই। কারণ দুধ কখনো মরে না। আর এক্ষেত্রে নাপাকেরও কোনো প্রভাব নেই, যেমন কেউ নাপাক পাত্রে দুধ দোহন করল। অনুরূপভাবে কেউ তার জীবিতাবস্থায় দুধ দোহন করে মৃত্যুর পর পান করলেও সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে।[২৬]

শাফেয়ীগণ বলেন, দুধ আলাদা হওয়ার সময় স্তন্যদানকারিণী জীবিত থাকা শর্ত। তাই মৃতের দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হবে না, যেমন তার সাথে সহবাস করলে বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তা প্রমাণিত হয় না। কেননা সে জীবজন্তুর ন্যায় হালাল-হারামের ঊর্ধ্বে নিছক মৃতদেহ। তবে তার জীবিতাবস্থায় দুধ আলাদা করে রাখলে এবং তার মৃত্যুর পর শিশু পান করলে সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে।[২৭]

## দুধপানের আগে গর্ভবতী হওয়া

জমহুরের মতে, নারীর দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য পূর্বে গর্ভবতী হওয়া শর্ত নয়। এটি হাম্বলী মাযহাবেরও একটি মত। সুতরাং সহবাস করেনি এবং গর্ভধারণ করেনি- এমন কুমারীর দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। কেননা আল্লাহর বাণী এ ব্যাপারে ব্যাপক : اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ
'এবং তোমাদের দুধমাতাগণ'।[২৮] আর এজন্য ও যে, এটি নারীর দুধ, তাই নিষেধাজ্ঞা যুক্ত হয়েছে।[২৯] ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে, কুমারী মেয়ের দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় না। কেননা এটি বিরল এবং খাদ্য হিসেবে সাধারণত প্রচলিত নয়। এই মতের ভিত্তিতেই তার মাযহাব।[৩০]

## দ্বিতীয়ত : দুধ

এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, দুধ স্তন থেকে চোষণ দিয়ে অথবা গলায় ঢোক গিলে অথবা নাকে টেনে শিশুর পেটে পৌঁছা। তাই দুধ খাঁটি হোক অথবা দুধের ওপর প্রাধান্য লাভ করেনি এমন তরল দ্রব্যের সাথে মিশ্রিত হোক না কেন। অর্থাৎ দুধের আধিক্য থাকবে এবং তার গুণ-বৈশিষ্ট্য অটুট থাকবে।

---

২৬. আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৪০-৫৪১; আল ফাওয়াকেহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৮৮; হাশিয়াতুদ দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৫০২; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪০৩।

২৭. আল কালয়ুবী, খ. ৪, পৃ. ৬২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৭২; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪১৫।

২৮. সূরা আন নিসা, ২৩।

২৯. প্রাগুক্ত এবং কিফায়াতুল আখ্য়ার, খ. ২, পৃ. ৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৭২; আল ওয়াজীয, খ. ২, পৃ. ১০৫।

৩০. কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪৪৪; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৪০।

www.amarboi.org

মিশ্রিত দ্রব্য অপবিত্র হোক যেমন- মদ, অথবা পবিত্র হোক যেমন- পানি ও ছাগলের দুধ-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৩১]

আর মিশ্রণে দুধের পরিমাণ কম হলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। হানাফী ও মালেকীদের মতে, দুধের ভাগ কম হলে নিষেধাজ্ঞায় তার কোনো ভূমিকা থাকবে না। কারণ, বিধান হয় অধিকাংশের ভিত্তিতে। এছাড়াও অন্য জিনিসের আধিক্য থাকায় দুধ নামটিই বিলীন হয়ে গিয়েছে।[৩২]

শাফেয়ীগণের মতে, দুধের আধিক্য না থাকলেও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। যেমন দুধের কোনো বৈশিষ্ট্যই বাকী থাকল না। তবে শর্ত হলো, শিশু পুরো দুধটুকুই পান করবে অথবা আংশিক পান করলে নিশ্চিত হওয়া যে, দুধ পেটে প্রবেশ করেছে এবং সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে। আর দুধের পরিমাণ এতটুকু হতে হবে যে, শুধু দুধ হলে তা শরীরে প্রভাব ফেলত।[৩৩]

হাম্বলীগণ বলেন, নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মিশ্রিত দুধ খাঁটি দুধের মতোই। মিশ্রিত হলো যেখানে অন্য কিছু মিশানো হয়েছে এবং খাঁটি হলো যা অবিমিশ্র। খাদ্য-পানীয় বা অন্যকিছুর সাথে মিশ্রণ হোক বা দুধের প্রাধান্য কম বেশি হোক-সবই সমান। আবু বকর বলেন, ইমাম আহমদের মতের যুক্তি হলো, দুধ ওষুধস্বরূপ। ইবনে হামেদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দুধের পরিমাণ বেশি হলে হারাম হবে, নতুবা নয়। কেননা বিধান হয় অধিকাংশের ভিত্তিতে। আর এজন্যও যে, পরিমাণ কম হলে তার নাম ও উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইবনে কুদামা বলেন, প্রথম অবস্থায় কারণ হলো, মিশ্রিত দুধের রং যখন প্রকাশ্য থাকে তখন দুধপানই সাব্যস্ত হয় এবং সেটি পান করে হাড়-মাংস গঠন হয়, তাই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। এরূপ হলো যতক্ষণ দুধের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকবে।

আর অধিক পরিমাণ পানির মধ্যে যদি দুধ ঢালা হয় যদ্বারা পানি পরিবর্তিত হয় না, তাহলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। কেননা এটি মিশ্রিত দুধ নয়। এর দ্বারা পুষ্টিলাভ করা যায় না এবং হাড়-মাংস গঠনের কাজে আসে না। তাই এর দ্বারা দুধপান সাব্যস্ত হয় না। এ কারণে নিষেধাজ্ঞার বিধান সাব্যস্ত না হওয়াই

---

৩১. আল কালয়ুবী, খ. ৪, পৃ. ৬২-৬৩; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৪০-৫৪৫; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪০২; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪১৫; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪০২-৪০৮; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ৮।

৩২. শারহুদ দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৫০৩; শারহুয যারকানী, খ. ৪, পৃ. ২৩৯; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৩৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৪৭; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪০৯; বাদায়েউস সানয়ে, খ. ৪, পৃ. ৯।

৩৩. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৭২-১৭৩; রাওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৪।

www.amarboi.org

আবশ্যক। কাজী আয়াজ থেকে বর্ণিত, এর দ্বারাও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। কেননা দুধের কিছু অংশ হলেও তার পেটে প্রবেশ করেছে। তাই দুধের রং দৃশ্যমান হওয়ার সাথে সামঞ্জস্য হয়ে গেল।[৩৪]

অনুরূপভাবে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হওয়া এবং দুধের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারেও তারা মতভেদ করেছেন। যেমন দুধ পনির বা মাঠায় পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে।

জমহুরের মতে, শিশুর পেটে মূল দুধ পৌছলে এবং তা দ্বারা পুষ্টিলাভ করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। আর হানাফীগণ বলেন, খাদ্যের সাথে মিশ্রিত ও অবস্থা পরিবর্তিত দুধের কোনো প্রভাব নেই, অনুরূপভাবে আগুনে জ্বাল দেয়া দুধেরও। কেননা একে স্তনের দুধপান বলা হয় না।[৩৫]

## তৃতীয়ত : দুগ্ধপায়ী

### ক. দুধ পাকস্থলিতে পৌছা

স্তন্যদান, ফিডার অথবা নাকে টেনে নেওয়ার মাধ্যমে দুধ পাকস্থলিতে পৌছা শর্ত, যদিও শিশুটি ঘুমন্ত থাকে। কেননা নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারী হলো দুধ দ্বারা পুষ্টি লাভ করা, হাড়-মাংস বৃদ্ধি পাওয়া এবং ক্ষুধা নিবারণ করা। আর পাকস্থলিতে পৌছা ছাড়া এর কোনোটিই অর্জিত হয় না।

কানে ফোঁটা ফোঁটা করে অথবা মূত্রনালি অথবা নিতম্বে অথবা মলদ্বারে ডুশ দিয়ে দুধ প্রবেশ করালে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না।[৩৬]

### খ. দুগ্ধপায়ীর বয়স দুই বছরের বেশি না হওয়া

এ বিষয়ে সকল ফকীহ একমত যে, দুই বছরের নিচের শিশুকে স্তন্যদান করলেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ-এর মত, যা হানাফী মাযহাবের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত এবং যার ওপর ফাতাওয়া প্রদান করা হয়েছে তা হলো, হারাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য স্তন্যদানের সময়সীমা দুই বছর। দুই বছর পর হারাম হবে না। তারা এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন–

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

---

৩৪. আল মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৫৩৯, ৫৪০।

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. রাওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৬; আল কালয়ুবী, খ. ৪, পৃ. ৬৩-৬৪; বাদায়েউস-সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ৫১৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৪৫; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫০৩; মালেকীগণ বলেন, মলদ্বারে দুধ দ্বারা ডুশ দিলে তা প্রভাব ফেলবে।



www.amarboi.org

'যে স্তন্যদান পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবে'।[৩৭] তারা আরো বলেন, আল্লাহ পূর্ণ স্তন্যদানের জন্য দুই বছর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং পূর্ণ স্তন্যদানের পর আর কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ বলেন- وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 'এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে।[৩৮] তিনি আরো বলেন- وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا 'তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস।[৩৯] আর গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ৬ মাস। সুতরাং দুধ ছাড়ানোর জন্য আর দুই বছর বাকি থাকে। কেননা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, 'দুই বছরের মধ্যে না হলে স্তন্যদান হবে না।[৪০] হযরত উম্মু সালামা রা. কর্তৃক রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বিধৃত হয়েছে, 'স্ত নে দুধ উৎপন্ন হওয়া থেকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্তন্যদান করলেই কেবল নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে'।[৪১]

ইবনে তাইমিয়া বলেন, পূর্বেকার ও বর্তমানের একটি দল বড়দেরকে স্তন্যপান করানোর দ্বারা হারাম হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের দলীল হলো, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত যয়নব বিনতে উম্মে সালামার হাদীস। উম্মু সালামা রা. আয়েশা রা.-কে বলেছিলেন- আসার কাছে একটি যুবক ছেলে আসে, যে আমার কাছে আসুক আমি তা পছন্দ করি না। আয়েশা রা. তখন বললেন- তুমি কি মনে করো না যে, রাসূলুল্লাহ স. এর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ? তিনি বলেন, একদা আবু হুযায়ফার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ স.-কে বললো- সালেম নামে একব্যক্তি আমার কাছে আসে, অথচ সে পুরুষ। তাই আবু হুযায়ফার মনে তার সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তাকে স্তন্য পান করাও যাতে সে তোমার নিকট আসতে পারে।' ইমাম মালেক এর আল-মুয়াত্তার একটি বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন, 'তাকে পাঁচবার স্তন্যপান করাও'।[৪২] এভাবে সে তার দুধপুত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। এ হাদীসটি আয়েশা রা. গ্রহণ করেছেন; কিন্তু নবী স.-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তা গ্রহণ করেননি। আয়েশা রা.

---

৩৭. সূরা বাকারা, ২৩৩।

৩৮. সূরা লুকমান, ১৪।

৩৯. সূরা আহকাফ, ১৫।

৪০. হাদীসটি দারা কুতনী ইবনে আব্বাস রা. থেকে উদ্ধৃত করেন, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, দারুল মাহাসিন প্রকাশনী।

৪১. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী উম্মু সালামা রা. থেকে উদ্ধৃত করেন, খ. ৩, পৃ. ৪৪৯, আল হালাবী সম্পা.। তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ।

৪২. হাদীসটি ইমাম মুসলিম (খ. ২, পৃ. ২০৫, আল হালাবী সম্পা.) উদ্ধৃত করেন।

www.amarboi.org

আরো বলেন- الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ 'স্তন্যদান ক্ষুধা নিবারণের জন্য'।[৪৩] কিন্তু তিনি স্তন্যদান সাব্যস্ত করার ইচ্ছা করা ও পুষ্টিলাভের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে দুধ ছাড়ানোর পরে স্তন্যদান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না।

এটা হলো সাধারণ মানুষকে স্তন্যদানের ক্ষেত্রে। আর কাউকে মাহরাম করার প্রয়োজন হলে প্রথমটি জায়েয। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যা বৈধ অন্যান্য ক্ষেত্রে তা বৈধ নয়- এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি।

মালেকীগণ বলেন- হারাম হওয়ার জন্য শর্ত হলো, দুই বছর অথবা অতিরিক্ত আরো একমাস বা দু'মাসের মধ্যে স্তন্যদান করা এবং অন্যান্য খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে দুধ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে দুই বছর শেষ হওয়ার আগেই দুধ না ছাড়ানো। যদি দুধ ছাড়ানোর পর এবং শিশু দুধের পরিবর্তে অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে পুনরায় স্তন্যদান করানো হয় তবে হারাম হবে না।[৪৪]

আবু হানীফা র. বলেন, যে দুধ পানের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় তার সময়সীমা দুই বছর ছয় মাস। এ সময় সীমার পর আর হারাম হবে না। তাই সময়সীমার মধ্যে দুধ ছাড়ানো হোক বা না হোক। তিনি আল্লাহর বাণীকে দলীল হিসেবে পেশ করেন- وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ 'এবং তোমাদের দুধমাতাগণ।[৪৫] তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা স্তন্যদানের মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হওয়াকে সময়ের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। এখানে দলীল এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত যে, এর দ্বারা দুই বছর ছয় মাস এর পরবর্তী সময় উদ্দেশ্য নয়। তাই পরবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে হারাম নয় বলে সাব্যস্ত হবে।।[৪৬] তাদের দলীল আল্লাহর বাণী- وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا 'তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস'।[৪৭] অর্থাৎ, গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের মোট সময় ত্রিশ মাস।

## দুধ পান করানোর মাধ্যমে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া

### ১. দুগ্ধপায়ীর ওপর যা নিষিদ্ধ :

এ বিষয়ে ফকীহগণ একমত যে, বংশগতভাবে যেসব নারীকে বিবাহ করা হারাম দুগ্ধপায়ীর জন্যও সেসব নারীকে বিবাহ করা হারাম। তারা সংখ্যায় সাতশ্রেণীর,

---

৪৩. হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ১৪৬, আস সালাফিয়্যা সং) ও ইমাম মুসলিম (খ. ২, পৃ. ১০৭৮, আল হালাবী সম্পা.) উদ্ধৃত করেছেন।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. সূরা আন নিসা, ২৩।

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. সূরা আহকাফ, ১৫।

www.amarboi.org

যাদের কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ 'তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণকে'।[৪৮] তারা হলেন মাতাগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগ্নিগণ। আর দুধমাতা ও দুধবোনকে কুরআনের নস দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ 'এবং তোমাদের দুধমাতা ও দুধভগ্নিগণ'।[৪৯] কন্যা হারাম হয়েছে অনুসঙ্গীরূপে। কেননা যেখানে বোনকে হারাম করা হয়েছে সেখানে কন্যা তো আরো অগ্রগণ্য।

আর অন্যান্য মাহরাম নারী হারাম সাব্যস্ত হয়েছে সুন্নাহ দ্বারা। রাসূলুল্লাহ স.- বলেন, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 'বংশগত কারণে যা নিষিদ্ধ দুধ পান করানোর মাধ্যমেও তা নিষিদ্ধ হবে'।[৫০] সুতরাং দুগ্ধপায়ীর জন্য স্তন্যদানকারিণীকে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, তিনি তার মাতা এবং স্তন্যদানকারিণীর বংশীয় অথবা দুধসম্পর্কীয় পিতা ও মাতাগণ দুগ্ধপায়ীর দাদা ও দাদী। যদি সে মেয়ে হয় তবে তাকে বিবাহ করা দাদাদের জন্য হারাম অথবা পুরুষ হলে দাদীদেরকে বিবাহ করা তার জন্য হারাম। দুধমাতার অধস্তনগণ বংশীয় অধস্তনদের অনুরূপ। সুতরাং দুধমাতার বংশীয় অথবা দুধসম্পর্কীয় সন্তানগণ তার ভাই বোন। এক্ষেত্রে তারা 'সাহেবুল ফাহ্ল (অর্থাৎ যার দ্বারা দুধ এসেছে) অথবা অন্য কারো ঔরসজাত হোক এবং তার আগে কিংবা পরে জন্মগ্রহণ করুক না কেন। কেননা আল্লাহর বাণী وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ 'এবং তোমাদের দুধবোনগণ'।[৫১] আল্লাহ তাআলা স্তন্যদাকারিণীর কন্যা ও দুগ্ধপায়ীর মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে নিষেধাজ্ঞা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক্ষেত্রে বোনে বোনে অনুরূপভাবে তার কন্যার কন্যা ও তার পুত্রের কন্যা যত অধস্তনই হোক, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।[৫২]

---

৪৮. সূরা আন নিসা, ২৩।

৪৯. সূরা আন নিসা, ২৩।

৫০. হাদীসটি বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ২৫৩, আস-সালাফিয়্যা সং) ও মুসলিম (১০৭২, আল হালাবীসং) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে উদ্ধৃত করেন।

৫১. সূরা আন নিসা, ২৩।

৫২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ৩-৪; আল কালয়ুবী, খ. ৩, পৃ. ২৪০-২৪১; আসনাল-মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ১৪৯-৪১৮; হাশিয়াতুদ দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৫০৩; আল মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৫৭১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৭০।

www.amarboi.org

**২. স্তন্যদানকারিণী**

স্তন্যদানকারিণীর জন্য তার দুধপুত্র তৎপুত্রের পুত্র ও ক্রমঅধস্তনদের বিবাহ করা হারাম। কিন্তু তার উসূল বা মূল পুরুষগণ হারাম নয়, যেমন তার পিতা, দাদা এবং তার সংশ্লিষ্ট যারা যেমন, ভাই, চাচা, মামা, এরা স্তন্যদানকারিণীকে অথবা তার কন্যা বা বোনকে বিবাহ করতে পারবে। সুতরাং স্তন্যদান দুগ্ধপায়ীর উসূল ও তার সংশ্লিষ্টদেরকে হারাম করে না।[৫৩]

**৩. 'সাহেবুল লাবান' হলো স্বামী**

'সাহেবুল লাবান' বা দুধের মালিক হলো স্তন্যদানকারিণীর স্বামী, ফকীহগণের নিকট যিনি 'লাবানুল ফাহ্ল' নামে পরিচিত। সুতরাং স্ত্রী স্তন্যদান করেছে এমন মেয়েকে বিবাহ করা 'সাহেবুল লাবান'-এর জন্য হারাম। কেননা সে তার দুধকন্যা। এ ছাড়া স্তন্যদানকারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি তার এমন পুত্রগণের জন্যও সে হারাম। কেননা তারা তার দুধভাই। স্তন্যদানকারিণী ছাড়া তার (অন্য ঘরের) কন্যার পুত্রগণের জন্যও হারাম। কেননা তারা তার দুধপিতার দিক থেকে সহোদরের পুত্র। যদি তার দুইজন স্ত্রী পরস্পরের নিকট আজনবী বা অপরিচিত দু'টি শিশুকে স্তন্যদান করে তাহলে তারা উভয়ে দুধ পিতার কারণে বৈমাত্রেয় ভাই হয়ে যাবে এবং তাদের যে কোনো একজন মেয়ে হলে তাদের মধ্যে বিবাহ-শাদী হারাম। কেননা তাদের মধ্যে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সম্পর্ক। আর দুগ্ধপায়ী মেয়েকে বিবাহ করা স্তন্যদানকারিণীর স্বামীর উর্ধ্বতন পুরুষদের জন্যও হারাম। কেননা তারা মেয়েটির বৈমাত্রেয় দাদা। 'সাহেবুল লাবান'-এর ভাইদের জন্যও তা হারাম। কেননা তারা তার দুধ চাচা। তার ভগ্নিগণ দুগ্ধপায়ীর ফুফু। তাই তারা দুগ্ধপায়ীর জন্য হারাম। সাহেবুল লাবান-এর জন্য দুগ্ধপায়ীর মাতাগণ ও তার বংশীয় বোনদের মধ্যে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।[৫৪]

'সাহেবুল লাবান' হারাম হওয়ার দলীল হলো, আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, 'হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবুল কুআয়েস এর ভাই ফাহ্ল আমার কাছে (আসার) অনুমতি চাইল। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ স. অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আমি অনুমতি দেব না। কারণ আবুল কু'আয়েস এর ভাই আমাকে স্তন্যদান করেনি; বরং আবুল কুআয়েস -এর স্ত্রী আমাকে স্তন্যদান করেছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ স. আমার কাছে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি (অর্থাৎ আবুল কুআয়েস-এর ভাই) আমাকে স্তন্যদান করেনি, বরং তার স্ত্রী

৫৩. প্রাগুক্ত।

৫৪. কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৪৩; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৫৭২, খ. ৭, পৃ. ৫৪১; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ৩-৪; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪১৮; রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ১৫; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৩৩; হাশিয়াতুদ দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৫০২-৫০৩।

www.amarboi.org

আমাকে স্তন্যদান করেছে। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমার ডান হাত ধূলিমলিন হোক! তাকে অনুমতি দাও। কারণ সে তোমার চাচা'।[৫৫]

উরওয়া র. বলেন, আয়েশা রা. বলেছেন– حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "বংশগত কারণে যা নিষিদ্ধ, স্তন্যদানের কারণেও তা নিষিদ্ধ করো"।[৫৬] ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেউ দু'জন নারীকে বিবাহ করল এবং তাদের একজন একটি মেয়েকে এবং অন্যজন একটি ছেলেকে স্তন্যদান করেছে। এমতাবস্থায় উক্ত ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কি বিবাহ হতে পারে? তিনি বললেন, না। কারণ শুক্র এক।[৫৭]

'লাবানুল ফাহল' দ্বারা হারাম সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আতা, নাখঈ' ও আবু কিলাবা র.। কিছু সাহাবী থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে।[৫৮]

## তালাক অথবা মৃত্যুর পরেও পিতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়া

তালাক কিংবা মৃত্যুর পরে দুধপান দ্বারা পিতৃত্ব সাব্যস্ত হবে। সময় কম বা বেশি অতিবাহিত হোক। কেউ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে অথবা তার মৃত্যুর পর বুকে দুধ থাকায় স্ত্রী পুনরায় বিবাহের আগে কোনো শিশুকে স্তন্যদান করলো। এমতাবস্থায় দুগ্ধপায়ী শিশুটি তালাকদাতা বা মৃতব্যক্তির দুধপুত্র হিসেবে গণ্য হবে এবং এ দুধ সম্পর্ক তার মৃত্যু বা তালাক প্রদানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হবে না। স্তন্যদান ইদ্দতের মধ্যে হোক কিংবা পরে হোক। সময় কম হোক বা বেশি অতিবাহিত হোক এবং স্তনের দুধ শেষ হোক বা না হোক। কেননা, এমন কিছু ঘটেনি যা তার সাথে দুধের সম্পর্কের প্রতিবন্ধক হবে। তাই তার সাথে দুগ্ধপায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত। এটি জমহুর ফকীহদের অভিমত।[৫৯]

যদি স্তন্যদানকারিণী ইদ্দতের পর অন্য কাউকে বিবাহ করে এবং তার থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সন্তান জন্মগ্রহণের পরবর্তী দুধ দ্বিতীয় স্বামীর দুধ বলে

---

৫৫. হাদীসটি বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৩৮, আস সালাফিয়্যা) ও মুসলিম (খ. ২, পৃ. ১০৬৯, আল হালাবী) উদ্ধৃত করেছেন। শব্দাবলি ইমাম মুসলিমের।

৫৬. হাদীসটি বুখারী (আল ফাত্হ, খ. ৯, পৃ. ১৬০, আস সালাফিয়্যা) উদ্ধৃত করেন।

৫৭. রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ১৫-১৬; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪১৮; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৪১-৫৪২; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ৩; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪১১; হাশিয়াতুদ দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৫০৪-৫০৫; আল ফাওয়াকেহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৮৯।

৫৮. আল মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৫৭২।

৫৯. রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ১৮; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪১৮; বাদায়েউস-সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ১০; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

উমর ইবনে খাত্তাব রা. ও উমর ইবনে আবদুল আযীয র. থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, দুধের কারণে সাদৃশ্য হয়। সুতরাং ইহুদী, খ্রিস্টান ও ব্যভিচারিণী নারীর স্তন্যপান করাবে না। বোকার স্তন্যপান এজন্য অপছন্দ করা হয় যে, শিশুও তার মতো বোকা হতে পারে'।[৭১]

## স্তন্যদানকারিণীর সাথে সম্পর্ক

দুগ্ধপায়ীর ওপর স্তন্যদানকারিণীর অধিকার রয়েছে, যদিও তা মজুরির বিনিময়ে হয়। এর দলীল হলো, হাজ্জাজ আল আসলামীর একটি হাদীস। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল–

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ : الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ .

'কীভাবে আমার স্তন্যদানের ঋণ শোধ হবে? তিনি বললেন, একটি দাস অথবা দাসী দেওয়ার মাধ্যমে।[৭২]

কাজী বলেন, অর্থাৎ কোন্ জিনিস আমাকে স্তন্যদানের ঋণ থেকে মুক্ত করবে, যাতে আমি স্তন্যদানকারিণীর অধিকার পুরোপুরি আদায় করতে পারি? আরবরা দুধ ছাড়ানোর সময় মজুরি ছাড়াও আরো কিছু দ্বারা ধাত্রীমাতাকে সন্তুষ্ট করতে পছন্দ করত। হাদীসে এটিই জানতে চাওয়া হয়েছে।

খাত্তাবী 'আল মাআ'লিম-এ বলেন, তিনি [নবী (স)] বলেন, তুমি শিশু থাকাবস্থায় তিনি তোমার সেবা করেছেন, তোমার ছোটকালে তোমাকে কোলে নিয়েছেন। তাই একজন খাদেম দিয়ে তুমি সে প্রতিদান দাও, যে তার সেবা করবে ও কাজকর্ম করে দিবে। এটি হলো তার ঋণ অর্থাৎ অধিকার আদায় এবং তার কৃত ইহসানের প্রতিদানস্বরূপ। এ হাদীসটি প্রমাণ করে, দুধ ছাড়ানোর সময় ধাত্রীমাতাকে একজন দাস কিংবা দাসী দ্বারা হলেও উপহার দেয়া মুস্তাহাব। খুব দামী সম্পদ হওয়ায় হাদীসে এটি বুঝাতে 'আল গুররা' (উজ্জ্বল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[৭৩]

নবী স.-এর কাজও এর সমর্থন করে। আবু তুফাইল রা. বর্ণনা করে বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে জিইররানা নামক স্থানে গোশ্ত বণ্টন করতে দেখলাম। আবু তুফাইল বলেন, সেদিন আমি এমন যুবক ছিলাম যে, জবাইকৃত উটের হাড় বহন করতে পারতাম। অতঃপর একজন মহিলা এসে নবী স. এর

৭১. আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৬৩।
৭২. হাদীসটি আবু দাউদ (খ. ২, পৃ. ৫৫৩, সম্পা-ইজ্জত উবাইদ দা'আস) ও তিরমিযী (খ. ৩, পৃ. ৪৫০, আল হালাবী) উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ।
৭৩. আওনুল মা'বূদ, খ. ৬, পৃ. ৬৯; সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৫৩।

www.amarboi.org

কাছে এগিয়ে গেল। তখন তিনি তাঁর চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং সে তাতে বসল। আমি বললাম, ইনি কে? অন্যরা বলল, ইনি তাঁর দুধমাতা'।[৭৪]

উমর ইবনুস সায়েব বর্ণনা করেন, তার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ স. বসা থাকাবস্থায় তাঁর দুধপিতা এলেন। রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জন্য কিছু কাপড় বিছিয়ে দিলে তিনি সেখানে বসলেন। এরপর তাঁর দুধমাতা এলেন। তখন তিনি তার আরেক পাশে একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দিলে তিনিও তার ওপর বসলেন। এরপর তাঁর দুধভাই আসলে তিনি তার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে তাঁর সামনে বসালেন'।[৭৫]

–নাজমুল হুদা সোহেল

---

৭৪. হাদীসটি আবু দাউদ (খ. ৫, পৃ. ৩৫৩, সম্পা-ইজ্জত উবাইদ দা'আস) উদ্ধৃত করেছেন। আল মিযযী বলেন, এর সনদে অজ্ঞতা রয়েছে (আত্ তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ১১৬)।

৭৫. হাদীসটি আবু দাউদ উদ্ধৃত করেন (খ. ৫, পৃ. ৩৫৪, সম্পা-ইজ্জত উবাইদ দা'আস)। আল মুনযিরী বলেন, এটি মু'যাল; উমর ইবনুস সায়েব তাবেয়ীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। মুখতাসারুস সুনানেও এরূপ বলা হয়েছে (খ. ৮, পৃ. ৩৯, দারুল মা'রিফা সং)।

www.amarboi.org

# শিশুর লালন-পালন (حَضَانَةُ)

**সংজ্ঞা :** الْحَضَانَةُ শব্দটি আরবী ক্রিয়ামূল حَضَنَ হতে নির্গত; এর আভিধানিক অর্থ : (শিশুর) লালন-পালন করা, প্রতিপালন করা।[১] এর থেকে পাখি যখন ডিমের ওপর বসে তখন বলা হয় পাখি ডিমে তা দিয়েছে। নারী যখন শিশুকে পরিচর্যা করে, তখন বলা হয় নারী শিশুকে লালন-পালন করেছে। আরবীতে الْحَاضِنُ ও الْحَاضِنَةُ বলা হয় যাদের নিকট শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এরপর তারা তা পরিচর্যা ও দেখাশুনা করে। আর শরীয়তের পরিভাষায় حَضَانَةُ বলা হয় : حِفْظُ مَنْ لاَ يَسْتَقِلُ بِأُمُوره ، وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ অর্থাৎ ঐ শিশুর লালনপালন করাকে যে তার আপন কাজ-কর্ম সম্পাদন ও যথাযথ পরিচর্যায় স্বনির্ভর নয়।[২]

## শিশুর লালন-পালনের শরয়ী বিধান

শিশুর লালন-পালন ও পরিচর্যা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। কেননা শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন বর্জন করার কারণে অনেক সময় সে মৃত্যুবরণ করে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তাকে মৃত্যু ও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তার লালন-পালন ও দেখাশোনা করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং যদি লালন-পালনকারী একাধিক না পাওয়া যায় তাহলে শিশুকে লালন-পালন করা ফরজে আইন। আর যদি লালন-পালনকারী একাধিক পাওয়া যায় তাহলে শিশুকে প্রতিপালন করা ফরজে কেফায়া।[৩]

আরবীতে الْمَحْضُونَ বলা হয় ঐ শিশুকে যাকে লালন-পালন করা হয়। অন্য কথায় যার ওপর প্রতিপালন কার্যকর হয় তাকে الْمَحْضُونَ বলা হয়।

## লালন-পালনযোগ্য শিশুর বৈশিষ্ট্য

ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতে শিশুদেরকে লালন-পালন করা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন জমহুর উলামায়ে কেরাম। অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণ। আর মালেকী মাযহাবের

---

১. লিসানুল আরব; আল মিসবাহুল মুনীর। শব্দমূল حضن

২. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫২; কাশ্‌শাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬; মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১৩; আল কাওয়ানীনুল ফিক্‌হিয়্যাহ, পৃ. ২২৪, নাশরু দারিল কিতাবিল আরাবী ও ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৪।

৩. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১০২; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১২।

www.amarboi.org

একমত অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক পাগল এবং নির্বোধের জন্যও লালন-পালন করা নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রমাণিত। মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, ছেলে শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন সে রোগী কিংবা পাগল হলেও তাকে লালন-পালনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।[৪]

## প্রতিপালনের দাবি

শিশুকে প্রতিপালন করার দাবি হলো তাকে দেখাশোনা করা। তাকে তার কষ্টদায়ক বিষয়সমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখা। তার যথাযথ পরিচর্যা করা, যেন সে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠে। এ সমস্ত বিষয় এমনভাবে সম্পাদন করতে হবে যা তার জন্য উপযোগী। শিশুকে লালন-পালনের আরো দাবি হলো, তার পানাহারের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা। তাকে নিয়মিত গোসল করানো। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। তার মাথায় ও শরীরে তৈল ব্যবহার করা। তার ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়া ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা।[৫]

## লালন-পালনের অধিকার

শিশুকে লালন-পালন করার ক্ষেত্রে শিশু ও শিশুর প্রতিপালনকারী প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকার রয়েছে। প্রতিপালনকারীর অধিকার হলো, যদি সে শিশুকে লালন-পালন করা হতে বিরত থাকতে চায় তাহলে তাকে লালন-পালনে বাধ্য করা যাবে না। কেননা শিশুকে লালন-পালন করা তার ওপর অবশ্যকর্তব্য নয়। আর সে যদি শিশুকে লালন-পালন করার অধিকার পরিত্যাগ করে তাহলে তার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। অতঃপর পুনরায় যদি সে তার এই অধিকার ফিরিয়ে আনতে চায় এবং সে এর যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে তার অধিকার পুনরায় তার নিকট ফিরে আসবে। এটাই জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত। কেননা এটি এমন একটি অধিকার যা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করে।

আর শিশুর অধিকার হলো, যদি সে তার মাতা ছাড়া অন্য কাউকে লালন-পালনের জন্য গ্রহণ না করে অথবা তার মা ছাড়া অন্য কাউকে না পাওয়া যায় অথবা শিশুর পিতার কিংবা শিশুর সম্পদ না থাকে, তাহলে শিশুকে লালন-পালন করার জন্য তার মাতা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এবং তার মাকে তার লালন-পালন করার জন্য বলপ্রয়োগ করে বাধ্য করা হবে। এজন্য হানাফীগণ বলেন : কোনো

৪. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৪১; আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১০১; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১৪; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৬; আল-কাওয়াইদুল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ১২৪; নিহায়াতুল-মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১৪।

৫. আলবাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ৪০; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫২; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৬; আশশারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭৫৫।

www.amarboi.org

স্ত্রী যদি এই শর্তের ওপর খুলার মাধ্যমে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে যে, সে তার সন্তানকে তার স্বামীর নিকট রেখে দেবে এবং তার লালন-পালন করবে না, তাহলে খুলা তালাক শুদ্ধ হবে; কিন্তু শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাকে তার সন্তানের লালন পালন করতে হবে। এ মত পোষণ করেছেন হানাফী শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ। মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতও তাই। তবে তারা শিশু প্রতিপালনে অধিকার পরিত্যাগ করার পর পুনরায় তা ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে জমহুর উলামায়ে কেরামগণের বিপরীত মত পোষণ করেন। তাদের মত হলো, শিশুর প্রতিপালনকারী যখন তার ওপর প্রতিপালন অবশ্যকর্তব্য হওয়ার পরও কোনো ওযর ছাড়া তার অধিকার পরিত্যাগ করবে তখন তার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এরপর তার এই অধিকার আর কখনো ফিরে আসবে না। যদিও সে তা ফিরিয়ে আনতে চায়। আর তাদের অপ্রসিদ্ধ মত হলো, প্রতিপালনের অধিকার তার দিকে ফিরে আসবে, এর ওপর ভিত্তি করে যে, এটি শিশুর অধিকার।[৬]

## ক্রম অনুযায়ী শিশুর লালন-পালনের হকদারগণ

নারী-পুরুষ সকলেই শিশুর লালন-পালন ও দেখা-শোনা করার হকদার হতে পারে। তবে লালন-পালনে নারীগণ পুরুষের তুলনায় অগ্রগণ্য। কেননা তারা অতিশয় দয়াশীল ও স্নেহপরায়ণ। শিশুদের লালন-পালনে তারা অতিশয় যোগ্য ও পারদর্শী। এরপর পুরুষদের দিকে শিশুদের লালন-পালনের ভার ন্যস্ত হবে। কেননা তারা শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিকতর সক্ষম।[৭]

শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব তার পিতা-মাতার উপর ন্যস্ত হবে, যখন তাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন অটুট থাকবে। যদি তাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব তার মাতার ওপর ন্যস্ত হবে।

কেননা হাদীস শরীফে এসেছে–

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُول اللّٰه : إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي ، فَقَال : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

৬. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৬; আদদাসুকী, খ. ২, পৃ. ৫৩২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬; কাশ্‌শাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৬-৪৯৮; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬২৪।

৭. আল বাদায়ে'।

www.amarboi.org

"জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ স. এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ হলো আমার ছেলে। আমার পেটই ছিল তার সুরক্ষিত থলি। আমার কোল ছিল তার দোলনা। আমার স্তনই ছিলো তার পানপাত্র। অথচ এখন তার পিতা ইচ্ছা করছে যে, সে তাকে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেবে। তখন মহানবী স. বললেন, তুমি বিবাহ করার পূর্ব পর্যন্ত তার লালন-পালনের ব্যাপারে অধিকতর হকদার।[৮]

প্রত্যেক মাযহাবেই মায়ের পর সন্তান লালন-পালনের হকদারদের ধারাবাহিকতা এবং লালন-পালনের অধিকারের ক্ষেত্রে হকদার সকলে সমান হলে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সে ব্যাপারে বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক মাযহাবই একথার ওপর একমত যে, শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নিকটবর্তী হকদার হতে দূরবর্তী হকদারের দিকে স্থানান্তরিত হবে না। তবে নিকটবর্তী হকদার যদি তার অধিকার ছেড়ে দেয় অথবা কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে তার অধিকার রহিত হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। হকদারদের ব্যাপারে মাযহাবসমূহের ক্রমবিন্যাস নিম্নে প্রদত্ত হলো :

হানাফীদের মতে কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে যদি মায়ের লালন-পালনের অধিকার রহিত হয়ে যায় তাহলে লালন-পালনে মায়ের স্থলাভিষিক্ত হবে নানী। এরপর দাদী– সে যতই ঊর্ধতন হোক না কেন। তারপর সহোদর বোন, তারপর বৈপিত্রেয় বোন, তারপর বৈমাত্রেয় বোন। তারপর আপন ভাগ্নি, তারপর বৈপিত্রেয় ভাগ্নি। তারপর আপন খালাগণ তারপর বৈপিত্রেয় খালাগণ তারপর বৈমাত্রেয় খালাগণ, তারপর বৈমাত্রেয় ভাগ্নি (তাকে খালাগণের পরে আনাই বিশুদ্ধ)। তারপর আপন ভাতিজি এরপর বৈপিত্রেয় ভাতিজি; এরপর বৈমাত্রেয় ভাতিজি। এরপর আপন ফুফুগণ এরপর বৈপিত্রেয় ফুফুগণ এরপর বৈমাত্রেয় ফুফুগণ এরপর মায়ের খালা এরপর পিতার খালা এরপর পিতা ও মাতাদের ফুফুগণ। তারপর মিরাসের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পুরুষ আসাবাগণ। সুতরাং এক্ষেত্রে পিতা অগ্রগণ্য, এরপর দাদা, এরপর সহোদর ভাই, এরপর বৈমাত্রেয় ভাই, এরপর তার সন্তানগণ এরপর চাচা এরপর তার সন্তানগণ। আর যখন তারা সকলেই শিশুকে প্রতিপালন করার জন্য একত্রিত হবে তখন তাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে। এরপর যখন কোনো আসাবা না থাকে তখন শিশুর প্রতিপালনের অধিকার স্থানান্তরিত হবে রক্তসম্পর্কিত মাহরাম পুরুষ 'যাবিল আরহাম'দের নিকট। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নানাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর বৈপিত্রেয়

৮. আহমাদ, খ. ২, পৃ. ১৮২; আল-হাকেম, খ. ২, পৃ. ২০৭; হাদীসের রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.। হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবীও তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

www.amarboi.org

ভাইকে এরপর তার সন্তান এরপর বৈপিত্রেয় চাচা এরপর আপন মামা এরপর বৈপিত্রেয় মামাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যদি তারা সকলেই সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে অধিক সৎকর্মশীল, তারপর যে অধিক খোদাভীরু, তারপর যে অধিক বয়স্ক তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।[৯]

মালেকী আলিমগণ বলেন : মায়ের পর শিশুর লালন-পালনের অধিকতর হকদার নানী। এরপর মায়ের নানী। মাতৃসূত্রে আপনজনকে পৈত্রিকসূত্রে আপনজনদের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর শিশুর আপন খালা, এরপর বৈপিত্রেয় খালা, এরপর বৈমাত্রেয় খালা। এরপর মায়ের আপন খালা। এরপর মায়ের বৈপিত্রেয় খালা, এরপর মায়ের বৈমাত্রেয় খালা। এরপর মায়ের ফুফু। এরপর দাদী (এখানে দাদী বলতে বাপের মা, বাপের নানী, বাপের দাদী এর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে নিকটতম আত্মীয় দূরবর্তীর ওপর অগ্রাধিকার পাবে)। দাদীর পর শিশুর প্রতিপালনের হকদার পিতা। এরপর শিশুর সহোদর বোন, এরপর শিশুর বৈপিত্রেয় বোন, এরপর শিশুর বৈমাত্রেয় বোন, এরপর ফুফু এরপর উল্লিখিত ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী পিতার ফুফু, এরপর পিতার খালা।

এরপর ভাতিজি অথবা ভাগ্নিকে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে। অথবা তাদের মধ্যে যারা সকলেই সমস্তরের তাদের মধ্যে কে অগ্রাধিকার পাবে- সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এটিই তাদের প্রসিদ্ধ মত। এরপর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এরপর ভাই এরপর দাদা এরপর ভাতিজা এরপর চাচা এরপর চাচাত ভাই এরপর মুক্তকারী মনিব এরপর মুক্ত দাস।

মালেকী ইমামগণের মধ্যে বৈপিত্রেয় দাদার প্রতিপালনের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে রুশদ বলেন : বৈপিত্রেয় দাদার শিশুকে লালন-পালনের অধিকার নেই। অপরদিকে আল্লামা লাখমী বলেন, তার জন্য শিশুকে প্রতিপালন করার অধিকার রয়েছে। তিনি বলেন : তার স্তর হলো, বৈমাত্রেয় দাদার পরের স্তর। তারা সকলেই যখন সমান হবে তখন শিশুর সবচেয়ে অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী ও স্নেহশীলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরাও যদি সকলেই সমস্তরের হয় তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বয়স্কের নিকট শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পিত হবে। এরপর সকল ক্ষেত্রে যদি সকলেই সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে লটারি করা হবে।[১০]

শাফেয়ী ইমামগণের মতে মায়ের পর শিশুর লালন-পালনের অধিকতর হকদার তার কন্যা। এরপর মায়ের ঐ সমস্ত ঊর্ধ্বতন মাতৃগণ যারা উওরাধিকারী মহিলাদের মাধ্যমে নিকটতর, তাদেরকে আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে প্রাধান্য

---

৯. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯।

১০. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৭-৫২৮।

৫—

www.amarboi.org

দেওয়া হবে। এরপর বিশুদ্ধতম অভিমত অনুযায়ী শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব দাদীর দিকে স্থানান্তরিত হবে। বস্তুত নানীদেরকে দাদীদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাদের স্নেহপরায়ণতা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে। তাছাড়া তারা দাদীদের তুলনায় উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে অধিকতর শক্তিশালী। দাদীর পর দাদীর ঐ সমস্ত মাতাগণ যারা উত্তরাধিকারী মহিলাদের মাধ্যমে নিকটতর। এরপর বাপের দাদী এরপর তার ঐ সমস্ত উর্ধ্বতন মাতাগণ যারা উত্তরাধিকারী নারীদের মাধ্যমে নিকটতর। এরপর দাদার দাদী এরপর তার ঐ সমস্ত মাতা যারা উত্তরাধিকারী নারীদের মাধ্যমে নিকটতর। আর এর প্রত্যেকটিতেই আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর সহোদর বোন, এরপর বৈমাত্রেয় বোন এরপর বৈপিত্রেয় বোন। এরপর বিশুদ্ধতম মতানুসারে এই ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী খালা। এরপর ভাগ্নি এরপর ভাতিজি এরপর আপন ফুফু এরপর বৈমাত্রেয় ফুফু এরপর বৈপিত্রেয় ফুফু। আর শাফেয়ীদের পূর্বমত অনুযায়ী বোন ও খালাগণ দাদী-পরদাদীদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। বোনগণ অগ্রাধিকার পাবে কারণ হলো, তারা শিশুর একই ঔরসে ও একই পেটে-জন্মগ্রহণ করেছে। আর খালাগণ অগ্রগণ্য হবে কারণ হলো, নবী করীম স. বলেছেন– اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ অর্থাৎ- খালা হলো মায়ের সমমর্যাদাসম্পন্ন ।

সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, শিশুর লালন-পালনের অধিকার যারা মাহরাম নয় যেমন- খালাতো বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন, চাচাত বোন তাদের জন্য এ কারণে সাব্যস্ত হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের দরুন শিশুর প্রতি তাদের স্নেহ রয়েছে। সাথে সাথে মেয়ে হওয়ার দরুন তাদের মধ্যে শিশুকে পরিচর্যা করার যথাযথ জ্ঞান বিদ্যমান। আর বিশুদ্ধমতের বিপরীত মত হলো, শিশু প্রতিপালনে এই সমস্ত মহিলাদের কোনো অধিকার নেই।

শিশুদের প্রতিপালনে পুরুষদের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে শাফেয়ীগণ উল্লেখ করেন যে, শিশুর প্রতিপালন প্রত্যেক মাহরাম উত্তরাধিকার পুরুষের জন্য সাব্যস্ত হবে ওয়ারিসী সত্বের ক্রমধারা অনুযায়ী। সুতরাং সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দেয়া হবে পিতাকে। এরপর দাদা যত উর্ধতন হোক. এরপর সহোদর ভাই এরপর বৈমাত্রেয় ভাই। এমনিভাবে চলবে বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্রম-ধারা অনুযায়ী। যেমনিভাবে শিশুর লালন-পালন গাইরে মাহরামের জন্য সাব্যস্ত হয় যদি সে ওয়ারিস হয়। যেমন চাচাত ভাই। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। অভিভাবকত্বের ব্যাপারে তার স্নেহপরায়ণতা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে। বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মত হলো, চাচাত ভাই মাহরাম না হবার কারণে তার শিশুকে পালন-পালন করার অধিকার নেই।

www.amarboi.org

শিশুকে লালন-পালন করার জন্য যখন নারী-পুরুষ হকদারগণ একত্রিত হবে তখন শিশুর মাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর ঐ সমস্ত নানীদেরকে অগ্রে রাখা হবে যারা মহিলাদের মধ্যে নিকটতর। এরপর পিতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কেউ কেউ বলেন, খালা ও বৈপিত্রেয় বোনকে পিতার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মূলকে শাখার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে তাই সে মূল মহিলা হোক বা পুরুষ হোক। যেমন ভাই, বোন। মূল যদি না পাওয়া যায় আর সেখানে কয়েকটি শাখার লোক থাকে তাহলে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, উত্তরাধিকারের ন্যায় তারা পুরুষ হোক বা মহিলা।

যদি তারা সকলেই সমান হয় এবং তাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা থাকে তাহলে মহিলা পুরুষের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। আর প্রত্যেক দিক থেকেই যদি দুইজন সমান হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে লটারি দেওয়া হবে। যেমন দুই ভাই, দুইবোন, দুই খালা তাহলে বিবাদ নিরসনকল্পে তাদের মধ্যে লটারি দেওয়া হবে।

শাফেয়ী ইমামগণের বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মত হলো, মহিলাদের আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা যদিও দূরবর্তী হয় তাহলেও তারা শিশুদের লালন-পালনে পুরুষের তুলনার অগ্রাধিকার পাবে। কারণ তারাই শিশুর লালনপালনে অতিশয় যোগ্যতর।[১১]

আল্লামা বায়যাবী র. বলেন, শিশুর প্রতিপালনের জন্য অনেক হকদার যদি একত্রিত হয় তাহলে মূলের মধ্যে মাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যে পর্যন্ত তিনি অপরিচিতি কাউকে বিবাহ না করবেন। এরপর দাদী এরপর সে দাদীর নিকট তম মহিলা। কেননা তিনি অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় অধিকতর উপযুক্ত। এরপর পিতা এরপর ঐ মহিলা যে শিশুর পিতার নিকটতম। এরপর দাদা এরপর ঐ মহিলা, যিনি দাদার নিকটতম এরপর বোন এরপর ভাই এরপর খালাগণ এরপর ভাগ্নি এরপর ভাতিজি এরপর ভাতিজা এরপর চাচা এরপর চাচাতো বোন এরপর চাচাত ভাই। বয়ঃসন্ধি নিকটবর্তীতে যে বালিকা পৌঁছেছে তাকে লালন-পালনের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাক্তির নিকট সোর্পদ করা হবে। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে সহোদর ভাই-বোন এরপর বৈমাত্রেয় ভাই বোন এরপর বৈপিত্রেয় ভাই বোন। এরপর নানা এরপর মামা। তবে কেউ কেউ বলেন যে, এই দু'জনের লালন-পালনের অধিকার নাই। অনুরূপভাবে বৈপিত্রেয় ভাতিজারও মহিলা না হওয়া এবং ওয়ারীসি স্বত্ব না থাকার কারণে তাদের শিশুকে লালন-পালন করার অধিকার নেই।[১২]

---

১১. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫২-৪৫৩-৪৫৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১৫-২১৭।
১২. আল্লামা বায়যাবী, আলগায়াতুল কাসওয়া, খ. ২, পৃ. ৮৭৮।

www.amarboi.org

হাম্বলী উলামায়ে কেরামের মতে, মায়ের পর শিশুর লালন পালনের অধিকতর হকদার হলো শিশুর নানীগণ। যে যত বেশি নিকটতর সে তত বেশি অগ্রাধিকার যোগ্য। এরপর পিতা এরপর দাদীগণ অতপর সহোদর বোন এরপর বৈপিত্রেয় বোন এরপর বৈমাত্রেয় বোন এরপর আপন খালা এরপর বৈপিত্রেয় খালা এরপর বৈমাত্রেয় খালা। এরপর আপন ফুফু এরপর বৈপিত্রেয় ফুফু এরপর বৈমাত্রেয় ফুফু এরপর অনুরূপভাবে তার মায়ের খালা এরপর তার পিতার খালা এরপর তার পিতার ফুফু এরপর তার ভাতিজিগণ এবং তার ভাগ্নিগণ এরপর তার চাচাত বোনগণ এবং তার ফুফাত বোনগণ এরপর তার পিতার চাচাত বোনগণ এবং তার পিতার ফুফাত বোনগণ। এর সবক্ষেত্রেই সহোদরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এরপর বৈপিত্রেয়দেরকে এরপর বৈমাত্রেয়দেরকে। এরপর শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পিত হবে আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে আসাবাগণের উপর। শিশু যদি মেয়ে হয় তাহলে তার প্রতিপালনের দায়িত্ব স্বগোত্রীয় মাহরাম ব্যক্তিদের উপর যদিও তা দুধপান কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন স্থাপিত হোক না কেন। আর এ বিধান মেয়ে শিশুটির বয়স সাত বৎসর পর্যন্ত প্রযোজ্য। সুতরাং সাত বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর তার চাচাতো ভাই প্রমুখের জন্য তাকে লালন-পালনের অধিকার থাকবে না, যদি তারা দুধপান কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন মাহরাম না হয়। উপরে যা আলোচনা করা হলো তা কাশশাফুল কিনা গ্রন্থকারের লেখা। ইবনে কুদামা কাশশাফুল কিনা গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে বলেন যে, হাম্বলীদের এটাই প্রসিদ্ধ মাযহাব।

ইবনে কুদামা ইমাম আহমদের বরাত দিয়ে কয়েকটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি রেওয়ায়াত হলো, তিনি বলেন, দাদী ও তার ঊর্ধতন নারীগণ নানীর উপর অগ্রগণ্য। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী পিতা অগ্রাধিকার প্রাপ্তিতে শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং মায়ের পর পিতাই হবেন সন্তানের প্রতিপালনের হকদার। এরপর তার (পিতার) মাতাগণ।

ইমাম আহমদ থেকে আরেক রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, বৈপিত্রেয় বোন ও খালা পিতা থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে। আর সহোদর বোন পিতা ও সকল আসাবা থেকে শিশুর প্রতিপালনের অধিকতর হকদার। হাম্বলী মাযহাবে শিশুর প্রতিপালনে পুরুষদের ধারাক্রম হলো পিতা সকলের চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য। এরপর দাদা এরপর পরদাদা। এভাবে তিনি যতই ঊর্ধস্তরের হোননা কেন। এরপর সহোদর ভাই এরপর বৈমাত্রেয় ভাই এরপর ওয়ারীসি স্বত্বের ধারাক্রম অনুযায়ী তার সন্তানগণ যদিও তারা নিম্নস্তরের হোকনা কেন। এরপর চাচাগণ এরপর তাদের সন্তানগণ এরপর পিতার চাচাগণ এরপর তাদের সন্তানগণ। যদি লালন-পালনের অধিকারী দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হয় এবং তারা সকলেই সমান হয় যেমন : দুই সহোদর ভাই তাহলে তাদের মধ্যে লটারি করে একজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

www.amarboi.org

যখন শিশুকে লালন-পালন করার জন্য তার লালন পালনের ঐসমস্ত হকদার যাদের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে তারা কেউ না থাকে তখন তার লালন-পালনের দায়িত্ব মাতৃ কিংবা পিতৃবংশের দুই দিকের কোনো একদিকে রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়দের ওপর অর্পিত হবে। কেননা তাদের অত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে রয়েছে যার দ্বারা তারা উত্তরাধিকারের ভাগিদার হয়ে থাকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ না থাকার সময়। সুতরাং এক্ষেত্রে নানাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এরপর তার মাতাগণ এরপর বৈপিত্রেয় ভাই এরপর মামা এরপর বিচারক মুসলমানদের মধ্যে যে কোনো একজনের নিকট তাকে সোপর্দ করবে। আর সে-ই তাকে লালন-পালন করবে।

হাম্বলীগণের অন্য একটি মত হলো, পুরুষদের মধ্যে যারা রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয় তাদের জন্য শিশুর প্রতিপালনের অধিকার নেই। এমতাবস্থায় লালন-পালনের বিষয়টি বিচারকের ওপর ন্যাস্ত হবে।

আর যেসব স্থানে ভাই ও বোন একত্রিত হয় অথবা চাচা ও ফুফু একত্রিত হয় অথবা ভাতিজা ভাতিজি একত্রিত হয় অথবা ভাগ্নে ও ভাগ্নি একত্রিত হয় সেখানে নারী তার স্তরের পুরুষের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে। কেননা এখানে সমান হওয়া সত্ত্বেও মহিলা হওয়ার কারণে সে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে।[১৩]

## লালন-পালনের অধিকারীদের বিষয়ে শর্তসমূহ

শিশুর পরিচর্যা ও লালন-পালন তার উপর অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর তার উদ্দেশ্য হলো শিশুর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, তার যত্ন নেওয়া। আর এসব কিছু শিশুর লালন-পালনকারী প্রতিপালনের যোগ্য না হলে অর্জিত হয় না। এজন্য ফুকাহয়ে কেরাম শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন, যে শর্তগুলি প্রতিপালকের মধ্যে বিদ্যমান না থাকলে সে লালন পালনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। শর্তসমূহ তিনভাগে বিভক্ত :

(এক) পুরুষ ও নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ শর্তসমূহ
(দুই) নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ
(তিন) পুরুষদের সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ।

## নারী ও পুরুষদের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ শর্তসমূহ

**(এক)** মুসলমান হওয়া। এই শর্তটি তখনই প্রযোজ্য যখন শিশু মুসলমান হবে। কেননা মুসলমানের উপর কাফেরের কোনো অভিভাবকত্ব নেই। তাছাড়া কাফের যদি শিশুর পরিচর্যা করে তাহলে শিশুর দীন-ধর্ম ফেতনাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা

---

১৩. কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮; মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬২১-৬২২-৬২৩।

www.amarboi.org

রয়েছে। এই শর্তটি আরোপ করেছেন শাফেয়ী, হাম্বলী ও কতিপয় মালেকী ফুকাহায়ে কেরাম। পুরুষ পরিচর্যাকারীর ক্ষেত্রে হানাফীদের মতামতও তাই। মালেকী ফুকাহায়ে কেরামগণের প্রসিদ্ধ মতে এবং মহিলা লালন-পালনকারী হলে সে ক্ষেত্রে হানাফীদের মাযহাব মতে তার মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। অবশ্য সে মহিলা যদি মুরতাদ হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা তাকে হানাফীদের মাযহাব অনুযায়ী আটক করা ও প্রহার করা হবে। ফলে সে লালন-পালনের জন্য অবসর পাবে না। আর কিতাবধারী অথবা অগ্নিপূজারী অমুসলিম মহিলা শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলার মতোই হকদার। হানাফীগণ বলেন, যতদিন পর্যন্ত শিশু দীন সম্পর্কে না বুঝে এবং কুফরকে ভালোবাসা শুরু না করে ততদিন পর্যন্ত শিশু ঐ মহিলার পরিচার্যাধীন থাকবে। আর যখনই এ ব্যাপারে তার ওপর আশঙ্কা হবে তখনই তাকে ঐ মহিলার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে মুসলমানদের মধ্যে রাখা হবে। তবে মালেকীদের মতে তার উপর যদি কেবলমাত্র আশংকা হয় তাহলে তার থেকে ছিনিয়ে আনা হবে না। বরং ঐ অমুসলিম লালন-পালনকারীকে মুসলমানদের প্রতিবেশী করে রাখা হবে, যেন তারা তার (মহিলার) ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে।[১৪]

**(দুই)** প্রাপ্তবয়স্ক ও বোধসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং শিশু, পাগল ও নির্বোধের জন্য শিশুর লালন-পালনের অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা, তারা নিজেদের কাজকর্ম এবং যাদের পরিচর্যা করবে তাদের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। সুতরাং তাদের নিকট অন্যের লালন পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে না। এটি সকল মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামগণের সর্বসম্মত অভিমত।[১৫]

**(তিন)** দীনের আমানত রক্ষা। সুতরাং ফাসেকের জন্য শিশু প্রতিপালনের অধিকার নেই। কেননা ফাসেকের কোনো আমানতদারী নেই। তাই তার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। আর এক্ষেত্রে ফিস্‌ক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে অন্যায়ের দরুন শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, প্রকাশ্যে মদপান, চুরি, যিনা-ব্যাভিচার ও হারাম খেলাধুলায় প্রসিদ্ধ হওয়া।

আর যার অন্যায় ও মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে জানা না যায়, বরং তা গোপন থাকে তার জন্য শিশু প্রতিপালনকারীর অধিকার বলবৎ থাকবে। ইবনে আবেদীন বলেন, মোটকথা হলো শিশু প্রতিপালনকারিণী যদি এমন অন্যায় করে, যে

---

১৪. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৩-৬৩৯; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৯; জাওয়াহিরুল-ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৪০৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৫; কাশ্‌শাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪৯৮।

১৫. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৩; আদ-দাসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫২৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৪-৪৫৬; কাশ্‌শাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৮।

www.amarboi.org

অন্যায়ের দরুন শিশুর ক্ষতি হয় তাহলে তার জন্য শিশু লালন-পালনের অধিকার বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্যথায় শিশুর বুদ্ধি বিবেক হওয়া পর্যন্ত এই মহিলাই উক্ত শিশু লালন-পালন করার অধিকারী বলে বিবেচিত হবে। তবে যখন শিশু এই মহিলার অন্যায় সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে তখন তাকে তার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনা হবে। আল্লামা রামলী বলেন, সন্তান লালন-পালনের জন্য সে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে, যার ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায় গোপন থাকে। আল্লামা দাসূকী বলেন, শিশুকে লালন-পালন করার দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমানতদার থাকবে। যদি লালন-পালনকারীর খিয়ানত সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় তাহলে তার প্রতিপালনের অধিকার বাতিল বলে গণ্য হবে।[১৬]

**(চার)** শিশুর পরিচর্যা সম্পাদনে সক্ষম হওয়া। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্য শিশুর লালন-পালনের অধিকার নেই, যে ব্যক্তি শিশুকে সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করতে সক্ষম নয়, অধিক বয়স্ক হওয়ার কারণে অথবা এমন কোনো রোগের কারণে যা শিশু পরিচর্যাকে বাধাগ্রস্ত করে। অন্ধ, বোবা ও বধিরের জন্যও শিশুকে প্রতিপালন করার অধিকার নেই। অবশ্য তাদের নিকট যদি এমন কেউ থাকে, যে শিশুকে দেখাশুনা করবে ও যত্ন নেবে। তাহলে তখন তাদের থেকে শিশু প্রতিপালন করার অধিকার রহিত হবে না।[১৭]

**(পাঁচ)** শিশু প্রতিপালনকারীর মধ্যে সংক্রামক কোনো ব্যাধি না থাকা। যেমন- কুষ্ঠ ও শ্বেতী রোগসহ এজাতীয় কোনো রোগ, যার ক্ষতি শিশুর দিকে সংক্রমিত হয়।[১৮]

**(ছয়)** সৎপথের ও সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা। এটি মালেকী ও শাফেয়ীগণের নিকট শর্ত। সুতরাং নির্বোধ অপব্যয়ীর জন্য শিশুকে লালন-পালন করার অধিকার নেই। যাতে সে শিশুর মাল ধ্বংস করতে না পারে।[১৯]

**(সাত)** প্রতিপালিত শিশুর জন্য স্থান নিরাপদ থাকা। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্য শিশুকে লালন-পালন করার অধিকার নেই, যে ব্যক্তি ভয়সঙ্কুল স্থানে বসবাস করে, যেখান থেকে দুষ্কৃতকারী ও অপহরণকারীরা নিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। মালেকীগণ এই শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[২০]

---

১৬. ইবনে আবদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৩-৬৩৪; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৫; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৮।

১৭. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৪; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৪৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৯।

১৮. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৯।

১৯. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৪০৯-৫০০; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬-৪৫৮।

২০. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৪০৯।

www.amarboi.org

**(আট)** শিশু প্রতিপালনকারী ও অভিভাবকের দূরবর্তী বা স্থান পরিবর্তনের কোনো সফর না করা।

## পুরুষদের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ শর্তসমূহ

**(ক)** যার লালন-পালন করা হবে সে যদি এমন হয় যাকে দেখলে কামভাব জাগ্রত হয় তাহলে লালন-পালনকারী তার মাহরাম হওয়া। সুতরাং চাচাত ভাইয়ের জন্য তাকে লালন-পালন করার অধিকার নেই। কেননা সে তার মাহরাম নয়। তাছাড়া তার জন্য তাকে বিবাহ করা বৈধ। সুতরাং তার চাচাত বোনের ব্যাপারে তার ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে সে মেয়ে যদি ছোট হয় ও কামভাবসম্পন্ন না হয় এবং তার ওপর কোনো আশঙ্কা না থাকে তাহলে চাচাতো ভাইয়ের জন্য তাকে প্রতিপালন করার অধিকার রহিত হবে না।

যদি কামভাবসম্পন্না মেয়ের চাচাতো ভাই ছাড়া অন্য কেউ লালন-পালন করার মতো না থাকে তাহলে তাকে কোনো বিশ্বস্ত মহিলার নিকট রাখা হবে। তাকে বাছাই করবে উক্ত মেয়ের চাচাতো ভাই। এটি শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের অভিমত। আর হানাফীদের অভিমত হলো, বিশ্বস্ত মহিলাকে কাজী (বিচারক) নির্বাচন করবে। কেননা তার চাচাতো ভাই তাকে লালন-পালনের উপযুক্ত নয়। আর উপযুক্ত হলে কাজী প্রতিপালিতকে তত্ত্বাবধানের জন্য তার কাছে রেখে দেবে। আর মালেকীদের মতে গায়র মাহরমের জন্য তাকে লালন পালন করার অধিকার নেই।

আর চাচাতো ভাইয়ের যদি কোনো কন্যা সন্তান থাকে, যার কারণে সে লজ্জাবোধ করবে, এমতাবস্থায় শাফেয়ী ইমামগণ তার চাচাতো বোনকে তার মেয়ের সাথে রাখার অনুমতি দিয়েছেন।[২১]

**(খ)** মালেকী ফুকাহায়ে কেরাম পুরুষদের লালন-পালনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তার নিকট এমন কোনো মহিলা বিদ্যমান থাকার শর্তারোপ করেন, যে মহিলা সুন্দরভাবে শিশুর পরিচর্যা করতে পারে। যেমন- স্ত্রী অথবা বাদী অথবা পারিশ্রমিক দিয়ে শিশু পরিচর্যাকারিণী রাখা অথবা স্বেচ্ছাসেবী কোনো মহিলা থাকা।[২২]

## নারীদের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ শর্তাবলি

**প্রথমত :** শিশুর অপরিচিত কোনো পুরুষের স্ত্রী না হওয়া। কেননা সে স্বামীর অধিকার পূর্ণ করার মধ্যে ব্যস্ত থাকে। আর মহানবী স. বলেছেন- أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي 'তুমি বিবাহ না করা পর্যন্ত তার প্রতিপালনের ব্যাপারে অধিকতর হকদার'।[২৩]

---

২১. আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ৪৩; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৪; কাশশাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৯৭।

২২. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৪০৯।

২৩. আহমাদ, খ. ২, পৃ. ১৮২; আল-হাকেম, খ. ২, পৃ. ২০৭; হাদীসের রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.। হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবীও তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

www.amarboi.org

সুতরাং ঐ মহিলার জন্য শিশুকে লালন-পালন করার অধিকার নেই, যে মহিলা প্রতিপালিত শিশুর অপরিচিত কাউকে বিবাহ করেছে। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে বিবাহবন্ধন সম্পাদন হওয়ার পরই তার লালন-পালনের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর মালেকী আলেমগণের মতে স্বামী-স্ত্রী মিলনের সাথে সাথে তার লালন-পালনের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। মুগনী গ্রন্থে ইবনে কুদামা যা বলেছেন তার মর্ম এটাই।[২৪]

মালেকী ফকীহগণ কয়েকটি অবস্থা ব্যতিক্রম রেখেছেন, যে সব অবস্থায় প্রতিপালনকারিণী মহিলা শিশুর অপরিচিতের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও লালন-পালনের ক্ষেত্রে তার অধিকার বাতিল হবে না, সেগুলি হলো :

**(ক)** তার স্বামীর সাথে মিলন করার কারণে তারপর কে তার প্রতিপালনের হকদার হবে তা জানা থাকা। এবং তার লালন-পালনের হক রহিত হওয়ার ব্যাপারে সম্যক অবগত থাকা। তার লালন-পালনের দায়িত্ব রহিত হয়ে গেছে তা জানার পর বিনা উজরে এক বছর চুপ থাকা। এমতাবস্থায় তার লালন-পালন করার দায়িত্ব রহিত হবে না।

**(খ)** শিশু লালন-পালনের হকদার ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালনের জন্য গ্রহণ না করা। যেমন- মাতা অথবা অন্য কোনো হকদারকে গ্রহণ না করা। এমতাবস্থায় স্বামী সহবাসের কারণে তার অধিকার রহিত হবে না।

**(গ)** স্তন্যদানকারিণী কোনো মহিলা শিশুকে দুধপান করানোর জন্য গ্রহণ না করা, যখন তার মাতা অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দরুন তার প্রতিপালনের দায়িত্ব অন্যের দিকে স্থানান্তরিত হয়।

**(ঘ)** যে প্রতিপালনকারিণী মহিলার সাথে স্বামী সহবাস করেছে সে ছাড়া শিশুর জন্য অন্য কোনো লালনপালনকারী না থাকা। অথবা তার জন্য অন্য লালন-পালনকারী আছে, কিন্তু সে নিরাপদ নয়। কিংবা সে শিশু প্রতিপালন করতে অক্ষম।

**(ঙ)** শিশুর ঐ প্রতিপালনকারিণী যে শিশুর অপরিচিতকে বিবাহ করেছে সে শিশুর লালন-পালনের জন্য ওসিয়তকৃত না হওয়া। এ শর্তটি মালেকীগণের এক মত অনুযায়ী। তাদের অন্য একটি মত হলো, তারা এই শর্তারোপ করেন না।[২৫]

---

২৪. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৪০৯-৪১০; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৯; আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ৪২; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৪৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৯; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১৯; আল-মারদাবী প্রণীত আল-ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ৪২৫।

২৫. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৪০৯; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৫৬।

www.amarboi.org

এটি তখন প্রযোজ্য, যখন প্রতিপালনকারিণী মহিলা শিশুর অপরিচিত কাউকে বিবাহ করবে। আর যদি সে শিশুর রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয় কাউকে বিবাহ করে যেমন : দাদী শিশুর দাদাকে বিবাহ করে অথবা নিকটাত্মীয় কাউকে বিবাহ করে- যদিও সে শিশুর গাইরে মাহরাম হয় যেমন : শিশুর চাচাতো ভাইকে যদি বিবাহ করে- তাহলে এমতাবস্থায় তার লালন-পালনের অধিকার রহিত হবে না। এটি জমহুর আলিমগণের অভিমত। এদের মধ্যে রয়েছেন, শাফেয়ী, মালেকী ও বিশুদ্ধ মতে হাম্বলী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম। তাদের বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মত হলো, স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তার লালন-পালনের অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

**লালন-পালনের স্থান এবং প্রতিপালনকারী অথবা অভিভাবক পরিবর্তন করার বিধান**

শিশুর লালন-পালনের স্থান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ বাসস্থান, যেখানে শিশুর পিতা বসবাস করে যখন প্রতিপালনকারী মহিলা তার মা হয়। আর সে তার পিতার স্ত্রী থাকে। অথবা তালাকে রাজয়ী অথবা বায়েন এর ইদ্দতে থাকে। এটি এই কারণে যে, স্ত্রী স্বামীর সাথে অনুগমনে বাধ্য এবং তিনি যেখানে অবস্থান করেন সেখানে অবস্থান করা তার জন্য অপরিহার্য। আর ইদ্দত পালনরতা মহিলার জন্য আবশ্যক হলো ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাসস্থানে অবস্থান করা। তাই সে সন্তানসহ অবস্থান করুক অথবা সন্তান ছাড়া অবস্থান করুক। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

"তোমরা নারীদেরকে তাদের গৃহ হতে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়। তবে তারা যদি সুস্পষ্ট কোনো অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তাহলে ভিন্ন কথা।"[২৬]

যখন মায়ের ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে তখন শিশুর লালন-পালনের স্থান হবে ঐ শহর যেখানে তার পিতা অথবা অভিভাবক অবস্থান করে। একই বিধান প্রতিপালনকারিণী মহিলা মা ছাড়া অন্য কেউ হওয়ার ক্ষেত্রেও। কেননা পিতার জন্য তার সন্তানকে দেখাশুনা করা এবং তার পরিচর্যার পর্যবেক্ষণ করার অধিকার রয়েছে। আর এটি শিশুর প্রতিপালনকারিণী যখন শিশুর পিতা অথবা তার অভিভাবকের শহরে অবস্থান করবে তখনই সম্ভব। সকল মাযহাব অনুসারীদের অভিমত তাই। হানাফী ফুকাহায়ে কেরামগণ এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মাযহাবের আলোচনাও এরই প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।[২৭]

---

২৬. সূরা তালাক, ১।

২৭. আল বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ৪৪; আল-মাওয়াক বিহামিশিল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২১৫-২১৭; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৭; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৫০০; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১৮-৬১৯।

www.amarboi.org

আর শিশু প্রতিপালনকারী অথবা তার অভিভাবকের স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদের জমহুর ফুকাহায়ে কেরামগণ প্রতিপালনকারিণী অথবা অভিভাবকের বাসস্থান পরিবর্তনের জন্য সফর এবং কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য সফর যেমন : প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর এবং ব্যবসার জন্য সফরের মধ্যে পার্থক্য করেন।

সুতরাং প্রতিপালনকারিণী অথবা অভিভাবকের কেউ যদি স্থান পরিবর্তন করার জন্য সফর করে তাহলে মায়ের লালন-পালন করার অধিকার রহিত হয়ে যাবে এবং তারপর যে লালন-পালনের ব্যাপারে অধিকতর যোগ্য তার ওপর লালন-পালন করার অধিকার ন্যস্ত হবে। তবে শর্ত হলো, তাদের সফরের পথ নিরাপদ থাকতে হবে। সাথে সাথে যে স্থানে স্থান পরিবর্তন করে যাওয়া হবে তাও শিশুর জন্য নিরাপদ থাকতে হবে। শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে পিতা অধিকতর হকদার তাই তিনি মুকীম হোন আর মুসাফির হোন। কেননা পিতা সাধারণত শিশুর আদব-আখলাক ও তার বংশপরম্পরতা রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং সন্তান যখন পিতার শহরে না থাকে তখন সে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু হাম্বলীগণ পিতার অগ্রাধিকারপ্রাপ্তিকে শর্তযুক্ত করেছেন এই বলে যে, যখন তিনি মায়ের ক্ষতির ইচ্ছা না করেন ও তার সন্তানকে তার থেকে ছিনিয়ে না আনেন। সুতরাং যখন তিনি এ জাতীয় অনিষ্ট চিন্তা করবেন তখন তার ওপর প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত করা হবে না; বরং সন্তানের কল্যাণে কাজ করা হবে। যদি মাতা শিশুর পিতার সাথে সফর করে তাহলে সন্তান তার প্রতিপালনাধীন থাকবে।

এটি হলো জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত। কিন্তু তারা মতানৈক্য করেছেন সফরের দূরত্বের পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে। মালেকীগণ এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন ছয় বারীদ[২৮] অথবা ততোধিক। তাদের অন্য একটি মত হল সফরের দূরত্বের পরিমাণ হলো দুই বারীদ। আর শাফেয়ীগণের বিশুদ্ধতম মত হলো, তারা দীর্ঘ সময়ের সফর ও স্বল্প সময়ের সফরের মধ্যে পার্থক্য করেন না। হাম্বলী ফুকাহায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মাযহাব হলো, তারা সফরের দূরত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করেন কসরের নামাযের দূরত্ব দ্বারা। এটি শাফেয়ীগণেরও একটি মত। ইমাম আহমদ র. হতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, যখন দুই শহরের মধ্যে এতটুকু নৈকট্য থাকে যে, শিশু ও প্রতিপালনকারীকে পিতা প্রত্যেক দিন দেখতে পারেন

---

২৮. দুই মনযিলের মধ্যেবর্তী দূরত্ব। তাতে কত মাইল সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রায় বারো মাইলের দূরত্বে এক বারীদ হয়।

www.amarboi.org

এবং তারাও তাকে দেখতে পারে তাহলে এমতাবস্থায় মা সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বে বহাল থাকবে।

আর সফর যদি কোনো প্রয়োজনে হয় যেমন- ব্যবসা ও প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাহলে সন্তান পিতা-মাতার মধ্যে যে মুকীম তার সাথে থাকবে, মুসাফির ফিরে না আসা পর্যন্ত। তাই সফর দীর্ঘ সময়ের জন্য হোক অথবা স্বল্প সময়ের জন্য হোক। এমনিভাবে সফর যদি স্থান পরিবর্তন করার জন্য হয় তাহলে সফরকৃত স্থান যদি নিরাপদ না থাকে তাহলে সন্তান মুকীমের সাথে থাকবে।

যদি মাতা ও পিতা পরস্পরে মতানৈক্য করে, পিতা বলে : আমার সফর দীর্ঘদিনের অবস্থান করার জন্য। আর মাতা বলে, আপনার সফর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। তাহলে পিতার কথা ধর্তব্য হবে তার শপথের সাথে। এটি শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের অভিমত। শাফেয়ীগণ একটু বাড়িয়ে বলেন, মাতা যদি মুকীম হয় আর শিশুও তার মায়ের সাথে অবস্থান করার স্থানে তার জন্য অপকারী অথবা তার কল্যাণের অন্তরায় কিছু থাকে যেমন : শিশুর জন্য কুরআন শিক্ষা করার পরিবেশ না থাকা অথবা মার এমন কোনো পেশা অবলম্বন করা, যেখানে সন্তানের জন্য পিতার স্থলাভিষিক্ত অন্য কেউ না থাকে, তাহলে আল্লামা যারকাশী র. এর মত অনুযায়ী পিতাকে তার সন্তানসহ সফর করার অবকাশ দেয়া হবে। বিশেষ করে সন্তান যদি তাকে গ্রহণ করে।

আর মালেকীগণের মতে যদি প্রতিপালনকারিণী অথবা অভিভাবকের কোনো একজন ব্যবসা অথবা আপনজনদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সফর করে তাহলে মায়ের লালন-পালন করার অধিকার রহিত হবে না। মাতা যদি সফর করে তাহলে সে তার সন্তানকে সাথে করে নিয়ে নিবে। আর পিতা যদি সফর করে তাহলে সন্তান মায়ের সাথেই থাকবে। তাই সফরের দূরত্ব ছয় বারীদ বা তার কম বেশি হোক না কেন। এটি হচ্ছে আজহূরী ও আবদুল বাকীর অভিমত। আল্লামা ইবরাহীম আল-লাক্কানী, আল-খারশী ও আল-আদাবী বলেন, মা যদি সফর করে তাহলে তার শিশু সন্তানকে সাথে নেবে না। তবে সফর যদি এক বারীদ পরিমাণ নিকটে হয় তাহলে নিতে পারবে। আর যদি এরচেয়ে বেশি দূরত্ব হয় তাহলে নিতে পারবে না। যদিও তার লালন-পালনের অধিকার অবশিষ্ট থাকবে।[২৯]

হানাফীগণ বলেন, শিশুর প্রতিপালনকারিণী মা যে শিশুর পিতার বিবাহাধীন রয়েছে অথবা ইদ্দত পালনরতা আছে, তার জন্য আপন শিশু সন্তানকে নিয়ে অন্য শহরে যাওয়া জায়েয নেই। আর স্বামীর জন্য তাকে নিষেধ করার অধিকার

২৯. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫৩১-৫৩২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮-৪৫৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৫০০; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১৮-৬১৯; আল ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ৪২৭।

www.amarboi.org

রয়েছে। আর যে মহিলার ইদ্দত শেষ হয়ে গিয়েছে তার জন্য তার সন্তানকে নিয়ে অন্য শহরে যাওয়া নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহে জায়েয আছে :

**(এক)** যখন সে মহিলা নিকটবর্তী এমন কোনো শহরে যাবে যেখানে গিয়ে পিতার জন্য তার সন্তানকে দেখে দিনে দিনে ফিরে আসা সম্ভব। এই শর্তের সাথে যে, যেখানে সে যাবে সেই স্থানটি শিশুর বর্তমানে অবস্থানরত স্থানের চেয়ে নিম্নমানের না হতে হবে, যাতে শিশুর চরিত্র অপপ্রভাবে প্রভাবিত না হয়।

**(দুই)** নিম্নোক্ত শর্তাবলি পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে যখন সে দূরবর্তী শহরে যাবে :
**(ক)** মহিলা যে শহরে যাবে সেই শহরটি তার মাতৃভূমি হওয়া।

**(খ)** স্বামী তার সাথে এই শহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।
**(গ)** স্বামী মুসলমান অথবা জিম্মি হলে যে শহরে যাবে তা দারুল হারব (যুদ্ধের দেশ তথা যে দেশের সাথে যুদ্ধ অনুমোদিত) না হওয়া।

যখন উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া যাবে তখন এই মহিলার জন্য তার সন্তানকে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে যাওয়া জায়েয আছে। কেননা মূলত সফরের প্রতিবন্ধক হলো পিতা ও পুত্রের মধ্যকার বিচ্ছেদের ক্ষতি। আর পিতা এই ক্ষতিকে বরণ করে নিয়েছে যেহেতু তার সম্মতির আভা পাওয়া গিয়েছে। আর সেটি হলো, এই মহিলাকে এই শহরে বিবাহ করা। কেননা যে কোনো মহিলাকে তার শহরে বিবাহ করে সে একথা জেনেই করে যে, সে মহিলা এই শহরে অবস্থান করবে। আর সন্তান বিবাহেরই পরিণত ফল। সে যেহেতু এই শহরে বিবাহ করেছে সুতরাং সে যেন এই শহরে তার সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে সম্মত আছে। অতএব সে যেন সন্তানের সাথে তার বিচ্ছেদকে মেনে নিয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য মহিলার জন্য তার সন্তানকে নিয়ে এমন শহরে যাওয়া জায়েয নেই, যে শহরে তার সাথে তার স্বামীর বিবাহ সম্পাদিত হয় নাই। অথবা যেখানে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে; কিন্তু সেটি তার মাতৃভূমি নয়। কেননা স্বামীর পক্ষ থেকে তার সন্তানকে নিয়ে এই শহরে যাওয়ার সম্মতি পাওয়া যায়নি। ইমাম মুহাম্মদ র. তাঁর লিখিত 'আল-আসল গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন সে অনুযায়ী এই দু'টি শর্ত পাওয়া অপরিহার্য। আর ইমাম আবু ইউসুফ র. কেবলমাত্র বিবাহ বন্ধনের স্থানকে গণ্য করেছেন।

আর স্বামী যখন জিম্মি অথবা মুসলমান হবে তখন স্থানটি দারুল-হারব না হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে এ জন্য যে, এ কারণে শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কাফেরদের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে উঠে। উপর্যুক্ত আলোচনা তখনই প্রযোজ্য যখন শিশুর প্রতিপালকারী হবে তার মা। আর শিশুর লালনপালনকারী যদি তার মা ছাড়া অন্য কেউ হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন না থাকার কারণে তার জন্য শিশুকে নিয়ে পিতার অনুমতি ছাড়া কোনো স্থানেই যাওয়া জায়েয নাই।

www.amarboi.org

হানাফীগণ বলেন, মহিলাদের মধ্যে যার শিশুকে লালনপালন করার অধিকার রয়েছে, পিতা ও অভিভাবকের জন্য সন্তানকে তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া এবং মায়ের সম্মতি ছাড়া তাকে নিয়ে তার শহর হতে অন্যত্র সফর করার অধিকার নেই, যে পর্যন্ত মায়ের জন্য তার শিশুকে লালন-পালন করার অধিকার থাকে। স্বামীর অন্যত্র সফর করার দ্বারা লালন-পালনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার বাতিল হবে না। ভ্রমণকৃত স্থান দূরে হোক অথবা কাছে হোক।[৩০]

### লালন-পালন করার পারিশ্রমিক

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে প্রতিপালনকারিণীর জন্য শিশুকে লালন-পালন করার পারিশ্রমিক চাওয়ার অধিকার রয়েছে। চাই সে প্রতিপালনকারিণী মা অথবা অন্য কেউ হোক না কেন। কেননা শিশুকে লালন-পালন করা মায়ের উপর অবশ্য কর্তব্য নয়। যদি সে তার শিশুকে লালন-পালন করা হতে বিরত থাকে তাহলে তাকে লালন-পালন করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। আর লালন পালনের খরচ শিশুর সম্পদ হতে গ্রহণ করা হবে। আর যদি শিশুর মাল-সম্পদ না থাকে, তাহলে তার লালন-পালনের খরচ তার তত্ত্বাবধানকারীর ওপর ন্যস্ত হবে। হাম্বলীগণ বলেন, শিশুকে লালন-পালন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী মহিলা বিদ্যামন থাকা সত্ত্বেও শিশুর মা তাকে লালন-পালন করার কারণে ঐ পরিমাণ পারিশ্রমিক পাবে, যে পরিমাণ পারিশ্রমিক অনুরূপ কাজের জন্য অন্য মহিলাদের দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শাফেয়ীগণ বলেন, শিশুর মা ঐ পরিমাণ পারিশ্রমিক তখনই পাবে যখন শিশুকে প্রতিপালন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী কোনো মহিলা না পাওয়া যায়। অথবা স্বল্প পারিশ্রমিকে লালন-পালন করতে রাজি এমন কোনো মহিলা না পাওয়া যায়। সুতরাং স্বেচ্ছাসেবী কোনো মহিলা অথবা মায়ের পারিশ্রমিকের চেয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে রাজি এমন কোনো মহিলা যদি শিশু প্রতিপালনের জন্য পাওয়া যায় তাহলে মায়ের জন্য লালন-পালনের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, মায়ের লালন-পালনের অধিকার রহিত হবে না, যদি তিনি তার সমস্তরের মহিলার পারিশ্রমিকের সমপরিমাণ পারিশ্রমিক চান যদিও অপরিচিত কোনো মহিলা স্বেচ্ছাসেবী তাতে আগ্রহী হয় অথবা মায়ের পরিশ্রমিকের থেকে স্বল্প পারিশ্রমিকে লালন-পালন করতে কোনো মহিলা রাজী হয়। আবু যুরআ এরূপ গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন।[৩১]

---

৩০. আল বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ৪৪; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৪২-৬৪৩।

৩১. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৩৮, ৩৪৫ এবং খ. ৩, পৃ. ৪৫২; হাশিয়াতুশ-শিরওয়ানী, খ. ৮, পৃ. ৩৫৯; আল-জুমাল আলা শারহিল মানহাজ, খ. ৪, পৃ. ৫২০; হাশিয়াতুর রশীদী আলা নিহায়াতিল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৯৬-৪৯৮; নাইলুল মাআরিব, খ. ২, পৃ. ৩০৭।

www.amarboi.org

হানাফীগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, শিশুর প্রতিপালনকারিণী যখন শিশুর মা হবে এবং সে পিতার বিবাহাধীনে থাকবে অথবা তার পক্ষ থেকে রাজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরত থাকবে তখন সে শিশুকে প্রতিপালন করার জন্য কোনোরূপ পারিশ্রমিক নিতে পারবে না। তার ওপর শিশুকে প্রতিপালন করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক হওয়ার কারণে। কেননা এমতাবস্থায় পারিশ্রমিক নেয়া ঘুষের পর্যায়ভুক্ত হবে। বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনরত মহিলার বিধানও এক বর্ণনা মতে অনুরূপ।

প্রতিপালনকারিণী মহিলা যদি মা ছাড়া অন্য কেউ হয় অথবা মা হয় কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা এবং তার ইদ্দতও শেষ হয়ে গিয়েছে। অথবা এক রেওয়ায়েত মতে তালাকে বায়েনের ইদ্দত পালনরত থাকে এমতাবস্থায় শিশুর যদি সম্পদ থাকে তাহলে সেই সম্পদ থেকে মা লালন-পালনের পারিশ্রমিক পাবে। আর যদি শিশুর সম্পদ না থাকে তাহলে শিশুর পিতা অথবা তার অভিভাবক তথা তত্ত্বাবধানকারীর সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিক পাবে। একথা তখন প্রযোজ্য যখন কোনো স্বচ্ছাসেবী মহিলা না থাকে। সুতরাং লালন-পালনের জন্য যদি কোনো স্বেচ্ছাসেবী মহিলা পাওয়া যায় আর সে শিশুর গাইরে মাহরাম হয় তাহলে মাকে লালন-পালন করার জন্য তার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, যদিও মা এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক দাবি করে। তখন সে অন্য মহিলাদের অনুরূপ পারিশ্রমিক পাবে। আর স্বেচ্ছাসেবী মহিলা যদি শিশুর মাহরাম হয় তাহলে তার মাকে বলা হবে, হয়তো তুমি তাকে বিনা পারিশ্রমিকে লালন পালন করো, অথবা এই স্বেচ্ছাসেবী মহিলার নিকট সোপর্দ করো; কিন্তু এটি দু'টি শর্তের সাথে শর্তযুক্ত :

**(ক)** পিতা অসচ্ছল হওয়া । চাই সন্তানের সম্পদ থাকুক আথবা না থাকুক।

**(খ)** সন্তানের মাল সম্পদ থাকার সাথে সাথে পিতার সচ্ছল হওয়া, শিশুর সম্পদ হেফাজত করার জন্য। শিশুকে স্বেচ্ছাসেবী মহিলার নিকট অর্পণ করার অর্থ তার মালে প্রবৃদ্ধি করা। কেননা এর কারণে মূলত শিশুর সম্পদ ব্যয়মুক্ত থাকবে। পিতা যদি ধনী হয় আর শিশুর সম্পদ না থাকে তাহলে শিশুর প্রতি লক্ষ্য রেখে মাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, যদিও তিনি পারিশ্রমিক দাবি করেন।[৩২]

মালেকীগণ বলেন, শিশুকে লালন-পালন করার প্রতিদানে কোনো পারিশ্রমিক নেই। ইমাম মালেক র. এর পরবর্তী উক্তি তাই। ইবনে কাসেম র. এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেক র. এর প্রথম উক্তি হলো, শিশুর সম্পদ হতে প্রতিপালনকারীর ওপর ব্যয় করা হবে। তিনি মিনাহুল জালীল নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, এ মতভেদ তখনকার জন্য প্রযোজ্য, প্রতিপালনকারিণী মহিলা যখন ধনী

---

৩২. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৬-৬৩৭-৬৩৮।

www.amarboi.org

হবে। পক্ষান্তরে প্রতিপালনকারিণী মহিলা যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার দরিদ্রতার কারণে শিশুর সম্পদ হতে তার জন্য ব্যয় করা হবে, প্রতিপালন করার জন্য নয়।[৩৩]

## প্রতিপালনের আবাসস্থলের ভাড়া

প্রতিপালনকারিণী যখন শিশুর পিতার বাসস্থান ছাড়া অন্যত্র অবস্থান করে তখন বাসস্থানের ভাড়া দেওয়া ওয়াজিব কি-না, এ ব্যাপারে হানাফী উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতিপালনকারিণীর বাসস্থানের দায়িত্ব শিশুর পিতার ওপর। আল্লামা নাজমুল আইম্মাহ এমনটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হাফসের অভিমতও তাই। যে মহিলার ওপর সন্তানকে লালন-পালন করার দায়িত্ব অথচ সন্তানকে নিয়ে অবস্থান করার মতো বাসস্থান তার নেই, তার সম্পর্কে ইমাম আবু হাফস র.-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, প্রতিপালনকারিণী মহিলা ও শিশুর বাসস্থানের দায়িত্ব পিতার ওপর। আল্লামা রামলী বলেন, শিশু ও শিশুর প্রতিপালনকারিণীর বাসস্থানের দায়িত্ব শিশুর খোরপোষ দেয়া যার দায়িত্ব তার উপরই ন্যস্ত।

হানাফী মাযহাবের অন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, শিশুর যদি সম্পদ থাকে তাহলে প্রতিপালনকরিণীর বাসস্থানের ভাড়া শিশুর সম্পদ হতে আদায় করা হবে। অন্যথায় বাসস্থানের ভাড়ার দায়িত্ব শিশুর তত্ত্বাবধানকারীর ওপর অর্পিত হবে।

মালেকী মাযহাবের ফাতওয়াপ্রাপ্ত মত হলো, শিশু ও তার প্রতিপালনকারিণীর বাসস্থানের দায়িত্ব শিশুর পিতার ওপর। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বাসস্থানকে ব্যয়ভারের মধ্যে গণ্য করেছেন। সুতরাং যার ওপর প্রতিপালনকারিণীর ব্যয়ভার ওয়াজিব হবে তার উপরই তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও ওয়াজিব হবে।[৩৪]

## লালন পালনের শেষ সময়সীমা

এটি স্থিরীকৃত অভিমত যে, সামষ্টিকভাবে শিশুদের লালন-পালনে পুরুষদের তুলনায় মহিলাগণই অধিকতর হকদার। শিশুদের লালন-পালন শুরু হয় জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচেছদের অবস্থায় নারীগণ শিশুদের লালন-পালনের শেষ সময়সীমা নিয়ে মাযহাবসমূহের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, ছেলে শিশুর ওপর নারীদের লালন-পালনের দায়িত্ব ততদিন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে যতদিন পর্যন্ত সে নারীদের দেখাশুনা ও যত্ন গ্রহণ করা হতে অমুখাপেক্ষী না হয়। নারীদের যত্ন গ্রহণ করা হতে তাকে অমুখাপেক্ষী তখনই ধরা হবে যখন সে একাকী আহার করতে পারবে, একাকী

---

৩৩. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৪১০; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।
৩৪. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৬০।

www.amarboi.org

পান করতে পারবে এবং একাকী কাপড় পরিধান করতে পারবে। এর সময়সীমা হলো সাত বছর। এর উপরই ফতওয়া। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরা এই বয়সে নারীদের লালন-পালন থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, অমুখাপেক্ষী হবার বয়স হলো নয় বছর।

আর মেয়ে শিশুর ওপর লালন-পালনের দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকবে সে ঋতুস্রাব, স্বপ্নদোষ অথবা নির্ধারিত বয়সের বিচারে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত। এটি জাহিরী রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী লালন-পালনকারিণী যদি মা অথবা দাদী হয় তখন প্রযোজ্য। আর মা ও দাদী ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে বিধান হলো, তারা মেয়ে শিশুকে লালন-পালনের অধিকারী থাকবে সে কামভাবসম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে নয় বছর। এর উপরই ফতওয়া।

ইমাম মুহাম্মদ র. হতে বর্ণিত আছে যে, শিশুর প্রতিপালনে মা ও দাদীর হুকুম অন্যদের হুকুমের মতোই। সুতরাং শিশুর ওপর তার মা অথবা অন্য যে কারো লালন-পালনের শেষ সময়সীমা হবে সে প্রাপ্তবয়স্কের সীমায় উপনীত হওয়ার মাধ্যমে, যার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে নয় বছর। আর ফিতনা-ফাসাদ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ফতোয়া হলো ইমাম মুহাম্মদ র. এর বর্ণনার ওপর।

মহিলাদের লালন-পালনের সময়কাল যখন শেষ হয়ে যাবে তখন শিশু ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক তাকে (পিতা অথবা মাতা অথবা অন্য যে কোনো একজনকে গ্রহণ করার) স্বাধীনতা দেওয়া হবে না; বরং তাকে তার পিতার কাছে সোপর্দ করা হবে। কেননা সে তার বুদ্ধির অপরিপক্বতার কারণে এমন একজনকে পছন্দ করবে যার নিকট খেলাধুলার সুযোগ রয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামগণ হতে এমন কোনো উক্তি বর্ণিত নাই যে, তাঁরা স্বাধীনতা দিয়েছেন। শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার ওপর পিতার কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। অতঃপর ছেলে শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে, নিজের সিদ্ধান্তে মুখাপেক্ষীহীন হবে এবং নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন তাকে তার অভিভাবকের সাথে অথবা প্রতিপালনকারীর সাথে অথবা একাকী থাকার মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে মেয়ে শিশুও যদি অকুমারী হয় অথবা কুমারী কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা হয় এবং তার নিজস্ব মতামত থাকে, তাহলে ছেলে শিশুর মতো তাকেও স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আর যদি ছেলে শিশু তথা বালক অথবা অকুমারী মেয়ে অথবা কুমারী কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা বেছে নেওয়ার দরুন অনিরাপদ হয় তাহলে তাদের ওপর পিতার অভিভাবকত্ব বহাল থাকবে। যেমনিভাবে কম বয়স্ক কুমারীর ওপর পিতার অভিভাবকত্ব বহাল থাকে। অনুরূপভাবে নির্বোধ শিশুর ওপর পিতার কতৃত্ব বহাল থাকবে, যে পর্যন্ত না সে বোধসম্পন্ন হয়।[৩৫]

---

৩৫. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৪১-৬৪২; আল বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ৪২-৪৩।



www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ছেলে শিশুর ওপর নারীদের লালন-পালনের অধিকার বাকি থাকবে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে তার লালন-পালনের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। যদিও সে অসুস্থ অথবা পাগল হোক না কেন। আর বালিকাকে লালন-পালনের অধিকার তার বিবাহ এবং তার সাথে তার স্বামীর সহবাস হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকবে।[৩৬]

মালেকী মাযহাবপন্থী ইবনে শাবান বলেন, আমি ছেলে শিশুর ওপর লালন পালনকে সে সুস্থ, বল ও বোধসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত করি। শাফেয়ীগণের মতে শিশুর উপর লালন-পালন চলমান থাকবে সে ভাল মন্দ পরখ করার বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত। তাই শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। সুতরাং যখন সে ভালো মন্দ পরখ করার বয়সে উপনীত হবে -এর পরিমাণ তারা নির্ধারণ করেছেন সাত বছর বা আট বছর, তখন তাকে তার মাতা অথবা পিতার যে কোনো একজনকে গ্রহণ করার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হবে। অতঃপর যদি সে তাদের কোনো একজনকে গ্রহণ করে তাহলে তাকে তার নিকট সোপর্দ করা হবে। আর যখন সে তার মত পরিবর্তন করে দ্বিতীয়জনকে গ্রহণ করবে তখন তাকে তার নিকট সোপর্দ করা হবে। এমনিভাবে যখনই তার ইচ্ছা পরিবর্তিত হবে তখনই এভাবে তা কার্যকর করা হবে। কেননা অনেক সময় লালন-পালনকারীর অবস্থা পরিবর্তিত হয়। আবার শিশুর সিদ্ধান্তও অনেক সময় প্রতিপালনকারীর ব্যাপারে বদলে যায়। তবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন যদি ঘন ঘন হয়, যার ফলে অনুমিত হয় যে, সে যথাযথভাবে পরখ করতে পারছে না, তাহলে তাকে তার মায়ের নিকট অর্পণ করা হবে এবং তার সিদ্ধান্ত নিরর্থক বলে পরিগণিত হবে।

আর শিশু যদি মাতা পিতার কোনো একজনকে নির্বাচন করে গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে তাহলে তাকে মায়ের নিকট সোপর্দ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা সে তার সন্তানের প্রতি পিতার তুলনায় অধিক স্নেহশীল। কেউ কেউ বলেন, এমতাবস্থায় তাদের দু'জনের মাঝে লটারি করা হবে। আর যদি তাদের দু'জনকে একসাথে গ্রহণ করে তাহলেও লটারি করা হবে। শিশু মা-বাবার যাকে গ্রহণ করবে সে যদি তার জিম্মাদারী নিতে অস্বীকার করে তাহলে তার জিম্মাদার হবে অন্যজন। মা বাবার যাকে শিশু পছন্দ করেছিল সে যদি জিম্মাদারী নিতে অস্বীকার করা হতে ফিরে আসে তাহলে শিশুকে পুনরায় তাদের যে কোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হবে। যদি মাতা-পিতা উভয়েই শিশুর জিম্মাদারী নেয়া থেকে বিরত থাকে আর তাদের পর যিম্মাদারী নেয়ার জন্য দু'জন হকদার থাকে যেমন : দাদা দাদী। তাহলে তাদের যে কোনো একজনকে

---

৩৬. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫২৬।

www.amarboi.org

বেছে নেওয়ার জন্য শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। অন্যথায় শিশুর জিম্মাদারী তার তত্ত্বাবধানকারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। আর তার অভিভাবকত্ব শিশুর উপর সে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এরপর যদি সে শিশু ছেলে হয় আর বালেগ হয়ে ভালো-মন্দ বুঝতে পারার বয়সে উপনীত হয় তাহলে সে তার জিম্মাদারের প্রতি মুখাপেক্ষী না হবার কারণে তার নিজের দায় দায়িত্ব তারই ওপর অর্পণ করা হবে। সুতরাং তখন তার মাতা-পিতা কারো নিকট অবস্থান করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। তবে উত্তম হলো সে তার মাতা পিতা থেকে পৃথক না হওয়া। যাতে সে তার মাতা-পিতার খেদমত এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারে।

আল্লামা মাওয়ারেদী বলেন, ছেলে শিশুর জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যে পুরুষ-শ্রেণীর সামঞ্জস্যতার কারণে পিতার নিকট অবস্থান করা উত্তম। অবশ্য সে যদি দাড়িবিহীন কিশোর হয় অথবা তার একাকিত্বের কারণে যদি তার উপর আশংকা হয় তাহলে তাকে পিতা মাতা হতে বিচ্ছেদ হওয়া থেকে বারণ করা হবে। এ উক্তিটি ইবনুস সাব্বাগ প্রণীত কিতাবুল ইদ্দতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছেলে শিশু যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় কিন্তু ভালো-মন্দ বুঝার মতো জ্ঞান না হয় তাহলে তার হুকুম শিশুর তাই। আল্লামা ইবনে কাজ্জ বলেন, শিশুর অবস্থা যদি এরূপ হয় তার মাল সম্পদ হেফাজত করতে না পারার কারণে, তাহলে তার হুকুম তাই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে যদি তার অবস্থা এমন হয় তাহলে এক্ষেত্রে মত হলে, তার লালন-পালন অবস্থা বহাল থাকবে তার ক্রোড় উঠে না যাওয়া পর্যন্ত। এক্ষেত্রে মাযহাব হলো সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করবে।

শিশুটি যদি মেয়ে হয় আর সে ভালো-মন্দ বুঝার বয়সে উপনীত হয় তাহলে উত্তম হলো, সে তার মাতা-পিতার যে কোনো একজনের নিকট থাকবে বিবাহ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এটি তখন প্রযোজ্য যখন তার মাতা পিতার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আর তাদের মধ্যে যদি বিবাহবন্ধন অটুট থাকে তাহলে সে উভয়ের কাছে অবস্থান করবে। কেননা এটি অপবাদ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম মাধ্যম। আর যদি কোনোরূপ সংশয় ও অনিশ্চয়তা না থাকে তাহলে তার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকার অধিকার রয়েছে। আর তার অবস্থানের জায়গায় যদি কোনোরূপ অনিশ্চয়তা ও সংশয় থাকে, তাহলে তার মায়ের দায়িত্ব হলো তাকে তার সাথে রাখা। অনুরূপভাবে স্বগোত্রীয় অভিভাবকের জন্যও তাকে তার সাথে রাখার অধিকার রয়েছে, যদি সে তার মাহরাম হয়। যদি সে তার মাহরাম না হয় তাহলে তাকে যে কোনো উপযুক্ত স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করবে এবং তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে বংশকে অপমান থেকে রক্ষা করা জন্য।

www.amarboi.org

আর প্রতিপালিত বালিকা মেয়ে যদি প্রাপ্তবয়স্কা হয় কিন্তু বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা ছেলের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পাগল ও নির্বোধ শিশুকে তার মাতা পিতার কাউকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে না; বরং তার ওপর তার মায়ের প্রতিপালন স্থায়ী থাকবে সুষ্ঠু জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত।[৩৭]

ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে হাম্বলীগণের মাযহাব হলো, সে তার সপ্তম বর্ষে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি-পালনকারীর নিকট অবস্থান করবে। এরপর যদি তার পিতা-মাতা এ কথার ওপর একমত হয় যে, সে তাদের কোনো একজনের নিকট থাকবে তাহলে তা জায়েয হবে। কেননা তাকে প্রতিপালন করার অধিকার তাদের উভয়ের রয়েছে। আর মাতা-পিতা যদি তার প্রতিপালন নিয়ে বিবাদে অবতীর্ণ হয় তাহলে বিচারক শিশুকে তার মাতা-পিতার যে কোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেবে। সুতরাং এরপর সে যাকে বাছাই করবে তার সাথে অবস্থান করবে। এভাবে হযরত উমর রা.ফায়সালা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী রা. ও আলী রা. এটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রা.বলেন-

جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ

"জনৈক মহিলা মহানবী স. এর কাছে এসে বলল, আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায় অথচ সে আমাকে আবু ইনাবার কূপ থেকে পানি পান করিয়েছে এবং আমার উপকার সাধন করেছে। তখন নবী কারীম স. (শিশুকে) বললেন, এই হলো তোমার পিতা এবং এই হলো তোমার মাতা। সুতরাং তাদের দু'জনের যার হাত ইচ্ছা তুমি তার হাত ধর। তখন ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরল। অতঃপর সে মহিলা তাকে নিয়ে চলে গেল"।[৩৮]

তাছাড়া শিশু যখন তার মাতা-পিতার কোনো একজনের দিকে ধাবিত হয় তখন একথা ইঙ্গিত বহন করে যে, সে তার প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ও দয়ালু। আর শিশু প্রতিপালনকারীর পরিচর্যাধীন সাত বছর থাকা সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো, শরীয়তের নির্দেশ আরোপ হওয়ার এটিই প্রথম সময়। কেননা সাত বছর বয়সেই তাকে নামাজ পড়ার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে; এর পূর্বে নয়। তবে

---

৩৭. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২২০-২২২; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৪৯-৪৫১।

৩৮. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭০৮-৭০৯; হাকেম, খ. ৪, পৃ. ৯৭; আল-হাকেম ও আল্লামা যাহাবী এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

www.amarboi.org

শিশুর মাতা এর ব্যতিক্রম। কেননা তাকে শৈশবকালীন প্রতিপালনে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কেননা তিনি আপন শিশুর পরিচর্যা ও লালন-পালন এবং তার প্রয়োজন সম্পর্কে অধিকতর অবগত।

আল্লামা ইবনে আকীল বলেন, শিশুকে তার মাতা-পিতার যে কোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা তখনই দেওয়া হবে যখন সে ফিতনা-ফাসাদ হতে নিরাপদ থাকবে। সুতরাং যদি জানা যায় যে, সে তাদের এমন একজনকে গ্রহণ করছে যার কাছে থেকে তার পক্ষে অন্যায় করা সম্ভব হয়। আর অন্যজনকে অপছন্দ করছে তাকে নম্রতা, সভ্যতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে বলে। তাহলে তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা হবে না। কেননা এটি তার জন্য ধ্বংস ও বিনাশের কারণ।

আর ছেলে শিশু যাকে পছন্দ করবে তার কাছে থাকবে। এরপর যদি সে তার ইচ্ছা পরিবর্তন করে অন্যজনকে পছন্দ করে তাহলে তাকে তার কাছে হস্তান্তর করা হবে। এরপর যদি সে পুনরায় প্রথমজনকে পছন্দ করে তাহলে আবার তাকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে যতবার তার ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটবে ততবারই তদনুযায়ী আমল করা হবে। কেননা এটি হচ্ছে একটি কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাধিকার। তাছাড়া সে একবার একজনকে ভালো মনে করে আবার অন্য সময় তাকে পছন্দ করে না। সুতরাং সে যাকে ভালো মনে করবে তাকেই তার অনুগামী করা হবে। তবে যদি সে তাদের কাউকে পছন্দ না করে অথবা উভয়কে একসাথে পছন্দ করে তাহলে তাদের মধ্যে লটারি করা হবে। কেননা তদের একজনের ওপর অন্যজনের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব নেই। এরপর যদি সে লটারিতে যার নাম আসে তাকে ছাড়া অন্যজনকে গ্রহণ করে তাহলে তাকে তার কাছে সোপর্দ করা হবে। যদি তার পিতা-মাতার কোনো একজন লালন-পালন করার যোগ্য না হয়, তাহলে তাকে পিতা-মাাতার কোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। কেননা যে লালন-পালন করার যোগ্য নয় তার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। শিশু যদি তার পিতাকে বাছাই করে নেয় এরপর তার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে তার মায়ের নিকট প্রত্যার্পণ করা হবে। কেননা এখন তার এমন একজন জিম্মাদার প্রয়োজন, যে তাকে দেখাশুনা করবে শিশুর মতো। আর তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তার কথার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

মেয়ে শিশু যখন সাত বছরে উপনীত হয় তখন মা-বাবার যে কোনো একজনকে বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে না; বরং সে আবশ্যকীয়ভাবে বালেগা হওয়ার পূর্ব পযন্ত পিতার কাছে থাকবে। অনুরূপভাবে বালেগা হওয়ার পরও বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত পিতার নিকট তার তত্ত্বাবধানে থাকবে, যদিও তার মাতা কোনোরূপ পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে তার লালন-পালন করতে

www.amarboi.org

আগ্রহী হয়। কেননা লালন-পালন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। আর পিতাই রক্ষাণাবেক্ষণ করতে অধিকতর সক্ষম। তাছাড়া তার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হবে মূলত তার পিতার নিকট। অতএব তার জন্য জরুরী হলো, পিতার তত্ত্বাবধানে থাকা; যেন সে তার ওপর সর্বপ্রকার গোলযোগ ও অন্যায় সংঘটিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। কেননা বিভিন্ন সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু সাধারণত মেয়েরা হয়ে থাকে।

নির্বোধ শিশু যদিও সে মেয়ে হয় তবুও সে তার মার নিকট থাকবে বালেগা হওয়ার পরও। কেননা সে এমন একজনের প্রতি মুখাপেক্ষী, যে তার সেবা-যত্ন করবে এবং তার কাজকর্ম আঞ্জাম দেবে। আর মহিলারাই এ ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।[৩৯]

**শিশুকে পরিদর্শন করা**

শিশুর পিতা-মাতা যখন তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য তার সন্তানকে পরিদর্শন করার অধিকার রয়েছে। এটি ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত। কিন্তু কোনো কোনো বিশ্লেষণে তারা মতবিরোধ করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের অভিমত হলো, শিশু যদি মেয়ে হয় তাহলে সে তার লালনপালনকারীর নিকট থাকবে। মাতা হোক কিংবা পিতা দিনে হোক কিংবা রাতে। কেননা তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া এবং শিষ্টাচার শিখানো এগুলি গৃহের অভ্যন্তরে হয়ে থাকে। আর তাকে নিয়ে বাইরে বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর মাতা-পিতার যে কোনো একজনের নিটক থাকার সময় সে অন্যজনকে তার সন্তান পরিদর্শনে বাধা দিতে পারবে না। কেননা তা থেকে বাধা দেওয়া আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার নামান্তর। আর পরিদর্শনকারী যেন তার পরিদর্শনের সময় প্রলম্বিত না করে। কেননা বায়েন তালাকের কারণে শিশুর মা শিশুর পিতার জন্য অপরিচিত মহিলা হয়ে গিয়েছে। আর খোদাভীরুতা হলো, মা এমন সময় তার মেয়েকে পরিদর্শন করতে যাবে, যখন মেয়ের পিতা জীবিকা উপার্জনের জন্য বাইরে যাবে। সে সময়টাই সে মেয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য বেছে নেবে।

শিশুর মায়ের নতুন স্বামী যদি তার পিতাকে তার কাছে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি না দেয়, তাহলে তার মাতা তাকে তার পিতার নিকট পাঠিয়ে দেবে, যেন সে তাকে পরিদর্শন করতে পারে এবং তার খোঁজ-খবর নিতে পারে। আর পিতা যখন শিশুর মাকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দিতে কৃপণতা করবে, তখন সে তাকে তার মার নিকট বের হতে দেবে, যেন তার মা তাকে পরিদর্শন করতে পারে। পিতার জন্য তার মেয়েকে রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে তার মায়ের সাথে

৩৯. কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৫০১-৫০২-৫০৩; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১৪-৬১৬।

www.amarboi.org

সাক্ষাৎ করতে না দেওয়ার অধিকার রয়েছে, যখন তিনি কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা করেন। শাফেয়ীগণের মতে প্রতি দু'দিন অন্তর অথবা তার বেশি সময় পর একবার সাক্ষাৎ করার অনুমতি রয়েছে, প্রতিদিন নয়। আল্লামা মাওয়ারেদী বলেন, বাড়ী যদি কাছে হয় তাহলে প্রতিদিন সাক্ষাৎ হওয়াতে দোষের কিছু নেই। আর হাম্বলী মাযহাবমতে সাক্ষাৎলাভ প্রচলিত অভ্যাস ও রীতি-নীতি অনুযায়ী হবে। যেমন– এক সপ্তাহের মধ্যে একদিন।

আর শিশু যদি ছেলে হয় এবং সে যদি তার পিতার নিকট অবস্থান করে তাহলে দিন-রাত তার নিকটই থাকবে। আর পিতা তাকে তার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা দেবে না। কেননা সাক্ষাৎ করা হতে বাধাদান মাতা-পিতার প্রতিঅবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মাকে তার সন্তান পরিদর্শন করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। মায়ের তুলনায় সন্তান তার মাতার নিকট গমন করবে সেটাই উত্তম। কেননা তার কোনো পর্দা করতে হয় না। মাতা যদি তার সন্তানকে পরিদর্শন করতে চায় তাহলে পিতা তাকে বাধা দিবে না। কেননা, এতে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়। কিন্তু মায়ের জন্য সমীচীন হলো, তার সন্তানের নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান না করা। শিশুর পিতা যদি তার মাকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দিতে কৃপণতা প্রদর্শন করে তাহলে সে শিশুকে তার মায়ের নিকট প্রেরণ করবে। আর শিশুর পরিদর্শন হবে দুই বা ততোধিক দিনের মধ্যে মাত্র একবার। তবে মায়ের আবাসস্থল যদি নিকটে হয় তাহলে শিশু প্রতিদিন তার মাকে পরিদর্শন করতে যেতে পারবে। এতে কোনো বাধা নেই। এ মতটি পোষণ করেছেন শাফেয়ীগণের মধ্য থেকে আল্লামা মাওয়ারেদী। আর হাম্বলীগণ বলেন, শিশু পরিদর্শন হবে প্রতি সপ্তাহে মাত্র একবার। যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

শিশু যদি ছেলে হয় তাহলে সে তার মায়ের নিকট থাকবে রাতে, আর দিনে থাকবে পিতার নিকট। যেন তিনি তাকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারেন।

শিশু যদি অসুস্থ হয় এবং সে তার পিতার গৃহে থাকে তাহলে তার মা হবে তার সেবাশুশ্রূষার অধিকতর হকদার, যদি তার পিতা রাজি থাকে। এ হল শাফেয়ী মাযহাবের অভিমত। আর হাম্বলীদের মতে শিশুর সেবাশুশ্রূষা তার মায়ের গৃহে হবে। আর পিতা তাকে মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে যাবে। তবে নির্জনে সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকবে।

যদি পিতা-মাতার কোনো একজন অসুস্থ হয় আর শিশু অন্যের কাছে থাকে তাহলে অসুস্থ পিতা বা মাতার সেবাশুশ্রূষা ও পরিদর্শন করা থেকে তাকে বাধা দেয়া যাবে না। সন্তানটি ছেলে হোক অথবা মেয়েই হোক না কেন।

www.amarboi.org

মাতাযদি অসুস্থ হয় তাহলে পিতার জন্য অপরিহার্য হলো মেয়েকে তার মায়ের সেবাশুশ্রূষা করার সুযোগ দেওয়া যদি সে সুন্দরভাবে সেবাশুশ্রূষা করতে সক্ষম হয়। আর সন্তান যদি ছেলে হয় তাহলে পিতার জন্য তাকে সেবাশুশ্রূষা করার সুযোগ দেয়া অপরিহার্য নয়। যদিও সে ভালোভাবে সেবা করতে পারে। শাফেয়ীগণের অভিমত এটাই।[৪০]

হানাফীগণ বলেন, সন্তান যখন পিতা মাতার কোনো একজনের কাছে থাকবে তখন সে অন্যজনকে এই শিশুর পরিদর্শন ও দেখাশুনা করতে বাধা দিতে পারবে না, যদি সে পরিদর্শন করার ইচ্ছা করে। আর তাদের কাউকেই শিশুকে অন্যজনের নিকট প্রেরণ করতে বাধ্য করা যাবে না; বরং সে তাকে এমন স্থানে পাঠাবে যেখানে অন্যজনের জন্য তাকে দেখা সম্ভব হয়।[৪১]

মালেকীগণের মতে শিশু যদি মায়ের নিকট অবস্থান করে, তাহলে মা তাকে তার পিতার নিকট গমন করা হতে বাধা দিতে পারবে না, যেন পিতা তার দেখাশুনা করতে পারেন এবং শিক্ষা দিতে পারেন। এরপর রাতে সে তার মায়ের নিকট গিয়ে রাত্রি যাপন করবে। আর শিশু যদি পিতার নিকট থাকে তাহলে তার মায়ের জন্য তাকে প্রতিদিন নিজের বাড়ীতে এনে তাকে পর্যবেক্ষণ করা এবং তার অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়ার অধিকার রয়েছে। যদি শিশুর মা শিশুর অপরিচিত কারো সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহলে তার নতুন স্বামী এই সন্তানকে তার মায়ের ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না। যদি সে তাকে নিষেধ করে তাহলে মহিলার জন্য এই অধিকার আছে বলে ফয়সালা দেওয়া হবে।[৪২]

–আনোয়ার শাহ

---

৪০. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮; আল মুহায্যাব, খ. ২, পৃ. ১৭২; আসনাল-মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৪৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৫০১-৫০২-৫০৩; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১৭-৬১৮।

৪১. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৬৪৩।

৪২. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫১২, ৫২৭; আল-মাওয়াক বিহামিশিল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২১৫।

www.amarboi.org

# ইশরা (স্বামী-স্ত্রীর যৌথ জীবনযাপন) (عِشْرَةٌ)

**পরিচয় :** ইশরা শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘনিষ্ঠতা, একত্রে বসবাস, মিলেমিশে থাকা। আর اَلْعَشِيرُ অর্থ সহচর, বন্ধু। নারীর সহচর বা সঙ্গী হলো তার স্বামী, কেননা সে তার সাথে বসবাস করে এবং স্বামীও তার সাথে বসবাস করে।[১] হাদীসে এসেছে আমি তোমাদেরকে (নারীদের) জাহান্নামে অধিকসংখ্যক দেখেছি। বলা হলো, কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

"তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দাও এবং স্বামীর অবাধ্যতা করো।"[২]

পরিভাষায় ইশরা হলো : স্বামী-স্ত্রীর পরিস্পরিক অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ জীবনযাপন।

## সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

**আন নুশূয (اَلنُّشُوزُ) :** শব্দটির আভিধানিক অর্থ উত্তোলন, উচ্চতা। অন্যান্য অর্থের মধ্যে রয়েছে- স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য হওয়া, স্বামী তার স্ত্রীকে ফেলে রাখা।[৩]

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীসহ অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে, এটি হলো, স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া।[৪]

## সদ্ভাবে জীবনযাপনের বিধান

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে, স্বামী-স্ত্রী সদ্ভাবে বসবাস করা মানদুব ও মুস্তাহাব। আল-কাসানী বলেন, শুদ্ধ বিবাহের একটি বিধান হলো, সদ্ভাবে একত্রে জীবনযাপন করা। তার মতে এটি মানদুব ও কাঙ্ক্ষিত।[৫]

আল বাহুতী বলেন, তাদের উভয়ের জন্যই সুন্নত হলো, পরস্পরের সাথে উত্তম ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা এবং (টুকিটাকি) দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা।[৬]

---

১. লিসানুল আরব ও আল মিসবাহুল মুনীর।

২. হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৪০৫) ও ইমাম মুসলিম (খ. ১১, খ. ৮৬-৮৭) ইবনে উমর রা. থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

৩. আল-মিসবাহুল মুনীর।

৪. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩২৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৫১; কাশশাফুল-কিনা, খ. ৫,পৃ. ২০৯।

৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩৪।

৬. কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৮৫।

www.amarboi.org

মালেকীগণ বলেন, সদ্ভাবে জীবনযাপন করা আইনগতভাবে না হলেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব।

ইবনুল আরাবী বলেন, এটি অর্থাৎ সদ্ভাবে জীবনযাপন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। যদিও এজন্য তাকে বাধ্য করা হবে না। তবে এলাকার মানুষ চাইলে তাকে শর্ত বা শপথাবদ্ধ করতে পারে।[৭]

## সদ্ভাবে জীবনযাপনে উৎসাহ প্রদান

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাবে জীবনযাপন করতে শরীয়ত উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।"[৮] তিনি আরো বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের।"[৯]

আবু যায়েদ বলেন, স্বামীগণ স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে অনুরূপভাবে স্ত্রীগণ স্বামীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করবে। আজ-জাহহাক উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : স্ত্রীগণ আল্লাহ ও তাদের স্বামীর আনুগত্য করলে স্বামীর দায়িত্ব হলো তাকে উত্তম সঙ্গদান করা; কোনো প্রকার কষ্ট না দেয়া এবং তার জন্য সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করা।[১০] রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : তোমরা নারীদের ব্যাপারে হিতাকাঙ্ক্ষী হও, নিশ্চয় তারা তোমাদের নিকট বন্দির মতো।[১১]

## সদ্ভাবে জীবনযাপনের অর্থ

'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর'। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে সদ্ভাবে জীবন-যাপনের যে নির্দেশ দিয়েছেন তার অর্থ হলো, স্ত্রীর অধিকারসমূহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করার পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের সাথে বসবাস করা। আল-জাসসাস বলেন, স্ত্রীকে তার অধিকারসমূহের মধ্যে মোহর, ভরণপোষণ ও পালাবণ্টন সঠিকভাবে করা। কঠিন কথা দিয়ে তাকে কষ্ট না দেয়া, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো প্রতি আসক্ত না হওয়া এবং বিনা অপরাধে ভ্রূকুঞ্চিত না করা।[১২]

---

৭. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩৬৩।

৮. সূরা, আন-নিসা, ১৯।

৯. সূরা, আল-বাকারা, ২২৮।

১০. আল-মুগনী লি ইবনে কুদামা, খ. ৭, পৃ. ১৮; রিয়াদ; আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, খ. ১, পৃ. ৪৫২; আল-মাতবাআ আল বাহিয়্যা, ১৩৪৭ হিঃ।

১১. হাদীসটি ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৫৯৪; ও তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ২৭৪; আমর ইবন আহওয়াস থেকে উদ্ধৃত করেন। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান সহীহ।

১২. তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৪, পৃ. ৩১২; (সম্পা. : মুস্তফা আল-হালাবী, ১৯৫৪ ইং); ইআনাতুত-তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭১ (সম্পা. : মুস্তাফা আল-হালাবী, ১৯৩৮ ইং)।

www.amarboi.org

ইবনে কুদামা বলেন, 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের'। আল্লাহ্ তাআলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় কতিপয় আহলুল ইলম বলেন, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের তাৎপর্য হলো, স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকে তার সঙ্গীর অধিকার আদায় করবে, তাতে কোনো গড়িমসি করবে না। কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে হাসিমুখে থাকবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন : 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর'। আর এগুলো সদ্ভাবে জীবনযাপনের অংশ। উভয়ের জন্যই মুস্তাহাব হচ্ছে, পরস্পরের সাথে উত্তম ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা এবং এজন্য টুকিটাকি কষ্ট সহ্য করা।[১৩]

**স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাবে জীবনযাপনের বাস্তবায়ন**

ইতোপূর্বে ইশরা বিল মারূফ বা সদ্ভাবে জীবনযাপনের অর্থ করা হয়েছে, উত্তম ব্যবহার ও সঙ্গদানের মাধ্যমে সকল অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। এ অধিকারসমূহের মধ্যে কিছু অধিকার স্বামীর, কিছু স্ত্রীর আবার কিছু উভয়ের যৌথ, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

**স্বামীর অধিকারসমূহ**

স্ত্রীর ওপর স্বামীর রয়েছে বিরাট অধিকার; বরং স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারের তুলনায় বৃহত্তম। কেননা আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"নারীর তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যাদা আছে।"[১৪]

আল জাসসাস বলেন : এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা জানাচ্ছেন যে, "স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেরই একে অন্যের ওপর অধিকার আছে এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর বিশেষ কিছু অধিকার আছে, যা স্বামীর ওপর স্ত্রীর নেই।"

ইবনুল আরাবী বলেন : "এ আয়াত অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীর ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং বৈবাহিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে তার ওপর অগ্রগণ্য।"[১৫]

কেননা নবী কারীম স. বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا .

---

১৩. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১৮।

১৪. সূরা আল-বাকারা, ২২৮।

১৫. জাসসাস, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৪৪২; ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ১৮৮; সম্পা. ঈসা আল হালাবী, ১৯৫৭ইং; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৮৫।

www.amarboi.org

"আমি যদি কাউকে কারো সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে অবশ্যই নারীকে তার স্বামীকে সিজদা করার আদেশ দিতাম।"[১৬]

**স্বামীর অধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে**

**ক. স্ত্রী নিজেকে সমর্পণ করা :** বিবাহ বন্ধনের যাবতীয় শর্তাবলি সঠিকভাবে পূর্ণ হলে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পন করা ওয়াজিব, যাতে স্বামী তাকে উপভোগ করতে পারে। কেননা এ বন্ধনের মাধ্যমে স্বামী একটি প্রতিদানলাভের অধিকারী হয়। আর তা হলো স্ত্রীকে উপভোগ করা, যেভাবে স্ত্রী প্রতিদান হিসাবে মোহর লাভের অধিকারী হয়।[১৭]

স্বামী কাছে পেতে চাইলে স্ত্রী তার প্রস্তুতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে। যেমন দু'দিন বা তিন দিন। এ সময়ের মধ্যে রীতি-নীতি সেরে নেয়া সহজ হবে।

আল খারাশী বলেন : স্ত্রী সাজসজ্জার জন্য তার সমপর্যায়ের অন্যান্য মেয়েদের মতো রীতি অনুযায়ী কিছু সময় পেতে পারে। এর পরিমাণ ধনী-গরীব ও মানুষের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার আগে স্বামীকে সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে।

শাফেয়ীগণ বলেন : যদি সাজসজ্জার জন্য সময় চাওয়া হয়, তাহলে বিচারকের মতানুসারে একদিন বা দু'দিন সময় দিতে হবে। আর এটি তিনদিনের বেশি হতে পারবে না। এরূপ সময়দান ওয়াজিব, কেউ কেউ বলেন, মুস্তাহাব।

হাম্বলীগণ স্পষ্ট করে বলেছেন : আসবাবপত্র প্রস্তুতের জন্য কোনো প্রকার সময় দেয়া হবে না। আল বাহুতী বলেন, স্ত্রী কিংবা তার পরিবারের পক্ষ থেকে সময় চাওয়া হলে তাদেরকে সময় দেয়াই স্বামীর জন্য উত্তম।[১৮]

**সমর্পণের প্রতিবন্ধকসমূহ**

নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহে স্ত্রী নিজেকে সমর্পণ না করা জায়েয :

**১. মোহরে মুআজ্জাল (নগদ মোহর) পরিশোধ না হওয়া :** স্বামী নগদ মোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্ত্রী নিজেকে সমর্পণ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে। বিস্তারিত দ্র. শিরো. তাসলীম (تَسْلِيمٌ) ও মোহর (مَهْرٌ)।

---

১৬. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬; আবু হুরায়রা রা. থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, এটি হাসান গরীব।

১৭. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৪৮; হাশিয়াতুদ দাসুকী, খ. ৩, পৃ. ২৯৭; আল কালয়ুবী ও উমাইরা, খ. ৩, পৃ. ২৭৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৮৫।

১৮. আল-খারশী আলা খালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৯; আল-কালয়ুবী ও উমাইরা, খ. ৩, পৃ. ২৭৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৮৭; আল-মুগনী লি ইবনে কুদামা, খ. ৭, পৃ. ১৯।

www.amarboi.org

**২. বাল্যকাল** : ফকীহগণের মতে, বাল্যকাল সমর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং সহবাসের অনুপযুক্ত ছোট মেয়েকে উপযুক্ত হয়ে এসব বাধা দূর না হওয়া পর্যন্ত তার স্বামীর নিকট সমর্পণ করা যাবে না। কেননা এমতাবস্থায় সহবাসে তার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

মালেকী ও শাফেয়ীগণ বলেন : সহবাসের উপযুক্ত হলে বাল্যকালের বাধা দূর হয়ে যাবে। শাফেয়ীগণ আরো বলেন : স্বামী যদি বলে, আমার নিকট তাকে সমর্পণ করুন। উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি তার সাথে সহবাস করব না তবুও তাকে সমর্পণ করা যাবে না, এক্ষেত্রে স্বামী বিশ্বস্ত হলেও। কেননা যৌন উত্তেজনার ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না। হাম্বলীগণ বলেন : কন্যা নয় বছর বয়সে উপনীত হলে তাকে স্বামীর কাছে সোপর্দ করতে হবে। নয় বছর হয়ে গেলে তাকে আর আটকে রাখা যাবে না। এমনকি কৃশকায় গঠন হলেও।

ইমাম আহমাদ র. এ মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে বলেন, নবী কারীম স. হযরত আয়েশা রা.-এর সাথে ঘর বাধার সময় তার বয়স ছিল নয় বছর।[১৯] কিন্তু কাজী বলেন : বিষয়টি নয় বছরের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি তা উল্লেখ করেছেন মাত্র। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা নয় বছরে উপনীত হলে সহবাসের উপযুক্ত হয়।

অবশ্য নয় বছরের মেয়েকে স্বামীর কাছে সমর্পণের পর যদি সে নিজের ক্ষতির আশঙ্কা করে তাহলে সে স্বামীকে সহবাসে বারণ করতে পারবে। স্বামী তখন হায়েজরত নারীর মতো তাকে (সীমিতভাবে) উপভোগ করতে পারবে।

**৩. রোগ** : ফকীহগণের মতে, স্ত্রীকে তার স্বামীর নিকট সমর্পণের ক্ষেত্রে রোগ একটি বাধা। এখানে রোগ বলতে এমন অসুস্থতাকে বুঝানো হয়েছে যা সহবাসকে বারণ করে। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তার অসুস্থতা দূর হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া হবে। শাফেয়ীগণ এমন রোগীকেও এর সাথে যুক্ত করেছেন, যে খুব দুর্বল এবং এ অবস্থায় তার সাথে সহবাস ক্ষতিকর।[২০]

**খ. আনুগত্য** : স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত : "একদা জনৈক সাহাবী যুদ্ধে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে আদেশ দিয়েছিল সে যেন বাড়ি থেকে বের না হয়। বাড়ির সন্নিকটেই তার পিতা থাকত। সে তার পিতার নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করল এবং তাকে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট পাঠিয়ে বিষয়টি অবহিত করাল এবং আদেশ চাইল। রাসূলুল্লাহ স. মহিলার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আল্লাহকে ভয় করো এবং

১৯. হাদীসটি বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ১৯০) ও মুসলিম খ. ২, পৃ. ১০৩৯; উদ্ধৃত করেন।
২০. ফাতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৪৯; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ২৯৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২২৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৮৬।

www.amarboi.org

স্বামীর আনুগত্য করো। এরপর একদিন তার পিতা মারা গেলে আবারো সে লোক পাঠিয়ে অনুমতি চাইল। রাসূলুল্লাহ স. তাকে আগের কথাই জানিয়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ স. বের হয়ে এসে জানালেন, তোমার স্বামীর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২১]

ইমাম আহমদ র. বলেন : "কোনো নারীর যদি স্বামী ও অসুস্থ মা থাকে সেক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি না পেলে মায়ের তুলনায় স্বামীর অনুগত্যই অধিকতর পালনীয়।"[২২]

স্বামীর আদেশ অমান্য করলে যেমন কঠিন গুনাহ রয়েছে, তেমনি স্বামীর আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহ অনেক সওয়াব রেখেছেন। আবু হুরায়রা রা. নবী কারীম স. থেকে বর্ণনা করে বলেন : যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে বিছানায় ডাকার পর স্ত্রী তাতে সাড়া না দেয় এরপর সে স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে রাত কাটায়, তাহলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত উক্ত নারীর প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকে।[২৩]

স্বামীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, তা কোনো গুনাহের কাজ হতে পারবে না। সুতরাং কোনো হারাম কাজে তার আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য জায়েয নেই। যেমন স্বামী হায়েজের সময় বা মলদ্বার দিয়ে সহবাস করতে চাইলে অথবা অন্য যে কোনো গুনাহের কাজ। কেননা স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না।[২৪]

**গ. স্ত্রীকে উপভোগ করা :** স্ত্রীকে উপভোগ করা স্বামীর অধিকার। আর এটিই বিবাহবন্ধনের বিষয়বস্তু। ফকীহগণের মতে, স্ত্রীর সমস্ত শরীর এমনকি যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও স্বামীর জন্য জায়েয। আল কাসানী বলেন : শুদ্ধ বিবাহের একটি বিধান হচ্ছে স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ করা বৈধ। যেহেতু সহবাস করা দৃষ্টি ও স্পর্শের চেয়েও বড় ব্যাপার, তাই দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ অনেক আগেই বৈধ।[২৫]

ইবনে আবেদীন বলেন : "একবার আবু ইউসুফ র. আবু হানিফা র.-কে জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তি উত্তেজনার জন্য তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করেছে এবং স্ত্রীও তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করেছে, এতে কি কোনো সমস্যা আছে? তিনি বললেন, না। আমি আশা করি এতে তাদের সওয়াব বেশি হবে।"[২৬]

---

২১. হাদীসটি হাকীম আত-তিরমিযি, নাওয়াদেরুল এ উদ্ধৃত করেন, পৃ. ১৭৬।

২২. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২০।

২৩. হাদীসটি ইমাম মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১০৬০; উদ্ধৃত করেন।

২৪. তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৬৯; দারুল কুতুব, মিসর সং., ১৯৩৭ ইং ; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী খ. ৭, পৃ. ২০; ইবনুল জাওযী, আহকামুন নিসা, পৃ. ৭৭-৪৫; পরবর্তী, মাকতাবাতুত তুরাছ আল ইসলামী।

২৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩১।

২৬. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২৩৪।

www.amarboi.org

ফকীহদের মতে, স্বামী তার স্ত্রীর সম্মুখভাগ (যৌনাঙ্গ) যে কোনো সময় যে কোনো পদ্ধতিতে উপভোগ করতে পারে। এমনকি বিরল পদ্ধতিতে হলেও।[২৭] কেননা আল্লাহর বাণী : نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষিক্ষেতে যাও।"[২৮]

**সম্ভোগ বা তার পূর্ণতায় বাধা দেয় এমন সব বিষয় থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখা**

যেহেতু বিবাহবন্ধনের অন্যতম উদ্দেশ্য স্ত্রীকে উপভোগ করা, তাই সম্ভোগ বা তার পূর্ণতায় বাধা সৃষ্টি করে এমন সব বিষয় থেকে স্বামী তার স্ত্রীকে বিরত রাখতে পারে। এ কারণে ফকীহগণ বলেছেন, হায়েজ ও নিফাসের পর স্ত্রী গোসল করতে না চাইলে স্বামী তাকে গোসলে বাধ্য করতে পারে। কেননা এটি সম্ভোগের ক্ষেত্রে বাধা, যা তার অধিকার। তাই সে তার অধিকারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা দূর করতে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারবে।[২৯]

ফকীহগণ স্পষ্ট করে বলেছেন : সহবাসে বাধা সৃষ্টি করে এমন সব কিছু থেকেই স্বামী তার স্ত্রীকে বিরত রাখতে পারবে। কামাল ইবনুল হুমাম বলেন : যেসব খাবারের ঘ্রাণ তার জন্য কষ্টকর তা খেতেও স্ত্রীকে নিষেধ করা যাবে। একই ভাবে যেসব সৌন্দর্য উপকরণের ঘ্রাণ স্বামীর জন্য কষ্টদায়ক তা ব্যবহারেও নিষেধ করা যাবে। যেমন কাঁচা মেহেদী ও এ জাতীয় অন্যান্য উপকরণ। স্বামী চাওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী না সাজলে তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে।[৩০]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যায় বলা হয়েছে, স্বামী তার স্ত্রীকে সুগন্ধি লাগানো এবং অবাঞ্ছিত পশম কামাতে বাধ্য করতে পারবে।[৩১]

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে শরীরের অপবিত্রতা ধৌত করতে এবং অপবিত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত জামা-কাপড় না পরতে বাধ্য করতে পারবে, যাতে ভালোভাবে উপভোগ করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া সে স্ত্রীকে নাভীর নীচের লোম কাটা, নখ ছোট করা, বগলের পশম ছাটা ও অন্যান্য ময়লা থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য জোর করতে পারবে। পেঁয়াজ,

---

২৭. আল-খারশী আলা-খালীল, খ. ৩, পৃ. ১৬৬; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ২১৫; ইআনাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৪০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৮৮।

২৮. সূরা আল-বাকারা, ২২৩।

২৯. আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩৪১; হাশিয়াতুল আদওয়া মাআল খারশী, খ. ১, পৃ. ২০৮; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৮৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৯০।

৩০. ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ৫২০, আল আমীরিয়্যা সং., ১৩১৫ হি।

৩১. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৩৪২১, আল আমীরিয়্যা স.; ১৩১০ হিঃ।

www.amarboi.org

রসুন বা এ জাতীয় অন্য কিছু খেলে তার গন্ধ যদি স্বামীকে কষ্ট দেয় অথবা তার অসুস্থতার কারণ হয় তাহলে স্ত্রীকে তা খাওয়া থেকে বারণ করা যাবে।[৩২]

**ঘ. অবাধ্য হলে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া :** অবাধ্য হলে বা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেলে স্বামী তার স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার অধিকার রাখে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"আর যেসব স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো। তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা তাদের ওপর (নির্যাতন চালাবার জন্য) বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।"[৩৩]

বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম অবাধ্যতা 'নুশূয' (نُشُوز)।

**ঙ. স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া :** স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার হলো, তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দিবে না। কেননা আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

لاَ يَحِل لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِه ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِه إِلاَّ بِإِذْنِه .

"স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া রোজা রাখা এবং তার সম্মতি ছাড়া বাড়িতে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়"।[৩৪] ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, স্বামীর সাথে পরামর্শ ব্যতীত কাউকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না, যদি না স্ত্রী এক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতির কথা জানে। স্বামীর সম্মতি থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- আগে থেকে দাওয়াতকৃত মেহমানদের প্রবেশের ক্ষেত্রে স্বামী উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক নতুন করে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে মূল কথা হলো ইজমালী বা বিশেষ যে কোনোভাবেই হোক স্বামীর অনুমতি আবশ্যক।[৩৫]

---

৩২. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৮৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৯০।

৩৩. সূরা আন-নিসা, ৩৪; আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, খ. ২, পৃ. ২২৯; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ১৮৮; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৫-১৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৫৯; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৬।

৩৪. হাদীসটি বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ১৯৫) ও মুসলিম খ. ২, পৃ. ৭১১, উদ্ধৃত করেন। শব্দ ইমাম বুখারীর।

৩৫. ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ২৯৬; প্রকাশক মাকতাবাতুর রিয়াদ; মাতালিবু উলিন-নুহা, খ. ৫, পৃ. ২৫৮, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী দামেশক।

www.amarboi.org

**চ. স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে বের না হওয়া :** স্ত্রীর ওপর স্বামীর একটি অধিকার হলো, সে তার অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হবে না।[৩৬] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত "একবার এক মহিলা নবী স. এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল : স্ত্রীর ওপর স্বামীর কী অধিকার ? তিনি বললেন :

حَقُّهُ عَلَيْهَا أَلاَّ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِه ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ

"স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার হলো, সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হবে না। যদি সে এমনটি করে তাহলে ফিরে আসা পর্যন্ত আকাশ, রহমত ও আযাবের ফেরেশতাগণ তার ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকে।"[৩৭] বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম زَوْج (স্বামী)।

**ছ. খেদমত :** স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব কি-না, এ ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। শাফেয়ী, হাম্বলী ও কিছুসংখ্যক মালেকী অনুসারীর মতে, স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব নয়। এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো, স্থানীয় রীতি অনুযায়ী কাজ করা। হানাফী মাযহাবমতে, স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর ওপর দীনী দিক থেকে ওয়াজিব, আইনীভাবে নয়। মালেকীগণের মতে, একান্ত কাজকর্মে স্থানীয় রীতি অনুযায়ী স্বামীর সেবা করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। তবে স্ত্রী অভিজাত পরিবারের হলে খেদমত ওয়াজিব হবে না, যদি না তার স্বামী দরিদ্র হয়।[৩৮] বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম خِدْمَة (খেদমত)।

**জ. স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণ করা :** স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণ করা, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া স্বামীর অধিকার। কেননা নবী কারীম স. ও তার সাহাবীগণ তাদের স্ত্রীদের নিয়ে সফর করেছেন। হানাফীগণ এক্ষেত্রে শর্তারোপ করে বলেছেন, স্বামীকে স্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে।[৩৯]

---

৩৬. আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৩৪১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৩০৪; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৪৮; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২০।

৩৭. হাদীসটি ইমাম তাবারানী উদ্ধৃত করেন। অনুরূপ আল মুনযিরী আত-তারগীব ওয়াত তারহীবে খ. ৩, পৃ. ৫৭-৫৮, এটি উল্লেখ করেন এবং সনদ দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত দেন।

৩৮. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ১৯২; আল-খারশী আ'লা মুখতাসারি খলীল, খ. ৪,পৃ. ১৮৬; ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩২৪-৫০৬; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ৩১৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৯৫।

৩৯. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩৬০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩০৭; হাশিয়াতুদ দাসুকী, খ. ২, পৃ. ২৯৭-২৯৮; আল-কালয়ুবী ও উমাইরা, খ. ৪, পৃ. ৭৪; মাতালিবু উলিন-নুহা, খ. ৫, পৃ. ২৫৮।



www.amarboi.org

**স্ত্রীর অধিকারসমূহ**

**ক. মোহর :** মোহর স্বামীর ওপর স্ত্রীর একটি অধিকার।[৪০] যেমন আল্লাহর বাণী :

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"আর আনন্দের সাথে (ফরজ মনে করে) স্ত্রীদের মোহর আদায় করে দাও।"[৪১] ইলকিয়া আল হাররাসী বলেন : এখানে নিহলা দ্বারা ফরজ বুঝানো হয়েছে যেভাবে মিরাসের আলোচনার পর আল্লাহ বলেন (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) "আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ।"[৪২]

সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া স্বামীর জন্য স্ত্রীর মোহর থেকে ব্যয় করা বৈধ হবে না।[৪৩] কেননা আল্লাহর বাণী : وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
"আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়"।[৪৪] বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম 'মোহর' (مَهْر)।

**খ. খোরপোষ :** স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারের একটি হলো খোরপোষ।[৪৫]

কেননা আল্লাহ বলেন :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুপাতে খরচ করবে। আর যাকে স্বল্প পরিমাণ রিজিক দেয়া হয়েছে সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে।"[৪৬]

এ ছাড়া নবী স. বলেছেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ . . . ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

"নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তোমরা তাদেরকে আল্লাহর হেফাজতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নামে তাদের যৌনাঙ্গকে হালাল করেছ, ....... তোমাদের ওপর দায়িত্ব, সদ্ভাবে তাদের জীবিকা ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া"।[৪৭]

---

৪০. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৩৫; আল-কালয়ুবী ও উমাইরা, খ. ৩, পৃ. ২৯৯।
৪১. সূরা আন-নিসা, ৪।
৪২. আহকামুল কুরআন লিল কিয়া আল হাররাসী, খ. ২, পৃ. ১০৫; আরো দ্র. সূরা আন-নিসা, ১১।
৪৩. আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, খ. ২, পৃ. ৭১; আহকামুল কুরআন লিল আরাবী, খ. ১, পৃ. ৩১৬; সম্পা. ঈসা, আল হালাবী ১৯৫৭ ইং।
৪৪. সূরা বাকারা, ২২৯।
৪৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৩, পৃ. ৫০; আল কালয়ুবী ও উমাইরা, খ. ৪, পৃ. ৬৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪৬০।
৪৬. সূরা তালাক, ৭।
৪৭. হাদীসটি মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮৮৯-৮৯০; জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে উদ্ধৃত করেন।

www.amarboi.org

ইবনু হুবায়রা বলেন : ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী পুরুষের ওপর তার অধীনস্ত স্ত্রী, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ও পিতা-মাতার খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব।[৪৮]

**গ. স্ত্রীকে পবিত্র ও তার সতীত্ব ঠিক রাখা :** স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার হলো স্ত্রীর সতীত্ব ঠিক রাখা এবং তার সাথে সহবাস করা। হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ্-এর মতে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। শাফিয়ীগণের মতে, সহবাস স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়; বরং এটি তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।[৪৯]

জমহুর ফকীহগণ অনুমতি ছাড়া স্বাধীন স্ত্রীর সাথে 'আযল' করতে নিষেধ করেছেন।[৫০] কেননা তার সন্তান লাভের অধিকার রয়েছে এবং আযল তার জন্য ক্ষতিকর। তাই স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযল করা জায়েয় হবে না। কিন্তু হানাফীগণের মতে, খারাপ সময়ের কারণে স্বামী তার সন্তানের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করলে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই আযল করা যাবে।[৫১]

**ঘ. স্ত্রীর সাথে রাতযাপন :** হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, স্ত্রীর সাথে রাতযাপন করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। তবে তারা এর পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করেছেন। হানাফীগণ বলেন : এর কোনো নির্ধারিত সময়সীমা নেই। বরং মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সাথে রাতযাপন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব।

ইবনে আবেদীন বলেন : "স্বামী যদি ইবাদত বা এ জাতীয় কারণে স্ত্রী থেকে দূরে থাকে সেক্ষেত্রে মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, সময়সীমা নির্ধারণ না করেই মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন ও তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য স্বামীকে আদেশ করা যাবে।" ইমাম তাহাবী বলেন : প্রতি চার রাতের মধ্যে একদিন ও একরাত স্ত্রীর জন্য; বাকিটা স্বামীর। কেননা স্বামী আরো তিনজন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে পারে। আর স্ত্রী দাসী হলে পাবে প্রতি সপ্তাহে একদিন একরাত। এটি ইমাম আবু হানিফা র. থেকে হাসান র.-এর বর্ণনা।[৫২]

হাম্বলীগণের মতে, প্রতি চার রাতের মধ্যে কমপক্ষে এক রাত স্ত্রীর শয্যায় রাত্রিযাপন করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। কেননা কাব ইবন সাওয়ার রা. থেকে

---

৪৮. আল-ইফসাহু লি ইবনে হুবায়রা, খ. ২, পৃ. ১৮১; মুদ্রণ- আল মুআসসাসা আস সালাফিয়্যা রিয়াদ।

৪৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩১; ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ৫১৮; আল-ফাওয়াকেহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৪৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৯২।

৫০. হাদীসটি ইমাম বায়হাকী, খ. ৭, পৃ. ২৩১, উদ্ধৃত করেন। ইবনে হাজার আত-তালখীসে উল্লেখ করে বলেন, এর একটি রেওয়ায়াত দুর্বল।

৫১. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩৭৯-৩৮০; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ২৬৬; আল-কালয়ুবী ও উমাইরা, খ. ৪, পৃ. ৩৭৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৮৯।

৫২. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩৯৯।

www.amarboi.org

বর্ণিত "একবার তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন মহিলা এসে বলল : হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আমার স্বামীর চাইতে উত্তম কোনো পুরুষ দেখিনি। সে রাতে কিয়ামুল্লাইল ও দিনে রোজা অবস্থায় কাটায়। উমর রা. মহিলার প্রশংসা ও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। এতে মহিলাটি লজ্জা পেয়ে ফিরে গেল। এরপর তিনি (কা'ব) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি মহিলাটিকে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন? তিনি বললেন : কেন কী হল ? কা'ব বললেন : সে এসেছিল স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করতে। এই যদি লোকটির ইবাদতের অবস্থা হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য অবসর কোথায়? এরপর উমর রা. মহিলার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন এবং কাবকে বললেন, এদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। কেননা এদের বিষয়টি তুমি যতটুকু বুঝেছ আমি তা বুঝিনি। তিনি বললেন : এই মহিলাটি চার স্ত্রীর মধ্যে চতুর্থতম। সুতরাং আপনি এভাবে ফায়সালা করে দিন যে, তিন দিন তিন রাত অন্যান্য স্ত্রীর জন্য এবং একদিন একরাত এই মহিলার জন্য।

এই বিচার প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং এটি কেউ অস্বীকার না করায় ইজমার মতোই ধর্তব্য। আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আসের উদ্দেশ্যে নবী স.-এর একটি বাণীও একে সমর্থন করে- "নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার রয়েছে। তোমার ওপর তোমার চোখের অধিকার রয়েছে এবং তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে"।[৫৩]

মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে, স্ত্রীর সাথে রাতযাপন স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়; বরং এটি সুন্নত। শাফেয়ীগণ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন : যার চারজন স্ত্রী আছে তার জন্য সুন্নতের সর্বনিম্ন স্তর হলো, প্রতি চার রাত থেকে অন্তত এক রাত থাকা।

মালেকী মাযহাবের ইবনে আরাফা র. স্ত্রীর সাথে রাতযাপন ওয়াজিব বলেছেন। কেননা স্ত্রীকে একাকী রেখে দেয়া তার জন্য ক্ষতিকর এবং সেক্ষেত্রে ফিতনা-ফাসাদ ও অপহরণের ভয় থাকে।[৫৪]

**ঙ. স্ত্রীকে খাদেম দেয়া :** স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারসমূহের একটি হলো, সেবক দেওয়া। কেননা এটি সদ্ভাবে জীবনযাপনের অংশ। এছাড়া সর্বদা এর প্রয়োজন হয়। বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম 'খিদমত' (خِدْمَة)

---

৫৩. হাদীসটি বুখারী ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ২৯৯; মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮১৮, উদ্ধৃত করেন। শব্দ বুখারীর।

৫৪. আল-আদওয়া আলার রিসালাহ, খ. ২, পৃ. ৫৯; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৪,পৃ. ২৮১; আল-বুজাইমিরী আলাল খতীব, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫।

www.amarboi.org

**চ. পালাবণ্টন :** একাধিক স্ত্রী থাকলে পালা অনুযায়ী স্বামীকে পাওয়া স্ত্রীর অধিকার।[৫৫] হযরত আয়েশা রা. বলেন : রাসূলুল্লাহ্ স. নিরপেক্ষভাবে পালাবণ্টন করতেন এবং বলেতন :

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ হে আল্লাহ, আমার সাধ্যানুযায়ী আমি বণ্টন করেছি' অতএব তুমি যা পারো কিন্তু আমার সাধ্যাতীত সেজন্য আমাকে পাকড়াও করো না।[৫৬]

**স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকারসমূহ**

**ক. সদ্ভাবে জীবনযাপন :** সদ্ভাবে জীবনযাপন স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকার। অতএব প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব তার সংগীর সাথে সুন্দরভাবে জীবনাতিপাত করা। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

**খ. উপভোগ করা :** স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে উপভোগ করা তাদের যৌথ অধিকার। এটি যৌথ অধিকার হলেও নারীর তুলনায় পুরুষের দিকটি অধিকতর শক্তিশালী। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

**গ. উত্তরাধিকার :** মিরাস স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকার। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার উত্তরাধিকার লাভ করবে। অনুরূপভাবে স্বামীর মৃত্যুর পরও স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবে।[৫৭] কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ; ওসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর।"[৫৮]

- নাজমুল হুদা সোহেল

---

৫৫. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩৯৭; হাশিয়াতুদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৩৯; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৫১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৯৮; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী খ. ৭, পৃ. ২৭।

৫৬. হাদীসটি আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৬০১; ও তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৪৩৭, উদ্ধৃত করেন। তিরমিযী বলেন, এটি মুরসাল।

৫৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩২।

৫৮. সূরা, আন-নিসা, ১২।

www.amarboi.org

# খোরপোষ (نَفَقَةٌ)

**সংজ্ঞা :** অভিধানে اَلنَّفَقَةُ শব্দটি نَفَقَ এর ক্রিয়াবিশেষ্য। যেমন বলা হয়- نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ نَفَقًا দিরহামগুলো খরচ হয়ে গেছে, অর্থাৎ ফুরিয়ে গেছে। اَلنَّفَقَة-এর বহুবচন نِفَاقٌ (নিফাক)। যেমন- رَقَبَةٌ এর বহুবচন رِقَاب বলা হয় نَفَقَ الشَّيْءُ نَفَقًا فَنِيَ : জিনিসটি ফুরিয়ে গেছে এবং أَنْفَقْتُهُ অর্থাৎ আমি তা নিঃশেষ করে ফেলেছি। এছাড়া نَفَقَتِ السِّلْعَةُ وَالْمَرْأَةُ نِفَاقًا অর্থাৎ মহিলার দাবিদার ও প্রস্তাবকারী অধিকসংখ্যায় হয়েছে।[১]

পরিভাষায় খোরপোষ হচ্ছে, অপচয় ছাড়া যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ জীবন ধারণ করে।[২]

**সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ :**

اَلْعَطَاءُ **দান :** আল-আতা এর আভিধানিক অর্থ হস্তান্তর, দান। এটি اَلْإِعْطَاءُ শব্দের ক্রিয়াবিশেষ্য। বহুবচন أَعْطِيَةٌ পরিভাষায়, রাষ্ট্রের ইমাম হকদারদের জন্য বায়তুল মালে যা নির্ধারণ করেন তাকে আল-আতা বা দান বলা হয়।[৩]

দান ও খোরপোষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, খোরপোষ শরীয়ত কর্তৃক ধার্য হয়, আর দান ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক ধার্য করা হয়।

**আরোপিত বিধান :**

ফকীহগণের মতে, সব ধরনের খোরপোষ সাধারণভাবে ওয়াজিব। তবে তার পরিমাণ ও প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্যতার শর্তসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় তারা মতভেদ করেছেন।

**খোরপোষের কারণসমূহ :**

খোরপোষ তিনটি কারণের যে কোনো একটির বর্তমানে ওয়াজিব হয়। কারণ তিনটি হলো : বিয়ে, আত্মীয়তা ও মালিকানা।

**প্রথমত : বিয়ে :** নিম্নবর্ণিত মাসআলাগুলো এর অন্তর্ভুক্ত :

স্ত্রীর খোরপোষের বিধান : ফকীহগণ কিছু শর্ত সাপেক্ষে স্বামীর ওপর স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব বলে একমত।[৪]

---

১. আল-মিসবাহুল মুনীর

২. আশ-শারহুস-সাগীর-এর উপর আস-সাবীর হাশিয়া, খ. ২, পৃ. ৭২৯, দারুল মা'আরিফ সং.।

৩. হাশিয়া ইবন আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৪১১।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

স্ত্রীকে খোরপোষ দেয়ার আবশ্যকতা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত।

**আল-কুরআন** : আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে"।[৫]

আল্লাহ্ আরো বলেন : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা"।[৬]

আল্লাহ্ আরো বলেন :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস করো তাদেরকেও সেরূপ গৃহে বাস করতে দিবে; তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না সঙ্কটে ফেলার জন্য; তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে"।[৭]

এসব আয়াত স্ত্রীদের খোরপোষ বা ভরণ পোষণ দেয়া ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

**সুন্নাহ্** : বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমা দ্বারা তাদেরকে বৈধ করেছ। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো, এমন কেউ তোমাদের বিছানা দলন করবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ কর। এরূপ করলে তোমরা তাদেরকে মৃদু প্রহার করবে। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো, যথাবিধি তাদের জীবিকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা"।[৮]

---

৪. আল-হিদায়াতু বি আলা ফাতহিল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৩২১, আত-তিজারিয়্যা সং.; দুররুল মুখতার এর ওপর ইবনে আবেদীন এর হাশিয়া, খ. ৩, পৃ. ৫৭২; মাওয়াহিবুল জালীল ও আত তাজ ওয়াল-ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ১৮১-১৮২; আল-ইনসাফ, খ. ১, পৃ. ৩৭৬।

৫.. আল-কুরআন, ৬৫ : ৭।

৬. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩।

৭. আল-কুরআন, ৬৫ : ৬।

৮. হাদীসটি ইমাম মুসলিম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণিত হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেন, খ. ২, পৃ. ৮৮৯-৮৯০; সম্পা. ঈসা আল-হালাবী।

www.amarboi.org

এছাড়া আরো অনেক হাদীস আছে, যাতে স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব বলে বর্ণিত হয়েছে।

**ইজমা :** বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একমত যে, স্ত্রী স্বামীর সাথে অবস্থান করলে, দৈহিক মিলনে সামর্থ্য হলে এবং শরীয়তসম্মত কোনো ওজর ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্বামী থেকে নিজেকে দূরে না রাখলে তার খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। ইবনুল মুনযির বলেন, বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ঐকমত্য হলো, স্ত্রী সাবালিকা হলে এবং অবাধ্য না হলে তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করা স্বামীদের জন্য ওয়াজিব।[৯]

**যুক্তি :** যেহেতু স্ত্রীর থেকে প্রাপ্য উপকারিতা স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট এবং স্বামী কর্তৃক তাকে ভোগ করার অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপ নিষেধ, তাই তার খাদ্য ও ভরণপোষণের সামগ্রী যোগান দেয়া স্বামীর জন্য তেমনি ওয়াজিব, যেমন যুদ্ধগামী সৈনিকরা জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে বায়তুলমাল থেকে তাদের প্রয়োজনীয় রসদপত্র সরবরাহ করা ইমামের ওপর ওয়াজিব।[১০]

এছাড়া স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখার কারণে খোরপোষ ওয়াজিব হয়। বিচারক, গভর্নর ও যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত কর্মচারীদের ওপর কিয়াস করে বলা যায়, কেউ কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাজে আটকে থাকলে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করা ঐ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। কারণ সে তার নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অবসর পায়নি।[১১]

## স্ত্রীর খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার কারণ

স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব হওয়ার কারণ নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। এটি কি শুধু আকদের দ্বারাই ওয়াজিব হয় নাকি সাথে সাথে স্বামীর সাথে অবস্থান ও পূর্ণ সমর্পণও এর সাথে জড়িত? এ নিয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে।

**প্রথম অভিমত :** এটি ওয়াজিব হওয়ার কারণ, বিশুদ্ধ বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখার অধিকারী হওয়া। এটি হানাফী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত[১২] এবং শাফেয়ীগণের পুরনো অভিমত।[১৩]

---

৯. আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ২৩১।

১০. আল-হাবী আল-কাবীর, খ. ১৫, পৃ. ৫২৪ থেকে তৎপরবর্তী।

১১. আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ১৬; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩০; তাবয়ীনুল-হাকায়েক, খ. ৩, পৃ. ৫১।

১২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১৯২; রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৪; আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ১৬।

১৩. শারহু জালালুদ্দিন আল-মাহাল্লী আলা মিনহাজিত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৭৭।

www.amarboi.org

ইবনে আবেদীন বলেন, ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান না থাকায় ফাসেদ বিয়ে দ্বারা কোনো মুসলমানের ওপর খোরপোষ ওয়াজিব হবে না। আর ওয়াজিব হওয়ার কারণটি হলো, স্বামী বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখার অধিকারী হয়। ইদ্দতের বিষয়টিও অনুরূপ।[১৪]

তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী : لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ "বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে"।[১৫]
আল্লাহ্ তাআলা সময়ের শর্ত ছাড়াই খোরপোষ প্রদানের আদেশ দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে ঐ আকদের সময় থেকেই খোরপোষ প্রদান ওয়াজিব।

এছাড়া নবী স.-এর ব্যাপক অর্থবোধক বাণীও প্রমাণ করে যে, আকদের সময় থেকেই খোরপোষ ওয়াজিব। তিনি বলেন :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমাদের কর্তব্য হলো, যথাবিধি তাদের জীবিকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা"।[১৬]

**দ্বিতীয় অভিমত :** যথানিয়মে বিয়ের পর স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর সাথে না থাকলে স্বামীর ওপর খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব হবে না। এটি মালেকী[১৭] ও হাম্বলী[১৮] মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে[১৯] এবং এটি শাফেয়ী মাযহাবেরও একটি নতুন মত।[২০]
কিফায়ার গ্রন্থকার বলেন, পরবর্তীকালের কিছু আলেম বলেছেন, স্বামীর সাথে না থাকলে খোরপোষের অধিকারী হবে না। এটি আবু ইউসুফ র. থেকে বর্ণিত।[২১]
ইবনে কুদামা 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলেন, স্ত্রী স্বামীর কাছে নিজকে সমপর্ণ করলে তার কাছ থেকে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন খাদ্য-পানীয়, পোশাক, বাসস্থান পাওয়ার অধিকার লাভ করবে।[২২]
এ ব্যাপারে তাদের দলীল হলো, নবী কারীম স. আয়েশা রা.-এর ছয় বছর বয়সের সময় তার সাথে আকদ করেন।[২৩] কিন্তু তাঁর সাথে একত্রে বসবাসের

---

১৪. রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৪।
১৫. আল-কুরআন, ৬৫ : ৭।
১৬. প্রাগুক্ত (মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮৮৯-৮৯০, সম্পা. ঈসা আল-হালাবী)।
১৭. আদ-দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৫০৮; ও মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৮২; শারহুল খারাশী, খ. ৪, পৃ. ১৮৩।
১৮. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩০।
১৯. আল-কিফায়া আলাল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১৯২-১৯৩।
২০. হাশিয়াতু উমায়রা, খ. ৪, পৃ. ৭৭; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৫।
২১. আল-কিফায়া আলাল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১৯২-১৯৩।
২২. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩০।

www.amarboi.org

আগে তাঁকে খোরপোষ দেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু আকদের মাধ্যমে নয়; বরং স্ত্রী স্বামীর সাথে অবস্থান করলে খোরপোষ লাভের অধিকারী হয়। নবী স. যদি তাঁকে খোরপোষ দিতেন তবে অবশ্যই আমাদের কাছে তার বর্ণনা আসতো। যেহেতু তিনি খোরপোষ দিয়েছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না তাই ওয়াজিব না হওয়াই প্রমাণিত হলো।[২৪]

এছাড়াও আকদ বা বিবাহ চুক্তির কারণে মোহরানা ওয়াজিব হয়। তাই একই কারণে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি বিনিময় ওয়াজিব হয় না।[২৫]

খোরপোষের পরিমাণ অজ্ঞাত, আর আকদ দ্বারা অজ্ঞাত পরিমাণ সম্পদ ওয়াজিব হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু আকদ দ্বারা খোরপোষ ওয়াজিব হয় না।

আরো কারণ হলো, বিশুদ্ধ বিয়ের পর সম্ভোগের বিনিময়ে তা ওয়াজিব হয়। সুতরাং স্ত্রী নিজেকে সমর্পণ করলে বিনিময়ে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব। যেমন বিক্রেতা বিক্রিত পণ্য সমর্পণ করলে তার মূল্য পরিশোধ করা ক্রেতার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।[২৬]

**তৃতীয় অভিমত :** শাফেয়ী মাযহাবের পুরনো মত অনুযায়ী আকদের মাধ্যমে খোরপোষ ওয়াজিব হয় এবং স্বামীর সাথে অবস্থানের মাধ্যমে তা স্থায়ী হয়।[২৭]

## খোরপোষের পরিমাণ

স্ত্রীর খোরপোষের পরিমাণ নিয়ে ফকীহদের মতপার্থক্য চারভাগে বিভক্ত :

**প্রথম মত :** খোরপোষের পরিমাণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এ মত হানাফী[২৮] ও মালেকী[২৯] মাযহাবের। শাফেয়ী মাযহাবের কারো কারো[৩০] এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ-এর মত এটিই।[৩১]

তারা কুরআনের আয়াত : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "পিতার কর্তব্য হলো, যথাবিধি তাদের খোরপোষ দেয়া" প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।[৩২] আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ না করেই স্বামীর

---

২৩. হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ২২৪) ও ইমাম মুসলিম খ. ২, পৃ. ১০৩৮, সম্পা. ঈসা আল-হালাবী উদ্ধৃত করেন।

২৪. হাশিয়াতু উমায়রা খ. ৪, পৃ. ৭৭; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৫।

২৫. প্রাগুক্ত দুই তথ্যসূত্র।

২৬. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৫।

২৭. আল-কালয়ূবী, খ. ৪, পৃ. ৭৭।

২৮. আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২৩; আল-ইখতিয়ার, খ. ৪, পৃ. ৪।

২৯. হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫০৯; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৫৯।

৩০. রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৮৮।

৩১. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩১; আল-ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ৩৫২।

www.amarboi.org

ওপর তার স্ত্রীর খোরপোষ ওয়াজিব করে দিয়েছেন। সুতরাং কাজী ও মুদারিবের ন্যায় প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হবে।[৩৩]

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন। একদা হিন্দ বিনতে উতবা রাসূলুল্লাহ স.-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের মতো করে দেয় না। তবে আমি তার অজান্তে তার সম্পদ থেকে নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করি। রাসূলুল্লাহ স. বললেন : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ "তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যা প্রয়োজন তা সদ্ভাবে নিয়ে নিবে"।[৩৪]

রাসূল স. পরিমাণ নির্ধারণ না করেই হিন্দকে তার নিজের ও সন্তানের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বামীর সম্পদ থেকে যথাবিধি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যথাবিধি হলো, প্রচলিত প্রথা ও রীতির আলোকে যা প্রয়োজন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীর খোরপোষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, শরীয়ত দ্বারা নয়।

এ সম্পর্কে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণিত হাদীসকেও তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ স. জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ . . . وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং তাদেরকে আল্লাহর বাণী দ্বারা হালাল করে নিয়েছ। তোমাদের কর্তব্য হলো, যথাবিধি তাদের জীবিকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা।[৩৫]

রাসূলুল্লাহ স. স্বামীর ওপর খোরপোষের বিষয়টিকে মারূফ বা প্রচলিত রীতি ও প্রথা দ্বারা শর্তযুক্ত করেছেন। আর মারূফ হলো, যথাযথ প্রয়োজন, অন্য কিছু নয়। কেননা প্রয়োজনের চেয়ে কম হলে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তা মারূফ হিসেবে গণ্য

---

৩২. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩।

৩৩. আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২১; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৮৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪৬।

৩৪. হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৫০৭; আস সালাফিয়্যা সং.) ও ইমাম মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৩৩ উদ্ধৃত করেন, মুল পাঠ ইমাম বুখারীর।

৩৫. হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেন, খ. ২, পৃ. ৮৮৯-৮৯০; সম্পা. ঈসা আল-হালাবী।

www.amarboi.org

হবে না। অনুরূপভাবে প্রয়োজনের বেশি খরচ অপচয় হিসেবে গণ্য হবে, মারূফ হিসেবে নয়। সুতরাং মারূফ দ্বারা প্রয়োজনকে বুঝানো হয়েছে।[৩৬]

স্ত্রীর খোরপোষের সাথে নিকট আত্মীয়ের খোরপোষের সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাও নির্ধারিত নয়। সুতরাং স্ত্রীর খোরপোষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে ওয়াজিব হবে। তারা আরো বলেন, স্ত্রী সর্বদা স্বামীর সাথে থাকার কারণে এবং নিজের প্রয়োজনে উপার্জন থেকে বিরত থাকায় বাধ্য হওয়ায় তাকে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব এবং এটি হবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে।[৩৭]

**দ্বিতীয় মত :** খোরপোষের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত। এ মত শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ এবং হাম্বলী মাযহাবের কাজীর মতও এটিই। শাফেয়ী আলেমগণ স্বামী ধনী হলে দৈনিক দুই মুদ, দরিদ্র হলে এক মুদ এবং মধ্যবিত্ত হলে দেড় মুদ্ পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আর কাজী বলেন, ধনী ও দরিদ্র প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দৈনিক দুই রাতল রুটি ধার্য হবে কাফফারার ওপর ভিত্তি করে। তারা আল্লাহ তাআলার বাণীর মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তারা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন–

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে"।[৩৮]

স্ত্রীর খোরপোষের পরিমাণকে কাফফারার ওপর এজন্য কিয়াস করা হয় যে, উভয়টিতে সম্পদ প্রদান করা হয়, যা শরীয়ত কর্তৃক ওয়াজিব করা হয়েছে।[৩৯]

**তৃতীয় মত :** খোরপোষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো দেশের অবস্থা এবং সমপর্যায়ের দম্পতিদের রীতি। মালেকীগণ ও শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন।[৪০]

**চতুর্থ মত :** এটি নির্ধারণ করবেন বিচারক। তার দায়িত্ব অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি পরিমাণ ঠিক করে দেয়া। এটিই শাফেয়ী মাযহাবের কারো কারো মত।[৪১]

---

৩৬. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩২।
৩৭. আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২৩।
৩৮. আল-কুরআন, ৬৫ : ৭।
৩৯. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪২৬; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ৩০২।
৪০. রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৪০; আদ-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৫০৯; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৫৯।
৪১. রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৪০।

www.amarboi.org

**খোরপোষের ক্ষেত্রে যা লক্ষণীয়**

অধিকাংশ ফকীহ্-এর মতে, স্বামী-স্ত্রী সচ্ছল হলে স্ত্রীর খোরপোষ হবে সচ্ছলদের মতো এবং তারা অসচ্ছল হলে স্ত্রীর খোরপোষও সে অনুযায়ী হবে।[৪২]

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সচ্ছল বা অসচ্ছলতার ব্যাপারে বিপরীতধর্মী হলে যেমন-স্বামী সচ্ছল ও স্ত্রী অসচ্ছল হয় অথবা তার বিপরীত অবস্থা এবং তারা নির্দিষ্ট খোরপোষের ব্যাপারে একমত হতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারিত হবে– তা নিয়ে ফকীহ্গণ তিনটি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন :

**প্রথম মত :** সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার ব্যাপারে স্বামীর অবস্থাই বিবেচ্য। জাহিরী রেওয়ায়াত অনুযায়ী হানাফীদের কারো কারো মত এটিই। শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণও এমত পোষণ করেন। তারা আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন– وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"পিতার অর্থাৎ স্বামীর কর্তব্য যথাবিধি স্ত্রীর খোরপোষের ব্যবস্থা করা"।[৪৩]

তাদের দলীল অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা সদ্ভাবে স্ত্রীর খোরপোষ দেয়াকে স্বামীর ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর তা হবে স্বামীর অবস্থা অনুপাতে। স্বামী সচ্ছল হলে সচ্ছলতার সাথে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব এবং অসচ্ছল হলে সে অনুপাতে ওয়াজিব। কেননা এটাই তার অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[৪৪]

তাদের আরো দলীল হলো, আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"বিত্তবান সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা অধিক বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি"।[৪৫]

আল্লাহ্ তাআলা স্বামীদেরকে নিজেদের সামর্থ্য ও অবস্থা অনুযায়ী খরচ করার আদেশ করেছেন, অন্য কারো অবস্থা অনুযায়ী নয়।[৪৬]

---

৪২. আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২৪; রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৫; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫০৯; রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৪১; আল-ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ২৫৩।

৪৩. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩।

৪৪. তাকমিলাতুল মাজমূ, খ. ১৮, পৃ. ২৫০।

৪৫. আল-কুরআন, ৬৫ : ৭।

৪৬. তাকমিলাতুল মাজমূ, খ. ১৮, পৃ. ২৫০।

www.amarboi.org

**দ্বিতীয় মত :** স্ত্রীর অবস্থা বিবেচিত হবে। হানাফী মাযহাবের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেছেন।[৪৭] তাদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী-

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের জীবিকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা"।[৪৮]

তাদের দলীলের দৃষ্টিকোণ হলো, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক জীবিকা ও পোশাক পরিচ্ছদকে স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত করা প্রমাণ করে যে, খোরপোষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচিত হবে; স্বামীর অবস্থা নয়। আল্লাহ তাআলা তার বাণীতে জীবিকার সাথে পোশাক-পরিচ্ছদকে সংযুক্ত করেছেন- উভয়টি সমান বুঝানোর জন্য। সুতরাং পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচ্য হলে জীবিকার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচ্য হবে।[৪৯]

এমনিভাবে নবী কারীম স. আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদ বিনতে উতবাকে যে কথা বলেছিলেন তা দ্বারাও তারা দলীল পেশ করেন : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ "তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়ে নাও"।[৫০] রাসূলুল্লাহ স. বিষয়টিকে স্ত্রীর প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, স্বামীর অবস্থার সাথে নয়। এটি প্রমাণ করে, খোরপোষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থার পরিবর্তে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

**তৃতীয় মত :** একই সঙ্গে উভয়ের অবস্থাই বিবেচনা করতে হবে। হানাফী মাযহাবের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেছেন এবং এর উপরই তাদের ফাতওয়া।[৫১] এটি মালেকী মাযহাবেরও নির্ভরযোগ্য মত।[৫২] এক্ষেত্রে তাদের দলীল হলো আল্লাহর এ বাণী-

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"বিত্তবান সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে"।[৫৩]

---

৪৭. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৫৭৪।
৪৮. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩।
৪৯. ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৫০৯; নাইলুল আওতার, খ. ৬, পৃ. ৩২৩।
৫০. হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।
৫১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ১৯৪-১৯৫।
৫২. আশ-শারহুল কাবীর লিদ দারদীর, খ. ২, পৃ. ৫০৮-৫০৯। আত তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৮৩।
৫৩. আল-কুরআন, ৬৫ : ৭।

www.amarboi.org

এছাড়া আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদ বিনতে উতবার উদ্দেশ্যে নবী স.-এর বাণীও তাদের দলীল, 'তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তা নিয়ে নিবে'।[৫৪]
তাদের দলীলের দৃষ্টিকোণ হলো, আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী স্বামীর অবস্থা বিবেচ্য এবং হাদীস অনুযায়ী স্ত্রীর অবস্থা বিবেচ্য। সুতরাং উভয়টির সমন্বয় সাধন করে তার ওপর আমল করার জন্য খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।[৫৫]

## খোরপোষের প্রকারসমূহ

ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, স্বামীর জন্য স্ত্রীকে অবশ্যপ্রদেয় খোরপোষের অন্তর্ভুক্ত হলো খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান এবং এমনসব জিনিস যা না হলে চলে না। খাদ্য হিসেবে দেশে সাধারণত যা প্রচলিত তাই প্রযোজ্য যেমন- রুটি, ঘি, তেল, খেজুর, চাল, দুধ, গোশত ইত্যাদি।
এসব জিনিসের কতটুকু পরিমাণ ওয়াজিব সে সম্পর্কে ফকীহদের মতামত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্ত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন (বিস্তারিত দ্র. কুসওয়া' كُسْوَةٌ অনুচ্ছেদ ২ ও তৎপরবর্তী বর্ণনা) অনুরূপভাবে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও তারা একমত হয়েছেন। (বিস্তারিত দ্র. 'সুকনা' سُكْنَى অনুচ্ছেদ ৪ ও তৎপরবর্তী অংশ)।

খোরপোষের বিষয়টি শুধু উপর্যুক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কিছু সংখ্যক ফকীহ মনে করেন চিকিৎসা, গৃহপরিচারিকার বেতন, সুগন্ধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অন্যান্য উপকরণের অর্থ যোগান দেয়াও ওয়াজিব। এসবের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

## এক. স্ত্রীর চিকিৎসা

ফকীহদের ঐকমত্য হলো, স্বামীর জন্য স্ত্রীর ওষুধের মূল্য ও ডাক্তারের পারিশ্রমিক পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়।[৫৬] দলীল হলো আল্লাহর এ বাণী-

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

"বিত্তবান সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে"।[৫৭]

---

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৫০৯।

৫৬. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ৫৪৯; আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২০; আশ-শারহুল কাবীর লিদ-দারদীর, খ. ২, পৃ. ৫১১; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, প. ৪৩১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৯৫; আল-হাবী, খ. ১৫, পৃ. ১৯; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩৫।

৫৭. আল-কুরআন, ৬৫ : ৭।

www.amarboi.org

তাদের দলীলের দৃষ্টিকোণ হলো, আল্লাহ্ তাআলা স্বামীর ওপর তার স্ত্রীর প্রাত্যহিক ব্যয় ওয়াজিব করেছেন। এর মধ্যে চিকিৎসার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা চিকিৎসার বিষয়টি আকস্মিক ও সাময়িক।[৫৮]

ওষুধ ও চিকিৎসা খরচের উদ্দেশ্য শরীরের সুস্থতা বিধান। সুতরাং চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়।

**দুই. পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের উপকরণ এবং সুগন্ধি**

ফকীহদের মতে, স্বামীর ওপর ওয়াজিব হলো, মাথা ও চুলের যত্নের জন্য তেল, চিরুনি, এবং গোসলের জন্য সাবানসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ স্ত্রীকে সরবরাহ করা।[৫৯]

সুগন্ধি জাতীয় জিনিস নিছক আনন্দ ও উপভোগের জন্য হলে তার মূল্য পরিশোধ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়। তবে শরীরের অপছন্দনীয় গন্ধ দূর করার জন্য হলে তা সরবরাহ করা স্বামীর কর্তব্য।[৬০]

**তিন. খাদেমের মজুরি ও তার ভরণপোষণ**

ফকীহগণের মতে, উচ্চ বংশজাত হওয়ার কিংবা পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী স্ত্রী সাংসারিক কাজ করতে অভ্যস্ত না হলে অথবা রোগগ্রস্ত হলে স্বামীর জন্য আবশ্যক স্ত্রীর জন্য একজন সেবিকা নিয়োগ করা এবং সচ্ছলতা বিদ্যমান থাকার শর্তে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে, এক্ষেত্রে স্বামীর সচ্ছলতা থাকা শর্ত নয়। তাদের মতে, যে স্ত্রীর পক্ষে নিজের সেবা নিজে করা মানানসই নয় তার ক্ষেত্রে সচ্ছল ও অসচ্ছল সমান।

হাসান র.-এর বর্ণনানুযায়ী আবু হানীফা র.-এর মত হলো, স্ত্রীর জন্য পূর্ব থেকেই সেবিকা থাকলেও অসচ্ছল স্বামীর ওপর সেবিকার ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব নয়। কেননা, অসচ্ছল স্বামীর জন্য কেবলমাত্র স্ত্রীর ন্যূনতম খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব। ইমাম মুহাম্মাদ র.-এর মতে, আগে থেকেই স্ত্রীর সেবিকা থাকলে তার ব্যয়ভার বহন করা অসচ্ছল স্বামীর জন্যও ওয়াজিব। তবে আগে থেকে না থাকলে তা ওয়াজিব নয়। কারণ আগে থেকেই স্ত্রীর সেবক থাকায় বুঝা যায়, সে সেবিকা ছাড়া সম্মত হবে না। আর আগে থেকে সেবিকা না থাকা

---

৫৮. আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২০; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫১১।

৫৯. আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২০; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫১১; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩১।

৬০.. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ৫৪৯; আত-তাজু ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ১৮২-১৮৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩০-৪৩১।



www.amarboi.org

প্রমাণ করে যে, সে নিজের সেবা নিজে করতে সম্মত।[৬১] (বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম, 'খিদমাহ' خدمة)।

### অবাধ্য স্ত্রীর খোরপোষ

অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে, অবাধ্য স্ত্রীর খোরপোষ পাওয়ার অধিকার নেই। আল্লাহ্ তাআলার বাণী–

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"আর তোমরা যেসব স্ত্রীর অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান শ্রেষ্ঠ"।[৬২]

যুক্তির সপক্ষে তারা নবী স.-এর এ হাদীসও উল্লেখ করেছেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণী দ্বারা তাদেরকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো, তোমাদের বিছানা অন্য কেউ দলন করবে না, যা তোমরা অপছন্দ করো। অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে মৃদুভাবে প্রহার করবে। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো, যথারীতি তাদেরকে জীবিকা ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা"।[৬৩]

মূলকথা হলো, তারা অবাধ্যতা থেকে বিরত না হলে খোরপোষ পাবে না। (বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম 'নুশূয' نُشُوز বা অবাধ্যতা)।

### খোরপোষ না দেয়ায় বিচ্ছেদ দাবি করা

#### ক. স্বামী কাছে থাকা অবস্থায়

অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে, স্বামী কাছে থাকলে এবং সে সচ্ছল ও দৃশ্যত ধন-সম্পদের অধিকারী হলে স্ত্রী তার কাছে যাবতীয় অধিকার পূর্ণরূপে পাওয়ার দাবি

---

৬১. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ৫৪৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩১; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৩৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৬৩; আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২৪।

৬২. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪।

৬৩. হাদীসটি ইমাম মুসলিম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে উদ্ধৃত করেন, খ. ২, পৃ. ৮৮৯; সম্পা. ঈসা আল-হালাবী।

www.amarboi.org

করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী বিচ্ছেদ দাবি করতে পারবে না।[৬৪] অনুরূপভাবে তারা এরূপও মত পোষণ করেন যে, স্বামী খোরপোষ দিতে আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী তার সাথে থাকতে চাইলে থাকতে পারবে।

কিন্তু স্বামী অসচ্ছল হওয়ায় স্ত্রী তার সাথে সম্পর্ক রাখতে অসম্মত হলে সে বিচ্ছেদ দাবি করতে পারবে কি-না, এ ব্যাপারে ফকীহগণ দু'টি মত দিয়েছেন।

**প্রথম মত :** স্ত্রীর বিচ্ছেদ দাবি করার অধিকার নেই। তবে স্ত্রী নিজের খরচ মেটানোর জন্য উপার্জন করতে চাইলে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে না। ইবনে শুবরুমা, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান, আতা, যুহরী, হাসান, ইবনে আবী লায়লা প্রমুখ এ মত পোষণ করেছেন। হানাফী হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতও এটিই।[৬৫] এর সমর্থনে তারা আল্লাহর এ বাণীর দ্বারা দলীল পেশ করেন- وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও"।[৬৬]

তাদের দলীলের দৃষ্টিকোণ হলো, আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অসচ্ছলকে অবকাশ দেয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং আয়াতের ব্যাপকার্থ অনুসারে স্ত্রীও এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দেয়ার জন্য আদিষ্ট। সুতরাং স্ত্রী তালাকের দাবি করতে পারবে না।[৬৭]

এছাড়াও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণিত, হাদীসকেও তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জাবের রা. বলেন, একদা আবু বকর রা. রাসূলুল্লাহ স. এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাওয়ার সময় দেখলেন, তার দরজার সামনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের কাউকেই অনুমতি দেয়া হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর রা. কে অনুমতি দেয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর রা. আসলে তাকেও অনুমতি দেয়ায় তিনি প্রবেশ করে দেখলেন, নবী কারীম স. বসে আছেন এবং তার চারপাশে তার স্ত্রীগণ নিরবে অবস্থান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর রা. বললেন, আমি এমন একটি কথা বলব যা নবী কারীম র.-কে হাসাবে। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি (আমার স্ত্রী) বিনতে খারেজা আমার নিকট খোরপোষ চাইত তাহলে আমি তার

---

৬৪. বাল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২৭; শারহুল খারাশী, খ. ৪, পৃ. ১৯৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪২; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৪৩।

৬৫. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৬৫৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪২; আল-ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ৩৮৩।

৬৬. আল-কুরআন, ২ : ২৮০।

৬৭. ফাতহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১২।

www.amarboi.org

গলা টিপে ধরতাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ স. হেসে বললেন, তুমি যেভাবে তাদেরকে আমার চারপাশে দেখছ তারা অনুরূপ আমার কাছে খোরপোষ দাবি করছে। আবু বকর রা. উঠে আয়েশা রা.-এর কণ্ঠনালী চেপে ধরতে উদ্যত হলেন এবং উমরও রা. হাফসা রা.-এর গলা টিপে ধরতে উদ্যত হলেন। তাঁরা উভয়েই বলছিলেন, তেমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এমন কিছু দাবি করছ যা তাঁর কাছে নেই। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এমন কিছু চাইব না, যা তাঁর কাছে নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ স. তাঁদের থেকে একমাস বা ঊনত্রিশ দিন দূরে থাকলেন এরপর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলো :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"হে নবী তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করো, তবে আসো আমি তোমাদেরকে তা কিছুটা দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আকাঙ্ক্ষা করো তবে তোমাদের সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন" (সূরা আহযাব, ২৮-২৯)।

বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াত নাযিলের পর নবী স. আয়েশা রা. থেকে শুরু করে বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমার কাছে একটি বিষয় উত্থাপন কতে চাচ্ছি। আমি চাই তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ ছাড়া সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত জানাতে তাড়াহুড়া করবে না। আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিষয়টি কি? তখন আল্লাহর রাসূল স. তাকে আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনালেন। আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি আপনার ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করব? বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকে বেছে নিচ্ছি। আমি চাই আমি যা বললাম, তা আপনি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীকে বলবেন না। রাসূল স. বললেন, তাদের যে কেউ-ই আমাকে তা জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে কঠোর ও কষ্টদানকারীরূপে পাঠাননি; বরং আমাকে শিক্ষক ও কোমল স্বভাবসম্পন্ন করে পাঠিয়েছেন।[৬৮]

হাদীসটি প্রমাণ করে যে, স্বামীর নিকট যা নেই তার দাবি করা স্ত্রীর জন্য উচিত নয়, তালাক দাবি করাতো আরো দূরের কথা।

---

৬৮. হাদীসটি ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেন, খ. ২, পৃ. ১১০৪-১১০৫; সম্পা. ঈসা আল-হালাবী।

www.amarboi.org

**দ্বিতীয় মত :** স্বামী খোরপোষ দিতে অপারগ হলে স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করতে পারবে। স্বামী তাতে অসম্মত হলে বিচারক বিচ্ছেদ কার্যকর করবেন। এটি মালেকীদের[৬৯] মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত।[৭০] আর হাম্বলীদের নিকট এটিই বিশুদ্ধ মত।[৭১]

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে, এই বিচ্ছেদ বিবাহ বাতিলকরণ হিসেবে এবং মালেকীগণের মতে তালাকে রাজয়ী হিসেবে গণ্য হবে। এটি উমর রা., আবু হুরাইরা রা. ও ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, হাসান, ইসহাক ও অন্যরাও একই মত পোষণ করেছেন।[৭২]

তাদের দলীল হলো, আল্লাহর এ বাণী– فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
"স্ত্রীকে হয় বিধিমতো রাখবে, নয়তো উত্তম পন্থায় মুক্ত করে দিবে"।[৭৩]

আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করেছেন, হয় স্ত্রীকে বিধিসম্মতভাবে রাখতে হবে নয়তো উত্তমরূপে বিদায় দিতে হবে। স্বামী প্রয়োজনীয় খোরপোষ না দিলে বিধিসম্মতভাবে রাখা হয় না। সুতরাং দ্বিতীয়টি অবধারিত হয়ে যায়, আর তা হলো, উত্তমরূপে বিচ্ছেদ করে দেয়া।[৭৪]

বর্ণিত আছে একবার হযরত উমর রা. পরিবার ছেড়ে মদীনার বাইরে অবস্থানরত সেনাকর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য একটি চিঠি লিখে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তাদেরকে তাদের স্ত্রীদের নিকট ফিরে আসতে হবে এবং হয় তাদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে কিংবা খোরপোষ পাঠাতে হবে। তাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটাবে তারা পূর্বের বকেয়া খোরপোষ পাঠিয়ে দেবে।[৭৫]

এছাড়াও তাদের দলীল হলো, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব থেকে বর্ণিত যে, আবুয-যিনাদ এক ব্যক্তি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করল, যে তার স্ত্রীর খোরপোষ দিতে পারছে না। তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। আবুয-যিনাদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি সুন্নত? তিনি বললেন, হ্যাঁ সুন্নত।[৭৬] (বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম 'তালাক' طلاق)।

---

৬৯. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৯৬; শারহুল খারাশী, খ. ৪, পৃ. ১৯৬।
৭০. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১২।
৭১. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৪৩; আল-ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ৩৮৪।
৭২. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৪৩।
৭৩. আল-কুরআন, ২ : ২২৯।
৭৪. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৪৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৭৬।
৭৫. হাদীসটি ইমাম শাফেঈ আল-মুসনাদ, খ. ২, পৃ. ৬৫; এবং ইবনে আবী শায়বা আল-মুনসিফ, খ. ৫,প্. ২১৪; দারুস সালাফিয়্যা এ উদ্ধৃত করেন। শব্দ ইবনে আবী শায়বার।
৭৬. হাদীসটি ইমাম শাফেঈ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থে সনদের তারতীবে উদ্ধৃত করেন, খ. ২, পৃ. ৬৫।

www.amarboi.org

**খ. স্বামী কাছে না থাকলে**

স্বামী স্ত্রীর কাছে না থাকলে এবং স্ত্রীর খোরপোষ না দিলে অথবা খোরপোষের ব্যবস্থা করা যায় এ পরিমাণ সম্পদ না রেখে গেলে অথবা কাউকে খোরপোষের দায়িত্ব অর্পণ না করে থাকলে স্ত্রী তার অনুপস্থিত স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করতে পারবে কি-না, এ ব্যাপারে ফকীহগণ দু'টি মত দিয়েছেন।

**প্রথম মত** : এ অবস্থায় স্ত্রী বিচ্ছেদের দাবি করতে পারবে। এটি মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত,[৭৭] শাফেয়ীদের একটি মত।[৭৮] এটা হাম্বলীদের সিদ্ধান্ত,[৭৯] যদি স্ত্রী কারো কাছে ঋণ করতেও সক্ষম না হয়।

হযরত উমর রা. সম্পর্কিত একটি বর্ণনাকে এ ক্ষেত্রে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন। স্ত্রীদের ছেড়ে মদীনার বাইরে অবস্থানরত সেনাকর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে হযরত উমর রা. একটি চিঠি লিখে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তাদেরকে তাদের স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসতে হবে এবং হয় তাদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে নতুবা তাদের জন্য খোরপোষ পাঠাতে হবে। তাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটাবে তারা পূর্বের বকেয়া খোরপোষ পাঠিয়ে দেবে।[৮০]

–নাজমুল হুদা সোহেল

---

৭৭. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৪৪; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৯৬; শারহুল খারশী, খ. ৪, পৃ. ১৯৯।

৭৮. রওদাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৭২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪২।

৭৯. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৪৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪২৩; আল-মুবাদি, খ. ৮, পৃ. ২৩৩; আল-ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ৩৯১।

৮০. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১২; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ২৪৩; হাদীসের সূত্র প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

# স্ত্রীর অবাধ্যতা (نُشُوزٌ)

**সংজ্ঞা :** আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নুশূয্ শব্দটি النَّشْزُ (নাশযুন) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ উঁচুস্থান। যেমন আন-নাশায (النَّشَازُ) ও আন নাশায (النَّشَزُ) বলা হয় : نَشَزَ الشَّيْءُ نَشْزًا وَنُشُوزًا অর্থ স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য হয়েছে এবং নিজেকে তার থেকে বিরত রেখেছে।

বলা হয় : نَشَزَ بِه وَمِنْهُ وَعَلَيْه অর্থাৎ সে তার অবাধ্য হলো। এ কাজের কর্তা পুরুষকে বলা হয় نَاشِزٌ (নাশিয) এবং নারীকে نَاشِزٌ (নাশিয) ও نَاشِزَةٌ (নাশিযাহ) উভয়টিই বলা হয়। এর বহুবচন نَوَاشِزُ (নাওয়াশিয)।

আবু ইসহাক বলেন, নুশূয স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে হয়ে থাকে। আর তা হলো, তাদের উভয়ের একে অন্যকে অপছন্দ করা। শব্দটি নাশযুন শব্দ থেকে উৎপন্ন। আর তা হলো, যা মাটি থেকে উচ্চ হয়েছে (উঁচুস্থান)। আর نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا عَلَى زَوْجِهَا অর্থ—স্ত্রী স্বামীর ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। তাকে অপছন্দ করেছে, তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ "স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর।"[১]

অতএব نُشُوزُ الْمَرْأَةِ অর্থ স্ত্রীর স্বামীর অবাধ্য হওয়া। একইভাবে শব্দটি পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে স্ত্রীর সাথে অমিল, তাকে প্রহার, তার ওপর রূঢ় হওয়া, তাকে ক্ষতি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২]

পবিত্র কুরআনে রয়েছে : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
"যদি কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে।"[৩]

**নুশূয-এর পারিভাষিক অর্থ :**
হানাফীগণ এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে যে, অন্যায়ভাবে স্বামীর গৃহ থেকে স্ত্রীর বের হয়ে যাওয়া।[৪]

---

১. সূরা আন-নিসা, ৩৪।
২. আল-কামূসুল-মুহীত; আল-মুজামুল-ওয়াসীত; আল-মিসবাহুল-মুনীর; লিসানুল-আরাব।
৩. সূরা আন-নিসা, ১২৮।
৪. আদ্-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৬; আল-বারাকাতী, কাওয়াইদুল ফিক্হ।

www.amarboi.org

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ এর সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেছেন যে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ওয়াজিব আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া।[৫]

কোনো কোনো ফকীহ বর্ণনা করেছেন যে, নুশূয শুধু স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় এর বিপরীতটি (তথা স্বামীর পক্ষ থেকে) হয় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য ফকীহ বর্ণনা করেছেন, নুশূয যেমনিভাবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় তেমনিভাবে স্বামীর পক্ষ থেকেও হয়।

শারকাবী বলেন, নুশূয স্বামী স্ত্রী উভয়ের থেকে হয়। যদিও স্বামীর ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ প্রসিদ্ধ নয়। বাহুতী বলেন, বলা হয় :نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য হয়েছে। আর বলা হয় : نَشَزَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا এক্ষেত্রে অর্থ হবে, স্বামী স্ত্রীর ওপর নির্দয় হয়েছে এবং তার ক্ষতি করেছে।[৬]

## সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ

### ক. আত-তাআত (الطَّاعَةُ) বা আনুগত্য

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাআত অর্থ বশ্যতা স্বীকার ও আনুগত্য। আত তাহযীব গ্রন্থে এসেছে : طَاعَ لَهُ অর্থ– সে তার আনুগত্য করল। যখন কেউ তার নির্দেশ অনুযায়ী চলে তখন বলা হয়, সে তার আনুগত্য করেছে। বলা হয়, স্ত্রী তার স্বামীর পূর্ণ অনুগত হলো।[৭]

পরিভাষায় তাআত বলা হয়, স্বেচ্ছায় কোনো বিষয়ে আনুগত্য করা। ইমাম রাগেব আল-ইসফাহানী বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাআত বলা হয়, যা নির্দেশ দেয়া হবে তা পালন করা এবং যে নীতি নির্ধারণ করা হবে তা মান্য করা।[৮]
নুশূয ও তাআতের মধ্যে বৈপরীত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

### খ. ইরাজ (الإِعْرَاضُ) বা উপেক্ষা

ইরাজের আভিধানিক অর্থের মধ্যে একটি হলো الصَّدُّ (বিরত থাকা) বলা হয় أَعْرَضَ عَنِ الشَّيْءِ অর্থাৎ সে কোনো কিছু থেকে বিরত থেকেছে ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِه

"আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়।"[৯] বলা হয় أَعْرَضْتُ عَنْهُ অর্থাৎ আমি তার থেকে বিরত থেকেছি ও

৫. আশ-শারহুল কাবীর হাশিয়া দাসূকীসহ, খ. ২, পৃ. ৩৪৩; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৫১১; হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ২৯৯; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৬।
৬. মাওয়াহিবুল-জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৫; হাশিয়াহ কালয়ূবী, খ.৩, পৃ. ২৯৯; হাশিয়াহ শরকাবী আলা শরহিত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ২৮০; কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ২০৯।
৭. আল-মুজামুল ওয়াসীত; লিসানুল আরাব।
৮. কাওয়াইদুল ফিক্‌হ; আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন।
৯. সূরা বনী ইসরাঈল, ৮৩।

www.amarboi.org

পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছি। ইমাম রাগিব বলেন : الْعَرْضُ শব্দটি الْجَانِبِ তথা পার্শ্বের জন্য নির্দিষ্ট, عَرَضَ الشَّيْءُ অর্থ–তার উপেক্ষা প্রকাশ পেল এবং أَعْرَضَ অর্থ সে উপেক্ষা করল এবং পার্শ্ব প্রদর্শন করল। আর যখন বলা হবে, أَعْرَضَ عَنِّي তখন অর্থ হবে, সে তার পার্শ্ব প্রদর্শন করে ফিরে গেল। পারিভাষিক অর্থ আভিধানিক অর্থ থেকে পৃথক নয়।[১০]

ইরাজ (উপেক্ষা) ও নুশূয (অবাধ্যতা)-এর মধ্যকার সম্পর্ক হলো, ইরাজ নুশূযের লক্ষণসমূহের অন্যতম একটি লক্ষণ।

### গ. বুগ্‌জ (الْبُغْضُ) বা ঘৃণা ও বিদ্বেষ

বুগদ হলো, অপছন্দ ও ঘৃণা করা। বলা হয় : بَغَضَ الشَّيْءُ بُغْضًا অর্থাৎ সে তাকে অপছন্দ করেছে ও ঘৃণা করেছে। আর أَبْغَضَهُ ও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার بَغُضَ الشَّيْءُ بُغْضًا ও بَغُضَ الشَّيْءُ بَغَاضَةً وَبِغْضَةً অর্থ– জিনিসটি ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় হয়েছে এবং بَاغَضَهُ অর্থ ঘৃণার প্রতিদানে ঘৃণা করেছে। আর الْبَغْضَاءُ অর্থ তীব্র ঘৃণা। আল-বারাকাতী বলেন, এর দ্বারা অন্তরের ঘৃণা বুঝায়। রাগেব বলেন, বুগজ বলা হয় এমন বিষয়ের প্রতি অন্তরের ঘৃণাকে যা সে বর্জন করতে চায়। আর এটি হলো পছন্দের বিপরীত।[১১]

নুশূয ও বুগজ এর মধ্যকার সম্পর্ক হলো, বুগদ বা ঘৃণা নুশূয বা অবাধ্যতার একটি উপলক্ষ ও তার লক্ষণ।

### নুশূয এর শরয়ী বিধান :

ফকীহগণের মতে স্বামীর অবাধ্য হওয়া স্ত্রীর জন্য হারাম। কেননা স্ত্রীর ওপর স্বামীর মর্যাদা ও তার আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে।[১২]

তন্মধ্যে একটি হাদীস হলো, এক নারীর উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ স. বললেন :

أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

'তোমার কী স্বামী আছে? সে বলল, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, তাহলে লক্ষ্য কর, তার

---

১০. আল-মুজামুল ওয়াসীত; আল-মিসবাহুল-মুনীর; আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন। আরো দ্র. তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ৪০৩।

১১. আল মুজামুল ওয়াসীত আল-মিসবাহুল মুনীর; কাওয়াইদুল ফিকহ; আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন।

১২. বাদায়ে'উস-সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩৪; আশ-শারহুল কাবীর ওয়া হাশিয়াহ দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৩; আশ্-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৫১১; শারহুত-তাহরীর ওয়া হাশিয়াহ শারকাবী, খ. ২, পৃ. ২৮৫; তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ৪৯১-৪৯২; আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ১৭১।

www.amarboi.org

তুলনায় তোমার অবস্থান কোথায়! কেননা সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।[১৩]
আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন–

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"যখন কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমজান মাসে রোযা পালন করবে, নিজ লজ্জাস্থান হেফাজত করবে, তার স্বামীর আনুগত্য করবে তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের দরজাসমূহের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর।[১৪]

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন–

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"আমি যদি কাউকে (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য কারো সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে নারীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।"[১৫]

অনুরূপভাবে ফকীহগণ স্বামীর অবাধ্যতা স্ত্রীর জন্য হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেসব হাদীসে স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে কঠোরভাবে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন– মহানবী স. বলেন–

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"যখন কোনো নারী তার স্বামীর বিছানা ছেড়ে আলাদাভাবে রাত্রি যাপন করে তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।[১৬]

আবু হুরায়রা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন–

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আহ্বান করে; কিন্তু স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ দিতে থাকে।"[১৭]

---

১৩. মুসনাদে আহমদ : খ. ৬, পৃ. ৪১৯, আল-মায়মানিয়া সং., আত্‌তারগীব ওয়াত তারহীব এর সনদকে উত্তম বলেছেন, খ. ২, পৃ. ৬৭২।

১৪. মুসনাদে আহমদ, খ. ১, পৃ. ১৯১ আল-মায়মানিয়া সং.; আল-মুনযিরী আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব-এ বলেন, আত-তাবারানী এটি রেওয়ায়াত করেছেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসের রাবী ইবনে লাহীআ ছাড়া আর সকলে সহীহ হাদীসের রাবী। উক্ত হাদীস হাসান পর্যায়ের, খ. ২, পৃ. ৬৭১।

১৫. তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৪৬৫ (সম্পা. আল-হালাবী), তিনি এটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

১৬. বুখারী, খ. ৯, পৃ. ২৯৪; মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১০৫৯।

১৭. বুখারী, খ. ৯, পৃ. ২৯৪; মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১০৬০।

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, নেককার নারীগণ অনুগত অর্থাৎ তাদের স্বামীদের আনুগত্যকারিণী এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী–

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"নেককার স্ত্রীগণ অনুগত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষিত করেছেন তা হেফাজতকারিণী।"[১৮]

ইবনে আব্বাস রা. ও অন্যান্যরা এ মত পোষণ করেছেন। তিনি এও বর্ণনা করেছেন যে, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাজতকারিণী অর্থাৎ তারা তাদের স্বামীদের অবর্তমানে তাদের সম্পদ ও নিজেদের সতীত্ব হেফাজত করে।[১৯]

কুরতুবী বলেন, আল্লাহর বাণী–নেককার নারীগণ অনুগত, লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাজতকারিণী" এ এমন এক খবর যা দ্বারা স্বামীর আনুগত্য ও স্বামীর অবর্তমানে তার সম্পদ ও নিজ সতীত্বের অধিকার সংরক্ষণ করার নির্দেশ প্রদানই উদ্দেশ্য।[২০]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন–

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

"সর্বোত্তম স্ত্রী সেই মহিলা যখন তুমি তার দিকে তাকাবে তোমাকে আনন্দ দিবে, যখন তাকে কোনো নির্দেশ দিবে সে তা পালন করবে এবং যখন তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকবে সে তার জীবন (সতীত্ব) ও তোমার সম্পদ সংরক্ষণ করবে।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ স. তিলাওয়াত করলেন–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. "পুরুষগণ নারীগণের দায়িত্বশীল।"[২১]

ইবনে হাজার আল-হায়তামী বলেন, নুশূয কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য। এ বিষয়টি ফকীহগণের বিরাট একটি দল বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ তাদের এ উক্তি দ্বারা এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেননি যে, 'কোনো কারণ ছাড়া স্বামী থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর জন্য কবীরা গুণাহ' বরং এর দ্বারা তারা অবাধ্যতার সকল পদ্ধতির প্রতি সতর্ক করেছেন।[২২]

---

১৮. সূরা আন-নিসা, ৩৪।

১৯. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ৪৯১; আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ১৭০।

২০. আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ১৭০।

২১. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আত-তাবায়ী তার তাফসীর গ্রন্থে, খ. ৫, পৃ. ৩৯০, দারুল-মারেফা বৈরূত; হাকেম, খ. ২, পৃ. ১৬১-১৬২; মূল পাঠ আত-তাবারীর। আল-হাকেম বলেন, মুসলিম-এর শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ ।

২২. আয-যাওয়াজের 'আন ইকতিরফিল কাবাইর, খ. ২, পৃ. ৪৭।

www.amarboi.org

**যেসব কাজ স্ত্রীর জন্য অবাধ্যতা বলে গণ্য**

যেসব কাজে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্যতা হয় সে সম্পর্কে ফকীহ্গণ মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

হানাফীগণ বলেন, অবাধ্য স্ত্রীর জন্য তার পক্ষ থেকে নিজেকে স্বামীর নিকট পূর্ণরূপে সমর্পণ না থাকার কারণে তার কোনো ভরণপোষণ নেই। আর এটাই অবাধ্যতা। এ অবাধ্যতা কখনও বিবাহে থাকা অবস্থায় আবার কখনো ইদ্দাত অবস্থায় হয়ে থাকে।

বিবাহ অবস্থায় অবাধ্যতা হলো, স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ থেকে অন্যায়ভাবে বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে নিজেকে তার থেকে বিরত রাখা। যেমন তার অনুমতি ছাড়া বের হওয়া ও অনুপস্থিত থাকা অথবা ভ্রমণ করা। আর যদি স্ত্রী তার স্বামীর গৃহে অবস্থান করে কিন্তু নিজেকে স্বামী থেকে বিরত রাখে তাহলে সে খোরপোষ প্রাপ্য হবে। কেননা সে স্বামীর অধিকারের জন্য আবদ্ধ আছে প্রকাশ্যভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তার থেকে উপকৃত হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট তাকে সমর্পণের অর্থ পাওয়া যায়।

রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে এসেছে, স্বামীর গৃহ থেকে স্ত্রীর আইনগত বহির্গমনও অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন স্ত্রী যে গৃহে বসবাস করে তা স্ত্রীর নিজের কিন্তু সে ঐ গৃহে স্বামীকে প্রবেশ করতে নিষেধ করে তবে সে গৃহ থেকে বহির্গমনকারিণী হিসেবে গণ্য হবে। যদি সে উক্ত গৃহ থেকে স্থানান্তরের দাবি না করে থাকে। যেমন সে তার স্বামীকে বলল, আমাকে তোমার গৃহে স্থানান্তর কর। অথবা আমার জন্য একটি গৃহ ভাড়া কর। কেননা আমি আমার এই বাড়িটি ভাড়া প্রদান করার মুখাপেক্ষী। তবে সে ক্ষেত্রে তার জন্য খোরপোশ বহাল থাকবে।

যদি গৃহে সন্দেহ থাকে যেমন সরকারি বাড়ি ফলে সে নিজেকে স্বামী থেকে বিরত রাখে, তবে সে অবাধ্য বলে গণ্য হবে। কারণ বর্তমান সময়ে সন্দেহকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। প্রক্ষান্তরে যদি স্ত্রী জবরদখলকৃত গৃহ থেকে বের হয়ে যায় তবে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা জবরদখলকৃত গৃহে বসবাস করা হরাম। আর হারাম থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। অপরপক্ষে সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা মুস্তাহাব। অতএব এর ওপর স্বামীর ওয়াজিব অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যদি স্ত্রী নিজেকে শুধু রাতে অথবা শুধু দিনে সমর্পণ করে বিপরীত সময়ে নয়, তাহলে সমর্পণের ত্রুটি তথা কমতির কারণে তার খোরপোষ আবশ্যক হবে না। আল-মুজতাবা গ্রন্থে এসেছে, এ বিধান দ্বারা বর্তমান সময়ের একটি বাস্তবতার উত্তর জানা যায়। আর তা হলো, যদি কেউ কর্মজীবী কোনো নারীকে বিবাহ করে যে তার নিজের কল্যাণে দিন অতিবাহিত করে ও রাতে স্বামীর কাছে থাকে,

www.amarboi.org

তাহলে তার জন্য খোরপোষ আবশ্যক নয়। 'আন নাহার' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ হিসেবে ইবনে আবিদীন বলেছেন, উপর্যুক্ত অবস্থায় স্ত্রী নিজ কল্যাণহেতু কর্মরত থাকায় সে ওজরপ্রাপ্ত হবে। যে বিধানের ওপর কিয়াস করা হয়েছে তা ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা তার (যে শুধু রাতে বা দিনে নিজেকে সমর্পণ করে) কোনো ওজর নেই। অতএব তার ক্ষেত্রে সমর্পণের ক্রটি ও ঘাটতি প্রযোজ্য হবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে তা (চাকরি ইত্যাদি) থেকে নিষেধ করে অতঃপর সে তার কথা না শোনে এবং অনুমতি ছাড়াই বের হয়, তবে যতক্ষণ সে বাইরে অবস্থান করবে ততক্ষণ সে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি নিষেধ না করে তবে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে না।[২৩]

ইদ্দত অবস্থায় অবাধ্যতা হলো, যে বাড়িতে সে ইদ্দাত পালন করছে তা থেকে স্বামীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বের হওয়া অথবা নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যে বের হওয়া। বর্ণিত আছে, ফাতিমা বিনতে কায়েস তার শ্বশুরদেরকে গালি দিত। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ থেকে বর্ণিত, ফাতিমা বিনতে কায়েস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবু আমর ইবনে হাফসা ইবনে মুগীরার স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাকে সর্বশেষ তিন তালাক প্রদান করেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, তিনি নিজ গৃহ থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া নেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসেন। রাসূলুল্লাহ স. তাকে অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মারওয়ান তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ঘর থেকে বের হওয়ার বিষয়ে তাকে সত্যায়ন করতে অস্বীকার করেন। উরওয়া বলেন, আয়েশা রা. ফাতিমা বিনতে কায়েসের এ বিষয়টি অস্বীকার করেন।[২৪] আর এ জন্যও যে, এ বের হওয়াটি ছিল তার পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যে। তাই তিনি যেন স্বামীর ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে নিজেই বের হয়েছিলেন।

মালেকীগণ বলেন, স্ত্রীর অবাধ্যতা সাব্যস্ত হয় যার দ্বারা তার মধ্যে রয়েছে, স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীকে সঙ্গম ও সম্ভোগ থেকে বাধা দেয়া, এটিই প্রসিদ্ধ মত। তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে এমন কোনো স্থানে বের হওয়া যার সম্পর্কে তার জানা আছে যে, সেখানে যাওয়ার অনুমতি স্বামী প্রদান করবে না বা যেখানে বের হওয়া আবশ্যক নয়। স্বামীর প্রথম থেকেই তাকে নিষেধ করতে অতঃপর তার আনুগত্যে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হওয়া। আর যদি প্রথমেই তাকে নিষেধ করতে সক্ষম হয় অথবা সংশোধনের মাধ্যমে বা শাসকের মধ্যস্থতায় ফিরাতে পারে

---

২৩. বাদায়ে'উস-সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ২২; আল-ইখতিয়ার, খ. ৪, পৃ. ৫; আদ্ দুররুল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৭।

২৪. সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১১১৬ (সম্পা. ঈসা আল-হালাবী)।

www.amarboi.org

তবে স্ত্রী অবাধ্য বলে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী আল্লাহর বিধান পরিত্যাগের মাধ্যমেও অবাধ্য হয়। যেমন-গোসল, নামায, রমজানের রোযা, স্বামীকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করা, তার নিজের সতীত্বে বা স্বামীর সম্পদে খিয়ানত করা।[২৫]

শাফেয়ীগণ বলেন, যার দ্বারা স্ত্রীর অবাধ্যতা সাব্যস্ত হয় তা হলো, কাযীর নিকট নিজ অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া ছাড়া স্বামীর বিনা অনুমতিতে গৃহ থেকে বের হওয়া। স্বামীর আর্থিক সঙ্কট না থাকলে ভরণপোষণের জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। স্বামী ফকীহ হলে বা তাকে ফাতওয়া প্রদান করতে সম্মত হলে অন্যত্র ফাতওয়া গ্রহণের জন্য বের হওয়া। আটা-ময়দা বা জরুরী সামগ্রী ক্রয়ের প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া। তবে স্ত্রী যদি গৃহ ভেঙ্গে পড়ার ভয়ে অথবা স্বামীর অবর্তমানে তার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর উৎখাতের কারণে অথবা ঘরের ভাড়া পরিশোধ করার জন্য অথবা ভাড়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ভাড়াটের কাছে যাওয়ার জন্য বের হয়, অনুরূপভাবে যদি নিজ এলাকায় তার প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে বের হয় যেমন সে হাম্মামের পরিচালিকা কিংবা কেশ বিন্যাসকারিণী অথবা ধাত্রী হিসেবে নিয়োজিত হয় তবে তাকে অবাধ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না।

স্ত্রী অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে তার স্বামীর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়ার এবং স্বামীর প্রবেশের জন্য বন্ধ দরজা খুলে না দেয়া, স্বামীকে আটকে রাখা, তালাক দাবী করার কারনে।

স্ত্রী তার স্বামীকে বিনা ওজরে তাকে সম্ভোগ করা থেকে বাধা দেয়ার মাধ্যমে অবাধ্য হয়। আর যদি তার ওজর থাকে, যেমন স্বামী স্থায়ী দুর্গন্ধযুক্ত যার কষ্ট সহ্য করা যায় না, সে ক্ষেত্রে স্ত্রী অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে না। এ ব্যাপারে স্ত্রীর কথা তখনই বিশ্বাসযোগ্য হবে যখন তার মিথ্যার ক্ষেত্রে শক্তিশালী কোনো লক্ষণ বা প্রমাণ না পাওয়া যায়।

তারা (শাফেয়ীগণ) বলেন, স্ত্রী যদি স্বামীকে গালি দেয় বা কথার দ্বারা কোনো প্রকার কষ্ট দেয় তা হলে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এর কারণে স্ত্রী গুনাহগার হবে এবং শিক্ষামূলক শাস্তিদানের উপযুক্ত হবে।

একইভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীদেরকে তার ঘরে আসার জন্য আহ্বান করে, যে ঘর তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত করেছেন, অতঃপর তাদের কেউ সেখানে আসতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তা হবে অবাধ্যতা। অপরপক্ষে যদি তাদের কাউকে সতীনের ঘরে উঠার জন্য আহ্বান করে, তবে তা থেকে তার বিরত থাকা অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হবে না।

---

২৫. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৫১১; শরহুয্ যারকানী, খ. ৪, পৃ. ৬০; আশ-শারহুল কাবীর মা'আ হাশীয়াহ আদ্-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৩।

www.amarboi.org

স্ত্রী যখন স্বামী ছাড়া এবং তার বিনা অনুমতিতে ভ্রমণ করবে তখন সে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে। অথবা স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক, তবে তা স্বামী ছাড়া অন্যের প্রয়োজনে। যেমন–তার নিজের প্রয়োজনে অথবা ভিন্ন কারো প্রয়োজনে অথবা উভয়ের প্রয়োজনে অথবা কোনো প্রয়োজন ছাড়াই যেমন প্রমোদ ভ্রমণ।

স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই ভ্রমণ করে তবে স্বামী তাকে নিষেধ না করলে সে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে না। আর যদি স্বামী তাকে নিষেধ করে থাকে তবে সে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে। তবে হ্যাঁ, যদি স্বামী তাকে সফরে উপভোগ করে তাহলে উপভোগের পর তাকে আর অবাধ্য বলে গণ্য করা হবে না। কেননা তাকে সম্ভোগ করার অর্থ তার সাহচর্যে সন্তুষ্ট থাকা।

স্ত্রী যদি দেশের ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির কারণে প্রস্থান করে এবং সেখানকার অধিবাসীরাও প্রস্থান করে আর এ কাজ শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী করে, তবে সে অবাধ্য বলে গণ্য হবে না।

তারা বলেন, স্ত্রীর কথার দিক থেকে অবাধ্যতার একটি লক্ষণ হলো, সে তার স্বামীর ডাকের উত্তর কর্কশ ভাষায় প্রদান করে, অথচ ইতঃপূর্বে সে কোমল কণ্ঠে উত্তর প্রদান করত। আর কর্কশ ভাষা যদি তার স্বভাবগত হয়ে থাকে তবে তা অবাধ্যতা হবে না। কিন্তু যদি তা স্বভাবগত পর্যায় থেকে বেশি হয় তবে তা অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে।

স্ত্রীর কাজের দিক থেকে অবাধ্যতার লক্ষণসমূহের অন্যতম লক্ষণ হলো, তার পক্ষ থেকে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যভাব পাওয়া যাবে। কেননা এটি কেবল অপছন্দের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এ কারণে গালি গালাজকে এ বিধান থেকে আলাদা করা হয়েছে। কেননা এটি কুস্বভাবের কারণে হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে তাকে শিক্ষাচার শিষ্টাদানের উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদানের অধিকার স্বামীর রয়েছে। যদিও শাসকের নির্দেশ ছাড়া হয়।[২৬] হাম্বলীগণ বলেন, অবাধ্যতার লক্ষণ হলো, যেমন- স্বামী তাকে উপভোগের জন্য ডাকলে বিষণ্নতা প্রকাশ করা বা বাধাদান করা। অপছন্দ ও অসন্তোষ ছাড়া তার কাছে গমণ না করা অথবা অনিচ্ছায় বিরক্ত হয়ে তার ডাকে সাড়া দেওয়া এবং তার অধিকারের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার বর্জন করা। স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্যতা হলো, আল্লাহ্ যেসব বিষয়ে তার আনুগত্য ফরয করেছেন তা অগ্রাহ্য করা। তার বিছানায় যাওয়া থেকে বিরত থাকা অথবা তার অনুমতি ছাড়া তার গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়া।[২৭]

---

২৬. শরহুল-মিনহাজ ওয়া হাশিয়াতুল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৫, খ. ৪, পৃ. ৭৮; শরহুত-তাহরীর ওয়া হাশিয়া শারকাভী, খ. ২, পৃ. ২৮৩-২৮৫।

২৭. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ২০৯।

www.amarboi.org

**খোরপোষের ওপর অবাধ্যতার প্রভাব**

স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে তার খোরপোষ রহিত হওয়ার বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। জমহুর ফকীহগণ যার মধ্যে রয়েছে হানাফী, প্রসিদ্ধমত অনুযায়ী মালিকী, হাম্বলী, শা'বী, হাম্মাদ, আওযায়ী, আবু ছাওর প্রমুখের মতে, অবাধ্য স্ত্রীর জন্য কোনো খোরপোষ ও বাসস্থান নেই। কেননা স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট অর্পণের ফলে খোরপোষ আবশ্যক হয়। এর দলীল হলো, স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণের পূর্বে খোরপোষ আবশ্যক হয় না। আর যদি স্বামী খোরপোষ প্রদান না করে তবে স্ত্রীর নিজেকে স্বামীর নিকট অর্পণ করা হতে বিরত থাকার অধিকার রয়েছে। আর যদি স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সম্পর্ণ করা থেকে বিরত রাখে তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদান না করার অধিকার আছে, যেমন সহবাসপূর্ব অবস্থায় হয়ে থাকে।

মালেকী মাযহাবের কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, অবাধ্যতার কারণে খোরপোষ রহিত হবে না। তারা তাদের মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, স্ত্রী অবাধ্য হলে তার মোহর রহিত হয় না একইভাবে তার খোরপোষও রহিত হবে না।[২৮]

অবাধ্যতার কারণে খোরপোষ রহিত হওয়ার প্রবক্তা ফকীহগণের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :
হানাফীগণ বলেন, অবাধ্য স্ত্রীর জন্য খোরপোশ নেই। কেননা এখানে স্ত্রীর পক্ষ থেকে সমর্পণ অনুপস্থিত। আর এটিই অবাধ্যতা। তাদের নিকট অবাধ্যতা দুইভাগে বিভক্ত; বিবাহ শুদ্ধ থাকা অবস্থায় অবাধ্যতা, ইদ্দত অবস্থায় অবাধ্যতা। এ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী অবাধ্যতার কারণে ফরজ খোরপোষ রহিত হয় তবে খোরপোষের জন্য গৃহীত ঋণ রহিত হবে না। অর্থাৎ যদি স্বামীর কাছে স্ত্রীর কয়েক মাসের ফরয খোরপোষ বাকি থাকে অতঃপর স্ত্রী অবাধ্য হয় তবে বিগত মাসসমূহের খোরপোষ রহিত হয়ে যাবে। অপরপক্ষে যদি স্বামী স্ত্রীকে ঋণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে থাকে ফলে সে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তবে তা রহিত হবে না। ইবনে আবেদীন বলেন, ফরজ খোরপোষ রহিত হওয়ার বিষয়টি আল-জামি'গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে খোরপোষের জন্য গৃহীত ঋণের বিষয়টি 'আয-যাখীরা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, দু'টি বর্ণনার ভিত্তিতে এটি মৃত্যুর মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। বর্ণনা দু'টির অধিকতর শুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী রহিত হয় না। পরিস্থিতির দাবি এটাই যে, যদি স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসে তবে যা রহিত হয়েছে তা

২৮.আল-বাদায়ে', খ. ৪, পৃ. ২২; আল-ইখতিয়ার, খ. ৪, পৃ. ৫; আদ্ দুররুল মুখতার ওয়া রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৭; আয্‌যারকানী; খ. ৪, পৃ. ২৫০-২৫১; হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ১৮৭-১৮৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৬; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১১।

www.amarboi.org

ফেরত দেয়া হবে না। আর স্বামীর ঘরে ফিরে আসার পর ফরযটি কি বাতিল হয়ে যাবে যা পুনরায় নবায়ন করতে হবে? প্রকাশ্যমান এটিই যে, তা বাতিল হবে না। কেননা তাদের বক্তব্য ছিল ফরজ খোরপোষ রহিত হওয়ার ব্যাপারে, ফরজ রহিত হওয়ার ব্যাপারে নয়।[২৯]

মালেকীগণ একমত হয়েছেন যে, অবাধ্য স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তবে তার খোরপোষ রহিত হবে না। কেননা সে সময় খোরপোষ প্রদান করা হবে গর্ভস্থ শিশুর কারণে। একইভাবে যদি রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হয় এবং বিনা অনুমতিতে বের হয় তবে একই বিধান প্রযোজ্য। কেননা এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে বের হওয়া থেকে নিষেধ করার কোনো অধিকার স্বামীর নেই।
উপর্যুক্ত দু'টি অবস্থা ছাড়া অবাধ্য স্ত্রীর খোরপোষ রহিত হওয়ার ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছেন।

তাদের কেউ কেউ বলেন (আর এটিই প্রসিদ্ধ মত) যে, স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বিনা ওজরে সহবাস বা সম্ভোগ থেকে বিরত রাখে তবে যেদিন নিষেধ করবে ঐ দিনের খোরপোষ রহিত হয়ে যাবে।

তারা বলেন, অন্য আরো যে ক্ষেত্রে তার খোরপোষ রহিত হবে তা হলো, যদি স্ত্রী স্বামীর বাড়ি থেকে অথবা আনুগত্যের স্থান থেকে অন্যায়ভাবে বিনা অনুমতিতে বের হয় এবং স্বামী নিজে অথবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা শাসকের মধ্যস্থতায় তাকে ফিরিয়ে আনতে না পারে। আর তার বহির্গমন যদি জ্ঞাত স্থানে হয় এবং স্বামী তাকে প্রথমেই বাধাদানে সক্ষম না হয়। আর যদি সে তাকে বাধাদানে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বাধা না দিয়ে থাকে তবে তার খোরপোষ রহিত হবে না। কতিপয় মালেকী বলেন, স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করার পর অবাধ্যতার কারণে খোরপোষ রহিত হবে না। এ ব্যাপারে তাদের মতামত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৩০]

শাফেয়ীগণ বলেন, স্বামীর অবাধ্যতার কারণে অর্থাৎ স্বামীর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেলে খোরপোষ রহিত হবে যদিও স্ত্রী স্বামীর বাড়ি থেকে বের না হয়। অথবা স্বামী তাকে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়। যদিও তাকে স্পর্শ করা অথবা দৃষ্টিদানে স্ত্রী বাধা দেয়। যেমন–বিনা ওজরে প্রকৃতই মুখমণ্ডল আবৃত করে। পুরা দিন বিনা ওজরে অবাধ্য থাকলে পুরা দিনের খোরপোষ রহিত হবে। অধিকতর

---

২৯. আদ্‌দুররুল মুখতার ওয়া রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৭।

৩০. ইকদুল জাওয়াহিরিছ-ছামীনা, খ. ২, পৃ. ৩০৯; শারহুয-যারকানী, খ. ৪, পৃ. ২৫০-২৫১; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫১৪; আশ-শারহুস-সাগীর, খ. ২, পৃ. ৫১১, ৭৪০; আল-হাত্তাব মাআত-তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ১৮৭-১৮৮।



www.amarboi.org

শুদ্ধমত অনুযায়ী দিনের একাংশ অবাধ্য থাকলেও অনুরূপ হুকুম। কালয়ূবী বলেন, এটিই নির্ভরযোগ্য মত। মৌসুমের পোশাক প্রদানের বিধান দিনের জন্য প্রযোজ্য খোরপোষের বিধানের মতো। আর যদি স্ত্রী দিনের বাকি অংশে অথবা রাতে অথবা মৌসুমের মধ্যে স্বামীর আনুগত্যে ফিরে আসে তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তার স্ত্রীকে উপভোগ না করবে ততক্ষণ স্ত্রী খোরপোষ ফেরত পাবে না।

পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কা নারীর অবাধ্যতা বিবেকসম্পন্না পূর্ণবয়স্কার মতো। যদিও তাদের কোনো পাপ নেই। যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞত থাকা অবস্থায় তার জন্য রসদ সরবরাহ করে অতঃপর অবাধ্যতার বিষয়ে অবগত হয় তবে উক্ত রসদ ফেরত নেয়ার অধিকার তার থাকবে। যদি স্ত্রী তা ব্যয় করে ফেলে তবে তা ফেরত নেয়া সহীহ্ হবে না।

আল-আনসারী দিনের কিছু অংশের অবাধ্যতার কারণে সম্পূর্ণ দিনের খোরপোষ রহিত হওয়ার বিষয়ে বলেন, তার খোরপোষ রহিত হবে। কেননা তা বিভাজ্য হয় না, এই দলীলের ভিত্তিতে যে, সেটি একবারেই অর্পণ করা হয়, সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যে বিভাজন করা হয় না।[৩১]

হাম্বলীগণ বলেন, অবাধ্য স্ত্রীর জন্য খোরপোষ বা বাসস্থান নেই। কেননা স্ত্রী নিজেকে সমর্পণের বিনিময়ে খোরপোষ আবশ্যক হয়। এই দলীলের ভিত্তিতে যে, স্ত্রী নিজকে স্বামীর নিকট সমর্পণের পূর্বে খোরপোষ আবশ্যক হয় না। যদি স্বামী তাকে খোরপোষ প্রদান না করে তবে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ না করার। একইভাবে স্ত্রী যদি নিজকে স্বামীর নিকট সমর্পণ না করে তবে স্বামীর অধিকার রয়েছে খোরপোষ প্রদান না করার। যেমন সহবাসের পূর্বের বিধান। আর যদি ঐ স্ত্রী থেকে তার কোনো সন্তান থাকে তবে সন্তানের খোরপোষ প্রদান করা তার কর্তব্য। কেননা এটি তার ওপর ওয়াজিব। স্ত্রীর অপরাধের কারণে তার অধিকার রহিত হবে না। এছাড়া স্ত্রী যদি তার সন্তানের পালনকারিণী বা দুগ্ধদানকারিণী হয় তবে তার খোরপোষ প্রদান করা স্বামীর কর্তব্য। একইভাবে স্ত্রীকে দুগ্ধপান করানোর বিনিময় প্রদান করাও তার ওপর আবশ্যক হবে। কেননা এটি দুগ্ধদান করার বিনিময়ে তার প্রাপ্য, সম্ভোগের বিপরীতে নয়। অতএব সম্ভোগের অবর্তমানে তা বিলুপ্ত হবে না।

### অবাধ্যতা পরিত্যাগের কারণে খোরপোষ পুনরায় চালু হওয়া

অবাধ্যতার কারণে খোরপোষ রহিত হওয়ার ফয়সালা দানকারী ফকীহগণ-এর মতে অবাধ্য স্ত্রী যদি তার অবাধ্যতা থেকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার স্বামীর

---

৩১. শরহুল-মিনহাজ ওয়া হাশিয়াতান কালয়ূবী ওয়া আমীরাহ্, খ. ৪, পৃ. ৫৪, ৭৮, ৭৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০২; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৩৩।

www.amarboi.org

কাছে ফিরে আসে তাহলে খোরপোষ রহিত হওয়ার কারণ দূরীভূত হওয়ায় পুনরায় তার খোরপোশ চালু হবে। এ ব্যাপারে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে :

হানাফীগণ বলেন, অবাধ্য স্ত্রী তার স্বামীর বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার খোরপোষ রহিত থাকবে। যদিও স্বামীর সফরে বের হওয়ার পর আসে। অতএব, স্ত্রী যদি স্বামীর সফরের পর তার বাড়িতে ফিরে আসে তবে সে অবাধ্য হওয়ার বিধান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং খোরপোষের হকদার হবে। সে মুহূর্তে স্ত্রী স্বামীর কাছে তার খোরপোষ প্রদানের জন্য পত্র লিখবে অথবা তার বিষয়টি বিচারকের বরাবর উত্থাপন করবে, যাতে তিনি স্বামীর উপর তার খোরপোষ প্রদান আবশ্যক করেন। এসব ব্যবস্থার কোনো একটি ছাড়া সে যদি নিজেই নিজের খোরপোষ বহন করে তবে তা তাকে ফেরত দেয়া হবে না। কেননা খোরপোষ বিচারকের রায় অথবা উভয়ের সম্মতিতে ছাড়া ঋণ হিসেবে গণ্য হয় না। অতএব বিচার এবং উভয়ের সন্তুষ্টি ছাড়া অতীতের খোরপোষ রহিত হয়ে যাবে।[৩২]

শাফেয়ীগণ বলেন, ইদ্দতপালনকারিণী অবাধ্য স্ত্রীর জন্য বাসস্থান প্রদান আবশ্যক নয়। তাই তা তালাকের পূর্বে হোক, যেমনটি বর্ণনা করেছেন কাজী ইয়ায ও অন্যান্যরা; অথবা ইদ্দতপালনকালে হোক, যেমনটি বর্ণনা করেছেন আল-মুতাওয়াল্লী। স্ত্রী যদি আনুগত্যে ফিরে আসে তবে তার বাসস্থানের অধিকারও ফিরে আসবে, যেমনটি বর্ণনা করেছেন আল-মুতাওয়াল্লী। কেউ কেউ বলেন, স্ত্রী যদি স্বামীর বাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় তার অবাধ্য হয়, তবে ইদ্দতকালীন তার বাসস্থানের অধিকার বহাল থাকবে। আর যদি বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং সব দিক দিয়ে অবাধ্য হয় তবে তার বাসস্থানের অধিকার নেই। অবাধ্যতার সময়কালের ঘরভাড়া ফেরত নেওয়া হবে। যদিও তা তার স্বামীর হয়ে থাকে। স্ত্রী অবাধ্য হলে তাকে বের করে দেয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে। আর স্ত্রী অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসলে তাকে ঘরভাড়া ফেরত দেয়া আবশ্যক হবে।

স্ত্রী যদি অবাধ্য হয়ে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়, অতঃপর স্বামী গায়েব হয়ে যায় আর স্বামীর অদৃশ্য হওয়ার পর স্ত্রী ফিরে আসে এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে তবে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সমর্পণ ও গ্রহণ না থাকার কারণে উক্ত আনুগত্যকালীন তার খোরপোষ আবশ্যক হবে না। আর অধিকতর শুদ্ধ মতের বিপরীত মত অনুযায়ী আনুগত্যে ফিরে আসার কারণে খোরপোষ প্রদান করা আবশ্যক হবে। যদি স্ত্রী তার বিষয়টি শাসক বরাবর উপস্থাপন করে তবে শাসক বিষয়টি এলাকার শাসক বরাবর এ মর্মে পত্র লিখবেন যে, তিনি যেন তাকে (স্বামীকে) বর্তমান অবস্থা অবগত করান; যদি স্বামী অথবা তার প্রতিনিধি প্রত্যাবর্তন করে এবং স্ত্রীকে নতুনভাবে গ্রহণ করে তবে তার খোরপোষও প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যদি প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য

৩২. রদ্দুল মুহতার আলা-দুররিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৭।

www.amarboi.org

সময়কাল অতিবাহিত হয়ে যায়; কিন্তু তাকে না পাওয়া যায় তাহলে তার খোরপোষ প্রত্যাবর্তিত হবে। আর অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে যদি অবাধ্যতার পূর্বেই স্বামী গায়েব হয়ে যায়।

স্ত্রী যদি বাড়ি থেকে বের হওয়া ছাড়া অবাধ্য হয়, অতঃপর স্বামী গায়েব হয়ে যায়। এরপর স্ত্রী অনুগত হয়ে যায় তাহলে কেবল তার আনুগত্যের কারণে খোরপোষ আবশ্যক হবে। যেমন- ধর্মত্যাগী স্ত্রীর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করা। কেননা স্ত্রী তখনও স্বামীর কর্তৃত্ব থেকে বের হয়নি।[৩৩]

হাম্বলীগণ বলেন, যখন স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে তার খোরপোষ রহিত হবে, অতঃপর স্ত্রী অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসবে এমতাবস্থায় যে, স্বামী তখন উপস্থিত। তাহলে তার খোরপোষও পুনরায় চালু হবে। কেননা এক্ষেত্রে খোরপোষ রহিত হবার কারণ বিলুপ্ত হয়েছে এবং স্ত্রীর নিকট থেকে কাঙ্ক্ষিত সমর্পণ ও আনুগত্য পাওয়া গেছে।

যদি স্বামী অনুপস্থিত থাকে তাহলে খোরপোষপ্রাপ্তির অধিকার ফিরে আসবে না যতক্ষণ না স্বামীর উপস্থিতিতে অথবা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আনুগত্য ও সমর্পণ প্রকাশ পায়। অথবা তার ফেরার সম্ভাব্য সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শাসক খোরপোষ আবশ্যক করে হুকুম জারি করেন।

তারা বলেন, অবাধ্য অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে গেলে অথবা নিজেকে পূর্ণভাবে স্বামীর নিকট সোপর্দ করা থেকে বিরত থাকলে তার খোরপোষ রহিত হবে। স্ত্রীর নিজ স্বামী গৃহে ফিরে আসা এবং নিজেকে স্বামীর ক্ষমতায় সোপর্দ করা ব্যতীত এ বিধান রহিত হয় না। আর এটি তার অনুপস্থিতিতে অর্জিত হয় না। এ কারণে স্ত্রীর সাথে স্বামীর দৈহিক মিলনের পূর্বে স্ত্রী যদি স্বামীর অনুপস্থিত অবস্থায় নিজেকে সমর্পণ করে তবে কেবল উক্ত সমর্পণের কারণে খোরপোষের হকদার হবে না; এক্ষেত্রেও তাই।

### স্ত্রীর মধ্যে সমবন্টনের ক্ষেত্রে অবাধ্যতার প্রভাব

ফকীহগণের মতে স্ত্রীর অবাধ্যতার ফলে অন্য স্ত্রীদের সাথে সমবন্টনের ক্ষেত্রে তার অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। কেননা সে তার অবাধ্যতার মাধ্যমে সমবন্টনের ক্ষেত্রে তার অধিকার রহিতকরণে সম্মত হয়েছে। অতএব সে যদি আনুগত্যে ফিরে আসে তবে স্বামী অন্যান্য স্ত্রীর সাথে তার বন্টন পুনরায় চালু করবে। তবে উক্ত সময়কালে তার অধিকার রহিত হওয়ার কারণে সতিনদের সাথে স্বামীর যাপিত রাতের কাজা করতে হবে না।[৩৪]

---

৩৩.শরহুল-মিনহাজ ওয়া হাশীয়াতাল-কালয়ূবী ওয়া আমীরাহ্, খ. ৪, পৃ. ৫৪, ৭৮, ৭৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০২; আসনাল-মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৪৩৩।

৩৪. রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৪০০, হাশীয়াহ আদ্ দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪২ নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৭৩; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২০৪।

www.amarboi.org

**অবাধ্য স্ত্রীকে যাকাত প্রদান**

শাফেয়ীগণের অধিকতর শুদ্ধ মত অনুযায়ী অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী যাকাত প্রদান করবে না। কেননা সে বর্তমানে আনুগত্য করতে এবং অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হওয়ার কারণে ফকীর নয়। ফলে এ সময়ে সে স্বামীর খোরপোষের যোগ্য হবে। অতএব ফকীর হিসেবে তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। কেননা স্বামীর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় খোরপোষপ্রাপ্তির কারণে সে অমুখাপেক্ষী। এখানে সে ঠিক ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে প্রতিদিন তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপার্জন করে।

তাদের বিশুদ্ধ মতের বিপরীত দ্বিতীয় মত হলো, তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তার কোন সম্পদও নেই এবং কোনো উপার্জনও নেই। উপার্জনকারীর সাথে তার তুলনা করাও নিষিদ্ধ।[৩৫]

**অবাধ্য স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের শরীয়তসম্মত বিধান ও কর্তৃত্ব**

অবাধ্য স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া শরীয়তসম্মত।[৩৬]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগতা, এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষিত করেছেন তা হেফাজত করে। আর স্ত্রীদের যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।"[৩৭]

এ আয়াতটি সা'দ ইবনুর রাবী' রা.-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁর স্ত্রী তাঁর অবাধ্য হওয়ায় তিনি তাকে চপেটাঘাত করেন। অতঃপর তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, "আমি আমার আদরের এ কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছিলাম; কিন্তু সে তাকে প্রহার করেছে"। তখন

---

৩৫. শরহ আল-মুহাল্লী ওয়া হাশিয়াতাল-কালয়ূবী ওয়া আমীরাহ, খ. ৩, পৃ. ৯৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১০৮।

৩৬. তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৬৮-১৬৯; আয-যাওয়াজের 'আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, খ. ২, পৃ. ৪২।

৩৭. সূরা আন্ নিসা : ৩৪

www.amarboi.org

মহানবী স. উক্ত মহিলাকে বললেন, তার থেকে কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ কর। অতঃপর সে বদলা নেয়ার জন্য তার পিতার সাথে প্রস্থান করছিল। এমতাবস্থায় মহানবী স. তাদেরকে বললেন, তোমরা ফিরে এসো। এই মাত্র জিবরাঈল আ. আমার নিকট আগমন কারে আল্লাহর তরফ থেকে এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। অতঃপর মহানবী স. বলেন, আমরা এক বিষয় চেয়েছিলাম আর আল্লাহ্ চেয়েছেন অন্যটি। আল্লাহ্ যেটি চেয়েছেন সেটিই কল্যাণকর। অতঃপর তিনি কিসাস প্রত্যাহার করে নিলেন।[৩৮]

মোটকথা ফকীহ্গণের মতে স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাকে প্রহারের মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের অধিকার স্বামীর রয়েছে। এ বিষয়ে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে :

হানাফীগণ বলেন, স্বামীর জন্য শিষ্টাচার শিক্ষাদানের কর্তৃত্ব তখনই সাব্যস্ত হবে যখন সে (অর্থাৎ স্ত্রী) যেসব ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য তা পালন করতে অবাধ্য হয়। এক্ষেত্রে শাসনের মাধ্যমে স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের অধিকার স্বামীর আছে।[৩৯]

মালেকীগণ বলেন, স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে যখন অবহিত হবে তখন তাকে তিরস্কার করার অধিকারী ব্যক্তি হলেন স্বামী। যদি তার অবাধ্যতার বিষয়টি ইমামের (শাসক) নিকট উত্থাপিত না হয়ে থাকে। অথবা ইমামের নিকট উত্থাপন করা হয়েছে; কিন্তু ইমাম তার স্বামীর হাতেই তার সংশোধন আশা করেন। অন্যথায় ইমামই তাকে তিরস্কারের দায়িত্বপাপ্ত হবেন।[৪০]

কুরতুবী বলেন, মহান আল্লাহ্ এ বিষয়ে শাসকদের পরিবর্তে স্বামীদেরকে কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। কোন বিচারক, সাক্ষী ও প্রমাণ ব্যতিরেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানতস্বরূপ স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের কর্তৃত্ব নির্ধারণ করেছেন।[৪১]

শাফেয়ীগণ বলেন, স্বামীর জন্য অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার করা বৈধ। তার (স্বামীর) কষ্টের বিষয়টি শাসক বরাবর উত্থাপন করা আবশ্যক নয়। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য স্ত্রীকে আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা। মহান আল্লাহর এ বাণী দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বুঝায় যায় : فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
"যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ অন্বেষণ করো না।"[৪২] আল্লামা যারকাশী এ অবস্থাটি উভয়ের মধ্যে শত্রুতা না

---

৩৮. আল-ওয়াহেদী তার আসবাবুন নুযূল গ্রন্থে হাদীসটি মুকাতিল থেকে কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে তাবারী।

৩৯. আল-বাদায়ে'উস-সানায়ে' : খ. ২, পৃ. ৩৩৪।

৪০. মাওাহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৫, হাশিয়া আদ-দাসুকী, খ. ২ পৃ. ৩৩৪।

৪১. তাফসীরে কুরতুবী; পৃ. ৫, খ. ১৭৩।

৪২. সূরা আন-নিসা, ৩৪।

www.amarboi.org

থাকার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আর যদি তাদের মধ্যে শত্রুতা থাকে, তবে তাদের বিষয়টি শাসক বরাবর উত্থাপন করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

হাম্বলীগণ বলেন, স্ত্রীকে স্বামীর শিষ্টাচার শিক্ষাদানের অধিকার রয়েছে। তবে তা থেকে তাকে তখনই বিরত রাখা হবে, যখন তার বিরুদ্ধে স্ত্রীর অধিকার পূরণ থেকে বিরত থাকার অভিযোগ পাওয়া যাবে। যতক্ষণ না সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করবে এবং তার সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে ততক্ষণ এ বিধান বলবৎ থাকবে। কেননা স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের অধিকার চাওয়ার মাধ্যমে সে জালিমে পরিণত হবে।[৪৪] বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. পরিভাষা 'তাদীব' تأديب (শিষ্টাচার শিক্ষাদান)

**অবাধ্যতার কারণে যার মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া যায় :**

ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে। আর এ শিষ্টাচার শিক্ষাদান সদুপদেশ, শয্যা বর্জন ও প্রহারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী–

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

"স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর"।[৪৫]

এই সদুপদেশ, শয্যা বর্জন ও প্রহার প্রত্যেকটির ব্যাপারেই তাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

**ক. সদুপদেশ :**

সদুপদেশ অর্থ স্বামীর আনুগত্যের পুরস্কার এবং তার বিরোধিতার শাস্তির উল্লেখপূর্বক এমন উপদেশ দান, যা তার অন্তরকে আনুগত্য ও খারাপ কাজ বর্জনের ক্ষেত্রে নমনীয় করে। স্ত্রী অবাধ্য হলে অথবা তার অবাধ্যতার লক্ষণ প্রকাশ পেলে স্বামীর সদুপদেশদান শরীয়ত অনুমোদন করেছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত হয়েছেন। দলীল আল্লাহর বাণী–

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

"স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও।" শাফেয়ীগণ বর্ণনা করেন, যে সকল ক্ষেত্রে সদুপদেশ দেয়া বৈধ সে সকল ক্ষেত্রে স্বামীর জন্যই তা মুস্তাহাব।

---

৪৩. হাশিয়াতুল জুমাল আলা শারহিত-তাহরীর, খ. ৪, পৃ. ২৮৯।

৪৪. কাশশাফুল কিনা; খ. ৫, পৃ. ২১০।

৪৫. সূরা আন নিসা, ৩৪।

www.amarboi.org

হানাফী ও মালেকীগণ বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে তখনই সদুপদেশ প্রদান করবে যখন সে কাজেকর্মে অবাধ্য হবে।

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেন, যখন স্ত্রীর অবাধ্যতার লক্ষণ প্রকাশিত হবে তখন স্বামী সদুপদেশ প্রদান করবে।

ফকীহগণ বলেন, স্বামী স্ত্রীকে কোমলতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সদুপদেশ দান করবে। যেমন তাকে বলবে, তুমি সৎকর্মশীলা, অনুগতা, লজ্জাস্থানের হেফাজতকারিণী হও, এবং এরূপ এরূপ (দুষ্কর্মশীলা ও অবাধ্য) হয়ো না। সে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে উপদেশ দেবে। স্বামীর সঙ্গে সৎসঙ্গ ও উত্তম জীবনাচরণের যে আবশ্যকতা রয়েছে এবং তার ওপর স্বামীর যে মর্যাদা রয়েছে তা উল্লেখ করবে। তাকে দুনিয়ার শাস্তি তথা প্রহার ও খোরপোষ বন্ধ করার এবং আখেরাতের আজাবের করুণ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করবে। তাকে বলবে, তোমার ওপর আমার যে অপরিহার্য অধিকার রয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাকে জানাবে যে, অবাধ্যতা স্ত্রীদের মধ্যে সমবন্টন রহিত করে। ফলে হয়তো সে কোনো ওজর উপস্থাপন করবে অথবা বিনা ওজরে তার থেকে প্রকাশিত অপরাধের জন্য তওবা করবে। স্বামীর জন্য উত্তম হবে, তাকে রাসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়া :

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"স্ত্রী স্বামীর বিছানা পরিত্যাগকারী অবস্থায় রাত্রিযাপন করলে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে।[৪৬]

এবং মহানবী স.-এর এ বাণী :

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا .

"আমি যদি কাউকে কোনো মানুষের সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে অবশ্যই স্ত্রীকে স্বামীর সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম।[৪৭]

ইবনে আব্বাস রা.-এর এ বাণীও তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে : "যে নারী তার স্বামীর প্রতি উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে কিয়ামতের দিন সে কবর থেকে কৃষ্ণাভ মুখমণ্ডলে উঠবে এবং জান্নাতের দিকে তাকাতে পারবে না"।

স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো, সে তার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং কোনো কিছু (প্রেম ও সৌহার্দ) দ্বারা তার অন্তরকে আকর্ষণ করবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেন–

---

৪৬. পূর্বে হাদীসটির তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।
৪৭. পূর্বে হাদীসটির তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ .

"নারী পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মতো। যদি তা সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তাকে উপভোগ করতে চাও তবে বাঁকা অবস্থাতেই উপভোগ করতে হবে"।[৪৮]

ফকীহগণ বলেন, স্ত্রী যদি সদুপদেশের দ্বারা আনুগত্য ও শিষ্টাচারে ফিরে আসে তবে এরপর আর শয্যাত্যাগ করা এবং প্রহার করা হারাম।[৪৯]

**খ. শয্যা বর্জন :**

ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামী যেসব পন্থায় তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেবেন, তার মধ্যে শয্যা বর্জন অন্যতম। মহান আল্লাহর বাণী- وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. "তোমরা তাদেরকে শয্যায় বর্জন কর।[৫০]

শরীয়তসম্মতভাবে বর্জনের পন্থা এবং তার সীমা সম্পর্কে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন : হানাফীগণের মতে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে সদুপদেশ প্রদান করবে তখন যদি উপদেশ তার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় এবং স্ত্রী অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাহলে ভালো, অন্যথায় শয্যা ত্যাগ করবে। অন্য মতে তাকে প্রথমে বর্জন, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান, সহবাস পরিত্যাগ এবং সর্বোপরি বিছানা ত্যাগের ভয় দেখাবে। এতে যদি সে অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তবে ভাল, নতুবা এরপর শয্যা ত্যাগ করবে। সম্ভবত তার মন শয্যা ত্যাগের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না।

অতঃপর ফকীগহণ শয্যা বর্জনের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তাকে পরিত্যাগের অর্থ তার সাথে সঙ্গম করবে না এবং তার সঙ্গে একই বিছানায় শয়ন করবে না। কেউ কেউ বলেন, শয্যা বর্জনের অর্থ, তার সাথে বিছানায় শয়নকালে কথা বলবে না। বর্জনের অর্থ এই নয় যে, সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ও একই বিছানায় শয়ন পরিত্যাগ করবে। কেননা এটি তাদের উভয়ের মধ্যকার যৌথ অধিকার। অতএব এ ক্ষেত্রে তার উপর স্বামীর যে অধিকার রয়েছে তাতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং নিজ অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দান করবে না। কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে এই অর্থে যে, তাকে বিছানা থেকে আলাদা করে দিবে এবং তার অধিকার ও ভাগে অন্য স্ত্রীর বিছানায় শয়ন করবে। কেননা স্বামীর

---

৪৮. বুখারী, ফাতহুল বারী খ. ৯, পৃ. ২৫২; মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১০৯০।

৪৯. আল-বাদায়ে'উস-সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩৪; হাশিয়া আদ দাসুকী আলা শারহিদ-দারদীর : খ. ২, পৃ. ৩৪৩; তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭১; আল-উম্ম, খ. ৫, পৃ. ১১২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৫৯; হাশিয়াতুল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৫।

৫০. সূরা নিসা, ৩৪।

www.amarboi.org

উপর স্ত্রীর সমবণ্টনের অধিকার স্বামীর আনুগত্য ও আল্লাহ নির্ধারিত সীমা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ বলেন, তাকে পরিত্যাগ করার অর্থ তার সাথে শয়নের বিছানা পরিত্যাগ করা এবং তার চরম যৌন উত্তেজনা ও প্রয়োজনের মুহূর্তে সঙ্গম বর্জন করা। তবে স্বামীর প্রয়োজনের মুহূর্তে নয়। কেননা এটি হলো শিষ্টাচার শিক্ষাদান ও ভীতিপ্রদর্শন। সুতরাং স্ত্রীকেই তা শিক্ষাদান করবে, স্ত্রীর প্রতি নিজ প্রয়োজনের সময় একই বিছানায় শয়ন থেকে বিরত থেকে নিজকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে না।[৫১]

মালেকীগণ বলেন, শয্যা বর্জন অর্থ, স্ত্রীর বিছানা বর্জন করা অর্থাৎ বিছানা থেকে দূরে থাকা। অতএব, স্ত্রীর সাথে একই বিছানায় ঘুমাবে না। যাতে স্ত্রী তার অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে। এ মতটি ইমাম মালেক র. থেকে ইবনে কাসিম বর্ণনা করেছেন, ইবনুল আরাবী এ মতই গ্রহণ করেছেন এবং কুরতুবী একে উত্তম বলেছেন।

মালেকীগণের মতে শয্যা বর্জনের উত্তম সময়সীমা একমাস। এ অবস্থা চারমাস অতিক্রম করতে পারবে না, যাকে আল্লাহ অভিভাবকের জন্য আপত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন।[৫২]

শাফেয়ীগণ বলেন, স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয় তাহলে তার স্বামী তাকে সদুপদেশ প্রদান করবে। অতঃপর তার শয্যা বর্জন করবে। কেননা স্ত্রীদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এর প্রকাশ্য প্রভাব রয়েছে। তবে তিন দিনের বেশি কথা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়; কেননা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে :

لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

"কোনো মুমিনের জন্য বৈধ নয় যে, তিন দিনের বেশি তার ভাইকে পরিত্যাগ করবে।"[৫৩] তবে যদি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বা তার দীন সংশোধন করার ইচ্ছা করে। কেননা পরিত্যাগ করা যদিও তা স্থায়ী হয় এবং স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রেও হয় তবে শরয়ী উদ্দেশ্যে বৈধ। যেমন– পাপাচার, বিদআত, কষ্টপ্রদান, শাসন, সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

শয্যা বর্জন দ্বারা উদ্দেশ্য, তার বিছানা বর্জন করা। অতএব এক বিছানায় তার সাথে শয়ন করবে না। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সহবাস বর্জন করা, আবার কেউ কেউ বলেন, স্বামী স্ত্রীর সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বলা।

---

৫১. আল-বাদায়ে'উস-সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩৪।

৫২. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৫; আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৩; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭১-১৭২; আশ-শারহুস-সাগীর, খ. ২, পৃ. ৫১১।

৫৩. বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৪৯২; মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৮৪।

www.amarboi.org

ইবনে হাজার আল হায়তামী বলেন, আমাদের আলিমগণের মতে এর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। কেননা এটি স্ত্রীর সংশোধনের উদ্দেশ্যে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী সংশোধন না হবে ততক্ষণ তাকে বর্জন করা হবে। তাই যদি কয়েক বছরও লেগে যায়। আর যখনই সংশোধন হবে তখন বর্জন রহিত হবে।[৫৪]

যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন : فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

"তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তবে তাদের ওপর কোনো পথ অন্বেষণ করো না"।[৫৫]

হাম্বলীগণ বলেন, স্ত্রী যদি তার অবাধ্যতা প্রকাশ করে তবে স্বামী তাকে বিছানায় যতকাল ইচ্ছা বর্জন করবে।

মহান আল্লাহর বাণী– وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ "তাদেরকে শয্যায় পরিত্যাগ কর"। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তোমার বিছানায় তার সাথে শয়ন করবে না। মহানবী স. তাঁর স্ত্রীদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন। একমাসকাল তিনি তাঁদের নিকট গমন করেননি।[৫৬] তাদের সাথে কথা বর্জন করেন তিন দিন, তার উর্ধে নয়।[৫৭] এর প্রমাণ আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীস। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য (শিরোনাম : হাজর هجر)।

### গ. প্রহার

ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, স্ত্রীর অবাধ্যতায় স্বামীর শিষ্টাচার শিক্ষা দানের মাধ্যমসমূহের মধ্যে প্রহারও অন্যতম।[৫৮]

মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

"তাদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, শয্যায় তাদের বর্জন কর এবং (প্রয়োজনে) তাদেরকে প্রহার কর"।[৫৯]

প্রহারের পদ্ধতি ও প্রয়োগ বিষয়ে ফকীহগণের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় তবে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের শরীয়তসিদ্ধ প্রহারের ক্ষেত্রে ফকীহগণ

---

৫৪. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৫৯; আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩১৬; আয্ যাওয়াজের খ. ২, পৃ. ৪৩।

৫৫. সূরাতুন নিসা, ৩৪।

৫৬. বুখারী, ফাতহুল বারী; খ. ৯, পৃ. ২৭৯; মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১১১৩।

৫৭. কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২০৯।

৫৮. আল-বাদা-সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩৪; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৪৩; নিহায়াতুল মুহতাজ; খ. ৬, পৃ. ৩৮৩; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২০৯।

৫৯. সূরা আন নিসা, ৩৪।

www.amarboi.org

শর্ত আরোপ করেছেন যে, প্রহার রক্তপাতকারী, প্রচণ্ড ধরনের, অসম্মানজনক এবং ভয়ংকর ধরনের হবে না। উক্ত প্রহারে অস্থি ভাঙ্গবে না এবং শরীরের কোনো অঙ্গ বিকৃত হবে না। যেমন– কিল, ঘুষি ইত্যাদি। কেননা প্রহারের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সংশোধন, অন্য কিছু নয়।

তারা বলেন, প্রচণ্ড প্রহার বলতে যা সাধারণত মারাত্মক ব্যাথা সৃষ্টি করে অথবা যার মাধ্যমে জীবন বিপন্ন বা অঙ্গহানির আশঙ্কা হয় অথবা অঙ্গ বিকৃত হয়। হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ،وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ .

"নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের যৌনাঙ্গকে বৈধ করেছ। তোমাদের জন্য তাদের ওপর কর্তব্য হলো, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে স্থান দিবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে তবে তাদেরকে মৃদু প্রহার কর।"[৬০]

মালেকী ও শাফেয়ীগণ বর্ণনা করেন, যদি অবাধ্য স্ত্রী প্রচণ্ড অথবা ভীতিকর প্রহার ছাড়া অবাধ্যতা ত্যাগ না করে তবুও তার স্বামীর জন্য এ জাতীয় শাস্তি প্রয়োগ করা বৈধ নয়। দারদীর বলেন– প্রচণ্ড প্রহার বৈধ নয়, যদিও স্বামী অবগত থাকে যে, এই জাতীয় প্রহার ব্যতীত স্ত্রী অবাধ্যতা ত্যাগ করবে না। স্বামী যদি এ ধরনের আচরণ করে তবে স্ত্রীর নিজে তালাক গ্রহণ ও কিসাসের অধিকার রয়েছে।[৬১]

শাফেয়ীগণ বলেন, যে স্ত্রীর অবাধ্যতা প্রমাণিত হয়েছে, স্বামী তাকে মুখমণ্ডল ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে প্রহার করবে না। ইবনে হাজার আল-হায়তামী বলেন, হাদীসে মুখমণ্ডলে প্রহার করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মুআবিয়া আল কুশাইরী রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের ওপর স্ত্রীর কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে। আর মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না, কুৎসিত কিছু করবে না এবং গৃহ ছাড়তে বাধ্য করবে না।[৬২]

---

৬০. মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮৮৯-৮৯০ (ঈসা আল-হালাবী সম্পা.)।

৬১. বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ২, পৃ. ৩৩৪; তাফসীর কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭২; আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া আদ্ দাসুকী; খ. ২, পৃ. ৩৪৩; মাওয়াহিবুল জালীল; খ. ৪, পৃ. ১৫-১৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬০; হাশিয়া শারকাভী আলা শারহ আত্ তাহরীর, খ. ২, পৃ. ২৮৬; আয্-যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের; খ. ২, পৃ. ৪৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২০৯।

৬২. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৬০৬; আহমদ, খ. ৫, পৃ. ৩; হাকিম, খ. ২, পৃ. ১৮৮।

www.amarboi.org

আল হায়তামী বলেন, গৃহ ছাড়া বাইরে তাকে প্রহার করবে না। প্রহার দেহের বিভিন্ন অঙ্গে করবে; একই স্থানে বারংবার করবে না, যাতে এর অনিষ্টতা মারাত্মক না হয়। তারা বলেন, স্বাধীন নারীকে প্রহারের পরিমাণ চল্লিশ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে বিশোর্ধ হবে না।[৬৩]

হাম্বলীগণ বলেন, মর্যাদার কারণে মুখমণ্ডল, নিহত হওয়ার আশংকায় পেট ও স্পর্শকাতর স্থানে এবং সৌন্দর্য যাতে বিকৃত না হয় সে জন্য সৌন্দর্যময় স্থানে প্রহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রহার দশ বেত্রাঘাত বা তার চেয়ে কম হবে।[৬৪]

দলীল মহানবী স.-এর বাণী–

لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ .

"আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না"।[৬৫]

শাফেয়ীগণের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী এবং হাম্বলীগণের মাযহাব মতে, স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামীর অধিকার রয়েছে বেত অথবা লাঠি দ্বারা মৃদু আঘাতের মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, যাতে রক্তপাত এবং দেহ বিকৃত না হয়।

মালেকীগণ, কতিপয় শাফিঈ মতাবলম্বী ও হাম্বলীগণ বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে মিসওয়াক বা অনুরূপ বস্ত্র দ্বারা পেঁচানো রুমাল অথবা হাত দ্বারা প্রহার করবে। বেত, লাঠি ও কাঠখণ্ড দিয়ে নয়। কেননা এর উদ্দেশ্য শিষ্টাচার শিক্ষাদান।[৬৬]

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বর্ণনা করেন, স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামীর জন্য তাকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রহার করা বৈধ। তবে উত্তম হলো, ক্ষমা করা। কেননা এ অধিকার তার নিজের কল্যাণ ও উপকারের স্বার্থে।
শাফেয়ীগণ বলেন, সামগ্রিকভাবে প্রহার পরিত্যাগই উত্তম। হাম্বলীগণ বলেন, মুহাববত ও ভালোবাসা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে প্রহার ত্যাগ করাই উত্তম।[৬৭]

---

৬৩. রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৬৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬০; আয-যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, খ. ২, পৃ. ৪৩।

৬৪. কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, ২০৯-২১০।

৬৫. মুসলিম খ. ২, পৃ. ১৩৩৩ (ঈসা আল-হালাবী সম্পা.)।

৬৬. তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২০৯-২১০।

৬৭. রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৬৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৩। হাশিয়া শারাভী আলা, শারহ আত্তাহরীর, খ. ২, পৃ. ২৮৬; আয্ যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, খ. ২, পৃ. ২৪৩; কাশ্শাফুল কিনা; খ. ২, পৃ. ২১০।

www.amarboi.org

অবাধ্যতার কারণে স্ত্রীকে প্রহার বিষয়ে মালেকীগণ বলেন, স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্র এবং বড় দণ্ডের ক্ষেত্র ছাড়া আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর কিতাবের কোনো স্থানেই প্রকাশ্যভাবে প্রহারের নির্দেশ দেননি। অতএব স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবাধ্যতা স্ত্রীদের জন্য কবীরা গুনাহের সমকক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর শাফেয়ীগণ বলেন, অবাধ্য স্ত্রীর শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্বামীর প্রহার ছাড়া আমাদের জন্য এমন স্থান নেই, যেখানে কোনো ব্যক্তি তাকে প্রহার করতে পারে।

## প্রহার বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য বারংবার অবাধ্য হওয়া শর্ত কি-না

স্ত্রীকে প্রহার করার জন্য বারংবার অবাধ্য হওয়া শর্ত কি-না, সে বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন :

জমহুর ফকীহদের মতে অবাধ্য স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য তার অবাধ্যতা প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট। অবাধ্যতার পুনরাবৃত্তি বা বারবার অবাধ্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী–

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

"স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর, তারপর তাদেরকে শয্যায় ত্যাগ কর ও তাদেরকে প্রহার কর।"[৬৮]

এর মূল প্রতিপাদ্য এই যে, তোমরা যেসব স্ত্রীর অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও। এরপরও যদি তারা অবাধ্য হয় তবে তাদেরকে শয্যায় বর্জন কর ও প্রহার কর। এখানে 'আশঙ্কা' শব্দটি অবগত হওয়া অর্থে এসেছে, যেমন আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে– فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا

"যদি কেউ অসীয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব অথবা অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের আশঙ্কা করে।"[৬৯]

আয়াতকে তার সুস্পষ্ট অর্থের ওপর রাখাই উত্তম। আর যেহেতু স্ত্রী প্রকাশ্যভাবে তার অবাধ্য হয়েছে, তাই স্বামীর প্রহারের অধিকারও সাব্যস্ত হয়েছে, যেমন– স্ত্রী বারংবার অবাধ্য হলে প্রহারের অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর এজন্যও যে, পাপের শাস্তি হুদূদ (দণ্ড)-এর ন্যায় পুনরাবৃত্তি হওয়া না হওয়ার কারণে ভিন্ন হয় না।

শাফেয়ীগণের মধ্যে রাফিঈ, আবু হামিদ, মাহামিলী প্রমুখ ফকীহ যে বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং যা হাম্বলী মাযহাবভুক্ত আল-খারকীর প্রকাশ্য উক্তি, তা হলো, যদি স্ত্রীর অবাধ্যতা প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং বারংবার তা প্রকাশ না পায় তবে তাকে প্রহার করা বৈধ নয়। কেননা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে

---

৬৮. সূরা আন-নিসা, ৩৪।

৬৯. সূরা আল-বাকারা, ১৮২।

www.amarboi.org

অপরাধ দৃঢ় হয়নি। তাছাড়া এর দ্বারা উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে অপরাধ করা থেকে সতর্ক করা। তাই এব্যাপারে সহজ আচরণই কাম্য।[৭০]

মালেকী ও শাফেয়ীগণ অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার বিধিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, স্বামী নিশ্চিত হবে অথবা তার ধারণায় প্রবল হবে অথবা ধারণা করবে যে, প্রহার স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান ও অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য উপযোগী হবে। যদি তার ধারণায় প্রবল হয় যে, প্রহারও তার ক্ষেত্রে উপকারী হবে না তবে তাকে প্রহার করা স্বামীর জন্য বৈধ হবে না এবং তা হবে হারাম। কেননা এ এমন এক শাস্তি যা থেকে স্ত্রী অমুখাপেক্ষী।[৭১]

যারকাশী স্বামী কর্তৃক তার অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহারের মাধ্যমে অবাধ্যতা দূর করা এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার শত্রুতা থাকবে না। অন্যথায় তাকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য বিষয়টি কাজী বরাবর উপস্থাপন করবে।[৭২]

### শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য প্রহারের ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা

জমহুর ফকীহ তথা হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে স্বামী কর্তৃক প্রহার হতে হবে কুরআন কারীমে যে শর্তে ও উদ্দেশ্যে উল্লেখ হয়েছে ঠিক সেই শর্ত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আর তা হলো শিষ্টাচার শিক্ষাদানমূলক যা থেকে সংশোধনই কাম্য; অন্য কিছু নয়। অতএব সে প্রহারের ফলে যদি ধ্বংস, অঙ্গহানী বা কোনো ক্ষতি হয় সে ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা আবশ্যক হবে। কেননা এখানে এটিই সুস্পষ্ট যে, উক্ত প্রহার ছিল ধ্বংসাত্মক, সংশোধনমূলক নয়।

প্রহারের কারণে স্ত্রীর জীবন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা উপকারী কিছুর বিনাশ হলে স্বামী তার ক্ষতিপূরণ দিবে। কেননা শিষ্টাচার শিক্ষাদানমূলক প্রহার নিরাপদ পরিণতির সাথে শর্তযুক্ত।

হাম্বলীগণের মতে, যদি অবাধ্য স্ত্রীর অবাধ্যতা হেতু তাকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য তার স্বামীর প্রহারের কারণে কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে স্বামীর উপর জরিমানা আবশ্যক হবে না। কেননা সে শরীয়তমতেই এর জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত।[৭৩]

---

৭০. বাদায়েউস-সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩৪; আশ-শারহুল কাবীর হাশীয়া আদ-দাসূকী সহ, খ. ২, পৃ. ৩৪৩; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৬৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৫৯-২৬০; শারহ আল মিনহাজ মাআল কালউবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৫; শারহ আল-মানহাজ মাআল জুমাল, খ. ৪, পৃ. ২৮৯; শরহ আত্ তাহরীর মাআ আশ্-শারকাবী, খ. ২, পৃ. ২৮৫; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৬।

৭১. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১।

৭২. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩,পৃ. ২৬১।

৭৩. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৩, পৃ. ২১১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ২১৮; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৫৩; তাফসীর কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭২; আল-মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৫; রওদাতুত তালেবীন, খ. ৭, পৃ. ১৭২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১০।

www.amarboi.org

**শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ক্রমধারা অবলম্বন**

**ফকীহগণ স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্বামীর উপর আয়াতে বর্ণিত ক্রমধারা অবলম্বন আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে মতভেদ করেছেন :**

জমহুর ফকীহ তথা হানাফী, মালেকী, হাম্বলীগণের মতে স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে স্বামী কর্তৃক শিষ্টাচার শিক্ষাদান আয়াতে বর্ণিত ক্রমধারা অনুযায়ী হবে। অতএব সে সদুপদেশ দিয়ে শুরু করবে, অতঃপর শয্যা ত্যাগ অতঃপর প্রহার করবে। এটিই হাম্বলীগণের মাযহাব এবং এটি শাফিয়ীগণের একটি মতও। এ বিষয়ে তাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে।

হানাফীগণ বলেন, স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে তাকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের কর্তৃত্ব ও অধিকার স্বামীর রয়েছে, তবে তা কুরআনে বর্ণিত ক্রমধারা অনুসারে। অতএব স্বামী প্রথমে স্ত্রীকে কোমলতা ও স্নেহশীলতার সাথে সদুপদেশ প্রদান করবে। যদি স্ত্রীর মধ্যে এই সদুপদেশ কার্যকর প্রভাব না ফেলে তবে তাকে পরিত্যাগ করবে। কেউ কেউ বলেন, প্রথমত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার ভয় দেখাবে, অতপর তার থেকে দূরে অবস্থান করবে, সহবাস ও শয্যা ত্যাগের ভয় দেখাবে। যেন স্ত্রী অবাধ্যতা ত্যাগ করে তো ভালো, নতুবা তাকে পরিত্যাগ করবে। সম্ভবত স্ত্রী পরিত্যাগের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এরপরও অবাধ্যতা ত্যাগ না করলে তাকে প্রহার করবে যদি প্রহার উপকারে আসে তো ভালো, নতুবা বিষয়টি বিচারক বরাবর উত্থাপন করবে।

এর মূলভিত্তি মহান আল্লাহর বাণী–

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

"স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর।"[৭৪] আয়াতের প্রকাশ্য রূপ যদিও ওয়াও (و) একত্রিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য ক্রমধারা অনুযায়ী বিষয়গুলো বিন্যাস করা। আর ওয়াও (و) এ অর্থও প্রদান করে।

তারা বলেন, এ পদ্ধতিটি গোটা মানবজাতির ক্ষেত্রে 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ' এর পদ্ধতির মতো; আদেশদাতা কোনো প্রকার কঠোরতা ব্যতীত কোমলতা ও স্নেহশীলতার মাধ্যমে সদুপদেশ দিয়ে শুরু করবে। স্ত্রী যদি উক্ত সদুপদেশ গ্রহণ না করে তবে কঠোর ভাষায় করবে। তাও যদি গ্রহণ না করে তবে এ ক্ষেত্রে সে তার হাত প্রশস্ত করবে অর্থাৎ হাত দ্বারা প্রহার করবে।[৭৫]

---

৭৪. সূরা আন্ নিসা, ৩৪।

৭৫. বাদায়েউস-সানায়ে' : খ. ২, পৃ. ৩৩৪।

www.amarboi.org

মালেকীগণ বলেন, যে অবাধ্য হবে তাকে স্বামী সদুপদেশ প্রদান করবে। অতঃপর যখন সদুপদেশ কোনো উপকারে আসবে না তখন তার শয্যা ত্যাগ করবে। অতঃপর যদি শয্যা ত্যাগও উপকারী না হয়, তবে তাকে প্রহার করা স্বামীর জন্য বৈধ। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করা যাবে না, যতক্ষণ না স্বামী এ ধারণা পোষণ করবে যে, পূর্ববর্তী অবস্থা কোন উপকারে আসবে না। প্রহার ছাড়া অন্যগুলো করবে যদিও তা উপকারী হওয়ার ধারণা না করে– অর্থাৎ যদি এ ব্যাপারে সন্দিহান থাকে যে, সম্ভবত এ পদ্ধতি উপকারে আসছে। এমনটি নয় যে, তা উপকারী না হওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিত থাকে। আর প্রহারের উপকারিতার বিষয়ে প্রবল ধারণা ব্যতীত প্রহার বৈধ নয়। দাসূকী বলেন, মূল কথা হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে সদুপদেশ প্রদান করবে যদি তা উপকারী হওয়ার বিষয়ে সে নিশ্চিত বা ধারণাকারী বা সন্দিহান হয়। আর যদি উপকারী না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত বা ধারণাকারী হয় তবে তাকে শয্যায় পরিত্যাগ করবে, যদি এটি উপকারে আসার ব্যাপারে সে নিশ্চিত বা ধারণাকারী অথবা সন্দিহান হয়। যদি স্বামী এ পদ্ধতিও উপকারে না আসার ব্যাপারে নিশ্চিত বা ধারণাকারী হয় তবে তাকে প্রহার করবে যদি তা উপকারী হওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিত বা ধারণাকারী হয়, তবে সন্দিহান হলে প্রহার করবে না।[৭৬]

হাম্বলীগণ বলেন, আর এটিই তাদের মাযহাব যে, যখন স্ত্রী থেকে অবাধ্যতার লক্ষণ প্রকাশিত হবে তখন স্বামী তাকে সদুপদেশ প্রদান করবে। যদি সে আনুগত্য ও শিষ্টাচারে ফিরে আসে তবে শয্যা ত্যাগ ও প্রহার নিষিদ্ধ হবে। আর যদি স্ত্রী বারংবার অবাধ্য হতে থাকে তবে যে ভাবে ইচ্ছা, স্বামী তার শয্যা ত্যাগ করবে; তার সাথে কথা পরিত্যাগ করবে তিনদিন, তার বেশি নয়। এরপরও স্ত্রী যদি বারংবার অবাধ্য হতে থাকে এবং শয্যা ত্যাগ সত্ত্বেও স্ত্রী যদি নিবৃত্ত না হয় তবে স্বামীর অধিকার রয়েছে, স্ত্রীর শয্যা ত্যাগ ও তিনদিন বাক্যালাপ ত্যাগের পর প্রহার করা।[৭৭]

শাফেয়ীগণ ও ইমাম আহমদ র.-এর এক মত অনুযায়ী স্বামীর জন্য বৈধ যে, সে তার স্ত্রীকে কুরআনে বর্ণিত শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্রমধারা অনুসরণ করা ছাড়াই যে পদ্ধতি তার নিকট উপযুক্ত তার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা।

ইমাম নববী র. বলেন, স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের স্তর তিনটি :

**প্রথমত**, স্ত্রীর মধ্যে কথায় বা কাজে অবাধ্যতার লক্ষণ পাওয়া যাবে। যেমন– স্বামীর কোমল কণ্ঠে কথার প্রতিউত্তর কর্কশ ভাষায় প্রদান, অথবা স্বামীর বন্ধুভাবাপন্ন ও

---

৭৬. আশ্-শারহুল কাবীর ওয়া হাশিয়া আদ্-দাসূকী : খ. ২, পৃ. ৩৪৩।

৭৭. কাশ্শাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ২০৯।



www.amarboi.org

প্রফুল্ল অবস্থায় স্ত্রী থেকে উপেক্ষা ও ভ্রূকুটি পাওয়া যায় তবে এই স্তরে স্বামী তার সদুপদেশ প্রদান করবে তাকে শয্যাত্যাগ করবেনা এবং প্রহারও করবে না।

**দ্বিতীয়ত**, স্ত্রীর অবাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে; কিন্তু তার পুনরাবৃত্তি হবে না এবং সে কাজ বারংবার করবেনা। এ অবস্থায় স্বামী তাকে সদুপদেশ প্রদান করবে এবং তার শয্যা পরিত্যাগ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রহার বৈধ হওয়ার বিষয়ে দু'টি মতামত বর্ণিত হয়েছে : শায়খ আবু হামেদ ও মাহামিলী র. প্রহার নিষিদ্ধ হওয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। 'আল-মুহাযযাব' ও 'আশ-শামিল' গ্রন্থকারদ্বয় বৈধ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ইমাম নববী র. আরও বলেন, রাফেঈ 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে নিষিদ্ধ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কুরআনের প্রকাশ্য বর্ণনা অনুযায়ী বৈধ হওয়াটিই সঙ্গত এবং সেটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত।

**তৃতীয়ত,** স্ত্রী অবাধ্যতার পুনরাবৃত্তি করে এবং বারংবার তা করতে থাকে তবে স্বামীর জন্য শয্যা ত্যাগ এবং প্রহার করা বৈধ। এ ব্যাপারে কারো কোন মতবিরোধ নেই। তিন স্তরের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে এটিই নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। ইবনে কুজ আয়াতের প্রকাশ্য রূপ অনুযায়ী অবাধ্যতার আশংকার ক্ষেত্রে শয্যাত্যাগ ও প্রহার বৈধ হওয়া সংক্রান্ত একটি মত বর্ণনা করেছেন। আল-হানাতীর অবাধ্যতা প্রকাশিত হওয়ার অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে তিনটি মত বর্ণনা করেছেন :

**প্রথমত :** সদুপদেশ, শয্যাত্যাগ ও প্রহার।

**দ্বিতীয়ত :** এগুলোর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ এবং সবগুলো একত্রে ব্যবহার না করা।

**তৃতীয়ত :** প্রথমে সদুপদেশ প্রদান করবে। স্ত্রী যদি সদুপদেশ গ্রহণ না করে তবে তার শয্যা ত্যাগ করবে, তাতেও যদি অবাধ্যতা পরিত্যাগ না করে তবে তাকে প্রহার করবে।[৭৮]

## অবাধ্যতা বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্য হওয়া

অবাধ্য হওয়ার বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর বক্তব্য ভিন্ন হলে কার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন।

হানাফীগণের মতে, যদি অবাধ্য হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী ভিন্নমত পোষণ করে, স্বামী যদি স্ত্রীর অবাধ্যতার দাবি করে এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করে, তবে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবাধ্য না হবার দাবিই শপথের সাথে গ্রহণ করা হবে। কেননা পুরুষের কোনো প্রমাণ নেই পক্ষান্তরে স্ত্রী তার (স্বামীর) ঘরেই অবস্থান

৭৮. রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৭; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৭৭।

www.amarboi.org

করছে। ইবন আবেদীন বলেন, যদি মতভেদটি বর্তমানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তো তা সুস্পষ্ট। আর যদি স্বামী অবাধ্যতাহেতু স্ত্রীর পূর্ববর্তী মাসের (উদাহরণস্বরূপ) আবশ্যক খোরপোষ বাতিল হওয়ার দাবি করে তবে স্পষ্টতই এক্ষেত্রে স্ত্রীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। স্ত্রী অবাধ্যতার অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তার প্রতি খোরপোষ প্রযোজ্য হবে। স্ত্রী যদি দাবি করে যে, পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে তার বের হওয়াটা স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে ছিল এবং স্বামী তা অস্বীকার করে অথবা স্ত্রী যদি দাবি করে যে, তাকে (স্ত্রীকে) সেখানে অবস্থানের অনুমতিদানের একমাস পর অবাধ্যতা প্রতীয়মান হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে কি না? আমার মতে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও খোরপোষ না দেয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বলা যায়, এক্ষেত্রে মাহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।[৭৯]

মালেকীগণ বলেন, স্ত্রী যদি উজরবশত সহবাস বা তাকে সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার দাবি করে এবং স্বামী তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে দু'জন নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্ত্রী উক্ত ওজর সাব্যস্ত করবেন, এ বিধান এমন বিষয়ের জন্য যা সম্পর্কে পুরুষরা অবহিত হয় না। আর যে বিষয়ে পুরুষ অবহিত হতে পারে, সে বিষয়টি দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। যেমন– অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর বহির্গমন। স্বামীর এ কথা গ্রহণযোগ্য হবেনা যে, স্ত্রী আমাকে তার সাথে সহবাস থেকে বিরত রেখেছে, যদি স্ত্রী বলে, আমি তাকে বিরত রাখিনি, বরং সে নিজেই বিরত ছিল। কেননা স্বামী এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর খোরপোষের অধিকার কর্তন করার দায়ে অভিযুক্ত হবে।

তারা বলেন, স্বামী যদি তাকে প্রহার করে অতঃপর স্ত্রী একে শত্রুতা হিসেবে এবং স্বামী শিষ্টাচার হিসেবে দাবি করে, তবে স্ত্রীকেই সত্যবাদী গণ্য করা হবে। তখন শাসক স্বামী যদি সৎ হিসেবে প্রসিদ্ধ না হয় তাহলে তাকে ঐ শত্রুতার জন্য শাস্তি দিবেন, অন্যথায় স্বামীর বক্তব্য গ্রহণ করা হবে।[৮০]

শাফেয়ী মাযহাবভুক্ত মুগনী 'আল-মুহতাজ' গ্রন্থকার বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে প্রহার করে অতঃপর স্বামী দাবি করে, তা অবাধ্যতার কারণে; কিন্তু স্ত্রী ভিন্ন দাবি করে তবে সে ক্ষেত্রে দু'টি সম্ভাব্যতা বিরাজ করে। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে যেটি শক্তিশালী তা হলো, স্বামীর বক্তব্যই গ্রহণ করা হবে। কেননা শরীয়ত তাকে এ ব্যাপারে অভিভাবক বানিয়েছে। আর এ জাতীয় বিষয়ে অভিভাবকের

---

৭৯. আদ-দুররুল মুখতার ওয়া রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৬-৬৪৭।
৮০. শারহ আয-যারকাশী, খ. ৪, পৃ. ২৫১; হাশিয়াহ আদ্-দাসুকী, খ. ২. পৃ. ৩৪৩; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৫।

www.amarboi.org

উপরই নির্ভর করতে হবে। তবে স্ত্রীর কোনো অধিকার নষ্ট হলে সেক্ষেত্রে স্বামীর উপর নির্ভর করা হবে না। এ বিধান তখনই যখন স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো অপরাধ বা সীমালঙ্ঘন সম্পর্কে জানা যায় না। অন্যথায় তাকে সত্যবাদী বলা হবে না, স্ত্রীকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে। শারকাবী স্বামীকে সত্যবাদী গণ্য করার জন্য তার শপথকে শর্ত করেছেন।[৮১]

হাম্বলীগণ বলেন, স্ত্রীর নিজকে সমর্পণের স্বীকৃতির পর তার অবাধ্যতার ব্যাপারে যদি স্বামী-স্ত্রী মতভেদ করে তবে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মৌলিকত্ব হলো অবাধ্য না হওয়া।[৮২]

### স্বামীর দুর্ব্যবহার বা অবজ্ঞা

ফকীহগণের মতে, স্ত্রী যদি তার প্রতি অনাগ্রহ বশতঃ স্বামীর দুর্ব্যবহার ও অবজ্ঞার আশঙ্কা করে, তাই তা অসুস্থতার কারণে হোক, বয়োবৃদ্ধ বা কুৎসিত আকৃতি যে কারণেই হোক-তার জন্য দূষণীয় নয় যে, সে স্বামীর সন্তুষ্টি প্রত্যাশায় নিজের কিছু অধিকার ছাড় দেবে। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী–

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

"যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা অবজ্ঞার আশঙ্কা করে তবে পারস্পরিক আপষ-নিষ্পত্তি করে নিলে তাদের ওপর কোনো দোষ নেই।"[৮৩] এর আরো প্রমাণ, এ আয়াত সম্পর্কে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, এক ব্যক্তির একজন স্ত্রী ছিল। সে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে চাচ্ছিল না; বরং সে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছিল। তখন স্ত্রী বলল, আমার ব্যাপারে সমাধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ কি আপনাকে কোনো বিধান দিয়েছেন? তখন সে বিষয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৮৪]

হানাফীগণ বলেন, এ আয়াতটি স্বামীর অধীনে একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমবণ্টন আবশ্যক হওয়া এবং একাধিক স্ত্রী না হয়ে একজন হলে তার কাছেই থাকার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। তারা আরো প্রমাণ পেশ করেন যে, কা'ব ইবনে সুওয়ার উমর রা.-এর উপস্থিতিতে ফয়সালা করেন যে, চারদিনের একদিন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত হবে। তখন উমর রা. তার এ ফয়সালা উত্তম বিবেচনা করেন এবং তাকে বসরার বিচারকের দায়িত্ব দেন। মহান আল্লাহ

---

৮১. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৪; শারকাবী, খ. ২, পৃ. ২৮৬।
৮২. কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ৪৭৫।
৮৩. সূরা আন্ নিসা, ১২৮।
৮৪. বুখারী : ফাতহুল বারী, খ. ৮, পৃ. ২৬৫।

www.amarboi.org

(একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে) স্ত্রীর জন্য বৈধ করেছেন যে, সে তার ভাগের হক স্বামীর অন্য স্ত্রীর জন্য ছেড়ে দেবে। আয়াতটি মোহর, খোরপোষ, (স্ত্রীদের মধ্যে) সমবণ্টনসহ দাম্পত্যজীবনের যে কোনো হক ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এসব ব্যাপারে সন্ধি করা বৈধ। তবে স্ত্রীর জন্য কেবলমাত্র পূর্বের খোরপোষ ত্যাগ করা বৈধ হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত করে দেয়া সহীহ হবে না। এমনিভাবে স্ত্রী যদি সহবাস থেকে মুক্ত করে দেয় তবে তার এ দায়মুক্তি সহীহ হবে না। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে স্বামী থেকে তার অধিকার দাবি করা। অবশ্য সন্তুষ্টচিত্তে তার খোরপোষ ও তার কাছে থাকার দাবি পরিত্যাগ করা স্ত্রীর জন্য বৈধ। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দায়মুক্ত করে দেয়া বৈধ হবে না। এমনিভাবে সমবণ্টন বা সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার ত্যাগ করার বিনিময়ে স্বামী তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করাও বৈধ নয়। কেননা তা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণের নামান্তর অথবা এটি এমন এক অধিকার, যার বদলা গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা একে অপরিহার্যকারী কারণ বর্তমান থাকা অবস্থায় তা পরিত্যাজ্য হতে পারে না আর সে কারণ হলো বিবাহের আকদ।[৮৫]

মালেকী মাযহাবভুক্ত কুরতুবী র. বলেন, আমাদের আলেমগণ বলেন, এ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সব ধরনের সমঝোতাই মুবাহ তথা বৈধ। যেমন– স্বামী এমন কিছু প্রদান করবে যে, স্ত্রী ধৈর্যধারণ করবে। অথবা স্ত্রী এমন কিছু প্রদান করবে যে, স্বামী ত্যাগ স্বীকার করবে। অথবা ত্যাগ স্বীকার করবে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে। অথবা কোনো কিছু প্রদান ছাড়াই ধৈর্য ও ত্যাগের ভিত্তিতে সমঝোতা হবে। এসব কিছুই মুবাহ।[৮৬]

শাফেয়ীগণ বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর সীমালঙ্ঘন না করে; বরং বয়োবৃদ্ধি বা অসুস্থতা বা অনুরূপ কোনো কারণে তার সংশ্রব অপছন্দ করে এবং তাকে উপেক্ষা করে তবে তার ওপর কোনো (শাস্তির) বিধান নেই। স্ত্রীর জন্য সুন্নত বিধান হল, স্বামী যা পছন্দ করে তার মাধ্যমে তাকে তুষ্ট করা, যেমন সে নিজের কিছু অধিকার ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে স্বামীর সন্তুষ্টি কামনা করবে। যেভাবে সাওদা রা. যখন আশঙ্কা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. তাকে তালাক প্রদান করবেন তখন তিনি তাঁর পালার দিন আয়েশা রা.-এর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৮৭] অনুরূপভাবে স্বামীর জন্য সুন্নত পদ্ধতি হলো, উল্লিখিত কোনো

---

৮৫. আহকামুল কুরআন লিল জাস্‌সাস, খ. ২, পৃ. ২৮৩।
৮৬. কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ৪০৩-৪০৫।
৮৭. তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ২৪৯; ইবনে হাজার, আল ইসাবা, খ. ৭, পৃ. ৭২০।

www.amarboi.org

কারণে যখন স্ত্রী তার সংশ্রব অপছন্দ করবে তখন সে খোরপোষ বৃদ্ধি বা এ জাতীয় কিছু যা স্ত্রী পছন্দ করে তার মাধ্যমে তাকে তুষ্ট করবে।[৮৮]

হাম্বলীগণ বলেন, স্ত্রী যদি বয়োবৃদ্ধ বা অন্য কোনো কারণ যেমন : অসুস্থতা অথবা কুৎসিত আকৃতির কারণে তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও তাকে অবজ্ঞার আশঙ্কা করে অতঃপর নিজের কিছু বা সম্পূর্ণ অধিকার ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে স্বামীর সন্তুষ্টি কামনা করে, তবে তা বৈধ হবে। কেননা এটি তার নিজেরই অধিকার এবং সে নিজেই তা ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছে। স্ত্রী চাইলে ভবিষ্যতে তার অধিকার ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে অতীতের অধিকার ফিরিয়ে নেয়ার তার অধিকার নেই। তারা উভয়ে যদি এমন শর্ত করে, যা বিবাহবন্ধনকে ছিন্ন করে না তবে তা পালন করা আবশ্যক হবে অন্যথায় নয়। স্ত্রী যদি তার খোরপোষ বা পালার অংশের কিছু বা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে স্বামীর সাথে সমঝোতায় উপনীত হয় তবে তা বৈধ। স্ত্রী যদি এ অবস্থা থেকে ফিরতে চায় তবে সে অধিকার তার রয়েছে। ইমাম আহমদ র. যে তার স্ত্রী থেকে অনুপস্থিত থাকে তার সম্পর্কে তার স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি যদি এভাবে থাকতে রাজী থাকো তবে তো ভালো, অন্যথায় তুমিই অধিক জ্ঞাত'। তখন স্ত্রী লোকটি বলল, আমি রাজি। তাহলে তা বৈধ। অতপর স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার অধিকারে ফিরতে পারবে।[৮৯]

### স্বামীর জুলুম

ফকীহগণের মতে, স্বামী যদি তার স্ত্রীর ওপর জুলুম করে তবে শাসক বা বিচারক তাকে তা থেকে নিবৃত্ত করবেন।

জমহুর ফকীহগণ বলেন, বিচারক বা শাসকের অধিকার রয়েছে যে, তারা স্বামী কে শাস্তি প্রদান করবেন। এ বিষয়ে ফকীহগণের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে–

হানাফীগণ বলেন, স্ত্রী যদি স্বামীগৃহে থাকে এবং তার সাথে আর কেউ বসবাস না করে অতঃপর স্ত্রী বিচারকের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, স্বামী তাকে প্রহার করে বা কষ্ট দেয় তবে বিচারক তার প্রতিবেশীদের নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যদি তারা সৎ লোক হয় এবং স্ত্রীর দাবি অনুযায়ী একই কথা জানায় তবে বিচারক তাকে (স্বামীকে) শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবেন, তাকে নির্দেশ দিবেন স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করার এবং তার প্রতিবেশিদের নির্দেশ দিবেন স্ত্রীর ব্যাপারে তারা যেন খোঁজখবর রাখে। পক্ষান্তরে প্রতিবেশিরা সৎ লোক না হলে কাজী স্বামীকে নির্দেশ দিবেন, সে যেন স্ত্রীকে সৎ প্রতিবেশিদের

৮৮. হাশিয়া শারকাবী আলা শারহিত-তাহরীব, খ. ২, পৃ. ২৮৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১।

৮৯. কাশ্শাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ২১১; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৮।

www.amarboi.org

নিকট স্থানান্তর করে। অতঃপর তারা যদি বিচারকের কাছে স্ত্রী যা বলেছিল তার বিপরীত বিবৃতি প্রদান করে, তবে কাজী তাকে সেখানেই রাখবে এবং অন্যত্র স্থানান্তরিত করবে না।[৯০]

মালেকীগণ বলেন, স্বামী যদি শরয়ী কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে প্রহার করে বা গালী-গালাজ করে বা অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে জুলুম করে এবং তা প্রমাণের ভিত্তিতে অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় তবে বিচারক ধমকের সুরে উপদেশ প্রদান করবেন অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করবেন। উপদেশের মাধ্যমে সে যদি নিবৃত্ত না হয় তবে তাকে প্রহার করবেন যদি তিনি তাকে বিরত ও নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রে এটিই উপযোগী মনে করেন, অন্যথায় নয়। এ বিধান তখনই, যখন স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস করতে চাইবে। পক্ষান্তরে জুলুমের বিষয়টি সাব্যস্ত না হলে বিচারক প্রহার ব্যতীত শুধুমাত্র উপদেশ প্রদান করবেন।[৯১]

শাফেয়ীগণ বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর কোনো হক যেমন– সমবণ্টন ও খোরপোষ ইত্যাদি প্রদান না করে তবে বিচারক তাকে তা প্রদানে বাধ্য করবেন, যখন স্ত্রী অক্ষমতার কারণে স্বামী থেকে তা আদায় করতে না পেরে তার কাছে দাবি জানাবে। তবে স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রটি ভিন্ন। কেননা পরিমাণ অনুযায়ী স্বামীর অধিকার পূর্ণ করার জন্য স্ত্রীকে বাধ্য করার অধিকার তার (স্বামীর) রয়েছে।

স্বামী যদি মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনের যোগ্য না হয় অথবা মাহজুর তথা যার ওপর শরীয়ত বাস্তবায়নে নিষেধাজ্ঞা আছে এমন হয়, তবে বিচারক তার অভিভাবককে স্ত্রীর অধিকার প্রদানে বাধ্য করবেন।

স্বামী যদি খারাপ আচরণ করে এবং বিনা কারণে স্ত্রীকে প্রহার করে বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট দেয়, তাহলে বিচারক তাকে এ থেকে নিষেধ করবেন তবে কোনো শাস্তি প্রদান করবেন না। অতঃপর স্বামী যদি পুনরায় একই কাজ করে এবং স্ত্রী বিচারক থেকে তার শাস্তি দাবি করে তখন বিচারক তাকে স্ত্রীর ওপর জুলুম করার কারণে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। প্রথমবার তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না। যদিও স্ত্রীর দাবির প্রক্ষিতে কিয়াস অনুযায়ী তা বৈধ। সুবকী বলেন, সম্ভবত এটি এ কারণে যে, খারাপ ব্যবহার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সচরাচর হয়ে থাকে, আর এ কারণে শাস্তি প্রদান করলে তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হবে। অতএব প্রথমে তিনি (বিচারক) কেবল নিষেধ করবেন, যাতে তাদের উভয়ের মধ্যে সংশোধনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এরপরও যদি স্বামী তার পুনরাবৃত্তি করে তবে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন এবং তাকে বিশ্বস্ত লোকদের সাথে বসবাস করাবেন যাতে স্বামী স্ত্রীর ওপর জুলুম থেকে বিরত থাকে।

---

৯০. বাদায়ে'উস -সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ২৩।

৯১. আশ শারহুল কাবীর মাআ হাশিয়াহ আদ্-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৩।

www.amarboi.org

ইমাম গাযালী র. বলেন, তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। যাতে স্বামী ন্যায়সঙ্গত জীবন-যাপনের দিকে ফিরে আসে। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে স্বামীর কথার ওপর নির্ভর করা যাবে না; বরং স্ত্রীর কথা এবং পারিপার্শ্বিকতার সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করা হবে।

ইমাম গাযালী র. বিষয়টি আরো বিশ্লেষণ করে বলেন, বিচারক যদি স্বামীর অত্যাচারের বিষয়টি কেবল ধারণা করেন; কিন্তু তা তার কাছে প্রমাণিত না হয় তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। আর যদি বিষয়টি প্রমাণিত হয় অথবা (বিচারকের কাছে) দৃঢ়রূপে প্রতীয়মান হয় এবং স্বামী দুষ্ট হওয়ায় স্ত্রীকে নির্দয় প্রহার করার আশঙ্কা পোষণ করেন, তবে তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন যে পর্যন্ত না তিনি ধারণা করেন যে, স্বামী ন্যায়বিচার করেছে। যদি তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন না করেন এবং শুধু শাস্তি প্রদান করেন তবে বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যা অনুধাবন করা যায় না।[৯২]

হাম্বলীগণ বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন কোনো মনোমালিন্য দেখা যাবে তখন শাসক তাতে গভীর দৃষ্টি প্রদান করবেন। যদি তার কাছে স্পষ্ট হয় যে, বিষয়টি স্ত্রীর কারণে হয়েছে তবে তা অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তার কাছে স্পষ্ট হয় যে, বিষয়টি পুরুষের পক্ষ থেকে, তবে তাদের উভয়েকে বিশ্বস্ত লোকদের কাছে বসবাস করাবেন যাতে তারা স্বামীকে স্ত্রীর যে কোনো প্রকার ক্ষতি থেকে এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করবে।[৯৩]

**স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের ওপর জুলুম করা**

ফকীহগণের মতে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দাবি করে যে, তার সঙ্গী তার ওপর জুলুম করেছে, তবে তাদের বিষয়টি বিচারক বরাবর উপস্থাপন করা হলে তিনি বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এমন নির্দেশ দিবেন যাতে জুলুম নিষ্পন্ন হয় এবং জুলুমকারীকে ধমক দেয়া হয়। নতুবা তাদের উভয়ের মনোমালিন্য দূর করা এবং সংশোধনের প্রচেষ্টার বিষয়ে নজর দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নিযুক্ত করবেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

হানাফীগণ বলেন, স্বামী ও স্ত্রী যখন মতবিরোধ করবেন, স্বামী তার স্ত্রীর অবাধ্যতার এবং স্ত্রী তার ওপর স্বামীর অত্যাচার ও তার অধিকারহরণের দাবি করবে তখন শাসক স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যকার বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের জন্য। তারা তাদের মধ্যকার বিষয়ে যা জানতে পেরেছেন তা শাসককে অবহিত করবেন। সালিশ এজন্য নিয়োগ করবেন যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে

---

৯২. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬০-২৬১।

৯৩. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৮; কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ২১০।

www.amarboi.org

অত্যাচারী তাকে উপদেশ প্রদান করবেন এবং তার অত্যাচারের ওপর র্ভৎসনা করবেন তারা এ বিষয়ে শাসককে এজন্য অবহিত করবেন যাতে বিষয়টি তিনি নিজের আয়ত্তে নিতে পারেন।[৯৪]

মালেকীগণ বলেন, যদি শাসকের নিকট স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই তার সাথীর ওপর অত্যাচার করা প্রমাণিত হয় তবে তিনি তাদের উভয়কে সুদপদেশ প্রদান করবেন। অতঃপর নিজস্ব ইজতিহাদের আলোকে তাদেরকে প্রহার করবেন। আর যদি বিষয়টি তার কাছে প্রমাণিত না হয় তবে শুধু সদুপদেশ প্রদান করবেন এবং স্ত্রী যদি সৎ গোত্রের মধ্যে বসবাস না করে তবে তিনি তাকে তাদের মধ্যে বসবাস করাবেন। যদি স্ত্রী প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে বসবাস করে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্য থেকে কে অত্যাচারী তা তাকে অবগত করানোর জন্য তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। যদি বিষয়টি জটিলতাপূর্ণ হয় তবে শাসক উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে সালিশ নিযুক্ত করবেন।[৯৫]

শাফেয়ীগণ বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি বলে, তার সঙ্গী তার ওপর জুলুম করেছে এবং তাদের মধ্যকার বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে তবে বিচারক একজন বিশ্বস্ত মাধ্যমের সাহায্যে তাদের মধ্যকার বাস্তব অবস্থা অবগত হবেন, যে তাদের দু'জন সম্পর্কে জানাবে এবং তাদের প্রতিবেশী হবে। যদি সেরকম কাউকে না পাওয়া যায় তবে তাদের দু'জনকে এমন বিশ্বস্ত প্রতিবেশীর পাশে অবস্থান করাবেন, যে তাদের অবস্থা অবগত হবে অতঃপর যা অবগত হয়েছে তা বিচারক বরাবর পেশ করবে। আর যখন বিচারকের কাছে তাদের উভয়ের প্রকৃত অবস্থা প্রতীয়মান হবে তখন তিনি অন্যায়কারীকে অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি থেকে নিষেধ করবেন। স্বামীর ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞার পদ্ধতি, 'স্বামীর জুলুম শীর্ষক শিরোনামে উল্লিখিত হয়েছে। আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে ধমকপ্রদান, শিষ্টাচার শিক্ষাদান ইত্যাদির মাধ্যমে।

তারা বলেন, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, তাদের মতবিরোধ ও শত্রুতা চলতেই থাকে, পরস্পর গালী-গালাজ ও সংঘাত স্থায়ী হয় এং তা কদর্য আকার ধারণ করে তখন বিচারক স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবেন।[৯৬]

হাম্বলীগণ বলেন, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনৈক্য সঙ্ঘটিত হবে তখন বিচারক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। যদি তার কাছে স্পষ্ট হয় যে, তাদের উভয়েই জুলুম করেছে অথবা তাদের প্রত্যেকেই অন্যের ব্যাপারে দাবি করে যে, সে তার ওপর জুলুম করেছে

---

৯৪. আল্লামা জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৯০-১৯৩।
৯৫. দারদীর, শরহে কাবীর ও হাশিয়া আদ-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪।
৯৬. মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৬১।

www.amarboi.org

তবে তিনি তাদেরকে এমন ব্যক্তির পাশে অবস্থান করাবেন, যিনি তাদের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন এবং তাদের ওপর ইনসাফ বাধ্যতামূলক করবেন। যদি এ পদ্ধতি মানতে তারা প্রস্তুত না হয়; বরং তাদের মধ্যে অনিষ্টতা দীর্ঘায়িত হয় এবং তাদের অনৈক্য ও পাপাচারের আশংকা করা হয় তাহলে শাসক স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবেন।[৯৭]

## স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের সময় সালিস মানা

ফকীহগণের মতে, যখন স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ চরম আকার ধারণ করে, তাদের বিষয়টি জাটিল হয়ে দাঁড়ায়, তাদের কার পক্ষ থেকে অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে তা জানা না যায় এবং তাদের এ বিরোধ আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত পাপাচার ও জুলুমের পর্যায়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয় তখন তাদের মধ্যে সালিসী শরীয়সম্মত হবে।[৯৮]

মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত"।[৯৯]

স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের ক্ষেত্রে সালিসী ব্যবস্থার যে কথা ফকীহগণ বলেছেন তা মূলত পূর্বোক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী এবং তার ওপর আমল করণার্থে।

ফকীহগণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সালিসীর বিধি-বিধানকে কয়েকটি মাসাআলায় ব্যাপৃত করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

## ক. যে অবস্থায় সালিস নিযুক্ত করা হবে

ফকীহগণের মতে, স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান ও অবাধ্যতা থেকে ফিরানোর জন্য প্রহার, ধমকপ্রদান অথবা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের যত মাধ্যম আছে তার কোনোটিই ফলপ্রসূ না হয় অতঃপর স্বামী বিচারক বরাবর তাদের জন্য সালিস নিযুক্তির নির্দেশনাসহ স্ত্রীর বিষয়টি উত্থাপন করে। একইভাবে যখন স্বামী-

---

৯৭. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৮।

৯৮. বাদায়ে'উস-সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩৪; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৬; আল-উম্ম, খ. ৫, পৃ. ১৯৪; কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ২১১; আল-জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৯০; তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭৮।

৯৯. সূরা আন-নিসা, ৩৫।

www.amarboi.org

স্ত্রীর মধ্যকার বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে; কিন্তু অন্যায় কার থেকে সজ্ঘটিত হচ্ছে তা জানা না যায়; স্ত্রীকে সৎগোত্রের মধ্যে বসবাস করানোর পরেও জটিলতা চলমান থাকে। অথবা তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় বিবাদের সূচনা হয় অথবা তাদের মধ্যে বসবাস সম্ভব না হয় অথবা তাদের মধ্যে অনৈক্য বিরোধ ও শত্রুতা চরম আকার ধারণ করে এবং পরস্পর গালিগালাজ, ও মারামারি নিত্যকার ঘটনা হয় এবং তা কদর্যতার রূপ নেয়, তাদের মধ্যে অনিষ্টতা দীর্ঘায়িত হয় এবং এই আশঙ্কা করা হয় যে, বিষয়টি তাদেরকে পাপাচারের পথে নিয়ে যাবে তখন বিচারক দু'জন সালিস নিযুক্ত করবেন।[১০০]

### খ. সালিস নিযুক্তির ব্যাপারে সম্বোধন ও তার বিধান

জমহুর ফকীহগণের মতানুযায়ী আল্লাহর বাণী–

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

"তোমরা যদি তাদের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর তবে তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রী) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর।[১০১] এ আয়াতে সম্বোধিত হলেন শাসক ও নেতৃবর্গ। কেননা তারাই উভয়ের বিরোধে দৃষ্টিপাত করবেন এবং সীমালঙ্ঘন ও জুলুম থেকে নিষেধ করবেন।

কেউ কেউ বলেন, এখানে সম্বোধিত ব্যক্তি হলেন অভিভাবকগণ। কেউ কেউ বলেন, স্বামী-স্ত্রী। অতএব অভিভাবক ও স্বামী-স্ত্রীর জন্য বৈধ হবে কোনো ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর বিষয়ে ফয়সালার জন্য দু'জন সালিস নিযুক্ত করা এবং তাদের দু'জনের ফয়সালা এ বিষয়ে কাজী (বিচারক) যাদেরকে নিযুক্ত করেন তাদের ফয়সালার সমতুল্য।[১০২]

মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের জমহুর ফকীহগণ বর্ণনা করেন, সালিস নিযুক্ত করা শাসক বা বিচারকের উপর অপরিহার্য। কেননা সালিস নিযুক্ত করা সংক্রান্ত।

আয়াতটি মুহকাম, মানসুখ নয়। অতএব এ অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য। তাছাড়া এটি জুলুম প্রতিরোধের পর্যায়ভুক্ত, যা বিচারকের সাধারণ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

---

১০০. আল-বাদায়ে'উস-সানায়ে', খ. ২, পৃ. ৩৩৪; জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৯০; তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭৫; আশশারহুল কাবীর মাআ হাশিয়া আদ্-দাসুকী; খ. ২, পৃ. ৩৪৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; আল-মুগনী; খ. ৭, পৃ. ৪৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১১।

১০১. সূরা আন-নিসা, ৩৫।

১০২. জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৯০; তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭৫; আশ-শারহুল কাবীর মাআ আদ্দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১, আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৮।

www.amarboi.org

শারবীনী আল-খাতীব বলেন, যিয়াদাতুর রওযা গ্রন্থে এ মতকেই সহীহ বলা হয়েছে। আল-মাওয়ারেদী এ মতকে নিশ্চিত করেছেন। আল-আযরাঈ বলেন, আল-উম্ম গ্রন্থের প্রকাশ্য বর্ণনা হলো, এটি অপরিহার্য। 'আল-উম্ম' এর সে বর্ণনা হলো, ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যখন শাসকের কাছে বিরোধের আশঙ্কাযুক্ত স্বামী-স্ত্রীর বিষয় উত্থাপিত হবে তখন তার উচিৎ স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করা।[১০৩]

**গ. সালিস স্বামী-স্ত্রীর পরিবার থেকে হওয়া**

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে সালিসদ্বয় স্বামী ও স্ত্রীর পরিবার থেকে হওয়া মুস্তাহাব, আবশ্যক নয়। তবে অগ্রাধিকারযোগ্য আল্লাহর এ বাণীর কারণে :

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

"তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর।" কেননা তারা অধিক সহানুভূতিশীল, প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তাদের দু'জনের পরিবার ভিন্ন অন্য কোনো লোককে সালিস নিযুক্ত করাও বৈধ। কেননা বিচারক বা প্রতিনিধির জন্য আত্মীয়তা শর্ত নয়। অতএব এ বিষয়টি নির্দেশনামূলক ও মুস্তাহাব।[১০৪]

মালেকীগণ বলেন, সালিসদ্বয় স্বামী স্ত্রীর পরিবার থেকে (স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন) হবে, যদি সম্ভব হয়। কেননা নিকটতমরা গোপন বিষয়সমূহ জানেন, স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে তারা বেশি অবগত এবং সংশোধনের জন্য অধিক উত্তম। আর স্বামী-স্ত্রীর অন্তর তাদের প্রতি তৃপ্ত। সুতরাং তারা তাদের কাছে নিজেদের অন্তরের গভীরে লুকায়িত ভালোবাসা ও ক্ষোভ, পৃথক হওয়ার বা সাহচর্যে থাকার ইচ্ছা নির্বিঘ্নে প্রকাশ করবে। পরিবার থেকে সালিস হওয়ার সম্ভাব্যতা থাকা অবস্থায় বাইরের কাউকে সালিস নিযুক্ত করা জায়েয নেই। যদি সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও (বাইরের কাউকে) নিযুক্ত করে তবে তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল হবে। কেননা আয়াতের প্রকাশ্য রূপ হলো সালিস হতে হবে তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) পরিবার থেকে। যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া অবস্থায় তা অপরিহার্য শর্ত।

যদি তাদের দু'জনই একসাথে স্বামী-স্ত্রীর পরিবারভুক্ত না হয় বরং শুধু একজন তাদের কোন একজনের পরিবারের হয় এবং অন্যজন বাইরের হয় তবে সে ব্যাপারে আল-লাখমী বলেন, তাদের একজনের পরিবারের জন্য বাইরের কাউকে অন্তর্ভুক্ত

---

১০৩. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩২৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; আল-উম্ম, খ. ৫, পৃ. ১৯৪।

১০৪. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫০; কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ২১১।

www.amarboi.org

করে নেয়া হবে। ইবনে হাজিব বলেন, তাদের উভয়ের জন্য লোক নির্ধারণ করা হবে এবং একজনের নিকটতমকে পরিত্যাগ করা হবে। দাসূকী বলেন, যাতে ঐ নিকটতম ব্যক্তি তার নিকটতমের প্রতি (বিচারের সময়) ঝুঁকে না পড়ে।

যদি সম্ভব হয় তবে উভয় পরিবার থেকে (সালিস) নিযুক্তির সময় তারা প্রতিবেশী হওয়া উত্তম। আর যদি সম্ভব না হয় তবে দূরের লোক হবে।
কুরতুবী বলেন, যদি তাদের উভয়ের পরিবারে এমন কাউকে না পাওয়া যায়, যে এ বিষয়টি মিমাংসা করবেন তবে তাদের ভিন্ন অন্যদের প্রেরণ করা হবে।[১০৫]

জাস্সাস বলেন, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন একজন সালিস হবেন স্ত্রীর পরিবার থেকে এবং অন্যজন হবেন স্বামীর পরিবার থেকে, যাতে দূরের কেউ হলে পক্ষপাতিত্বহেতু) তাদের কারো প্রতি ঝুঁকে পড়ার সন্দেহ দূরীভূত হয়। যখন সালিসদ্বয়ের একজন স্বামীর পক্ষ থেকে এবং অন্যজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে তখন এ জাতীয় সন্দেহ দূর হয়ে যাবে এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের পক্ষের ব্যক্তির পক্ষ থেকে কথা বলতে পারবে।[১০৬]

### ঘ. সালিসদ্বয়ের শর্তাবলি

ফকীহগণের মতে সালিসদ্বয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, অবাধ্যতা বিষয়ক বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শর্ত। পুরুষ হওয়া ও স্বাধীন হওয়া শর্ত কি-না, সে ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে :

মালিকীগণ বলেন, সালিসদ্বয়ের শর্ত হলো, পুরুষ হওয়া, বিবেক সম্পন্ন হওয়া, ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং যে বিষয়ে ফয়সালা করবে সে সম্পর্কে দক্ষ হওয়া। ন্যায়পরাপয়ণতাহীন (ফাসিক, বালক, পাগল) ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহ স্থায়ী রাখা অথবা সম্পদ প্রদান ছাড়াই তালাক অথবা সম্পদ প্রদান পূর্বক খুল'আ তালাক সংক্রান্ত ফয়সালা বাতিল হবে। নির্বোধ ব্যক্তি, নারী এবং অবাধ্যতার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি, যে আলিমদের সাথে পরামর্শ ছাড়া ফয়সালা প্রদান করে তার ফয়সালা বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি ঐ ব্যক্তি আলিমদের সাথে পরামর্শ অনুযায়ী ফয়সালা করে তবে তার ফয়সালা কার্যকর হবে।[১০৭]

শাফেয়ীগণ বলেন, সালিসদ্বয়ের ক্ষেত্রে তাকলীফ (শরীয়ত পালনের যোগ্যতা), ইসলাম, স্বাধীন হওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, যে জন্য তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া শর্ত।

---

১০৫. তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭৫; আশ-শারহুল কাবীর ওয়া হাশিয়া আদ-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৪।
১০৬. জাসসাস, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ১৯০।
১০৭. আশ-শারহুল কাবীর ওয়া হাশিয়া আদ-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৪।

www.amarboi.org

মাযহাবের অধিকতর স্পষ্ট মতামতের ভিত্তিতে তাদের পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। কালয়ূবী বলেন, তবে উত্তম। আর দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে পুরুষ হওয়া শর্ত।[১০৮]

হাম্বলীগণ বলেন, সালিসদ্বয় জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক, ন্যায়পরায়ণ, মুসলমান হতে হবে। কেননা এগুলো ন্যায়পরায়ণতার শর্ত; তাই আমরা তাদেরকে প্রতিনিধি বা বিচারক যাই বলি না কেন। কারণ প্রতিনিধি যেহেতু শাসকের পর্যবেক্ষণে থাকে সেহেতু সে ন্যায়পরায়ণতাই অবলম্বন করবে, যেমনিভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক অথবা নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হলে সে ন্যায়পরায়নতা অবলম্বন করে। তারা পুরুষ হবে। কেননা তারা রায় ও পর্যবেক্ষণের মুখাপেক্ষী।

কাজী ইয়াজ বলেন, তাদের স্বাধীন হওয়া শর্ত। কেননা তার মতে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং স্বাধীন হওয়া ন্যায়পরায়ণতার শর্ত। ইবনে কুদামা বলেন, এটি বলা উত্তম হবে যে, যদি তারা প্রতিনিধি হয় তবে তাদের স্বাধীন হওয়া জরুরী নয়। কেননা, গোলামের প্রতিনিধিত্ব বৈধ। আর যদি তারা বিচারক হয় তাহলে স্বাধীন হওয়া জরুরী। কেননা গোলামের শাসক হওয়া বৈধ নয়। তাদের একত্রিত রাখা ও বিচ্ছিন্ন করা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াও জরুরী, কেননা এ বিষয়েই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। সুতরাং এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকা জরুরী।[১০৯]

### ঙ. সালিসদ্বয়ের গুণাবলি ও যোগ্যতা

হানাফীগণের মত, শাফেয়ীগণের অধিকতর স্পষ্ট মত ও হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত হলো, সালিসদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ থেকে উকীল বা প্রতিনিধি। তাদের দু'জনের সম্মতি ও ওকালাত (প্রতিনিধি নিয়োগ) ছাড়া তাদেরকে নিযুক্ত করা যাবে না এবং তারা তাদের অনুমতি ছাড়া বিচ্ছিন্ন করার অধিকার রাখবে না।[১১০]

মালেকীগণ বলেন, এটি শাফেয়ীগণের অধিকতর স্পষ্ট মতামতের বিপরীত মত ও ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় বর্ণনা, আর তা হলো, তারা দু'জন শাসক বা বিচারক। তারা যা কল্যাণকর মনে করবেন তাই করবেন। তাই স্বামী-স্ত্রী তাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করুক বা না করুক।[১১১]

এটি হলো সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এ ব্যাপারে তাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে :

হানাফীগণ বলেন, সালিসদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর প্রতিনিধি। একজন স্ত্রীর প্রতিনিধি অন্যজন স্বামীর প্রতিনিধি। হযরত আলী রা. থেকে এমনটি বর্ণিত আছে। এক

---

১০৮. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; হাশিয়া আল-কালয়ূবী; খ. ৩, পৃ. ৩০৭।

১০৯. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৭-৫০।

১১০. জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৯০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৮০।

১১১. আশ-শারহুল কাবীর হাশিয়া আদ্-দাসূকীসহ, খ. ২, পৃ. ৩৪৪।

www.amarboi.org

ব্যক্তি ও তার স্ত্রী আলী রা.-এর নিকট আগমন করল যাদের মধ্যে বিরোধ ছিল এবং তাদের প্রত্যেক্যের সাথে একদল মানুষও ছিল। আলী রা. বললেন, স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর। অতঃপর সালিসদ্বয়কে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের দায়িত্ব কী? তোমাদের দায়িত্ব হলো, তোমরা যদি দেখ তারা মিলিত হবে তবে তাদেরকে মিলিয়ে দিবে। আর যদি দেখ তারা বিচ্ছিন্ন হবে তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করবে। স্ত্রী বলল, আল্লাহর কিতাব নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আমার ব্যাপারে তাতে যা আছে সে ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট হলাম। স্বামী বলল, তবে বিচ্ছেদ হবে না। তখন আলী রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি মিথ্যা বলেছ। স্ত্রী যেমন স্বীকারোক্তি দিয়েছে স্বামীও তদ্রূপ স্বীকারোক্তি না দেওয়া পর্যন্ত সে এখান থেকে যেতে পারবে না। অতঃপর আলী রা. জানালেন, সালিসদ্বয়ের বক্তব্য স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হতে হবে।

হানাফীগণ আরো বলেন, স্বামী স্ত্রীর সন্তুষ্টি ছাড়া তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো অধিকার সালিসদ্বয়ের নেই। এটি এ কারণে যে, এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, যদি স্বামী স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না এবং সালিসদ্বয়ের সালিসীর পূর্বে শাসক স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য স্বামীকে জবরদস্তি করতে পারবে না। একইভাবে স্ত্রী যদি তার অবাধ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করে তবে শাসক তাকে খুলা তালাক প্রদান করার জন্য অথবা মোহর প্রত্যাহারের জন্য জবরদস্তি করতে পারবে না। সুতরাং সালিস নিযুক্ত করার পূর্বে যখন এটাই তাদের হুকুম তখন একইভাবে সালিস নিযুক্ত করার পরেও সেই একই হুকুম হবে যে, স্বামীর সম্মতি ও তার প্রতিনিধি নিয়োগ ছাড়া তাদের পক্ষ থেকে তালাক সঙ্ঘটন করা এবং স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তার মালিকানা থেকে মোহর বের করে নেয়াও বৈধ নয়। অতএব এ কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তাদের খুলআ তালাকও বৈধ নয়। তাছাড়া যেখানে শাসকই বিচ্ছিন্ন করার অধিকার রাখেন না সেখানে সালিসদ্বয় কিভাবে সে অধিকার রাখবেন? বরং তারা খুলাআ তালাক অথবা বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে উকীল বা প্রতিনিধি মাত্র।

তারা আরো বলেন, সালিসদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টিতে প্রতিনিধি নিয়োজিত হওয়া ছাড়া এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি তারা ছাড়া বিচ্ছিন্ন করার কোনো ক্ষমতা রাখেন না এবং সালিসও হতে পারেন না। নিয়োজিত হবার পর তারা যে ফয়সালাই করবেন তা বৈধ। সালিসদ্বয়ের জন্য স্বামীর সন্তুষ্টি ছাড়া খুলআ তালাক সংঘটিত করা বৈধ হবে না এবং স্ত্রীর অধিকার থেকে তার সম্পদ বের করে দেয়াও বৈধ হবে না তার দলিল আল্লাহর এ বাণী :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

www.amarboi.org

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছ তা হতে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে কারো কোনো অপরাধ নেই"।[১১২]

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ"।[১১৩]

তিনি প্রত্যেককে অন্যের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন–

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে-অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং তা বিচারকের নিকট পেশ করো না"।[১১৪]

অতএব মহান আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, শাসক ও অন্যান্য সকলে এ ক্ষেত্রে সমান যে, কেউ কারো সম্পদ গ্রহণ ও অন্যকে প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। এ থেকে প্রমাণিত হয়, শাসক স্ত্রীর সম্পদ গ্রহণ ও তা স্বামীকে অর্পণের ক্ষমতা রাখেন না। একইভাবে স্বামীর প্রতিনিধি নিয়োগ বা তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার ওপর তালাক অর্পণের ক্ষমতা রাখেন না।[১১৫]

মালেকীগণ বলেন, সালিসদ্বয়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ। তাই স্বামী-স্ত্রী তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রতিনিধি নিয়োগ করুক বা না করুক। এটি তালাকে বায়েন হবে যদিও খুলআ তালাক না হয়; বরং তা বিনিময় ছাড়া হয়। তালাক পতিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী তাতে সম্মত না হলেও তা কার্যকর হবে। আর তালাক পতিত হওয়ার পূর্বে হলে শাসকের কাছে উত্থাপন ছাড়াই স্বামী-স্ত্রী যারা সালিস নিযুক্ত করেছিল তারা তা প্রত্যাহার করতে পারে। সালিসদ্বয়ের ফয়সালা কার্যকর হবে শাসক তাতে সম্মত না হলেও। অথবা স্থানীয় বিচারকের ফয়সালার বিরোধী হলেও। তাই তারা বিচারক অথবা স্বামী-

১১২. সূরা আল-বাকারাহ, ২২৯।
১১৩. সূরা আন-নিসা, ২৯।
১১৪. সূরা আল বাকারা, ১৮৮।
১১৫. জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৯০-১৯২।

www.amarboi.org

স্ত্রী যার পক্ষ থেকেই নিয়োজিত হোন না কেন। কেননা তাদের কাজ ফয়সালা করা, সাক্ষ্য বা প্রতিনিধিত্ব নয়। কারণ মহান আল্লাহ বলেন–

فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

"তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রী) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর"।[১১৬]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এটিই সুস্পষ্ট বর্ণনা যে, তারা বিচারক, প্রতিনিধি বা সাক্ষী নন। শরীয়তে উকীল বা প্রতিনিধির একটি বিশেষ নাম (পরিভাষা) ও অর্থ রয়েছে। সালিসেরও একটি নাম ও পরিভাষা শরীয়তে আছে। মহান আল্লাহ যেহেতু তাদেরকে আলাদা আলাদা বর্ণনা করেছেন সেহেতু তাদের একের অর্থ অন্যের ওপর যুক্ত করা উচিত নয়। উবায়দা র. থেকে বর্ণিত ইবনে সীরীনের হাদীসে (যা ইতঃপূর্বে হানাফীগণের প্রমাণ বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে) বর্ণিত হয়েছে যে, আলী ইবনে আবি তালিব রা. সালিসদ্বয়কে বলেন– তোমাদের দু'জনের দায়িত্ব কী তা-কি তোমরা জান? যদি দেখ, তারা পৃথক হতে চায় তাহলে তোমরা তাদেরকে পৃথক করবে।" তারা যদি উকীল বা সাক্ষী হতো তবে তিনি বলতেন না যে, "তোমাদের দায়িত্ব কী তাকি তোমরা জান"? বরং বলতেন, তোমাদের কী জন্য উকীল নিযুক্ত করা হয়েছে তা-কি তোমরা জান?

সালিসদ্বয় কর্তৃক নির্ধারিত তালাক এক তালাকের বেশি হবে না। তাদের জন্য একাধিক তালাক প্রদান করা বৈধও নয়। কেননা এটি তাদেরকে সাংশোধনের যে অর্থে নিযুক্ত করা হয়েছে তার বিরোধী। অতএব স্বামীর জন্য অতিরিক্ত তালাক প্রত্যাখ্যান করা বৈধ। আলী র. বলেন, মুদাওয়ানা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তারা এক তালাকের বেশি দিয়ে পৃথক করতে পারবে না। আর সেটি বায়েন তালাক হিসেবে গণ্য হবে। তারা যদি একাধিক তালাকের ফয়সালা দেয় তা হলেতো বাতিল হবে।

সালিসদের একজন যদি এক তালাকের সিদ্ধান্ত দেয় এবং অন্যজন দুই বা তিন তালাকের, তাহলে এক তালাক অপরিহার্য হবে, একের উপর উভয় সালিসের ঐকমত্যের কারণে।

যদি সালিসদ্বয় তালাক দেয় এবং তারা তালাক স্বামীর জন্য স্ত্রী থেকে সম্পদের বিনিময়ে অথবা সম্পদ ছাড়া হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করে, যেমন– তাদের একজন বলল, আমি সম্পদের বিনিময়ে তাকে তালাক দিয়েছি। আর অন্যজন বলল, আমি তাকে সম্পদ ছাড়া তালাক দিয়েছি। অথবা তাদের একজন বলল, আমরা উভয়ে একত্রে সম্পদের বিনিময়ে তাকে তালাক দিয়েছি, অন্যজন বলল,

---

১১৬. সূরা আল-নিসা, ৩৫।



www.amarboi.org

সম্পদ ছাড়া। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি সম্পদ প্রদান না করে তবে স্বামীরও তালাক প্রদান করা আবশ্যক হবে না এবং অবস্থা আগের মতই থেকে যাবে। আর স্ত্রী যদি সম্পদ প্রদান করে তাহলে তালাক পতিত হবে এবং বায়েন তালাক হবে।

আদ্‌দাসূকী বলেন, সালিসদ্বয়ের কর্তব্য হলো, যে শাসক তাদেরকে নিযুক্ত করেছেন তার কাছে আগমন করে মামলার ব্যাপারে তার জ্ঞাতার্থে তারা যা করেছেন তা তাকে জানাবেন। তারা যখন শাসককে অবহিত করবেন তখন শাসকের জন্য আবশ্যক হবে কোন প্রকার পিছনে না ফিরে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা, যদিও তা তার নীতিমালা থেকে ভিন্ন হয়। যেমন তিনি বলবেন, আমি সেই সিদ্ধান্তই দিলাম তোমরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছ।

স্বামী-স্ত্রী যখন তাদের বিষয়টি শাসকের কাছে উত্থাপন ছাড়াই দু'জন সালিস নিযুক্ত করবে তখন স্বামী স্ত্রীর জন্য বৈধ হবে যে, তারা সালিস নিযুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসবে এবং সালিসদ্বয়কে বরখাস্ত করবে যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করার কাজ শুরু না করে থাকে এবং তালাকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকে। আর যদি অনুধাবন করার কাজ করে এবং তালাকের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তবে তাদের মধ্য থেকে যে সালিসীর সিদ্ধান্ত থেকে ফিরতে চায় তার ফেরার সুযোগ থাকবে না। বরং তারা (সালিসদ্বয়) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তা বাস্তবায়ন আবশ্যক হবে। তাই তাদের একজন বা উভয়েই সালিসী প্রত্যাহার করুক না কেন। ইবনে ইউনুস বলেন, তারা উভয়ে যদি বৈবাহিক জীবনে স্থায়ী থাকতে চায় তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটনোই সমীচীন। দারদীর বলেন, এর অর্থ হলো, যদি সালিসদ্বয় শাসক কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে থাকেন তাহলে স্বামী-স্ত্রীর জন্য বৈধ হবে না সালিসী পরিত্যাগ করা যদিও সালিসদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা অনুধাবন করার কাজ শুরু এবং তাতে মনোনিবেশ না করে থাকেন।[১১৭]

শাফেয়ীগণ বলেন, অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী সালিসদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর উকীল বা প্রতিনিধি। কেননা তাদের অবস্থা কখনো কখনো বিচ্ছেদ পর্যন্ত পৌঁছে যায় অথচ সহবাস স্বামীর অধিকার এবং সম্পদ স্ত্রীর অধিকার আর তারা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে কেউ কর্তৃত্ব করতে পারে না। কেননা দাসের ক্ষেত্রে ছাড়া কর্তৃত্বের মাধ্যমে তালাক প্রদান করা যায় না। আর এটি কিয়াস বহির্ভূত বিষয়। এ কারণেই সালিস নিযুক্তির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টি শর্ত। স্বামী ইচ্ছা করলে তার সালিসকে তালাক ও বিনিময়সহ খুলআর ক্ষমতা দিয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে। স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার সালিসকে খুলআর বিনিময় ব্যায় ও তার সাথে

---

১১৭. তাফসীর কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ১৭৬-১৭৭; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩২৯-৩৩০; আশ-শারহুল কাবীর ওয়া হাশিয়াহ আদ্‌দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৪-৩৪৭।

www.amarboi.org

তালাক গ্রহণের অধিকার দিয়ে ক্ষমতা দিতে পারে। সে মুহূর্তে সালিসদ্বয় যদি ভালো মনে করেন তবে তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

তালাকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলের জন্য বৈধ নয় যে, তিনি খুলআ সংঘটিত করবেন, কেননা এটি যদিও তাকে সম্পদ প্রদান করে; কিন্তু এর ফলে রাজআত তথা স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণের অধিকার নিঃশেষ হয়ে যায়। একইভাবে খুলআর উকীলের জন্য বৈধ নয় যে, তিনি কোনো সম্পদ ছাড়াই তালাক দিবেন।

যদি সালিসদ্বয়ের সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে বিচারক অন্য দু'জনকে নিযুক্ত করবেন যাতে তারা একটি বিষয়ে একমত হতে পারেন। যদি সালিসদ্বয়ও ব্যর্থ হন তবে বিচারক তাদের মধ্যকার অত্যাচারিকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবেন এবং তার থেকে অন্যজনের অধিকার গ্রহণ করবেন।[১১৮]

হাম্বলীগণের মতে সালিসদ্বয়ের বিষয়ে ইমাম আহমদ-এর কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। তার প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রীর প্রতিনিধি। তাদের সম্মতি ও ওকালত ছাড়া তাদের নিযুক্ত করা যাবে না এবং তাদের অনুমতি ছাড়া বিচ্ছেদের ক্ষমতা তারা রাখেন না। কেননা সহবাস স্বামীর অধিকার এবং সম্পদ স্ত্রীর অধিকার। আর তারা দু'জনই বয়প্রাপ্ত ও বুদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন অতএব তাদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত উকীল অথবা তাদের ওপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা ছাড়া এ ক্ষেত্রে অন্যদের হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। এ বর্ণনাটি মাযহাবের সহীহ বর্ণনা, যেমনটি বলেছেন– আল-মারদাভী।

দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী তারা দু'জন শাসক। তারা মিলিয়ে দেয়া অথবা বিনিময়সহ বা বিনিময় ছাড়া বিচ্ছিন্ন করার যেটিই ভাল মনে করবেন তা করার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা স্বামী-স্ত্রীর ওকালাত বা সম্মতির মুখাপেক্ষী নন। কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

"তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর।"

তিনি তাদেরকে সালিস হিসেবে নামকরণ করেছেন এবং স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টি বা সম্মতি বিবেচনায় নেননি। অতঃপর তিনি বলেন : إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا "যদি তারা সমঝোতা চায়" সালিসদ্বয়কে এ বিষয়ে সম্বোধন করেছেন।

হাম্বলীগণ বলেন, আমরা যদি বলি, তারা দু'জন উকীল বা প্রতিনিধি তবে তারা কোনো কিছু করতে পারবে না যতক্ষণ স্বামী তার প্রতিনিধিকে তালাক বা

---

১১৮. মুগনী আল-মুহতাজ : খ. ৩, পৃ. ২৬১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫; শ-রহু আল-মুহাল্লা ওয়া হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ১৫৭।

www.amarboi.org

সমঝোতার যেটি ভালো মনে করেন সে বিষয়ের অনুমতি না দেন এবং স্ত্রী তার প্রতিনিধিকে খুলআ ও সমঝোতার ব্যাপারে যেটি ভালো মনে করেন তা করার অনুমতি না দেন। সালিসদ্বয়ের থেকে দায়মুক্তিও সহীহ্ হবে না। কেননা এজন্য তাদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়নি। তবে স্ত্রীর উকীল স্ত্রীর পক্ষ থেকে শুধু মাত্র খুলআর দায়মুক্ত করতে পারবে। কারণ বিনিময় ছাড়া খুলআ সহীহ্ হয় না। অতএব খুলআর বিষয়ে স্ত্রীর প্রতিনিধি নিয়োগ বিনিময় আদান প্রদানে অনুমতি প্রদানের মতোই, যাতে দায়মুক্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আর যদি বলি, তারা দু'জন শাসক তবে তারা তালাক ও খুলআর মধ্যে যেটি উত্তম মনে করবেন সেটিই কার্যকর করবেন তাই তারা তাতে সম্মত থাকুক বা অস্বীকার করুক।[১১৯]

**চ. একজন সালিস নিয়োগ**

বিরোধের সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন সালিস নিয়োগের বিষয়ে ফকীহ্গণ মতভেদ করেছেন। মালেকীগণ বলেন, স্বামী স্ত্রীর জন্য তাদের বিষয়টি বিচারকের বরাবর উত্থাপন না করে একজন ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ পুরুষ, যে বিষয়ে তাকে নিয়োগ করা হচ্ছে সে বিষয়ে দীনী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে সালিস নিয়োগ করা বৈধ। উক্ত সালিস সমঝোতা, অথবা সম্পদসহ বা সম্পদছাড়া তালাক প্রদানের কাজই করবেন, যা দুইজন সালিস করতো।

শাফেয়ীগণের মাযহাব বর্ণনা করে রামলী বলেন, একজন সালিস যথেষ্ট হবে না; বরং অবশ্যই দু'জন হতে হবে, যারা স্বীয় পক্ষের সাথে নিভৃতে মিলিত হয়ে তাদের থেকে সবকিছু জানার পর তাদের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন। অতঃপর ফয়সালা দেবেন।

খতীব বলেন, গ্রন্থকার ইমাম নববী-এর উক্তি 'একজন সালিস যথেষ্ট নয়' আয়াতের বাহ্যিক বর্ণনা অনুযায়ী অধিকতর শুদ্ধ। তাছাড়া সালিস একজন হলে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে তাকে দোষারোপ করবে এবং তার কাছে নিজ গোপন বিষয় প্রকাশ করবে না।[১২০]

**ছ. সালিসদ্বয়ের করণীয়**

ফকীহ্গণের মতে, সালিসদ্বয় যথাসম্ভব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করার চেষ্টা করবেন। যদি সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে বিষয়টি শাসক বরাবর

---

১১৯. আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৮০-৩৮১; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৭-৫০; কাশ্শাফুল-কিনা', খ. ৫, পৃ. ২১১।

১২০. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫।

www.amarboi.org

উপস্থাপন করবেন অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। এটি সংক্ষিপ্ত কথা। এ ব্যাপারে তাদের বিশ্লেষণ রয়েছে :

হানাফীগণ বলেন, সালিসদ্বয়কে স্বামী-স্ত্রীর কাছে তাদের মধ্যে সমঝোতার জন্য প্রেরণ করা হবে। যদি তারা সমঝোতা করতে অপারগ হন তবে তারা তাদের মধ্যে যে অত্যাচারী তাকে সদুপদেশ প্রদান করবেন; তার জুলুমের জন্য তিরস্কার করবেন এবং শাসককে এ ব্যাপারে অবহিত করবেন যেন তিনি বিষয়টি তার আয়ত্তে নেন।[১২১]

মালেকীগণ বলেন, প্রথম পর্যায়ে সালিসদ্বয়ের ওপর আবশ্যক হলো, সম্ভাব্য যে কোনো পন্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৌহার্দময় ও সৎ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সমঝোতা করে দেয়া। তার পদ্ধতি এই যে, প্রত্যেকে তার নিকটতমের সাথে একান্ত পরিবেশে মিলিত হবে। অতপর সে তার সঙ্গীর কী কী বিষয় অপছন্দ করে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং তাকে বলবেন, যদি তোমার সঙ্গীর প্রতি তোমার কোনো প্রয়োজন থাকে তাবে আমরা তাকে তোমার কাছে ফেরত দিব যদি তুমি তার সাথে থাকা পছন্দ করো ।

যদি সমঝোতা অসম্ভব হয় তাহলে সালিসদ্বয় তাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। যদি তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, দুর্ব্যবহার স্বামীর পক্ষ থেকে, তাহলে তারা খুলআ ছাড়া তালাক প্রদান করবে। অর্থাৎ কোনো প্রকার সম্পদ ছাড়াই যা তার জুলুমের কারণে স্ত্রীর থেকে তাদের গ্রহণ করার কথা ছিল।

আর যদি দুর্ব্যবহার স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় তবে সালিসদ্বয় যদি উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হবার সম্ভাবনা দেখেন তাহলে স্বামীকে স্ত্রীর ওপর আস্থা স্থাপন করাবেন এবং স্ত্রীকে স্বামীর নিকটই রেখে দিবেন। তারা স্বামীকে ধৈর্য ও সৎ জীবনযাপনের নির্দেশ দিবেন। অথবা তারা তাদের বিবেচনানুযায়ী একটি পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে খুলআ করে দিবেন, যদিও তা মোহরের চেয়ে বেশি হয়, যদি স্বামী বিচ্ছিন্ন হতে চায় অথবা সালিসদ্বয় জানতে পারেন যে, স্ত্রী তার সাথে বসবাস করবে না।

দুর্ব্যবহার যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের থেকে হয় তবে সমঝোতা অসম্ভব হলে এবং স্ত্রী উক্ত স্বামীর সাথে অবস্থান করতে না চাইলে, খুলআ ছাড়া তালাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সালিসদ্বয়ের জন্য বৈধ হবে নাকি তাদের জন্য স্ত্রী থেকে সহজ কিছু গ্রহণের ভিত্তিতে খুলআ প্রদানের অধিকার থাকবে, এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। খলীল বলেন, অধিকাংশই এটির অর্থাৎ খুলার ওপর মত দিয়েছেন। আল মুদাওয়ানার অধিকাংশ ভাষ্যকারও এর পক্ষে মত দিয়েছেন। আশ-শাবরখীতী র. বলেন, অধিকাংশই বরং প্রথম মত অর্থাৎ খুলা ছাড়া তালাক এর পক্ষে।

---

১২১. জাসসাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৯৩।

www.amarboi.org

আল-আবী র. ইবনে আরাফা র. থেকে বর্ণনা করে বলেন, বিচ্ছেদের পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। বাজী র. বলেন, যদি দুর্ব্যবহার স্বামী স্ত্রী উভয়ের থেকে হয় তবে সালিসদ্বয় কিছু মোহরের বিনিময়ে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। অতএব তারা স্বামীর ওপর পূর্ণ মোহর ধার্য করবেন না। কিছু আলেম এ মতের পক্ষে। ইমাম মুহাম্মদ র. এ মতটি আশহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ রহ. বলেন, আল্লাহর বাণী– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে কারো কোনো অপরাধ নেই"-এর মর্মার্থ এটাই। ইবনে ফাতহুন বলেন, সালিসদ্বয় যদি সমঝোতা করাতে সক্ষম না হন তবে স্ত্রী থেকে স্বামীকে কিছু বিনিময়ের অথবা তার থেকে মোহর বিয়োজনের মাধ্যমে অথবা কোনো প্রকার গ্রহণ বা বিয়োজন ছাড়াই সন্ধির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করবেন। তবে এ ক্ষেত্রে স্বামী থেকে কোন কিছু নেয়া উচিৎ নয় এবং সালিসদ্বয়ের কর্তব্য হলো, শাসক বরাবর এসে তারা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা তাকে অবগত করাবেন।

শাফেয়ীগণ বলেন, স্বামীর সালিস তার সাথে এবং স্ত্রীর সালিস তার সাথে নিভৃতে মিলিত হওয়ার এবং এ বিষয়ে তাদের অভিমত অবগত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে লক্ষ্য করবেন। এরপর সালিসদ্বয় যখন একত্রিত হবেন তখন এক সালিস অন্য সালিস থেকে কিছু গোপন করবেন না, তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করবেন। কিংবা যদি সংশোধন কষ্টকর হয় তাহলে এক তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। প্রত্যেক সালিসের জন্য আবশ্যক যে, তারা সতর্কতা অবলম্বন করবেন। স্বামী যদি তার উকীলকে বলে, স্ত্রী থেকে আমার সম্পদ গ্রহণ করুন এবং তাকে তালাক দিন। অথবা তাকে এই শর্তে তালাক দিন যে, তার থেকে আমার সম্পদ গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ তালাকের পূর্বে সম্পদ গ্রহণ করার শর্তারোপ করল। এমনিভাবে যদি বলে, স্ত্রী থেকে আমার সম্পদ গ্রহণ করুন এবং তাকে তালাক দিন। যেমনটি আল-বগবীর তাসহীহ থেকে আর-রাওজাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি তা সমর্থন করেছেন। কেননা উকীলের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য; সুতরাং তার জন্য তা অপরিহার্য হবে। যদিও ওয়াও তারতীব (ধারাবাহিকতা) এর জন্য না হয়। অতএব যদি বলে, তাকে তালাক দিন। অতঃপর তার থেকে আমার সম্পদ গ্রহণ করুন। তবে প্রথমেই সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ। কেননা এতে কল্যাণ বেশী। আল-আযরায়ী বলেন, স্বামীর প্রতিনিধি নিয়োগ সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হলো স্ত্রীর প্রতিনিধি নিয়োগও তেমনিভাবে হয়ে থাকে। যেমন– স্ত্রী বলল, তার থেকে আমার সম্পদ গ্রহণ করুন। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে খুলআ করুন।[১২২]

---

১২২. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১-২৬২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫; হাশিয়া আল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ১০৭।

www.amarboi.org

হাম্বলীগণ বলেন, সালিসদ্বয়ের উচিৎ তারা সংশোধনের নিয়ত করবে। কেননা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী– إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

"যদি তারা সমঝোতা চায় তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।"[১২৩] আর সালিসদ্বয় কোমল কথা বলবে, ইনসাফ করবে, উৎসাহ প্রদান করবে, ভীতি প্রদর্শন করবে। এ জন্য একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেবে না যাতে তাদের মধ্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।[১২৪]

**জ. স্বামী স্ত্রীর কোনো একজন অনুপস্থিত থাকা অথবা পাগল হয়ে যাওয়া**

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অথবা তাদের একজন সালিস নিযুক্তির পরে গায়েব হয়ে যায় তবে সালিসদ্বয়ের পর্যবেক্ষণ বন্ধ হবে না। আর যদি স্বামী স্ত্রীর উভয়ে বা একজন পাগল হয়ে যায় তাহলে সালিসদ্বয়ের পর্যবেক্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। এটি সংক্ষিপ্ত বিধান এবং এ ব্যাপারে তাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

শাফেয়ীগণের অধিকতর স্পষ্ট মত হলো, সালিসদ্বয় মূলত দু'জন উকীল। যদি স্বামী-স্ত্রীর একজন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে বা পাগল হয়ে যায় এমনকি যদি সালিসের কাছে তার মতামত অবগত করানোর পরেও হয় তবে তাদের নির্দেশ কার্যকর হবে না। কেননা সংজ্ঞাহীন বা পাগল হওয়ার কারণে উকীল বরখাস্ত হয়ে যায়। আর যদি সালিস নিযুক্তির পূর্বে তাদের একজন সংজ্ঞাহীন বা পাগল হয়ে যায় তাহলে সালিস নিযুক্ত করা জায়েয হবে না। আর যদি সালিস নিযুক্তির পর তাদের একজন গায়েব হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য উকীলের মতই তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।[১২৫]

হাম্বলীগণ বলেন, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা তাদের একজন গায়েব হয়ে যায় তবে প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী সালিসদ্বয়ের পর্যবেক্ষণ বন্ধ হবে না। কারণ তাদের দু'জনকে উকীল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এটি মাযহাবের সহীহ্ বর্ণনা, যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী তাদের পর্যবেক্ষণ বন্ধ হবে। এ বর্ণনায় সালিসদ্বয়কে শাসক বা বিচারক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী তাদেরকে শাসক বিবেচনা করা সত্ত্বেও তাদের পর্যবেক্ষণ বন্ধ হবে না।

স্বামী-স্ত্রী বা তাদের একজন যদি পাগল হয়ে যায় তবে প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী তাদের পর্যবেক্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী বন্ধ হবে না। কেননা শাসক পাগলের উপরও বিচার-ফয়সালা করে। আল-মারদাবী বলেন,

---

১২৩. সূরা আন-নিসা, ৩৫।

১২৪. কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১১।

১২৫. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫।

www.amarboi.org

এটিই মাযহাবের সহীহ্ মত এবং জমহুর এর ওপর একমত। তিনি আরও যোগ করেন যে, আল-মুগনী গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ীও তাদের পর্যবেক্ষণ বন্ধ হবে। কেননা পাগল অবস্থায় আর বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না।

ইবনে কুদামা বলেন, যদি সালিস নিযুক্তির পর স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে বা একজন গায়েব হয়ে যায় তবে সালিসদ্বয়ের জন্য তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা বৈধ হবে, যদি আমরা তাদেরকে উকীল বলে সাব্যস্ত করি। কেননা অনুপস্থিতির কারণে ওকালাত বাতিল হয় না। আর আমরা যদি তাদেরকে শাসক বা বিচারক বলে সাব্যস্ত করি তাহলে তাদের জন্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা বৈধ নয়। কেননা স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকে মাহকুম লাহু (যার অনুকূলে বিচার হয়) ও মাহকুম আলাইহি (যার প্রতিকূলে বিচার হয়)। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার তাদের নিযুক্ত উকীল বা প্রতিনিধি ছাড়া বৈধ নয়। অতএব তারা তাওকীল বা প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা বলে এটি করতে পারে; শাসকের ক্ষমতাবলে নয়। আর তাদের একজন যদি প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকে তবে তার অনুপস্থিতিতে তাকে যে বিষয়ে প্রতিনিধি বানিয়েছে তা করা তার জন্য বৈধ।

আর তাদের কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তবে তার উকীলের ক্ষমতা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা মুক্কেল (প্রতিনিধি নিয়োগকারী) পাগল হওয়ার কারণে তার ওকালত বাতিল হয়ে যায়। আর যদি সে শাসক হয় তবে তার জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করা বৈধ নয়। কেননা এর শর্ত হলো, বিরোধ স্থায়ী থাকা এবং বিচারপ্রার্থীর উপস্থিত থাকা। আর পাগলামী অবস্থার মধ্যে এ শর্ত বাস্তবায়িত হয় না।[১২৬]

**ঝ. সালিসদ্বয়কে প্রতিনিধি নিয়োগ করা থেকে স্বামী-স্ত্রীর বিরত থাকা**

শাফেয়ীগণের অধিকতর প্রকাশ্য ও হাম্বলীগণের মাযহাবের সহীহ্ মত অনুযায়ী সালিসদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ থেকে উকীল বা প্রতিনিধি। অতএব স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি ও উকীল নিয়োগ ছাড়া তাদের নিয়োগ প্রদান করা যাবে না। স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের নিযুক্তিতে সম্মত না হয় বা তাদেরকে ওকালত প্রদান থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের ওপর জবরদস্তি করা যাবে না। তবে শাসক অনুসন্ধান চালাতে থাকবেন, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে অত্যাচারী তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে তিনি তাকে নিবৃত্ত করতে পারেন এবং আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য তার থেকে অত্যাচারিতের অধিকার আদায় করে দিতে পারেন।[১২৭]

–মুহাম্মদ রুহুল আমিন

---

১২৬. আল ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৮১; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫০।

১২৭. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১১; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৮০।

www.amarboi.org

# পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)

**সংজ্ঞা :** আরবী الْبِرُّ শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ, অনুগ্রহ, সততা, আনুগত্য ও উপকারিতা[১]। পরিভাষায় সদ্ব্যবহার বলতে বুঝায়, কোমল ও সুন্দর কথার মাধ্যমে ইহসান করা, যা সহানুভূতি ও ভালোবাসার প্রতি নির্দেশ করে এবং ঘৃণা উদ্রেককারী রূঢ় কথা থেকে দূরে থাকা। আর যা সম্পদ ও অন্যান্য ভালো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত।[২]

الأَبَوَانِ দ্বারা পিতা ও মাতা উভয়কে বুঝায়।[৩]

الأَبَوَيْنِ শব্দটি দাদা-নানা ও দাদী-নানীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে।[৪]

ইবনুল মুনযির বলেন : الأَجْدَادُ (দাদাগণ) শব্দটি পিতাকে এবং الْجَدَّاتُ (দাদীগণ) শব্দটি মাতাকেও শামিল করে। তাই কোনো ব্যক্তি তাদের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে যেতে পারবে না। উক্ত শব্দটি বাপ-দাদা ছাড়া ভাই বা অন্যান্য নিকটাত্মীয়দেরকেও শামিল করে বলে আমার জানা নেই।[৫]

## পালনীয় বিধান

ইসলাম পিতা-মাতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের আনুগত্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে সর্বোত্তম মহৎ কাজ হিসেবে গণ্য করেছে। আর তাদের অবাধ্য হতে নিষেধ করেছে এবং সে ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

---

১. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, আস্-সিহাহ, ধাতু برر আবুর বাকা এর আল-কুল্লিয়্যাত, খ. ১, পৃ. ৩৯৮, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দামেস্ক, সংস্করণ, ১৯৭৪।

২. আল-ফাওয়াকেহুদ-দাওয়ানী আলা রিসালাতিল কায়রাওয়ানী, পৃ. ২, খ. ৩৮২-৩৮৩; আন-হায়ছামী, আয-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবায়ের খ. ২, পৃ. ৬৬ (দারুর মারিকা, বৈরুত সংস্করণ।

৩. লিসানুল আরব ও আস-সিহাহ।

৪. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ২২০; তাবয়ীনুল হাকায়েক শরহ কানযুদ-দাকায়েক, খ. ৩, পৃ. ২৪২; আল-মহাযযাব ফী ফিকহিল ইমাম আশ-শাফেঈ, খ. ২, পৃ. ২৩০; তুহফাতুল-মুহতাজ বিশারহিল মিনহাজ, খ. ৯, পৃ. ২৩২-২৩৩; মাতালিবু উলিল-নুহা, খ. ২, পৃ. ৫১৩।

৫. আল-কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৪১।

www.amarboi.org

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতায় পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[৬]

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ইবাদত ও একত্ববাদের নির্দেশ দিয়ে তার সাথেই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে 'আল-কাজা' শব্দটি নির্দেশ দেয়া বাধ্যতামূলক ও ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখের সাথে সাথেই পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তাঁর বাণী–

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।"[৭]

আল্লাহর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) হলো ইমানের নিয়ামত দানের জন্য। আর পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে লালন-পালনের জন্য। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না র. বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করল সে আল্লাহর শোকর (কৃতজ্ঞতা) আদায় করল। আর যে নামাযসমূহের পর পিতা-মাতার জন্য দুআ করলো, সে তাদের শোকর (কৃতজ্ঞতা) আদায় করল।

সহীহ্ বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি নবী কারীম স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন্ কাজটি সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, সময়মতো নামায আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।"[৮] অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ স. জানালেন, সবচেয়ে বড় স্তম্ভ সেই নামাযের পরে সর্বোত্তম আমল হলো পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।[৯]

---

৬. সূরা বনী ইসরাইল, ২৩-২৪।

৭. সূরা লুকমান, ১৪।

৮. হাদীসটি বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৪০০, আস-সালাফিয়্যা সং.) মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৯০ আল-হানাফী সংস্করণ।

৯. আল-কুরতুবী, আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৩৭-২৩৮।

www.amarboi.org

হাদীসে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে জিহাদের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজে আইন, যা পালন করা একান্ত জরুরী এবং সে ব্যাপারে অন্য কোনো কিছুই তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। একবার জনৈক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রা.-কে বলল, আমি রোমে যুদ্ধ করার মান্নত করেছি, কিন্তু আমার পিতা-মাতা আমাকে বারণ করছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করো। কেননা রোমে যুদ্ধ করার জন্য তুমি ছাড়া আরো অনেককে পাওয়া যাবে।"[১০]

আল্লাহর পথে জিহাদ করা ফরজে কিফায়া, কিছু লোক তা পালন করলে অন্যরা তা থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়। অন্যদিকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ফরজে আইন। আর ফরজে আইন ফরজে কিফায়া থেকে অধিক শক্তিশালী।

মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন– সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, "একদা জনৈক ব্যক্তি নবী স.-এর নিকট এসে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইল, তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ তাদের ব্যাপারেই তুমি জিহাদ কর, অর্থাৎ তাদের খেদমতই তোমার জিহাদ।"[১১]

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরতের ব্যাপারে বায়আত গ্রহণ করার জন্য এসেছি এবং আমার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন :

ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

"তুমি তাদের কাছে চলে যাও এবং তাদেরকে যেরূপ কাঁদিয়েছ সেরূপ হাসাও।"[১২]

আবু দাউদ আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত, একজন লোক ইয়ামান থেকে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসল। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, ইয়ামানে কি তোমার কেউ আছে? সে বলল, আমার

---

১০. আল-মুহায্‌যাব ফী ফিকহিল ইমাম আশ-শাফেয়ী, খ. ২, পৃ. ২৩০।

১১. হাদীসটি ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেন (ফাতহুল বারী খ. ১, পৃ. ৪০৩, সালাফিয়্যা সংস্করণ)।

১২. হাদীসটি আবু দাউদ খ. ৩, পৃ. ৩৮; ইজ্জত উবাইদ দা'আস সম্পা.; হাকেম, খ. ৪, পৃ. ১৫২, দায়েরাতুল মা'আরেফ আল উসমানিয়্যা সংস্করণ উদ্ধৃত করেন এবং তা সহীহ বলে প্রত্যায়ন করেন। আয-যাহাবী এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

www.amarboi.org

পিতা-মাতা আছেন, তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল না। তিনি বললেন–

فَارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا.

"তুমি ফিরে যাও। গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি চাও। তারা যদি তোমাকে অনুমতি দেন তবেই জিহাদ করবে, অন্যথায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার (তাদের খেদমত) করবে।"[১৩]

এ বিধান হলো যখন সাধারণভাবে যুদ্ধাভিযান থাকবে না। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধের ডাক পড়লে যুদ্ধে যাওয়া ফরজে আইন।[১৪]

আর যেহেতু পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজে আইন, তাই এর বিপরীত করা হারাম, যতক্ষণ না তারা শিরক অথবা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়। কারণ আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা যায় না।[১৫]

## বিধর্মী পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজে আইন এবং এ ক্ষেত্রে তারা মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। যদি তারা দু'জনে কাফের হয় তবুও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা ওয়াজিব, যতক্ষণ তারা তাদের সন্তানকে শিরক অথবা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আদেশ না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لاَ يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়িঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের পছন্দ করেন।"[১৬]

সুতরাং সন্তানের উচিৎ তাদের উভয়ের সাথে এমন কোমলভাবে কথা বলা যা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং অবজ্ঞাসূচক ও কঠিন করে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। পিতা-মাতার নিকট পছন্দনীয় শব্দে তাদেরকে

---

১৩. আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৩৯, সম্পা. ইযযাত উবায়দ দাআস; আল-হাকেম, খ. ২, পৃ. ১০৩-১০৪।

১৪. ফাতহুল কাদীর আলাল হিদায়া, খ. ৫, পৃ. ১৯৪; আল-কুরতুবী, 'আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৪০।

১৫. ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ২২০; আশ-শারহুস সগীর, খ. ৪, খ. ৭৩৯-৭৪১; আল-কাররাফী, আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৪৫।

১৬. সূরা মুমতাহিনা, ৮।

www.amarboi.org

ডাকবে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী এমন কথা বলবে। রাগ ও অসন্তোষের মাধ্যমে বিরক্তি প্রকাশ করবে না, তাদেরকে ধমক দিবে না এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে।

সহীহ বুখারীতে হযরত আসমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুরাইশদের যুগে তারা যখন নবী স. এর সাথে চুক্তি করে, তখন আমার মুশরিকা মা তার পিতার সাথে আমার নিকট আসে। আমি এ ব্যাপারে নবী করীম স. এর মতামত চেয়ে বললাম, আমার মা আমার নিকট আগ্রহ সহকারে এসেছে। আমি কি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমার মাতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।'[১৭]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, 'নবী স. এর জীবদ্দশায় আমার মা আগ্রহসহকারে আমার নিকট আসলেন। আমি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনে উয়ায়না র. বলেন, অতঃপর আল্লাহ তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন :

لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়িঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।"[১৮] এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যা সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মানবে না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দিব তোমরা কি করছিলে।"[১৯]

---

১৭. হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৪১৩, সালাফিয়্যা প্রকাশনী) উদ্ধৃত করেছেন।

১৮. সূরা মুমতাহিনা, ৮; বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : ইমাম কুরতুবী, আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৩৯, খ. ১৪, পৃ. ৬৩-৬৫; ফাতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৯, পৃ. ৪০; আল কাররাফি, আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৪৫; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮২; আশ-শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৪০; আল-হাইছামী, আয-যাওয়াজের আন-ইকতিরাফিল কাবায়ের, খ. ২, পৃ. ৭৫; দারুল মা'রিফা সংস্করণ।

১৯. সূরা আনকাবুত : ৮।

www.amarboi.org

বলা হয় আয়াতটি হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. সম্পর্কে নাযিল হয়। বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমি আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করতাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করবে। অন্যথায় আমি কিছু খাবোও না এবং কিছু পানও করব না এভাবেই মৃত্যুবরণ করব। তখন আমাকে লজ্জা দেয়া হলো এবং বলা হলো- "হে আপন মায়ের হত্যাকারী.......। এভাবে একদিন পর একদিন যেতে লাগল। এমতাবস্থায় আমি বললাম, হে আমার মা! যদি আপনার একশত প্রাণ থাকত আর একটি একটি করে সবকটি প্রাণ বেরিয়ে যেত তবুও আমি আমার দীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনার ইচ্ছে হলে খাবেন, ইচ্ছা হলে খাবেন না। এ অবস্থা দেখে তিনি খাবার গ্রহণ করলেন।[২০]

অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য তাদের জীবদ্দশায় দুনিয়াবী কল্যাণের দুআ করা যাবে কি-না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যা ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করেছেন।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى

"আত্মীয়স্বজন হলেও মুশরিকদের জন ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয়"।[২১]

রাসূলুল্লাহ স.-এর চাচা আবু তালিব ও কিছু সাহাবী কর্তৃক তাদের মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার করা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়। মৃত্যুর পর তাদের জন্য ইসতিগফার না করা এবং তা হারাম হওয়া আর তাদের রূহের উদ্দেশ্যে দান সাদকা না করার ওপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[২২]

আর কাফের পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করতেও পারে।

কাফের পিতা-মাতা যদি সন্তানের বিপদের আশঙ্কা বা সে চলে গেলে তাদের অসুবিধা হবে এরূপ কারণে তাকে ফরজে কিফায়ামূলক যুদ্ধে যেতে বারণ করে, হানাফী মাযহাব মতে তারা তা করতে পারে এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও আনুগত্যের স্বার্থে সন্তান তাদের অনুমতি ছাড়া বের হবে না। তবে সে বাধা যদি

---

২০. আল-কুরতুবী 'আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খ. ১৩, পৃ. ৩২৮; আর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর হাদীসটি ইমাম মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৮৭৭, আল-হালাবী সংস্করণ) উদ্ধৃত করেন।

২১. সূরা তাওবা, ১১৩।

২২. আল-কুরতুবী আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৪৫; আল-ফাতওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮৪; আশ-শারহুস সগীর তার সাথে হাশিয়াতুস সাবী এর পাদটীকা, খ. ৪, পৃ. ৭৪১; শারহু ইহয়াউ উলুমিদ দীন, খ. ৬, পৃ. ৩১৬।

www.amarboi.org

নিজ ধর্মের অনুসারীদের সাথে যুদ্ধ করা অপছন্দের কারণে হয়, তাহলে সন্তান তাদের আনুগত্য না করে যুদ্ধে বের হবে।[২৩]

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মতে, তাদের অনুমতি ছাড়া তার জিহাদে বের হওয়া জায়েয। কেননা তারা দীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত (সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, তারা তাদের দীনের প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাকে জিহাদে যেতে নিষেধ করছে)। তবে মালেকীগণের মতে, তাদের মধ্যে সহানুভূতির সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকলে ভিন্ন কথা। আছ-ছাওরী বলেন, জিহাদ ফরজে কিফায়া হলে তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তান যুদ্ধে যাবে না। কিন্তু যখন সৈন্যদের কাতারে হাজির হওয়ার কারণে জিহাদ অবধারিত হয়ে যায় অথবা শত্রু ঘেরাও করে ফেলে অথবা ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন, তখন আর অনুমতির প্রয়োজন নেই। বরং তাদের অনুমতি ছাড়াই তখন তার জিহাদে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা এমতাবস্থায় জিহাদ করা সকলের জন্য ফরজে আইন হয়ে যায়, যা পালন করা তার জন্যও অবশ্য কর্তব্য।[২৪]

## পিতা ও মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রয়েছে। এ বিষয়ে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে এবং হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। এতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের আবশ্যকতা, তাদের আনুগত্য করা, তাদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া এবং গুনাহ নেই-এমন কাজে তাদের আদেশ প্রতিপালন করার নির্দেশ রয়েছে, যার আলোচনা ইতঃপূর্বে হয়েছে।

যেহেতু সন্তানের লালন-পালনে মা সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন তাই তার সাথে বেশি সদ্ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন। তাদের দু'জনের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

"আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা তাকে কষ্টের পর কষ্টবরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে।"[২৫]

---

২৩. ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ২২০।

২৪. আল-মুহায্যাব, খ. ২, পৃ. ২৩০; তুহফাতুল মুহতাজ বিশারহিল মিনহাজ, খ. ৯, পৃ. ২৩২; মাতালিবু উলিন-নুহা; খ. ২, পৃ. ৫১৩; আল মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৩৫৯ (আর রিয়াদ আল হাদীছা সং); আশ-শারহুর কাবীর এবং তাতে সংযুক্ত আদ-দাসুকীর পার্শ্বটীকা, খ. ২, পৃ. ১৭৫; আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৪০।

২৫. সূরা লুকমান, ১৪।

www.amarboi.org

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকতর হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।[২৬]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন–

إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে তোমাদের নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।”[২৭]

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম স.-কে জিজ্ঞেস করলাম : একজন মহিলার ওপর কোন্ মানুষটির অধিকার সবচেয়ে বেশি? তিনি বললেন, তার স্বামীর। আমি বললাম, আর পুরুষের ওপর? তিনি বললেন, তার মায়ের।”[২৮]

উপর্যুক্ত আলোচনায় পিতা-মাতার মর্যাদা এবং সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিতার ওপর মাতার অগ্রাধিকার বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতার অগ্রাধিকারের কারণ হলো, গর্ভধারণের কষ্ট তারপর প্রসবের যন্ত্রণা, এরপর দুধপান করানোর কষ্ট, যার সবই একা মাতার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনিই এর কষ্ট ভোগ করেন। এরপর পিতা লালন-পালনে অংশগ্রহণ করেন। তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, পিতার তুলনায় মায়ের প্রয়োজনই বেশি। বিশেষত বড় হওয়ার ক্ষেত্রে।[২৯]

---

২৬. হাদীসটি ইমাম বুখারী ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৪০১, সালাফিয়্যা সংস্করণ) উদ্ধৃত করেছেন।

২৭. ইমাম বুখারী হাদীসটি ‘আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে, (পৃ. ২৬, সালাফিয়্যা সংস্করণ) আল-হাকেম (খ. ৪, পৃ. ২৫১, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যা সংস্করণ)-এ উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন। আয-সাহাবীও এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

২৮. হাদীসটি ‘আল-হাকেম, খ. ৪, পৃ. ১৫০, দায়েরাতুল মা'রেফ আল-উসমানিয়্যা সংস্করণ) উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদে অজ্ঞতা রয়েছে। আয-যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৯, আল-হালাবী সম্পা.।

২৯. ফাতহুল বারী সহীহুল বুখারী এর ভাষ্য, খ. ১০, পৃ. ৪০১-৪০২; আল-গাযালী, শারহু ইহয়াই উলমিদ দীন খ. ৬, পৃ. ৩১৫; আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল

www.amarboi.org

যদি সন্তানের ওপর পিতা-মাতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সে শুধু একজনের ভরণপোষণ দিতে সক্ষম হয়, তাহলে হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী সে মাতাকে পিতার ওপর অগ্রাধিকার দিবে। এটি হাম্বলী মাযহাবেরও একটি মত।[৩০] কারণ গর্ভধারণ, দুধপান করানো ও লালন-পালনে তার অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। তিনি অধিক স্নেহময়ী এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও অক্ষম। এ বিধান যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সদাচারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব না দেখা দেবে।

তবে যদি এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যেমন– একজনের আনুগত্য করলে অন্যজনের অবাধ্যতা হয়, এমতাবস্থায় সে দেখবে যে, তাদের একজন যদি মহৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যজন অন্যায়ের তাহলে যিনি মহৎ কাজের আদেশ করেন সে তার আনুগত্য করবে, যে অন্যায়ের আদেশ করবে তার আনুগত্য করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী–

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"[৩১] তবে সন্তানের উচিৎ অন্যায়ের নির্দেশদাতার সাথেও সদ্ভাব বজায় রাখা। কেননা এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন– وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।"[৩২]

আয়াতটি কাফের পিতা-মাতার প্রসঙ্গে নাযিল হলেও এর ক্ষেত্র ব্যাপক। এবং বিশেষ কারণের সাথে সীমাবদ্ধ নয়।

আর যদি অন্যায় নয় এমন বিষয়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং একই সাথে তাদের দু'জনের সাথে সদ্ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে জমহুর (গরিষ্ঠ সংখ্যক) আলেমের মতে, মাতার আনুগত্য অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সদ্ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি পিতার তুলনায় অগ্রাধিকার

---

কুরআন, আল-হায়ছামী, আয-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল-কাবাইর, খ. ২, পৃ. ৭১, দারুল মারেফা সংস্করণ; খ. ১৪, পৃ. ৬৩-৬৫।

৩০. রাদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৬৭৩; আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮৪; রাওজাতুত তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৯৫, আল-মাকতাবুল ইসলামী সংস্করণ; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৯৪, আর রিয়াদ আল-হাদীছা সংস্করণ।

৩১. আল-হাইতামী 'আল-মাজমা-এ হাদীসটি এ ইবারতে উদ্ধৃত করেন এবং বলেন, হাদীসটি আহমাদ ও আত-তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আহমাদ-এর সব রাবী সহীহ হাদীসের রাবী, মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, খ. ৫; পৃ. ২২৬; আল-কুদসী সং.।

৩২. সূরা লুকমান, ১৫।

১২—

www.amarboi.org

প্রাপ্ত।[৩৩] আবার কারো কারো মতে, সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইমাম মালেক রহ.-কে বললেন, আমার পিতা সুদান থাকেন। তার কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু আমার মা আমাকে যেতে বারণ করছেন। মালেক রহ. তাকে বললেন, "তুমি তোমার পিতার আনুগত্য করো তবে তোমার মায়ের অবাধ্যতা করো না।" অর্থাৎ, সে তার পিতার কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তাই তার মাকে সঙ্গে নিয়ে হলেও পিতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে, যাতে তার পিতার আনুগত্য করা হয় এবং মায়ের অবাধ্যতাও না হয়।

বর্ণিত আছে, ইমাম লাইছকে হুবহু এ মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তোমার মায়ের আনুগত্য করো, কেননা সদ্ব্যবহারের দুই তৃতীয়াংশ তার প্রাপ্য। অনুরূপ আল-বাজী বর্ণনা করেন যে, এক মহিলার তার স্বামীর ওপর কিছু অধিকার পাওনা ছিল। তখন কিছু ফকীহ তার পুত্রকে ফতোয়া দিলেন যে, সে তার মায়ের পক্ষে পিতার বিরুদ্ধে ওকালতী করবে। মাকে প্রাধান্য দিয়ে সে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আদালতে মামলায় লড়বে। কোন কোন ফকীহ অবশ্য এরূপ করতে বারণ করেছেন। কেননা এটি পিতার সাথে অবাধ্যতা। আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে, তার সাথে সদ্ব্যবহার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের তুলনায় স্বল্পতর, তবে এমন নয় যে, পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে। আল-মুহাসিবী বর্ণনা করেন যে, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে।[৩৪]

## সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হলো, কোমল কথার মাধ্যমে তাদের প্রতি ইহসান করা; তাদেরকে ভালোবাসা; ঘৃণা উদ্রেককারী রূঢ় কথা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের কাছে প্রিয় শব্দে তাদেরকে ডাকা; যেমন হে আম্মু ও হে আব্বু। তাদেরকে এমন কথা বলা যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর, উভয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী বিষয়াদি তাদেরকে জানানো এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করা। শরীয়তে ফরজ কিংবা নফল যে কোনো বিষয়ে তারা আদেশ করলে এবং যা ত্যাগ করলে অসুবিধা নেই তা ত্যাগ করতে বললে সন্তান তাদের আনুগত্য করবে। চলার পথে তাদের থেকে অগ্রবর্তী হওয়া দূরে থাক একান্ত প্রয়োজন (যেমন অন্ধকার) না হলে তাদের সমান্তরালেও হাঁটবে

---

৩৩. আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮৪।

৩৪. আল-কাররাফী, আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৪৩; তাহযীবুল ফুরূক বিহামিশিহি, পৃ. ১৬১; সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৪০২-৪০৩।

www.amarboi.org

না। তাদের কাছে গেলে তাদের অনুমতি ছাড়া বসবে না এবং বসা থাকলে তাদের অনুমতি ছাড়া উঠবে না। বার্ধক্য কিংবা অসুস্থতার কারণে তারা প্রশ্রাব-পায়খানা করলে সন্তান তাতে ঘৃণা করবে না। কারণ এতে তাদের মনে কষ্ট লাগবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কোনো কিছুতে তার শরীক করবে না; আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"[৩৫]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'সন্তান পিতা-মাতার সাথে কোমলতা ও নম্রতার মাধ্যমে সদাচরণ করবে, সে কোনোকিছুর জবাবে কঠোরতা প্রকাশ করবে না। তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না এবং তাদের সামনে কণ্ঠ উচ্চকিত করবে না।'[৩৬]

তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি ইহসানের অন্তর্ভুক্ত হলো, সে তাদের সাথে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার করবে না। তাদেরকে গালি গালাজ বা বকাঝকা করবে না এবং তাদেরকে কোনো প্রকারের কষ্ট প্রদান করবে না। কেননা এগুলো সর্বসম্মতভাবেই কবীরা গুনাহের পর্যায়ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ، قَالُوا . يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হলো, কোনো ব্যক্তির তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ কেউ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি অন্য কারো পিতাকে গালি দিলে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। তেমনি কেউ অন্য কারো মাতাকে গালি দিলে সেও তার মাতাকে গালি দেয়'।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ . قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ .

'কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম হলো কোনো ব্যক্তির তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়া। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল কীভাবে মানুষ তার পিতা-

---

৩৫. সূরা আন-নিসা, ৩৬।

৩৬. আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮২-৩৮৩; আয-যাওযাজের আন-ইকতিরাফিল কাবায়ের, খ. ২, পৃ. ৬৬।

www.amarboi.org

মাতাকে অভিশাপ দিবে? তিনি বললেন, সে কোনো ব্যক্তির পিতাকে গালি দিবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দিবে।'[৩৭]

তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো কোনো ব্যক্তির পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক রাখা।'[৩৮] তিনি অনুপস্থিত থাকলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে সে তার পছন্দের লোকজনকে দেখাশোনা করবে এবং তাদের সাথে সদাচার করবে। কেননা এর মাধ্যমেই তার পিতার প্রতি ইহসান পূর্ণতা পাবে।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত আবু উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসার সাহাবী এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোনো পথ কি অবশিষ্ট আছে, যদ্বারা আমি তাদের প্রতি সদাচার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দুআ করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের রেখে যাওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা, তাদের বন্ধুদের সম্মান করা এবং যেসব আত্মীয়দের সাথে তাদের মাধ্যমেই তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। এ কাজগুলোই তোমার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে।[৩৯]

হযরত খাদিজা রা. এর মৃত্যুর পর তার প্রতি দয়া ও সদাচরণবশে রাসূলুল্লাহ স. তার বান্ধবীদেরকে হাদিয়া দিতেন। অথচ তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী। আর পিতা-মাতার বিষয়টি তাহলে কিরূপ হবে, তা সহজেই অনুমেয়।[৪০]

---

৩৭. আয্‌ যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, খ. ২, পৃ. ৬৬; আল-ফাওয়াকেহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮৩; ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৩৮। হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৪০৩, আস-সালাফিয়্যা সংস্করণ) ও ইমাম মুসলিম খ. ১, পৃ. ৯২, আল-হালাবী সম্পা. উদ্ধৃত করেছেন।

৩৮. মুসলিম খ. ৪, পৃ. ১৯৭৯, আল-হালাবী সম্পা.।

৩৯. আবু দাউদ খ. ৫, পৃ. ৩৫২, সম্পা. ইযযাত উবায়দ দা'আস ও আল-হাযেম, খ. ৪, পৃ. ১৫৫, দায়েরাতুল মাআরেফ আল-উসমানিয়্যা সংস্করণ, আয-যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৪০. আল-কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০. পৃ. ২৪১ (আল মাসআলাতুল আশেরা) এহইয়াউ উলূমিদ-দীন, খ. ৬, পৃ. ৩১৬; আল-ফাওয়াকেহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮৩। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম বুখারী ফাতহুল-বারী খ. ৯, পৃ. ১৩৩, আস-সালাফিয়্যা সংস্করণ।

www.amarboi.org

**ব্যবসা বা লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে সফর করার জন্য পিতা-মাতার অনুমতি**

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি তৈরি করেছেন, যার সারকথা হলো, যেসব সফর মৃত্যুঝুঁকি থেকে নিরাপদ নয় এবং তাতে বিপদাপদের প্রবল আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে সন্তান পিতা-মাতার অনুমিত ছাড়া বের হতে পারবে না। কেননা তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে স্নেহশীল এবং এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর যেসব সফর বিপদাপদের আশঙ্কামুক্ত, সে ক্ষেত্রে সন্তান পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া বের হতে পারবে। কেননা এতে বিপদাপদের আশঙ্কা না থাকায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

এ মূলনীতি অনুযায়ী জ্ঞানার্জনসংক্রান্ত সফরের জন্য তাদের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক নয়, যদি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা নিজ দেশে সহজলভ্য না হয়, পথ নিরাপদ হয় এবং সে পিতা-মাতার ধ্বংসের আশঙ্গা না করে। কেননা এর দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না; বরং লাভবান হবেন। সুতরাং এর মধ্যে অবাধ্যতার কোন লক্ষণই নেই। আর ব্যবসায়িক সফরের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা যদি সন্তানের সেবার মুখাপেক্ষী না হন এবং কোনোরূপ ধ্বংস থেকে যদি তাদের নিরাপত্তা থাকে তবে তাদের অনুমতি ছাড়া সে বের হতে পারবে। তবে যদি পিতা-মাতা সন্তান ও তার সেবার মুখাপেক্ষী হন তাহলে সে তাদের অনুমতি ছাড়া সফরে যাবে না।[৪১]

মালেকী ফকীহগণ জ্ঞানার্জন সংক্রান্ত সফরের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনসা দিয়েছেন যে, সফর যদি এমন বিশেষ পর্যায়ের জ্ঞানার্জনের জন্য হয়, যা তার নিজ শহরে সম্ভব নয় যেমন, কিতাব ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, ইজমা সম্পর্কিত জ্ঞান, ফকীহদের মতভেদ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং কিয়াস-এর বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত জ্ঞান তাহলে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই সে সফরে যেতে পারবে। এতে বাধা আসলে তাদের আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। কেননা মুজতাহিদের যোগ্যতা অর্জন করা ফরজে কিফায়া। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা দরকার, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।"[৪২]

আর যদি সে সফর তাকলীদের ভিত্তিতে ফিকাহ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের জন্য হয় এবং তা নিজ শহরেও অর্জন করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়া তার সফরে যাওয়া বৈধ নয়।

---

৪১. বাদায়েউস সানায়ে' ফী তারতীবিশ শারায়ে', খ. ৭, পৃ. ৯৮; তাবঈনুল হাকায়েক শারহু কানযুদ দাকায়েক, খ. ৩, পৃ. ২৪২; ইবনু আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ২২০।

৪২. সূরা আলে ইমরান, ১০৪।

www.amarboi.org

আর যদি সে নিজ এলাকায় যে পরিমাণ ব্যবসা করে অনুরূপ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে যেতে চায় তাহলেও তাদের অনুমতি ছাড়া সে বের হবে না।[৪৩]

**নফল ইবাদত পরিত্যাগ বা হ্রাসের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্যের বিধান**

শায়খ আবু বকর আত-তারতুশী 'বিররুল ওয়ালিদাইন' গ্রন্থে বলেন, 'সুন্নাতে মুআক্কাদা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগের নির্দেশ দিলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। যেমন- নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া, ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ও বিতরের নামায ইত্যাদি পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে তবে যদি তারা নামাযের প্রথম ওয়াক্তে তাদের কোনো কাজে ডাকেন তাহলে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব, যদিও প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফজীলত ছুটে যায়।[৪৪]

**ফরজে কিফায়া পরিত্যাগে পিতা-মাতার আনুগত্যের বিধান**

ইতঃপূর্বে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে এক ব্যক্তি বায়আত গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং তার পিতা-মাতার যে কোনো একজন জীবিত ছিলেন। সেখানে পিতা-মাতার সাহচর্যকে নবী স.-এর সাহচর্যের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাদের সেবা করাকে যা তার ওপর ফরজে আইন ছিল ফরজে কিফায়ার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রমাণ রয়েছে। কেননা তাদের আনুগত্য ও তাদের সাথে সদাচার করা ফরজে আইন আর জিহাদ হচ্ছে ফরজে কিফায়া। আর ফরজে আইন বেশি শক্তিশালী।[৪৫]

**পিতা-মাতা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের আদেশ দিলে সেক্ষেত্রে আনুগত্যের বিধান**

ইমাম তিরমিযী র. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার একজন স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালোবাসতাম; কিন্তু আমার পিতা তাকে অপছন্দ করতেন। অতঃপর তাকে তালাক প্রদানের জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করলাম এবং বিষয়টি নবী স.-কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, 'হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর! তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও।'[৪৬]

---

৪৩. আল-কাররাফী, আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৪৫-১৪৬; আদ-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ১৭২-১৭৬; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ২৫২।

৪৪. মাতালিবু উলিন-নুহা, খ. ২, পৃ. ৫১৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী খ. ৮, পৃ. ৩৫৯; কাশশাফুল কিনা' আন মতনিল ইকনা' খ. ৩, পৃ. ৪৫; আল-কাররাফী, আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৪৩-১৪৪; আশ-শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৩৯; আল-ফাওয়াকেহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮৩; আয-যাওয়াজের, খ. ২, পৃ. ৬৭-৭৩।

৪৫. আল-কাররাফী, আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫-১৫০; আয্-যাওয়াজের, খ. ২, পৃ. ৬৭-৭৩।

৪৬. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী খ. ৩, পৃ. ৪৮৬ আল-হালাবী সম্পা.) উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ। আরো দ্রষ্টব্য ইমাম কুরতুবী 'আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৩৯; আয-যাওয়াজের খ. ২, পৃ. ৭৫।

www.amarboi.org

জনৈক ব্যক্তি এ বিষয়ে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করে বলল, আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে তালাক দিবে না। সে বলল, উমর রা. কি তার ছেলে আবদুল্লাহ রা.-কে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে আদেশ করেননি? তিনি বললেন, তোমার পিতা আগে উমর রা.-এর মতো হোক। অর্থাৎ, তুমি তার কথামতো স্ত্রীকে তালাক দিবে না, যতক্ষণ না তিনি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে উমর রা. এর মতো উপযুক্ত হবেন।

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী আবু বকর র.-এর মতে, নবী কারীম স. ইবনে উমরকে নির্দেশ দেয়ার কারণে এটি ওয়াজিব। এক লোককে তার মা তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার সম্পর্কে শায়খ তোকী উদ্দীন ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, স্ত্রীকে তালাক দেয়া তার জন্য বৈধ নয়, বরং তার উচিত তার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা। আর স্ত্রীকে তালাক দেয়া মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৭]

**অন্যায় কাজ করা বা ফরয ত্যাগের নির্দেশ দিলে পিতা-মাতার আনুগত্যের বিধান**

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের আনুগত্য করো না।"[৪৮]

তিনি আরো বলেন–

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।"[৪৯]

সুতরাং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের প্রতি ইহসান করা ওয়াজিব। আর শিরক অথবা গুনাহের কাজ করার নির্দেশ না দিলে

---

৪৭. ইবনে মুফলিহ আল-মুকাদ্দাসী আল-হাম্বলী, আল-আদাবুশ-শার'ইয়্যা ওয়াল মিনাহুল মার'ইয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫০৩; আয্-যাওয়াজের, খ. ২, পৃ. ৭২।

৪৮. সূরা আনকাবূত : ৮।

৪৯. সূরা লুকমান : ১৫।

www.amarboi.org

তাদের অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করা হারাম। অন্যায়ের আদেশ দিলে সন্তান তাদের আনুগত্য করবে না এবং তাদের নির্দেশ পালন করবে না। কেননা এক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করা ওয়াজিব এবং আনুগত্য করা হারাম। যেমন- রাসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"[৫০]

ইতঃপূর্বে বর্ণিত একটি হাদীসে দেখা যায়, হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস রা. তার মায়ের নির্দেশ অমান্য করেন, যখন তিনি তাকে ইসলাম ত্যাগ করতে বলেছিলেন; কিন্তু মায়ের সাথে সদাচারবশে তিনি তার সাথে সদ্ভাবে অবস্থান করেন। মা যে বিষয়ে তাকে আদেশ করেছিলেন তা আমান্য করা তার ওপর ওয়াজিব ছিল। সুতরাং ওয়াজিব ত্যাগ করে মায়ের আনুগত্য করা যাবে না।[৫১]

**পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং দুনিয়া-আখেরাতে তার পরিণতি**

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করার মতো অবাধ্যতার পাশাপাশি এর আরো কিছু রূপ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কথার মাধ্যমে কিছু কাজের মাধ্যমে করা হয়। যেমন : সন্তান তার পিতা-মাতার সাথে বিরক্তি প্রদর্শন করা, রাগ দেখানো এবং ঘাড়ের রগ মোটা করা; বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যের সময়। অথচ তাকে আদেশ করা হয়েছে তাদের সাথে উত্তম, কোমল ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতে এবং সম্মানসূচক কথা বলতে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ

"তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না।"[৫২]

আয়াতে পিতা-মাতার সাথে সামান্যতম অসন্তোষ ও বিরক্তিমূলক কথা বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা যে কোনো একজনের সাথে অবাধ্যতার বিধান হলো, অন্যান্যদের সাথে যে অপরাধটি সগীরা বা ছোট খাট গুনাহ হিসেবে গণ্য পিতা-মাতার ক্ষেত্রে সেটি কবীরা বা বড় গুনাহের পর্যায়ভুক্ত।[৫৩]

রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকেও

---

৫০. হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৫১. আশ-শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৩৯; আল-কুরতুবী, 'আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৩৮, খ. ১৩, পৃ. ৮, খ. ১৪, পৃ. ৬৩-৬৫; আল-কাররাফী, আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৪৫।

৫২. সূরা আল-ইসরা : ২৩।

৫৩. আল-কুরতুবী, আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২৩৮, ২৪১-২৪৫।

www.amarboi.org

জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। তবে খোটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও মদে আসক্ত ব্যক্তি তার ঘ্রাণ পাবে না।[৫৪] আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন :

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ . قَالَ : ثَلاَثًا . الإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ . أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ . فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ : لاَ يَسْكُتُ .

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহের কথা জানা? আমরা বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তিনবার বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা তখন তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। সাবধান! মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। এভাবে বলতে থাকলেন। এমনকি আমি মনে মনে বললাম, তিনি আর চুপ হবেন না।"[৫৫]

রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন–

رِضَى اللّٰهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ ، وَسَخَطُ اللّٰهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ .

"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ নিহিত"।[৫৬]

তিনি আরো বলেন :

كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، فَإِنَّ اللّٰهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ .

প্রত্যেক গুনাহের পরিণাম আল্লাহ চাইলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার পরিণাম আল্লাহ্ তাআলা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই

---

৫৪. হাদীসটি আত-তাবরানী 'আস-সগীর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আল-হাইছামী বলেন, বর্ণনাকারীদের মধ্যে রাবী' ইবনে বদর মাতরূক বা তার হাদীসটি পরিত্যাজ্য বলে অভিযুক্ত। মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, খ. ৮, পৃ. ১৪৮, আল-কুদসী সংস্করণ)।

৫৫. হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৪০৫, আস-সালাফিয়্যা সং) ও ইমাম মুসলিম (খ. ১, পৃ. ৯১, আল-হালাবী সম্পা.) উদ্ধৃত করেছেন।

৫৬. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী খ. ৪, পৃ. ৩১১, আল-হালাবী সম্পা., উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদে অজ্ঞতা রয়েছে। আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, খ. ৩, পৃ. ৭৮, আল-হালাবী সম্পা.।

www.amarboi.org

ত্বরান্বিত করেন।[৫৭]

**অবাধ্যতার শাস্তি**

পিতা-মাতার সাথে অবাধ্যতার পরকালীন পরিণতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দুনিয়াবী শাস্তি তা'যীরের অন্তর্ভুক্ত। সেক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ কর্ম ও কর্তার অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন রকম হবে।

সন্তান যদি পিতা-মাতা উভয়ের ওপর অথবা একজনের ওপর অত্যাচার করে যেমন, সন্তান যদি গালি দেয় কিংবা প্রহার করে তাহলে তারা উভয়ে তাকে তা'যীর (যে কোনো শাস্তি)-এর আওতায় শাস্তি দিতে পারেন। অথবা তাদের দাবি অনুযায়ী ইমাম তাকে তা'যীর করবেন, যদি তাদের উভয়কে একত্রে গালি দেয় বা প্রহার করে। অথবা যিনি অবাধ্যতার শিকার শুধু তিনিও বিচার চাইতে পারেন। যদি গালি প্রদত্ত অথবা প্রহৃত পিতা-মাতা উভয়ে ক্ষমা করে দেন তাহলে দায়িত্বশীল ইমাম তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংশোধনের জন্য তা'যীর করতে পারেন, অথবা তার পক্ষ থেকে ক্ষমাও করতে পারেন। যদি গালি দেয়া অথবা প্রচার করার অপরাধকারীর আদালতে উপস্থাপনের আগেই তারা ক্ষমা করে দেন তাহলে তা'যীর বাতিল হয়ে যাবে।

আর তা'যীর হবে অপরাধ ও ত্রুটির বিবেচনায় গ্রেফতার করা অথবা প্রহার করা অথবা কঠোর কথার মাধ্যমে ভর্ৎসনা করা অথবা তাকে অপরাধ থেকে নিবৃত্তকারী যে কোনো শাস্তির মাধ্যমে।[৫৮]

–নাজমুল হুদা সোহেল

৫৭. হাদীসটি আল-হাকেম খ. ৪, পৃ. ১৫৬, দায়েরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়্যা সং., উদ্ধৃত করেছেন। আর আয-যাহবী বলেন, হাদীসটির সনদে বাক্কার নামে একজন রাবী আছেন, যিনি যঈফ।

৫৮. ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ১৭৭-১৭৮, ১৮১-১৮২, ১৮৬, ১৮৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৬, পৃ. ১২১-১২২; ১২৪-১২৫; আল-মাওয়ারেদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ২৩৬-২৩৮; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

www.amarboi.org

# সেবা (خِدْمَةٌ)

**সংজ্ঞা :** الْخِدْمَةُ শব্দটি خَدَمَ এর মাসদার (ক্রিয়ামূল); অর্থ সেবা করা, খেদমত করা, চাকরি করা।

কেউ কেউ বলেন : الْخِدْمَةُ শব্দটিকে كسره (যের) দিয়ে পড়লে হবে الإسْمُ (ইসম) এবং فتح (যবর) দিয়ে পড়লে হবে الْمَصْدَرُ (মাসদার বা ক্রিয়ামূল)।

خادم (সেবক) শব্দের বহুবচন : الْخَدَمُ وَالْخُدَّامُ

الْخَادِمُ শব্দটি নারীপুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ : خادم শব্দটিকে فعل (ক্রিয়া) থেকে না এনেই اسم (ইসম) এর স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। এর স্ত্রীলিঙ্গে خَادِمَةٌ শব্দটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়।

اسْتَخْدَمَهُ ও اخْتَدَمَهُ অর্থ : তাকে সেবক বানানো হল, অথবা তার কাছে সেবা চাওয়া হল। أَخْدَمْتُ فُلَانًا অর্থ : আমি সেবা করার জন্য তাকে একজন সেবক দিয়েছি[১]।

এর পারিভাষিক অর্থ আভিধানিক অর্থ থেকে বেরিয়ে যায় না অর্থাৎ উভয় অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

## সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ

### الْمِهْنَةُ : (আল-মিহনা)

الْمِهْنَةُ : (আল-মিহনা) শব্দটি মীম অক্ষরে যবর এবং যের উভয়ভাবে পড়া যায়। অর্থ : দক্ষতার সাথে সেবা করা, কাজ করা। الْحِذْقُ فِي الْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ সেবা ও চাকরিতে দক্ষ হওয়া।

مَهَنَ يَمْهُنُ مَهْنًا অর্থ : সে কারখানায় কাজ করল।

مَهَنَهُمْ অর্থ : সে তাদেরকে সেবা করল। আর امْتَهَنْتُهُ অর্থ: আমি তার কাছে সেবা চাইলাম, আমি তাকে সাধারণ সেবা দিলাম। الْمَاهِنُ শব্দটি الْخَادِمُ (সেবক)-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। নারীদের ক্ষেত্রে مَاهِنَةٌ (সেবিকা) শব্দ ব্যবহার করা হয়। বহুবচন مُهَّانٌ (মুহ্হানুন)। বোকা নারীদের ক্ষেত্রে বলা হয় : لَا تُحْسِنُ الْمِهْنَةَ অর্থ : সে উত্তম সেবা প্রদান করতে পারেনি।

الْمِهْنَةُ (আল-মিহনা) অর্থ : সেবা করা, শ্রম ব্যয় করা। الْمَهِينُ (আল-মাহীন) অর্থ দুর্বল। কুরআনে শব্দটির ব্যবহার : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

---

১. তাজুল আরূস, লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, ধাতু خدم মুগনীআল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৩; কাশ্‌শাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪৬।

www.amarboi.org

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ অর্থ আমি কি তোমাদের তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করি নি?[২]
خَرَجَ فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهِ অর্থ : সে তার কাজের পোশাক পরে বের হয়েছে। যে পোশাক সে দায়িত্ব পালন ও কাজ কর্মের সময় পরে থাকে।[৩]
الْمِهْنَةُ শব্দটি বিশিষ্টতর; কেননা এতে সেবা কাজে দক্ষ হওয়া এবং পেশাগত বা নির্মাণ কাজের অর্থ রয়েছে।

**الْعَمَلِ (আল-আমাল)**

الْعَمَلِ : অর্থ কাজ কর্ম, পেশা, শ্রম, বহুবচন أَعْمَالٌ (আ'মাল)
الْعَامِلِ : অর্থ সেই ব্যক্তি, যে কোনো লোকের সম্পদ মালিকানা অথবা কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বহুবচন عُمَّالٌ (উম্মাল) عَامِلُونَ (আমিলূনা)। الْعُمْلَةُ (আল-উমলাতু) الْعِمَالَةُ (আল-ইমালাতু) হলো কাজের মজুরী অথবা যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে কর্মচারীর জীবিকা।
الْعَمَلَةُ যারা নিজের হাতে বিভিন্ন প্রকারের কাজ করে। মাটিতে কাজ করা অথবা খনন করা, ইত্যাকার কাজ সম্পাদন করে।[৪]
الْعَمَلِ ও الْخِدْمَةُ উভয় শব্দের মধ্যে সম্পর্ক : الْعَمَلِ শব্দটি الْخِدْمَةُ শব্দটির তুলনায় অধিকতর ব্যাপক।

## সেবা সম্পর্কিত বিধানাবলি

### পুরুষের জন্য নারীর এবং নারীর জন্য পুরুষের সেবা প্রদান

জমহুর ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হলো, অবিবাহিত পুরুষের ঘরে অপরিচিত প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে সেবা প্রদানের জন্য মজুরীভিত্তিক নিয়োগ দেয়া না জায়েয। নিরাপদ হোক বা না হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। ফিতনা ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার নিমিত্তে এ বিধান। কেননা নারী পুরুষের নির্জনতা অবলম্বন গুনাহ ও অন্যায়। তবে পুরুষ যদি মহিলার মাহরাম হয় অথবা ছোট বালক, বয়োবৃদ্ধ, মামসূহ তথা যার যৌনতা নিঃশেষ হয়ে গেছে অথবা মাজবুব তথা যার লিঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে- এমন কোনো পুরুষ হয় অথবা খাদিমা (সেবিকা) এতটুকু বয়সের যে, সে যৌনতা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না, এ সব ক্ষেত্রে সেবাকার্যে নিয়োগ দেয়া জায়েয।
জমহুর ফকীহগণ বলেন : স্বাধীন, দাসী, সুন্দরী, কুৎসিত ইত্যাকার যে কোনো শ্রেণীর নারী হোক না কেন, বিধানগত কোনো পার্থক্য হবে না।
ইমাম শাফেয়ী র.-এর একটি মতে পুরুষের ঘরে সমূহ ফিৎনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হলে কুৎসিত নারীকে সেবাকার্যে নিয়োগ দেয়া হারাম হবে না, বরং জায়েয।

---

২. সূরা আল মুরসালাত, ২০।
৩. লিসানুল আরব, আল মিসবাহুল মুনীর, ধাতুঃ مهن
৪. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, ধাতুঃ عمل

www.amarboi.org

জমহুর ফকীহগণের মতে নারীর সেবা প্রদানের ক্ষেত্র যদি নির্জনে হয় তাহলে তার সেবা প্রদান হারাম। আর যদি নির্জনে না হয় তাহলে তার সেবা প্রদান জায়েয।

এমনিভাবে পুরুষ যদি অসুস্থ হয় এবং তার সেবা করার জন্য কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে তার সেবা প্রদান জায়েয।

কোনো কোনো ফকীহ্-এর মতে অপরিচিত সুন্দরী নারী অথবা কুৎসিত নারীর দ্বারা পুরুষের সেবা নেয়া জায়েয।

কোনো কোনো ফকীহ্ যে সব অবিবাহিত পুরুষের কাছে তার নিকটাত্মীয়া মহিলা শ্রেণীর কেউ না থাকে এবং যে সব বিবাহিত পুরুষের কাছে তার স্ত্রী অথবা নিকটাত্মীয়া শ্রেণীর মহিলা থাকে, সে সব পুরুষের সেবার জন্য নারী নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন : স্বাধীন নারী ও দাসীকে সেবার জন্য মজুরীভিত্তিক নিয়োগ দেয়া পুরুষের জন্য জায়েয। তবে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দাসীর হুকুম স্বাধীন মহিলাদের অনুরূপ নয়। এ জাতীয় সেবিকার সাথে ঘরে নির্জনতা অবলম্বন করা, তাকে খোলামেলা অবস্থায় দেখা জায়েয নেই। এমনকি তার চুলের দিকে তাকানোও জায়েয নেই।

ইমাম আযম আবু হানীফা র. বলেন : পুরুষের সেবার জন্য স্বাধীন নারী বা দাসীকে মজুরীভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া এবং তাদের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা মাকরুহ্।

আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, নির্জনতা এজন্য নিষিদ্ধ যে, অপরিচিত নারীদের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা পাপ। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. উভয়ে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। আর সেবার জন্য নিয়োগ দেয়া এজন্য নিষিদ্ধ যে, মহিলা সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাপদ নয়। আল মুদাওয়ানা নামক গ্রন্থে উল্লেখত আছে যে, আল্লামা ইবনে কাসেম র.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : অবিবাহিত পুরুষের সেবার জন্য স্বাধীন নারী বা দাসীকে মজুরীভিত্তিক নিয়োগ দেয়া জায়েয কি না? উত্তরে তিনি বললেন, আমি ইমাম মালেক র.-কে শুনেছি; এমন এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে পুরুষের সাথে মিলে মাল বোঝাইয়ের কাজ করে এবং তাদের মাঝে কোনো মাহরাম থাকে না (ইমাম মালেক র.) তা অপছন্দ করলেন। তাহলে যে ব্যক্তি তার সেবা করার জন্য কোন মহিলাকে নিয়োগ দেয় এবং তাদের মধ্যে কোনো মাহরাম থাকে না এবং তার স্ত্রীও থাকে না, এমতাবস্থায় উভয়ের নির্জনে সহ অবস্থান করা আমার নিকট অধিক শক্ত 'মাকরুহ' সেই মহিলা থেকে, যে পুরুষের সাথে মিলে মাল বোঝাইয়ের কাজ করে।[৫]

---

৫. আল-বাদায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৯; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪; মাওয়াহিবুল-জালীল, খ. ৫, পৃ. ৯৩; আল-কাওয়ানীনুল ফিক্বহিয়্যাহ, পৃ. ৩৭৮; আল-মাজমূ', খ. ১৫, পৃ. ২৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৬৫-৩৩৭; রওদাতুত-তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৪২৭; নিহায়াতুল-মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৩২; ইবনে কুদামা, আল-

www.amarboi.org

আর নারীর সেবার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেবক নিয়োগ দেয়া জায়েয নেই, যে পুরুষের দিকে তার তাকানো বৈধ নয়। কারণ সেবকের অধিকাংশ সময় সে যে নারীর সেবা প্রদান করছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হয় বিধায় তার প্রতি তাকানো এবং তার সাথে অবৈধ নির্জন পরিবেশ থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব।

তবে সেবক যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক অথবা সেবার জন্য নিয়োগকারী মহিলার মাহরাম কোনো আত্মীয় হয় অথবা তার মালিকানাধীন কৃতদাস অথবা মামসূহ তথা যে পুরুষের যৌন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়েছে এমন পুরুষ হয় তাকে সেবক হিসেবে নিয়োগ দেয়া জায়েয।

আলোচিত বিধানাবলি ঘরের অভ্যন্তরীণ সেবাদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর ঘরের বাইরের সেবা প্রদানের জন্য যেমন : হাট-বাজার-মার্কেটের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষকে নিযুক্ত করা জায়েয।

আল্লামা আল হাত্তাব র.-কে অবিবাহিত নারীর জন্য পুরুষের কাছে এসে তাকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিতে বলা আপনার নিকট জায়েয কি-না এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন : এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে ঐ মহিলার ঘরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোনো লোককে সাথে রাখা আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। অন্যথায় উক্ত মহিলাকে মানুষে ত্যাগ করে একঘরে করে রাখলে সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

আজনবী তথা অপরিচিত মহিলার প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা পুরুষের জন্য জায়েয, যখন সে তার যে অঙ্গের দিকে তাকানো অবৈধ সে অঙ্গ থেকে দৃষ্টি অবনমিত রাখবে, যাতে মহিলার সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে"।[৬] আর তা হলো উভয় হাত ও চেহারা। মুফাস্সিরগণ অনুরূপ বলেছেন। তাই বিশেষ প্রয়োজনের সময় পুরুষের জন্য মহিলার উক্ত অঙ্গ দু'টি দেখা জায়েয।

মহিলার প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে যদি তার কাছে যেতে বাধ্য হয় তাহলে সাথে অন্য কাউকে নিয়ে যাবে, যাতে করে তার প্রতি মানুষের কু-ধারণা আসতে না পারে।[৭]

---

মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৪৭; কাশ্শাফুল-কিনা, খ. ৪, পৃ. ৬৪; আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ১০২; আল মুদাওয়ানা আল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ৪৩২; আল কালয়ূবী ও উমায়রা, খ. ৩, পৃ. ১৮; তুহফাতুল-মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪১৭

৬. সূরা আন-নূর, ৩১।

৭. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ১, পৃ. ২৭৩, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, খ. ৫, পৃ. ২৩৮; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ৩৯৩; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৬৫, খ. ৩, পৃ. ১৩১, খ. ৩, পৃ. ৪৩২; ইবনে কুদামা, আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৬৯; আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১০৮; আল-কালয়ূবী ও উমায়রা, খ. ৩, পৃ. ১৭; তুহ্ফাতুল-মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪১৭; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৪৫।

www.amarboi.org

**সন্তানের জন্য পিতার এবং পিতার জন্য সন্তানের সেবাদান**

পিতা যদি স্বেচ্ছায় সন্তানের সেবা করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। ছোট, অসুস্থ ও অক্ষম সন্তান যখন অভাবগ্রস্ত হবে তখন তার সেবা করা পিতার ওপর ওয়াজিব। মূল তথা পিতা-মাতা কর্তৃক শাখা তথা সন্তান-এর সেবা করার হুকুম সম্পর্কে ফকীহদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক র. ও শাফেয়ী মাযহাবের কিছুসংখ্যক ফকীহ এটা না জায়েয বলেছেন। কারণ এতে পিতাকে হেয় করা, অসম্মান করা এবং তুচ্ছ করা হয়, যা পিতৃত্বের মর্যাদার উপযোগী নয়। আর এ কারণেই সন্তান উচ্চ মর্যাদাশীল হলেও মজুরীর বিনিময়ে পিতার সেবা নেয়া জাযেয় নয়। মায়ের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য। পিতা মুসলমান, কাফের যে ধর্মাবলম্বীই হোক এটাই তার বিধান। কারণ ধর্মের দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও পিতাকে সম্মান করার জন্য সন্তানের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর পিতাকে সেবক নিয়োগের ক্ষেত্রে তার প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়, যা হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন : وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا "তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে"।[৮]

কাফের পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের জন্য আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। কারণ এ বাক্যটিকে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عطف (আত্‌ফ) করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নাই, তুমি তাদের কথা মানবে না"।[৯]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও ইমাম শাফেয়ী র.-এর নির্ভরযোগ্য মত হলো, সন্তান উচ্চ মর্যাদাশীল হলেও পিতা-মাতার কোনো একজন থেকে সেবা নেয়া মাকরূহে তানযীহী। তাদেরকে অপদস্ততা থেকে রক্ষার জন্য এ বিধান। তবে সন্তান কর্তৃক পিতার সেবা করা অথবা সন্তানের কাছে পিতার সেবা চাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয, বরং সদ্ব্যবহারের পর্যায়ভুক্ত, শরীয়তে যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পিতার সেবাদান করা অথবা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা সন্তানের ওপর ওয়াজিব। এজন্য সেবা কার্য নিজে করে অথবা অন্যের দ্বারা করিয়ে মজুরী গ্রহণ করা সন্তানের জন্য নাজায়েয। কারণ এটা তার কর্তব্য। আর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে তার বিনিময় নেয়া জায়েয নেই।[১০]

---

৮. সূরা লুকমান, ১৫।

৯. সূরা লুকমান, ১৫।

১০. আল-বাদায়ে, খ. ২, পৃ. ২৭৮, খ. ৪, পৃ. ১৯০; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৩৩৩; হাশিয়া আদ-দাসূকী-আলাশ্-শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪৩৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৩৭, খ. ৩, পৃ. ২১৩;

www.amarboi.org

## সেবক সম্পৃক্ত বিধানাবলি

### (ক) স্ত্রীর সেবক বানানো

জমহুর ফিক্‌হবিদদের মতে, যে স্ত্রী নিজে নিজের সেবা করতে পারে না-এভাবে যে, বাপের বাড়িতে থাকাকালীন তার জন্য সেবক নিয়োগ করা ছিল, অথবা সে মর্যাদাসম্পন্ন, এমতাবস্থায় তার সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। কারণ এসব স্ত্রীর সাথে সৎভাবে জীবন-যাপনের অধিকার যে সম্পর্কে শরীয়তের এ নির্দেশ রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে।[১১] আর এর্জন্যও যে, এটা দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্যজীবনের সম্ভাব্য প্রয়োজন পূর্ণ করার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তা নাফকাহ্ তথা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণের সাদৃশ্য রাখে। যেমনিভাবে তারা রোগাক্রান্ত, আহত ও বিকলাঙ্গ স্ত্রী যে নিজের কোনো কাজ নিজে করতে অক্ষম তার সেবা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব হবার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যদিও এ জাতীয় স্ত্রীর পূর্বে তার পিত্রালয়ে সেবা না করা হয়ে থাকে। কারণ এ সব স্ত্রীলোক সেবা ছাড়া (সৎভাবে) সাধারণ জীবনযাপন করতে অক্ষম।

মালেকীগণের মতে স্ত্রীর (যাবতীয়) সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। তবে তারা বলেন, এটা তখনই ওয়াজিব হবে যখন স্বামী বিত্তশালী হবে এবং স্ত্রী অভিজাত শ্রেণীর হবে, নিজের খেদমত করা যার শান নয়। অথবা স্বামী অভিজাত শ্রেণীর যার পক্ষে স্ত্রীর খেদমত করা অবমাননাকর। এমতাবস্থায় স্ত্রীর সেবাকার্য সম্পাদনের জন্য লোক নিযুক্ত করে (যাবতীয়) ব্যবস্থা গ্রহণে করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব।[১২]

হানাফীগণ বলেন, যে সব নারী আটা গোলানো অথবা রুটি বানানো থেকে বিরত থাকবে, সে যদি এমন শ্রেণীভুক্ত হয় যে সেবা করে না। অথবা তার কোনো কারণ থাকে তাহলে প্রস্তুতকৃত খাবারের ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যেসব নারী নিজেরা নিজেদের সেবাদানে অভ্যস্ত এবং সেবাকার্য সম্পাদনে সামর্থ সেক্ষেত্রে প্রস্ততকৃত খাবারের ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়। স্ত্রীর জন্য সেবাকার্য করে বিনিময়ে মজুরী নেয়া না-জায়েয। স্ত্রী সম্ভ্রান্ত খান্দানের হলেও। কারণ দীনদারীর দিক থেকে এটা তার ওপর ওয়াজিব।

দলীল : রাসূলুল্লাহ্ স. হযরত আলী ও ফাতিমা রা.-এর মাঝে কাজ বন্টন করে দিয়েছিলেন। হযরত আলী রা.-কে ঘরের বাইরের কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন

---

রওদাতুত্‌তালিবীন, খ. ৫, পৃ. ১৮৬, খ. ৪, পৃ. ৪২৭; আল-কাশ্‌শাফ, খ. ৪, পৃ. ৬৪; আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ১০২; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২২৫।

১১. সূরা নিসা, ১৯।

১২. আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৫১০।

www.amarboi.org

আর হযরত ফাতিমা রা.-কে অভ্যন্তরীণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন; অথচ তিনি বিশ্বের সকল মহিলার নেত্রী।[১৩]

স্ত্রীর জন্য যদি সেবক থাকে তাহলে তার ব্যয়ভার স্বামীর দায়িত্ব।[১৪]

**স্বামীর জন্য স্ত্রীর সেবা এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর সেবা**

ঘরে স্ত্রীর স্বামীকে সেবা প্রদানের ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। তাই সে স্ত্রী নিজের সেবা নিজেই সম্পাদন করুক বা অন্য লোক দিয়ে করাক -এর যে শ্রেণীভুক্ত হোক আইনত তাতে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু এই সেবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে।

জমহুর ফকীহগণ (শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের কতিপয় ফকীহ) বলেন, স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সেবা প্রদান করা ওয়াজিব নয়। তবে সেসব সেবা স্ত্রীর জন্য প্রদান করা শ্রেয় যা সাধারণত করতে স্ত্রী জাতি অভ্যস্ত।

হানাফীদের মতে, স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সেবা করা দিয়ানাতান তথা ধার্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব, বিচারকের বিচারে ওয়াজিব নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ স. হযরত ফাতেমা ও আলী রা.-এর মাঝে কাজ বণ্টন করে দিয়েছিলেন। ঘরোয়া কাজের দায়িত্ব হযরত ফাতেমাকে আর বাইরের কাজের দয়িত্ব হযরত আলী রা. কে দিয়েছিলেন।[১৫] এ কারণেই স্বামীর সেবার বিনিময়ে স্ত্রীর মজুরী গ্রহণ করা তাদের নিকট না-জায়েয।

মালেকী মাযহাবের জমহুর ফকীহ, ইমাম আবু ছাওর, আবু বকর ইবন শাইবাহ, আবু-ইসহাক আল জুরজানী প্রমুখ বলেন, নারীগণ স্বভাবত ঘরোয়া ও অভ্যন্তরীণ যে সব সেবা প্রদানে অভ্যস্ত তা তাদের করতে হবে। হযরত আলী রা. ও ফাতেমা রা. ঘটনার দ্বারা তা প্রমাণিত। কেননা রসূলুল্লাহ স. ঘরোয়া সেবার দায়িত্ব হযরত ফাতিমাকে আর বাইরের কাজের দায়িত্ব হযরত আলী রা.-কে দিয়েছিলেন।[১৬]

এর আরো দলীল : রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস তিনি ইরশাদ করেছেন :

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنْ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُل مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَل

"আমি মানুষকে সিজদা করার আদেশ করলে নারী জাতিকে আদেশ করতাম স্বামীকে সিজদা করতে। কোনো স্বামী লাল পাহাড় থেকে কোনো জিনিস কালো

---

১৩. এ হাদীসটি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী র. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন। খ. ৯, পৃ. ৫০৭ আস্‌সালাফিয়া সং।

১৪. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৮।

১৫. হাদীসটির সূত্র ও বরাত ১৩ নং টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. মালেকী ফকীহগণ সম্ভবত রসূলুল্লাহ স. এর (কাজ বণ্টনের) আদেশকে বিচারকের বিচারে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা রসূলুল্লাহ স.-এর আদেশকে ফতোয়ার অন্তর্ভুক্ত করে ওয়াজিবকে দিয়ানাত তথা ধার্মিকতার বিচারে অর্থাৎ-যা স্ত্রী ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয় সাব্যস্ত করেছেন। (মাওসূ'আ সম্পাদনা পরিষদ)।



www.amarboi.org

পাহাড়ে অথবা কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে স্থানান্তর করতে আদেশ করলে স্ত্রীকে তাই করতে হবে"।[১৭] আল্লামা জুরজানী র. বলেন, এ হাদীসে যে বিষয়ে স্ত্রীর কোনো উপকারিতা নেই সে বিষয়েই স্বামীর এহেন আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে। তাহলে তার জীবিকা নির্বাহের যোগান দেয়ার বিষয়ে কী হওয়া উচিৎ ?

আরো দলীল : নবী কারীম স. স্ত্রীগণকে তার সেবা করার আদেশ দিতেন। তিনি বলতেন :

يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا ، يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ وَاشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ

"হে আয়েশা! আমাদেরকে খানা খাওয়াও। হে আয়েশা! তুমি বড় ছুরিখানা নিয়ে আস এবং পাথরে ঘষে ধারালো করো"।[১৮]

ইমাম তাবারী র. বলেন, স্ত্রীর রুটি পাকানো ইত্যাকার ঘরোয়া কাজের সামর্থ্য থাকলে স্বামীর ওপর তা আবশ্যক নয়। যখন প্রসিদ্ধ হবে যে, এ ধরনের কাজ সে নিজেই করতে পারে।[১৯]

মালেকী শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহগণের মতে স্বাধীন পুরুষের জন্য স্ত্রীর সেবা করা জায়েয এবং স্ত্রীও তার সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

হানাফী মাযহাব মতে, স্ত্রীর জন্য স্বাধীন স্বামীর প্রদেয় মোহরের বিনিময়ে স্বামীর সেবা নেয়া হারাম। তবে যদি স্ত্রীকে এই শর্তে বিয়ে করে যে, স্ত্রীর ছাগল গুলোররাখালের দায়িত্ব পালন করবে এক বছর, অথবা স্ত্রীর জমি চাষাবাদের দায়িত্ব পালন করবে তাহলে মোহর হিসেবে এটা উল্লেখ করা সহীহ হবে।[২০]

স্ত্রীর জন্য স্বামীর সেবা প্রদান বাড়তি কাজ। আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, স্ত্রী ঘরোয়া কাজের জন্য যদি স্বামীকে নির্ধারিত মজুরির বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করে তাহলে তা জায়েয। কারণ, ঘরোয়া কাজ স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়। সুতরাং এটা এমন কাজে মজুরকে নিয়োগ করা হয়েছে, যা মজুরের অবশ্য কর্তব্য নয়।[২১]

—শফীকুল ইসলাম গওহরী

---

১৭. ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৫৯৫, আল-হালাবী সম্পা.। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণিত। আয-যাওয়ায়েদ নামক গ্রন্থে আল-বূসীরী বলেন: এ হাদীসের সনদে আলী ইবন যায়েদ নামক একজন রাবী আছেন, যিনি যঈফ-نولها অর্থ: "তার হক"।

১৮. মুসলিম শরীফ, খ. ৩, পৃ. ১৫৫৭ সম্পা., আল-হালাবী; আবু দাউদ, খ. ৫, পৃ. ২৯৪, সম্পা. ইজ্জত উবায়দ দা'আস, তুখফা আল গিফারীর হাদীস থেকে, তার সনদ সহীহ।

১৯. আল-বাদায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯২; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, খ. ৫, পৃ. ৩৯; আল-খারাশী, খ. ৪, পৃ. ১৮৬; তুহফা আল-মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ৩১৬; ইবনে কুদামা আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২১; কাশ্শাফুল কিনা,' খ. ৫, পৃ. ৯৫; ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৫০, ৩২৪।

২০. আল-বাদায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯২।

২১. আল-বাদায়ে, খ. ২, পৃ. ২৭৮, খ. ৪, পৃ. ১৯২; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, খ. ৫, পৃ. ৩৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৩; রওদাতুত-তালেবীন, খ. ৯, পৃ. ৪৫; আল-কাওয়ানীনুল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২২৬; আল-খারাশী, খ. ৪, পৃ. ১৮৬; তুহফা আল-মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ৩১৬; ইবনে কুদামা আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২১, ৫৭০।

www.amarboi.org

# নারীর যোনিপথে বাধা (قَرَنٌ)

**সংজ্ঞা :** আল-কারানু (القَرَنُ) রা-এর ওউপর যবর। শব্দটি মাসদার। যেমন বলা হয় : قَرَنَتِ الْجَارِيَةُ قَرَنًا যখন তার যোনিপথ মিলানো থাকে। অর্থাৎ তার যৌনাঙ্গে এমন কোনো জিনিস থাকা, যা সহবাসে বাধা সৃষ্টি করে। একে الْعَفَلَةُ ও বলা হয়। আরো বলা হয়, এটি জরায়ুতে অস্বাভাবিক ফুলা থাকার মতো-যা মানুষ, ছাগল ও গাভীর মধ্যে হয়ে থাকে।

الْعَفْلَاءُ ও الْقَرْنَاءُ একই অর্থবোধক

আত-তাহযীব গ্রন্থে বলা হয়েছে, পরিভাষায় 'কারনা' হলো সে নারী যার যোনিপথে পুরুষাঙ্গ প্রবেশে বাধাদানকারী কিছু থাকে। তা পুরু লালাগ্রন্থি অথবা উঁচু গোশতপিণ্ড বা হাড় হতে পারে। এ সবগুলোকেই আল-কারানু বলা হয়। অভিধান গ্রন্থে القَرَنُ শব্দের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। যেমন- القَرْنُ (রা সাকিন যোগে) একটি স্থানের নাম, যা নজদ এর অধিবাসীদের জন্য মীকাত। শব্দটি সময়ের নির্দিষ্ট অংশ (যুগ) বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়।[১] তবে এখানে القَرَنُ এর পারিভাষিক অর্থে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর একটি ত্রুটির কথা বুঝানো হয়েছে।

হানাফী ও মালেকীগণ বলেন, এটি একটি গোশতের টুকরো যা নারীর যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গ প্রবেশপথে গজিয়ে উঠে। হানাফীগণ বলেন, এটি লালাগ্রন্থির ন্যায়। আর মালেকীগণ বলেন, এটি ছাগলের শিং এর অনুরূপ। তারা আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, কখনো তা হাড়ও হতে পারে।[২]

শাফেয়ীদের মতে, এটি হলো সহবাসের স্থান হাড় দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।[৩] হাম্বলীগণ বলেন, তা হলো যোনীপথে বাধা সৃষ্টিকারী এক টুকরো গোশত। এটি কাজী ও আল-খিরাকী এর অভিমত। আল-মুত্তালি' গ্রন্থকার ও আয-যারকাশী বলেন, 'আল-কারান' হলো হাড় অথবা লালাগ্রন্থি, যা পুরুষাঙ্গ প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।[৪]

**সংশ্লিষ্ট পরিভাষা**

**الرَّتَقُ আর-রাতাকু :** আর-রাতাকু অর্থ মুখ বন্ধ করা, যা আল-ফাতাকু : ফাটল এর বিপরীত। এটি হলো ফাটল জোড়া লাগানো ও তা সংস্কার করা।

পরিভাষায় 'আর-রাতাকু' হলো গোশতের দ্বারা সহবাসের স্থান এমনভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া যে, সেটি থাকাবস্থায় সহবাস করা সম্ভব নয়।[৫] আল-কারানু ও আর-রাতাকু এর মধ্যে সম্পর্ক হলো, উভয়টাই বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর ত্রুটি হিসেবে গণ্য।

---

১. লিসানুল আরব, মিসবাহুল মুনীর, শব্দমূল قرن

২. দুররুল মুখতার এর উপর ইবনে আবেদীন এর হাশিয়া খ. ২, পৃ. ৫৯৭; আশ্ শারহুল কাবীর হাশিয়া আদ্-দাসুকীসহ খ. ২, পৃ. ২৭৮।

৩. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩০৩।

৪. কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১০৯।

৫. হাশিয়া ইবনে আবেদীন আলাদ দুররিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৫৯৭; আশ-শারহুল কাবীর আলা হাশিয়াতুদ দাসুকী খ. ২, পৃ. ২৭৮; রওদাতুত তালেবীন, খ. ৭, পৃ. ১৭৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১০৯।

www.amarboi.org

**সংক্ষিপ্ত বিধান**

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবমতে, যোনিপথে বাধা থাকা এমন একটি ত্রুটি, যার কারণে এখতিয়ার সাব্যস্ত হয়। স্ত্রীর যোনিপথে বাধা থাকলে এবং আকদের সময় তা না জানা থাকলে স্বামী বিবাহ বাতিল করতে পারে অথবা বহালও রাখতে পারে। কেননা বিবাহের মূল উদ্দেশ্য সহবাস-ই এখানে সম্ভব হচ্ছে না।[৬]

হানাফী মাযহাব মতে, স্ত্রীর এ ধরনের ত্রুটি থাকলে স্বামীর বিবাহ বাতিল করার অধিকার থাকবে না। এটি 'আতা, আন-নাখঈ, উমর ইবনে আবদুল আযীয, আবু যিয়াদ, আবু কিলাবা, ইবনে আবু লায়লা, আল-আওযায়ী', সুফিয়ান ছাওরী, আলী রা. ও ইবনে মাসউদ রা. এরও অভিমত।

**যোনিপথবন্ধ স্ত্রীর ভরণপোষণ**

আল-কারানা বা যোনিপথবন্ধ স্ত্রীর ভরণপোষণ দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব। কেননা ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো, সহবাসের উদ্দেশ্যে বা শৃঙ্গার-এর জন্য হাজির থাকা।[৭]

**পালাবণ্টন**

একাধিক স্ত্রী থাকলে যোনিপথবন্ধ স্ত্রীর জন্যও পালাবণ্টন করা ওয়াজিব, যেমনিভাবে যে স্ত্রীর শরয়ী অথবা প্রকৃতিগত ওজর আছে তার জন্য পালাবণ্টন করা ওয়াজিব। কেননা পালার উদ্দেশ্য হলো প্রেম-ভালোবাসা, উপভোগ করা নয়।[৮]

**চিকিৎসার জন্য যোনীপথবন্ধ স্ত্রীকে বাধ্য করা**

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যোনিপথবন্ধ থাকা স্ত্রীকে উক্ত স্থান কাটা বা অপারেশন করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। সে নিজে তা করলে এবং সহবাস করা সম্ভব হলে স্বামীর আর এখতিয়ার থাকবে না। এটি মালেকী ও শাফেয়ীদের অভিমত।[৯] হানাফীগণ বলেন, স্ত্রীর যোনিপথের বন্ধ থাকা স্থান কাটা বা অপারেশন করার অধিকার স্বামীর রয়েছে এবং স্ত্রী তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে স্বামী তাকে বাধ্য করতে পারবে। কেননা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব হলো নিজেকে সমর্পণ করা, যা এ ছাড়া সম্ভব নয়।[১০]

- নাজমুল হুদা সোহেল

---

৬. হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশ শারহিল কাবীর খ. ২, পৃ. ২৭৮; হাশিয়াতুল 'আদাবী আলা শারহির রিসালা খ. ২, পৃ. ৮৩; শারহু রাওদাতু তালিব, খ. ৩, পৃ. ১৭৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩০৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১০৯-১১০।

৭. রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৪৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৭; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬০৩; আদ-দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৫১৭।

৮. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৫২; রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৪০০; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৩৯।

৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩০৩; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ১৭৬; হাশিয়াতুদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ২৮৪।

১০. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৫৯৭।

www.amarboi.org

# পুরুষের যৌন অক্ষমতা (عُنَّة)

**সংজ্ঞা :** العُنَّةُ -এর আভিধানিক অর্থ–পুরুষের অক্ষমতা যার ফলে সে সহবাস করতে সক্ষম হয় না। যেমন–বলা হয় عُنَّ عَنِ امْرَأَتِهِ সে তার স্ত্রীর ব্যাপারে অক্ষম হয়েছে– যখন বিচারক তার ব্যাপারে এরূপ রায় দেন অথবা যাদুর মাধ্যমে তাকে তার স্ত্রী থেকে বাধা দেয়া হয়।

العُنَّةُ শব্দটি الاِعْتِرَاض -এর অর্থ থেকে গৃহীত। কেননা এটি পুরুষত্বহীনকে নারী থেকে বাধা দেয়। আর العِنِّين বা পুরুষত্বহীন নামকরণ করা হয়েছে, কারণ তার পুংলিঙ্গ নারীর অঙ্গে প্রবেশে অক্ষম।[১]

ফকীহদের পরিভাষায় : পুরুষের যৌন অক্ষমতা হলো, লিঙ্গ উত্থিত না হওয়ায় স্ত্রীর অঙ্গ দিয়ে সহবাসে অপারগতা।[২] লিঙ্গ নরম হওয়া বা বেঁকে যাওয়ার কারণে তাকে العِنِّين বা পুরুষত্বহীন নামকরণ করা হয়েছে– عَنَانِ الدَّابَّةِ (পশুর লাগাম) থেকে গৃহীত।[৩]

যার দু'জন স্ত্রী আছে সে একজন ছাড়া অন্যজনের নিকট অক্ষম হলে পুরুষত্বহীনের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যার চারজন স্ত্রী আছে সে তিনজনের সাথে সহবাস করার পর চতুর্থজনের সাথে অক্ষম হলে শুধু সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর সাথেই পুরুষত্বহীন হিসেবে গণ্য হবে। কোনো নির্দিষ্ট স্ত্রীকে অপছন্দ করা অথবা লজ্জার কারণে উত্তেজনা বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে এমনটি হতে পারে। অন্যদের সাথে সে সক্ষম হয় আকর্ষণ ও ঘনিষ্ঠতার কারণে। তবে গঠনগত ও জন্মগত অক্ষমতা নারীর ভিন্নতার ফলে পরিবর্তন হয় না।[৪] যে ব্যক্তি কুমারী নারীর ক্ষেত্রে অক্ষম কিন্তু অকুমারীর ক্ষেত্রে সক্ষম এবং যে সামনের দিক দিয়ে অক্ষম কিন্তু গুহ্যদ্বার দিয়ে সক্ষম সেও পুরুষত্বহীনের অন্তর্ভুক্ত। অক্ষমতা থাকলে দু'টি অণ্ডকোষকর্তিত খাসিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বিষয়টি এর ওপর ভিত্তি করে যে,

---

১. লিসানুল আরাব; আল-কামূসুল মুহীত; আল-মুহকাম ওয়াল মুহীতুল আজাম লি ইবনে সাইয়্যেদা; আল-মুজামুল ওয়াসীত, মাদ্দাহ عنن

২. আসনাল-মাতালিব শারহ বাওদুত-তালিব, খ. ৩, পৃ. ১৭৬।

৩. আল কালয়ূবী খ. ৩, পৃ. ২৬১; আর-রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ খ. ৬, পৃ. ৩০৯-৩১৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০২; আল-মুগনী ওয়া শারহুল কাবীর, খ. ৭, পৃ. ৬০৬।

৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ২৯৭; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ১৯০; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬০৬।

www.amarboi.org

খাসির ক্ষেত্রে কোনো এখতিয়ার নেই। অথবা মহিলাটি তার ব্যাপারে সম্মত ছিল এবং তাকে খাসির পাশাপাশি অক্ষম পেয়েছে। লিঙ্গকর্তিত ব্যক্তির লিঙ্গের মাথা বা তার বেশি অবশিষ্ট থাকাবস্থায় সহবাসে অক্ষম হলে সেও পুরুষত্বহীন হিসেবে গণ্য।[৫]

এ অর্থে الْعِنِّيْنُ -কে মালেকীগণ الْمُعْتَرِضُ (বাধাদানকারী) নামকরণ করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, الْمُعْتَرِضُ শব্দটি الْعِنِّيْنُ -এর একটি অর্থ। তবে তাদের মতে, الْعِنِّيْنُ শব্দ ব্যবহার করা হয় যার পুংলিঙ্গ বোতামের মতো অতি ক্ষুদ্র এবং তা দ্বারা সহবাস করা সম্ভব নয়।[৬] এর বিধান الْمُعْتَرِضُ থেকে ভিন্ন।

## সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ

**ক. الْجَبُّ আলজাব্বু :** এর আভিধানিক অর্থ কর্তন করা। সেখান থেকে الْمَجْبُوبُ বা কর্তিত, সে ব্যক্তিকে বলে, যার পুরুষাঙ্গ গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। জমহুর ফকীহদের নিকট এর পারিভাষিক অর্থ হলো, পুরুষাঙ্গের সবটুকু বা কিছু অংশ এমনভাবে কেটে যাওয়া যাতে সহবাস করার মতো কিছু অবশিষ্ট না থাকে।[৭]

الْجَبُّ ও الْعُنَّةُ -এর মধ্যে পার্থক্য : الْجَبُّ হলো পুরুষাঙ্গ কর্তিত থাকায় নারীর সাথে সহবাস করতে অক্ষম হওয়া। আর العنة হলো লিঙ্গের উত্থান না হওয়ায় স্ত্রী সহবাসে অক্ষমতা।[৮]

**খ. الْخِصَاءُ আল খিসা :** আল খিসা হলো জন্মগতভাবে অথবা কর্তনের কারণে অণ্ডকোষ না থাকা।[৯]

الْخِصَاءُ ও الْعُنَّةُ -এর মধ্যে পার্থক্য : আল উন্নাহ বা পুরুষত্বহীনতা হয় লিঙ্গের উত্থান না হওয়ার কারণে। আর আল খিসা লিঙ্গের উত্থানে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

## পুরুষের যৌন অক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিধান

পুরুষের যৌন অক্ষমতার সাথে কিছু বিধান সংশ্লিষ্ট। যেমন : যৌন অক্ষমতার ফলে এখতিয়ার সাব্যস্ত হওয়া। পুরুষের যৌন অক্ষমতা একটি ত্রুটি। জমহুর ফকীহদের মতে এর ফলে এক বছর সময় দেওয়ার পর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে বিবাহ বিচ্ছেদ দাবি করতে পারে।[১০]

---

৫. রওদাতুত তালেবীন, খ. ৭, পৃ. ১৯৫-১৯৬; মাতালিবু উলিন-নুহা, খ. ৫, পৃ. ১৪৫।
৬. আল-খারশী খ. ৩, পৃ. ২৪০; আশ-শারহুস সাগীর খ. ১, পৃ. ৪৪৫।
৭. ইবনুল আছীর, আন নিহায়া, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত; আল-মুগরিব; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১২৮; আল কালয়ুবী খ. ৩, পৃ. ২৬১; কাশশাফুল কিনা খ. ৫, পৃ. ১০৫।
৮. নিহায়াতুল মুহতাজ খ. ৬, পৃ. ৩০৩।
৯. আল-মুগরিব; আল কালয়ুবী খ. ২, পৃ. ১৯৭; খ. ২, পৃ. ১৯৭; আসনাল মাতালিব খ. ৩, পৃ. ১৭৬।
১০. ফাতহুল কাদীর খ. ৪, পৃ. ২৯৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০৩; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬০৩।

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাবের একটি দলের মতে, এক্ষেত্রে স্ত্রী চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহ বাতিল করতে পারে। তাদের মধ্যে রয়েছে আবু বকর ও আল মাজদ।[১১]

জমহুরের দলীল হলো, হযরত উমর রা. পুরুষত্বহীনকে এক বছর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন।[১২] এছাড়া বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর উদ্দেশ্য থাকে পবিত্র থাকা এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করা। আর বিবাহের দ্বারাই সে সধবার গুণ অর্জন করে। চুক্তির মাধ্যমে চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হাতছাড়া হলে চুক্তিকারী তা বাতিল করার অধিকার রাখে। ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্পদের সামান্য বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হয়ে যায়- এমন ত্রুটি থাকলে ক্রেতার এখতিয়ার সাব্যস্ত হবে। আর বিবাহের উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়ে গেলে সেখানে এখতিয়ার থাকা তো আরো অগ্রগণ্য।[১৩] তাছাড়া যৌন অক্ষমতা পুরুষের লিঙ্গ কর্তনের মতো এবং নারীর যোনিপথ বন্ধ থাকার সমতুল্য।[১৪]

## যৌন অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়া

কিসের দ্বারা অক্ষমতা প্রমাণিত হবে? সে ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফীগণ বলেন, সহবাস না হওয়ার বিষয়ে স্বামীর স্বীকারোক্তি দ্বারা যৌন অক্ষমতা প্রমাণিত হবে। যদি এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী মতভেদ করে এবং স্ত্রী অকুমারী হয় তাহলে শপথ সহকারে স্বামীর কথাই ধর্তব্য হবে। কেননা সে বিচ্ছেদের অধিকার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করছে। আর প্রকৃতিগতভাবে সুস্থ থাকাটাই স্বাভাবিক। অতঃপর স্বামী শপথ করলে স্ত্রীর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে শপথ থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকে এক বছর সময় দেয়া হবে। আর স্ত্রী কুমারী হলে অন্যান্য মহিলা তাকে যাচাই করবে। তারা যদি বলে, সে কুমারী তাহলে এক বছর বিলম্ব করা হবে যাতে স্বামীর মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যায়। আর যদি তারা বলে, সে অকুমারী তাহলে স্বামী শপথ করবে। স্বামী শপথ করলে স্ত্রীর আর বিচ্ছেদের অধিকার থাকবে না। আর সে শপথ করতে বিরত থাকলে তাকে এক বছর সময় দেয়া হবে।[১৫]

মালেকীগণ বলেন, স্ত্রী যদি দাবি করে, তার স্বামী যৌন অক্ষম এবং স্বামী তা স্বীকার করে তাহলে এক বছর সময় দেয়া হবে। আর যদি স্বামী তা অস্বীকার করে তাহলে শপথ সহকারে তার কথাই ধর্তব্য। শাফেয়ীগণ বলেন, অন্যান্য অধিকারের ন্যায় বিচারকের সামনে স্বামীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যৌন অক্ষমতা

১১. আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ১৮৭।
১২. আল মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০০, ১০১।
১৩. হাশিয়াতু উমাইরা খ. ৩, পৃ. ২৬১।
১৪. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬০৩।
১৫. ফাতহুল কাদীর খ. ৪ পৃ. ১৩০-১৩১।

www.amarboi.org

প্রমাণিত হবে। অথবা তার স্বীকারোক্তির পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে স্বামী যৌন অক্ষমতা অস্বীকার করলে এবং শপথ করা থেকে বিরত থাকলে স্ত্রীর উল্টো শপথের দ্বারা স্বামীর যৌন অক্ষমতা প্রমাণিত হবে। স্ত্রীর জন্য শপথের বিধান এ জন্য রাখা হয়েছে যে, সে বিভিন্ন লক্ষণ ও স্পর্শ দ্বারা অক্ষমতা বুঝতে পারে। এ মতের বিপরীত মত হলো, শপথ স্ত্রীর ওপর প্রত্যাবর্তিত হবে না; বরং স্বামীর বিরত থাকার ভিত্তিতেই রায় হবে।[১৬]

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, যৌন অক্ষমতার স্বীকারোক্তি অথবা স্বীকারোক্তির ওপর প্রমাণ দ্বারা পুরুষত্বহীনতা প্রমাণিত হবে। যদি স্বীকারোক্তি অথবা স্বীকারোক্তির ওপর প্রমাণ পাওয়া না যায় এবং স্ত্রী তার স্বামীর অক্ষমতার দাবি করার পর স্বামী তা অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় স্ত্রী কুমারী হলে তার কথাই ধর্তব্য। আর অকুমারী হলে মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতনুসারে শপথ সহকারে স্বামীর কথা ধর্তব্য হবে। কেননা তার পক্ষ ছাড়া অন্য কোনোভাবে এটি জানা সম্ভব নয়। আর মূল হচ্ছে সুস্থ থাকা। কাজী আয়ায বলেন, স্বামী অক্ষমতার স্বীকারোক্তি করলে অথবা তার স্বীকারোক্তির ওপর প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা সে অস্বীকার করলে এবং স্ত্রী তার শপথ দাবি করার পর শপথ থেকে বিরত থাকলে তার অক্ষমতা প্রমাণিত হবে।[১৭]

## পুরুষত্বহীনতা সাব্যস্ত হলে যা বাধ্যতামূলক হয়

জমহুর ফকীহের মতে, স্ত্রী যদি দাবি করে যে, তার স্বামী পুরুষত্বহীন, সহবাসে অক্ষম এবং তার পুরুষত্বহীনতা প্রমাণিত হয়, তবে তাকে এক বছর সময় দেয়া হবে। শাফেয়ীগণ বলেন, স্ত্রী দাবি করা ছাড়া এক বছর সময় দেয়া হবে না। সে চুপ থাকলে সময়সীমা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য তার চুপ থাকা যদি হতবুদ্ধিতা অথবা অবহেলা অথবা অজ্ঞতার কারণে হয় তবে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে দোষ নেই।[১৮]

জমহুর উলামা হযরত উমর রা.-এর একটি ফয়সালা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। 'আন নিহায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ হযরত উমর রা.-এর অনুসরণে এ বিষয়ের একটি মূলনীতিতে একমত হয়েছে।[১৯] আর এ কারণে যে, সময়প্রদান

১৬. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০৫।
১৭. আল-মুগনী মা'আশ শারহিল কাবীর, খ. ৭, পৃ. ৬০৪; মাতালিবু উলিন-নুহা খ. ৫, পৃ. ১১৪২।
১৮. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১৩০-১৩১; আল-বাহজা, খ. ৪, পৃ. ১৬৮; আর রওদা, খ. ৭, পৃ. ১৯৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০৬; আল-মুগনী মা'আশ শারহিল কাবীর খ. ৭, পৃ. ৬০৪।
১৯. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ২০৬।

www.amarboi.org

হলো ওজর যাচাই করার জন্য। আর একবছর সময় ওজরের জন্য যথেষ্ট।[২০] আর এ কারণেও যে, যৌন অক্ষমতা কখনো পুরুষত্বহীনতার কারণে, আবার কখনো অসুস্থতার কারণে হতে পারে। তাই একবছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে স্পষ্ট হয় যে, এটি পুরুষত্বহীনতা, অসুস্থতা নয়। অতঃপর যখন এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সে স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না তখন বুঝা যাবে যে, এটি তার মৌলিক সমস্যা।[২১]

কখনো এমনও হতে পারে যে, সে আদ্রতার কারণে অক্ষম, তাই গ্রীষ্মকালে সে সক্ষম হবে, আবার কখনো এর বিপরীত হতে পারে। অর্থাৎ শীত মওসুমে অসুস্থতা হলে গরমকালে তা চলে যায় অথবা বর্ষার কারণে হলে শরতের গরমে তা দূর হয়ে যায়। অথবা গরমের কারণে হলে শীতের ঠাণ্ডায় তা দূর হয়ে যায় অথবা শুষ্কতার কারণে হলে বসন্তের আদ্রতায় স্বাভাবিকভাবেই তা দূর হয়ে যায়।[২২] অথবা কখনো ওষুধ এক ঋতুতে কাজ করে, অন্য ঋতুতে কাজ করে না।[২৩] তাই সে এ এক বছরের মধ্যে নিজের চিকিৎসা করিয়ে নিবে।

## যিনি সময়দানের ফয়সালা করবেন

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ সময়দানের ক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃক ফয়সালা দেয়ার শর্তারোপ করেছেন।[২৪] হানাফীগণ বলেন, সময়দানের ফয়সালা দিবেন দেশ অথবা স্থানীয় শহরের কাজী, যার ফয়সালা বৈধ। উক্ত মহিলা অথবা কাজী ছাড়া অন্য কেউ এরূপ সময় প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৫]

মালেকী মাযহাব মতে, যে আমীর কাজীকে নিযুক্ত করেন সে আমীর সময়দানের ফয়সালা দিতে পারেন। কাজী না থাকলে পুলিশপ্রধানও তা করতে পারেন।[২৬]

## গঠনগত অক্ষমের জন্য সময়সীমা নির্ধারণের বিধান

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মতে, যদি জানা যায় যে, তার যৌন অক্ষমতা কম বয়স হওয়ার কারণে অথবা এমন অসুস্থতার কারণে যা দূর হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে সময়সীমা নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এ বাধা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে; জন্মগত পুরুত্বহীনতা দূর হয় না। আর যদি তা বার্ধক্য অথবা

---

২০. আল-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০০-১০১; আল-উকূদুদ্ দুররিয়্যা খ. ১, পৃ. ৩০।

২১. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৫৯।

২২. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১০২।

২৩. আল-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০২; আল খারশী খ. ৩, পৃ. ২৪০।

২৪. হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ২৬৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩১৪; কাশশাফুল- কিনা' খ. ৫, পৃ. ১০৬।

২৫. আল মাবসূত খ. ৫, পৃ. ১০২; আল-উকূদুদ-দুররিয়্যা ফী তানকীহিল ফাতাওয়া আল-হামেদিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৩০; ফাতাওয়া কাযী খান বিহামিশিল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা খ. ১, পৃ. ৪১০।

২৬. আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা খ. ২, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

www.amarboi.org

মারাত্মক রোগের কারণে হয়, যা দূর হওয়ার আশা করা যায় না, তাহলে তার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। কেননা সে তারই পর্যায়ভুক্ত, জন্মগতভাবে যে এরূপ। যদি লিঙ্গ কর্তন অথবা পক্ষাঘাতের কারণে অক্ষমতা হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর এখতিয়ার সাব্যস্ত হবে। কারণ তার কাছ থেকে সহবাস আশা করা যায় না এবং এ জন্য অপেক্ষা করা নিরর্থক। কিন্তু যদি লিংগের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে, যার দ্বারা সহবাস করা সম্ভব, সে ক্ষেত্রে তার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া উত্তম। কেননা, সে জন্মগতভাবে পুরুষত্বহীন-এর পর্যায়ভুক্ত।[২৭]

ইবনুল হুমাম বলেন, যদি পুরুষত্বহীনতা নিশ্চিতভাবে জানা যায় তাহলে এক বছর সময় দেয়া হবে না। কারণ সময় প্রদান করা হয় এটা জানার জন্যই যে, অভিযোগ অনুযায়ী সে পুরুষত্বহীন কি-না; কিন্তু তা জানার পরও সময় দেয়া নিরর্থক। তবে পুরুষত্বহীনতা যাচাই করার প্রয়োজন হলে অবশ্যই সময় প্রদান করতে হবে। কারণ এটাই তার হুকুম। আর তার মেয়াদ এক বছরই।[২৮]

আশ-শুবরামুলসী বলেন, কিছু আলেমের মত অনুযায়ী অবশ্যই এক বছর সময় নির্ধারণ করতে হবে। কেননা শরীয়ত হুকুমকে বছর এর সাথে যুক্ত করেছে।[২৯]

### এক বছরের অর্থ

ফকীহদের মতে শর্তহীনভাবে যখন শুধু মাসের কথা উল্লেখ করা হবে তখন উক্ত মাস দ্বারা চান্দ্রমাস বুঝাবে। ইবনুল হুমাম বলেন, সঠিক হলো, বছর দ্বারা চান্দ্রবছর উদ্দেশ্য। শর্তহীনভাবে শুধু আস-সানা বা বছর শব্দটি ব্যবহৃত হলে তার দ্বারা চান্দ্রবছরই বুঝাবে যতক্ষণ না সুস্পষ্টভাবে অন্য কিছু বলা হবে।[৩০]

আল-ইনসাফ গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ বারোটি চান্দ্রমাস। শায়খ তাকী উদ্দীন বলেন, এটিই সঠিক। তবে ঋতু-সংক্রান্ত তাদের ব্যাখ্যা দ্বারা এর ব্যতিক্রম কিছুর সম্ভাবনাও রয়েছে।[৩১]

আস-সারাখসী বলেন, কখনো কখনো সাবধানতার কারণে বছর দ্বারা সৌরবছরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, যে জন্য তাকে সময় প্রদান করা হয়েছে সে সমস্যা কখনোবা চান্দ্রবছর ও সৌরবছরের মধ্যে ব্যবধানসম্পন্ন দিনগুলোতে দূর হয়ে যায়। ইবনে সুমাআ মুহাম্মদ থেকে 'আন নাওয়াদের' গ্রন্থে

---

২৭. আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৭, পৃ. ৬০৬।

২৮. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩০২, আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৫৯।

২৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩০৮।

৩০. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩০২; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৫৯; মুনতাহাল-ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৬।

৩১. আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ১৮৮।

www.amarboi.org

এ ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করেছেন। তখন দিন হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর তা চান্দ্রবছর থেকে আরো এগারো দিন বেশি হবে।[৩২]

ইবনে রজব বর্ণনা করেন, এখানে বছর দ্বারা রোমক সৌরবছরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তা বছরের চারটি ঋতুকেই সন্নিবেশিত করে, যার পরিবর্তনে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে- যা চান্দ্রবছরে হয় না। আল-ইনসাফ গ্রন্থকার বলে, সৌরবছর ও চান্দ্রবছরের মধ্যে ব্যবধান সামান্যই। আর তা হলো সৌরবছর চান্দ্রবছর থেকে ১১ দিন এবং আরো একদিনের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ বেশি।[৩৩]

**পুরুষত্বহীনের সময়সীমা যখন থেকে শুরু**

জমহুর ফকীহ-এর মতে, বিচারক কর্তৃক সময়সীমা নির্ধারণের সময় থেকে বছর গণনা শুরু হবে। এক বছর সময় নির্ধারণ হযরত উমর রা.-এর ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর তিনি সময় নির্ধারণকাল থেকেই এটি গণনা শুরু করেছিলেন। তাই জমহুর তার এ কাজের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৩৪] মালেকীগণ বলেন, তারা উভয়ে বিষয়টি বিচারকের দরবারে উত্থাপন না করে বরং নিজেরাই সম্মত হলে সে সম্মতির দিন থেকেই বছর গণনা শুরু হবে।[৩৫] যদি মাসের শুরু থেকে বছর গণনা আরম্ভ হয় তবে মাস হিসেবেই বছর গণনা করা হবে। আর যদি মাসের শুরু না হয়ে বরং মাঝখান অর্থাৎ ভাংতিমাস থেকে গণনা শুরু হয়, তাহলে এর পরবর্তী সময় থেকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে মাস হিসেবে গণনা করবে।[৩৬]

**এক বছরের সময়সীমা হ্রাস পাওয়া**

পুরুষত্বহীনতা ছাড়াও সহবাসে বাধাদানকারী আরো কিছু প্রতিবন্ধকত রয়েছে। এ প্রতিবন্ধকতাসমূহ বছরের বেশকিছু সময় পরিব্যাপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় উক্ত সময় নির্ধারিত বছরের সাথে সংযোজিত হবে না-কি হবে না? প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে রয়েছে হায়েয, রমজানের রোযা ইত্যাদি।

হানাফী মাযহাব মতে, হায়েয ও রোযার দিনসমূহের বদলে স্বামীকে উক্ত সময় বাড়িয়ে দেয়া হবে না। কেননা, একবছর সাধারণত এসব অভ্যাস থেকে মুক্ত নয় জেনেও সাহাবায়ে কেরাম রা. সময়সীমা একবছর নির্ধারণ করেছেন।

আর স্বামী অথবা স্ত্রী যে কারো অসুস্থতা সহবাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তা ধর্তব্য হবে না। কেননা বছরতো কখনো তা থেকে মুক্তও হয়। এটি হানাফী

---

৩২. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৫৯।

৩৩. আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ১৮৮।

৩৪. আল-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০১; শারহুল বাহজাহ, খ. 8, পৃ. ১৬৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩১4; আল-মুগনী খ. ৭. পৃ. ৬০৫।

৩৫. আল-খারশী, খ. ৩, পৃ. ২8০।

৩৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩১৫।

www.amarboi.org

মাযহাবের অভিমত। আল-বাবরতী বলেন, এর উপরই মাশায়েখদের ফাতাওয়া। ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, অসুস্থতা অর্ধমাসেরও বেশি হলে অসুস্থতার সময়কাল বছরের মধ্যে হিসাব করা হবে না, চাই সে অসুস্থতা স্বামী বা স্ত্রী যারই হোক না কেন। তাই দ্বিতীয় বছরে স্বামীকে এর পরিবর্তে সময় দেয়া হবে। আর অসুস্থকাল অর্ধ মাসের কম হলে রমজান মাসের উপর কিয়াস করে সে সময় স্বামীকে দেয়া এক বছরের মধ্যেই গণ্য হবে। কেননা রমযান মাসের দিনে যৌন সহবাস নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তা নির্দিষ্ট বছরের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অর্ধমাস বা তার কম সময়ের জন্য কোনো বদলি বা বর্ধিত সময় দেয়া হবে না।[৩৭]

আবু ইউসুফ র.-এর অন্য একটি বর্ণনামতে, অসুস্থকাল কম হলেও তা বছরের মধ্যে গণ্য হবে না চাই তা একদিন হলেও (সুতরাং উক্ত পরিমাণ সময় স্বামীকে দ্বিতীয় বছর থেকে দেয়া হবে)।
ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, এক মাসের কম হলে তার পরিবর্তে সময় দেয়া হবে না। তবে একমাস হলে তার বদলে সময় দেয়া হবে।[৩৮]

হানাফীগণ আরো বলেন, স্ত্রী হজের ইহরাম বাধলে হজকালীন পরিবর্তে স্বামীকে সময় দেয়া হবে। কেননা সে স্ত্রীকে হজ সম্পন্ন করা থেকে বাধা দিতে পারে না। যদি স্বামী হজে থাকে তাহলে হজের সময়কাল তার জন্য বরাদ্দকৃত সময় থেকেই ধরা হবে। কেননা এটা তারই কাজ। তাই সে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতে পারে অথবা হজে যাওয়া পিছিয়ে দিতে পারে।[৩৯]

স্বামী স্ত্রীর সাথে জিহার করাকালীন অবস্থায় যদি স্ত্রী পুরুষত্বহীনতার অভিযোগে মামলা করে, তাহলে স্বামী জিহারের কাফ্ফারা-স্বরূপ দাসমুক্ত করতে সক্ষম হলে তার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে, যাতে সে তৎক্ষণাত তা শুরু করতে পারে। আর যদি স্বামী দাস মুক্ত করতে সক্ষম না হয় তাহলে নির্ধারিত সময় শুরুর আগে তাকে দুই মাস সময় দেয়া হবে। কেননা কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্বামী তার জিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে না। আর দাসমুক্ত করতে অক্ষমের কাফফারা হলো, দুই মাস রোযা রাখা। যদি এক বছরের নির্দিষ্ট সময়সীমা চলাকালে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে জিহার করে এবং কাফ্ফারাস্বরূপ দুই মাস রোযা রাখার সময় শরয়ী নিষেধাজ্ঞার কারণে সহবাস না করে, তাহলে তাকে ঐ দুই মাসের বদলি সময় দেয়া হবে না। কেননা সে স্ত্রীর সাথে জিহার না করতে পারত।

---

৩৭. আল-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০২, ১০৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩০৩।
৩৮. আল-ফাতাওয়া আল খানিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৪১০।
৩৯. ফাতহুল কাদীর খ. ৪, পৃ. ৩০৩; ফাতওয়া কাযী খান ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যার পাদটীকায় সংযুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১১।

www.amarboi.org

হজের মতো অনুরূপ বিধান হবে যে কোনো অনুপস্থিতি ও পলায়নের ক্ষেত্রেও।[৪০] মালেকীগণ বলেন, সময়সীমার ফয়সালা হওয়ার পর নপুংসক স্বামী যদি পুরো বছর বা বছরের কিছু সময় অসুস্থ থাকে আর এ অসুস্থতার মধ্যে সে চিকিৎসা করতে সক্ষম হোক বা না হোক, তার সময়সীমা এক বছরের বেশি বৃদ্ধি করা হবে না; বরং ঐ এক বছর তার জন্য বরাদ্দ থাকবে।[৪১]

শাফেয়ীগণ বলেন, পুরুষত্বহীনের স্ত্রী যদি তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে অথবা অসুস্থ থাকে অথবা পুরো সময়সীমায় বন্দি থাকে তাহলে এ সময়টি তার নির্ধারিত সময় হিসেবে গণ্য হবে না; বরং নতুন করে অন্য এক বছর শুরু করবে।[৪২]

হাম্বলীগণ বলেন, পুরুষত্বহীনতার কারণে যার জন্য একবছর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তার স্ত্রী যদি অবাধ্যতা বা অন্য কোনো কারণে তার কাছ থেকে দূরে থাকে. তবে সে সময় হিসেবে ধরা হবে না। কেননা এটা স্ত্রীর পক্ষ থেকে বাধা। কিন্তু যদি স্বামী নিজেই স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকে অথবা প্রয়োজন বা অন্য কারণে সফরে থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত সময় তার নির্ধারিত সময় থেকেই ধরা হবে।[৪৩]

**নির্ধারিত এক বছরের মধ্যে বা তারপরে সহবাস হওয়া সম্পর্কে মতভেদ**

পুরুষত্বহীন প্রমাণিত স্বামীর জন্য সময় নির্ধারণের পর যদি স্বামী-স্ত্রী সহবাস হওয়া নিয়ে মতভেদ করে, সে ক্ষেত্রে হানাফীগণ বলেন, সময়সীমা নির্ধারণ এবং একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা উভয়ে মতবিরোধ করলে স্ত্রী যদি কুমারী হয় তাহলে অন্যান্য মহিলারা তাকে যাচাই করে দেখবে (অথবা মেডিক্যাল পরীক্ষা করাবে)। তারা যদি রিপোর্ট দেয় যে, সে কুমারী তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বিবাহ বহাল রাখা বা বিচ্ছিন্ন করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। আর যদি তারা রিপোর্ট দেয় যে, সে অকুমারী তাহলে স্বামী শপথ করবে। স্বামী শপথ না করলে স্ত্রীকে এখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেয়া হবে। আর শপথ করলে বিবাহ বহাল থাকবে। আর যদি স্ত্রী প্রথম থেকেই অকুমারী হয় এবং সময়সীমা নির্ধারণের আগে বা পরে সহবাস সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে স্বামীর কথাই ধর্তব্য হবে। সে শপথ করলে বিবাহ বহাল থাকবে। আর শপথ থেকে বিরত থাকলে সময় দেয়া হবে এবং তারপর স্ত্রীকে এখতিয়ার প্রদান করা হবে।[৪৪]

মালেকীগণ বলেন, সময়সীমা নির্ধারণের পর যদি স্বামী সহবাসের দাবি করে এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে যদি সময়সীমার মধ্যে বা পরে দাবি করা

---

৪০. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৬০।
৪১. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ১, পৃ. ৪২৬।
৪২. রওদাতুত তালেবীন, খ. ৭, পৃ. ১৯৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, পৃ. ৬, খ. ৩১০।
৪৩. কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ১০৬, ১০৭।
৪৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১৩১।

www.amarboi.org

হয় যে, সে সময়সীমার মধ্যে সহবাস করেছে, তাহলে শপথসহ স্বামীর কথাই ধর্তব্য হবে। আর যদি সে শপথ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে স্ত্রী শপথ করবে এবং এক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণ করা হবে। কিন্তু স্ত্রীও যদি শপথ না করে তাহলে সে উক্ত স্বামীর স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে।[৪৫]

শাফেয়ীগণ বলেন, নির্দিষ্ট একবছর শেষ হওয়ার পর স্বামী যদি বলে, আমি সহবাস করেছি এবং স্ত্রী শপথ দাবি করলে সে যদি শপথ করে তাহলে শপথের সাথে তার কথা সত্য বলে ধরে নেয়া হবে। যদিও সহবাসের ওপর তার মজবুত প্রমাণ না থাকার কারণে সহবাস না হওয়াটাই বাস্তবতা। আর স্বাভাবিক হলো সুস্থ থাকা এবং বিবাহ স্থায়ী থাকা। এ বিধান হলো অকুমারির ক্ষেত্রে। আর স্ত্রী কুমারী হলে চারজন মহিলা যদি তার কুমারিত্বের সাক্ষ্য দেয়, তাহলে বাহ্যিক অবস্থার কারণে স্ত্রীর কথাই ধর্তব্য হবে। স্বামী যদি তা মানতে না চায় তাহলে স্ত্রী এ মর্মে শপথ করবে যে, স্বামী তার সাথে সহবাস করেনি। স্ত্রী এভাবে শপথ করলে অথবা স্বামী এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করলে স্ত্রীর বিবাহ বাতিল করার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে।[৪৬]

হাম্বলীগণ বলেন, পুরুষত্বহীনকে যখন একবছর সময় দেয়া হবে এবং উক্ত সময়সীমার মধ্যে সে সহবাসের দাবি করবে সেক্ষেত্রে স্ত্রী কুমারী হলে এবং বিশ্বস্ত কিছু মহিলা তার কুমারিত্ব অবশিষ্ট থাকার সাক্ষ্য দিলে স্ত্রীর কথাই ধর্তব্য হবে- এ ফয়সালা বাহ্যিক অবস্থার নিরীখে। আর যদি স্ত্রী অকুমারী হয় এবং পুরুষত্বহীনতা প্রমাণিত হওয়ার পর স্বামী সহবাসের দাবি করে, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করে; তাহলে স্ত্রীর কথাই ধর্তব্য। কেননা এখানে মূল হচ্ছে সহবাস না করা।[৪৭]

**যৌন অক্ষমতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ**

হানাফী মাযহাবের অনেক আলেম বলেন, যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্বামী সহবাস না করে এবং স্ত্রী বিবাহ বহাল রাখতে না চায়, তাহলে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বিচারক স্বামীকে আদেশ দিবেন। স্বামী তালাক দিতে অস্বীকার করলে বিচারক এই বলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবেন, 'আমি তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করলাম'। বিবাহ বহাল না রাখা এবং বিচ্ছেদের জন্য শুধু স্ত্রীর পছন্দই যথেষ্ট নয়। কেননা বিবাহ একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি এবং এক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার সংরক্ষিত। সুতরাং স্বামী বাতিল না করলে তা বাতিল হবে না। কিন্তু যখন তার ওপর 'বিধিমতো রেখে দেয়া অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়া'র বিধান বর্তেছে অথচ সে বিধিমতো রেখে দিতে অক্ষম। আর এ ক্ষেত্রে বিচারকও তার স্থলাভিষিক্ত হতে

৪৫. আদ-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ২৮২।
৪৬. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ২০৬-২০৭।
৪৭. কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ১০৮।

www.amarboi.org

পারে না, তাই স্ত্রীকে সদয়ভাবে আলাদা করে দেয়া স্বামীর উপরই ওয়াজিব। তবে স্বামী যখন তা করা থেকে বিরত থাকবে তখন বিচারক তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন। কেননা জুলুম প্রতিরোধের জন্যই তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাই বিচারক কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া সে বিচ্ছিন্ন হবে না। এ বিধান ইমাম আবু হানীফা র. থেকে হাসান র. বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বিবাহ বাতিল করার মধ্যে মতভেদ থাকায় কাজী বা বিচারকের আদেশ ছাড়া তা করা জায়েয হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যে, স্ত্রী যদি পৃথক হয়ে যেতে চায় তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে, স্বামী অথবা শরীয়ত কর্তৃক এখতিয়ারপ্রদত্ত মহিলার এখতিয়ার গ্রহণ করার ভিত্তিতে।[৪৮]

মালেকীগণের মতে, সময়সীমা নির্ধারণের পর স্বামী তা প্রত্যাখ্যান করলে স্ত্রী তালাক দাবি করতে পারে। এরপর বিচারক তালাক প্রদানের জন্য স্বামীকে আদেশ দিবেন। স্বামী দিলে তো ভালো, আর তালাক দিতে অস্বীকার করলে এক বর্ণনামতে বিচারক তার পক্ষে তালাক দিবেন। অন্য বর্ণনা মতে বিচারক স্ত্রীকে তালাক প্রদানের আদেশ দিবেন। তখন স্ত্রী তার স্বামীকে বলবে, আমি তোমার কাছ থেকে নিজেকে তালাক দিলাম। এভাবে তালাকে বায়েন কার্যকর হবে। স্ত্রী চাইলে এ অবস্থা সত্ত্বেও সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর সাথে সংসার করতে পারে। আর পরবর্তীকালে সন্তুষ্টির অভাব হলে তালাকও দাবি করতে পারে।[৪৯]

শাফেয়ীগণ বলেন, পুরুষত্বহীনের জন্য ধার্যকৃত বছর শেষ হওয়ার পর বিষয়টি বিচারকের কাছে মামলা দায়ের হলে স্বামী যদি বলে, আমি সহবাস করেছি, তাহলে তাকে শপথ করতে হবে। সে যদি শপথ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে স্ত্রী শপথ করবে। স্ত্রী শপথ করলে অথবা স্বামী স্বীকারোক্তি করলে স্ত্রী বিবাহ বাতিল করার স্বাধীনতা লাভ করবে, যেভাবে বিক্রিত পণ্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে ক্রেতা চুক্তি বাতিল করার স্বাধীনতা লাভ করে। বিচারকের একথা বলার দ্বারা বিবাহ বাতিল হবে যে, 'পুরুষত্বহীনতা প্রমাণিত হয়েছে' অথবা 'বাতিলের অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং বিবাহ বাতিলের ব্যাপারে তুমি স্বাধীন'। এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। আর কেউ কেউ বলেন, স্ত্রী বিবাহ বাতিলের স্বাধীনতা লাভ করবে না, তাকে বিবাহ বাতিলের জন্য বিচারকের অনুমতি নিতে হবে অথবা বিচারক নিজেই বাতিল করবে। কেননা বিষয়টি গভীর দৃষ্টি ও গবেষণার দাবি রাখে, তাই তিনি নিজে তা করবেন অথবা এ ব্যাপারে অনুমতি দিবেন।[৫০]

---

৪৮. আল-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা এর পাদটীকায় সংযুক্ত আল-ফাতওয়া আল-বায্যাযিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৪১১।

৪৯. আদ্-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ২৮২, ২৮৩।

৫০. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০৭।

www.amarboi.org

হাম্বলীগণ বলেন, পুরুষত্বহীনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে এবং সে উক্ত সময়ের মধ্যে সহবাস না করলে স্ত্রী এখতিয়ার তথা গ্রহণ বাতিলের স্বাধীনতা লাভ করবে। অতঃপর সে বিবাহ বাতিল করতে চাইলে বিচারকের আদেশ ছাড়া তা জায়েয হবে না। কেননা বিষয়টি বিতর্কিত। তাই বিচারক হয় নিজে বাতিল করবেন অথবা তাকে বাতিলের ক্ষমতা দেয়ার পর সে বাতিল করবে। আর স্ত্রী বিবাহ বাতিল করতে না চাইলে এবং বাতিলের দাবি না করলে বিবাহ বাতিল হবে না। কারণ এটি তার অধিকার। সুতরাং তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না।[৫১]

**যৌন অক্ষমতার কারণে বিবাহবিচ্ছেদ বাতিল বলে গণ্য হবে না-কি তালাক?**

হানাফী ও মালেকীগণের মতে, পুরুষের যৌন অক্ষমতাজনিত বিচ্ছেদ তালাক হিসেবে গণ্য।

হানাফীগণ বলেন, স্বামীর ওপর অধিকার হচ্ছে দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি : হয় 'বিধিমতো' রেখে দেবে 'নতুবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে'। অতঃপর সে যখন দু'টির একটি তথা বিধিমতো রেখে দিতে অক্ষম তখন দ্বিতীয়টিই নির্ধারিত হবে; অর্থাৎ সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। আর স্বামী যখন সে মুক্ত করে দেয়া থেকে বিরত থাকবে তখন বিচারক সেক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করবে। আর সে মুক্ত করে দেয়া হলো তালাক। আর এজন্যও যে, হযরত উমর রা. একে এক তালাকে বায়েনরূপে গণ্য করেছেন। তালাকে বায়েন এজন্য যে, তালাকে রাজয়ী দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। কারণ এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো, স্ত্রীর ওপর থেকে জুলুম দূর করা। আর তালাক যদি রাজঈ হয় তাহলে স্বামী তাকে জোরপূর্বক ফিরিয়ে এনে জুলুম অব্যাহত রাখবে। এছাড়া প্রকৃত সহবাসের পর ইদ্দত পালনের ক্ষেত্র ছাড়া কোনো তালাক রাজয়ী বা প্রত্যাবর্তনযোগ্য হয় না। কিন্তু এখানে তা অনুপস্থিত।[৫২] এছাড়া হানাফী মাযহাব মতে শুদ্ধ, পরিপূর্ণ, কার্যকর ও যথোচিত বিবাহ কখনো বাতিল হয় না।[৫৩]

মালেকীগণ বলেন, বিচ্ছেদ তালাকরূপে গণ্য হবে। কেননা সে স্বামীর সাথে থাকতে চাইলে থাকতে পারত এবং বিবাহটি ছিল শুদ্ধ। অতঃপর যখন সে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছে তখন তা তালাকই হয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা পরস্পরের ওয়ারিশ ছিল।[৫৪] তাই স্ত্রী পৃথক হতে চাইলে তালাক প্রদানের জন্য বিচারক স্বামীকে আদেশ দিবেন।

৫১. আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৭, পৃ. ৬০৫।

৫২. আল-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০২; আল ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৫৯; মুখতাসারুত তাহাবী, পৃ. ১৮৩।

৫৩. ফাতহুল কাদীর এর পাদটীকায় সংযুক্ত আল-ইনায়া খ. ৪, পৃ. ৩০০।

৫৪. আল-মুদাওয়ানা, খ. ২, পৃ. ২৬৫।

www.amarboi.org

স্বামী তা করতে অস্বীকার করলে বিচারক তালাকে বায়েন প্রদান করবেন অথবা স্ত্রীকে তালাক কার্যকর করার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর সে তা কার্যকর করার পর এ ব্যাপারে তিনি রায় দিবেন। তখন স্ত্রী যা কার্যকর করেছে সে ব্যাপারে বিচারকের রায় বায়েন এ পরিণত হবে।

শাফেয়ীগণের বিশুদ্ধতম মত ও হাম্বলীগণের মতে, পুরুষত্বহীনতাজনিত বিচ্ছেদ ফাস্‌খ বা বাতিলকরণ হিসেবে গণ্য হবে, তালাক হিসেবে নয়।[৫৫]

## দু'বছরের আগে সন্তান জন্মদান

হানাফীগণ বলেন, বিচারক পুরুষত্বহীন স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর সময় যদি সে বলে, আমি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। অতঃপর বিচ্ছেদের দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই স্ত্রী সন্তান জন্মদান করলে স্বামীর থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ সে বাস্তবেই সহবাস করেছিল বলে ধরা হবে এবং বিচারক কর্তৃক বিচ্ছেদের রায় বাতিল হয়ে যাবে।[৫৬]

## বিচ্ছেদের আগে স্ত্রীর স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য

হানাফীগণ বলেন, যদি বিচ্ছেদের পর দু'জন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, বিচ্ছেদের আগে স্ত্রী স্বীকারোক্তি করেছিল যে, স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে। এমতাবস্থায় বিচারক কর্তৃক তাদের বিচ্ছেদ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু বিচ্ছেদের পর সে যদি স্বীকারোক্তি করে যে, বিচ্ছেদের আগে স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে, তাহলে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে না। কেননা সে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত।[৫৭]

## স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বহাল রাখার এখতিয়ার গ্রহণ করা

হানাফীগণ বলেন, স্ত্রী তার স্বামীর বর্তমান অবস্থা জেনেও যদি সুস্পষ্টভাবে স্বামীকে গ্রহণ করে তাহলে পরবর্তীকালে তার আর কোনো এখতিয়ার থাকবে না। এ বিধান হলো যখন সে এখতিয়ার গ্রহণ করার পূর্বেই উক্ত মজলিস থেকে উঠে যাবে। অথবা বিচারকের লোকজন তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেবে। অথবা বিচারক নিজে সেখান থেকে উঠে যাবে। কারণ তার এখতিয়ার গ্রহণ করা উক্ত মজলিসের সাথেই নির্ধারিত। যেমনিভাবে স্ত্রীকে গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার স্বামীর জন্য উক্ত মজলিসের সাথে নির্ধারিত।[৫৮]

---

৫৫. হাশিয়াতুল কালয়ূবী ওয়া 'উমায়রাহ, খ. ৩, পৃ. ২৬১; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১৮৫, কায়রো সংস্করণ।

৫৬. আল-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০৪।

৫৭. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৪; আল-বাবারতী, ফাতহুল-কাদীর-এর পাদটীকা, খ. ৪, পৃ. ৩০০।

৫৮. আল মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০৪।

১৪—

www.amarboi.org

মালেকীগণ বলেন, স্ত্রী যদি তার জন্য ধার্যকৃত এক বছর পার হওয়ার পরও চিন্তা ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় অথবা সাধারণভাবে অনির্দিষ্ট কিছুকাল স্বামীর সাথে সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করতে চায়, তবে সে তা করতে পারে। অতঃপর সে চাইলে এ সম্মতি থেকে ফিরে আসতে পারে এবং এ জন্য দ্বিতীয়বার সময়সীমা নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন নেই। স্বামীর সাথে অবস্থানের সম্মতি দেয়ার পর সে বিচ্ছেদও ঘটাতে পারে। ইবনুল কাসেম বলেন, স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে স্থায়ীভাবে বসবাসের সম্মতি দেয় এরপর বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তবে তার এ অধিকার নেই।[৫৯]

শাফেয়ীগণ বলেন, এক বছরের নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার এবং বিচারক কর্তৃক এখতিয়ার প্রদানের পর স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে বসবাস করতে চায় তাহলে সে তা পারবে। তবে পরবর্তীকালে তার এখতিয়ার গ্রহণের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে তার বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ত্যাগ করেছে। কিন্তু মুদ্দত বা সময়সীমার মধ্যে অথবা তা নির্ধারণের আগে এরূপ সম্মতিদান করলে তার সে অধিকার বাতিল হবে না; বরং সময়সীমার পর সে বিবাহ বাতিল করতে পারবে। কেননা পুরুষত্বহীনতা প্রমাণিত হওয়ার আগে সে তার অধিকার ত্যাগের সম্মতি দিয়েছিল। সুতরাং তার অধিকার রহিত হবে না, যেমনটি বিক্রয়ের আগে শুফআ' মার্জনা করলে তার অধিকার রহিত হয় না।[৬০]

হাম্বলীদের অভিমত হচ্ছে, স্ত্রী যে কোনো সময়ই যদি বলে, "পুরুষত্বহীনতা সহই আমি তার সাথে বসবাসে সম্মত আছি" তাহলে সে পরবর্তীকালে তা বাতিলের দাবি করতে পারবে না। কেননা সে তার উক্ত অধিকার নিজেই ত্যাগ করেছে।[৬১]

## মুদ্দতের পর এখতিয়ার-এর সময়কাল

জমহুরের মতে এখতিয়ারের সময়কাল শিথিলযোগ্য। অর্থাৎ বিচারকের নিকট বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে উত্থাপন করা জরুরী নয়। সুতরাং সময়মতো উত্থাপন না করলে স্ত্রীর অধিকার বাতিল হবে না।[৬২]

বিবাহের পর তার চুপ থাকাটা স্বামীর যৌন অক্ষমতার ওপর তার সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। কেননা বিচারকের নিকট উত্থাপনের আগে সে বিবাহ বাতিল করার অধিকারী হয় না এবং স্বামীকে ভোগ করতে বাধা দেয়ার অধিকারীও হয় না।[৬৩] ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার অধিকার তার রয়েছে।[৬৪]

---

৫৯. আশ-শারহুস সগীর, খ. ১, পৃ. ৪২৪।
৬০. আল-উম্ম খ. ৫, পৃ. ৪০।
৬১. কাশ্‌শাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ১০৭।
৬২. আস-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০২।
৬৩. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬০৮।
৬৪. মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৯।

www.amarboi.org

সুতরাং সহবাসের পর স্বামীর যৌন অক্ষমতার কথা জেনেও সে যদি মামলা করা থেকে চুপ থাকে এবং পরে গিয়ে সে মামলা দায়ের করে তবে সে অধিকার তার রয়েছে।[৬৫] যেমনিভাবে মুদ্দত বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর মামলা দায়ের করতে দেরি করলেও তার অধিকার রহিত হবে না। কারণ এটা স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে যাচাই করা, তার প্রতি সন্তুষ্টি নয়। সাধারণত মানুষের পক্ষে ঠিক সময়মতো মামলা দায়ের করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষত এ জাতীয় অবস্থায়। এমনকি এ দিনসমূহে সে তার স্বামীকে শয্যাসঙ্গী হিসেবে মেনে নিলেও।[৬৬] আর বিচারকের নিকট উত্থাপন ও স্বামীর অক্ষমতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য এখতিয়ার সাব্যস্ত হয় না। তাই এর আগে তার চুপ থাকাতে কোনো ক্ষতি নেই।[৬৭] ধার্যকৃত এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্ত্রী একটা সময়কাল বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখতে সম্মত হওয়ার পর আবার সে সম্মতি থেকে ফিরে আসতে চাইলে তা তার জন্য বৈধ। এজন্য পুনরায় সময় ধার্য করার প্রয়োজন নেই।[৬৮] হাম্বলী মাযহাবের একটি মত অনুযায়ী, এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীর পদক্ষেপ হতে হবে তাৎক্ষণিক।[৬৯]

শাফেয়ীগণ বলেন, বিবাহের অন্যান্য ক্রটির মতো পুরুষত্বহীনতাজনিত ক্রটির কারণে স্ত্রীর এখতিয়ার হবে তাৎক্ষণিক। যেমন– ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রটির এখতিয়ার। শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ আলেম এ মত পোষণ করেন এবং এটিই উক্ত মাযহাবের অভিমত। আল-কাফ্ফাল বলেন, যদি এখতিয়ার তাৎক্ষণিক না হয়ে প্রলম্বিত হয় তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে কিনা স্বামী-স্ত্রী তা জানতে পারবে না। ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হবে না এবং স্ত্রীর অবস্থা হয়ে যাবে অবিবাহিতের মতো।[৭০] আর তাৎক্ষণিক এখতিয়ারের অর্থ হলো, স্ত্রীর নিকট যৌন অক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার পর বিবাহ বাতিলের জন্য বিচারকের নিকট দ্রুত তা উত্থাপন করা।[৭১]

## বিবাহের আগে পুরুষত্বহীনতা সম্পর্কে জানার বিধান

হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীগণের মতে, কোনো ব্যক্তি নারীর সাথে সহবাসে অক্ষম বা পুরুষত্বহীন জেনেও কোনো মহিলা তাকে বিবাহ করলে তার মামলা

---

৬৫. কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ১০৭।
৬৬. আল-ফাতাওয়া আল-খানিয়্যা খ. ১, পৃ. ৪১১।
৬৭. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬০৮।
৬৮. আল-খারশী খ. ৩, পৃ. ২৪১, আল ফাতাওয়া আল-খানিয়্যা খ. ১, পৃ. ৪১১।
৬৯. আল-ইনসাফ খ. ৮, পৃ. ২০৪।
৭০. আল কালয়ুবী খ. ৩, পৃ. ২৬৩।
৭১. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ২০৪; নিহায়াতুল মুহতাজ খ. ৬, পৃ. ৩১২।

www.amarboi.org

করার অধিকার ও এখতিয়ারের অধিকার থাকবে না। যেমন– ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের সময় তার দোষ সম্পর্কে অবহিত থাকলে তার এখতিয়ার থাকে না। সুতরাং মহিলা তার এ অবস্থা জানা সত্ত্বেও যখন বিবাহবন্ধনের জন্য অগ্রসর হয়েছে, তখন বুঝা যায় যে, সে তার প্রতি সন্তুষ্ট।[৭২] শাফেয়ীগণ বলেন, যদি বিবাহের আগে স্ত্রী পুরুষত্বহীনতা সম্পর্কে জানতে পারে, অতঃপর তাকে বিবাহ করতে সম্মত হয় তবে তার এখতিয়ারের অধিকার বাতিল হবে না। কেননা তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সে তার অধিকার বাতিলের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। সুতরাং তার অধিকার বাতিল হবে না।[৭৩]

**পুরুষত্বহীনতার পূর্বে সহবাসের বিধান**

স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে একবারও সহবাস করে, এরপর যৌন অক্ষম হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর সময়প্রদান অথবা এখতিয়ারের অধিকার থাকবে না। এমনকি স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় এবং পুনরায় ফিরিয়ে আনে তাহলেও না।[৭৪] ইবনে কুদামা বলেন, অধিকাংশ আলেম এ মত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে আ'তা, তাউস, হাসান, ইয়াহয়া আল আনসারী, যুহরী, 'আমর ইবনে দীনার, কাতাদাহ, মালেক, আওযায়ী, ইমাম শাফেয়ী, হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এবং আবু উবাইদ র. অন্যতম।[৭৫]

এ অবস্থায় পুরুষত্বহীনতার বিধান না হওয়ার কারণ হলো, স্ত্রী সহবাসের বিনিময়ে তার বিবাহের যা উদ্দেশ্য তা হাসিল করেছে, যেমন মোহর প্রাপ্য হওয়া, সধবার গুণ অর্জন করা। আর সে তার স্বামীর সহবাসের সক্ষমতা জেনেছে। এখন উপভোগ ছাড়া কিছু বাকি নেই, আর তা হলো কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, যার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা যায় না। তবে যৌন অক্ষমতা দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তো রয়েছে।[৭৬]

আবু ছাওর বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতপর যৌন অক্ষমতা দেখা দেয় তখন তার জন্য সময়সীমা ধার্য করা হবে।[৭৭]

---

৭২. আল-ফাতাওয়া আল-খানিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৪১০; আল মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ১০৪; আশ-শারহুস সগীর, খ. ১, পৃ. ৪২২; কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ১০৭।

৭৩. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ২০৩-২১৭।

৭৪. কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ১১১।

৭৫. আল-উম্ম খ. ৫, পৃ. ৪০; আল-মুদাওওয়ানা, খ. ২, পৃ. ২৬৫; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ১৬০; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১০।

৭৬. আল-কালয়ুবী খ. ৩, পৃ. ২৬২-২৬৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০৩-২০৪।

৭৭. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১০।

www.amarboi.org

### যে সহবাসের ফলে সময় প্রদানের এখতিয়ার থাকে না

সময় প্রদানের এখতিয়ার না থাকার জন্য যে সহবাস প্রয়োজন তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ যোনিতে প্রবেশ করা এবং তা অদৃশ্য হওয়া। এ জাতীয় সহবাসের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সহবাসের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন সতীত্ব নির্ধারণ এবং প্রথম স্বামীর জন্য বৈধকরণ[৭৮] কর্তিত না হলে তার লিঙ্গের অগ্রভাগ ধর্তব্য হবে, যদিও তা ছোট অথবা বড় বিবেচনায় স্বাভাবিক সাইজের না হয়। আর কর্তিত লিঙ্গ অনুরূপ পরিমাণ হলে সেটিও মূল্যায়িত হবে। তা একবার মাত্র প্রবেশ করলে এবং আঙ্গুল বা এ জাতীয় কিছুর সাহায্যে প্রবেশ করালেও তা সহবাস হিসেবে পরিগণিত হবে।[৭৯]

অনুরূপভাবে স্ত্রী হায়েজ, ইহরাম বা রোযা অবস্থায় থাকলে অথবা স্বামী নিজে ইহরাম বা রোযা অবস্থায় কৃত সহবাসও গণ্য করা হবে। কেননা হারাম হওয়া এক জিনিস এবং সময় প্রদানে প্রতিবন্ধক হওয়া আরেক জিনিস।[৮০]

গুহ্যদ্বার দিয়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে তা সময় প্রদানে বাধা হবে না। কেননা সেটি সহবাস হিসেবে প্রচলিত নয়[৮১] এবং তার সাথে সহবাসের কোনো বিধান সংশ্লিষ্ট নয়।[৮২] যেমন সধবা হওয়া, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়া। তবে ইবনে আকীল বলেন, গুহ্যদ্বার দিয়ে সহবাস পুরুষত্বহীনতার অভিযোগ খণ্ডন করবে। কেননা তা তুলনামূলকভাবে কঠিন। তাই যে এক্ষেত্রে সক্ষম সে অন্যক্ষেত্রে তো আরো বেশি সক্ষম।[৮৩]
হাম্বলীগণের মতে, পুরুষাঙ্গ সবটুকু প্রবেশ করানো শর্ত।[৮৪]

### পুরুষত্বহীনের স্ত্রীর মোহর

হানাফীগণের মতে পুরুষত্বহীনের স্ত্রী পুরো মোহর পাবে।[৮৫]

হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সে তার নির্ধারিত মোহর পাবে। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে, সে 'মোহরে মিসিল' পাবে। পুরুষত্বহীন ব্যক্তির

---

৭৮. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১১-৬১২।
৭৯. আল-কালয়ুবী, খ. ৩, পৃ. ২৬৩।
৮০. আল-উম্ম, খ. ৫, পৃ. ৪০।
৮১. প্রাগুক্ত।
৮২. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬১১, ৬১২।
৮৩. প্রাগুক্ত।
৮৪. আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ১৮৯।
৮৫. মুখতাসারুত তাহাবী, পৃ. ১৮৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১৩০।

www.amarboi.org

সাথে নির্জনবাস অন্যান্য স্বামীর সাথে নির্জনবাসের মতোই, যদ্দারা মোহর ওয়াজিব হয়ে যায়।[৮৬]

মালেকী মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর সে পুরো মোহর পাবে। কেননা সে নিজকে স্বামীর কাছে সপে দিয়েছে এবং তার সাথে দীর্ঘসময় অবস্থান করেছে আর স্বামী তাকে উপভোগ করেছে এবং তার যৌবন ক্ষয় করেছে।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, যে স্ত্রীকে তার স্বামী ভোগ করেছে সে যদি বলে, স্বামী আমার সাথে সঙ্গম করেনি তাহলে সে মোহরের অর্ধেক পাবে। কেননা সঙ্গমের আগেই সে স্বামী থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।[৮৭]

## পুরুষত্বহীনের স্ত্রীর ইদ্দত

হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, পুরুষত্বহীন ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব।[৮৮] অনুরূপভাবে সতর্কতামূলকভাবে মালেকী মাযহাবেও তা ওয়াজিব।[৮৯] স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না; ইদ্দতের মধ্যেও না, তার পরেও না।

শাফেয়ীগণের মতে, সহবাস না হলে তার ওপর ইদ্দত আবশ্যক হবে না।[৯০]

–নাজমুল হুদা সোহেল

---

৮৬. আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ২১২।

৮৭. আল-উম্ম, খ. ৫, পৃ. ৪১।

৮৮. মুখতাসারুত তাহাবী, পৃ. ১৮৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১৩০; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৮০, দারুল ফিকর সংস্করণ।

৮৯. আল-মুদাওওয়ানা, খ. ২, পৃ. ২৬৫।

৯০. আল-উম্ম, খ. ৫, পৃ. ৪১।

www.amarboi.org

# তালাক (طَلاَقٌ)

**সংজ্ঞা :** তালাক শব্দের আভিধানিক অর্থ : খুলে যাওয়া, বন্ধন মুক্ত হওয়া। শব্দটি বিশেষ্য, এর ক্রিয়ামূল তাতলীক (التَّطْلِيْقُ)। তবে তার প্রয়োগ হলো মাসদারের (ক্রিয়ামূল) ন্যায়। মহিলাকে তালাক দেয়া হয়েছে বুঝাতে طَلُقَتْ ও تَطْلُقُ শব্দের প্রয়োগ হয়। তালাক শব্দের মূলে রয়েছে এ দু'টি ক্রিয়া। স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তালিক (طَالِقٌ) বলা হয়, শেষে هاء যোগে তালিকাতুন (طَالِقَةٌ) বলা যায়। ইতলাক (الْإِطْلاَقُ) শব্দটি তালাক শব্দের সমার্থক। তালাক প্রদানে طَلَّقْتُ ও أَطْلَقْتُ একই অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ আমি মুক্ত করে দিলাম। কেউ কেউ মনে করেন, মহিলাকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়ার ক্ষেত্রে তালাক আর অন্যকে মুক্ত করে দেয়ার ক্ষেত্রে ইতলাক শব্দের প্রয়োগ হয়। ফলে তালাক প্রদানে طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ এবং বন্দিকে মুক্ত করে দেয়ার ক্ষেত্রে أَطْلَقْتُ الأَسِيرَ বলতে হবে। ফুকাহায়ে কিরাম এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন, তালাক শব্দ প্রয়োগে মহিলাকে বন্ধন মুক্ত করে দিলে এর দ্বারা স্পষ্ট তালাক (طلاق صريح) বুঝাবে। আর ইতলাক শব্দ দ্বারা তালাক দিলে ইঙ্গিতমূলক তালাক (كنايه طلاق) বুঝাবে। طَالِق শব্দের বহুবচন হয় طُلَّقٌ এবং طَالِقَةٌ শব্দের বহুবচন طَوَالِق স্বামী যখন বহু তালাক প্রদান করে তখন তাকে مِطْلاَق (মিতলাক), مِطْلِيق (মিতলীক) ও طَلَقَةٌ (তালাকাহ্) বলা হয়।[১]

ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় তালাক হলো, বিশেষ শব্দ কিংবা তার স্থলবর্তী কিছু শব্দ দ্বারা বিবাহের শৃঙ্খলকে তাৎক্ষণিকভাবে কিংবা ফলশ্রুতিতে মুক্ত করে দেয়া। বিবাহ বলতে এখানে বৈধ বিবাহ বুঝাবে।[২] বিবাহ যদি ফাসিদ হয়ে থাকে তা থেকে শৃঙ্খল মুক্তকরণকে তালাক বলা শুদ্ধ হবে না। সেক্ষেত্রে পরস্পর বর্জন কিংবা বিচ্ছিন্নকরণ (فَسْخٌ) বলা যেতে পারে।

তালাক মূলত স্বামীর একক অধিকার। স্বামী যদি কাউকে তালাক প্রদানের জন্য নিয়োগ করে সেক্ষেত্রে অন্য কেউ তার স্থলাভিষিক্তি হতে পারে। যেমন–উকীল

---

১. আল-মিসবাহুল মুনীর, মুখতারুস সিহাহ, আল-মুগরিব, আল কামূস ও আদ্-দুররুল মুখতার খ. ৩, পৃ. ২২৬।

২. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২২৬-২২৭; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৪৭, মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৯।

www.amarboi.org

নিয়োগ বা ক্ষমতা অর্পণের (Authorisation) মাধ্যমে হয়ে থাকে। স্বামী কর্তৃক নিয়োগদান না করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচারক তালাকদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আত-তাহযীবের উদ্ধৃতি দিয়ে শারবীনি তালাকের সংজ্ঞায় বলেন– تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلاَ سَبَبٍ ، فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ
(নিজ স্ত্রীর ক্ষেত্রে) স্বামীর অধিকার কোনো মাধ্যম ছাড়া প্রয়োগ করা, যার ফলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।[৩]

**সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ**

**الفَسْخُ (আল-ফাসখ)** : الفَسْخُ -এর শাব্দিক অর্থ ছিন্নকরণ ও দূরীকরণ। পারিভাষায় আক্‌দের বন্ধন খুলে দেওয়া। এর ফলে আকদের কারণে যে সকল সুযোগ-সুবিধা হয় এবং বিধিবিধানের উৎপত্তি হয় তা রহিত হয়ে যায়। এ অর্থে الفَسْخُ (ফাস্খ) শব্দটি তালাকের নিকটতম শব্দ। তবে দু'টি শব্দের মাঝে পার্থক্য হলো الفَسْخُ শব্দটির দ্বারা আকদভঙ্গ হয় যার ফলে তার দ্বারা সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধাও রহিত হয়। পক্ষান্তরে তালাক এর দ্বারা আকদ বা চুক্তি ভঙ্গ হয় না, বরং সুবিধাসমূহ কেবল রহিত হয়।

**(المُتَارَكَةُ) আল মুতারাকা :**

আল-মুতারাকার শাব্দিক অর্থ সাধারণত প্রস্থান ও বিচ্ছেদ। অতঃপর তা রহিতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। অধিকার ত্যাগ করা বুঝাতে বলা হয়। تَرَكَ حَقَّهُ[৪]

পারিভাষিক অর্থ : ফাসিদ আকদের মাধ্যমে যে মহিলাকে বিবাহ করা হয় তাকে মিলনের পূর্বে কিংবা পরে ত্যাগ করাকে 'মুতারাকা' বলে। অধিকাংশ ফকীহ্-এর মতে মিলনের পর মৌখিক উক্তি ছাড়া ত্যাগ করা যায় না। যেমন– মহিলার উদ্দেশ্যে বলা– خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ আমি তোমায় পথ উন্মুক্ত করে দিলাম। অথবা تَرَكْتُكِ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করলাম। তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, মিলনের পূর্বেও কথার মাধ্যমে বর্জন করতে হয়।

'আল মুতারাকা' শব্দটি এক দিক থেকে আত-তালাক এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর এক দিক থেকে তার বিপরীত। সামঞ্জস্যশীল এ দিক দিয়ে যে, এর দ্বারা বিবাহের সুবিধাসমূহকে অস্বীকার করা হয় এবং তা কেবল পুরুষের অধিকার। আর বিপরীত এদিক দিয়ে যে, তা কেবল পুরুষের ওপর বর্তায় না। তা আকদে ফাসিদ ও সন্দেহযুক্ত মিলনের সাথেই কেবল সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে তালাক কেবল শরীয়তসম্মত আকদের সাথে সংশ্লিষ্ট ।[৫]

---

৩. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৯।
৪. আল-মিসবাহুল মুনীর ও মুখতারুস-সিহাহ।
৫. ইবনে আবিদীন আলাদ দুররিল মুখতার খ. ৩, পৃ. ১৩৪।

www.amarboi.org

(اَلْخُلْعُ) **আল খুলা**

খুলা শব্দের আভিধানিক অর্থ : উপড়ানো। স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে স্বামী থেকে পৃথক হলে এবং উক্ত বিনিময়ের বদলে স্বামী তালাক প্রদান করলে আরবীতে বলা হয় : – خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مُخَالَعَةً وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ

শব্দটির মাসদার হলো আল-খাল'উ এবং বিশেষ্য হলো আল খুলাউ।[৬]

**পারিভাষিক অর্থ :** স্ত্রী বা অন্য কেউ স্বামীকে কোনো বিনিময় প্রদান করায় খুলা শব্দ অথবা তার সমার্থক কোনো শব্দ দিয়ে বিবাহের অধিকার বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।[৭]

হানাফীগণের গ্রহণযোগ্য অভিমত, মালেকীগণের অভিমত, শাফেয়ী মাযহাবের নতুন অভিমত এবং হাম্বলীগণের এক অভিমত মতে খুলা হলো তালাক। ইমাম শাফেয়ীর প্রাচীন অভিমত এবং ইমাম আহমদ র.-এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী খুলা হলো কেবল (فَسْخٌ) বিচ্ছিন্ন হওয়া।[৮]

(اَلتَّفْرِيْقُ) **আত-তাফরীক**

আত-তাফরীক-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ : এটি فَرَّقَ -এর মাসদার। এর তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়া হলো فَرَقَ । বলা হয়– فَرَقْتُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ আমি হক ও বাতিলের মাঝে পৃথক করে দিয়েছি। অনুরূপ– فَرَقْتُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ 'আমি দু'টি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছি। এ অর্থ কেবল তাশদীদবিহীন অদৃশ্যমান বস্তুর ক্ষেত্রে। আর তাশদীদযুক্ত হলে তা দৃশ্যমান জিনিসের বেলায় ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– فَرَّقْتُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ আমি দু'টি গোলামের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিয়েছি। এটি ইবনুল আরাবী ও আল-খাত্তাবী প্রমুখের অভিমত। কিন্তু অন্যান্যরা বলেন, তাশদীদযোগে ও তাশদীদবিহীন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে তাশদীদ দ্বারা জোরদার বুঝায়।[৯]

ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় তাফরীক হলো, কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজনের আবেদনের ভিত্তিতে কাজী কর্তৃক উভয়ের মাঝে দাম্পত্যের বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া। যেমন মনোমালিন্য, কোনো ক্ষতির আশঙ্কা কিংবা খোরপোষ

---

৬. আল-মিসবাহুল মুনীর, মুখতারুস সিহাহ ও আল-মুগরিব।

৭. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৮৬০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ.৭২; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ১৮২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৬২; আদ-দাসূকী, আলাশ-শারহিল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৪৭।

৮. বাদায়েউস সানায়ে' খ. ৩, পৃ. ১৫২; আদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫১; বিদায়াতুল মুজতাহিদ খ. ২, পৃ. ৭৫; আল-মুগনী মা'আশ শারহিল' কাবীর, খ. ৮, পৃ. ১৮০; আল ইকনা', খ. ৩, পৃ. ৫৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬৮; রাওদাতুত্ তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৭৫।

৯. আল-মিসবাহুল মুনীর, মুখতারুস সিহাহ ও আল-মুগরিব।

www.amarboi.org

না দেয়ার কারণে তাদের একজনের আবেদনের ভিত্তিতে হতে পারে। অথবা কারও আবেদন ছাড়াও শরীয়তের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজী উভয়কে বিচ্ছিন্নকরে দিতে পারেন। যেমন স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজন যদি মুরতাদ হয়ে যায়।

কাজী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া কোনো কোনো অবস্থাতে বায়েন তালাক হিসেবে পরিগণিত হয়, আবার কোনো কোনো অবস্থাতে শুধু বিবাহ ভঙ্গ করে দেয়া বুঝায়। আবার কোনো কোনো অবস্থায় রাজয়ী তালাক হিসেবে গণ্য হয়।[১০]

**(الإيلاء) আল-ঈলা**

ঈলার শাব্দিক অর্থ হলো শপথ করা, آلى يؤلي إيلاء হতে শব্দটি গৃহীত বহুবচন আলায়া (ألايا) [১১]

পারিভাষিক অর্থ : নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত স্ত্রীর নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য স্বামী কর্তৃক শপথ করা।[১২]

মেয়াদটি আল-কুরআনুল কারীম চারমাস নির্ধারণ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো– لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে"।[১৩]

অতঃপর স্ত্রীর নিকট গমন না করা অবস্থায় চারমাস অতিক্রান্ত হলে হানাফী মাযহাব মতে একটি বায়েন তালাক ধর্তব্য হবে। মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মতে মহিলাটি এর ফলে স্বামী হতে তালাক লাভের অধিকারী হবে। ফলে স্ত্রী আদালতে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উত্থাপন করবে। আদালত স্বামীকে স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া বা না হওয়ার অধিকার দিবে।

যদি স্বামী স্ত্রীর নিকট গমন করে তাহলে ঈলা প্রত্যাহার হয়ে যাবে আর অস্বীকৃতি জানালে কাজী তাদেরকে একটি তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।[১৪]

**(اللعان) আল-লিআন**

লিআন শব্দটি اللعن ক্রিয়ামূল হতে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ কল্যাণ হতে হটিয়ে দেয়া এবং দূরে সরিয়ে রাখা, গালি দেয়া। আরবীতে এর প্রয়োগ এরূপ পাওয়া যায় : لعنه لعنا ، ولاعنه ملاعنة ، ولعانا ، وتلاعنوا একে অন্যকে অভিশাপ ও গালি দিলে এরূপ বলা হয়।[১৫]

---

১০. ইবনে আবিদীন খ. ২, পৃ. ৩৯৬; আয-যারকানী, খ, ৫, পৃ. ২৪২।

১১. আল-মিসবাহুল মুনীর, মুখতারুস সিহাহ, আল-মুগরিব।

১২. আল-লুবাবু আলাল কুদূরী, খণ্ড ২; পৃ. ২৪০, আদ-দুররুল মুখতার খ. ২, পৃ. ২৪৫; প্রথম সংস্করণ।

১৩. সূরা আল বাকারা : ২২৬।

১৪. আল-মুত্তাকী, খ, ৭, পৃ. ৪৯৮; ও মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৪৮।

১৫. আল-মিসবাহুল মুনীর ও মুখতারুস সিহাহ।

www.amarboi.org

ফকীহগণের পরিভাষায় : কামাল ইবনুল হুমাম এর সংজ্ঞায় বলেন, স্বামী স্ত্রীর মাঝে নির্ধারিত শব্দমালার সাহায্যে যে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তার নাম হলো লিআন।[১৬]

নামকরণ : যেহেতু স্বামীর শপথের মাঝে লানত শব্দটি রয়েছে–

إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ অর্থাৎ, আল্লাহর লানত তার ওপর নাযিল হোক যদি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই এ শপথকে লিআন নামকরণ করা হয়েছে। লা'নাতের এ শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার বাণী হতে গৃহীত–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

"যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক"।[১৭]

লিআনের পর লিআনকারী স্বামী স্ত্রীর মাঝে চিরকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে তালাকের মাধ্যমে চিরকালীন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয় না।

## (الظِّهَار) জিহার

জিহার হলো স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বলা : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي 'তুমি আমার ওপর আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ স্বরূপ' (অর্থাৎ আমার জন্য হারাম)। আরবদের কাছে এটি ছিল এক ধরনের তালাক।[১৮]

পারিভাষিক অর্থ : মুসলিম স্বামী কর্তৃক নিজ স্ত্রীকে কিংবা তার উল্লেখযোগ্য কোনো অঙ্গকে নিজের জন্য চিরতরে হারাম এমন কোনো মহিলার সাথে উপমা দেয়া।[১৯] যেমন : নিজের মাতা ও বোন। তবে অন্যের স্ত্রীর সাথে উপমা দেয়ার বিষয়টি ভিন্নতর। কারণ তার হারাম হওয়ার বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ।

জিহার নামকরণ : ظَهْر ধাতু হতে জিহার শব্দের উৎপত্তি। সাধারণত জিহারকারী চিরতরে হারাম কারো পিঠের সাথে উপমা দেয় বলে এর নাম জিহার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রকৃত অর্থে জিহার কেবল পিঠের সাথে তুলনা করার সাথে নির্দিষ্ট নয়।

---

১৬. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৪৭।
১৭. সূরা আন-নূর : ৬-৭।
১৮. আল-মুগরিব; আল-মিসবাহুল মুনীর ও মুখতারুস সিহাহ।
১৯. আত-তামারতাশী, তানবীরুল আবসার, হাশিয়া ইবন আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫৭৬, ১ম প্রকাশ।

www.amarboi.org

জিহারের ফলে দম্পতির মাঝে কোনো বিচ্ছিন্নতা আসে না। তবে কাফফারাদানের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন ও তার আনুষঙ্গিক কর্মাদি সম্পাদন করা হারাম। কাফফারা আদায় করলে প্রথম আকদের দ্বারাই তার স্ত্রী হালাল হয়ে যায়।

## তালাকের পালনীয় হুকুম

ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তালাক শরীয়তসিদ্ধ। এর ওপর তারা বিভিন্ন দলিল পেশ করেন। তা হলো :

১. আল্লাহ তাআলার বাণী– الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"এ তালাক দু'বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমতো রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে"।[২০]

২. আল্লাহ তাআলার বাণী– يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"হে নবী, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তখন তাদেরকে তালাক দিবে ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে"।[২১]

৩. রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী– مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

"তালাক হতে ঘৃণিত কিছুই আল্লাহ তাআলা বৈধ করেন নি"।[২২]

৪. সাহাবী উমর রা. হতে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

"রাসূলুল্লাহ স. হাফসা রা.-কে তালাক দিয়ে আবার তাকে প্রত্যার্পণ করেছিলেন"।[২৩]

৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত–

أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضِهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِارْتِجَاعِهَا ثُمَّ طَلَاقِهَا بَعْدَ طُهْرِهَا ، إِنْ شَاءَ

"তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঋতুকালীন তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী স. তাকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, সে পবিত্র হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তালাক দেবে"।

তালাকের বৈধতার ব্যাপারে নবী কারীম স.-এর যুগ হতে মুসলিমসমাজের ঐকমত্য রয়েছে। তবে ফুকাহায়ে কেরাম তালাকের মৌল বিধান নিয়ে ইখতিলাফ (মতভেদ)

---

২০. সূরা আল-বাকারা : ২২৯।

২১. সূরা আত-তালাক, ১।

২২. আবূ দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৬৩১; মুহারিব ইবনে দিছার সূত্রে মুরসাল সনদে বর্ণিত। অতঃপর ইবনে উমর রা. হতে মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণিত। তবে একাধিক আলিম হাদীসটির মুরসাল হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেমন– ইবনে হাজার, আত তালখীস খ. ৩, পৃ. ২০৫।

২৩. আবু দাউদ, আস সুনান, খ. ২, পৃ.৭১২; আল হাকিম খ. ২, পৃ. ১৯৭।

www.amarboi.org

করেছেন। জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, তালাকের মূলনীতি হলো বৈধ হওয়া। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কখনো তা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়।

অন্যদের অভিমত হলো, তালাকের মূলনীতি হচ্ছে, বৈধ না হওয়া তবে ক্ষেত্র বিশেষে নিষেধাজ্ঞা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। মূলনীতি যাই হোক ফুকাহায়ে কেরাম এর ওপর বহু বিধি-বিধান আরোপিত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। তালাক মুবাহ, মানদুব ও ওয়াজিব হওয়ার অবকাশ রাখে। আবার তা মাকরূহ ও হারামও হতে পারে।[২৪] স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে তালাকের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন :

**১. ওয়াজিব :** ঈলাকারী ব্যক্তি চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন স্ত্রীর দিকে প্রত্যাগমন করতে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় জমহুরের অভিমত হলো, তালাক প্রদান করা ওয়াজিব। অবশ্য হানাফীগণের অভিমত হলো, ঈলার মেয়াদান্তে এমনিতেই দম্পতির মধ্যে বিভেদ সংঘটিত হয়ে যাবে।

ওয়াজিবের আরো একটি উদাহরণ হলো– বিরোধপূর্ণ স্বামী স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা করতে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে দুই বিচারক কর্তৃক তালাক প্রদান করা। যখন তারা মনে করবে, তালাক ছাড়া কোনো গত্যান্তর নেই।

**২. মুস্তাহাব তালাক :** স্ত্রী যদি তার ওপর আরোপিত আল্লাহর ফরযসমূহ পালনে অবহেলাে করে তাহলে স্বামীর জন্য তাকে তালাক প্রদান করা মুস্তাহাব। যেমন–সালাত বা অনুরূপ যে কোন ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে তালাকদানের আবেদন করে, সেক্ষেত্রে তাকে তালাক প্রদান করা মুস্তাহাব।

**৩. মুবাহ তালাক :** স্ত্রীর মন্দ স্বভাবের কারণে কিংবা নিম্নমানের জীবনযাপনের কারণে অথবা তাকে ভালোবাসতে না পারলে স্ত্রীকে তালাক দেয়া মুবাহ।

**৪. মাকরূহ তালাক :** উপর্যুক্ত কোনো কারণ পাওয়া না গেলে এমনি এমনিতে স্ত্রীকে তালাক দেয়া মাকরূহ। কেউ কেউ বলেন, বিনা কারণে তালাক দেয়া হারাম। কারণ এতে অকারণে স্ত্রীকে ক্ষতির সম্মুখীন করা হয়।

**৫. হারাম তালাক :** হায়েয অবস্থায় কিংবা মিলন হয়েছে এমন তুহুর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। একে বিদাতী তালাকও বলা হয়। অচিরেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। আদ-দারদীর বলেন, জেনে রাখুন, তালাক প্রদান জায়েয, তবে বিভিন্ন কারণে তা হারাম, মাকরূহ, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব হয়।[২৫]

---

২৪. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২২৭; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৯৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৯।

২৫. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২২৭-২২৯; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৬১;। মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৯৬।

www.amarboi.org

**তালাক শরীয়তসম্মত হওয়ার হিকমত**

ইসলাম নারী পুরুষ সকলকে বিবাহের সময় উত্তম সঙ্গী ও সঙ্গিনী বেছে নেয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছে। নবী করীম স. বলেন–

تَخَيَّرُوا لِنُطفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

'আপন বীর্যের জন্য তোমরা সঙ্গ নির্বাচন কর। সমতাবিধান করে বিবাহ দাও এবং সমপর্যায়ভুক্তদের সাথে বিবাহ করো'।[২৬]

তিনি আরও বলেন–

لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ فَلَعَلَّ أَمْوَالَهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ ، أَفْضَلُ

'মহিলাদের সৌন্দর্য দেখে বিবাহ করো না। কারণ তাদের সৌন্দর্য তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাদেরকে ধন-সম্পদ দেখে বিবাহ করো না। কারণ সম্পদ তাদেরকে অহংকারী করে দিতে পারে। দীনদারী দেখে তোমরা বিবাহ কর। কান ফাড়া কৃষ্ণ বর্ণের দাসী দীনদার হলে সেই উত্তম'।[২৭]

তিনি আরো বলেন–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'মহিলাকে চারটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করে বিয়ে করা হয় : তার মাল-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। তবে তোমরা দীনদারীকে বিবেচনায় নিয়ে সফলকাম হও'।[২৮]

মুগীরা ইবনে শুবা রা. জনৈকা মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে চাইলে রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, انْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
'তাকে দেখে নাও, কারণ তা দু'জনের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর'।[২৯]

রাসূলুল্লাহ স. আরো ইরশাদ করেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

---

২৬. ইবনে মাজাহ, আস্-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬৩৩। আয়েশা (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণিত। ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী, খ. ৯. পৃ. ২২৫, হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, তা তর্কাতীত নয়। হাদীসটি আবু নু'আয়ম থেকেও বর্ণিত। তাই একটির সনদ অন্যটিকে মজবুত ও শক্তিশালী করেছে।

২৭. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৯৭। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমর। তবে এটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে, আয-যাহাবী তাঁর আল মীযান গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

২৮. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, বরাত ফাতহুলবারী, খ. ৯, পৃ. ১৩২; মুসলিম আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৮৬; রাবী আবু হুরায়রা (রা)।

২৯. তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮; হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (র.)-এর অভিমত হলো, এটি 'হাসান' স্তরের হাদীস।

www.amarboi.org

'তোমরা প্রেমময় ও অধিক সন্তানদানকারিণী মহিলা বিবাহ কর। এতে আমি সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব'।[৩০]

মহিলাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ স. বলেন–

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ

'যার দীন ও স্বভাব চরিত্র সম্বর্কে তোমরা খুশি হও এমন কেউ তোমাদের নিকট পয়গাম নিয়ে আসলে তার নিকট তোমরা বিবাহ দাও। যদি তোমরা এমনটি না কর, তাহলে দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে।[৩১]

অনেক সময় পরিবার প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে স্বামী স্ত্রীর মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে তাদেরকে উপদেশ দেয়া, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরামর্শ প্রদানে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষত স্ত্রীর পক্ষ হতে ত্রুটি হলে সেক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً

"তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে; যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন"।[৩২]

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা উভয় পক্ষ হতেই সম্ভব হয় না। মনোমালিন্যতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পন্থা থাকে না। এরূপ অবস্থায় শরীয়ত যদি দাম্পত্যজীবন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয় তাহলে মনোমালিন্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, ঝগড়া-বিবাদের উদ্রেক হবে, হুকুল্লাহ পালনে ত্রুটি দেখা দেবে। বিয়ের ন্যূনতম আবেদন মানব-মানবীর মাঝে প্রেম ভালোবাসা, সৎ সন্তান লাভ এসব ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। ফলে শরীয়ত বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম আরোপ করেছে। ইসলামী আইনে একে তালাক বলে।

এ থেকে বলা যায়, তালাক কেবল কলহ-বিবাহ দূর করার জন্য শরীয়তসিদ্ধ হয়েছে। যাতে মানব মানবী স্বতন্ত্র জীবন শুরু করতে পারে কিংবা অন্তরঙ্গ কোনো ব্যক্তির সাথে নতুনভাবে দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

---

৩০. আল হায়ছামী, মাজমাউয-যাওয়াইদ, খ. ৪, পৃ. ২৫৮। রাবী হযরত আনাস (রা)। আহমদ ইবন হামবাল ও তাবারানী আল আওসাত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদ 'হাসান' পর্যায়ভুক্ত।

৩১. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, খণ্ড-৩, ৩৮৬। রাবী আল-হাতিম আল মুযানী। হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি 'হাসান গারীব' পর্যায়ভুক্ত।

৩২. সূরা আন সিনা, ১৯।

www.amarboi.org

'যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়'।[৩৩]

এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম কোনো কোনো অবস্থায় তালাককে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। আর কোনো কোনো অবস্থায় মুস্তাহাব বলেছেন। যেখানে দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখার মাঝে ক্ষতির আশংকা করা হয় সেখানে হালকা ক্ষতিকে বড় ক্ষতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর এটি ফিকহী বিধি মোতাবেক নিম্নোক্ত মূলনীতির অনুকূলে : يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ 'দুটি অমঙ্গলের মধ্য হতে তুলনামূলক হালকাটিকে গ্রহণ করা যায়।[৩৪] আরো বলা হয়েছে–
الضَّرَرُ الأَشَدُّ يُزَال بِالضَّرَرِ الأَخَفِّ হালকা ক্ষতির দ্বারা বড় কঠিন ক্ষতি দূরীভূত হয়।[৩৫]

নিম্নোক্ত হাদীস হতেও এ ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায়–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُول اللَّهِ : ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ ، قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَل الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً .

ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস রা.-এর স্ত্রী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ছাবিত ইবনে কায়সের চরিত্র ও দীনদারী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করছি না। তবে আমি ইসলামে অকৃতজ্ঞতাকে অপছন্দ করছি। রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি কি তাকে তার বাগানটি ফিরিয়ে দিতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ছাবিতকে বললেন, বাগানটি তুমি গ্রহণ কর এবং তাকে তালাক প্রদান কর।[৩৬]

## তালাকদানের অধিকার কার

তালাকদানের অধিকার কেবল স্বামীর। একমাত্র স্বামীর ইচ্ছায় ও তার কথায় তালাক কার্যকর হয়, যখন সে এমন কোনো কারণ পায়, যাতে তালাক দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্ত্রী অবশ্য দাম্পত্যজীবন ছিন্ন করার আবেদন করার অধিকার রাখে, যদি সে কোনো যৌক্তিক কারণ পায়। যেমন স্বামী যদি খোরপোষদানে অক্ষম হয় অথবা স্বামী নিখোঁজ হয়ে যায়। এ কারণগুলো নির্ণয়ে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বিস্তৃত আকারে কারণগুলো

৩৩. সূরা আন নিসা, ১৩০।
৩৪. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদালিয়্যাহ, মাদদা–২৯।
৩৫. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদালিয়্যা, মাদদা–২৭।
৩৬. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৯৫।

www.amarboi.org

উল্লেখ করেছেন; আবার কেউ সীমিত আকারে কারণ বর্ণনা করেছেন। স্ত্রী যদি এ কারণগুলোর সম্মুখীন হয় তাহলে সে আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। কাজী এ ব্যাপারে রায় প্রদান করবেন। স্ত্রী নিজে নিজে তালাক দিতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক প্রদানের অধিকার প্রদান করে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। এ ক্ষেত্রে সে নিজে তালাক দানের অধিকারী হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ওপর একমত হয় তাহলে সেখানে আদালত কিংবা বিচারকের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বিচিরক কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার প্রশ্ন তখন আসে যখন এমন কোনো কারণ পাওয়া যায় যাতে তার হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হয়, আল্লাহ্ তাআলার হক রক্ষার্থে। যেমন– স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে কোনো একজন মুরতাদ হয়ে গেলে, কিংবা অমুসলিম দম্পতির মধ্য হতে কোনো একজন মুসলিম হয়ে গেলে; কিন্তু অপরজন তাতে অস্বীকৃতি জানালে। এ সকল কিছুকে তালাক বলা যায় না। তালাক কেবল স্বামীর ইচ্ছায় এবং তার কথায় প্রতিফলিত হয়। এ সম্পর্কিত দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী–

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

"তালাক হলো তার হক যে পায়ের নলার অধিকারী"[৩৭]

স্বামী তালাকের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা সঙ্গত নয়। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা।
২. স্ত্রীর সম্মান ও সুনাম রক্ষা করা। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে মানুষকে না জানানো।
৩. তালাকের এমন অনেক কারণ আছে যা প্রমাণ করা অসম্ভব। কারণ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধ প্রধানতঃ গোপন বিষয়-আশয় নিয়ে হয়ে থাকে যা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য হয়। কারণ জানার জন্য যখন স্বামীকে আমরা বাধ্য করব তখন তা হবে অক্ষম কিংবা কষ্টদায়ক কিছুতে তাকে বাধ্য করা অথচ ইসলামে তা নিষিদ্ধ। ইরশাদ হয়েছে– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

   'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো জটিলতা ও কাঠিন্য আরোপ করেন নি'।[৩৮]

৪. তালাকদানে স্বামীর বহু ধরনের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে হয়, যেমন মহরে মুআজ্জল পরিশোধ করতে হয়। ইদ্দতকালের খোরপোষ দিতে হয়,

---

৩৭. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, রাবী : ইবন আব্বাস রা.। আল-বূসীরী মিসবাহুয যুজাজাহ গ্রন্থে এর সনদকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন, খ. ১, পৃ. ৩৮৫।

৩৮. সূরা হজ্জ, ৭৮।

১৫—

www.amarboi.org

সন্তান পালনের খরচাদি প্রদান করতে হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তালাকদানের জন্য অগ্রসর হওয়া প্রমাণ করে, এতে শরীয়তসম্মত এমন কিছু কারণ রয়েছে, যা তাকে তালাকদানে অনুপ্রাণিত করেছে।

৫. তালাকের কারণ অনুসন্ধান না করার আরো একটি কারণ হলো, জমহুরের মতে এটি একটি সাধারণ মুবাহ্ কাজ। কোনো শর্ত বা বিধি-নিষেধ ব্যতিরেকে বৈধ।

**তালাকের ক্ষেত্র**

ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বৈধ বিবাহের স্ত্রীই হলেন তালাক প্রয়োগের স্থান। স্ত্রীর সাথে মিলন হওয়া বা না হওয়া ধর্তব্য বিষয় নয়। আর বিবাহ যদি বাতিল কিংবা ফাসিদ হয় তাহলে তালাক দিলেও তা কার্যকর হবে না। কারণ তালাক হলো বৈধ বিবাহের বন্ধন মুক্ত করার একটি উপায়।[৩৯]

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত হলো, তালাকে রাজয়ী-এর ফলে স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকলে তাকে আবার তালাক দিলে সেটিও আরোপিত হবে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি যার সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক। অতঃপর ইদ্দতের মাঝে আবার বলে, 'তুমি তালাক'। এর দ্বারা যদি সে প্রথম তালাক মজবুত করার নিয়ত না করে তাহলে দ্বিতীয়বার তালাক আরোপিত হবে। আর যদি প্রথম তালাকের মজবুতকরণ বুঝায় তাহলে দ্বিতীয় তালাক আরোপিত হবে না। তবে এক্ষেত্রে মজবুতকরণের নিয়তের বিপরীত যদি কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় তাহলে আবার এটা দ্বিতীয় তালাক হিসেবে গণ্য হবে। রাজ'ঈ তালাকের ইদ্দত পালনরত অবস্থায় পুনরায় তালাক দিলে তা পতিত হওয়ার কারণ হলো, তালাকে রাজয়ী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। কারণ এক্ষেত্রে নতুন আকদ ব্যতিরেকে প্রথম আকদের দ্বারাই ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয আছে।[৪০]

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং যার বিবাহ ছিন্ন হয়ে গেছে এমন কাউকে ইদ্দতের ভিতর তালাক দিলে তালাক পতিত হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

জমহুর উলামার অভিমত হলো, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং যার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, ইদ্দত পালনরত অবস্থায় তার উপর কোনো তালাক পতিত হবে না। তাই তা এক বা দুই তালাকে বায়েন হোক অথবা তিন

---

৩৯. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ১৩৪; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৭০

৪০. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২৫৩; আল-ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ১৫২; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১৯২; কাশশাফুল কিনা; খ. ৫, পৃ. ৪২৮।

www.amarboi.org

তালাকে বায়েন হোক। কারণ বায়েন তালাকের মাধ্যমে এবং বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ফলে বিবাহের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।[৪১]

তবে হানাফীগণ মনে করেন, ছোট্ট আকারের বায়েন তালাকের (এক বা দুই তালাক) ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন কালে মহিলাটি এক দিক দিয়ে স্ত্রী থাকে। কেননা স্বামীর জন্য ইদ্দতের ভিতর তাকে নতুন আকদের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নাজায়েয। সুতরাং এক বা দুই তালাক বায়েনপ্রাপ্তা মহিলাকে ইদ্দতের মধ্যে তালাক দিলে তা পতিত হবে রাজয়ী তালাকের ন্যায়।

যে মহিলার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, চিরদিনের জন্য হারাম হওয়ার কারণে সেক্ষেত্রে হানাফীগণ ইদ্দতের মাঝে উক্ত মহিলার ওপর তালাক পতিত হবে না বলে মনে করেন। যেমন স্বামীর অন্য পক্ষের কোনো ছেলে তাকে যৌন আবেদনের সাথে চুমো খেলে। আর যদি চিরকালীন হারাম হওয়ার মতো কোনো কারণ না পাওয়া যায় তাহলে মহিলা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তালাকের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে আর কিছু ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না। ইবনে আবিদীন বিষয়টির বিবরণ দিয়েছেন।

**তালাকের রুকন বা স্তম্ভ**

হানাফীগণের মতে উক্তিমূলক যাবতীয় শারয়ী কর্মকাণ্ডের রুকন (স্তম্ভ) হলো সেই শব্দ যা দিয়ে তা বুঝানো হয়। তবে জমহুর ফুকাহা রুকনের অর্থে অনেকটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। হানাফীগণ যাকে কর্মকাণ্ডের আনুষঙ্গিক বিষয় মনে করেন তারা তাকেও রুকনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করেন।

সর্বসম্মত অভিমত হলো, তালাক শরয়ী কর্মকাণ্ডের একটি উক্তিমূলক বিষয়। তাই হানাফীগণের মতে তালাকের রুকন হলো সেই শব্দ যা দ্বারা তা ব্যক্ত করা হয়।

মালেকীগণের মতে তালাকের চারটি রুকন রয়েছে। তাহলো, তালাকের অধিকারী হওয়া, ইচ্ছা, ক্ষেত্র ও শব্দ। শাফেয়ীগণের মতে তালাকের রুকন পাঁচটি। তা হলো, তালাক দাতা, শব্দ, ক্ষেত্র, কর্তৃত্ব ও ইচ্ছা।

তালাক বুঝাতে মৌলিকভাবে যা প্রয়োগ করতে হয় তা হলো, কালাম বা উক্তি। কখনো লেখা ও ইশারা তালাকের স্থলাভিষিক্ত হয়। শব্দ প্রয়োগ কিংবা লেখা অথবা ইশারা ব্যতীত তালাক পতিত হবে না, যদিও তালাকের নিয়ত করা হয়। কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়তে চুল মুণ্ডানোর নির্দেশ দেয় সেক্ষেত্রেও সে তালাকদাতা হিসেবে গণ্য হবে না।[৪২]

---

৪১. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯২-২৯৭; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৬১; আশ শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৫৬।

৪২. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২৩০; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৬৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৯।

www.amarboi.org

## তালাকের শর্তাবলি

তালাক বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের নিকট কতিপয় শর্ত রয়েছে, যা তালাকের তিনটি অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। কোনোটি তালাকদাতার সাথে, কোনোটি তালাকপ্রাপ্তার সাথে আবার কোনোটি তালাকের শব্দের সাথে সম্পৃক্ত।

## তালাকদাতার সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

স্বামীকর্তৃক নিজ স্ত্রীকে তালাকদান সহীহ্ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

### প্রথম শর্ত : স্বামী হওয়া

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে আকদ বিদ্যমান থাকা।

### দ্বিতীয় শর্ত : বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, নাবালিগ শিশুর তালাক পতিত হবে না। সে ভাল-মন্দের বাছ-বিচার করতে সক্ষম হোক আর না হোক। মুরাহিক হোক আর গায়র মুরাহিক হোক (মুরাহিক বলা হয় বালিগ হওয়ার পর্যায়ভুক্ত ছেলেকে)। তালাকদানের অনুমতিপ্রাপ্ত হোক আর না হোক। তালাকদানের পর অভিভাবকের তরফ হতে তা অনুমোদন করা হোক আর না হোক। কারণ তালাক হলো একটি অহিতকর কাজ। তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে কিংবা তার অভিভাবক এর অধিকার রাখে না।[৪৩]

নবী কারীম স. বলেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَة : عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُون حَتَّى يَعْقِل

'তিন ব্যক্তির কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করা হতে কলমকে বিরত রাখা হয়েছে : ঘুমন্ত ব্যক্তির জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত; শিশুর বালিগ হওয়া পর্যন্ত এবং পাগলের সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া পর্যন্ত।[৪৪]

তবে হাম্বলীগণ দ্বিমত পোষণ করেন সেই শিশুর ক্ষেত্রে, যে তালাক সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। ইমাম আহমদ র. হতে বর্ণিত বেশিরভাগ রেওয়ায়াতে তালাক কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আর যে শিশুটি তালাক সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তার বিষয়ে তারা জমহুরের মত সমর্থন করেছেন যে, তার তালাক কার্যকর হবে না। আল-মুগনীতে আছে, একথা বলার পর বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। তবে যে শিশুটি জানে যে, তালাক দিলে তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সে

---

৪৩. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২৩০; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৯; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৬৫।

৪৪. ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, খ. ৬, পৃ. ২০০; আল-হাকেম আল-মুসতাদরাক, খ. ২, পৃ. ৫৯; হাদীসটি সহীহ বলে তিনি মনে করেন। আয-যাহাবীও তার সাথে একমত পোষণ করেন। রাবী হযরত আইশা রা.।

www.amarboi.org

তার জন্য হারাম হয়ে যাবে, সে শিশুর ব্যাপারে বেশিরভাগ বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ র. মনে করেন, তার তালাক পতিত হবে। আবু বকর, আল-খারকী ও ইবন হামিদ এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। আবু তালিব ইমাম আহমদ র. হতে বর্ণনা করেন, বালিগ না হওয়া পর্যন্ত শিশুর তালাক দেয়া সহীহ্ হবে না। নাখয়ী ও যুহরীও এ অভিমত পোষণ করেন।

আবুল হারিছ ইমাম আহমদের একটি অভিমত বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, যখন সে তালাক সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে এবং তার বয়স দশ বছর হতে বার বছরের মধ্যে হবে তখন তার প্রদত্ত তালাক পতিত হবে। এতে বুঝা যায় যে, দশ বছরের কম বয়সে তালাক কার্যকর হবে না। কারণ দশ বছর এমন একটি সময়সীমা যাতে উপনীত হলে শিশু নামায ও রোযা তরক করলে তাকে শাস্তি দেয়া যায়। তার ওসিয়াত কার্যকর হয়।
সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন, শিশু যখন সালাত গণনা করতে সক্ষম হয় এবং সাওম পালনে সামর্থ হয় তখন তার তালাক প্রদান বৈধ হবে।

হাসান বসরী র. হতেও এমনটি বর্ণিত।
'আতা বলেন, শিশু যখন মহিলার নিকটবর্তী হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছবে তখন তার তালাক কার্যকর হবে। ইসহাক বলেন, শিশুর বয়স ১২ বছর অতিক্রম করলে তার তালাক কার্যকর হবে।[৪৫]

## তৃতীয় শর্ত : সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া

ফকীহগণ[৪৬] বলেন, পাগল (الْمَجْنُون)[৪৭] ও নির্বোধ (الْمَعْتُوه)[৪৮] ব্যক্তির তালাক সহীহ্ হয় না। কারণ পাগলের মাঝে কোনো কিছু আদায় করার যোগ্যতা নেই।

---

৪৫. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩১২-৩১৫।

৪৬. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২৩০, ২৪৩ ও ২৩৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৯; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩১১; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৬৫।

৪৭. ইবন আবিদীন তালবীহ্ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, পাগলামী (جنون) বলা হয়, ভালো-মন্দের মাঝে তফাৎ করার শক্তিতে ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়াকে। কাজের পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি হ্রাস পাওয়া। হয়তো এ শক্তি প্রকাশই পাবে না কিংবা তা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাবে। এ অবস্থা মানুষের জন্মগত ত্রুটির কারণে হতে পারে। কোনো সমস্যাগ্রস্ত হওয়ায় মস্তিষ্কে অপরিপক্বতা আসায় অথবা হিতাহিত বিবেচনা করতে বিবেক অক্ষম হওয়ার কারণে হতে পারে। জিনের আছর পড়ায় বা শয়তান কর্তৃক ফাসিদ কল্পনাসমূহে ফেলে দেয়ায়ও পাগলামী আসতে পারে। যেমন হঠাৎ করে উল্লসিত হয়ে ওঠা কিংবা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়া অথচ আনন্দ ও ভয়ের যৌক্তিক কোনো কারণ নেই।

৪৮. নির্বোধ (معتوه) এর সংজ্ঞায় আল্লামা শামী বলেন, সে হলো হালকা বুদ্ধির মানুষ, কথায় ভারসাম্য নেই, কর্মসম্পাদনে দক্ষতা নেই। কিন্তু সে পাগলের ন্যায় কাউকে মারে না, কটু কথাও বলে না।

www.amarboi.org

আর নির্বোধ (الْمَعْتُوه)-এর মাঝে এ যোগ্যতার ক্রটি বা অভাব রয়েছে। ফলে এ দুই শ্রেণীর মানুষকে ফকীহগণ নাবালিগ ছোট ছেলের মত গণ্য করেছেন। ফলে এদের তালাক পতিত হবে না। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কিত দলীল আলোচিত হয়েছে। এটি হলো স্থায়ীভাবে পাগল ব্যক্তির হুকুম। সাময়িক পাগলের[৪৯] হুকুম তার অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। যদি এমন সময় তালাক দেয় যখন তার পাগলামী অবস্থা নেই তাহলে তালাক হবে। কারণ তার উপযুক্ত সময়ে তা আরোপিত হয়েছে। আর যদি পুরো পাগল অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তা ধর্তব্য হবে না।

ফুকাহায়ে কেরাম ঘুমন্ত[৫০] ব্যক্তি, বেহুঁশ (الْمُغْمَى عَلَيْهِ),[৫১] প্লুরিসি রোগে (Pleurisy) আক্রান্ত ব্যক্তি (الْمُبَرْسَمْ),[৫২] হতবুদ্ধি লোক[৫৩] (الْمَدْهُوش)-কে পাগলের হুকুমের সাথে যুক্ত করেছেন। কারণ তাদের থেকেও দায়িত্ব আদায়ের যোগ্যতা লোপ পায়। আরো দলীল নবী কারীম স.-এর হাদীস, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَة [৫৪] তিন ব্যক্তি হতে কলমকে বিরত রাখা হয়েছে .....। অন্য হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَق 'জবরদস্তি বা বাধ্য করণ অবস্থায় তালাকদান ও দাসমুক্তি কার্যকর হয় না।'[৫৫]

---

৪৯. সাময়িক পাগল বলতে এ ধরনের লোককে বুঝানো হয়েছে যার পাগলামী মাঝে মাঝে দূর হয়ে সে সুস্থ হয়ে যায়। তা নির্দিষ্ট সময়ে হোক আর না হোক।

৫০. নিদ্রা এমন একটি জৈবিক চাহিদা যার সাথে সকলেই পরিচিত। এমন অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

৫১. বেহুঁশ (مغمى عليه) : কোন সমস্যাগ্রস্ত হওয়ায় মানুষের সাময়িক বোধশক্তি লোপ পাওয়াকে আরবিতে اغـمـاء বলে। যে ব্যক্তির এমন অবস্থা হয় তাকে مغمى عليه বলে। তার হুকুম হলো সেই ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে এখনও ঘুমের ঘোরে বিভোর এবং সেই পাগলের ন্যায়, যে প্রলাপরত রয়েছে (ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২৪৩)।

৫২. مبرسم (Pleurisy) : এ শব্দটি 'আরবি برسام হতে উদগত এর অর্থ যকৃত ও অন্ত্রের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ায় খুবই উত্তেজিত হওয়া। উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করলে তা মস্তিষ্কে গিয়ে আক্রমন করে।

৫৩. হতবুদ্ধি (مدهوش) : যার কথা ও কাজে ক্রোধের ফলে অসামঞ্জস্য অবস্থার সৃষ্টি হয় রাগের ফলে যথেচ্ছ তাই প্রলাপ বকে।

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. 'আহমদ, মুসনাদ, খ. ৬, পৃ. ২৭৬; হাকিম আল-মুসতাদরাক, খ. ২, পৃ. ১৯৮। বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা)। হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আয-যাহাবী কোনো এক রাবীর দুর্বলতার কারণে হাদীসটিকে মু'আল্লাল আখ্যায়িত করেছেন।

www.amarboi.org

আর নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির হুকুম হলো, যদি সে নেশায় অভ্যস্ত না হয় যেমন কাউকে নেশাদ্রব্য পানে বাধ্য করা হয়, অথবা সে জরুরি চিকিৎসার্থে নির্ভরযোগ্য মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে পান করে, অথবা উক্ত দ্রব্যকে নেশাজাতীয় বলে জানে না তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার দেয়া তালাক পতিত হবে না। কারণ সে তখন পাগলের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে, যে অন্যায়কারী নয়। তবে এ ক্ষেত্রে তাকে জ্ঞানশূন্য অথবা তার আচরণে ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে হবে। নতুবা তার তালাক পতিত হবে।

আর স্বেচ্ছায় ও অপ্রয়োজনে কেউ নেশাদ্রব্য পান করলে সে অন্যায়কারী হিসেবে গণ্য হবে। নেশার কারণে তার বিবেক লোপ পেলেও জমহুরের অভিমত হলো, এমন ব্যক্তির তালাক পতিত হবে। এটি তার শাস্তিস্বরূপ। সাঈদ, আতা, মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবন সীরীন, শাবী ও নাখয়ী প্রমুখ এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

আহমদ ইবনে হাম্বল হতে এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। প্রথম অভিমত হলো, জমহুরের অভিমতের ন্যায় তালাক পতিত হবে। আর বকর আল-খাল্লাল ও কাজী এ মত গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় অভিমত হলো, তালাক পতিত হবে না। আবু বকর 'আবদুল 'আযীয এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। এটি হানাফীগণেরও একটি মত তাহাবী ও কারখী এটি গ্রহণ করেছেন। শাফেয়ীগণের ও অনুরূপ একটি অভিমত আছে। আর খলীফা উসমান রা. হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। উমর ইবন আবদিল আযীয, কাসিম, তা'উস, রাবী'আ প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন।

জমহুরের দলীল হলো, সাহাবায়ে কেরাম নেশাগ্রস্তকে জ্ঞাতসারে মিথ্যা অপবাদ আরোপের জন্য শাস্তিপ্রাপ্য ব্যক্তির ন্যায় গণ্য করেছেন। যেমনিভাবে দলিল দিয়েছেন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক পতিত না হওয়ার ক্ষেত্রে এই বলে যে, সে পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় বিবেকশূন্য। আর এ জন্য যে, পাপজাতীয় নেশার ফলে বিবেকশূন্য হওয়া আর পাপজাতীয় নেশা ছাড়া বিবেকশূন্য হওয়ার মাঝে কোনো তারতম্য নেই। এর উদাহরণ হলো, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পা ভেঙ্গেছে তার জন্য বসে সালাত আদায় করা জায়েয। এমনিভাবে কোনো মহিলা যদি স্বেচ্ছায় নিজ পেটে আঘাত করার ফলে নিফাসযুক্ত হয় তাহলে তার থেকে নামায আদায়ের হুকুম রহিত হয়ে যায়।[৫৬]

**চতুর্থ শর্ত : ইচ্ছা ও ইখতিয়ার**

কোনো বাধ্য-বাধকতা ছাড়া তালাকের ইচ্ছায় এমন শব্দ প্রয়োগ করা যা তালাককে আবশ্যক করে তুলে। ফুকাহায়ে কেরাম কৌতুককারীর তালাক সহীহ

---

৫৬. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ২৩৯; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৬৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৯; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১১৪; প্রকাশক-দারুল মানার।

www.amarboi.org

হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কৌতুককারী এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে ইচ্ছাকৃতভাবে তালাকজাতীয় শব্দ প্রয়োগ করে অথচ সে তার প্রকৃত অর্থ বা রূপক অর্থ দ্বারা তালাক বুঝাতে চায়নি। এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেছেন–

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

'তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলোর আসল অর্থ তো আসলই, রসিকতাও সেখানে আসল হিসেবে পরিগণিত হয় : বিবাহ, তালাক ও রাজআত।'[৫৭]

যেহেতু তালাকের কেন্দ্রবিন্দু হলো মহিলা, তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর যেহেতু মহিলা একজন মানুষ এবং মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা; তাই তার ক্ষেত্রে কৌতুক করা শোভা পায় না। অন্য একটি কারণ হলো, কৌতুককারী এমন শব্দের প্রতি ধাবিত হয়েছে, শরীয়ত যে শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়া নির্ধারণ করেছে। সুতরাং সে শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গেলে সাধারণভাবে তালাক পতিত হয়ে যাবে।

ভুলকারী, চাপ প্রয়োগকৃত ব্যক্তি, রাগান্বিত, বোকা ও অসুস্থ ব্যক্তিদের তালাক কার্যকর হয় কি-না, সে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো :

## (ক) ভুলকারী

ভুলকারী বলতে বুঝানো হয় সে ব্যক্তিকে যে তালাক শব্দ ব্যক্ত করার ইচ্ছা করেনি, অন্য একটি শব্দ উচ্চারণ করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু মুখ ফসকে তালাক শব্দ বেরিয়ে এসেছে। যেমন–স্বামী চেয়েছিল স্ত্রীকে বলবে, 'ওহে সুন্দরী'!; কিন্তু ভুলবশত রসিকতা ছাড়াই বলে ফেলে, 'হে তালাকপ্রাপ্তা'! এমন ব্যক্তির তালাক পতিত হওয়া সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, ভুলকারী ও রসিক ব্যক্তি একই শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা রসিক ব্যক্তি শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করে থাকে। তবে তার উদ্দেশ্য স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করা নয়।

ভুলকারী সম্পর্কে জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, বিচারিক ও দীনদারী কোনো দিক দিয়েই তালাক কার্যকর হবে না।[৫৮] তালাক পতিত না হওয়ার বিষয়টি কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন তার ভুলের ব্যাপারটি পারিপার্শ্বিক লক্ষণ দ্বারা

---

৫৭. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪৮১; রাবী আবু হুরায়রা রা.। যায়লাঈ, নাসবুর-রায়া, খ. ৩, পৃ. ২৯২ তে হাদীসটির কোনো এক রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন।

৫৮. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২৩০; মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ২৮৭; আশ-শারহুলকাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৬৬।

www.amarboi.org

প্রমাণিত হবে। এমনটি না হলে বিচারিক ক্ষেত্রে তালাক পতিত হয়ে যাবে। তবে দীনদারীর দিক দিয়ে তালাক পতিত হবে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস, إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে ভুল-ক্রটি ও বল প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন'।[৫৯]
ভুলকারীর অবস্থাকে কৌতুককারীর অবস্থার ওপর কিয়াস করা যাবে না। কারণ, কৌতুককারীর তালাক সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি কিয়াসের বিপরীত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোনো কিছুকে অন্য কিছুর ওপর কিয়াস করার কোনো অবকাশ নেই। হানাফীগণের অভিমত হলো, বিচারিক ক্ষেত্রে ভুলকারীর তালাক ধর্তব্য হবে, আর ভুল প্রমাণিত হোক বা না হোক তার দীনদারীর দিক দিয়ে তালাক ধর্তব্য হবে না। আর তা এজন্য যে, তালাকের কেন্দ্রবিন্দু খুবই স্পর্শকাতর। আর তা হলো মহিলা। অধিকন্তু এক্ষেত্রে যদি তালাক না হয় তাহলে তালাক দেয়ার পর ভুলের দাবির হিড়িক পড়ে যাবে, যা খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। আর এ পথ বন্ধ করা অপরিহার্য।

**খ. বল প্রয়োগকৃত**

এখানে বল প্রয়োগ অর্থ– স্বামীকে ভীতিকর বস্তু দ্বারা তালাকদানে বাধ্য করা। জমহুর উলামার অভিমত হলো, প্রচণ্ডভাবে বল প্রয়োগ করা হলে এ ধরনের ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না। যেমন : হত্যার হুমকি, কেটে ফেলার হুমকি, বেদম প্রহারের হুমকি-এ জাতীয় অত্যাচারের সম্মুখীন ব্যক্তি। কারণ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ[৬০]

অনুরূপ হাদীস–

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ[৬১]

আর এ জন্য যে, এখানে তালাকের ইচ্ছা ও নিয়ত অনুপস্থিত। ফলে সে পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেল। বল প্রয়োগ যদি হালকা ধরনের হয় অথবা চাপ প্রয়োকৃত ব্যক্তির ওপর এর প্রভাব প্রমাণিত না হয় তাহলে তালাক পতিত হবে। কারণ এ অবস্থায় তালাকদানের ইচ্ছা পাওয়া যায়।

হানাফী মতাবলম্বীগণের অভিমত হলো, বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির তালাক সর্বাবস্থায় পতিত হবে। কারণ সে ঝামেলা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছায় তালাকদানকে বেছে নিয়েছে। ফলে তার ইচ্ছার উপস্থিতির কারণে

---

৫৯. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬৫৯; আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক, খ. ২, পৃ. ১৯৮। রাবী হলেন, ইবন আব্বাস রা.। হাকিম হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ বলেছেন, যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

তালাক পতিত হয়ে যাবে। উল্লিখিত বর্ণনা অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি ন্যায়ত তালাক দানের জন্য বল প্রয়োগ করা হয়, যেমন ঈলাকারী যদি তার স্ত্রীকে ঈলার মুদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ফেরত না নেয়, সে ক্ষেত্রে বিচারক স্বামীকে তালাকদানে বাধ্য করবে। এ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে তালাক পতিত হয়ে যাবে।

**(গ) রাগান্বিত ব্যক্তি**

রাগ মানুষের এমন এক স্নায়ুবিক অবস্থা যার ফলে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যখন তার ওপর কেউ অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে তা কথায় হোক আর কাজে হোক তখন তার এমন অবস্থা হয়। ক্রোধ মানুষের কোনো উক্তিমূলক কর্মকাণ্ড শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রভাব ফেলে না। তালাক হলো এ ধরনেরই একটি কাজ। তবে হ্যাঁ, ক্রোধ যদি এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, মানুষকে হতবুদ্ধি (الْمَدْهُوشُ) করে ফেলে। তাহলে তালাক পতিত হবে না। কারণ এর ফলে সে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়।
ইবনুল কায়্যিম ক্রোধকে তিন স্তরে বিভক্ত করেছেন। ইবনে আবিদীন সেগুলো বর্ণনা করেছেন এবং তার সাথে আরো কিছু যোগ করেছেন।

**এক.** রাগের প্রাথমিক পর্যায়। এক্ষেত্রে তার জ্ঞানবুদ্ধির কোনো তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে পরিবর্তন হয় না। তাই সে যা বলছে এবং করছে সে সম্পর্কে সে অবহিত। এক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন নেই।

**দুই.** রাগের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যার ফলে সে কী বলে এবং কী চায় কিছুই বুঝতে পারে না। এমতাবস্থায় তার কোনো ধরনের কথা যে কার্যকর হয় না, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

**তিন.** উপর্যুক্ত দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তর। তা এমন পর্যায়ের যে, এর ফলে মানুষ পাগলের ন্যায় হয় না। এক্ষেত্রটি পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। যুক্তি প্রমাণ এমতাবস্থায় তার কথাবার্তা কার্যকর না হওয়ার পক্ষে রায় দেয়।

অতঃপর ইবনে আবিদীন বলেন, আমার কাছে প্রতীয়মান হয়, হতবুদ্ধি (الْمَدْهُوشُ) ও ক্রোধান্বিত কেউই এ পর্যায়ের নয় যে, তারা যা বলে তা জানে না। অতঃপর হতবুদ্ধি ইত্যাদি শ্রেণীর লোক সম্পর্কে তিনি বলেন, কথা ও কাজ যতক্ষণ ভারসাম্যহীন মনে করা হবে ততক্ষণ তাদের কথা ধর্তব্য হবে না; যদিও সে জানে ও ইচ্ছা করে। কারণ এ ধরনের উপলব্ধি ও ইচ্ছা সঠিক চেতনার অভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমনটি বুদ্ধিমান শিশুর কথা ও ইচ্ছা ধর্তব্য হয় না।[৬২]

---

৬২. রাদদুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার খ. ২, পৃ. ২৪৩; আদ-দাসূকী খ. ২, পৃ. ৩৬৬; কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ২৩৫; হাশিয়াতুল জুমাল খ. ৫, পৃ. ৩২৪; ইবনুল কায়্যিম, ইগাছাতুল লাহফান ফী তালাকিল গাদবান, পৃ. ৩৮।

www.amarboi.org

### (ঘ) নির্বোধ

এমন হালকা বুদ্ধি, যা বিবেক ও শরীয়ত-পরিপন্থী স্থানে সম্পদ ব্যয়ে উৎসাহিত করে।[৬৩] জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, নির্বোধের তালাক পতিত হয়। কারণ সে তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আতা এ অভিমতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে নির্বোধের তালাক ধর্তব্য নয়।[৬৪]

### (ঙ) অসুস্থ ব্যক্তি

ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় শুধু اَلْمَرَضُ (রোগ) শব্দটি প্রয়োগ করলে সাধারণত মৃত্যুর পূর্ববর্তী রোগকে বুঝায়। তবে অন্য রোগের যদি কোনো প্রমাণ থাকে তাহলে অন্য রোগও বুঝায়। ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, যে কোনো ধরনের রোগী হোক না কেন, তার তালাক পতিত হবে। মৃত্যু পূর্ববর্তী রোগ হোক আর সাধারণ রোগ হোক, তাতে কোনো ভেদাভেদ নেই। তবে শর্ত হলো, রোগের প্রভাব যেন তার সুস্থ বিবেকের ওপর না পড়ে। যদি বিবেকের ওপর প্রভাব পড়ে তাহলে সে পাগলের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। মুমূর্ষু অবস্থায় যদি কোনো রোগী তার এমন স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয় যার সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে, আর এ তালাকের ওপর স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট না হয় বা সে তালাক না চায়, তাহলে ধরা হবে স্ত্রীকে সে তালাক দিয়েছে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে। স্ত্রী তালাকের ইদ্দত পালনরত অবস্থায় যদি স্বামী এ রোগে মারা যায় তাহলে সে স্ত্রীকে বঞ্চিত করার কৌশল অবলম্বনকারী হিসেবে গণ্য হবে। জমহুর উলামার মতে তালাক পতিত হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী স্বামীর সম্পদের ওয়ারিস হবে।

হানাফীগণ ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী কর্তৃক বায়েন তালাক দানের তলব না করার শর্ত আরোপ করেছেন। স্ত্রী বায়েন তালাক তলব করলে সে আর ওয়ারিস হবে না। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্বামীর ওয়ারিস হবে না। তবে রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামীর ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।[৬৫]

### তালাকপ্রাপ্তার সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা হলো :

**১ম শর্ত :** দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকা চাই প্রকৃত হোক বা আইনত হোক আর তা হলো তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তালাকদানকারীর স্ত্রী হবে অথবা রাজয়ী তালাকের

---

৬৩. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খ. ২৫ سفه শিরো. দ্র.

৬৪. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২৩৮; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩১৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৯; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৬৫।

৬৫. ইবন আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫২১; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫২; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৪, পৃ. ৩৩৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩২৯।

www.amarboi.org

ইদ্দত পালনকারিণী হবে। বায়েন তালাক অথবা বিচ্ছিন্নকরণজনিত কারণে ইদ্দত পালনকারিণী হলে সে সম্পর্কিত আলোচনা মতভেদসহ তালাকস্থলে আলোচিত হয়েছে।

এ কথাগুলো কার্যকর তালাকের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর কোনো শর্তের সাথে যদি তালাককে সম্পৃক্ত করে : যেমন বলে, তুমি অমুকের গৃহে প্রবেশ করলে তালাক। তাহলে শর্ত আরোপের সময় যদি উক্ত মহিলা তার স্ত্রী থাকে তাহলে তালাক সহীহ হবে। আর যদি স্ত্রী এ সময় ইদ্দত পালনকারিণী হয় তাহলে পূর্বে বর্ণিত কার্যকর তালাকের ইখতিলাফ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর উক্ত শর্ত আরোপকালে যদি উক্ত মহিলা অপরিচিত তথা তার স্ত্রী না হয় পরবর্তীকালে তাকে বিবাহ করে অতঃপর আরোপিত শর্ত পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে যদি উক্ত শর্ত বিবাহের সাথে যুক্ত করে; যেমন–কোনো মহিলাকে বলে আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে তুমি তালাক। অতঃপর মহিলাকে বিবাহ করলে হানাফী ও মালেকীগণের মতে তালাক হয়ে যাবে। শাফেয়ীগণ এতে দ্বিমত পোষণ করেন।

আর উক্ত শর্ত যদি বিবাহের সাথে যুক্ত না করে, যেমন– কোনো অপরিচিতা মহিলাকে বলল, অমুকের গৃহে প্রবেশ করল তুমি তালাক। অতঃপর তাকে বিবাহ করল এবং মহিলা ঐ ঘরে প্রবেশ করলে কারো মতে এক্ষেত্রে তালাক হবে না। অনুরূপভাবে যদি উক্ত মহিলা বিবাহের পূর্বে উক্ত ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে তালাক পতিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অপরিচিতাকে বিবাহের উল্লেখ ব্যতীত যদি তালাকের শর্ত জুড়ে দেয় আর এতে বিবাহের নিয়ত করে, যেমন মহিলাকে বলে, যদি অমুকের বাড়িতে প্রবেশ কর তবে তুমি তালাক। অতঃপর তাকে বিবাহ করে এবং উক্ত মহিলা প্রতিশ্রুত বাড়িতে প্রবেশ করে, তাহলে নিয়তের কারণে মালেকীগণের মতে তার ওপর তালাক পতিত হবে। কিন্তু জমহুরের মতে যেহেতু সে শর্ত আরোপকালে বিবাহ শব্দ যুক্ত করেনি তাই তালাক পতিত হবে না।

**দ্বিতীয় শর্ত :** তালাকপ্রাপ্তাকে ইশারা অথবা বিশেষণ অথবা নিয়ত দ্বারা নির্দিষ্ট করা। ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন তালাকপ্রাপ্তাকে নির্দিষ্টকরণের শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে। নির্দিষ্টকরণের পন্থা ৩টি। ইঙ্গিত করা, তার বিশেষণ বর্ণনা করা এবং নিয়ত করা। যে কোনো একটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা জায়েয। তিনটির মধ্যে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে সেক্ষেত্রে বিশদ আলোচনার অবকাশ রয়েছে :

ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইশারা, গুণবর্ণনা ও নিয়তের মাধ্যমে যদি স্ত্রীকে তালাকের জন্য নির্দিষ্ট করে তাহলে সেই নির্ধারিত স্ত্রীই তালাক

www.amarboi.org

প্রাপ্তা হবে। যেমন– তার যে স্ত্রীর নাম আমরাহ্ তার প্রতি ইশারা করে তালাকের নিয়তে বলল, হে আমরাহ্ তুমি তালাক। তাহলে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে। কারণ নির্দিষ্টকরণের সকল মাধ্যমই সে প্রয়োগ করেছে।

যদি তার একাধিক স্ত্রীর মধ্য হতে একজনের প্রতি ইশারা করে কিন্তু তার কোনো বিশেষণ উল্লেখ না করে আর তাকে ছাড়া অন্যের নিয়তও করে না। আর তাকে বলে তুমি তালাক। তাহলে ঐ স্ত্রীর ওপরও ঐকমত্যের ভিত্তিতে তালাক পতিত হবে। কারণ ইঙ্গিতই নির্দিষ্টকরণের জন্য যথেষ্ট। অনুরূপভাবে যদি ইশারা ও অন্যের নিয়ত করা ব্যতীত কেবল তার গুণ উল্লেখ করে, সে ক্ষেত্রেও তালাক হয়ে যাবে। যদি তার একাধিক স্ত্রীর মধ্য হতে একজনকে তালাকদানের নিয়ত করে; কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে না এবং তাকে ইঙ্গিত করে চিহ্নিতও করে না; যেমন বলল, আমার এক স্ত্রী তালাক এবং একথা বলে একাধিক স্ত্রী হতে একজনের কথা নিয়ত করে। তাহলে নিয়তকৃত স্ত্রীই কেবল তালাকপ্রাপ্তা হবে, অন্যরা নয়। অনুরূপভাবে যদি তার একমাত্র স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে, আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

যদি একাধিক স্ত্রী হতে একজনের প্রতি ইঙ্গিত করে আর বিশেষণ বর্ণনা করে অন্যের; যেমন : তার সালামা নাম্নী স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলে, ওহে 'আমরাহ্! তুমি তালাক। অথচ তার অন্য স্ত্রীর নাম হলো আমরাহ্ এ ক্ষেত্রে হানাফীগণের অভিমত হলো, বিচারিক আদালতে যার প্রতি সে ইঙ্গিত করেছে তার ওপর তালাক পতিত হবে। আমরার ওপর তালাক পতিত হবে না। কারণ, ফিক্হের সার্বজনীন বিধান হলো, উপস্থিত ব্যক্তির গুণ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, অনুপস্থিত ব্যক্তির গুণ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।[৬৬]

এমনিভাবে যদি তার দিকে ইঙ্গিত করে কিন্তু অন্যের গুণ বর্ণনা করে, তাহলেও তার ইঙ্গিতকৃত স্ত্রী তালাক হবে। যেমন তার স্ত্রীকে বলল, হে গাযালা, তুমি তালাক।

আর যদি স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত না করে কেবল তার এমন গুণ উল্লেখ করে, যা তার মাঝে রয়েছে অথচ তার উদ্দেশ্য হলো অন্যকে তালাক দেয়া। যেমন বলল, আমার স্ত্রী সালমা তালাক, অথচ তার উদ্দেশ্য হলো অন্যকে তালাক দেয়া। বাস্তবে যদি তার সালমা নাম্নী কোনো স্ত্রী থাকে তাহলে দীনদারীর (دِيَانَة) দিক দিয়ে তার ওপর তালাক পতিত হবে। আর যদি না থাকে তাহলে দীনদারী ও বিচারের (قَضَاء) দিক দিয়ে কোনোভাবেই তালাক পতিত হবে না। কারণ তালাকের মূল পাত্রী এখানে নির্দিষ্ট নেই।

---

৬৬. মাজিল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, আল-মাদদাহ-৬৫

www.amarboi.org

যদি কেউ বলে, গোটা জগতের মহিলা সকলেই তালাকপ্রাপ্তা। একথা বলে নিজ স্ত্রীকে নিয়ত করল, হানাফী মাযহাবমতে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে। যদি নিয়ত না করে তাহলে তালাক হবে না। আর যদি নিজ মহল্লার মহিলাগণের কথা বলে, আমার মহল্লার সকল মহিলা তালাক। তাহলে তার স্ত্রীর নিয়ত করুক বা না করুক তার ওপর তালাক পতিত হবে।

কারো দুইজন স্ত্রী আছে, একজনের নাম সালমা আর অন্য জনের নাম আমরাহ। স্বামী ডাক দিল সালমাকে, উত্তর দিল আমরা স্বামী তাকে সালমা মনে করে তালাক দিল। এতে মালিকীগণের অভিমত হলো, নিয়তের কারণে সালমা দিয়ানাতের দিক দিয়ে তালাকপ্রাপ্তা হবে। তবে বিচারিক দিক দিয়ে আমরাহর ওপর তালাক পতিত হবে, দিয়ানতের (دِيَانَة) দিক দিয়ে নয়। কেননা এখানে ইচ্ছা অনুপস্থিত।

শাফেয়ীগণের অভিমত হলো, ডাকের উত্তরদাতার উপরই তালাক পতিত হবে। যাকে ডাকা হয়েছিল তার ওপর তালাক পতিত হবে না। শাফেয়ীগণের অন্য এক অভিমত হলো, দু'জনের কারো ওপর তালাক পতিত হবে না।[৬৭]

আর স্ত্রীর সাথে যদি অপরিচিত অন্য এক মহিলা থাকে এমন অবস্থায় স্বামী বলে, "তোমাদের একজন তালাক"। অতঃপর বলে, আমি এর দ্বারা অপরিচিত মহিলাকে উদ্দেশ্য করেছি। তাহলে শাফেয়ীগণের এক উক্তিমতে তার কথা এ ক্ষেত্রে গৃহীত হবে; কিন্তু অপর উক্তি মতে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে। কারণ একমাত্র সেই এখানে তালাক পাওয়ার যোগ্য।[৬৮]

স্ত্রীর উল্লেখযোগ্য কোনো অংশের কথা উল্লেখ করে তালাক দেয়া মানে গোটা শরীরের ওপর তালাক দেয়া। যেমন স্ত্রীকে বলল, তোমার অধিকাংশ তালাক, তোমার এক তৃতীয়াংশ তালাক বা এক চতুর্থাংশ তালাক ইত্যাদি ধরনের শব্দ। আর নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গের কথা বলে যদি তালাক প্রদান করে যেমন বলে, মাথা তালাক, পেট তালাক ইত্যাদি। তাহলে দেখতে হবে উক্ত অঙ্গটি বাদ দিয়ে মানুষের কল্পনা করা যায় কি-না? যদি না যায় তাহলে তার হুকুম হবে পূর্বের ন্যায়। আর যদি দেখা যায় সেটি বাদ দিয়ে মানব দেহকে কল্পনা করতে কোনো বাধা নেই তাহলে তালাক পতিত হবে না। যেমন কেউ বলল, তোমার লালা তালাক, তোমার ঘাম তালাক ইত্যাদি।

---

৬৭. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩ পৃ. ৩২৭

৬৮. মাজিল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দাহ-৬০; সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাজাইর, ১৪২, হালাবী সম্পা.।

www.amarboi.org

হানাফীগণের মতে দেহের এমন কিছু অংশ রয়েছে যেগুলোর কথা উল্লেখ করে গোটা মানুষই বুঝানো হয়। যেমন– মাথা, ঘাড়, চেহারা, পিঠ ইত্যাদির কথা বলে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে। আর যদি এমন অঙ্গ, যা দ্বারা সাধারণত গোটা মানুষ বুঝায় না যেমন হাত, পা ইত্যাদির কথা বলে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না।[৬৯]

### তালাক শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ

তালাকের শব্দমূল হলো সেই শব্দ যা দ্বারা তালাক বুঝানো হয়, সেটিই হলো তালাকদানের শব্দ। আর ক্ষেত্রবিশেষে লেখা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমেও তালাক দেয়া যায়। শব্দ, ইঙ্গিত ও লিখন যার দ্বারাই তালাক দেয়া হোক তার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে যা পালন করা আবশ্যক, নতুবা তালাক হবে না। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

### ক. শব্দের ক্ষেত্রে শর্ত

**১ম শর্ত :** শব্দের উচ্চারণ ও তার অর্থ অনুধাবন। এখানে তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়তের শর্ত নেই। তবে তালাক পতিত হওয়ার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত, যার আলোচনা পরে আসছে।

তালাকদাতা কোনো কিছুর দ্বারা শপথ করল, অতঃপর সে সন্দেহে পড়ে গেল এটি তালাকের শপথ ছিল, না অন্য কিছুর। তখন এ ধরনের কথা মূল্যহীন বলে গণ্য হবে। এর দ্বারা তালাক সংঘটিত হবে না। অনুরূপভাবে কেউ সন্দিহান হয়ে গেল যে, সে তালাক দিয়েছে কি না? এতে তালাক পতিত হবে না। আর যদি তালাকদানের ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়; কিন্তু সংখ্যার ব্যাপারে সন্দিহান যে, একটি না দু'টি না বেশি সেক্ষেত্রে জমহুরের অভিমত হলো, সর্বনিম্ন সংখ্যা ধর্তব্য হবে। কারণ তা নিশ্চিত সংখ্যা।

**২য় শর্ত :** শব্দের দ্বারা তালাক দানের নিয়ত করা।

নিয়ত করা শর্ত হলো শুধুমাত্র অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতমূলক শব্দ দ্বারা তালাকদানের ক্ষেত্রে। স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাকদানের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন নেই। মালেকী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম বলেন, অস্পষ্ট কিছু শব্দের الْأَلْفَاظ الْكِنَايَة ক্ষেত্রেও নিয়তের প্রয়োজন হয় না। হাম্বলীগণও তাদের সাথে একমত পোষণ করেন। তাহলো সে সকল শব্দ, যা (الْكِنَايَاتُ الظَّاهِرَةُ) বলে চিহ্নিত। যেমন– سَرَّحْتُكَ আমি তোমাকে ছাড়লাম। কেননা এ শব্দটি طَلَّقْتُكَ -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ 'তুমি আমার ওপর হারাম' একথা দ্বারা স্ত্রীর ওপর তালাক হয় কি-

---

৬৯. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪২৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯০; রাওদাতুত-তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৬৩; দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৮৮; আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২৫৬; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১২৬।

www.amarboi.org

না? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। জমহুর ফুকাহা বলেন, তালাকের ইচ্ছা করলে তালাক হবে। হাম্বলীগণ বলেন, এর ফলে জিহার হবে। তালাকের ইচ্ছা না করলে শাফেয়ীগণের মতে তালাক হবে না। হানাফীগণের পরবর্তী যুগের ফুকাহায়ে কেরামের মতে তালাক হবে। মালেকীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, যদি স্ত্রী এমন পর্যায়ের হয়, যার সাথে মিলন হয়েছে তাহলে তিন তালাক হবে। আর মিলন হয়নি এমন স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

### (খ) লিখনের মাধ্যমে তালাকদানের শর্ত

লিখনীর মাধ্যমে তালাকদানের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত প্রযোজ্য।

**১ম শর্ত** : লেখাটি সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হতে হবে অর্থাৎ লেখার চিহ্ন দ্বারা প্রমাণিত হবে। যেমন– কাগজে বা জমির ওপর লেখা যা দৃশ্যমান। পক্ষান্তরে বাতাস বা পানির ওপরের লেখা অদৃশ্যমান। তাই এর দ্বারা তালাক পতিত হবে না।

জমহুর ফুকাহা এ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ র.-এর এক বর্ণনা মতে লেখা দৃশ্যমান না হলেও তালাক পতিত হবে।[৭০]

**২য় শর্ত** : লেখাটি হবে অঙ্কিত ও ভাব প্রকাশক। হানাফীগণ বলেন, লেখাটি যখন দৃশ্যমান ও এমনভাবে অঙ্কিত হবে যার দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তখন নিয়ত করুক আর নাই করুক তালাক হয়ে যাবে। আর লেখা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান না হলে নিয়ত করলেও তালাক হবে না। পক্ষান্তরে লেখা যদি দৃশ্যমান হয়; কিন্তু অঙ্কিত না থাকে। সেক্ষেত্রে নিয়ত করলে তালাক হবে, অন্যথায় নয়। কেউ কেউ মনে করেন, নিয়ত করুক বা না করুক স্বাভাবিকভাবে তালাক হয়ে যাবে।

### (গ) ইশারার মাধ্যমে তালাকদানের শর্ত

জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য ইশারার মাধ্যমে তালাক দেয়া সহীহ নয়। মালেকীগণ এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে ইশারা যদি এমন হয় যার ফলে কথাটি অন্যকে বুঝানো যায় তাহলে এর দ্বারা তালাক হবে, অন্যথায় নয়। আবার মালেকীদের কেউ কেউ বলেন, নিয়তের দ্বারা এক্ষেত্রেও তালাক হবে। শাফেয়ীগণ মনে করেন, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন মানুষের ইশারা প্রচ্ছন্ন তালাক (كناية) হিসেবে গণ্য হবে।

ইশারার মাধ্যমে বোবা ব্যক্তির তালাক সম্পর্কে জমহুরের অভিমত হলো, তা কার্যকর হবে। হানাফীগণ বলেন, সে যদি লিখতে সক্ষম হয় তাহলে ইশারায় তালাক সহীহ হবে না। এটি শাফেয়ীগণেরও একটি দুর্বল মত।[৭১] বোবার ইশারা

---

৭০. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪২৮।

৭১. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২৪১; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৫৫; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৮৪; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪২৩।

www.amarboi.org

যদি সকল মানুষের নিকট বোধগম্য হয় তাহলে নিয়ত ছাড়াই তার তালাক পতিত হবে। আর যদি কেবল কিছুলোকের নিকট বোধগম্য হয়, তাহলে কেবল নিয়তের মাধ্যমে তালাক পতিত হবে।

**তালাকের প্রকারভেদ**

দৃষ্টিভঙ্গি অনুপাতে তালাক বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। শব্দ প্রয়োগের দিক দিয়ে তালাক দুই প্রকার। এক. সারীহ (স্পষ্ট), দুই. কিনাঈ (অস্পষ্ট)। ফলাফলের দিক দিয়ে তালাক দুই প্রকার, এক রাজঈ, দুই. বায়েন। বায়েন তালাক আবার দুই প্রকার এক. ক্ষুদ্রতর বায়েন, দুই. চূড়ান্ত বায়েন। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তালাক দুই ভাগে বিভক্ত : এক. সুন্নত তালাক, দুই. বিদআত তালাক।

ফলাফল কার্যকর হওয়ার সময়কালের দিক দিয়ে তালাক তিন প্রকার। এক. কার্যকর তালাক, দুই. শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট, তিন. ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত।

বিশদ আলোচনা নিম্নরূপ :

**প্রথমত : সারীহ ও কিনাঈ** (الصَّرِيحُ وَالْكِنَائِيُّ) :

ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে,[৭২] সারীহ (স্পষ্ট) তালাক হলো- যেসকল শব্দ আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় দিক দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তালাকের জন্য প্রয়োগ হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, সারীহ তালাক হলো, যার শরয়ী হুকুম নিয়ত ছাড়াই সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ দু'টি সংজ্ঞার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই; বরং একটি অপরটির পরিপূরক।

**কিনাঈ (অস্পষ্ট) তালাক** : যে শব্দটিকে কেবলমাত্র তালাকের জন্য গঠন করা হয়নি। বরং তা তালাক ও অন্য কিছুর সম্ভাবনাও রাখে। যদি শব্দটি একেবারেই তালাকের সম্ভাবনা না রাখে তাহলে কিনায়া শব্দ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তার দ্বারা কোনো তালাকই হবে না, ফলে তা অর্থহীন শব্দ হিসেবে পর্যবসিত হবে।

সারীহ শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তাতে নিয়তের প্রয়োজন হয় না। তালাকদানের ক্ষেত্রে সারীহ শব্দ প্রয়োগের পর যদি স্বামী বলে, আমি এর দ্বারা কোনো কিছুর নিয়ত করিনি; তবুও তালাক পতিত হবে। স্বামী যদি বলে, আমি এ শব্দ দ্বারা তালাক ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করেছি। তাহলে বিচারিক ক্ষেত্রে তার এ কথা গৃহীত হবে না; তবে দীনের (ধার্মিকতার) দিক দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে। অবস্থার প্রেক্ষাপট যদি এমন হয় যে, তার দ্বারা তালাক ছাড়া অন্য কিছুরও সম্ভাবনা থাকে, তাহলে বিচারিক ক্ষেত্রেও স্বামীর কথা গৃহীত হবে। ফলে কোনো

---

৭২. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২৪৭; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৭৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮০; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩১৮।



www.amarboi.org

ধরনের তালাক পতিত হবে না। যেমন কাউকে তালাকের জন্য বাধ্য করা হলো, ফলে সে তালাকের নিয়ত ব্যতিরেকে সারীহ্ তালাক দিল, এতে ধার্মিকতা ও বিচারিক কোনো ক্ষেত্রেই তালাক পতিত হবে না। কারণ এখানে জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের অবস্থা বিদ্যমান।[৭৩] এটি জমহুরের অভিমত।

হানাফীগণের অভিমত হলো, বল প্রয়োগ অবস্থায়ও তালাক পতিত হবে।

কিনাঈ (অস্পষ্ট) তালাক : নিয়ত ছাড়া কিনাঈ শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হবে না। এর কারণ হলো, উক্তশব্দ তালাক এবং অন্য কিছুরও সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং নিয়ত ব্যতিরেকে তালাকের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। নিয়তের দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো, শব্দটি এর সম্ভাবনা রাখে। মালেকীগণ স্পষ্ট কিনায়া (اَلْكِنَايَات الظَّاهِرَة)-কে সারীহ্ তালাকের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এ ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে তাদের অভিমত হলো, এর দ্বারা তালাক নিয়ত ছাড়াই পতিত হবে। স্পষ্ট কিনায়া বলতে সেই সকল শব্দকে বুঝানো হয় যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তালাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। যদিও তা তালাকের জন্য গঠন করা হয়নি। যেমন : ফিরাক (اَلْفِرَاقُ) ও সারাহ (اَلسَّرَاحُ) শব্দ।

আল-কাজীর বক্তব্যমতে হাম্বলী ফকীহগণও এক্ষেত্রে মালেকীগণের অভিমতের পক্ষে। তবে ফকীহ্ খারকীর বক্তব্য হতে বুঝা যায়, নিয়ত ব্যতীত এ দু'টি শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হবে না।

নিয়ত না থাকলে কিনায়া শব্দ দ্বারা তালাক সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও লক্ষণাদি নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হয় কি-না?

হানাফী ও হাম্বলীগণের নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, কিনায়া শব্দ দ্বারা তালাক সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়তের অনুরূপ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হলো নিয়তের স্থলাভিষিক্ত। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে রাগান্বিত অবস্থায় বলল, তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলে যাও। এতে সে নিয়ত না করলেও তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে যদি তালাকদানের আবেদনের উত্তরে উক্ত কথা বলে।

মালেকী, শাফেয়ী ও এক রেওয়ায়াত মতে হাম্বলীগণ বলেন, এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ফলে তাদের মতে নিয়ত ব্যতীত শুধু কিনায়া শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হবেনা।

ফকীহগণ এ অভিমত পোষণ করেন যে, তালাক (طَلَّقَ) ধাতু হতে নির্গত আভিধানিক ও পারিভাষিক শব্দসমূহ হলো সারীহ (صَرِيْح) তালাকের শব্দ। যেমন : طَلَّقْتُكِ আমি তোমাকে তালাক দিলাম, أَنْتِ طَالِقٌ -তুমি তালাক أَنْتِ

---

৭৩. আল-মুগনি, খ. ৭, পৃ. ৩২৯

www.amarboi.org

مُطَلَّقَة -তুমি তালাকপ্রাপ্তা। কেউ যদি বলে انت مطلقة (সাকিন যোগে) তাহলে সেটি হবে কিনায়া তালাক। নিয়ত ব্যতীত এর দ্বারা তালাক পতিত হবে না।

আগেই আলোচিত হয়েছে যে, মালেকীগণ মনে করেন প্রসিদ্ধ কিনায়া শব্দসমূহ নিয়ত ব্যতীত তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে সারীহ্ শব্দের স্থলাভিষিক্ত। যদিও তারা উক্ত শব্দসমূহকে সারীহ্ বলে গণ্য করেন না।[৭৪]

শাফেয়ীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত ও হাম্বলীগণের মতে সারীহ্ তালাকের শব্দ তিনটি তা হলো আত-তালাক (الطَّلَاقُ), আল-ফিরাক (الْفِرَاقُ) ও আস-সারাহ (السَّرَاحُ) এবং এগুলো হতে উদ্গত শাব্দিক ও পারিভাষিক শব্দসমূহ।

কিনাঈ শব্দসমূহ হলো, সারীহ্ ব্যতীত অন্যসব শব্দ, যা তালাকদানের সম্ভাবনা রাখে। যেমন : اعْتَدِّي -তুমি ইদ্দত পালন কর, اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ -তুমি তোমার গর্ভাশয় মুক্ত কর, الْحَقِي بِأَهْلِكِ -তুমি তোমার পরিবারের সাথে যুক্ত হও, أَنْتِ خَلِيَّةٌ-তুমি নিঃসঙ্গিনী এবং أَنْتِ مُطْلَقَةٌ (طاء সাকিন যোগে) তুমি মুক্ত এবং এ জাতীয় শব্দ।[৭৫]

হানাফীগণ মনে করেন, ভুল উচ্চারিত শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তালাক পতিত হবে। অতঃপর তাদের অভিমত হলো, শব্দটি যদি সারীহ্ হয় তাহলে নিয়ত ছাড়াই তালাক পতিত হবে। যেমন- طَلَاغ ، وَتَلَاغ ، وَطَلَاك ، وَتَلَاك তালাকদাতা আলিম হোক, আর মুর্খ হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে হ্যাঁ যদি তালাকদাতা বলে, শব্দটি বিকৃত করেছি ভয় দেখানোর জন্য আর তার কথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন তালাকদানের পূর্বে সে এব্যাপারে কাউকে সাক্ষী রেখেছে। এক্ষেত্রে তালাক পতিত হবে না, অন্যথায় তালাক হবে।

ফুকাহায়ে কিরাম তালাকদানের ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় সারীহ্ শব্দকে সীমিত করেন নি। আরবী ও অনারবী উভয় ক্ষেত্রে তাকে উন্মুক্ত রেখেছেন। তারা তুরকী ও ফার্সী কিছু শব্দের উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা স্পষ্ট তালাক পতিত হয় নিয়তের প্রয়োজন হয় না। যেমন 'সানবুশ' তুর্কী ও 'বেহেশতম' ফারসী। এ জাতীয় শব্দসমূহ সারীহ্ না কিনায়া সে ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। প্রকৃত কথা হলো, এর সিদ্ধান্ত এ সব ভাষা ও পরিভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞজনদের ওপর ন্যস্ত।[৭৬]

---

৭৪. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২৪৭; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৭৮; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩২২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮০।

৭৫. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮০; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩১৮; নায়লুল মাআরিব, খ. ২, পৃ. ২৩৭।

৭৬. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২৪৮; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৪৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮০; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১২৪-২৩৮।

www.amarboi.org

**সারীহ্ ও কিনায়া শব্দ দ্বারা যে তালাক পতিত হয়**

জমহুর ফকীহগণের মতে তিনটি অবস্থা ছাড়া সর্ব অবস্থায় স্বামীর তালাক রাজঈ হয়; বায়েন হয় না। তিনটি অবস্থা যাতে বায়েন তালাক পতিত হয় তা হলো :

ক. স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে তালাক দেয়া।

খ. মালের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক দেয়া। স্ত্রী যেহেতু চূড়ান্ত তালাক লাভের জন্যই সম্পদ ব্যয় করেছে, সেহেতু বায়েন তালাক সংঘটিত হবে।

গ. তিন তালাক; চূড়ান্ত তালাক পতিত হওয়ার জন্য এটি জরুরী। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে : فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "অতঃপর যদি সে তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।[৭৭]

এছাড়াও যদি আদালত কর্তৃক তালাক অর্পণ করা হয় তাহলেও বায়েন তালাক পতিত হবে। যেমন স্বামীর নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, ঈলা, দোষ-ত্রুটি মতানৈক্য ও ক্ষতির আশঙ্কা এবং খোরপোষদানে অক্ষম হওয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।

হানাফীগণ মনে করেন, কিনাঈ শব্দযোগে প্রদত্ত তালাক সাধারণত বায়েন তালাক হয়ে যায়। তবে সীমিত কিছু শব্দ এমন রয়েছে যার দ্বারা রাজঈ তালাক পতিত হয়। যেমন : اعْتَدِّي -তুমি ইদ্দত পালন কর, اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ -তোমার গর্ভাশয় মুক্ত কর, أَنْتِ وَاحِدَةٌ -তুমি এখন একা।

সারীহ শব্দযোগে কতিপয় শর্তের আলোকে তালাকে রাজঈ পতিত হয়। শর্তগুলো হলো :

১. তালাক হবে স্ত্রীর সাথে মিলন-উত্তর কালে। মিলনপূর্ব অবস্থায় তালাক দেয়া হলে তাতে বায়েনই পতিত হয়। তাই সারীহ শব্দযোগে তালাক প্রদান করুক আর কিনাঈ শব্দযোগে।

২. বিনিময় গ্রহণ করে তালাক না দেয়া। স্ত্রীর কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তালাক প্রদান করলে তা বায়েন তালাক হয়।

৩. তিন সংখ্যার সাথে তালাক যুক্ত না করা। তাই তা শব্দ প্রয়োগে, ইশারা যোগে কিংবা লেখার মাধ্যমে হোক না কেন।

৪. তালাক শব্দের সাথে এমন কোনো বিশেষণ যুক্ত না করা, যা বায়েন তালাকের ইঙ্গিত বহন করে।

৫. তালাকের সাথে এমন কোনো সংখ্যা কিংবা বিশেষণ যোগ না করা, যা বায়েন তালাক বুঝায়। যেমন তালাকদানের সময় তিন আঙ্গুল দেখিয়ে বলা, তুমি এরূপ তালাক। এরূপ করলে তিন তালাক হবে।

---

৭৭. সূরা আল-বাকারা, ২৩০।

www.amarboi.org

**দ্বিতীয়ত : রাজঈ ও বায়েন তালাক**

রাজঈ তালাক হলো, যাতে স্বামীর জন্য নতুন আকদ ছাড়াই স্ত্রীকে ইদ্দতের ভিতর ফিরিয়ে আনা জায়েয। বায়েন তালাক হলো, যার ফলে তাৎক্ষণিক বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। বায়েন তালাক দুই প্রকার :

১. ক্ষুদ্র বায়েন তালাক

২. বৃহৎ বা চূড়ান্ত বায়েন তালাক।

একটি বা দুইটি তালাকদানের মাধ্যমে যা হয় তাকে ক্ষুদ্র বায়েন তালাক বলে। পক্ষান্তরে তিনটি তালাক হয়ে গেলে তা হয় বৃহৎ বা চূড়ান্ত বায়েন তালাক। তালাক তিনটি বায়েন হোক আর রাজয়ী হোক।

রাজয়ী তালাক দিলে ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীকে নতুন আক্‌দ ছাড়াই ফিরিয়ে আনা বৈধ। ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কেবল নতুন আক্‌দের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়।

একটি বা দু'টি বায়েন তালাক দিলে ইদ্দতের ভিতর কিংবা ইদ্দতের পর নতুন আকদের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তার ওপর বড় ধরনের বায়েন তালাক পতিত হয়। এ ধরনের তালাকদানের পর স্ত্রী আর তার জন্য হালাল থাকে না। তবে ইদ্দত অন্তে মহিলা যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং তার সাথে মিলিত হয়। অতঃপর স্ত্রী যদি উক্ত স্বামী হতে মৃত্যুজনিত কারণে অথবা কোনো বৈধ পন্থায় বিচ্ছিন্ন হয় এবং তার ইদ্দত পূর্ণ হয় তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে নতুন আকদের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা বৈধ। কারণ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"যদি স্ত্রীকে সে তালাক দেয় তবে উক্ত স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অতঃপর যদি তাকে দ্বিতীয় তালাক দেয় আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তবে তাদের উভয়ের জন্য পরস্পরকে বিয়ে করতে কোনো পাপ নেই। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন"।[৭৮]

**বৃহৎ (চূড়ান্ত) বায়েন তালাক ও ক্ষুদ্র (ফেরতযোগ্য) বায়েন তালাক**

সাধারণভাবে বায়েন তালাক বলতে ক্ষুদ্র বায়েনকে বুঝায়। বৃহৎ বা চূড়ান্ত বায়েন হতে হলে তিন তালাক হতে হবে। স্বামী যখন তার স্ত্রীকে একবার বায়েন

---

৭৮. সূরা আল-বাকারা, ২৩০।

www.amarboi.org

তালাক কিংবা বায়েন তালাক দেয়। অতঃপর আবার তাকে রাজআত বা আকদের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেয়। আবার তাকে রাজয়ী কিংবা বায়েন তালাক দেয় অতঃপর আবার তাকে রাজআত কিংবা আকদের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেয়, আবার যদি তাকে তৃতীয় বার তালাক দেয় তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে এবং স্বামী হতে সে চূড়ান্তরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বাণী :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"তালাক দু'বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমতো রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে"।[৭৯]

আরো ইরশাদ হয়েছে : فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে"।[৮০]

এক তালাকদানের পর যদি তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর আবার তালাক দেয় তাহলে এ দ্বিতীয়বারের তালাক পতিত হবে না। কেননা দাম্পত্যজীবন সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে সে তালাক লাভের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। এমনিভাবে তৃতীয়বার তালাক দিলেও তা কার্যকর হবে না। তবে এর মাধ্যমে যে বিচ্ছিন্নতা হয় তা হয় লঘু ধরনের। নতুন আকদের মাধ্যমে স্ত্রীকে গ্রহণ করা পূর্বের স্বামীর জন্য হলোল।

সঙ্গম হওয়া স্ত্রীকে যদি প্রথমে এক তালাক দেয় অতঃপর আবার ইদ্দতের ভিতর দ্বিতীয় তালাক দেয়। এতে যদি প্রথম তালাক রাজঈ দিয়ে থাকে তাহলে জমহুরদের মতে দ্বিতীয় তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। অতঃপর ইদ্দতের মধ্যে যদি তৃতীয় তালাক দেয় এবং দ্বিতীয় তালাকও যদি রাজয়ী দিয়ে থাকে তবে তৃতীয় তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে এবং চূড়ান্তভাবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এ সিদ্ধান্ত তখন কার্যকর হবে যখন স্বামী দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দ্বারা প্রথম তালাককে জোরদার করার নিয়ত না করে থাকে। আর যদি প্রথম তালাক জোরদার করার নিয়ত করে তাহলে দিয়ানাত তথা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে, বিচারিক দিক দিয়ে হবে না।

স্ত্রীকে যদি একটি বায়েন তালাক দেয় অথবা এক সঙ্গে দু'টি তালাক দেয়, অতঃপর ইদ্দতের মাঝে যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দেয় তাহলে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীগণের মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক পতিত হবে না। কারণ প্রথম তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী বিবাহের গণ্ডির বাইরে চলে গেছে। ফলে সে তালাকলাভের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে।[৮১]

---

৭৯. সূরা আল-বাকারা, ২২৯।

৮০. সূরা আল-বাকারা, ২৩০।

৮১. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯৩।

www.amarboi.org

হানাফীগণের মতে, প্রথম তালাক কিংবা দ্বিতীয় তালাক যখন সারীহ শব্দযোগে প্রয়োগ করা হয় তখন দ্বিতীয় তালাক ও তৃতীয় তালাক পতিত হবে। তা সারীহ শব্দ কিংবা কিনাঈ যে কোনো শব্দ দ্বারা প্রয়োগ করা হোক না কেন। আর প্রথম তালাক ও দ্বিতীয় তালাক যদি বায়েন তালাক হয় তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক পতিত হয়ে যাবে যখন তা কেবল সারীহ শব্দ যোগে প্রয়োগ করা হবে। আর যদি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় তালাক বায়েন হয় এবং তাতে প্রথম তালাক সম্পর্কে অবহিতকরণের সম্ভাবনা থাকে যেমন স্ত্রীকে বলে أَنْتِ بَائِنٌ بَائِنٌ তুমি বায়েন তাহলে তা পতিত হবে না। কারণ তার সম্ভাবনা আছে। আর যদি পূর্বের তালাক সম্পর্কে অবহিতকরণের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলে : তুমি বায়েন অতঃপর আবার বলে তুমি বায়েন, যেহেতু এখানে পূর্বের তালাক সম্পর্কে অবহিতকরণের সম্ভবনা নেই, তাই তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে।[৮২]

যখন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তিন তালাক বলে উল্লেখ করে তাহলে জমহুর ফুকাহার মতে তিন তালাকই হবে। অনুরূপ দু'টি তালাকের কথা উল্লেখ করলে দু'টি তালাকই পতিত হবে। যেমন স্ত্রীকে বলল, তুমি তিন তালাক অথবা বলল, তুমি দুই তালাক।[৮৩]

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে : أَنْتِ طَالِقٌ أَكْبَرَ الطَّلَاقِ অথবা أَغْلَظَهُ 'তুমি তালাক বড় তালাক অথবা 'তুমি খুবই কঠিন তালাক' এর দ্বারা যদি সে তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে অন্যথায় একটি বায়েন তালাক পতিত হবে।

শাফেয়ীগণের মতে যদি স্ত্রীকে বলে, 'তুমি তালাক'-আর এর দ্বারা সংখ্যার নিয়ত করে তাহলে যার নিয়ত করবে তাই পতিত হবে। 'তুমি এক তালাক' একথা বলার পর যদি বলে আমার নিয়ত ছিল কয়েকটি। তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। কারণ নিয়তের চেয়ে উচ্চারণের শক্তি অধিক। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি মুক্ত" কিংবা 'তুমি বায়েন' বা 'তোমার রশি তোমার কাঁধে' অথবা বলে 'তুমি তোমার পরিজনের সাথে মিলে যাও' এ বাক্যগুলোর ব্যাপারে ইমাম আহমদ বলেন, স্বামী এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করলে আমার মতে তিন তালাকই পতিত হবে। তার সাথে সহবাস হোক বা না হোক। তবে এ ধরনের ফতোওয়া দিতে আমি অপছন্দ করি।[৮৪]

---

৮২. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৩০৯।
৮৩. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪১৮।
৮৪. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩২৪।

www.amarboi.org

তবে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মতে স্বামী যদি এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কারণ শব্দটিতে এর অবকাশ আছে। তিন তালাকের নিয়ত না করলে তা পতিত হবে না।

মালেকীগণ পূর্বোক্ত মাসআলাসমূহে জমহুরের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে শেষোক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের অভিমত হলো, সাধারণভাবে তিন তালাক সংঘটিত হবে। তবে খুলা অথবা মিলনের পূর্বের ঘটনা হলে এক তালাক হবে।[৮৫]

কেউ যদি এক তালাকের কথা উচ্চারণ করে তিন তালাকের নিয়ত করে অনুরূপভাবে তিন তালাক উচ্চারণ করে এক তালাকের নিয়ত করে তাহলে সর্বসম্মত ভাবে এধরনের নিয়তের কোনো মূল্য নেই।

'তুমি তালাক' এরূপ বলে যদি কেউ তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে হানাফী মাযহাবমতে এক তালাকই পতিত হবে। হাম্বলী মাযহাবের দু'টি অভিমতের একটি হলো এর অনুকূলে আর অপর অভিমত হলো, তিন তালাক পতিত হবে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী র. অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।[৮৬]

## তৃতীয়ত সুন্নতী ও বিদআতী তালাক

তালাকের শরয়ী গুণাগুণ বিবেচনায় ফকীহগণ একে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুন্নতী ও বিদআতী।

**সুন্নতী তালাক :** তালাক প্রদানে যদি সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাহলে তাকে সুন্নতী তালাক বলে।

**বিদআতী তালাক :** যে তালাকে সুন্নাতের অনুসরণ করা হয়নি তাকে বিদআতী তালাক বলে ।

তালাক অর্থ এই নয় যে, তালাক প্রদান করা সুন্নত। কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, তালাকদান আল্লাহর নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য হালাল কাজ। সুন্নতী ও বিদআতী তালাকের অনেক বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরাম দ্বিমত পোষণ করেছেন। আবার অনেক বিষয়ে তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ :

হানাফীগণ তালাককে সুন্নতী ও বিদআতী তালাকে বিভক্ত করেছেন। সুন্নতী তালাককে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তাহলো এক. হাসান দুই. আহসান।

আহসান তালাক হলো : তালাকদাতা তার স্ত্রীকে এমন পবিত্র অবস্থায় একটিমাত্র রাজ'য়ী তালাক দেবে, যার মধ্যে সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয়নি। এ তালাকটি ঋতু

---

৮৫. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩২৫; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৬৪।

৮৬. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৬৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩২৬; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪২০।

www.amarboi.org

অবস্থায় কিংবা প্রসব পরবর্তী স্রাবের পূর্বে হতে পারবেনা। মহিলার সাথে সন্দেহ বশত অন্য কেউ এমতাবস্থায় মিলিত হয়েছে বলেও প্রমাণিত হবে না। ঋতু অবস্থায় মহিলা যদি যিনা করে অতঃপর সে ঋতুমুক্ত হয়ে যায় তৎপরবর্তীকালে স্বামী তাকে তালাক দিলে তা বিদআতী তালাক হবে না।

হাসান তালাক : স্ত্রীকে মিলনবিহীন পবিত্র অবস্থায় একটি মাত্র রাজঈ তালাক দেয়া, ঋতু অথবা প্রসবজনিত স্রাবকালীন অবস্থায় না দেয়া। অতঃপর অপর দু'টি তালাক দু'টি পবিত্র অবস্থায় দেয়া যার মাঝে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয়নি। মহিলা যদি ঋতুস্রাবের উপযোগী না হয় তাহলে তাকে তিন মাসে তিনটি তালাক দেয়া। যেমন স্ত্রী বার্ধক্যে পৌঁছার ফলে হায়েজ বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে তাকে তিন মাসে তিন তালাক দেয়া।

হাসান তালাকের এ সংজ্ঞা সেসব স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রোযোজ্য হবে, যাদের সাথে স্বামীর দৈহিক মিলন হয়েছে অথবা তাকে নিয়ে একান্তে বাস করেছে। যার সাথে মিলন হয়নি কিংবা তার সাথে নির্জনে বাস করেনি এমন স্ত্রীর ক্ষেত্রে হাসান তালাক হলো, তাকে একটিমাত্র তালাক দেয়া। তা ঋতুকালীন কিংবা ঋতুমুক্ত অবস্থায় তা দেখার বিষয় নয়। তা বায়েন তালাক হলেও বাধা নেই। কারণ এধরণের স্ত্রীর তালাক বায়েনই হয়ে থাকে।

এছাড়া অন্য যে কোনো পন্থায় প্রদত্ত তালাক ফুকাহায়ে কেরামের মতে বিদআতী তালাক বলে পরিগণিত। যেমন : দুই তালাক কিংবা তিন তালাক এক সঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে একটি পবিত্র (طهر) অবস্থায় দেয়া অথবা ঋতু অবস্থায় কিংবা প্রসব পরবর্তী স্রাব অবস্থায় তালাক দেয়া অথবা এমন ঋতুমুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া যার মাঝে সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয়েছে। কিংবা এমন ঋতুমুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া যার পূর্ববর্তী ঋতুতে সে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছে। ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়ার পর আবার ঋতু পরবর্তী পবিত্র (তুহর) অবস্থায় তালাক দিলে দ্বিতীয়টিও বিদআতী তালাক হিসেবে গণ্য হবে। সুন্নতী তালাকদানের জন্য উচিত ছিল তাকে দ্বিতীয় ঋতু আসার অপেক্ষা করা। এ হতে পবিত্র হওয়ার পর তালাক দিলে সেটি হবে সুন্নতী তালাক। যদি ঋতুকালে তালাক দেয়ার পর প্রত্যহার করে নেয় অতঃপর তৎপরবর্তী পবিত্রতাকালে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে উক্ত তালাক গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুসারে বিদআতী তালাক হিসেবে গণ্য হবে। কুদূরীর লেখক বলেন, এটি সুন্নতী তালাক হবে। স্ত্রী যদি গর্ভবতী না হয় কিংবা বয়স কম হওয়ার কারণে ঋতুমতি না হয় অথবা যদি সে বার্ধক্যের কারণে ঋতু বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তালাকটি সুন্নতী তালাক হিসেবে পরিগণিত হবে। স্ত্রীর সাথে মিলিত হোক বা না হোক। কারণ সে সর্ব অবস্থায় পবিত্র (ঋতুমুক্ত)। তবে তাকে একের অধিক তালাক দেয়া যাবে না। একাধিক তালাক দিলে তা হবে বিদআতী তালাক।

www.amarboi.org

হানাফীগণ সাধারণত নিম্নের তালাকসমূহকে বিদআত বহির্ভূত মনে করেন : খুলা তালাক, অর্থের বিনিময়ে তালাক এবং রোগের কারণে তালাক। এগুলো বিদআতী তালাক বলে গণ্য হবে না যদিও তা ঋতু (হায়েজ) অবস্থায় প্রদান করা হয়। কারণ এটি হলো প্রয়োজনহেতু তালাক। অনুরূপভাবে ঋতুমতি অবস্থায় যদি তাকে তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া হয়। এতে যদি সে ঋতু অবস্থায় অথবা ঋতুর পর অধিকার প্রয়োগ করে তাতেও তালাক বিদআতী বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে যদি তাকে ঋতুকালের পূর্বে তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া হয় আর সে ঋতুকালে তা প্রয়োগ করে তাতেও বিদআতী তালাক হবে না। কারণ এটি শুধুমাত্র স্বামীর কোনো কাজ নয়।[৮৭]

জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম শরয়ী গুণাগুণ বিচারে তালাককে সুন্নতী ও বিদআতী এই দুই প্রকারে ভাগ করেছেন। তবে তারা সুন্নতী তালাককে কোনোভাগে বিভক্ত করেন নি। তাদের মতে সুন্নতী তালাক একপ্রকার মাত্র। হানাফীগণ অবশ্য এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম তালাককে সুন্নতীও বিদআতী এবং সুন্নতী ও নয় বিদআতীও নয় এমন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। তাদের মতে এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত। আর যে তালাক সুন্নতীও নয় বিদআতীও নয়, তাকে হানাফীগণ বিদআতী তালাক হতে পৃথক করে দিয়েছেন। যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

হানাফীগণের মতে বর্ণিত হাসান ও আহসান উভয় তালাক জমহুরের মতে সুন্নতী তালাকের অন্তর্ভুক্ত। তবে বিদআতী তালাকের ব্যাপারে জমহুরের সাথে হানাফীগণের দ্বিমত রয়েছে। যেমন তিন হায়েজে তিন তালাক হানাফীগণের মতে সুন্নতী আর জমহুরের মতে তা বিদআতী। অনুরূপভাবে দৈহিক মিলন হয়নি এমন পবিত্র (طهر) মেয়াদে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়াও শাফেয়ীগণের মতে সুন্নতী তালাক। হাম্বলীগণ হতেও এ ধরণের একটি উক্তি রয়েছে। আল-খারকী এ মতটি গ্রহণ করেছেন। আর মালেকীগণ হানাফীদের মত একে হারাম বলেছেন। হাম্বলীগণেরও এটি দ্বিতীয় অভিমত।[৮৮]

সুন্নতী ও বিদআতী তালাক নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ। আল-কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

“হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে”।[৮৯]

---

৮৭. আদ-দুররুল মুখতার ও ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২৩০-২৩৪

৮৮. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩০১; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩১১; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৬১।

৮৯. সূরা আত-তালাক, ১।

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রীকে এমন পবিত্র (طهر) অবস্থায় তালাক দেয়া, যাতে তার সাথে মিল হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[৯০]

হাদীসে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে উমর রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট জানতে চাইলে তিনি বললেন, তাকে বল, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর তাকে ঋতু হতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়। অতঃপর মহিলা আবার ঋতুমতী হবে এবং তা হতে আবার পবিত্র হবে। অতঃপর সে চাইলে স্ত্রীকে রাখতে পারে আর চাইলে তার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক দিবে। এটিই হলো ইদ্দত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদেরকে তালাকদানের জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৯১]

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নতী তালাক হলো, স্ত্রীকে পবিত্র (طهر) মেয়াদে সহবাসমুক্ত অবস্থায় একটিমাত্র তালাক দেয়া। অতঃপর সে ঋতুমতী হয়ে আবার তা থেকে পবিত্র হওয়ার পর আরো একটি তালাক দেয়া। আবার সে ঋতুমতী হওয়ার পর তা থেকে পবিত্র হওয়ার পর আরো একটি তালাক দেয়া। অতঃপর সে আর এক ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করবে।[৯২]

সুন্নতী ও বিদআতী তালাকের মাঝে বড় ধরনের তারতম্য হলো, সুন্নতী তালাক পরবর্তীকালে অনুতাপের হাত থেকে রক্ষা করে, স্ত্রীর ইদ্দতকে দীর্ঘায়িত হতে দেয় না। ফলে মহিলার তালাকজনিত কারণে ভোগান্তি কম হয়।

## বিদআতী তালাক কার্যকর হওয়া এবং তৎপরবর্তী ইদ্দত পালন অপরিহার্য হওয়া সম্পর্কিত বিধান

জমহুর ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত হলো, বিদআতী তালাক পতিত হয়। তারা এতেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সুন্নাহর পরিপন্থী হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে তালাকদাতা গুনাহগার হবে।

স্ত্রীকে ঋতুকালীন অবস্থায় তালাক দিলে গুনাহ হতে পরিত্রাণের জন্য তাকে ফিরিয়ে আনা ওয়জিব। এটি হানাফীগণের বিশুদ্ধ অভিমত। হানাফী মতাবলম্বী কুদূরীর অভিমত হলো, এমতাবস্থায় তাকে ফিরিয়ে নেয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।[৯৩]

---

৯০. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৯৮।
৯১. হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।
৯২. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৯৮; আন-নাসাঈ, আস-সুনান, খ. ৬, পৃ. ১৪০।
৯৩. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২৩৩।

www.amarboi.org

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, বিদআতী তালাকদানের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা সুন্নত। হাম্বলীগণ একে মুস্তাহাব বলে ব্যক্ত করেছেন।

মালেকীগণ বিদআতী তালাককে হারাম ও মাকরূহ এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। হারাম হলো, হায়েয কিংবা নিফাস অবস্থায় সাধারণভাবে তালাক দেয়া। মাকরূহ হলো, যে তালাক হায়েয কিংবা নিফাস অবস্থায় প্রদান করা হয়নি; বরং এমন পবিত্র (طهر) মেয়াদে তালাক দেয়া যাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে হায়েয ও নিফাসকালে তালাকদাতা স্বামীকে হারাম কাজ থেকে পরিত্রাণের জন্য স্ত্রীকে ফেরত আনতে বাধ্য করা হবে। তবে মাকরূহ তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ফেরত আনতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। যদিও কাজটি বিদআত[৯৪] তালাক সম্পর্কিত এসব আলোচনা শুধুমাত্র রাজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে। তালাক বায়েন হলে তা ক্ষুদ্র হোক আর বড় হোক প্রত্যাহার করার অবকাশ নেই।

**চতুর্থত :** কার্যকর তালাক, সময়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং শর্তের সাথে সংযুক্ত তালাক। তালাকের বেলায় সাধারণ নিয়ম হলো, তা কার্যকর হয়ে যাওয়া। তবে তা সম্পৃক্ত ও সংযুক্তকরণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

**ক. কার্যকর তালাক :** কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত ও সংযুক্তকরণ ছাড়া সরাসরি তালাক দেয়া। যেমন কেউ বলল, 'তুমি তালাক' কিংবা তালাকের নিয়তে বলল, 'তুমি তোমার পরিবারের বাড়িতে চলে যাও'।

**বিধান :** এতে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক কার্যকর হয়ে যায় এবং ইদ্দত গণনার পর্ব শুরু হয়।

**খ. সম্পৃক্তকরণ তালাক :** তালাক কার্যকর হতে কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন বলল, 'তুমি আগামী মাসের প্রথমদিকে তালাক', বা 'দিনের শেষে তালাক', অথবা 'তুমি গতকাল তালাক'।

**বিধান :** জমহুরের মতে ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া তালাক সংগে সংগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে থাকে। তবে যে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা পাওয়ার পূর্বে তালাক পতিত হয় না। যেমন বলল, 'তুমি মাসের শেষে তালাক'। এতে মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না।

অতীত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে যদি তালাক প্রদান করা হয় আর এর দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে তালাক কার্যকরের ইচ্ছা করা হয় তাহলে তা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর

---

৯৪. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৬১-৩৬২।

www.amarboi.org

হবে। আর কেউ কেউ বলেন, এতে তালাক বাতিল হয়ে যাবে। এটি হানাফী মাযহাবের মত।[৯৫]

মালেকীগণ বলেন, যদি তালাককে ভবিষ্যতকালের সাথে সম্পৃক্ত করে, যেমন স্ত্রীকে বলে, 'তুমি এক বছর পর তালাক' অথবা বলে, 'আমি যেদিন মারা যাবো সেদিন তুমি তালাক'। এতে সঙ্গে সঙ্গে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যখন অতীতকালের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করে বলে, 'তুমি গতকাল তালাক', আর এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।[৯৬]

হাম্বলীগণ বর্ণনা করেন, যদি কোনো ধরনের নিয়ত ছাড়া বলে, 'তুমি গতকাল তালাক'। এতে ইমাম আহমদের প্রকাশ্য অভিমত হলো, তালাক পতিত হবে না।

কাজী তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে বলেন, তালাক পতিত হবে। আর যদি পূর্বের খবর দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা মেনে নেয়া হবে আর তালাক পতিত হবে।[৯৭]

ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব হানাফী মাযহাবের অনুরূপ। তবে শাফেয়ীগণ এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন যে, যদি তালাককে অসম্ভব অতীতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় আর এতে যদি কোনো কিছুর নিয়ত না থাকে তাহলে তাদের মতে তালাক পতিত হবে। যেমন স্ত্রীকে বলল, 'তোমার জন্মের পূর্বে তুমি তালাক'। এতে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হবে, যখন তাতে কোনোরূপ নিয়ত না থাকবে।[৯৮]

## (গ) শর্তের সাথে সংযুক্ত তালাক

কোনো বাক্য অন্য কোনো বাক্যের সাথে সংযুক্ত করে তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে যে শর্তারোপ করা হয় তা যদি তালাকদাতার বা তালাকপ্রাপ্তার কিংবা তৃতীয় কারো দ্বারা আরোপ করা হয় তাহলে জমহুরের মতে রূপক অর্থে একে ইয়ামীন বা কসম বলা হয়। কারণ, এতে কসমের অর্থ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে কসম বলতে শক্তিশালীকরণ বুঝানো হয়েছে। যেমন : কেউ তার স্ত্রীকে বলল, 'অমুকের ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তালাক'। অথবা বলল, আমি অমুকের নিকট গেলে তুমি তালাক। কিংবা বলল, তোমার সাথে অমুক সাক্ষাত করলে তুমি তালাক।

যদি তালাক কারো কাজের সাথে সংযুক্ত না করা হয়, যেমন স্ত্রীকে বলল, 'যদি সূর্য উদিত হয় তাহলে তুমি তালাক'। এর হুকুম ইয়ামীন বা কসমের অনুরূপ

---

৯৫. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২৬৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩১৪; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩৬৩

৯৬. আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৯০

৯৭. আল-মুগনি, খ. ৭, পৃ. ৩৬৩

৯৮. মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩১৫।

www.amarboi.org

হলেও এতে কসমের অর্থ না পাওয়ার কারণে একে কসম বলা যাবে না। কোনো কোনো ফকীহ্ অবশ্য একে কসম বলেছেন।

**হুকুম :** জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করে তালাক দেয়া জায়েজ আছে। আরোপিত শর্তটি পাওয়া গেলে তালাক কার্যকর হবে। শর্তের অবর্তমানে তালাক কার্যকর হবে না। শর্তটি স্বেচ্ছায় পূর্ণ করা হোক বা ভুলে হোক কিংবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে হোক সর্বাবস্থায় তালাক কার্যকর হবে বলে জমহুরের অভিমত।

ভুলক্রমে শর্ত পূরণ হওয়া এবং বলপ্রয়োগে পূর্ণ করানোর ব্যাপারে শাফি'ঈগণের দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হলো, এতে তালাক পতিত হবে না।[৯৯]

উল্লেখ্য যে, সংযুক্তকরণ শর্তটি যে পর্যন্ত পাওয়া না যায় সে পর্যন্ত স্ত্রীর নিকটবর্তী হতে কোনো বাধা নেই। এটি জমহুরের অভিমত। ইমাম মালেক র. বলেন, তার জন্য ঈলাকলের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয়া হলো বাঞ্ছনীয়।

## শর্তযুক্ত তালাক সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ

১. শর্তযুক্ত তালাকদানের সময় আরোপিত শর্তটি অনুপস্থিত থাকতে হবে এবং ভবিষ্যতকালে তা পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে সম্ভাবনা থাকবে। অতঃপর শর্ত আরোপের সময় যদি শর্তটি বিদ্যমান থাকে তাহলে তা তাৎক্ষনিক কার্যকর হয়ে যাবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, 'তোমার পিতা এখন আমাদের সঙ্গে থাকলে তুমি তালাক'। অথচ বর্তমানে তিনি তাদের সাথে রয়েছেন।

ভবিষ্যত শর্তটি পাওয়া যাওয়া অসম্ভব হলে শর্তযুক্ত তালাকটি হানাফী মাযহাব মতে অনর্থক হবে। বর্তমানেও তা কার্যকর হবে না, ভবিষ্যতেও না। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, 'তোমার পিতা জীবিত হয়ে ফিরে আসলে তুমি তালাক' অথচ তিনি মৃত্যবরণ করেছেন। আর মালেকী মতে তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হবে। হাম্বলী মতে এতে দু'ধরনের উক্তি রয়েছে।[১০০]

২. শর্তের সংযুক্তিটি তালাক শব্দ উচ্চারণের সাথে যুক্ত হতে হবে, কথার সাথে মিলিয়ে আরোপ করতে হবে। তালাকদানের পর কিছুক্ষণ চুপ থেকে অথবা অন্যের সাথে কথা বলে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে শর্ত আরোপ করলে তা অকার্যকর হিসেবে গণ্য হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তালাক কার্যকর হবে। যেমন কেউ স্ত্রীকে বলল, 'তুমি তালাক' এই বলে কিছুক্ষণ চুপ থাকল অতঃপর বলল, 'যদি তুমি

---

৯৯. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩১৬; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩৭৯।

১০০. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৭০; মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯২।

www.amarboi.org

অমুকের ঘরে প্রবেশ কর'। অথবা বলল, 'তুমি তালাক' অতঃপর বলল, 'আমাকে পানি দাও' তারপর বলল, 'যদি তুমি অমুকের বাড়ীতে প্রবেশ না কর'।

৩. তালাকের কথাটি প্রতিউত্তর উদ্দেশ্যে বলা হবে না। প্রতিউত্তর উদ্দেশ্য হলে তাৎক্ষনিক তালাক কার্যকর হবে। শর্তের সাথে তা যুক্ত হবেনা। যেমন-স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, 'হে ইতর!' এর উত্তরে স্বামী বলল, 'আমি যদি তেমন হই তাহলে তুমি তালাক'। একথা দ্বারা স্বামী তার প্রতিউত্তর দানের ইচ্ছা করবে তালাকের শর্ত নয়। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তালাক পতিত হয়ে যাবে। স্বামীর বাস্তবিক ইতর হওয়া এবং না হওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য স্বামী যদি প্রতিউত্তর দানের উদ্দেশ্যে না বলে; বরং এ কথা দ্বারা তালাককে ঝুলন্ত রাখার নিয়ত করে তাহলে দীনী বিচারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তালাক উক্ত শর্তের সাথে ঝুলন্ত হয়ে যাবে।[১০১]

৪. যে জিনিসের সাথে শর্তটি আরোপ করছে তার উল্লেখ থাকতে হবে। জিনিসটির উল্লেখ না থাকলে শর্তারোপ করা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। এটি হানাফীগণের অভিমত। একই মত ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর। তবে ইমাম মুহাম্মদের মতে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। যেমন সে বলল, তুমি তালাক যদি ঘরে প্রবেশ করো।

৫. শর্তারোপের জন্য নির্দিষ্ট অব্যয় বাক্যের মাঝে বর্তমান থাকতে হবে। নির্দিষ্ট অব্যয় ছাড়াও যদি শর্তারোপের অর্থ অনুমিত হয় তাতেও চলবে।

৬. তালাকের শর্ত সংযুক্ত করার সময় স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে হবে। তা প্রকৃত অর্থে হোক বা আইনগত বিবেচনায় হোক। যেমন– স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকলে বিবেচনায় থাকে যে সে অমুকের স্ত্রী।

৭. যে জিনিসের ওপর শর্তারোপ করা হয়েছে তা কার্যকর হওয়ার সময় উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক বর্তমান থাকা। সে সম্পর্ক প্রকৃত অর্থে হোক বা আইনগত বিবেচনায় হোক। যেমন– তালাকে রাজয়ী কিংবা বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনরতা স্ত্রী।

৮. তালাক পতিত হওয়ার জন্য শর্ত আরোপের সময় স্বামীকে তালাকদানের উপযুক্ত হতে হবে। যেমন তাকে বালেগ ও সুস্থির জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। এটি জমহুরদের মত। তবে এতে হাম্বলীগণ ভিন্নমত পোষণ করেন।

**শর্তের সাথে সংযুক্ত তালাকের কার্যকারিতা**

স্বামী যখন তালাককে কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করবে তখন সংযুক্ত শর্ত

---

১০১. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪।

www.amarboi.org

হাসিল হয়ে গেলে তা একবারই কার্যকর হবে। সঙ্গে সঙ্গে একবারই স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে। স্ত্রী যদি ইদ্দতের ভিতর বা পরবর্তীকালে পুনরায় উক্ত কাজ করে তাহলে তার ওপর আর তালাক পতিত হবে না। কারণ তা কার্যকর হয়ে গেছে। তবে যদি كلما 'যখনই' শব্দ প্রয়োগ করে তালাক দেয় তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার তালাক পতিত হবে। কারণ শব্দটি বারবার পতিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অনুরূপ যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, 'অমুকের ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তিন তালাক'। অতঃপর তাকে সরাসরি একটি তালাক দিল। তখনও সে ঘরে প্রবেশ করেনি। অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত পালন করল। আর শর্তারোপকৃত ঘরে প্রবেশ করল। তারপর স্বামীর নিকট নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরে এলে তা জায়েয। কিন্তু এরপর যদি সে স্ত্রী তালাকের শর্তারোপ করা গৃহে প্রবেশ করে তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। এতে কোনো তালাক পতিত হবে না। কারণ ইদ্দতের পর প্রথম বার প্রবেশ করায় তা কার্যকর হয়ে গেছে।

## দু'টি শর্তের ওপর তালাক সংযুক্তকরণ

দুই বা ততোধিক শর্তের ওপর যখন স্ত্রীর তালাক সংযুক্ত করা হয়, তখন তার উপর তালাক পতিত হবে, বিবাহের ভিতরে সকল শর্ত পাওয়া সাপেক্ষে। অনুরূপভাবে ২য় বা শেষ তালাকও বিবাহের ভিতর পাওয়া যেতে হবে। অতএব প্রথম শর্তটি যদি বিবাহের ভিতর পাওয়া যায় আর দ্বিতীয় শর্তটি পাওয়া যায় বিবাহের পর যেমন স্ত্রীকে বলল, 'যায়দ ও আমর আসলে তুমি তালাক'। অতঃপর যায়দ আসল। এরপর সে স্ত্রীকে সরাসরি একটি তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর ইদ্দত শেষে আমর আসল। এতে তার আগমনে স্ত্রীর ওপর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। শর্তরোপের পর পরই যদি স্ত্রীকে সরাসরি একটি তালাক দিয়ে দেয়। অতঃপর প্রথমে যায়দ আগমন করে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর। অতঃপর তাকে পূণর্বার বিবাহ করে তারপর তার স্ত্রী অবস্থায় যদি আমর আগমন করে তাহলে তার উপর সংশ্লিষ্ট তালাক পতিত হবে। ফলে মহিলা দু'টি তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটি হানাফীগণের বর্ণনা।[১০২]

## তালাকের ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলা

যখন তালাক আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তখন একে ইসতিসনা ফিত-তালাক বলা হয়। এ বিষয়টি আল-কুরআনুল কারীমে হতে গৃহীত। ইরশাদ হয়েছে : إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ

"যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল এবং তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি"।[১০৩]

১০২. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।
১০৩. সূরা আল-কালাম, ১৭-১৮।

www.amarboi.org

সরল কথায় তালাক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 'ইনশাআল্লাহ' বলাকে ইসতিসনা ফিত তালাক বলে। এর দ্বারা তালাকের কার্যকরিতা বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ হানাফী ও শাফিয়ীগণের মতে তালাক পতিত হয় না। হাম্বলী ও মালিকীগণ এতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এতে তালাক পতিত হবে।

**তালাক হতে ইসতিসনা তথা পৃথকীকরণ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, তা হলো**

১. ইনশাআল্লাহ বাক্যটি কিংবা পৃথককৃত কথাটি পূর্বের কথার সাথে সম্পূর্ণ রূপে মিলিত থাকতে হবে, পরিভাষায় যাকে একটি বাক্য বলে জ্ঞান করা হয়। মাঝখানে অন্য কথার সন্নিবেশ করা হলে কিংবা মৌনতা অবলম্বন করা হলে, ইসতিসনা তথা পৃথক করা কথাটি অনর্থক হয়ে যাবে এবং তালাকের হুকুম কার্যকর হয়ে যাবে। যেমন, কেউ বলল, 'তুমি তালাক' অতঃপর কিছুক্ষণ মৌনতা অবলম্বন করে বলল, 'ইনশাআল্লাহ'। এতে ইনশাআল্লাহর কার্যকারিতা বাতিল হয়ে তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, 'তুমি দুই তালাক' অতঃপর মৌনতা অবলম্বন করে বলে, 'একটি বাদে'। তাহলে তার দু'টি তালাকই পতিত হবে। পৃথক করা বিষয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে। তাবে নিঃশ্বাস ফেলা কিংবা খাবার গ্রাস গলাধঃকরণ করা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন ধর্তব্য নয়।

২. মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে তালাক শব্দ উচ্চারণের পূর্বে তালাকদাতার পৃথক করার নিয়ত থাকতে হবে। তবে হানাফীগণের মতে ইসতিসনা বা পৃথকীকরণের নিয়তের প্রয়োজন নেই। সম্ভবত হাম্বলী অভিমত হানাফীগণের অনুকূলে।

৩. ইসতিসনা তথা পৃথকীকরণের কথাটি কমপক্ষে এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্তত নিজে শুনতে পায়। ইসতিসনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কেবল নিয়ত যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

৪. গোটা বস্তুর সবটুকুকে পৃথক করা চলবে না। এতে পৃথকীকরণের অসারতা প্রমাণ হয় এবং গোটা বিষয়টি আরোপিত ব্যক্তির উপর বর্তায়। তবে হ্যাঁ, যদি বলা হয় 'তুমি তিন তালাক ইনশাআল্লাহ' এতে জমহুরের মতে কোনো তালাকই পতিত হবে না। তবে হাম্বলীগণ এতে দ্বিমত পোষণ করেন। ইসতিসনা বা পৃথকীকরণের কথাটি আগে বা পরে হওয়ার মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। ফলে 'তুমি তিন তালাক একটি ব্যতীত' আর 'তুমি একটি ব্যতীত তিন তালাক', উভয় ক্ষেত্রেই দুই তালাক পতিত হবে।

৫. পৃথকীকরণের কথাটি তালাকের অংশবিশেষ হতে পারবে না। এতে পৃথকীকরণ শুদ্ধ হবে না। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, 'তুমি তিন তালাক একটি তালাকের অর্ধেক ব্যতীত'। এতে তিন তালাকই পতিত হবে। আর যদি বলে, 'তুমি তিন তালাক একটি তালাকের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যতীত'। এতে জমহুরের মতে দুই তালাক পতিত হবে।

১৭—

www.amarboi.org

## তালাকদানের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ

তালাক হলো, উক্তিমূলক শরয়ী ক্ষমতার ব্যবহার। এটি কেবল স্বামীর অধিকার। সে যেমন তালাকদানের অধিকার রাখে তেমনি অন্যকে এজন্য প্রতিনিধি নিয়োগেরও অধিকার রাখে, বেচা কেনা ভাড়া দেয়া-নেয়া ইত্যাদি জাতীয় কর্ম কাণ্ডের ন্যায়। স্বামী যদি অন্য এক ব্যক্তিকে বলে, 'আমার অমুক স্ত্রীকে তালাক দানের জন্য তোমাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করলাম'। এতে যদি সে লোকটি স্বামীর পক্ষ হতে নির্দিষ্ট স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তা কার্যকর হবে। যদি স্বয়ং স্ত্রীকেই তালাক প্রয়োগের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, আর স্ত্রী নিজে নিজেকেই তালাক দেয় তাও কার্যকর হবে। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের অবস্থান নিম্নরূপ :

### প্রথমত : ইমাম আবু হানীফা র.-এর মাযহাব

নিজ স্ত্রীকে তালাকদানের জন্য অন্যকে অনুমতিদান তিন প্রকারের হয়ে থাকে। তা হলো : 'তাফবীজ' (تَفْوِيض), তাওকীল (تَوْكِيل) ও রিসালা (رِسَالَة)।

তাফবীজ (تَفْوِيض) : এ আরবী শব্দটির অর্থ হলো অর্পণ করা। হানাফীগণ বলেন, আরবীতে এর জন্য তিনটি শব্দ রয়েছে। তা হলো : تَخْيِيرٌ -ইখতিয়ার দান, أَمْرٌ بِيَد -হাতে ক্ষমতা অর্পণ, مَشِيئَة -চাওয়া।

যদি স্ত্রীকে বলে, 'তুমি তোমার নিজকে তালাক দাও'। এতে স্বামীর তালাক দানের নিয়ত না থাকলেও স্ত্রী নিজকে তালাক দিলে সারীহ্ বা স্পষ্ট তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু 'তুমি তোমাকে ইখতিয়ার তথা গ্রহণ কর' কিংবা 'তোমার দায়িত্ব বা বিষয়টি তোমার হাতে' বললে তা হয় অস্পষ্ট (كناية) তালাক। ফলে নিয়ত ব্যতীত এর দ্বারা তালাক পতিত হবে না। স্বীয় স্ত্রীকে তালাকদানের জন্য যখন কারো ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে তখন সেটিকে পরিভাষায় تَفْوِيضٌ -তাফবীজ বলা হয়। যেমন কেউ অন্য লোককে বলল, 'তুমি ইচ্ছা করলে আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান কর'। যদি 'তুমি ইচ্ছা কর' শব্দটি যোগ করা না হয় তাহলে সেটি ওয়াকীল বানানো হবে, তাফবীজ নয়। হানাফীগণের দৃষ্টিতে তাফবীজ ও উকীল বানানোর মাঝে বিভিন্ন অনুপাতে তফাত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(ক) الرُّجُوعُ তথা ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে, তাফবীজ تَفْوِيضٌ -এর ক্ষেত্রে স্বামীর তাফবীজ ফেরত নেয়ার অধিকার থাকে না। কারণ এটি দায়িত্বপ্রদত্ত ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত থাকে। আর সংযুক্তি হলো এক প্রকারের শপথ যা ফেরত নেয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং 'তুমি চাইলে আমার স্ত্রীকে তালাক দাও' একথা কাউকে বললে কিংবা তালাকের নিয়তে যদি স্ত্রীকে বলে اخْتَارِي نَفْسَكِ 'তুমি তোমাকে গ্রহণ করো'। এরূপ কথা বললে তা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তবে ওয়াকীল নিয়োগ করলে তালাকদানের পূর্বে সে দায়িত্ব ফিরিয়ে আনা যায়।

www.amarboi.org

**(খ)** মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে, উকীল মজলিসে এবং অন্য যে কোনো স্থানে মক্কেলের পক্ষে তালাক দিতে পারে। যদি না মক্কেল স্থান কাল নির্ধারণ করে দেয়। নির্ধারণ করে দিলে সে মুতাবেক সীমিত হয়ে যাবে। কিন্তু তাফবীজ আলোচিত মজলিসেই সীমাবদ্ধ থাকে। বৈঠক শেষ হয় গেলে তালাকদানের ক্ষমতা রহিত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয় অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে তা সংযুক্ত করে তাহলে ভিন্ন কথা । যেমন বলল, 'একমাসের মধ্যে তুমি নিজকে তালাক দাও'। কিংবা বলল, 'এক দিনের বা এক ঘণ্টার ভিতর তালাক দাও'। অথবা বলল, 'তুমি তোমাকে যখনই ইচ্ছা, তালাক দাও'। এ ধরনের তাফবীজ মজলিসের সাথে সীমিত থাকে না।

**(গ)** পতিত তালাকের ধরনের ক্ষেত্রে, তাফবীজ যদি স্পষ্ট শব্দ দ্বারা করা হয় তাহলে হানাফীগণের মতে এতে রাজয়ী তালাক পতিত হবে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, 'তুমি তোমাকে তালাক দাও'। আর যদি অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা বলে, যেমন বলল, 'তুমি নিজেকে নিজে গ্রহণ কর'-এর উত্তরে যদি স্ত্রী বলে, 'আমি আমাকে গ্রহণ করলাম'। এতে বায়েন তালাক পতিত হবে, যদি সে তালাকের নিয়ত করে। আর নিয়ত না করলে তালাক পতিত হবে না।

**(ঘ)** স্বামীর পাগলজনিত কারণে তাফবীজ বাতিল হয় না; কিন্তু তালাকদানের উকীল বানানোর পর স্বামী যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে তার কর্তৃক উকীল নিযুক্তি বাতিল হয়ে যায়। কারণ তাফবীজ হলো মালিক বানানো। স্বামীর পাগল হয়ে যাওয়ায় তা বাতিল হয় না। পক্ষান্তরে উকীল নিযুক্তি হলো কেবল প্রতিনিধি বানানো। পাগল হওয়ার দ্বারা সেটি বাতিল হয়ে যায়।

**(ঙ)** সাবালক, পাগল ও নাবালক সকলকেই তাফবীজ করা সহীহ হয়; কিন্তু উকীল হতে হলে তার যোগ্যতা থাকা শর্ত। নাবালিকা স্ত্রীকে যদি তালাকদানের তাফবীজ করা হয় আর সে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেটি কার্যকর হবে। অপরদিকে যদি তার নাবালক ভাইকে তালাকদানের উকীল নিয়োগ করে আর সে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেই তালাক কার্যকর হবে না। স্ত্রীকে যদি তালাক দনের জন্য তাফবীজ করা হয় আর সে ঐ সময় বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন থাকে অতঃপর সে যদি পাগল হয়ে যায় এবং নিজকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে হানাফীগণের মতে ইসতিহসানস্বরূপ তা সহীহ হবে না।[১০৪]

**দ্বিতীয়ত : মালেকী মাযহাব**

মালেকীগণের মতে তালাকে প্রতিনিধিত্ব চার ধরনের : উকীল নিয়োগ, ইখতিয়ার প্রদান, মালিক বানানো বা ক্ষমতা প্রদান ও বার্তা প্রেরণ।

---

১০৪. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৩১৪-৩১৯।

www.amarboi.org

তাদের মতে উকীল নিযুক্তি হলো, স্বামী কর্তৃক অপরকে তালাকদানের জন্য নিযুক্ত করা। সে স্ত্রী হোক বা অন্য কেউ তবে এতে উকীলকে তালাকদান হতে বাধা প্রদান করার স্বামীর অধিকার থাকে। যেমন স্ত্রীকে বলল, 'তোমার বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত'।

ইখতিয়ার প্রদান- অন্যকে তিন তালাকের ইখতিয়ার প্রদান করা। যেমন স্ত্রীকে বলল, 'আমাকে গ্রহণ কর কিংবা তুমি নিজকে নিজে গ্রহণ কর'।

মালিক বানানো-তালাককে অন্যের অধিকারে দেয়া এবং তার মালিকানায় তিন তালাক অর্পন করা। যেমন সে তার স্ত্রীকে বলল, 'তোমার বিষয় তোমার হাতে'। এ তিন ধরনের ক্ষমতাদানে কোনোটিতে মতৈক্য এবং কোনো টিতে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন :

(ক) ফিরিয়ে নেয়া বৈধ হওয়ার দিক থেকে : তালাকদানে উকীল নিযুক্তিতে স্বামীর অধিকার থাকে তাকে পদচ্যুত করার। উক্ত উকীল স্ত্রী হোক বা অন্য কেউ। তবে স্ত্রীর উকীল নিযুক্তি ছাড়াও যদি অন্য কোনো অধিকার দেয়া হয় তাহলে তার থেকে অধিকার কেড়ে নেয়া যায় না। যেমন স্ত্রীকে বলল, 'যদি তোমার সাথে আমি অন্য কাউকে বিবাহ করি তাহলে তোমার অধিকার তোমার নিকট থাকবে'।

(খ) সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ করার দিক থেকে : প্রতিনিধিত্ব যদি কোনো মজলিসের সাথে সীমিত রাখে তাহলে সেভাবেই তা সীমিত থাকবে। যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ করে তাহলে কেবল মজলিস পর্যন্ত তা সীমিত থাকবে না।

(গ) তালাকের সংখ্যার দিক থেকে : সহবাসকৃত স্ত্রীকে যদি কেবল তালাকদানের অধিকার দেয়া হয়, যাকে আরবী পরিভাষায় تَخْيِير বলে, তাহলে অধিকারপ্রাপ্তা স্ত্রী এক-দুই ও তিন তালাকের যা ইচ্ছা তা দিতে পারবে। আর যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত না হয়ে থাকে কিংবা তাকে তালাকদানের মালিকানা প্রদান করে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় تَمْلِيك বলে, তাহলে একাধিক তালাকদান হতে বাধা প্রদান করার অধিকার স্বামীর থাকবে। তবে এক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন :

১. তিন তালাকের কমসংখ্যক তালাকদানের অধিকার প্রদান করার স্বামীর নিয়ত থাকতে হবে।
২. স্ত্রী যদি তিন তালাক দিতে চায় তাহলে স্বামী কর্তৃক সঙ্গে সঙ্গে তার অস্বীকৃতি থাকতে হবে।
৩. স্বামীকে কসম করতে হবে যে, সে একাধিক তালাকের অধিকারদানের নিয়ত করেনি।

www.amarboi.org

**তৃতীয়ত : শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব**

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাকদানের প্রতিনিধি নিয়োগ বৈধ হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। যেমনটি তারা অন্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ মনে করেন। স্ত্রী ব্যতীত অন্যকে তালাকদানের ক্ষমতা অর্পণ করলে সেটি হয় উকীল নিযুক্তি। ফলে উকীল নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত ও বিধান রয়েছে এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে। স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতা অর্পণের। পরিভাষায় একে তাফবীজ (تفويض) বলে। শাফেয়ীগণের মতে এর ফলে স্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে তালাক দিতে পারবে। বিলম্ব করলে তার অধিকার খর্ব হবে। শাফেয়ীগণের এক অভিমত অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাকদানের ক্ষমতা অর্পণকে বলা হয় তাওকীল বা 'উকীল নিযুক্তি'। ফলে এতে তাৎক্ষণিকভাবে তালাকদানের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না।

**মুমূর্ষু ব্যক্তির তালাক (طَلَاقُ الْفَارِّ)**

মুমূর্ষু ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীকে বায়েন তালাকদানকে 'তালাকুল ফার' বা পলায়নপর ব্যক্তির তালাক বলে। ফুকাহায়ে কেরাম একে 'তালাকুল মারীজ' বা অসুস্থ ব্যক্তির তালাক শিরোনামে বর্ণনা করেছেন। সুস্থ স্বামী কর্তৃক যেমনিভাবে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়া শাস্ত্রসম্মত, তেমনিভাবে অসুস্থ অবস্থায়ও স্ত্রীকে তালাক দেয়া বৈধ। যতক্ষণ সে তালাক দানের পূর্ণ যোগ্যতা রাখে।[১০৫]

ফুকাহায়ে কেরাম এ অভিমতও পোষণ করেন যে, স্ত্রী যদি রাজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরতা হয় আর এমতাবস্থায় স্বামী মারা যায় তাহলে সে স্ত্রী ওয়ারিস হিসেবে সম্পত্তির অধিকারী হবে। স্বামী তার স্ত্রীর অনুরোধে তালাকপ্রদান করুক বা স্বেচ্ছায় প্রদান করুক। স্বামীর ইনতিকালে নতুনভাবে স্ত্রীকে মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালন করতে হবে।

তালাকদানের সময় যদি স্বামী মুমূর্ষু অবস্থায় না থাকে, বরং সুস্থ অবস্থায় সে স্ত্রীকে বায়েন তালাক প্রদান করে আর স্ত্রীর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় সে মারা যায়, সেক্ষেত্রে স্ত্রী তার ওয়ারিস না হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন আর স্ত্রী কেবল তালাকের ইদ্দতই পালন করবে। আর তালাকদানের সময় যদি স্বামী মৃত্যুশয্যায় থাকে তাতেও শাফেয়ীগণের নতুন অভিমত অনুযায়ী একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

হানাফী ও হাম্বলীগণের বিশুদ্ধ অভিমত হলো, মরণাপন্ন অবস্থায় স্বামী তালাক দিলে স্ত্রী স্বামীর ত্যায্য সম্পত্তির অধিকারী হবে এবং সে তালাক ও মৃত্যুর দু'টি

---

১০৫. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৭৯; মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯৪।

www.amarboi.org

ইদ্দতের মধ্য হতে তুলনামূলক দীর্ঘতর ইদ্দতটি পালন করবে। এটি শফেয়ীগণের প্রাচীন অভিমতও। এতে স্বামীকে গণ্য করা হবে ত্যায্য সম্পত্তি হতে স্ত্রীকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রকারীরূপে। ফিক্‌হের পরিভাষায় একে 'তালাকুল ফিরার' (পলায়নপর লোকের তালাক) নামে অভিহিত করা হয়।

তবে ফুকাহায়ে কেরাম এক্ষেত্রে কতিপয় শর্তারোপ করেছেন :

- তালাক দেয়া হবে স্ত্রীর আবেদন ছাড়াই ।
- বিচ্ছেদ হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সন্তুষ্টি থাকবে না।
- তালাক দেয়ার সময় হতে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের ভিতর স্ত্রীর মীরাস পাওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

তালাক যদি স্ত্রীর সন্তুষ্টি ও সম্মতিতে সঙ্ঘটিত হয় যেমন খুলা তালাক, সে ক্ষেত্রে স্ত্রী ওয়ারিস হবে না।

অনুরূপভাবে হানাফীগণের মতে বিচ্ছেদ যদি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ছেলেকে কিংবা অন্য কাউকে চুম্বন করার ফলে হয়ে থাকে তাতেও স্ত্রী ওয়ারিস হবে না। কারণ এতে বিচ্ছেদ স্বামীর পক্ষ হতে হচ্ছে না। ফলে তাকে মীরাস বঞ্চিতকারীরূপে অভিহিত করা যাবে না।

স্বামীর কাছে যদি স্ত্রী সাধারণ তালাকের আবেদন করে কিংবা রাজয়ী তালাকের আবেদন করে এতে স্বামী তাকে যদি বায়েন তালাক প্রদান করে তা এক বা একাধিক হোক অতঃপর স্ত্রীর ইদ্দতকালে স্বামী যদি মারা যায় তাহলে সে তার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। কারণ, সে বায়েন তালাক চায়নি এবং সে এতে সম্মতও ছিল না। স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী তার ওয়ারিস হবে না। জমহুরের মতে এর দ্বারা স্ত্রীর ইদ্দতের মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না। তাকে স্ত্রী তালাকের দরুন মীরাস বঞ্চিতকারীরূপে অভিযুক্তও করা যাবে না।

হাম্বলীগণের দ্বিতীয় একটি অভিমত হলো, স্ত্রী অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সে ওয়ারিস হবে। এটি তাদের বিশুদ্ধ অভিমতের পরিপন্থী।

মালেকীগণের অভিমত হলো, সর্বাবস্থায় স্ত্রী মীরাসের অধিকারী হবে, তাই তালাক স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে হোক আর না হোক। এমনকি স্ত্রীর ইদ্দতপালন শেষে যদি স্বামী মারা যায় এবং অন্য কাউকে সে স্বামী হিসেবে বরণ করেও নেয় তবুও সে স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিস হবে।[১০৬]

---

১০৬. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫৩।

www.amarboi.org

**পূর্ববর্তী তালাকের কার্যকারিতা নষ্ট করা সংক্রান্ত বিধান**

ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্বামী যখন স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে অতঃপর সে ইদ্দত পালনশেষে অন্য স্বামী গ্রহণ করে আর ঐ স্বামী তার সাথে মিলিত হয়। এরপর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক প্রদান করে এবং স্ত্রী ইদ্দত শেষে আবার পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরে আসে তাহলে সে স্ত্রীর ওপর তিন তালাকদানের অধিকারী হবে। আর তারা এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেন যে, স্বামী যদি তিনের কমসংখ্যক তালাক প্রদান করে অতঃপর স্বামী তার সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ না হয় তাহলে স্বামী অবশিষ্ট তালাকের অধিকারী হবে। আর যদি তিন এর কম তালাক দেয় অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্য স্বামী গ্রহণ করে আর সে তার সাথে মিলিত হয় অতঃপর স্ত্রী এ দ্বিতীয় স্বামী হতে তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত শেষে আবার পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরে আসে, তাহলে জমহুর ফুকাহার ঐকমত্য হলো এবার স্বামী আগের দেয়া তিন তালাকের অবশিষ্ট তালাকের অধিকারী হবে। হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। পূর্বে যদি একটি বায়েন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে এখন বাকী দু'টি তালাকদানের অধিকারী হবে। আর পূর্বে যদি দু'টি বায়েন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে এখন শুধু তৃতীয় তালাকটি দানের অধিকারী হবে। একাধিক সাহাবায়ে কেরাম হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। যেমন- হযরত উমর, আলী, ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবু হুরায়রা রা.।

আর ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ র. বলেন, এক্ষেত্রে স্বামী তিন তালাকদানের অধিকারী হবে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কারণে পূর্ববর্তী তালাকের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিনষ্ট বা ধ্বংস করে দেয়াকে আরবীতে বলে 'হাদাম'। এজন্য এ মাসআলাটি ফিকহের পরিভাষায় 'মাসআলাতুল হাদাম' নামে পরিচিত।

শায়খাইন (ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ)-এর অভিমতের অনুকূলে একাধিক সাহাবায়ে কিরামেরও অভিমত রয়েছে। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার রা., আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.। এটি হাম্বলীগণেরও একটি অভিমত। তবে তাদের দ্বিতীয় অভিমত জমহুরের অনুকূলে। আর এঅভিমতটি তাদের শক্তিশালী অভিমত। হানাফী মাযহাবের অনেক বড় বড় ফকীহ ইমাম মুহাম্মাদের অভিমতকে প্রাধ্যন্য দিয়েছেন; বরং এটিকেই হক বলেছেন। যেমন কামাল ইবনুল হুমাম, সাহিবুন নাহর ওয়াল বাহর, আশ-শুরুম্বুলালী প্রমুখ। তবে আল্লামা কাসিমের ন্যায় ফকীহগণ শায়খাইনের অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ফিকহে হানাফীর মূল ইবারতেও সেরূপ রয়েছে।

www.amarboi.org

**আংশিক তালাকের হুকুম**

স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বলবে, 'তুমি এক তালাকের অর্ধেক তালাক' বা এক চতুর্থাংশ কিংবা এক তৃতীয়াংশ তালাক অথবা এর চেয়ে কম বা বেশি তালাক। সেক্ষেত্রে এক তালাক পতিত হবে। কারণ তালাক হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ তা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয় না।[১০৭]

হানাফীগণ বলেন, এক তালাকের অংশবিশেষ প্রদান করলে যদিও তা এক হাজার তালাকের অংশ হয় না কেন এতে একই তালাক পতিত হবে। কারণ তালাকের কোনো ভাগ বাটোয়ারা নেই। যদি এক তালাকের উপর অংশ বৃদ্ধি করে তাহলে আরো একটি তালাক পতিত হবে।

মালেকীগণ বলেন, স্ত্রীকে যদি তার স্বামী বলে, 'তুমি এক তালাকের অর্ধেক তালাক' বা দুই তালাকের অর্ধেক তালাক' তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। আর যদি বলে, 'তুমি অর্ধেক ও এক তৃতীয়াংশ এবং এক চতুর্থাংশ তালাক'। তাহলে দু'তালাক পতিত হবে। কারণ এতে এক তালাকের উপর অংশ বৃদ্ধি করেছে।

শাফেয়ীগণ বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে যদি বলে, 'তুমি এক তালাকের কিয়দাংশ তালাক' তাহলে এক তালাক পতিত হবে। কারণ তালাকের কোনো কিয়দংশ হয় না। আর যদি বলে, 'তুমি এক তালাকের দুই-অর্ধেক তালাক' তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। কারণ দুই-অর্ধেক মিলেই এক পূর্ণ হয়।

হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি এক তালাকের দুই অর্ধেক তালাক তাহলে' এক তালাক পতিত হবে। কারণ বস্তুর দুই-অর্ধেকই পূর্ণ জিনিস হয়ে থাকে। আর যদি বলে, 'এক তালাকের তিন অর্ধেক তালাক'। তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। কারণ তিন অর্ধেক মিলে এক এবং আরো অর্ধেক হয়। ফলে একের ওপর আরো অর্ধেক বৃদ্ধি পাওয়ায় দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, 'তুমি দুই তালাকের অর্ধেক তালাক' তাহলে একই তালাক পতিত হবে। কারণ দুই তালাকের অর্ধেকতো এক তালাকই হয়।

**তালাক পরবর্তী রাজআত**

ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বায়েন তালাকদানের পর স্ত্রীকে নতুন আক্‌দ ব্যতীত ফেরত নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তা ইদ্দতের ভিতর হোক আর বাইরে হোক। নতুন আকদের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তনের এ সুযোগ কেবল ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ বায়েন তালাক লঘু ধরনের থাকে। অনুরূপ হুকুম হলো, দাম্পত্যজীবন ছিন্ন করার ক্ষেত্রে।

---

১০৭. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪২৬; মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯৮; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৮৫; আশ-শারহুস-সাগীর, আল-হালাবী সম্পা., খ. ১, পৃ. ৪৬০।

www.amarboi.org

চূড়ান্ত পর্যায়ের বায়েন তালাক হয়ে গেলে স্ত্রীকে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং তার সাথে মিলিত হওয়ার পর ঐ লোক তাকে তালাক দিলে ইদ্দতের পর পূর্বের স্বামী তাকে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারবে। কারণ এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বাণী হলো–

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে"।[১০৮]

ফুকাহায়ে কেরাম যেমনভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে একটি বা দু'টি রাজয়ী তালাক দেয় তার জন্য অধিকার রয়েছে নতুন আকদ ছাড়াই ইদ্দতের ভিতর তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কারণ এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا

"যদি তারা আপস নিষ্পত্তি করতে চায় তবে এতে (ইদ্দতে) তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার"।[১০৯]

পুনঃগ্রহণের কোনো কোনো বিধানে ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন।

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য পরিভাষা (রাজআত : رجعت ২২)।

## বিরোধজনিত বিচ্ছেদ

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে কোনো একজনের কারণে বিরোধ হতে পারে কিংবা উভয়ের কারণে সংঘটিত হতে পারে। আবার তাদের দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোনো কারণেও বিরোধ হতে পারে।

যখন তাদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয় আর আপোষ নিষ্পত্তি কঠিন হয়ে পড়ে তখন উভয়ের পরিবার হতে দু'জন সালিস নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। যারা তাদের মতবিরোধ নিরসন করবে। ঝগড়া-বিবাদের কারণগুলো বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবং উপদেশ দান করে দূর করার চেষ্টা করবে। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"তাদের উভয়ের মাঝে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার পরিবার হতে একজন এবং ওর পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মাঝে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সবিশেষ অবহিত।[১১০]

---

১০৮. সূরা আল-বাকারা, ২৩০।

১০৯. সূরা আল-বাকারা, ২২৮।

১১০. সূরা, আন-নিসা, ৩৫।

www.amarboi.org

দুই সালিসের কাজ হলো আপন আপন প্রজ্ঞা, হেকমত ও কৌশল দ্বারা মীমাংসার পথ উন্মুক্ত করা। ফুকাহায়ে কেরাম তাদের দায়িত্বের গণ্ডি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। অনুরূপভাবে তাদের যোগ্যতার শর্তসমূহের ব্যাপারেও ভিন্নভিন্ন মত পোষণ করেছেন। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো :

**(ক) সালিসদ্বয়ের কাজ**

হানাফীগণের মতে সালিসদ্বয়ের কাজ হলো, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নিষ্পত্তি করে দেয়া, অন্য কিছু নয়। তারা এক্ষেত্রে সফল হলে তো ভাল অন্যথায় দম্পতিকে আপন আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবে, যাতে তারা ঝগড়া বিবাদের পর হয় সন্ধি-স্থাপন বা ধৈর্যধারণ কিংবা তালাক দান অথবা খুলা করা কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া সালিসদ্বয়ের কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রী যদি আপষ-মীমাংসায় অক্ষম হয়ে সালিসদ্বয়কে নিজেদের মাঝে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার অধিকার প্রদান করে তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে সালিসদ্বয় দম্পতির পক্ষ হতে উকীল হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর এই অধিকার ও ক্ষমতাবলে সালিসদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হবেন।[১১১]

মালেকীগণ মনে করেন, সালিসদ্বয়ের করণীয় হলো প্রথমে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া, তবে তাদের মাঝে বিবাদ কঠোরতর পর্যায়ে পৌঁছার ফলে যদি মীমাংসা করতে তারা সক্ষম না হয়, তাহলে সালিসদ্বয় উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার রাখেন। এ ব্যাপারে তাদেরকে উকীল নিযুক্তির প্রয়োজন নেই। কাজীর কর্তব্য হলো, এদের ফয়সালার ভিত্তিতে তা কার্যকর করা। যদিও তার গবেষণার রায় অন্যরকম মনে হয়।

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ মনে করেন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি বিরোধ চরম পর্যায়ে উপনীত হয় তাহলে কাজী উভয় পক্ষের পরিবার হতে দু'জন সালিস নিয়োগ করবেন। জাহিরী অভিমত অনুযায়ী তারা দু'জন স্বামী স্ত্রীর পক্ষ হতে উকীল হিসেবে নিযুক্ত হবে। অপর অভিমত অনুযায়ী তারা হবেন বিচারকের পক্ষ হতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রথম অভিমত অনুযায়ী সালিসদ্বয় নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টি থাকতে হবে। সুতরাং স্বামী তার সালিসকে তালাক দানের এবং খুলা এর বিনিময় গ্রহণের উকীল নিয়োগ করবে। আর স্ত্রী তার সালিসকে খুলা এর বিনিময়দান ও তালাক গ্রহণের উকীল নিযুক্ত করবে। অতঃপর সালিসদ্বয় যদি ভালো মনে করেন তাহলে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেবেন আর যদি সালিসদ্বয়ের মাঝে ঐকমত্য সৃষ্টি না হয় তাহলে কাজী আর দু'জনকে নিয়োগ করবেন যাতে তারা কোনো একটি জিনিসের উপর একমত হয়।

---

১১১. তাফসীর রূহুল মাআনী, খ. ৫, পৃ. ২৭।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী সালিস নিয়োগে স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই, বরং দাম্পত্যজীবন বহাল রাখার বা বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ক্ষেত্রে তারা যা ভালো মনে করবেন তার ফায়সালা দেবেন।[১১২]

হাম্বলীগণ মনে করেন, সালিসের প্রথম করণীয় হলো, তাদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করা। যদি তারা এক্ষেত্রে অক্ষম হন তাহলে তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেয়ার তাদের অধিকার নেই। এ মতটি হানাফীগণের অনুকরণে। কিন্তু তাদের অপর একটি অভিমত হলো, তারা তাদের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেয়ার অধিকার রাখেন।[১১৩]

### (খ) সালিসদ্বয় নিয়োগের শর্তাবলি

ফুকাহায়ে কিরাম সালিসদ্বয় নিয়োগে কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন, তা হলো :

১. পূর্ণ যোগ্য হওয়া অর্থাৎ বালিগ হওয়া, সুস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া এবং বিবেকসম্পন্ন হওয়া। নাবালক, পাগল ও নির্বোধকে সালিস নিয়োগ করা বৈধ হবে না।
২. মুসলিম হওয়া, অমুসলিমকে সালিস নিয়োগ করা বৈধ নয়।
৩. আযাদ হওয়া, গোলামকে সালিস নিয়োগ করা বৈধ নয়। তবে হাম্বলীগণের অন্য এক মতে গোলামকে সালিস নিয়োগ করা বৈধ।
৪. ন্যায়পরায়ণতা আর তা হলো তাকওয়ার গুণসম্পন্ন হওয়া।
৫. সালিসের বিধান সম্পর্কে সচেতন থাকা।
৬. সম্ভব হলে সালিসদ্বয় উভয় পক্ষের আত্মীয়দের থেকে হওয়া। এশর্ত অত্যাবশ্যকীয় নয়, বরং তা মুস্তাহাব পর্যায়ের।

যদি স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য দু'জনকে উকীল নিয়োগ করে, অতঃপর যদি তাদের কোনো একজন পাগল হয়ে যায় কিংবা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে তাহলে তাদের এ নিযুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তখন সালিসদ্বয়ের জন্য তাদের মাঝে মিল করে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো অধিকার থাকবে না। বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পূর্বে যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন হারিয়ে যায় তবুও সালিস নিযুক্তি বাতিল হবে না। তার অনুপস্থিতিতেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যাবে। কারণ অনুপস্থিতির কারণে ওকালত বাতিল হয় না। পক্ষান্তরে পাগল হওয়া ও উন্মাদ হওয়ার ফলে ওকালত বাতিল হয়ে যায়।

মালেকী মতাবলম্বীগণ সালিসদ্বয়ের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেন যে, তারা হবেন পুরুষ। এ অভিমতের সাথে শাফেয়ীগণের গায়র যাহিরী অভিমত রয়েছে। আর

---

১১২. মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬১।
১১৩. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৫২।

www.amarboi.org

হাম্বলীগণের দ্বিতীয় অভিমতও অনুরূপ। তাদের যুক্তি হলো, সালিসদ্বয় এখানে দুই জন হাকিমের তথা বিচারকের পর্যায়ে। আর তাদের মতে মহিলার বিচারক হওয়া বৈধ নয়।

মালেকীগণ সালিসদ্বয়কে স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারভুক্ত হওয়া আবশ্যক মনে করেন। হ্যাঁ, পরিবারভুক্ত এমন যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে যদি পাওয়া না যায় তাহলে বিকল্প কাউকে নিয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের প্রতিবেশী বা অন্য যে কেউ হতে পারেন। তবে মুসতাহাব হলো, এজন্য এমন দু'জন প্রতিবেশীকে নিয়োগ করা যারা উভয়ের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। স্বামী ও স্ত্রী যদি সালিসদ্বয়কে খুলার ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে তাহলে তাদের জন্য কেবল তাই করার অধিকার রয়েছে। তবে তারা যদি অন্য কোনো শর্ত আরোপ করে তাহলে সালিসদ্বয় উক্ত শর্তমত কাজ করবে।

**স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সালিসদ্বয়ের বিচ্ছেদের ফয়সালা আনুযায়ী কাজীর ফয়সালা দেয়া**

সালিসদ্বয়কে যদি স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ হতে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়ার জন্য নিয়োগ করা হয় তাহলে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়ার জন্য কাজীর আদেশের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং সরাসরি তাদের রায়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ কার্যকর হয়ে যাবে।

আর যদি সালিসদ্বয় কাজীর পক্ষ হতে নিযুক্ত হন তাহলে তাদের জন্য আবশ্যক হলো, নিজেদের অভিমত কাজীর নিকট উপস্থাপন করা, যাতে কাজী তা কার্যকর করতে পারেন। তবে কাজীর জন্য তা কার্যকর করা ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং তিনি এজন্য বাধ্য। যদিও তা স্বীয় ইজতিহাদের পরিপন্থি হয়।

সালিসদ্বয় যদি ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হন তাহলে কাজী তাদেরকে পদচ্যুত করে তাদের স্থলে অন্য দু'জনকে নিয়োগ দিবেন যে পর্যন্ত না সালিসদ্বয় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ঐকমত্য হন। অতঃপর তিনি তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন।

**সালিস কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ফলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ধরন**

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধের ফলে যে বিচ্ছেদ ঘটে মালেকীগণের মতে তা হলো বায়েন তালাক। তাই উক্ত সালিসদ্বয় কাজীর পক্ষ হতে নিযুক্ত হোন অথবা স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ হতে নিযুক্ত হোন। আর তা হবে এক তালাক। সালিসদ্বয় যদি দু'তালাক কিংবা তিন তালাক আরোপ করেন তাহলে একের অধিক তা কার্যকর হবে না। বিচ্ছেদটি তালাকস্বরূপ হোক আর খুলাস্বরূপ হোক তাতে কোনো তারতম্য নেই।

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ মনে করেন, খুলার মাধ্যমে যদি সালিসদ্বয় বিচ্ছেদ করে দেন তাহলে সেটি হবে বায়েন তালাক। আর যদি তারা তালাকের দ্বারা বিচ্ছেদ করে দেন তাহলে সেটি হবে এক তালাক (রাঈঈ)। দু'জনের বদলে এক সালিস

www.amarboi.org

নিয়োগ করার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর আছে কি-না? এর উত্তর হলো, হ্যাঁ স্বামী-স্ত্রীর সে অধিকার রয়েছে। মালেকীগণ এর পক্ষে স্পষ্ট অভিমত পেশ করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর অভিভাবকগণেরও সে অধিকার আছে কি-না? এ ব্যাপারে মালিকীগণ কোনো সিদ্ধান্ত দান করতে পারেননি।

শাফেয়ীগণ বলেন, এক সালিস যথেষ্ট নয়। কারণ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

"তোমরা তার পরিবার হতে একজন এবং ওর পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে"।[১১৪]

**অসদাচরণের জন্য বিচ্ছেদ**

স্ত্রীকে যখন তার স্বামী যাতনা দেয় তখন স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া তার জন্য জায়েয আছে। এ ব্যাপারে মালেকীগণের অবস্থান স্পষ্ট। এ যাতনা একাধিকবার হোক আর একবার হোক। যেমন- স্ত্রীকে গালি দেয়া এবং তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা। কাজীর নির্দেশে স্ত্রী কি নিজেকে নিজে তালাক দিবে নাকি তার পক্ষ হতে কাজী তালাক দিবে এ সম্পর্কে মালেকীগণের দু'ধরনের অভিমত রয়েছে।[১১৫]

তবে এ ব্যাপারে অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরাম হতে কোনো ধরনের স্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তারা এব্যাপারে কোনো অভিমত পোষণ করেননি যে পর্যন্ত যাতনা তাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টির উদ্রেক না করে। আর সে পর্যায়ে পৌঁছলে তার বিধান পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

**মোহরদানে অক্ষম হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ**

স্বামী যখন মোহর পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে যায় তখন স্ত্রীর করণীয় সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত বহুধা বিভক্ত :

হানাফীগণ মনে করেন, শুধু এ কারণে স্ত্রীর স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার নেই। তবে সে স্বামীর নিকট নিজকে সোপর্দ করা হতে বিরত রাখার অধিকার সংরক্ষণ করে। এ সময় সে সচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকবে। অপেক্ষমাণ কালে সে পূর্ণ খোরপোষের অধিকারী হবে।

মালেকীগণ মনে করেন, একারণে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে তা বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে হতে হবে। বিচারকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী প্রকৃতপক্ষেই দরিদ্র এবং সে মোহরদানে অক্ষম, তাহলে তালাক কার্যকর করে দিবে। স্বামী যদি তার সাথে সঙ্গম করে থাকে তাহলে স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

---

১১৪. সূরা আন-নিসা, ৩৫।

১১৫. আদ-দাসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৪৫।

www.amarboi.org

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের এব্যাপারে ৩টি অভিমত রয়েছে :

প্রথমত : বিচ্ছেদ করে দেয়া।

দ্বিতীয়ত : সঙ্গম হওয়ার পূর্বে বিচ্ছেদ করে দেয়া। সঙ্গম হয়ে থাকলে স্ত্রীর সে অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এটিই শাফেয়ীগণের স্পষ্ট অভিমত।

তৃতীয়ত : কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীর জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার নেই। অন্যান্য পাওনাদারের ন্যায় স্ত্রীও একজন পাওনাদার হিসেবে সাব্যস্ত হবে।[১১৬]

## দারিদ্র্যের কারণে বিচ্ছেদের শর্তাবলি

দারিদ্র্যের কারণে বিচ্ছেদের পক্ষে যারা অভিমত পোষণ করেন তাদের মতে এতে কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা হলো :

(ক) মোহর এমন পর্যায়ের হতে হবে যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যদি মোহর মোটেই ওয়াজিব না হয়, যেমন আকদ ফাসিদ হলে এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত না হয়ে থাকলে অথবা মোহর আদায়ে বিলম্বের শর্তারোপ পূর্ব হতে করা হয়ে থাকলে এমন স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকার নেই। মোহরের কিছু অংশ আদায় করলে কিন্তু কিছু আদায় করা হতে অক্ষম হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে শাফেয়ীগণের দু'টি অভিমত রয়েছে। শক্তিশালী অভিমত হলো, বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে। মালেকী ও হাম্বলীগণ অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

(খ) আকদের পূর্বে বিলম্বিত মহরের উপর রাজি ছিল এমন কোনো স্ত্রীর জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার আবেদন করার অধিকার নেই। আকদের পরও সে বিলম্বে মোহর আদায় করার ওপর রাজি ছিল বলে কোনোভাবে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার আবেদন করার অধিকার নেই। স্বামীর মোহর আদায়ের অপারগতার কথাটি জেনে যদি মহিলা তাকে বিবাহ করে তাহলে তার জন্য অনাদায়ে বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে আকদ সংঘটিত হওয়ার পরও যদি অক্ষমতার বিষয়টি সে অবহিত হয় আর এ ব্যাপারে সে নীরবতা অবলম্বন করে অথবা প্রকাশ্যে সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের আবেদন করার কোনো অধিকার নেই।

দারিদ্র্যের কারণে যারা বিচ্ছেদের ব্যাপারে অভিমত পোষণ করেন তাদের সম্মিলিত রায় হলো, এতে বিচারকের কিংবা হাকিমের ফয়সালার প্রয়োজন

---

১১৬. আল-বাদায়ে, খ. ২, পৃ. ২৮৮; রাদদুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৫৬ এবং খ. ৪, পৃ. ৩১৫-৩১৭; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩০৭-৩০৮; আশ-শারহুল কাবীর মা'আদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ২৯৯; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৬২; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৭৯; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৯৮।

www.amarboi.org

রয়েছে। কারণ তা বিশ্লেষণের বিষয়। তবে এক্ষেত্রে দেখার বিষয় হলো, মহিলা তা বিচারের জন্য উত্থাপনে সক্ষম কি-না? যদি সে মামলা দায়েরে অক্ষম হয় তাহলে সে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজেই বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। এ ব্যাপারে শাফেয়ীগণের স্পষ্ট অভিমত রয়েছে।[১১৭]

আর যদি কাজীর নিকট স্বামীর অপারগতা প্রমাণিত হয় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তালাক প্রদান করবেন। কেউ কেউ মনে করেন, তাকে উপযুক্ত সময় দান করা প্রয়োজন। আর যদি স্বামীর অক্ষমতা প্রমাণ না হয় তাহলে তাকে সময়সীমা বেধে দিবে। কেউ কেউ মনে করেন, তাকে কারাগারে পাঠাবে যে পর্যন্ত না তা পরিশোধ করবে, কিংবা তার সম্পদের কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হবে আর তা হতে মোহর পরিশোধ করবে অথবা অক্ষমতা প্রমাণিত হলে কাজী তালাক কার্যকর করবে।

## মোহর আদায়ে অক্ষমতায় বিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধরন

মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ মনে করেন, মহর আদায়ে অক্ষমতার দরুন যে বিচ্ছিন্নতা আসে তা হলো বায়েন তালাক। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ মনে করেন এটি তালাক নয়; বরং তা কেবলই বিবাহ ভঙ্গকরণ।[১১৮]

## খোরপোষদানে অক্ষমতার কারণে বিচ্ছেদ

সহীহ আকদের মাধ্যমে সংঘটিত বিবাহের পর স্বামীর উপর ওয়াজিব হলো, স্ত্রীর ভরণপোষণ দেয়া। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, স্বামীর কর্তৃত্ব ও অধিকারে নিজকে সোপর্দ করতে স্ত্রী কোনোরূপ বাধা প্রদান করবে না। স্ত্রীর কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যদি স্বামী তার ভরণপোষণ দিতে না চায় তাহলে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে বিচারের মাধ্যমে স্বামীর নিকট তা তলব করা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তা আদায় করা।

আর স্ত্রীর প্রতিবন্ধকতা ও অন্যায় আচরণের কারণে যদি স্বামী খোরপোষ দেয়া হতে বিরত থাকে তাহলে তাকে এক্ষেত্রে বাধ্য করা যাবে না।

স্ত্রীর কোনো অন্যায় আচরণ ছাড়াই স্বামী যদি স্ত্রীর খোরপোষ দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার আছে কিনা সে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যা নিম্নরূপ :

---

১১৭. মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪।

১১৮. ইবন আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৫৯০; আদ-দাসূকী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ২, পৃ. ২৯৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪; আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৮৮১।

www.amarboi.org

(ক) ভরণপোষণদানে অস্বীকারকারী স্বামীর যদি বাহ্যিক সম্পদ থাকে আর স্ত্রীর জন্য তা থেকে নিজের খরচাদি গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তা স্বামীর জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, নিজে নিজেই হোক বা কাজীর নির্দেশে হোক সেক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকার নেই। আর এ অধিকার না থাকার কারণ হলো বিচ্ছেদ ছাড়াইতো স্ত্রী আপন প্রাপ্য আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে।

স্বামী হাজির থাকুক বা নাই থাকুক এ বিষয়টি এক্ষেত্রে গৌণ, স্বামীর মাল দৃশ্যমান থাকুক আর অদৃশ্যমান, সম্পদ নগদ টাকা পয়সা হোক অথবা স্থাবর, অস্থাবর জমিজমা যা কিছুই হোক না কেন তাতে কোনো ভেদাভেদ নেই।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ মনে করেন, স্বামীর দৃশ্যমান সম্পদ যদি উপস্থিত থাকে তাহলে তাদের মাঝে কোনো ধরনের বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার নেই। আর সম্পদ যদি এত দূরে থাকে যেখানে মুসাফিরের হুকুম আরোপ হয়, তাহলে স্ত্রীর জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার আছে। আর যদি তার থেকে কম দূরত্বে থাকে তাহলে কাজী তা হাজির করার নির্দেশ দেবেন এমতাবস্থায় বিচ্ছেদের অধিকার থাকবে না। এটি শাফেয়ীগণের দু'টি অভিমতের অগ্রগণ্য অভিমত।

হাম্বলীগণ মনে করেন, যখন অনুপস্থিত স্বামীর মাল হতে খোরপোষ গ্রহণ করা স্ত্রীর জন্য সম্ভব না হয়, তখন তার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার আছে, অন্যথায় না। আর মাল যদি উপস্থিত থাকে সেক্ষেত্রেও তার বিচ্ছেদ চাওয়ার কোনো অধিকার নেই। এটি ইমাম আহমদের জাহিরী অভিমত, যা খারকী রহ. বর্ণনা করেছেন।

(খ) খোরপোষদানে বিরত রয়েছে এমন স্বামীর যদি বাহ্যিক সম্পদ না থাকে তাই সে দারিদ্র্যজনিত কারণে বিরত থাকুক অথবা তার মাল গায়েব হওয়ার কারণে অথবা স্ত্রী বুঝতেই পারছে না কি কারণে স্বামী খোরপোষ দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি বিচ্ছেদের জন্য কাজীর কোর্টে মামলা দায়ের করে তাহলে বিচ্ছেদ করে দেয়া বৈধ হবে কি-না, এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম দু'টি অভিমত পোষণ করেন :

হানাফীদের মতে এক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের আবেদন করা বৈধ নয়। কাজী বরং স্ত্রীকে স্বামীর নামে ঋণ নেয়ার নির্দেশ দিবেন এবং স্বামী উপস্থিত না থাকলে যার ওপর তার খোরপোষ দেয়া জরুরী তাকে নির্দেশ দিবেন উক্ত স্ত্রীকে ঋণ প্রদান করতে। যদি মহিলাটিকে ঐলোক ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে কাজী তাকে আটক করবেন এবং ঋণদানের জন্য বাধ্য করবেন। অতঃপর স্বামীর সচ্ছলতা ফিরে আসলে তার নিকট হতে সেই ঋণ পরিশোধ করবে। 'আতা, যুহরী, ইব্‌নে শুবরুমা ও হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন।

www.amarboi.org

মালেকী ও হাম্বলীগণ মনে করেন, স্বামী যখন খোরপোষ দিতে অক্ষম হয়ে যায় তখন স্ত্রীর ইখতিয়ার আছে যে, সে ইচ্ছা করলে দাম্পত্যসম্পর্ক বহাল রাখবে এবং স্বামীর নামে ঋণ করে সংসার চালাবে। আর ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কাজীর দরবারে মুকাদ্দামা দায়ের করবে। কাজী তাৎক্ষণিকভাবে তাতে সাড়া দিতে পারবেন অথবা স্বামীর সচ্ছলতা আসে কিনা সে উদ্দেশ্যে কিছু দিন অপেক্ষারও নির্দেশ দিতে পারবেন। এ অভিমত হযরত উমর, আলী, আবু হুরায়রা রা., সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, হাসান ও উমার ইবনে আবদিল আযীয র. প্রমুখের।

**খোরপোষ না দেয়ার কারণে বিচ্ছেদ ঘটানোর পক্ষে যারা অভিমত পোষণ করেন তাদের শর্তাবলি**

খোরপোষ দিতে অক্ষম হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ ঘটানোর হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা হলো :

(ক) খোরপোষদানে স্বামীর অক্ষম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া। এটি উভয়ের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে হতে পারে কিংবা প্রমাণ থাকার দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

(খ) দারিদ্র্যজনিত কারণে কিংবা খোরপোষদানে অস্বীকৃতির কারণে বিচ্ছেদের বিষয়টি তখন প্রযোজ্য হবে যখন সে ন্যূনতম খোরপোষ দান করা থেকে বিরত থাকবে। আর ন্যূনতমের পরিমাণ হলো, দরিদ্র পরিবার সাধারনত যা ভোগ করে। যদিও স্ত্রী ধনী পরিবারের অথবা অস্বীকারকারী স্বামী ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়। কারণ বিচ্ছেদ করে দেয়ার হুকুমটি তখনই দেয়া হয় যখন দেখা যায় এটি না করলে স্ত্রী ধ্বংস হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, দরিদ্রদের খোরপোষ বলতে বুঝায় জরুরী খাদ্য ও বস্ত্র। কারণ এ দু'টি ছাড়া জীবন চলে না। এ ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন। বাস স্থান দিতে না পারার কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়ার হুকুমদানের ব্যাপারে ইমাম গণের মতভেদ দেখা যায়। শাফেয়ীগণের বিশুদ্ধ অভিমত হলো, এর কারণে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। হাম্বলগণের বিচ্ছেদ করে দেয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে দু'টি অভিমত রয়েছে। তবে মালেকীগণের একক অভিমত হলো, বাসস্থানের অভাবে বিচ্ছেদ করে দেয়া যায় না। কারণ এটি জরুরী প্রয়োজনের আওতাভুক্ত নয়।

(গ) স্বামীর দৃশ্যমান কোনো সম্পদ বর্তমান না থাকা, যেখান থেকে স্ত্রী আপনা আপনি খোরপোষ নিতে পারে কিংবা কাজী রায় দিয়ে খোরপোষ দিতে পারে।

(ঘ) বর্তমানের ওয়াজিব খোরপোষ দেয়া হতে স্বামীর বিরত থাকা। অতীতের দিনগুলোতে খোরপোষ না দেয়ার জন্য ইমামদের সর্বসম্মত মতো অনুয়াযী বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না। কারণ সেটি অন্যান্য ঋণের মতো একটি ঋণ। জীবন নির্বাহের জন্য সেটি জরুরীও নয়।

১৮—

www.amarboi.org

ভবিষ্যত খোরপোষের ক্ষেত্রে স্বামী যদি অস্বীকৃতি জানায়। তাহলে মালেকীগণের অভিমত হলো, স্বামী সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তার জন্য আবশ্যক হলো, তার অনুপস্থিতকালে স্ত্রীর খোরপোষের নিশ্চয়তাবিধান করে যাওয়া। এক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হলে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকার রয়েছে। তবে কিছু মালেকী অনুসারী মনে করেন, এক্ষেত্রে স্ত্রীর খোরপোষ চাওয়ার অধিকার রয়েছে, বিচ্ছেদ চাওয়ার নয়। আর স্বামী সফরে চলে গেলে এবং স্ত্রীর নিকট রক্ষিত খরচ নিঃশেষ হয়ে গেলে কেবল তখনই বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে।

স্বামী যদি বাড়ীতে থাকে তাহলে স্ত্রীর ভবিষ্যত খোরপোষের জন্য আবেদন করার অধিকার নেই। খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই যেমন নির্জনবাস না হলে অথবা স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে খোরপোষ রহিত হলে স্বামী যদি অস্বীকৃতি জানায় তাহলে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার নেই।

(ঙ) যদি এমন হয় যে, স্বামীর দরিদ্রতা সত্ত্বেও স্ত্রী তার সাথে সহ অবস্থানের সম্মতি প্রকাশ করেছিল। অথবা স্ত্রী নিরঙ্কুশভাবে খোরপোষ ত্যাগে বিয়ের সময় সম্মতি দিয়েছিল তা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক। অথবা আকদ-এর সময় বা পরে খোরপোষ না দেয়ার শর্ত দেয়া হয়েছিল, তাহলে এরূপ স্ত্রীর জন্য খোরপোষ না দেয়ার দায়ে বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার নেই।

এটি মালেকীগণের অভিমত এবং হাম্বলীগণের একটি অভিমত।
কিন্তু শাফেয়ীগণের অভিমত হলো, পূর্বে খোরপোষ না দেয়ার উপর সম্মতি প্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে যখন অক্ষমতা প্রকাশ পাবে তখন স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার রয়েছে। কারণ খোরপোষদানের বিষয়টি প্রতিদিন নতুনভাবে ওয়াজিব হয়। এটি হাম্বলীগণের দু'টি অভিমতের একটি।

**খোরপোষ না দেয়ায় যে ধরনের বিচ্ছেদ ঘটে এবং তা আরোপিত হওয়ার পদ্ধতি**
শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে, খোরপোষ না দেয়ার কারণে যে বিচ্ছেদ ঘটে তা যতক্ষণ কাজীর হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে তাকে বিবাহ ভঙ্গ হিসেবে ধরা হবে। কাজী যদি স্বামীর কাছে স্ত্রীর তালাক তলব করে এবং স্বামী তাকে তালাক দেয় সে ক্ষেত্রে রাজয়ী তালাক হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তিন তালাক অথবা সঙ্গমের পূর্বে তালাক প্রদান না করবে। অন্যথায় তা বায়েন তালাক হিসেবে গণ্য হবে।

মালেকীগণ বলেন, তা হবে রাজয়ী তালাক। এ কারণে স্বামীর জন্য ইদ্দতের ভিতর তাকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মালিকীগণ একটি শর্তারোপ করেন তাহলো, স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ সহীহ হতে হলে স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় খোরপোষের ওপর সক্ষম হতে হবে। জরুরী খোরপোষ এখানে ধর্তব্য হবে না, যার কারণে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়েছিল। এ শর্ত পালিত না হলে পুনঃগ্রহণ শুদ্ধ হবে না।

www.amarboi.org

**বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতি**

খোরপোষ দিতে অক্ষমতার কারণে যারা বিচ্ছেদ করে দেয়ার অভিমত পোষণ করেন, তারা এ ব্যাপারে একমত যে, তা কাজীর মাধ্যম ছাড়া কার্যকর হবে না। এটি একটি গবেষণা উপযোগী বিষয়। এ ধরনের কাজ কাজীর ফায়সালা ছাড়া কার্যকর হয় না। তবে শাফেয়ীগণ এর সাথে এ শর্ত জুড়ে দেন যে, মহিলাকে কাজীর নিকট উত্থাপনে সক্ষম হতে হবে। বিচারক বা বিচারের রায় ব্যতিরেকেই যদি মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে সমর্থ হয় কিংবা কাজীর নিকট উত্থাপনে সে সমর্থ না হয় তাহলে প্রয়োজনের খাতির সকল ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ কার্যকর হয়ে যাবে।

**বিচ্ছেদের ফয়সালাদানের সময়কাল**

এ সংক্রান্ত ফয়সালাদানের সময় নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ীগণের পুরাতন অভিমত অনুযায়ী খোরপোষদানে স্বামীর অক্ষমতা প্রকাশ হওয়ার পর কোনো ধরনের সময়দান ব্যতিরেকে কাজী বিচ্ছেদ কার্যকর করবেন। তবে তাদের সর্বাধিক জাহিরী অভিমত হলো, স্বামীকে তিন দিনের সময় দেয়া। যদিও সে এব্যাপারে আবেদন না করে। এর কারণ স্বামীর অক্ষমতা ভালভাবে সাব্যস্ত হওয়া। কারণ অক্ষমতা কোনো কোনো সময় সাময়িক হয়ে থাকে অতঃপর তা দূর হয়ে যায়। যেমন ঋণের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে তা দূর করা যায়। কিন্তু তিন দিন সময় দেয়ার পরও যখন স্বামী তা দূর করতে পারল না তখন তার অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়ে গেল। ফলে বিচ্ছেদ করে দিতে কাজীর আর কোনো বাধা রইল না।

হাম্বলীগণের মতে, অক্ষমতা প্রকাশ পেলে কোনো ধরনের অবকাশ দেয়া ছাড়াই বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। যেমন পণ্যের মাঝে ত্রুটি দেখা দিলে বিক্রয়ের চুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে রহিত হবে।

মালেকীগণ এ ব্যাপারে বলেন, স্ত্রী যদি বিষয়টি কাজীর নিকট উত্থাপন করে তাহলে স্বামীকে কাজি তলব করে এবিষয়ে তার মতামত জানতে চাইবে। যদি সে দারিদ্র্যের দাবি করে এবং এ ব্যাপারে প্রমান প্রদর্শন করে তাহলে কাজি তাকে এ বিষয়ে একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দেবেন। মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে এবং স্বামী যদি তাকে খোরপোষ না দেয় তাহলে কাজী এর উপর তাকে তালাক দেবেন। আর যদি স্বামীর অক্ষমতা প্রকাশ না পায় অথবা সে সচ্ছল হওয়ার দাবি করে কিংবা কাজীর প্রশ্নের উত্তরে নীরবতা অবলম্বন করে এবং কোনো কিছুই বলে না। তাহলে এমতাবস্থায় কাজী খোরপোষদানের অথবা তালাকদানের নির্দেশ দেবেন। স্বামী কোনোটিই করতে না চাইলে তাৎক্ষনিকভাবে কাজী তালাক কার্যকর করবেন। তবে কেউ কেউ মনে করেন, কিছু দিন ভেবে দেখার জন্য কাজী সময় দেবেন। এতেও কাজ না হলে তালাক কার্যকর করবেন।

www.amarboi.org

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাসমূহ কাজী গ্রহণ করবেন যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে। যদি সে অনুপস্থিত থাকে আর তার অনুপস্থিতির স্থান দশদিনের কম দূরত্বে হয় তাহলে কাজী তাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য লিখিতভাবে ডিক্রি জারি করবেন। এবং তাকে স্ত্রীর খোরপোষ দান অথবা বিচ্ছেদের এখতিয়ার দিবেন। যদি সে উপস্থিত হয়ে দু'টি পন্থার কোনো একটি গ্রহণ করে তাহলে তো ভাল। অন্যথায় কাজীই তালাক কার্যকর করবেন। কাজীর ডাকে সাড়া না দিলেও অনুরূপ বিধান কার্যকর হবে। আর যদি স্বামীর অবস্থানস্থল জানা না থাকে কিংবা দশ দিনের বেশি দূরত্বে অবস্থান করে সেক্ষেত্রে কাজী সাথে সাথে তালাক কার্যকর করবেন।[১১৯]

## গায়েব বা অন্তর্ধান, নিখোঁজ ও বন্দিত্বের কারণে বিচ্ছেদ

গায়েব বলা হয়, যে লোক সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ি ত্যাগ করেছে অতঃপর ঘরে ফিরেনি অথচ তার বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত। আর যদি তার বেঁচে থাকার বিষয়টি অজ্ঞাত হয় তবে তাকে নিখোঁজ বলা হয়। বন্দি বলা হয়, যাকে অভিযোগ বা অপরাধের কারণে আটক করে কারাগারে রাখা হয়। গায়েব, নিখোঁজ ও বন্দি ব্যক্তির স্ত্রী যদি বিচ্ছেদের আবেদন করে তাহলে তা গৃহীত হবে কি-না? এব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

### ১. গায়েব বা অন্তর্ধানের কারণে বিচ্ছেদ

গায়েব বা অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ার কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়া জায়েয আছে কি-না, এ ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। সে মতভেদের ভিত্তি হলো, সহবাস করা স্বামীর অধিকারের ন্যায় স্ত্রীরও অধিকার কি-না, সে বিধান সম্পর্কে মতভেদ।

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের এক বর্ণনা মতে দৈহিক মিলন অব্যাহত রাখার অধিকার কেবল স্বামীর রয়েছে, স্ত্রীর এক্ষেত্রে কোনো অধিকার নেই। স্বামী যদি দীর্ঘকাল স্ত্রীর সাথে মিলিত না হয়, তাহলে সে কাজীর নিকট স্ত্রীর উপর জুলুম কারী হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই সে উপস্থিত থাকুক আর অনুপস্থিত থাকুক। তার এ অনুপস্থিতির মেয়াদ দীর্ঘ হোক বা কম হোক। এ কারণে স্বামী যদি স্ত্রীর জন্য খোরপোষের ব্যবস্থা রেখে তার থেকে অনুপস্থিত থাকে তাহলে স্বামীর অনুপস্থিতি যতই দীর্ঘ হোক না কেন স্ত্রীর পক্ষে বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকার থাকবে না।

হাম্বলীগণের দ্বিতীয় অভিমত হলো, দৈহিক মিলন অব্যাহত রাখার অধিকার স্বামীর উপর স্ত্রীরও রয়েছে। বিচারের ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য যদিনা স্বামীর কোনো উজর থাকে। যেমন অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো কারণে সে সহবাস থেকে

---

১১৯. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৫৭০; আদ-দাসূকী, ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৫১৮; মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪২ ও আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ১৭৫

www.amarboi.org

বিরত থাকে। সুতরাং বিনা ওজরে স্বামী যদি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকে তাহলে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে বিচ্ছেদের আবেদন করার।[১২০]

মালেকীগণের মতে, দৈহিক মিলন চলমান রাখার অধিকার সর্বাবস্থায় স্ত্রীর রয়েছে। সুতরাং স্বামী যদি স্ত্রী থেকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকে তাহলে তাকে বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। তাই তার এ সফর কোনো ওজরের কারণে হোক বা উজর ছাড়া হোক।

**অন্তর্ধান বা গায়েবের কারণে বিচ্ছেদের শর্তাবলী যাদের মতে তা প্রযোজ্য :**
এক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত বিবেচ্য। তা হলো :
(ক) গায়েব তথা অনুপস্থিতি দীর্ঘদিনের হতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম এর মেয়াদ নির্ধারণে মতভেদ করেছেন। হাম্বলীগণের মতে স্বামী যখন স্ত্রী হতে ছয়মাস বা তার চেয়ে অধিককাল অনুপস্থিত থাকবে তখন স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর রাত্রিকালীন শহরের মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ঘটনা এবং জনৈক মহিলার আকুতির বিষয়টি দলীল হিসেবে গৃহীত।

আবু হাফস তার সূত্রে যায়দ ইবনে আসলাম রা. হতে বর্ণনা করেন। একদা উমর রা. মদীনার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এক মহিলার গৃহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। মহিলাটি তখন তার একাকিত্বের আকুতি নিম্নের কবিতায় মাধ্যমে প্রকাশ করছিল :

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ
وَطَالَ عَلَيَّ أَنْ لاَ حَبِيبَ أُلاَعِبُهُ
وَوَاللهِ لَوْلاَ خَشْيَةُ اللهِ وَحْدَهُ
لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

অর্থ : এ রাত্রিটি দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং তার দিগন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমার উপর দীর্ঘকাল অতিক্রম হচ্ছে, অথচ আমার খেল-তামাশার জন্য বন্ধু নেই। আল্লাহর শপথ! এক আল্লাহর ভয় যদি না হত, তাহলে এ খাটের প্রান্তসমূহ থেকে যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করা হত।

মহিলাটির আকুতি শুনে উমর রা. তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকেরা উত্তর দিল এ মহিলাটির স্বামী জিহাদে গিয়েছে। উমর রা. তখন তার স্বামীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। অত:পর তিনি তার মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা.-এর

১২০. আল-মুগনী, খ.৭, পৃ. ২৩৪; আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২০২; আদ-দাসূকী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৩৯; আল-কালয়ূবী ও উমায়রা, খ. ৪, পৃ. ৫১।

www.amarboi.org

নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন ওহে দুলালী! কতদিন পর্যন্ত মহিলা তার স্বামী ছাড়া ধৈর্য ধরে থাকতে পারে?

হাফসা রা. তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনার মতো ব্যক্তি আমার নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন? তিনি বললেন, যদি না আমি মুসলিমগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতাম তাহলে তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম না। তিনি উত্তর দিলেন, পাঁচমাস, ছয়মাস। অতঃপর হযরত উমর রা. ধার্য করে দিলেন যে, ছয়মাস পর্যন্ত জিহাদে অবস্থান করা যাবে। গমনাগমনে ব্যয় হবে দু'মাস। আর আল্লাহর রাস্তায় থাকা চারমাস।[১২১]

মালেকীগণের নির্ভরযোগ্য মত হলো, অবস্থানের মেয়াদ এক বছর এবং তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। গারয়ানী ও ইবনে আরাফা মনে করেন, দু'বছর ও তিনবছর বেশি কোনো সময় নয়। এ সকল উক্তি তাদের ইজতিহাদী বিষয় ও নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি।

(খ) স্বামীর অনুপস্থিতির কারণে স্ত্রীর নিজের অনিষ্ট তথা যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকতে হবে। আর এ আশঙ্কা কেবল স্ত্রীর কথায়ই প্রমাণিত হবে। কারণ, কেবলমাত্র তার কাছ থেকেই এটি অবহিত হওয়া যায়।

(গ) স্বামীর গায়েব বা অনুপস্থিতি কোনো উজর ছাড়া হতে হবে। আর যদি হজ, ব্যবসা কিংবা জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি প্রয়োজনে গায়েব হয় তাহলে হাম্বলীগণের মতে স্ত্রীর বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার নেই। কিন্তু মালেকীগণ প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কোনো শর্তারোপ না করে গায়েব থাকার মেয়াদটি দীর্ঘ হওয়া সাপেক্ষে বিচ্ছেদের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে মত দেন।

(ঘ) স্বামীর নিকট কাজী বাড়িতে ফিরে আসার লিখিত নির্দেশ পাঠাবে অথবা স্ত্রীকে তার নিকট নিয়ে যাওয়ার অথবা তাকে তালাক দেয়ার লিখিত নির্দেশ পাঠাবেন। এজন্য কাজী একটি উপযুক্ত মেয়াদ নির্ধারণ করে দেবেন, যদি তার পরিচিত কোনো ঠিকানা থাকে। মেয়াদের ভিতর কার্যকর করলে তো ভাল, অন্যথায় কাজী বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। আর যদি ফিরে না আসার কোনো উজর থাকে সেক্ষেত্রে হাম্বলীগণ তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচ্ছেদ না ঘটানোর পক্ষে মত দেন। মালেকীগণ এরূপ ওযর-আপত্তি আমলে না এনে বিচ্ছেদের পক্ষে রায় দেন। আর যদি স্বামী এসব অস্বীকার করে, অথবা কোনো উত্তর না দেয় এবং নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়। অথবা তার কোনো পরিচিত ঠিকানা না থাকে। অথবা তার ঠিকানায় পত্র না যায় তাহলে কাজী স্ত্রীর আবেদনক্রমে তালাক কার্যকর করবেন।

---

১২১. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৩৫।

www.amarboi.org

**গায়বের কারণে বিচ্ছেদের ধরন এবং তা আরোপ হওয়ার পন্থা**

গায়েবের কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়ার পক্ষে যারা মত প্রকাশ করেছেন তাদের সম্মিলিত অভিমত হলো, এব্যাপারে কাজীর ফায়সালা আবশ্যক হবে। কারণ, এটি একটি ইজতিহাদ তথা গবেষণামূলক বিষয়। কাজীর ফায়সালা ব্যতীত তা কার্যকর হবে না।

হাম্বলীগণের অভিমত হলো, গায়েবের কারণে যে বিচ্ছেদ আসে তাহলো বন্ধনমুক্ত করে দেয়া। আর মালেকীগণ বলেন, তা হল তালাক। তবে এর দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হয় কিনা সে ব্যাপারে মালেকীগণের কোনো স্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায়নি। তবে তাদের বিভিন্ন বিবরণ হতে বুঝা যায়, তা হবে বায়েন তালাক। ইবন আবু যায়েদ আল কায়রাওয়ানীর পুস্তিকায় রয়েছে, বিচারক কর্তৃক আরোপিত সকল তালাক হলো বায়েন তালাক। তবে ঈলাকারী ও দারিদ্র্যের কারণে আরোপিত তালাক এর ব্যতিক্রম। আর দাসূকীর কথা থেকে অনুমিত হয় যে, স্বামীর গায়েবের কারণে আরোপিত তালাক হয় তালাকে রাজ'ঈ। প্রথম সম্ভাবনাটিই প্রাধান্যযোগ্য।

**২. নিখোঁজ হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ**

স্বামীর কোনো সংবাদ জানা নেই, বেঁচে আছে বলেও কোনো তথ্য নেই। এমতাবস্থায় স্ত্রী বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করতে পারবে কি-না, সেক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে, যার বর্ণনা পূর্বে গায়েব স্বামীর হুকুমের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। এ জন্য যে, নিখোঁজ গায়েবের ন্যায়। তাই বিচ্ছেদের ব্যাপারে গায়েবের স্ত্রীর যে অধিকার, নিখোঁজের স্ত্রীরও সেই অধিকার।

এদের স্ত্রী যদি বিচ্ছেদের আবেদন না করে তাহলে সারা জীবন সে ঐ স্বামীর স্ত্রী হিসেবে থেকে যাবে কি-না?

এ সংক্রান্ত মাসআলায় কিছু ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন আবার কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেছেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

(ক) স্বামীর অনুপস্থিতি যখন বাহ্যিকভাবে নিরাপদ হবে। যেমন- ব্যবসা বা ইলম অর্জনে গিয়ে অনুপস্থিত রয়েছে, ফিরে আসে নাই। এমনকি কোথায় কীভাবে আছে তাও জানা নাই। এমন অবস্থায় স্বামীকে জীবিত হিসেবে গণ্য করতে হবে। শরয়ী দলীল কিংবা সমসাময়িক মানুষের মৃত্যু দ্বারা তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া গেলে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকবে। এ অভিমত হলো ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ র.-এর এবং ইমাম শাফেয়ী র.-এর নতুন অভিমত। এটাই ইবনে শুবরুমা ও ইবনে আবী লায়লার মাযহাব । ইমাম শাফেয়ী র.-এর পূর্বেকার-অভিমত হলো, স্বামীর নিখোঁজ হওয়া থেকে চার বছর পর্যন্ত স্ত্রীকে অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর তার ব্যাপারে

www.amarboi.org

মৃত্যুর ফয়সালা দেয়া হবে। সে হিসেবে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করার পর অন্যদের জন্য হালাল হয়ে যাবে।

**(খ)** আর যখন তার অনুপস্থিতি বাহ্যিকভাবে ধ্বংস বলে মনে হবে। যেমন পরিবারের মধ্য হতে রাতে কিংবা দিনে নিখোঁজ হয়ে গেল। নামাযে গিয়ে আর ফিরে আসে নাই অথবা রণাঙ্গনে গিয়ে হারিয়ে গেল। এমতাবস্থায় ইমাম আহমদের জাহিরী অভিমত এবং ইমাম শাফেয়ী এর পূর্বেকার অভিমত হলো, এক্ষেত্রে স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। তারপর তার মৃত্যুর ফয়সালা দেয়া হবে। অতঃপর স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর সে অন্যদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। হযরত উমর, উসমান, আলী ও ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবী রা.-এর অভিমতও তাই।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা র-এর মত এবং ইমাম শাফেয়ীর আধুনিক অভিমত হলো, স্ত্রীর জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে কিংবা সমসাময়িকগণের মৃত্যুর মাধ্যমে স্বামীর মৃত্যুর বিষয়টি প্রমাণিত হবে। তাই তার অনুপস্থিতি যতই দীর্ঘ হোক না কেন।

মালেকীগণের মতে নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীর ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। তা হলো : যুদ্ধ অবস্থায় অথবা শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় নিখোঁজ হবে। আবার কখনও দারুল ইসলাম অথবা দারুশ-শিরক এ নিখোজ হতে পারে। আবার নিখোঁজ কখনও মুসলমানদের দু'দলের মধ্যে যুদ্ধাবস্থায় অথবা একদল মুসলিম এবং অন্য দল কাফিরের মধ্যে যুদ্ধাবস্থায় হতে পারে। এর প্রত্যেক অবস্থার জন্যই তাদের মতে বিশেষ বিধান রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

**(ক)** শান্তি ও নিরাপত্তা অবস্থায় যদি দারুল ইসলামে নিখোঁজ হয় তাহলে তার স্ত্রীকে চার বছর পর্যন্ত। অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর সে ওফাতের ইদ্দত পালন করার পর অন্যদের জন্য হালাল হবে। এ ব্যবস্থা কার্যকর হবে যখন স্বামীর সম্পদ হতে স্ত্রীর খোরপোষ চালু থাকবে। অন্যথায় খোরপোষ না পাওয়ার কারণে স্বামী হতে তালাকপ্রাপ্তা বলে গণ্য হবে।

**(খ)** যখন দারুল কুফরে নিখোঁজ হবে, যেমন বন্দি হয়ে গেল। এরূপর তার আর কোনো খবর জানা না যায়। তাহলে স্ত্রীকে সম-সাময়িক মানুষের বয়সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করার পর অন্যদের জন্য হালাল হবে। ফুকাহায়ে কিরাম এর জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, স্বামীর বয়স যখন সত্তর বছরে উপনীত হবে। কেউ কেউ বলেছেন, আশি। আর কেউ কেউ অন্য কিছুও বলেছেন। এ বিধানও কার্যকর হবে স্বামীর পক্ষ থেকে খোরপোষ চালু থাকলে। খোরপোষের ব্যবস্থা না থাকলে তালাক অনুষ্ঠিত হবে।

www.amarboi.org

(গ) মুসলিমদের দু'দলের মাঝে যুদ্ধ চলা অবস্থায় যদি স্বামী নিখোঁজ হয়। তাহলে উভয় দলের যুদ্ধ বিরতির পর যখন স্বামীর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকবে কেবল তখনই স্ত্রী ইদ্দত পালন করে অন্যদের জন্য হালাল হবে।

(ঘ) যুদ্ধ যদি মুমিন ও কাফিরদের মাঝে সংঘটিত হয় তাহলে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তবুও যদি কোনো খবর না হয় তাহলে স্ত্রীকে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময়সীমা বেধে দিতে হবে। অতঃপর সে ওফাতের ইদ্দত (চারমাস দশ দিন) পালন করে অন্যদের জন্য হালাল হয়ে যাবে।

**নিখোঁজ হওয়ার কারণে বিচ্ছেদের ধরন ও তা আরোপিত হওয়ার পন্থা**

নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি সুরাহার জন্য কাজীর নিকট স্ত্রী বা তার কোনো ওয়ারিস অথবা স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এমন যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত না হলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীকে সারাজীবন জীবিত ধরে নিতে হবে।

কাজীর পক্ষ হতে মৃত্যুর আদেশ জারির পর আদেশদানের তারিখ হতে বৈবাহিক সম্পর্ক খতম হয়ে যাবে। তবে উপযুক্ত শর্ত, প্রেক্ষাপটসমূহ ও ইমামগণের ইখতেলাফ এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এর ফলে স্ত্রী পৃথক হয়ে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে। কারণ এটি তালাক নয় এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার বিষয় নয়।

কাজীর পক্ষ হতে মৃত্যুর ডিক্রি জারির পর যদি নিখোঁজ স্বামী জীবিত অবস্থায় লোকালয়ে এসে উপস্থিত হয় তাহলে দেখতে হবে স্ত্রী যদি ইদ্দত পালনের পর অন্য কারো কাছে বিবাহে আবদ্ধ না হয় তাহলে সে ঐ স্বামীর স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি অন্য কারো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে এ বিবাহ যদি শাস্ত্রসম্মত না হয় অথবা নতুন স্বামী অবহিত হয় যে, এ মহিলার পূর্বের স্বামী জীবিত রয়েছে তাহলেও মহিলা পূর্বের স্বামীর স্ত্রী হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যদি দ্বিতীয় বিয়ে শাস্ত্রসম্মত হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামী জীবিত আছে বলে না জানে তাহলে সে দ্বিতীয় স্বামীর স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে, যদি সে এ মহিলার সাথে মিলিত হয়ে থাকে। অন্যথায় সে প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে। এটি জমহুর ফুকাহার অভিমত।

**৩. কারারুদ্ধ হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ**

স্বামী দীর্ঘকাল বন্দি থাকলে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার থাকে কি-না? এ ব্যাপারে জমহুরের অভিমত হলো, কারারুদ্ধের জন্য সাধারণত বিচ্ছেদ করে দেয়া বৈধ নয়। কারাবাস যতই দীর্ঘ হোক না কেন। বন্দিত্বের কারণ ও স্থান অবহিত হওয়া যাক আর না যাক। হানাফী ও শাফেয়ীগণ বিচ্ছেদ করা বৈধ না হওয়ার কারণ হিসেবে বলেন, সে অনুপস্থিত

www.amarboi.org

থাকলেও নিশ্চিতরূপে জীবিত। আর জীবিত ব্যক্তি থেকে বিচ্ছেদ ঘটানোর তারা পক্ষপাতি নন, যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর হাম্বালীগণ বিচ্ছেদ না ঘটানোর কারণ হিসেবে বলেন, তার অনুপস্থিতি একটি উযরের কারণে। মালেকীগণের মতে স্ত্রী যদি বিচ্ছেদের আবেদন করে এবং তার সমস্যার কথা উত্থাপন করে তাহলে তাকে বিচ্ছেদ করে দেয়া বৈধ হবে। তবে তা কারারুদ্ধের এক বছর পর। কারণ হিসেবে তারা বলেন, বন্দিত্বও অনুপস্থিতি। আর অনুপস্থিতির কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়া যাবে যেমনিভাবে ওজর থাকলে বিচ্ছেদ করে দেয়া যায়।

**ত্রুটিজনিত বিচ্ছেদ**

ত্রুটিসমূহের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়ার বৈধতার ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

তবে হানাফীগণ ত্রুটি কেবল স্বামীর সঙ্গে খাস করে বলেছেন, স্বামীর ত্রুটির কারণেই কেবল উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়া যেতে পারে। স্ত্রীর কোনো ত্রুটির ফলে বিচ্ছেদ করে দেয়া যায় না। কারণ, তালাকদানের ক্ষমতা কেবল স্বামীরই রয়েছে। মালেকী, শ ফেয়ী ও হাম্বলীগণ স্বামী-স্ত্রী যে কারো ত্রুটির কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়ার পক্ষে অভিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, দোষত্রুটিজনিত বিচ্ছেদে উভয়ের সমান অধিকার রয়েছে। তবে সকল ইমামই বিচ্ছেদের পরিধিকে সম্প্রসারিত না করে বরং সংকুচিত রাখার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

বিচ্ছেদের ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে লিঙ্গকর্তিত হওয়া, পুরুষত্বহীন ও নপুংসক হওয়াই কেবল বিচ্ছেদ করে দেয়ার কারণ হতে পারে। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের মতে এর সাথে পাগল হওয়াও যুক্ত হবে।

কিন্তু জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম অনেক ত্রুটির কারণে বিচ্ছেদের পক্ষে অভিমত পোষণ করেন। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেন। তারা ত্রুটিসমূহ মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : এক. শুধু পুরুষদের সাথে সম্পৃক্ত। দুই. শুধু মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত। তিন. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

মালেকীগণের মতে নিম্নোক্ত ত্রুটির কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়া যায়:
পুরুষদের ত্রুটিসমূহ হলো নপুংসক হওয়া, লিঙ্গ কর্তিত হওয়া, খাসি হওয়া এবং উত্তেজনার মুহূর্তে লিঙ্গ উত্থিত না হওয়া।

আর মহিলাদের ত্রুটিসমূহ হলো : সঙ্গমস্থল বন্ধ হয়ে যাওয়া, লজ্জাস্থানে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া, যৌনাঙ্গে লিঙ্গ প্রবেশ করতে না পারা, যৌনাঙ্গ ও গুহ্যদ্বার একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং মুখে কিংবা যৌনাঙ্গে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হওয়া।

www.amarboi.org

উভয়ের ক্ষেত্রে যে সকল ক্রটি প্রযোজ্য, তা হলো : পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগী হওয়া, শ্বেতী রোগ হওয়া। সঙ্গম হওয়ার সময় পেশাব ও পায়খানা নির্গত হওয়া এবং হিজড়া হওয়া।

শাফেয়ীগণের মতে নিম্নোক্ত ক্রটির কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়া যায় :

পুরুষদের ক্রটি হলো : লিঙ্গকর্তিত হওয়া ও পুরুষত্বহীন হওয়া।

মহিলাদের ক্রটি হলো : যৌনাঙ্গ তথা সঙ্গমস্থল বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং লজ্জাস্থানে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া।

আর উভয়ের ক্ষেত্রে যে সকল ক্রটি প্রযোজ্য তা হলো : পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগী হওয়া ও শ্বেতী রোগী হওয়া।[১২২]

হাম্বলীগণের মতে পুরুষত্বহীনতা ও লিঙ্গকর্তিত হওয়ার কারণে কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়া যায়। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সঙ্গমস্থল বন্ধ হওয়া, যৌনাঙ্গে কোনো প্রতিবন্ধকতা ও লিঙ্গ প্রবেশ করাতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়া যায়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ পাগল হলে কিংবা শ্বেতরোগে আক্রান্ত হলে অথবা কুষ্ঠরোগ পীড়ায় জর্জরিত হলে বিচ্ছেদ করে দেয়া যায়। আবূ বকর ও আবূ হাফস হাম্বলী মতাবলম্বী এ দুই ফকীহ পূর্বোক্ত দোষ-ক্রটির সাথে পেটের অতিসার রোগ ও অনবরত পেশাব হওয়ার রোগকে সংযুক্ত করেছেন।

ফকীহগণের বিবরণ হতে বুঝা যায়, বিচ্ছেদকে তারা উপর্যুক্ত ক্রটিসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। মুগনীতে বলা হয়েছে, আমরা যে সব ক্রটির কথা আলোচনা করেছি এছাড়া অন্য কোনোটিতে বিচ্ছেদ ঘটানোর কোনো অধিকার নেই। তবে কোনো কোনো ফকীহ- এর মতে বিচ্ছেদ ঘটানোর কারণ এ সকল ব্যাপারে সীমিত রাখা উচিত নয়, বরং এ সকল ক্রটির সাথে এ ধরনের অন্যান্য ক্রটিকেও সংযুক্ত করা উচিত।

যেমন ইবনে তাইমিয়া বলেন, যদি পরিপূর্ণরূপে সম্ভোগ করা না যায় তাহলে এ ক্রটির কারণে মহিলাকে ফিরিয়ে দেয়া যায়। ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা যাদুল মাআদ গ্রন্থে বলেন, দুই, ছয়, সাত ও আটটি ক্রটির সাথে সীমিত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অন্ধ, বোবা, বধির, হাত পা কর্তিত হওয়া ইত্যাদি ক্রটি দাম্পত্যজীবনে আরও বেশী অশান্তি সৃষ্টি করে।

যুক্তিও হলো, যে সকল ক্রটির কারণে দাম্পত্যজীবনে অশান্তির উদ্রেক হয় সে গুলোকে আমলে নেয়া। বিবাহের লক্ষ্য যেমন- দয়া মায়া ও ভালবাসা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক হয় সে সবকে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা।

---

১২২. মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০২।

www.amarboi.org

**ত্রুটির কারণে বিচ্ছেদের শর্তাবলি**

ফুকাহায়ে কিরাম ত্রুটির কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়ার শর্তাবলি আরোপের ব্যাপারে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন।

প্রথমত : জমহুরগণ ত্রুটির কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত শর্তারোপ করেন :

**ক.** ত্রুটির উপর সন্তোষ প্রকাশ না করা। তা সঙ্গত হওয়ার পূর্বে হোক বা পরে, আকদের সময় হোক বা পরে যে কোনো ক্ষেত্রে হোক। এ অসন্তোষ প্রকাশ্যে হোক আর অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইঙ্গিতে হোক, উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

আর দম্পতির মাঝে যে ত্রুটিমুক্ত সে যদি অন্যজনের ত্রুটির উপর সন্তোষ প্রকাশ করে তা কথায় হোক আর কাজে হোক, তাহলে পরবর্তীকালে বিচ্ছেদের আর এখতিয়ার থাকবে না। সন্তোষ প্রকাশ প্রমাণিত হয় কথার দ্বারা। যেমন বলল, আমি তাকে দোষসহ বরণ করে নিলাম। অথবা স্ত্রীর সাথে এমতাবস্থায় সহবাস করল কিংবা স্ত্রী তার স্বামীকে সংগত হওয়ার সুযোগ প্রদান করল। এটি হলো, হাম্বলীগণের মাযহাব। শাফেয়ীগণও এক্ষেত্রে একমত পোষণ করেন। ব্যতিক্রম শুধু অক্ষম পুরুষের মাসআলায়। সেক্ষেত্রে শাফেয়ীগণের অভিমত হলো, সংগত হওয়ার পর স্ত্রী যদি স্বামীর এ অক্ষমতায় সন্তোষ প্রকাশ করে তাহলে পরবর্তীকালে তার আর কোনো এখতিয়ার থাকবে না। হাম্বলীগণ এতে দ্বিমত পোষণ করেন।

মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ হাম্বলীগণের সাথে একমত পোষণ করেন। তবে পুরুষত্বহীনের ক্ষেত্রে তারা দ্বিমত পোষণ করেন। স্ত্রী যখন পুরুষত্বহীন স্বামীকে তার অবস্থা জানা সত্ত্বেও তার থেকে স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দেয়। তখনও ইমাম মালিকের মতে স্ত্রীর বিচ্ছেদের অধিকার রহিত হবে না। এ সম্ভাবনার কারণে যে, স্ত্রী তার স্বামীর সুস্থতার আশা করেছিল।

বিবাহের পূর্বে যদি ত্রুটির ওপর সন্তোষ প্রকাশ করে তাহলে এর ফলে বিচ্ছেদের অধিকার রহিত হবে কি না-এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন স্ত্রীকে বলা হলো, তার হবু স্বামী পুরুষত্বহীন এতে সে স্পষ্টভাবে কিংবা ভাবভঙ্গিতে সন্তোষ প্রকাশ করল। এক্ষেত্রে জমহুরের অভিমত হলো এর ফলে তার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী র.-এর নতুন অভিমতও অনুরূপ। তবে পুরুষত্বহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার অভিমত হলো, এক্ষেত্রে তার অধিকার প্রলম্বিত হবে। কারণ এটি সবক্ষেত্রে সমান হয় না। এমনি কি এক মহিলার সাথে অক্ষমতা দলীল হয়না যে, অন্য মহিলার সাথেও সে সঙ্গম হতে অক্ষম হবে।[১২৩]

---

১২৩. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১২৮-১২৯; মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০৩

www.amarboi.org

## (খ) বিচ্ছেদ প্রার্থী মোটামুটি ক্রটিমুক্ত থাকা

জমহুরের অভিমত হলো, ক্রটির কারণে বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদনকারীকে ক্রটিমুক্ত থাকার কোনো শর্ত নেই। এতে হানাফীগণ দ্বিমত পোষণ করেন, যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তবে জমহুর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আল-লাখমীর বিবরণমতে মালেকীগণের অভিমত হলো, স্বামী ও স্ত্রী যদি একই দোষে ক্রটিযুক্ত হয় তাহলে স্বামীর অধিকার রয়েছে বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার, স্ত্রীর নয়। কারণ সে তার মোহর বাবদ সম্পদ ব্যয় করেছে ক্রটিমুক্ত স্ত্রী পাওয়ার লক্ষ্যে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি তার সঙ্গীর মধ্যে দোষ থাকার কথা জানতে পারে। আর সে দোষ যদি একজাতীয় হয়, যেমন : কুষ্ঠ রোগ বা শ্বেতীরোগ অথবা স্থায়ী পাগল তাহলে স্বামীর জন্য বিচ্ছেদের অধিকার রয়েছে। কারণ সে মোহর ব্যয় করেছে ক্রটিমুক্ত স্ত্রী পাওয়ার লক্ষ্যে; কিন্তু সে এমন মহিলা পেয়েছে যার মোহর কম।

আর যদি তার দোষ হয় ভিন্ন ধরনের, তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার রয়েছে।

শাফেয়ীগণের অভিমত হলো, ক্রটিযুক্ত ব্যক্তি অন্যের ক্রটির কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার রাখে। ক্রটি একই শ্রেণীভুক্ত হোক আর ভিন্ন ধারার হোক। কেউ কেউ বলেন, কুষ্ঠরোগ কিংবা শ্বেতরোগ জাতীয় দোষ যদি পরিমাণ ও কদর্যের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের হয় তাহলে দু'জনের মধ্য হতে কারোরই বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার নেই।

হাম্বলীগণ মনে করেন, বিচ্ছেদপ্রার্থী যদি এমন দোষে ক্রটিপূর্ণ হয় যা তার প্রতিপক্ষের দোষ থেকে ভিন্ন। যেমন, শ্বেতীরোগী যদি তার স্ত্রীকে পাগল হিসেবে পায় তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই অধিকার রয়েছে বিচ্ছেদের আবেদন করার। তবে কর্তিত লিঙ্গের পুরুষ যদি যৌনাঙ্গবিহীন মেয়েকে বিবাহ করে তাহলে তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করার কোনো অধিকার না থাকাই উচিত। কারণ এ ধরনের ক্রটি একে অন্যকে ভোগ করতে কোনো প্রতিবন্ধক নয়।

যদি উভয়ের ক্রটি সমজাতীয় হয় তাহলে এক্ষেত্রে দু'ধরনের অভিমত রয়েছে;

এক. দু'জনের কারও ইখতিয়ার নেই। কারণ দু'জনের ক্রটি একই সমান। এখানে অগ্রাধিকার দেয়ারও কোনো পন্থা নেই।

দুই. স্বামীর অধিকার রয়েছে বিচ্ছেদের আবেদন করার। কারণ এখানে হেতু বিদ্যমান।

www.amarboi.org

**গ. ক্রটিটি পুরাতন হওয়া শর্ত কি-না?**

জমহুর ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ক্রটিটি আকদের পূর্বে হোক আর পরে হোক অধিকার প্রমাণের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। এর কারণ হলো, আক্দ অনুষ্ঠিত হয় উপকার ও কল্যাণের জন্য। আর ক্রটি আপতিত হওয়ার কারণে এখতিয়ার সাব্যস্ত হয়ে যায়। বিষয়টির তুলনা করা যায় ইজারার সাথে। তবে এ সম্পর্কে কয়েকটি ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

মালেকীগণ বলেন, আক্দের পূর্বেকার ক্রটি বা আকদের সাথে সাথে দেখা দেয়া ক্রটিই কেবল এখতিয়ারের অধিকার সাব্যস্ত করবে। আর আকদ উত্তর ক্রটি যদি স্ত্রীর ওপর আকস্মিক আপতিত হয়, তাহলে বিচ্ছেদের আবেদন করার স্বামীর অধিকার নেই। কারণ ক্রটি আকস্মিক নাযিল হওয়া বিপদ। প্রয়োজনে তালাকের মাধ্যমে তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার সুযোগ আছে। যদি আকদ উত্তর ক্রটি স্বামীর মাঝে মারাত্মক ধরনের হয় তাহলে স্ত্রীর বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকার রয়েছে। কারণ তা নিয়ে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। ক্রটি যদি গুরুতর না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী বিচ্ছেদের অধিকার ভোগ করতে পারবে না।

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মতে, পুরাতন ক্রটি থাকলে সাধারণভাবে অধিকার ভোগ করবে। আর আকদ-উত্তর ক্রটি দেখা দিলে যদি তা স্বামীর মাঝে সৃষ্টি হয় যেমন স্বামী যদি লিঙ্গ কর্তিত হয়ে যায় তাহলে তা মিলনের পূর্বেকার ঘটনা হলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী বিচ্ছেদের অধিকার ভোগ করবে নিশ্চিতভাবে। আর যদি মিলনের পরবর্তীকালে তা সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রেও বিশুদ্ধমত অনুযায়ী স্ত্রী উক্ত অধিকার ভোগ করবে।

**ঘ. যেসকল ক্রটি হতে মুক্তির আশা করা যায় সে ক্ষেত্রে বিলম্ব করা**

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ পুরুষত্বহীন স্বামীর ক্ষেত্রে একবছর পর্যন্ত বিলম্ব করার ব্যাপারে হানাফীগণের ন্যায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অন্যান্য ক্রটির ব্যাপারে অবশ্য তারা মতানৈক্য করেছেন। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে, অন্য ক্রটির ক্ষেত্রে বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই।

মালেকীগণের মতে যে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে বিলম্ব করতে হবে। তারা বলেন, পাগলামী, কুষ্ঠরোগ, শ্বেতরোগ ও দুর্গন্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিলম্ব করতে হবে। বিচারক এ ব্যাপারে একমাস বা দু'মাস সময়সীমা বেধে দিবেন, যা তিনি সমীচীন মনে করবেন। তারা এব্যাপারে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করেন নি। আর যদি রোগ এমন পর্যায়ের হয় যা সুস্থ হওয়ার নয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই। তাৎক্ষণিকভাবে বিচারক তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবেন। কারণ সেক্ষেত্রে বিলম্বের মাঝে কোনো ফায়দা নেই।[১২৪]

---

১২৪. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ২৭৯; মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০৬; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১২৬।

www.amarboi.org

**ঙ.** স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজনের বিচ্ছেদের আবেদন করতে হবে এবং প্রতিপক্ষের ত্রুটি প্রমাণ করতে হবে। কারণ, বিচ্ছেদ একটি অধিকার। এর আবেদনকারী পাওয়া না গেলে বিচারকের জোরপূর্বক বিচ্ছেদ করে দেয়ার কোনো অধিকার নেই। পুরুষত্বহীন স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর কর্তব্য হলো বিচ্ছেদের আবেদন করা, সময়সীমা বেধে দেয়ার পূর্বে ও পরে।

আল-মুগনীতে রয়েছে স্ত্রী না চাইলে বিচ্ছেদ করে দেয়া যাবে না। কারণ বিষয়টি স্ত্রীর অধিকারভুক্ত।[১২৫] তাই এ ব্যাপারে তাকে জোর জবরদস্তি করা যাবে না।
হানাফীগণের মতে ত্রুটির কারণে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে দু'ধরনের শর্ত রয়েছে :
এক. সবধরনের ত্রুটির ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত
**দুই.** নির্দিষ্ট ত্রুটির ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

### হানাফীদের মতে সকল শ্রেণীর ত্রুটির ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত

**ক.** আকদের পূর্বে ত্রুটি সম্পর্কে স্ত্রীর অনবহিত থাকা। অবহিত হওয়ার পর স্পষ্টভাবে কিংবা ইঙ্গিতে ও লক্ষণের দ্বারা সন্তুষ্টি প্রকাশ না করা। পক্ষান্তরে আকদের পূর্বে যদি স্বামীর ত্রুটি সম্পর্কে স্ত্রী অবহিত থাকে তাহলে আকদ হয়ে যাওয়ার পর আর তার বিচ্ছেদের আবেদন করার আইনত অধিকার থাকবে না। অনুরূপভাবে আকদ হয়ে যাওয়ার পর যদি সে অবহিত হয় আর সে কথার মাধ্যমে এ অবস্থার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে যেমন সে বলল, 'আমি তার এ দোষ ও ত্রুটি সত্ত্বেও রাজি আছি' কিংবা তার আচরণের মাধ্যমে সন্তুষ্টি প্রকাশ পায় যেমন সে মিলনের সুযোগ দেয়, তাহলে স্ত্রীর বিচ্ছেদের অবেদন করার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

**খ.** বিচারকের নিকট স্ত্রী কর্তৃক বিচ্ছেদের আবেদন করতে হবে। কারণ বিচ্ছেদের অধিকার হলো স্ত্রীর। তার আবেদন ছাড়া বিচারকের বিচ্ছেদ করে দেয়ার অধিকার নেই।

**গ.** মিলনের প্রতিবন্ধক সকল ধরনের ত্রুটি হতে স্ত্রীকে মুক্ত থাকতে হবে। যদি সে এ ধরনের ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে স্বামীর কোনো ত্রুটির কারণে তার বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকার খর্ব হয়ে যাবে। কারণ, মিলনের প্রতিবন্ধকতা কেবল স্বামীর পক্ষ থেকে নয়; বরং উভয় পক্ষ থেকেই তা বিদ্যমান।

### পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তসমূহ

**ক.** যৌনাঙ্গে লিঙ্গ প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হওয়া। তাই মলদ্বারে প্রবেশ করাতে সক্ষম হলে সে পুরুষত্বহীনতা থেকে অব্যাহতি পাবে না।

**খ.** আপন স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে অক্ষম হওয়া। অন্য কোনো মহিলার সাথে মিলনে

---

১২৫. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১২৭।

www.amarboi.org

সক্ষম হলে তাকে পুরুষত্বসম্পন্ন বলে গণ্য করা যাবে না। কারণ, পুরুষত্বহীনতা হলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনোরোগজনিত। নারীভেদে তা ভিন্ন হতে পারে।

গ. লিঙ্গের পূর্ণ অগ্রভাগ ঢুকাতে ব্যর্থ হওয়া। অগ্রভাগ যদি কর্তিত হয় তাহলে বাকী অংশের পূর্ণটুকু ঢুকাতে ব্যর্থ না হলে পুরুষত্বহীন বলে গণ্য হবে না।

ঘ. পুরুষত্বহীনতার পূর্বে একবার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে না পারা। কেননা একবার মিলিত হওয়ার মাধ্যমে স্ত্রীর বিচ্ছেদের অধিকার রহিত হয়ে যায়। পূর্বের (প্রথম) বিয়ের পর স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং মিলিত হওয়ার পর স্ত্রীকে বায়েন তালাক প্রদান করে। অতঃপর আবার নতুন বিয়ের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে আনে, এবার স্বামী মিলনের পূর্বে পুরুষত্বহীনতার মুখোমুখি হলে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, এর ফলেও স্ত্রীর বিচ্ছেদের আবেদনের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অভিমত হলো, স্ত্রীর অধিকার রহিত হবে না।

ঙ. কাজীর নিকট অভিযোগ উত্থাপনের পর তিনি একবছর পর্যন্ত স্বামীকে সময় প্রদান করবেন। এক বছরের মাঝে যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে সক্ষম না হয় আর স্ত্রী আবার অভিযোগটি নিয়ে কাজীর নিকট আসে তাহলে কাজী বিচ্ছেদ কার্যকর করবেন।

মোটকথা কাজীর নিকট অভিযোগ দায়ের ছাড়া বিচ্ছেদ কার্যকর করা যাবে না। সামাজিক বিচার সালিশের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। আবার বর্ষ অতিক্রম করা ছাড়াও বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না।

**লিঙ্গকর্তিত ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি**

পুরুষাঙ্গ কর্তিত হওয়া। আর যখন পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ উভয়টি কর্তিত হবে তখন বিচ্ছেদ অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। আর যদি লিঙ্গ কর্তিত না হয়; বরং ফুলের কুঁড়ির ন্যায় খাটো হয় সেক্ষেত্রে তা কর্তিতলিঙ্গের হুকুমের আওতাভুক্ত হবে। কারণ যৌনাঙ্গে এ ধরনের লিঙ্গ ঢুকানো সম্ভব নয়। আকারে ছোট হলেও যদি তা ঢুকানো সম্ভব হয় তাহলে কর্তিত লিঙ্গ সাব্যস্ত হবে না। এর দ্বারা বিচ্ছেদও কার্যকর হবে না। যদিও তা যৌনাঙ্গের শেষ সীমানায় না পৌঁছায়। লিঙ্গের কেবল অগ্রভাগ কর্তিত হলেও যদি বাকি অংশ প্রবেশ করাতে সক্ষম হয় তাহলে স্বামীকে কর্তিত লিঙ্গসম্পন্ন বলে গণ্য করা যাবে না। ফলে বিচ্ছেদ করে দেয়ার প্রশ্নও আসবে না।

**খাসি হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তসমূহ**

হানাফীগণের মতে পুরুষত্বহীনের ক্ষেত্রে যেসকল শর্ত আরোপ করা হয়েছে খাসি হওয়ার ক্ষেত্রেও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। উভয়ের হুকুম একইরূপ হওয়ার কারণে। উভয় অন্ডকোষ উৎপাটন বা কেটে ফেলার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি তার লিঙ্গ উত্থিত না হয় তাহলে তাকে খাসি হওয়া হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি লিঙ্গ

www.amarboi.org

উত্থিত হয় তাহলে সে খাসি হিসেবে পরিগণিত হবে না। ফলে এর কারণে বিচ্ছেদের অধিকার থাকবে না।

**দোষ-ত্রুটি প্রমাণের পন্থা**

ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তি যখন তার ত্রুটির কথা স্বীকার করবে তখন তার ত্রুটি প্রমাণিত হয়ে যাবে। এর ফলে সে আলোকে ফয়সালা করা যাবে। যদি সে ত্রুটির কথা অস্বীকার করে এবং ত্রুটিমুক্ত হওয়ার দাবী করে তাহলে ত্রুটি যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, লুঙ্গির ওপর থেকে যাচাই করা যায় তাহলে বিচারক এমন একজন পুরুষকে নিয়োগ করবেন, যে লুঙ্গির ওপর হাত বুলায়ে তা যাচাই করবে। সে যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে তার কথা গৃহীত হবে। কারণ এটি এক প্রকার সংবাদ প্রদান করা।

যাচাই করে পরখ করার মত ত্রুটি না হলে বিচারক নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখার অনুমতি দিবে। প্রয়োজনের খাতিরে এখানে তা বৈধ হবে।

ত্রুটি যদি মহিলার মাঝে হয় যেমন যোনিদ্বার সংকীর্ণ হওয়া বা যোনিদ্বারে গোশত বা হাড্ডি বেড়ে যাওযায় সঙ্গম করার প্রতিবন্ধক হওয়া ইত্যাদি তাহলে বিচারক এক মহিলাকে তা দেখে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করবেন। সে ন্যায়পরায়ণ হলে তার কথা গৃহীত হবে।

ত্রুটি যদি যাচাই করে বুঝার মত না হয় যেমন পুরুষত্বহীনতা, সেক্ষেত্রে যদি স্ত্রী দাবি করে সে কুমারী, তাহলে তাকে অন্য মহিলা দিয়ে দেখিয়ে নিতে হবে। যদি একজন বা দু'জন নির্ভরযোগ্য মহিলা সাক্ষী দেয় যে, সে কুমারী তাহলে তার কথা গৃহীত হবে। দু'জন মহিলার কথা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অতঃপর একবছর সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে। কারণ প্রকাশ্য অবস্থা তার সাক্ষী। বছর পূর্ণ হওয়ার পরও অনুরূপ হুকুম আরোপিত হবে। যদি নির্ভরযোগ্য মহিলা বলে যে, স্ত্রীটির কুমারিত্ব নেই তাহলে স্বামীকে হলোফ করতে বলা হবে। যদি সে হলফ করে বলে যে, সে পুরুষত্বহীন নয় তাহলে তা গৃহীত হবে। তখন স্ত্রীর বিচ্ছেদ করে দেয়ার আবেদন করার অধিকার থাকবে না। স্বামী যদি হলফ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে পুরুষত্বহীন বলে ফয়সালা দেয়া হবে এবং নির্ধারিত সময় সীমার এখতিয়ার লাভ করবে।

স্ত্রী যদি দাবী করে সে অকুমারী তার কুমারিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। তাহলে স্বামীকে বলা হবে পুরুষত্বহীন নয় বলে তুমি শপথ কর, যদি সে শপথ করে তাহলে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হবে। সেক্ষেত্রে স্ত্রীর এখতিয়ার রহিত হবে। যদি সে হলফ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে স্বামীকে পুরুষত্বহীন বলে ঘোষণা করা হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয়া হবে অথবা বিচ্ছেদের এখতিয়ার প্রদান করা হবে।



www.amarboi.org

স্ত্রী যদি দাবি করে সে কুমারী। অতঃপর পরীক্ষা করে দেখা গেল সে অকুমারী। তখন স্ত্রী যদি বলে যে, স্বামী আঙ্গুল দিয়ে কিংবা অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করে তার কুমারিত্ব নাশ করেছে। তাহলে স্বামীর কথা শপথের সাথে গৃহীত হবে। কারণ স্ত্রীর দাবি মৌল অবস্থার পরিপন্থী। এসকল বিশ্লেষণ হলো হানাফী ফিকহের আলোকে।[১২৬]

হাম্বলীগণও পুরুষত্বহীন ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে হানাফীগণের অনুরূপ মত পোষণ করেন। পুরুষত্বহীনের ব্যাপারে একজন মহিলার কথা গ্রহণ সম্পর্কে তাদের অভিমত হলো দু'টি। তাই স্ত্রী কুমারী হোক আর অকুমারী।

**এক.** স্বামী শপথ করে বললে, তার কথা গৃহীত হবে। কারণ বাহ্যিক অবস্থা তার পক্ষে সাক্ষীদাতাস্বরূপ।

**দুই.** স্ত্রীর সাথে স্বামীকে একান্তে থাকতে বলা হবে এবং তাকে বীর্য নির্গত করে কোনো জিনিসের উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হবে। যদি সে এতে সক্ষম হয় তাহলে তার কথা গৃহীত হবে। কারণ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি বীর্যপাত ঘটাতে অক্ষম হয়। বীর্যপাত ঘটাতে সক্ষম হলে তার সত্যতা প্রকাশ পাবে।

ইমাম আহমদ হতে তৃতীয় একটি অভিমত রয়েছে। তা হল স্ত্রী শপথ করে বললে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কাজী ইয়ায মুজাররাদ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

শাফেয়ীগণও এ সম্পর্কিত মাসআলায় হানাফী ও হাম্বলীগণের অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তবে পুরুষত্বহীনের ব্যাপারে তারাও ভিন্নমত পোষণ করেন। স্ত্রী যদি স্বামীর পুরুষত্বহীন হওয়ার দাবী করে বলে, এজন্য সে এখনও কুমারী রয়েছে। তাহলে কমপক্ষে চারজন মহিলাকে দেখাতে হবে। যদি তারা সাক্ষী দেয় যে, স্ত্রী কুমারী, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে হলফ করতে বলা হবে কি-না, সে ব্যাপারে দু'ধরনের অভিমত পাওয়া যায় : শারহুস সাগীর গ্রন্থে হলোফ করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমই এ মত পোষণ করেন। স্ত্রী যদি বলে, সে অকুমারী। আর স্বামীর সাথে তার সহবাস অস্বীকার করে এবং স্বামীর মিলনক্ষমতা নেই বলে দাবি করে, সেক্ষেত্রে স্বামী শপথ করে যদি স্ত্রীর দাবীকে অস্বীকার করে তাহলে তার কথা গৃহীত হবে। কারণ বাহ্যিক অবস্থা তার পক্ষে। স্বামী যদি হলোফ করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী হলফ করে তার দাবি প্রমাণ করবে। আর এক বর্ণনা মতে স্ত্রী হলোফ করবে না।

মালেকীগণের মতে কোনোভাবে যাচাই বা অনুসন্ধান করা গেলে তা করবে। আর যদি যাচাই বা অনুসন্ধানের দ্বারা জানা সম্ভব না হয়, আর ত্রুটিটিও এমন

১২৬. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৪৯৯ ও তুহফাতু'ল ফুকাহা খ. ২, পৃ. ৩৩৬।

www.amarboi.org

ধরনের যা কোনো পুরুষ বা মহিলা দেখতে পায়না যেমন পুরুষাঙ্গ উত্থিত না হওয়া অথবা মহিলার যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরভাগের শ্বেতী রোগ তাহলে যার ত্রুটি, শপথের সাথে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি ত্রুটি এমন পর্যায়ের হয় যা পুরুষে দেখতে পায় যেমন : পুরুষ বা মহিলার হতে বা মুখমণ্ডলে শ্বেতীরোগ তাহলে দু'জন পুরুষের সাক্ষী ছাড়া তা প্রমাণিত হবে না। আর যদি ত্রুটি মহিলার যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরভাগা ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অভ্যন্তরভাগে হয় তাহলে দু'জন মহিলার সাক্ষীই যথেষ্ট হবে।

**ত্রুটির ফলে সাব্যস্ত হওয়া বিচ্ছেদের ধরন এবং তা আরোপের পন্থা**

হানাফী ও মালেকীগণের মতে ত্রুটির কারণে আরোপিত বিচ্ছেদ হলো বায়েন তালাক। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে ত্রুটি কেবল সম্পর্কছিন্ন করে দেয়া, তালাক নয়।

এমনিভাবে হানাফীগণের মতে, কাজীর নিকট উত্থাপন ছাড়া ত্রুটির কারণে কোনো ধরনের বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে না। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর কাজী স্বামীকে তালাকদানে বাধ্য করবেন। যদি সে তালাক দেয় তাহলে ভাল, অন্যথায় কাজী তালাক প্রদান করবে। হানাফীগণ হতে এও বর্ণিত আছে যে, পুরুষত্বহীনের কারণে স্ত্রীকে বেঁধে দেয়া সময়সীমা অতিক্রম করার পর যদি স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হওয়াকে বেছে নেয় তাহলে কাজীর ফায়সালা ছাড়াই তা কার্যকর হয়ে যাবে। এটিই জাহিরী রেওয়ায়াত তথা প্রকাশ্য মত।[১২৭]

হানাফীগণের দ্বিতীয় অভিমতই হলো মালেকীগণের অভিমত। ব্যতিক্রম হলো এক্ষেত্রে যে, তাদের মতে যখন স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে বিচ্ছেদের প্রশ্ন আসবে তখন শর্ত হলো কাজীর অনুমতি নিয়ে সে তালাক দেবে। অতঃপর মতবিরোধ দূরীভূত করার লক্ষ্যে কাজীও সে আলোকে রায় দেবেন। এখানে কাজীর রায় কেবল সাক্ষীদান ও পাকাপোক্ত করার নিমিত্তে, তালাকদানের জন্য নয়। কারণ তালাক তো স্ত্রীর কথায়ই পতিত হয়ে গেছে।[১২৮]

শাফেয়ীগণের এব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে : এক. মহিলার যখন কাজীর সামনে বিচ্ছেদের অধিকার প্রমাণিত হয়ে যায় তখন বিচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায়। তার শপথের মাধ্যমে তা কার্যকর করবে অথবা স্বামীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। দুই. বিতর্ক নিরসনের লক্ষ্যে বিচ্ছেদ হতে হবে কাজির রায়ের মাধ্যমে।[১২৯]

---

১২৭. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ১২৫।
১২৮. আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ২৮২।
১২৯. মুগনি আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২০৭।

www.amarboi.org

হাম্বলীগণের মতে কাজির রায় ছাড়া বিচ্ছেদ পূর্ণ হয় না।[১৩০]

**ত্রুটিজনিত কারণে যে বিচ্ছেদ হয় তা কি চিরস্থায়ী?**

জমহুরের অভিমত হলো, এ বিচ্ছেদ স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। নতুন বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী আবার দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারবে। হাম্বলী মতাবলম্বী আবু বকর-এর মতে তা স্থায়ী বিচ্ছেদ।[১৩১]

**সমকক্ষ তথা কুফূ না হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ**

জমহুর ফকীহদের অভিমত হলো, বিয়ে শাদীতে সমকক্ষতার বিধান নিশ্চিত করতে হবে। তবে সমতার বিধান করা না হলে সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের মাসআলায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বিস্তারিত দ্র. কাফাআত (كَفَاءَةٌ) শিরোনাম।

**বিচ্ছেদের অন্যান্য ধারাসমূহ**

বিচ্ছেদ ঘটানোর আরও কিছু ধারা রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ কিছু কিছু ধারায় তালাক পতিত হওয়ার কথা বলেছেন। তা হলো :

ক. বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তালাক। এর বিস্তারিত বিবরণ শিরোনাম (بُلُوغٌ) দ্র.

খ. দীন ভিন্নতার কারণে বিচ্ছেদ। বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম রিদ্দাত (ردة)

গ. লিআনের কারণে বিচ্ছেদ। বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম লিআন (لعان)

ঘ. বিয়ের আকদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বিচ্ছেদ। বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম নিকাহ (نِكَاحٌ)

ঙ. দুগ্ধপান ও বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তাজনিত কারণে হারাম হওয়া। বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম রিদা‘ (رَضَاعٌ) ও মুসাহারা (مُصَاهَرَةٌ)

চ. মোহর কম হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ। বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম মোহর (مهر)।

—ফয়সল আহমদ জালালী

---

১৩০. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১২৬-১২৭

১৩১. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১২৭; আল-বাহরুর-রায়েক, খ. ৪, পৃ. ১২৭।

www.amarboi.org

## তালাকের ক্ষমতা প্রদান (تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ)

**সংজ্ঞা :** আভিধানিকভাবে التَّفْوِيضُ হলো فَوَّضَ এর ক্রিয়ামূল। বলা হয় : فَوَّضْتُ إِلَى فُلَانٍ আমি অমুকের নিকট বিষয়টি সোপর্দ করলাম। অর্থাৎ আমি তাকে এ বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রদান করলাম।[১] সূরা ফাতিহা সম্পর্কিত হাদীসে আছে 'আমার বান্দা আমার কাছে সোপর্দ করেছে'।[২] আর পারিভাষিক অর্থে শব্দটি বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়ে থাকে : فَوَّضَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحَهَا إِلَى الزَّوْجِ حَتَّى تَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ 'মহিলাটি তার বিবাহের দায়িত্ব স্বামীর ওপর অর্পণ করেছে। ফলে মোহর ছাড়াই সে তাকে বিবাহ করেছে'। আরো বলা হয় : فَوَّضَتْ 'সে (মহিলা) সোপর্দ করেছে'। অর্থাৎ মোহরের ব্যাপারে সে শৈথিল্য করেছে। সুতরাং মহিলা মহর ছাড়া স্বীয় ক্ষমতা স্বামী অথবা অভিভাবকের নিকট অর্পণ করার কারণে মহিলাকে مُفَوِّضَةٌ (ক্ষমতা প্রদানকারিণী) বলা হয়। আর মহিলার অভিভাবক কর্তৃক মোহর ছাড়া ক্ষমতা স্বামীর নিকট অর্পণ করার কারণে মহিলাকে مُفَوَّضَةٌ (ক্ষমতা প্রদত্তা) বলা হয়।[৩]

তালাকের ক্ষেত্রে التَّفْوِيضُ শব্দের অর্থ হলো, তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে অর্পণ করা।[৪]

**সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ**

**ক.** تَوْكِيل (অভিভাবক বানানো) : তাকে বিষয়টির অভিভাবক বা দায়িত্বশীল করা হল। অর্থাৎ তার ওপর বিষয়টি অর্পিত হলো। তাওকীল হলো, পরিচিত ও বৈধ কাজে প্রতিনিধি বানানো। শাফেয়ী ফিকহবিদগণের প্রাচীন মতানুসারে স্ত্রীর ক্ষেত্রে تَوْكِيل শব্দের অর্থ তালাকের সুযোগ দেওয়া তথা হুবহু তালাকের অধিকার প্রদান করা। আর মালেকী ফিকহবিদগণের মতানুসারে تَوْكِيل শব্দটি التَّفْوِيضُ-এর একটি প্রকার। (التَّفْوِيضُ - তিন প্রকার যথা التَّوْكِيل অভিভাবক বানানো,

---

১. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, فوض ধাতু।

২. মুসলিম, (১/২৯৬ সম্পা. ঈসা হালাবী); আহমাদ (১/২৪১-২৪২ আল-মাকতাবুল ইসলামী সং.।

৩. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩৩৫; দাসুকীর হাশিয়া, খ. ২, পৃ. ৩১৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২২৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ১৫৬।

৪. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; দাসূকীর টিকা, খ. ২, পৃ. ৪০৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ২৫৭।

www.amarboi.org

التَّمْلِيكُ মালিক, স্বত্বাধিকারী বানানো, التَّخْيِيرُ স্বাধীনতা প্রদান)। আর হাম্বলী ফিকহবিদগণের মতানুসারে স্ত্রীর হাতে তালাকের দায়িত্ব অর্পণ করা এবং তার ইচ্ছার ওপর তালাককে নির্ভরশীল করাই হলো التَّوْكِيل ।[৫]

**খ. التَّمْلِيكُ (মালিক বানানো)** : কোনো বস্তুর মালিক বানানো। হানাফী ফিকহবিদগণ ও আধুনিক মতানুসারে শাফেয়ী ফিকহবিদগণের মতে, স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণই হলো التَّمْلِيكُ (মালিক বানানো)। আর মালেকী ফিকহবিদগণের মতানুসারে التَّمْلِيكُ তিন প্রকার التَّفْوِيضُ -তার এক প্রকার। আর হাম্বলী ফিক্‌হবিদগণ মালিক বানানোর বিষয়টি الاخْتِيَار শব্দের সাথে নির্ধারণ করেন।[৬]

**গ. التَّخْيِيرُ (স্বাধীনতা প্রদান)** : দুই বস্তুর মধ্যে যে কোনোটি করার অধিকার প্রদান। আমি তাকে অধিকার দিয়েছি অতঃপর সে অধিকার গ্রহণ করেছে। التَّفْوِيض এর মূল বিষয় হলো, স্ত্রীকে স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে থাকা না থাকার অধিকার প্রদান করা। তাই তা তালাক প্রদানের অধিকারের মাধ্যমে হোক অথবা তালাকের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে হোক। হযরত আশেয়া রা. বলেন : রাসূলুল্লাহ স. যখন স্বীয় স্ত্রীদেরকে তালাকের অধিকার প্রদান করলেন এবং আমার থেকে শুরু করলেন ........।[৭] ফিকহবিদগণ اخْتَارِي 'তুমি ইচ্ছা পোষণ কর' বাক্যকে তালাকের ক্ষমতা প্রদানের অন্যতম বাক্য হিসেবে বিবেচনা করেন।[৮]

**التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দ করা সংক্রান্ত বিধানাবলি**

প্রথমত : বিবাহের ক্ষেত্রে التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দ করা : التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দ করার স্বরূপ ও বিধান।

বিবাহের ক্ষেত্রে التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দ করার অর্থ হলো, বিবাহবন্ধনের সময় মহর নির্ধারণের ব্যাপারে নিরব থাকা এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের ওপর অথবা অন্যের ওপর এ বিষয়টি সোর্পদ করা।

বিবাহের ক্ষেত্রে التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন :

---

৫. লিসানুল আরব وكل ধাতু; দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪০৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ২৫৭।

৬. লিসানুল আরব, মূল বর্ণ ملك ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; দাসুকীর টিকা, খ. ২, পৃ. ৪০৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ২৫৬।

৭. মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১১০৪-১১০৫ ঈসা হালাবী সম্পা.।

৮. লিসানুল আরব মূল বর্ণ خير ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; দাসূকীর টিকা, খ. ২, পৃ. ৪০৬।

www.amarboi.org

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"স্ত্রীদের স্পর্শ করার এবং কোনো মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই, তবে তাদের কিছু খরচ দেবে, সামর্থ্যবানদের ওপর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছলদের ওপর তাদের সাধ্য অনুযায়ী, যে খরচ নিয়মানুযায়ী প্রচলিত রয়েছে, সৎকর্মশীলদের ওপর অত্যাবশ্যক"।[৯]

দ্বিতীয়ত : মাকাল ইবন সিনান রা. বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স. বিরওয়া' বিনতে ওয়াশিক রা. এর ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন যখন তার স্বামী তার সাথে সহবাস না করা অবস্থায় মারা গিয়েছিল এবং স্বামী তার মহর নির্ধারণ করেনি। রাসূলুল্লাহ স. তার জন্য মোহরে মিছাল (অর্থাৎ পরিবারস্থ মহিলাদের মহরের সমপরিমাণ মোহর) এর ফয়সালা করেছিলেন। তার থেকে কম-বেশি করেননি।[১০]

তৃতীয়ত : বিবাহের উদ্দেশ্য হলো মিলন ও উপভোগ। মোহর প্রদান করা উদ্দেশ্য নয়। অতএব মোহর নির্ধারণ ছাড়াই বিবাহ শুদ্ধ হবে।[১১]

বিবাহের যে সকল অবস্থায় মোহর নির্ধারণ করা হয় না তার কোনো কোনো অবস্থা সম্পর্কে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। তা কি التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে তাতে তার অনুরূপ বিধান কার্যকর হবে কি না? যথা মোহর না দেওয়ার শর্ত করা, মোহর ক্ষমা করার ব্যাপারে উভয়ে রাজি হওয়া। সকল ফিকহবিদ-এর মতে এসব অবস্থা التَّفْوِيضُ -এর আওতাভুক্ত। এ জন্য এসব অবস্থায় বিবাহ বন্ধন শুদ্ধ হবে বলে তারা মত দিয়েছেন। কারণ বিবাহের মধ্যে মোহর রোকন বা শর্ত নয়; বরং মোহর হলো বিবাহের একটি বিধান। সুতরাং উক্ত বিধানের মধ্যে ত্রুটি হওয়ার ফলে বিবাহ বন্ধনে কোনোরূপ প্রভাব পড়বে না। পক্ষান্তরে মালেকী ফিকহবিদগণ এসব অবস্থায় বিবাহ শুদ্ধ না হওয়ার মতামত দিয়েছেন। তাই তাদের মতে সহবাসের পূর্বেই বিবাহ ভেঙ্গে

---

৯. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৬।

১০. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৮৮, সম্পা. উবায়দ আদ-দাআস'; তিরমীযী, খ. ৩, পৃ. ৪৫০, সম্পা. মুসতাফা আল-হালাবী, যা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ২, পৃ. ২৭৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৩৯; হাশিয়া দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩১৩; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২০৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২২৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ১৫৬; ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২১৮।

www.amarboi.org

দিতে হবে। আর যদি সহবাস করে ফেলে তাহলে বিবাহ বন্ধন চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং তার জন্য মোহরে মিছাল প্রদান আবশ্যক হবে।[১২]

### التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দ করণ-এর প্রকারভেদ

বিবাহের ক্ষেত্রে التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দকরণ দুই প্রকার :

**ক.** মোহর সোপর্দকরণ : তা হলো স্ত্রীর চাহিদা ও আশানুরূপ মোহর ধার্য করে বিবাহ করা। অথবা স্বামী বা অভিভাবক বা অন্যের আশানুরূপ মোহর ধার্য করে বিবাহ করা। মালেকী ফিকহবিদগণ এই প্রকারকে التَّفْوِيضُ বা সোপর্দকরণ বলে বিবেচনা করেন না; বরং এটিকে التَّحْكِيم তথা ফয়সালা প্রদান হিসেবে বিবেচনা করেন।

**খ.** গুপ্তাঙ্গ সোপর্দকরণ : তা হলো পিতা কর্তৃক মোহর ছাড়া জোরপূর্বক মেয়েকে বিবাহ করানো। অথবা মেয়ে কর্তৃক মোহর ছাড়া স্বীয় অভিভাবককে বিবাহের অনুমতি প্রদান করা।[১৩]

### التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দকরণ প্রক্রিয়ার বিবাহে যা করণীয়

হানাফী ও হাম্বলী ফিকহবিদগণের মাযহাব যা শাফেয়ী ফিকহবিদগণের জাহেরী মতের পরিপন্থী একটি মত, তা হলো, التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দকরণ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহরে মিছাল বিবাহবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর মৃত্যু অথবা সহবাসের দ্বারা তা দৃঢ় হয়ে যায়। শাফেয়ী আলেমগণের জাহেরী বর্ণনামতে মহরে মিছাল সহবাসের দ্বারা ওয়াজিব হয়।

মালেকী ফিকাহবিদগণ সহবাস ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন : সহবাস করার দ্বারা মোহর মিছাল আবশ্যক হবে। মৃত্যুর দ্বারা আবশ্যক হবে না। যার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

মালেকী ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, যদি সঙ্গমের পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে মুতআ (এককালীন দেয়া প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ) প্রাপ্ত হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন,

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

---

১২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২০৫; দাসূকীর হাশিয়া, খ. ২, পৃ. ৩০৩-৩১৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২২৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ১৫৬।

১৩. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২২৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৫৬; দাসূকীর টীকা, খ. ২, পৃ. ৩১৩।

www.amarboi.org

"স্ত্রীদের স্পর্শ করার এবং কোনো মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই, তবে তাদের কিছু খরচ দেবে, সামর্থ্যবানদের ওপর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছলদের ওপর তাদের সাধ্য অনুযায়ী, যে খরচ নিয়মানুযায়ী প্রচলিত রয়েছে, সৎকর্মশীলদের ওপর অত্যাবশ্যক।"[১৪]

মুতআ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফিক্হবিদগণের মতবিরোধ রয়েছে। জমহুর ফিকাহবিদগণের মতে মুতআ ওয়াজিব। কারণ আদেশসূচক বাক্য কোনো কিছু ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। আর উক্ত বিষয়ের সাথে আয়াতের এ অংশটি : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 'সৎকর্মশীলদের ওপর অত্যাবশ্যক'-এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ ওয়াজিব পালন সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত সোপর্দকৃত স্ত্রীর জন্য কোনো কিছু ওয়াজিব হয়নি। অতএব অনাহার ও অভাব-অনটন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্ত্রীকে মুতআ দেওয়া ওয়াজিব হবে।

আর মালেকী ফিকহবিদগণের মতে মুতআ মুস্তাহাব এবং শাফেয়ী ফিকহবিদগণের প্রথম উক্তিও অনুরূপ। কারণ মহান আল্লাহর বাণী حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 'সৎকর্মশীলদের ওপর অত্যাবশ্যক' সম্পর্কে মালেকী ফিকহবিদগণ বলেন, যদি মুতআ ওয়াজিব হত তাহলে অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল সৎকর্মশীলদের জন্য তা ওয়াজিব হত না।

সহবাসের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর জন্য মোহর মিছাল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। জমহুর ফিকহবিদগণ বলেন, যদি مُفَوَّضَةٌ তথা সোপর্দকৃত স্ত্রী রেখে সহবাসের পূর্বেই স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী মোহর মিছাল প্রাপ্ত হবে। কারণ মাকাল ইবনে সিনান রা.-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ স. বিরওয়া বিনতে ওয়াশিকের ব্যাপারে, যার স্বামী তার সাথে সহবাস ও মোহর নির্ধারণের পূর্বে মারা গিয়েছিল আর রাসূল স. কোনো প্রকার কম-বেশি না করে তার জন্য মহর মিছাল ধার্য করেছিলেন।[১৫]
আর মালেকীগণের মাযহাব হল, উক্ত স্ত্রী কোনো প্রকার মোহর পাবে না যদিও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হতে পারবে।[১৬]

---

১৪. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৬।

১৫. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৮৮, সম্পা. উবায়দ আদ-দাআস'; তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৪৫০, সম্পা. মুসতাফা আল-হালাবী, যা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

১৬. তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ২০০; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫; দাসূকীর টীকা, খ. ২, পৃ. ৩০১-৩১৩, পরবর্তী পৃ. ৪২৬; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২০৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২৮, পরবর্তী পৃ. ২৪১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ১৪৭, ১৫৬।

www.amarboi.org

## দ্বিতীয়ত : তালাকের ক্ষেত্রে التَّفْوِيضُ বা সোপর্দকরণ

### তালাকের ক্ষেত্রে সোপর্দকরণের হুকুম

ফিকহবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান করা বৈধ।[১৭] দলীল জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. হতে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, একদা হযরত আবু বকর রা. রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ স. এর দরজায় অপেক্ষারত দেখলেন। (রাসূলুল্লাহ্ স. এর পক্ষ থেকে) তাদের কাউকে অনুমতি দেওয়া হলো না। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর রা.-কে অনুমতি দেওয়া হলো। সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর উমর রা. এসে অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ্ স. অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ স. এর চারপাশে তার স্ত্রীগণকে নীরব নিস্তব্ধ অবস্থায় বসা দেখলেন। জাবির রা. বলেন, অতঃপর তিনি (ওমর) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই এমন কথা বলব, যা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর মুখে হাসি ফুটাবে। অতপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি খারেজার কন্যার বিষয়টি ভেবে দেখেছেন? সে আমার নিকট খরচাদি দাবি করেছিল। আর আমি তার ঘাড়ে আঘাত করেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ স. হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার পাশে যাদেরকে তুমি দেখতে পাচ্ছ তারা (স্ত্রীগণ) আমার নিকট খরচাদি দাবি করছে। অতপর আবু বকর রা. আয়েশার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ে ধরলেন আর ওমর রা. হযরত হাফসার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ে ধরলেন। তারা উভয়েই (আবু বকর ও ওমর) তখন বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট এমন জিনিস প্রার্থনা করছ, যা তাঁর নিকট নেই! তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমারা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট এমন বস্তু প্রার্থনা করব না, যা তাঁর কাছে নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ স. এক মাস অথবা ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত তাদের থেকে পৃথক রইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ স. এর ওপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا- وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

“হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই

---

১৭. ইবনে আবেদীনের টীকা, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; দাসূকীর টীকা, খ. ২, পৃ. ৪০৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ২৫৪; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ১৪, পৃ. ১৬২; ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ১৫০৫; আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯।

www.amarboi.org

এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[১৮]

বর্ণনাকারী হযরত জাবির রা. বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. হযরত আয়েশা রা. কে প্রথমে বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমার কাছে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। আমার আশা যে, তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিবে না। আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে প্রস্তাবটি কী? তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। আয়েশা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারে আমি আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করব! বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখেরাতকে গ্রহণ করলাম। আর আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমার বক্তব্য সম্পর্কে আপনার অন্য স্ত্রীদেরকে অবগত করবেন না। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, যে কোনো স্ত্রী আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবে আমি তাকে সে ব্যাপারে অবগত করাবে। মহান আল্লাহ আমাকে কষ্টের কারণ হওয়া অথবা কষ্ট চাপিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেননি; বরং তিনি আমাকে শিক্ষকরূপে, সহজকারীরূপে প্রেরণ করেছেন।[১৯]

## তালাকের ক্ষেত্রে সোপর্দকরণের স্বরূপ ও তার বর্ণনা

হানাফী ফিকহবিদগণের মতে এবং শাফেয়ী ফিকহবিদগণের সর্বশেষ মতে সোপর্দকরণ হলো, তালাক প্রদানের অধিকারী বানানো। এই ভিত্তিতে হানাফীগণ বলেন, স্বামী তালাকের ক্ষমতা সোপর্দকরণ প্রত্যাহার করতে পারবে না। কারণ শুধু মালিক বানানোর দ্বারাই মালিকানা পরিপূর্ণ হয়, গ্রহণ করার ওপর তা নির্ভরশীল থাকবে না।

শাফেয়ীগণের পূর্বের উক্তিমতে স্ত্রীকে তালাকপ্রদানের পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর জন্য সোপর্দকরণ প্রত্যাহার করা বৈধ। কারণ মালিকানা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত সে মালিকানা প্রদান প্রত্যাহার করে নেয়া বৈধ। দ্বিতীয়ত তাদের মতে তৎক্ষণাৎ তালাক প্রদান করা শর্ত। এর কারণ হলো, তাদের মতে তালাকপ্রদান তালাকের মালিকানা বানানোর জবাব।

---

১৮. সূরা আহযাব, আয়াত : ২৮-২৯।

১৯. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৮৮, সম্পা. উবায়দ আদ-দাআস'; তিরমীযী, খ. ৩, পৃ. ৪৫০, সম্পা. মুসতাফা আল-হালাবী, যা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

www.amarboi.org

মালেকীগণ তালাকের ক্ষেত্রে সোপর্দকরণকে তিনভাগে ভাগ করেছেন : ১. উকীল বানানো সোপর্দকরণ; ২. স্বাধীনতা সোপর্দকরণ; ৩. স্বত্বাধিকার সোপর্দকরণ। আর স্বামীর মুখ থেকে প্রকাশিত শব্দ দ্বারা এগুলোর মধ্যে পার্থক্য সনাক্ত করা সম্ভব। সুতরাং যেসকল শব্দ অন্যের হাতে তালাক দেওয়ার অধিকার প্রদান করার সাথে সাথে স্বামীর জন্য তালাক সঙ্ঘটনে বাধা প্রদানের অধিকার ঠিক রাখা বুঝায় তা হলো উকীল বানানো সোপর্দকরণ। আর যে সকল শব্দ এমন বুঝায় যে, স্বামী তাকে নিজের স্ত্রী থাকা অথবা না থাকার অধিকার দিয়েছে তা হলো স্বাধীনতা সোপর্দকরণ। আর যে সকল শব্দ (স্ত্রীকে) স্বাধীনতা প্রদান ছাড়া স্ত্রীর বা অন্যের হাতে তালাকের দায়িত্ব দেয়া বুঝায় তা হলো স্বত্বাধিকার সোপর্দকরণ। স্বামী কেবল উকীল বানানো সোপর্দকরণের ক্ষেত্রে উক্ত সোপর্দকরণ প্রত্যাহার করতে পারে।

অন্য দুই প্রকার সোপর্দকরণের ক্ষেত্রে তা প্রত্যাহার করতে পারে না। কারণ উকীল বানানোর ক্ষেত্রে স্ত্রীকে তালাক সংঘটনের জন্য তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য দুই প্রকারের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে এমন জিনিসের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যা তার নিজের জন্যই ছিল। তাই উক্ত দুই প্রকার সোপর্দ করণ তুলনামুলক ভাবে শক্তিধর।

হাম্বলীগণ التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দকরণের শব্দাবলির ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছেন। তারা 'তোমার ব্যাপার তোমার হাতে', 'তুমি নিজেকে তালাক দাও'। বাক্যদ্বয়কে উকীল বানানো সাব্যস্ত করেছেন।

সুতরাং স্বামী যদি তা বাতিল না করে অথবা তার সাথে সঙ্গম না করে তাহলে স্ত্রীর জন্য বিলম্ব করার সুযোগ আছে। আর 'তুমি স্বাধীনতা গ্রহণ কর' বাক্যকে স্বত্বাধিকার সোপর্দকরণের আওতাভুক্ত করেছেন। সুতরাং উক্ত বাক্য দ্বারা স্ত্রী তৎক্ষণাত তালাক সংঘটন করার অধিকার পাবে। তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিলম্বের সুযোগ প্রদান করলে ভিন্ন কথা।[২০]

### তালাকের ক্ষেত্রে التَّفْوِيضُ তথা সোপর্দকরণের শব্দসমূহ

জমহুর ফকীহগণ তালাকের ক্ষেত্রে সোপর্দকরণের শব্দসমূহকে সারীহ (প্রকাশ্য) ও কিনায়া (ইঙ্গিতমূলক) দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তাদের মতে সারীহ তথা প্রকাশ্য হলো, যা তালাক শব্দ ব্যবহার করে হবে। যেমন (স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বলা) 'যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে নিজেকে তালাক দাও'। আর কিনায়া (ইঙ্গিতমূলক)

---

২০. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪৭৫, ৪৮৬; দাসূকীর টীকা, খ. ২, পৃ. ৪০৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ২৫৭।

www.amarboi.org

হলো, যাতে অন্য ধরনের শব্দ উল্লেখ করা হবে। যেমন (স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বলা) 'তুমি নিজেকে গ্রহণ কর', 'তোমার বিষয় তোমার নিজের হাতে'।

## স্ত্রীকে তালাক সোপর্দকরণের সময়

তালাক সোপর্দকরণের শব্দটি হয়তোবা শর্তমুক্ত থাকবে। অথবা নির্ধারিত সময়ের সাথে শর্তযুক্ত থাকবে। অথবা সকল সময়কে অন্তর্ভুক্ত করবে।

ক. তালাক সোপর্দকরণের শব্দটি যদি শর্তমুক্ত থাকে তাহলে জমহুর ফকীহদের অভিমত হলো, স্ত্রী যে মজলিসে তা অবগত হলো, সে মজলিসের সাথেই তালাক প্রদানের অধিকার শর্তযুক্ত থাকবে। যদিও সে মজলিস দীর্ঘ হয়। যতক্ষণ না প্রকৃতভাবে সে মজলিস পরিবর্তন করবে অর্থাৎ মজলিস থেকে উঠে চলে যাবে অথবা পরোক্ষভাবে মজলিস পরিবর্তন করবে অর্থাৎ এমন কোনো কাজ করবে যা উক্ত অধিকার ছিন্ন করে এবং যা উক্ত অধিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বুঝায়। আর ইমাম মালেক র. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী শাসকের কাছে উপস্থাপন না করবে। অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞাতসারে স্বামীকে উপভোগ করার সুযোগ না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত শর্তবিহীন স্বাধীনতাদান এবং মালিকানাধীনকরণ স্ত্রীর জন্য উক্ত অধিকার বলবৎ থাকবে। অতঃপর ইমাম মালেক রহ. স্বীয় মত প্রত্যাহার করে জমহুর ফিকহবিদদের মত গ্রহণ করেন। আর অনুরূপ মতই হলো ইমাম ইবনুল কাসেমের। ইমাম দারদীর ও দাসূকী রহ. উক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

শাফেয়ী ইমামগণ বলেন : প্রস্তাব দান ও প্রস্তাব গ্রহণের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত যদি স্ত্রী বিলম্ব করে তালাক গ্রহণ করে তাহলে তালাক সঙ্ঘটিত হবে না।

আর হাম্বলীগণ সোপর্দকরণের প্রতিটি শব্দের জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান সাব্যস্ত করেছেন। তাই স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে 'তোমার ব্যাপার তোমার হাতে'। তাহলে এটি মজলিসের সাথে শর্তযুক্ত হবে না; বরং স্ত্রী বিলম্বেও নিজেকে তালাক দিতে পারবে। কারণ এটি হলো বিস্তৃত ও অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য উকীল বানানো, যদি তা কোনো প্রকার শর্তযুক্ত না করা হয়। অনুরূপ বিধান হবে যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, 'তুমি নিজকে তালাক প্রদান কর' তাহলেও তা বিলম্বে কার্যকরযোগ্য। কারণ, স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করেছে সুতরাং তা 'তোমার ব্যাপারটি তোমার নিজের হাতে' বাক্যটির ন্যায় হয়ে গেছে।

আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, 'তুমি নিজেকে গ্রহণ কর'। তবে তা মজলিসের সাথে শর্তযুক্ত হবে এবং এমন কাজে লিপ্ত না হওয়ার শর্তযুক্ত থাকবে, যা দেশজ প্রচলনে উক্ত মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বুঝায়।

www.amarboi.org

হযরত উমর, উসমান, ইবনে মাসউদ ও জাবের রা. থেকে এমনটিই বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়ত এটি হলো মালিক বানানোর স্বাধীনতা। সুতরাং তা কবুল করার স্বাধীনতার ন্যায় তাৎক্ষণিক কার্যকর হবে। তবে যদি এর ওপর বাড়িয়ে এরূপ বলে যে, 'একদিন বা এক সপ্তাহ্ বা একমাস পর্যন্ত তুমি নিজেকে গ্রহণ কর'। তাহলে স্ত্রী এটির মালিক হবে।

**খ.** যদি সোপর্দকরণের শব্দটি সকল সময়কে শামিল করে তাহলে স্ত্রী যে কোনো সময় নিজেকে তালাক দিতে পারবে। আর তা মজলিসের সাথে শর্তযুক্ত থাকবে না। মালেকীগণ শর্তযুক্ত করেছেন যে, স্ত্রী নিজেকে তালাক প্রদান করা অথবা মালিকানার সুযোগ রহিত করার জন্য বিচারকের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করবে না। অথবা স্ত্রীর দ্বারা এমন কিছু প্রকাশ পাবে না, যা মালিকানা রহিত করে দেয়। যেমন স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে উপভোগ করার সুযোগ দেওয়া।

**গ.** সোপর্দকরণের শব্দটি যদি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত থাকে তাহলে উক্ত সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর তালাকের অধিকার বলবৎ থাকবে। সময়ের সাথে শর্তযুক্ত সোপর্দকরণ মজলিস শেষ হওয়ার দ্বারা অথবা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার দ্বারা বাতিল হয় না।

মালেকীগণের মতে স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিচারকের সামনে উত্থাপন না করবে অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে তা রহিতকরণের মত কোনো কিছু প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য তালাকের অধিকার বলবৎ থাকবে।[২১]

### اَلتَّفْوِيضُ। তথা সোপর্দকরণের শব্দাবলি দ্বারা পতিত তালাকের সংখ্যা ও তার ধরন

হানাফীগণ সারীহ (স্পষ্ট) তালাকের শব্দ এবং কিনায়া (ইঙ্গিতমূলক) তালাকের শব্দের সোপর্দকরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তাই তারা বলেন, স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক সোপর্দকৃত স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে তালাক প্রদান করে, তাহলে তা দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য এক তালাক সংঘটিত হবে। তবে ব্যতিক্রম হবে যদি স্বামী তাকে একাধিক তালাকের অধিকার দেয়। যথা বলে, 'যত ইচ্ছা তুমি নিজেকে তালাক প্রদান করতে পার'।

আর যদি ইঙ্গিতমূলক শব্দের মাধ্যমে সোপর্দ করে যেমন : স্বামী বলে, 'তোমার বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত' অথবা 'তুমি নিজেকে গ্রহণ কর'। অতঃপর স্ত্রী বিচ্ছেদ গ্রহণ করে তাহলে ক্ষুদ্র একটি বায়েন তালাক সংঘটিত হবে। তবে যদি বড় তালাকের নিয়ত করে তাহলে শব্দ বা নিয়ত দ্বারা বড় তালাক সংঘটিত

---

২১. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৪৭৫-৪৮১; দাসূকীর টীকা, খ. ২, পৃ. ৪০৬-৪১২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৪২৯; রওদাতুত্ তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২৫৪ ও পরবর্তী।

www.amarboi.org

হবে। তাদের মতে ইঙ্গিতমূলক বায়েন তালাকের অর্থজ্ঞাপক শব্দকে যদি স্পষ্ট শব্দের সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে তা প্রত্যাহারযোগ্য রাজয়ী তালাক হয়ে যায়। ইঙ্গিতমূলক শব্দ দ্বারা সোপর্দ করা হলে তার দ্বারা বায়েন (প্রত্যাহার অযোগ্য) তালাক হয়, যা স্পষ্ট শব্দ দ্বারা হয় না। এর কারণ হলো, এ শব্দগুলো ইঙ্গিতমূলক শব্দের জবাব। আর মৌলিকভাবে ইঙ্গিতমূলক শব্দ বায়েন তালাক সংঘটনকারী। দ্বিতীয়ত : স্বামীর উক্তি 'তোমার বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত' স্ত্রীর হাতে কর্তৃত্ব দান করেছে। অতএব স্ত্রী স্বাধীনতা পাবে। সে আপন সত্তার মালিক হবে। আর কেবল বায়েন (প্রত্যাহার অযোগ্য) তালাকের মাধ্যমেই স্ত্রী স্বীয় সত্তার মালিকানা লাভ করতে পারে। রাজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকের অধিকার দ্বারা স্ত্রী স্বীয় সত্তার মালিকানা লাভ করতে পারে না।

মালেকীগণ اَلتَّفْوِيضُ তথা সোপর্দকরণকে তিনভাগে বিভক্ত করার ভিত্তিতে নিজেদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং উকীল বানানো সোপর্দ করার ক্ষেত্রে তালাকের এক বা একাধিক যত সংখ্যার উকীল বানিয়েছে তত তালাক প্রদান করতে পারে। তদ্রূপ বিধান হলো, মালিক বানানো সোপর্দকরণমূলক ক্ষেত্রে। সে অধিকারপ্রাপ্ত এক বা একাধিক তালাক প্রদান করতে পারবে এবং শর্তহীন রাখার ক্ষেত্রে স্বামী একাধিক তালাকের বিরোধিতা করতে পারবে।

আর স্বাধীনতাদানমূলক সোপর্দকরণের ক্ষেত্রে স্ত্রী বিচ্ছেদ তথা তালাকের স্বাধীনতা গ্রহণ করলে তিন তালাক সংঘটিত হবে। সুতরাং স্ত্রী যদি এক বা একাধিক তালাক সংঘটনের স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে চায় তাহলে এমনটি করার সুযোগ নেই। তবে স্বামী যদি তাকে এক বা একাধিক তালাক গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে তাহলে স্ত্রী তা সংঘটন করতে পারবে।

শাফেয়ীগণের মতে স্ত্রীর নিকট তালাক সোপর্দ করা হলে তদ্বারা সে এক তালাকে রাজয়ী গ্রহণ করতে পারবে। তবে যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তাই পতিত হবে।

হাম্বলীগণের মতে উকীল বানানো ও মালিক বানানোর ক্ষেত্রে স্ত্রী তিন তালাক দিতে পারে। আর স্বাধীনতমূলক সোপর্দকরণের ক্ষেত্রে সে এক তালাকের বেশী দিতে পারবে না। তবে যদি স্বামী শব্দের দ্বারা অথবা নিয়তের দ্বারা স্ত্রীকে সে অধিকার দেয়, তবে একাধিক তালাক পতিত হবে এবং এর দ্বারা রাজয়ী তালাক পতিত হবে।[২২]

–মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

---

২২. ইবনে আবেদীনের টীকা, খ. ২, পৃ. ৪৭৮ ও পরবর্তী; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১১৩, পরবর্তী; আল কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা পৃ. ২৩৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৮৭; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ২৫৪ ও পরবর্তী।

www.amarboi.org

# তালাক প্রত্যাহার (রাজআহ رَجْعَةٌ)

**সংজ্ঞা :** اَلرَّجْعَةُ শব্দটি رَجَعَ শব্দের মাসদার বা ক্রিয়ামূল। বলা হয় : رَجَعَ عَنْ سَفَرِهٖ ، وَعَنِ الْأَمْرِ অর্থাৎ, সে ভ্রমণ বা কাজ থেকে ফিরে এসেছে। এর রূপান্তর يَرْجِعُ رَجْعًا رَجَعَ وَرُجُوعًا وَرُجْعَى وَمَرْجِعًا ইবনুস সিককীত বলেন, এটি اَلذِّهَابُ অর্থাৎ, চলে যাওয়া বা প্রস্থানের বিপরীত। শব্দটি শুদ্ধ আরবী ভাষায় (متعدى) সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় : رَجَعْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ وَإِلَيْهِ অর্থাৎ আমি অমুক জিনিস থেকে ফিরে এসেছি এবং তার দিকে ফিরে এসেছি رَجَعْتُ الْكَلَامَ আমি কথা প্রত্যাহার করে নিয়েছি। মহান আল্লাহ বলেন :

فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ

"আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের কোনো দলের নিকট ফেরত আনেন।"[১]

رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أَهْلِهَا بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ بِطَلَاقٍ : মহিলাটি তার স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের কারণে নিজ গৃহে ফেরত এসেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি হবেন رَاجِعَةٌ বা প্রত্যাবর্তনকারী। اَلرَّجْعَةُ শব্দটি যবরযোগে অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। তালাকের পর ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে শব্দটি যবর ও যের উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়।[২]

اَلرَّجْعِيُّ (আর রাজয়ী) শব্দটি রাজআহ শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। তালাকে রাজয়ী বলা হয়, যে তালাক প্রদান করলে স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে আকদ নবায়ন ছাড়াই গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ হয়।

পরিভাষার দিক দিয়ে ফকীহগণ রাজআহ-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

আল-আইনী বলেন, বিবাহের মালিকানা অব্যাহত রাখা। হানাফী মাযহাবভুক্ত আল-বাদায়ে গ্রন্থকার এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন যে, "প্রতিষ্ঠিত বিবাহের মালিকানা অব্যাহত রাখা এবং বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করা"।[৩]

---

১. সূরা আত্ তাওবাহ : ৮৩।

২. আল-মুজামুল ওয়াসীত; আল-মিসবাহুল মুনীর শব্দমূল বা মাদ্দাহ : رجع

৩. আল-বিনায়া আলাল হিদায়া : খ. ৪, পৃ. ৫৯১, দারুল ফিকর সংস্করণ; বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৮১, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত সংস্করণ।



www.amarboi.org

www.amarboi.org

মালিকী মাযহাব এর অনুসারী আদ-দারদীর এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, নতুন বিবাহ থেকে রক্ষাকল্পে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফেরত নেয়া।"[৪]
শাফেয়ী মাযহাবের আলেম আশ-শারবীনী আল-খতীব এর সংজ্ঞায় বলেন, তালাকে বায়েন নয় এমন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে বিবাহে ফিরিয়ে নেওয়া।[৫]
হাম্বলী মাযহাবের বাহূতী এর সংজ্ঞায় বলেন, বায়েন নয় এমন তালাকপ্রাপ্তাকে আকদ ছাড়াই পূর্বাবস্থায় ফেরত আনা।[৬]

**রাজআহ্ শরীআতসম্মত হওয়ার প্রমাণ ও তার তাৎপর্য :**
স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া সংশোধনের একটি পথ, এ কারণে ইসলামী শরীয়ত এর বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছে। আল্লামা কাসানী রাজআহর হিকমত (তাৎপর্য) বর্ণনা করে বলেন, রাজআহর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা মানুষ তার স্ত্রীকে কখনো তালাক প্রদান করে। আবার এর ওপর অনুতপ্ত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন–

لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এরপর কোনো উপায় করে দিবেন।"[৭] তখন আবার সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যদি রাজআহ্ বা তালাক প্রত্যাহারের বিধান না থাকতো তবে ত্রুটি শুধরানো সম্ভব হতো না। কেননা, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, স্ত্রী বিবাহ্ নবায়ন করতে সম্মত হবে না এবং স্বামী ধৈর্যধারণও করতে পারবে না। ফলে সে যিনায় পতিত হবে।[৮] এ কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংশোধনের জন্য শরীয়তে রাজআহ্ এর বিধান রাখা হয়েছে। আর এটাই এর মহান তাৎপর্য, সুন্নাহ্ ও ইজমার ভিত্তিতে রাজআহ্ বিধিসম্মত হওয়া সাব্যস্ত হয়। এ বিষয়ের বর্ণনা নিম্নরূপ–
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا

"যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি চায় তবে স্ত্রীদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার"।[৯]

---

৪. আশ-শারহুল কাবীর, পৃ. ৩৬৯, আল-মাকতাবাতুত তুজজারিয়্যা, আল-কুবরা, কায়রো; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ৭৯, দারু সাদের বৈরুত, সংস্করণ।
৫. মুগনী আল-মুহতাজ : খ. ৩, পৃ. ৩৩৫, ঈসা আল-হালাবী সম্পা.।
৬. কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ৩৪১, দারুল বায, মক্কা, আর রওদাতুল মুরাববা শারহু যাদুল মুসতাকনা, খ. ৬, পৃ. ৬০১, বিসাত, বৈরূত।
৭. সূরা আত্-তাওবাহ : ১।
৮. বাদায়ে আস্ সানায়ে : খ. ৩, পৃ. ১৮১।
৯. সূরা আল-বাকারা : ২২৮।

www.amarboi.org

তিনি আরো বলেন–

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا

"যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় তাদেরকে রেখে দিবে অথবা মুক্ত করে দিবে। আর তোমরা তাদেরকে ক্ষতি করে সীমা লঙ্ঘণে আটকে রেখো না।"[১০]

সুন্নাহর প্রমাণ : উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. হাফসা র.-কে তালাক প্রদান করেন, অতঃপর তাকে আবার ফেরত নেন।[১১]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. হাফসা র.-কে এক তালাক প্রদান করেন। অতঃপর জিবরাইল আ. আগমন করে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি হাফসাকে তালাক দিয়েছেন। অথচ তিনি অধিক রোযাদার ও অধিক সালাত আদায়কারিণী, আর তিনি জান্নাতে আপনার স্ত্রী। তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে নিলেন।[১২]

উরওয়া র. আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মানুষের অবস্থা এমন ছিল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যত খুশি তালাক দিত, তবুও সে তার স্ত্রী হিসেবে থাকত যদি তাকে তার ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিত। যদিও তাকে একশতবার অথবা শতাধিকবারও তালাক দিয়ে থাকে। এমনকি এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে এমন তালাক দিব না, যার ফলে তুমি আমার থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং আমি তোমাকে কোনো আশ্রয় দিব না। স্ত্রী বলল, এটা কী করে হবে! লোকটি বলল, আমি তোমাকে তালাক দিব আর যখনই তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে আসবে তখন আমি তোমাকে ফেরত নিব। অতঃপর স্ত্রী লোকটি আয়েশা রা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে ঘটনা জানালেন। আয়েশা রা. চুপ থাকলেন, অতঃপর যখন মহানবী স. আগমন করলেন, তখন তিনি তাঁকে ঘটনাটি অবহিত করলেন। নবী কারীম স. চুপ থাকলেন। অতঃপর কুরআন নাযিল হলো–

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"এই তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমতো রেখে দিবে অথবা সয়দভাবে মুক্ত করে দিবে।"[১৩]

---

১০. সূরা বাকারা : ২৩১।

১১. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭১২, হাকেম, খ. ২, পৃ. ১৯৭। হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর আয-যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

১২. হাকেম : খ. ৪, পৃ. ১৫; আয-যাহাবী তার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে খ. ১, পৃ. ৪৮২, উক্ত হাদীসের একজন রাবীকে যঈফ বলেছেন।

১৩. সূরা আল-বাকারাহ : ২২৯।

www.amarboi.org

আয়েশা রা. বলেন অতঃপর মানুষ তালাকের এ বিধান নতুনভাবে শুরু করল। যে ব্যক্তি তালাক প্রদান করেছিল এবং যে তালাক প্রদান করেনি।[১৪]
বিধিমতো রেখে দেয়া অর্থাৎ সংশোধন করার এবং ক্ষতি না করার ইচ্ছায় ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করা।[১৫]

ফকীহগণ শর্ত পূরণ হওয়া সাপেক্ষে তালাক প্রত্যাহার করা বৈধ হওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ এ বিষয়ে মতভেদ করেননি। আর রাওজা আল-মুরাব্বা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, "ইবনে মুনযির বলেন, আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, স্বাধীন ব্যক্তি যদি তিন তালাকের কম সংখ্যক এবং দাস যদি দুই তালাকের কম সংখ্যক তালাক প্রদান করে তাহলে ইদ্দতের মধ্যে তা প্রত্যাহার করার অধিকার তাদের রয়েছে।[১৬]

## আরোপিত বিধান

আর-রাজআ তথা তালাক প্রত্যাহার করে নেয়ার মৌলিক বিধান হলো এটি মুবাহ এবং তা স্বামীর অধিকারও বটে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

"তারা যদি নিষ্পত্তি চায় তবে এক্ষেত্রে তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার।"[১৭]

রাজআহ কখনো ওয়াজিব হয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে তার হায়েয (মাসিক রক্তস্রাব) অবস্থায় তালাক প্রদান করে তবে হানাফী ও মালেকীগণের মতে উক্ত তালাক প্রত্যাহার করা ওয়াজিব। এ তালাককে তালাকে বিদঈ (بدعى) বলা হয়, যা শুদ্ধ করা আবশ্যক। আর তালাক প্রত্যাহার করা ছাড়া তা শুদ্ধ হয় না।

এর প্রমাণ ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদীস। তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. মহানবী স.-এর নিকট এর বিধান জানতে চাইলে তিনি বললেন, তাকে বল, সে যেন তা প্রত্যাহার করে নেয় এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে তার কাছে রাখে। এপর আবার যখন হায়েয হয়ে পুনরায় পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা করলে তাকে রেখে দিবে অথবা ইচ্ছা করলে স্পর্শ করার পূর্বেই তাকে তালাক প্রদান করবে। এটিই ইদ্দত যা পালনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহিলাদেরকে তালাক দেওয়ার জন্য

---

১৪. তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৪৮৮, আল-হালাবী সম্পা.; ইমাম তিরমিযী হাদীসটি কখনো হিশাম-উরওয়া সূত্রে আইশা রা.-এর উল্লেখ ছাড়াই মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এটিই অধিক শুদ্ধ।

১৫. ইবনে আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ১৯১-১৯৯।

১৬. আর রওদাতুল মুরাব্বা' খ. ৬, পৃ. ৬০১।

১৭. সূরা আল-বারাকা : ২২৮।

www.amarboi.org

আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।[১৮] এ অবস্থায় তালাক প্রদান করা শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে সুন্নাত।[১৯]

রাজআহ কখনো মানদুব (মুসতাহাব) হয়। আর তা হলো তালাক পতিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী যখন অনুতপ্ত হয়। বিশেষ করে যদি তাদের সন্তান থেকে থাকে সে অবস্থায় কল্যাণকর পন্থা হলো; তারা পিতা-মাতার কোলে লালিত-পালিত এবং পিতা-মাতা সন্তানদের যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা ও পরিচর্যা করবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রাজআহ মানদুব তথা মুসতাহাব হবে সেই কল্যাণ লাভের জন্য যা মহাজ্ঞানী শরীয়তপ্রণেতা নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপস মীমাংসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
"তারা আপস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো গুনাহ নেই, আর আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়।"[২০]
তিনি আরও বলেন– وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
"তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হয়ো না।"[২১]
রাজআহ কখনো হারাম হয়ে যায় যদি স্বামী এর দ্বারা স্ত্রীর ক্ষতি চান, স্ত্রীকে ফেরত নিয়ে তাকে বিভিন্ন রকমের কষ্ট দেয়ার এবং ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেন। কুরআনে কারীমে এ সব করতে নিষেধ করা হয়েছে–

وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"তোমরা তাদেরকে ক্ষতিসাধন ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। যে ব্যক্তি এমন করবে সে মূলত নিজের ওপরই জুলম করল।"[২২]
এ আয়াতে মহান আল্লাহ স্ত্রীদের ক্ষতি করার এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রাখতে স্বামীদের নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা হারামের অর্থ প্রদান করে। অতএব এ অবস্থায় রাজআহ তথা তালাক প্রত্যাহার করা হারাম।

এতদসত্ত্বেও এ অবস্থায় হানাফীগণের দৃষ্টিতে রাজআহ সহীহ হবে।[২৩] মালেকীগণের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে কুরতুবী বলেন, যে এমনটি করবে তার

---

১৮. বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৪৯, সালাফিয়্যাহ সম্পা.) মুসলিম : আল হালাবী সম্পা. খ. ২, পৃ. ১০৯৩।
১৯. আল ইখতিয়ার খ. ৩, পৃ. ১২২; আল-খারশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৭; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৯; কাশশাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ২৪।
২০. সূরা আন-নিসা : ১২৮।
২১. সূরা আল-বাকারা : ২৩৭।
২২. সূরা আল-বাকারা : ২৩১, আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবী।
২৩. জাসসাস, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩৮৯।

www.amarboi.org

রাজআহ সহীহ হবে। তবে আমরা যদি ঐ উদ্দেশ্য অবগত হতে পারি তবে তার ওপর তালাকের বিধান কার্যকর করি।[২৪]

ইবনে তাইমিয়া বলেন, যে ব্যক্তি সংশোধন ও সৎভাবে রেখে দেয়ার ইচ্ছা করবে তার ওপর ছাড়া রাজআহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।[২৫]

রাজআহ মাকরূহ হয় যদি স্বামী এ আশঙ্কা করে.যে, সে স্ত্রীকে ফেরত নিলে তার ওপর আল্লাহ নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি সদাচার বাস্তবায়ন করতে পারবে না। অতএব এ ক্ষেত্রে তার ওপর রাজআহ মাকরূহ হবে।

**রাজআহ'র শর্তাবলি**

রাজআহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে যা নিম্নরূপ :

**প্রথম শর্ত :** রাজআহ তালাক রাজয়ীর পরে হতে হবে। তাই উক্ত তালাক স্বামীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত কিংবা বিচারকের পক্ষ থেকে। কেননা, এটি বৈবাহিক জীবনের নব সূচনা, যা তালাকের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই যদি তালাক পতিত না হতো তাহলে রাজআর কোনো উপকারিতা থাকত না। অতঃপর স্বামী যখন স্ত্রীকে তৃতীয় তালাকটি দিয়ে ফেলবে তখন তার আর রাজআর অধিকার থাকবে না। কেননা তিন তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামী থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। ফলে রাজআর অধিকার থাকবে না। কেননা তিন তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামী থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। ফলে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ না করা পর্যন্ত তাকে পুনরায় গ্রহণ করা স্বামীর জন্য হালাল হয় না। আল্লাহ বলেন–

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“যদি তাকে তালাক প্রদান করে তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে”।[২৬]

**ফকীহগণ সকলেই এ শর্তের ওপর একমত। তাঁদের কেউই এ বিষয়ে মতভেদ করেননি।**[২৭]

**দ্বিতীয় শর্ত :** তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস হলেই কেবল রাজআহর অধিকার অর্জিত হবে। যদি সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেয় এবং তাকে ফেরত আনতে চায়, তবে সে ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার নেই। এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত পোষণ করেন। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا-

---

২৪. তাফসীর কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১২৩, ইবনে আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২০০।

২৫. আল-ফুরূ, খ. ৫, পৃ. ৪৬৪।

২৬. সূরা বাকারা : ২৩০।

২৭. আল-বিনায়া, খ. ৪,পৃ. ৫৯১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৩৪১; আল-উম্ম, খ. ৬, পৃ. ২৪৩, দারদীর, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৬৯।

www.amarboi.org

"হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন নারীগণকে বিবাহ করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিলে তোমাদের জন্য পালনীয় তাদের কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতএব তোমরা তাদেরকে কিছু সম্পদ দিয়ে সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে"।[২৮] তবে হাম্বলীগণ[২৯] স্বামী-স্ত্রীর শুদ্ধ নির্জনবাসকে সহবাসের পর্যায়ে সাব্যস্ত করে রাজআহর ক্ষেত্রে একই বিধানভুক্ত বলে গণ্য করেন। কেননা নির্জনবাস সহবাসের মত একই বিধান সাব্যস্ত করে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুযায়ী রাজআহ সহীহ হওয়ার জন্য অবশ্যই সহবাস হতে হবে। নির্জনবাস যথেষ্ট নয়।[৩০]

**তৃতীয় শর্ত :** তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকতে হবে। যদি তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তবে ফকীহগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজআহ সহীহ হবে না। দলীল মহান আল্লাহর বাণী– وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
"তালাকপ্রাপ্তাগণ তিন কুরূ (রজঃস্রাব কাল) পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে। অতঃপর আল্লাহ বলেন– وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
"তাদের স্বামীগণ এর মধ্যে তাদেরকে পুনঃগ্রহণের ব্যাপারে অধিক হকদার।[৩১] অর্থাৎ, তিন কুরূর মধ্যে।

কেননা ইদ্দতের সময়কালে তালাকপ্রাপ্তাকে ফেরত নেয়ার অর্থ বিবাহের আকদ অব্যাহত ও চলমান রাখা। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তবে এই অব্যাহত রাখার সুযোগও শেষ হয়ে যায়। সুতরাং ইদ্দত সমাপ্তির পর রাজআহ শুদ্ধ হবে না। আল-কাসানী বলেন, রাজআহ বৈধ হওয়ার শর্তসমূহের অন্যতম হলো, ইদ্দত অবশিষ্ট থাকা। অতএব ইদ্দত সামাপ্তির পর আর রাজআহ শুদ্ধ হবে না। কেননা রাজআহ মূলত মালিকানা অব্যাহত রাখা। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মালিকানারও সমাপ্তি ঘটে। ফলে তা অব্যাহত রাখা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না। কারণ প্রতিষ্ঠিত বিষয় ধ্বংস হওয়া থেকে সংরক্ষণ করার জন্যই তা অব্যাহত রাখতে চাওয়া হয়।[৩২] আর ইদ্দত কিসের দ্বারা শেষ হয়ে যায় সে সম্পর্কে দ্র. পরিভাষা 'ইদ্দত' (عدة)।

**চতুর্থ শর্ত :** বিবাহের আকদ বাতিলের দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়েছে, সে বিচ্ছেদ রাজআহর পূর্বে হতে হবে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য পরিভাষা ফাসখ (فسخ)।

---

২৮. সূরা আল-আহযাব : ৪৯।
২৯. কাশশাফুল কিনা, খ. ৫,পৃ. ৩৪১।
৩০. পূর্বোক্ত বরাত ও মুগনী আল-মুহতাজ : খ. ৪, পৃ. ৩৩৭।
৩১. সূরা আল বাকারা : ২২৮।
৩২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৮৩।

www.amarboi.org

**পঞ্চম শর্ত :** তালাকটি কোনো বিনিময়ের মাধ্যমে প্রদত্ত হবে না। কোনো কিছুর বিনিময় সহকারে যদি তালাক প্রদান করা হয় তবে রাজআহ হবে না। কেননা তখন মহিলা স্বামীকে সম্পদ প্রদান করে তার বিনিময়ে নিজেকে স্বামী থেকে মুক্ত করেছে বিধায় তা তালাক বাইন হয়ে যায়। তাই এ সম্পর্ক খুলা ও অর্থের বিনিময়ে তালাক এর পর্যায়ে চলে যায়।

**ষষ্ঠ শর্ত :** রাজআহ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হতে হবে। সুতরাং তা কোনো শর্ত বা ভবিষ্যৎ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা সহীহ হবে না। শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার দৃষ্টান্ত হলো, স্বামী বলল যদি যায়েদ আসে তবে আমি তোমাকে ফেরত নিব। অথবা তুমি যদি এ কাজ কর তবে তোমাকে ফেরত নিব। আর ভবিষ্যতকালের সাথে সম্পৃক্ত করার উদাহরণ হলো, স্বামী বলবে, তোমাকে আগামীকাল অথবা একমাস পরে ফেরত নেব। অথবা অনুরূপ কোনো বাক্য ব্যবহার করা। এ বিধান জমহুর ফকীহদের (হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) এবং মালিকীগণের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য শর্ত। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : পরিভাষা 'তালাক' (طلاق)। তাঁরা এ প্রমাণ পেশ করেন যে, রাজআহ হলো বিবাহের আকদ অব্যাহত রাখা অথবা তা ফেরত আনা। আর বিবাহ কোনো কিছুর সাথে সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত করা গ্রাহ্য করে না। আর রাজআহ বিবাহের হুকুম গ্রহণ করে।[৩৩]

**সপ্তম শর্ত :** তালাক প্রত্যাহারকারী বিবাহের আকদ সম্পাদনের যোগ্য হতে হবে। এ শর্তটি মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের গ্রন্থবালিতে উল্লেখিত হয়েছে। মালেকীগণের মতে যে ব্যক্তি বিবাহের আকদ করার অধিকারযোগ্য, রাজআর শর্তাবলি পূরণ হওয়া সাপেক্ষে কেবল তার জন্যই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে। এরই ভিত্তিতে পাগল ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহের আকদ সম্পন্ন করার যোগ্যতা না থাকায় তাদের রাজআহও শুদ্ধ হবে না। অবশ্য মালেকীগণ যাদের আকদ করার যোগ্যতার ঘটতি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে রাজআহ বৈধ হওয়ার বিধান দিয়েছেন। তারা হলো, বিচার বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন বালক, বোকা, মরণব্যধিতে আক্রান্ত রোগী, নিঃস্ব ব্যক্তি। তারা এ শ্রেণীর ক্ষেত্রে রাজআহর বৈধতা দিয়েছেন এই মৌলিক নীতির আলোকে যে, যাতে তাদের ক্ষতিসাধিত না হয় এবং তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে। তাই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বালকের ক্ষেত্রে, তার বিবাহের আক্‌দ সহীহ, তবে তার অভিভাবকের অনুমতির ওপর তা নির্ভরশীল। তাই যেহেতু এ অবস্থায় তার আক্‌দ সহীহ সেহেতু তার রাজআহও সহীহ হবে। আর নির্বোধ বা বোকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তার বিবাহের আক্‌দ সহীহ মোহরে মিছালের ফয়সালা মতে। অতএব এ দিক

---

৩৩. আল বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৮৫; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ৮০; আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৪৮৫; আল উম্ম, খ. ৬, পৃ. ২৪৫।

www.amarboi.org

থেকে তার বিবাহের আকদ চলমান রাখার জন্য তার রাজআহ্ও সহীহ্ হবে এবং অনুরূপভাবে তার থেকে সীমালঙ্ঘন না পাওয়ার কারণে। আর মরণ ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীর রাজআহ্ও শুদ্ধ। কেননা এ ক্ষেত্রে রাজআহ্র মাধ্যমে উত্তরাধিকারী নয় এমন কাউকে উত্তোরাধিকারে সম্পৃক্ত করানো হয় না। আর নিঃস্ব ব্যক্তির রাজআহ্ও সহীহ্ হবে। কেননা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা রাজআহ্র কারণে নতুনভাবে মোহরের দাবি করে না। ফলে তা আর্থিক বাধ্যবাধকতার জিম্মাদারিতে লিপ্ত করে না এবং এর জন্য ঋণদাতাদের অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না।

একইভাবে তারা হজ বা উমরাহ্র ইহ্রামকারীর রাজআহ্ বৈধ বলেছেন যদিও তাদের ক্ষেত্রে বিবাহের আকদ অবৈধ। কেননা রাজআহ্ হলো বিবাহের আকদ চলমান রাখা নতুন করে তা সৃষ্টি করা নয়।[৩৪]

শাফিয়ীগণের মতে, তালাক প্রত্যাহারকারীর জন্য নিজের বিবাহের যোগ্যতা বর্তমান থাকা শর্ত। যেমন–সে হবে প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী এবং নিজ ধর্মের অনুসারী। কেননা রাজআহ্ বিবাহ্ সম্পন্ন করার মতই। অতএব ধর্মত্যাগী, বালক, পাগল, জবরদস্তিকৃতদের ক্ষেত্রে রাজআহ্ শুদ্ধ হবে না। যেমন তাদের বিবাহ্ শুদ্ধ হয় না।
অতএব প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান ও সিদ্ধান্তগ্রহণে স্বাধীন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে রাজআহ্ শুদ্ধ হবে না।[৩৫]

শাফেয়ীগণ এ ক্ষেত্রে নির্বোধকে আলাদা করে থাকেন। অতএব যেভাবে তার বিবাহ্ শুদ্ধ, তেমনি তার রাজআহ্ও শুদ্ধ। মাতাল ব্যক্তির রাজআহ্ও শাফিয়ীগণের দৃষ্টিতে শুদ্ধ, কেননা মৌলিকভাবে সে বিবাহের আকদ সম্পন্ন করার যোগ্য। তবে মালেকীগণের দৃষ্টিতে তার রাজআহ্ শুদ্ধ নয়। যেমনিভাবে শাফেয়ীগণের দৃষ্টিতে যে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার নেশা অতিক্রম করতে পারেনি মাতালগ্রস্ততার কারণে, তার রাজআহ্ সহীহ্ হবে না। কেননা তার সব কথাই নিরর্থক।

মালেকী ও শাফেয়ীগণ ইহ্রামকারীর রাজআহ্ শুদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা ইহ্রাম বিবাহের আক্দ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ইহ্রামকারীর যোগ্যতার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না বরং এটি একটি ভিন্ন বিষয়। আর রাজআহ্র ক্ষেত্রে স্ত্রীর সন্তুষ্টির কোনো শর্ত নেই। মহান আল্লাহর বাণী– وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
"তাদের স্বামীগণ তাদের পুনঃগ্রহণের অধিক হকদার।"[৩৬] এ আয়াতটি এ অর্থেরই নির্দেশনা দেয়।

---

৩৪. আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ৭৯-৮০; দারদীর আশ-শারহুল কাবীর ও হাশীআহ আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৬৯-৩৭০।
৩৫. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ৫৩।
৩৬. সূরা আল-বাকারা–২২৮।

www.amarboi.org

**রাজআহর পদ্ধতি :**

**রাজআহর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে : কথার মাধ্যমে রাজআহ, আর কাজের মাধ্যম রাজআহ।**

**প্রথমত, কথার মাধ্যমে রাজআহ**

ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাজআহর প্রতি নির্দেশক কথা দ্বারা রাজআহ সহীহ হবে। যেমন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকা অবস্থায় স্বামী বলল, আমি তোমাকে ফেরত নিলাম বা আমি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করলাম অথবা আমার পবিত্রতার জন্য তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম। এমনিভাবে এ জাতীয় প্রতিটি শব্দ যা এ অর্থ প্রদান করে তার দ্বারা রাজআহ সহীহ হবে। হানাফী মাজহাবের অনুসারী আইনী বলেন, রাজআহ হলো, যে স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক প্রদান করেছে তাকে সম্বোধন করে বলবে, আমি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করলাম অথবা তার অনুপস্থিতিতে বলবে, আমি আমার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করলাম। এগুলো রাজআহর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শব্দ। একইভাবে যদি বলে, আমি তোমাকে ফেরত নিলাম অথবা আমি তোমাকে রেখে দিলাম।

ফকীহগণ যেসব শব্দে রাজআহ শুদ্ধ হয় তাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন–

**প্রথম প্রকার :** সুস্পষ্ট শব্দ। যেমন আমি তোমাকে আমার বিবাহে ফেরত নিলাম বা পুনরায় গ্রহণ করলাম। এ ধরনের শব্দ দ্বারা রাজআহ শুদ্ধ হয়ে যায় এবং এর জন্য কোনো নিয়তের প্রয়োজন হয় না।

**দ্বিতীয় প্রকার :** কিনায়াহ বা ইঙ্গিতবহ শব্দ। এগুলো এমন শব্দ যা রাজআহর অর্থও বহন করে আবার অন্য অর্থের সম্ভাব্যতাও থাকে। যেমন স্বামী বলল, তুমি এখন আমার কাছে আগের মতই। অথবা তুমি আমার স্ত্রী এবং এ দ্বারা রাজআহর নিয়ত করলো।

কিনায়াহ বা ইঙ্গিতসূচক শব্দসমূহে রাজআহ এবং অন্য অর্থের সম্ভাবনাও রয়েছে। যেমন– তুমি আমার কাছে আগের মতই। এ দ্বারা এ অর্থ বহন করে যে, তুমি যেমন স্ত্রী ছিলে। আবার এ অর্থও বহন করে যে, তুমি যেমন অপছন্দনীয় ছিলে। এ কারণে ফকীহগণ বলেন, এ ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ সম্পর্কে তার কাছে প্রশ্ন করতে হবে। অতঃপর তারা কতিপয় শব্দের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। যেমন– رَدَدْتُكِ (ফেরত নেয়া/ দেয়া) ও أَمْسَكْتُكِ (রাখা/বিরত রাখা), এগুলো সুস্পষ্ট (صريح) না কি ইঙ্গিতবহ (الكناية) মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের একদলের মতে এগুলো ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ এবং এগুলোর ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে তাদের প্রমাণ হলো, 'তোমাকে ফেরত নিলাম' (رَدَدْتُكِ) স্বামীর এ শব্দটি দু'টি অর্থ বহন করে, বৈবাহিক জীবনে ফেরত নেয়া অথবা তার পিতালয়ে

www.amarboi.org

ফেরত পাঠানো। একইভাবে أَمْسَكْتُكِ শব্দটির দু'টি অর্থ বহন করে : বৈবাহিক জীবনে রেখে দেওয়া অথবা ইদ্দতকালে বাড়ির বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখা।

মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের অন্য একটি দল এবং হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহগণের মতে এ শব্দ দু'টি রাজআহর ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধক তথা সুস্পষ্ট শব্দ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিয়াতের কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের প্রমাণ হলো, পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াতে রাজআহর বিধান বর্ণিত হয়েছে সে সব আয়াতে الرَّدُّ ও الإِمْسَاكُ শব্দ দ্বারা এর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[৩৭]

মহান আল্লাহ বলেন–

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

"তাঁদের স্বামীগণ এ সময়ের মধ্যে তাদেরকে পুনগ্রহণের অধিক হকদার।"[৩৮]

তিনি আরো বলেন–

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"তোমরা তাদেরকে সৎভাবে রেখে দাও অথবা বিধিমতো আলাদা করে দাও।"[৩৯]

**দ্বিতীয়ত : কাজের মাধ্যমে রাজআহ**

হানাফীগণের দৃষ্টিতে সঙ্গম ও তার পূর্ববর্তী কার্যক্রম দ্বারা রাজআহ শুদ্ধ হয়। হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "অথবা তার সাথে সহবাস করলো অথবা কামাতুরভাবে তার যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করল এসব কিছুই আমাদের নিকট রাজআহ সাব্যস্তকারী।"[৪০] তাদের এমত অনেক তাবেয়ী থেকে বর্ণিত। তারা হলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ, সুলায়মান আত-তাইমী। হানাফীগণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, যৌনাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রীর শরীরের অন্য কোনো অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে রাজ'আহ সাব্যস্ত হবে না।

তারা দলীল পেশ করেন যে, রাজআহ মূলত বিবাহকে চলমান রাখা ও তার যাবতীয় প্রভাব অব্যাহত রাখা। আর বিবাহের অন্যতম প্রভাব হলো, সঙ্গম ও তার পূর্ববর্তী কাজসমূহ বৈধ হওয়া। এ কারণে সঙ্গম ও তার পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড দ্বারা রাজআহ শুদ্ধ হবে। কেননা ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বর্তমান থাকে।

---

৩৭. আল-বিনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৪,পৃ. ৫৯২-৫৯৩; বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৮১-১৮২; আল খারশী, খ. ৪, পৃ. ৮০; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৭; কাশশাফুল কিনা খ. ৫, পৃ. ৩৪২।

৩৮. সূরা আল-বাকারা, ২২৮।

৩৯. সূরা আত্ তালাক, পৃ. ২।

৪০. আল-হিদায়া মাআ হাশিয়াতিল বিনায়াহ, খ. ৪, পৃ. ৫৯৩।

www.amarboi.org

যেমন মানুষের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ্যভাবে ও নির্দেশনামূলকভাবে কর্তার নিয়াতের নির্দেশনা প্রদান করে। অতএব যখন স্বামী তার রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে তার ইদ্দতকালে সঙ্গম করে অথবা কামোত্তেজনাসহ তাকে চুম্বন করে অথবা কামোত্তেজনার সাথে তাকে স্পর্শ করে, এসব কাজ নির্দেশনাগতভাবে রাজআহ হিসেবে গণ্য হবে। যেন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার মাধ্যমে তার সংশ্রবে ফিরে যাওয়ায় সম্মত হয়েছে।

হানাফীগণ চুম্বন, যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ও স্পর্শের ক্ষেত্রে কামোত্তেজনাকে শর্তযুক্ত করেছেন। অতএব কামোত্তেজনা ছাড়া স্পর্শ, যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত বা চুম্বন হলে তার মাধ্যমে রাজআহ সাব্যস্ত হবে না। এর কারণ হলো, উল্লিখিত বিষয়গুলো স্বামী ছাড়াও অন্যদের মাধ্যমেও অর্জিত হয়। যেমন– স্ত্রীর সাথে বসবাসকারী বা তার সাথে আলাপকারী অথবা ডাক্তার, ধাত্রী প্রমুখ। কিন্তু কামোদ্দীপনাসহ এমন কাজ একমাত্র স্বামী থেকেই প্রকাশিত হয়।

তাই কামোত্তেজনা ছাড়া এসব কাজ দ্বারা যদি রাজআহ সাব্যস্ত হয় তবে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের মুখাপেক্ষী হবে। ফলে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হবে এবং স্ত্রী প্রচণ্ড অসুবিধা ও সমস্যায় পতিত হবে।[৪১]

আর যদি এসব বিষয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। যেমন– স্ত্রী তার স্বামীকে চুম্বন করল অথবা তার যৌনাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করল অথবা কামোত্তেজনাসহ তাকে স্পর্শ করল তবে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদের দৃষ্টিতে রাজআহ সাব্যস্ত হবে। তারা দলীল পেশ করেন যে, বৈবাহিক জীবনাচারণের বৈধতা তাদের দু'জনের জন্য একই সাথে সাব্যস্ত হয়। অতএব স্ত্রী যখন কামাতুর দৃষ্টিতে তার স্বামীর দিকে তাকাবে তখন রাজআহ সাব্যস্ত হবে। যেমনিভাবে স্বামী দৃষ্টিপাত করলে সাব্যস্ত হয়। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, স্ত্রীর পক্ষ থেকে যেভাবে বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় যেমন স্বামীর পুত্র বা তার পিতার সাথে মেলামেশা করল। একইভাবে স্বামীর পক্ষ থেকেও বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয়। এ কারণে স্ত্রীর দিক থেকেও রাজআহ সাব্যস্ত হবে যখন সে কামোত্তেজনাসহ স্বামীকে স্পর্শ করবে, অথবা, তাকে চুম্বন করবে অথবা তার যৌনাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে রাজআহ সাব্যস্ত হবে না যদিও সে উত্তেজনাসহ স্বামীকে স্পর্শ করে বা তাকে চুম্বন করে অথবা তার গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এ ব্যাপারে তার যুক্তি হলো, রাজআহ স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক এ কারণে স্বামী স্ত্রীর অনিচ্ছায়ও রাজআহ করতে পারে। স্ত্রীর রাজআহ

---

৪১. আল-বিনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৫৯৩, ৫৯৪, বাদায়েউস-সানায়ে' খ. ৩, পৃ. ১৮১-১৮২; আস-সারাখসী, আল-মাবসুত, খ. ৬, পৃ. ২১।

www.amarboi.org

বাস্তবায়নের কোনো অধিকার নেই। তাই কথার মাধ্যমে হোক বা কাজের মাধ্যমে হোক। অতএব স্ত্রী স্বামীর প্রতি কামোত্তেজনাসহ বা অন্য কোনোভাবে দৃষ্টিপাত করলেও তার রাজআহ্ সাব্যস্ত হবে না।[৪২]

মালেকীদের দৃষ্টিতে কাজের মাধ্যমে রাজআহ শুদ্ধ হয়। যেমন– সঙ্গম ও তার প্রতি আবেদনময়ী কর্মসমূহ; এই শর্তে যে, স্বামী এসব কাজ দ্বারা রাজআহ্র নিয়ত করবে। অতএব যখন স্বামী-স্ত্রীকে উত্তেজনাবশত চুম্বন বা স্পর্শ করবে অথবা সঙ্গমস্থলে উত্তেজনাসহ দৃষ্টিপাত করবে অথবা তার সাথে সঙ্গম করবে কিন্তু রাজআহ্র নিয়ত করবে না তখন এসব কাজ দ্বারা রাজআহ্ সহীহ্ হবে না। 'খারশী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, নিয়ত ছাড়া শুধু কাজের মাধ্যমে রাজআহ্ অর্জিত হয় না যদিও কাজটি অনেক শক্তিশালী হয়। যেমন– সঙ্গম, চুম্বন, স্পর্শ, স্ত্রীর সাথে সহবাস এমন কাজ যদি তার দ্বারা রাজআহ্র নিয়ত করে তবে তা যথেষ্ট হবে।[৪৩]

শাফেয়ীদের মতে, কাজের মাধ্যমে কোনোভাবেই রাজআহ সাব্যস্ত হয় না। তাই তা সঙ্গম বা তার প্রতি আবেদনময়ী কর্মকাণ্ড হোক। তাই কাজটি স্বামীর রাজআহ্ করার নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা না হোক এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হলো, তালাকে রাজয়ী পতিত হওয়ার পর স্ত্রী তার জন্য অপরিচিত নারীর মতই, যার সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। ইদ্দতের মধ্যে রাজআহ্ করার অর্থ বিবাহের আকদ পূর্বাবস্থায় আনয়ন। বিবাহের আকদ যেমন তার প্রতি নির্দেশনাপ্রদানকারী শব্দ ছাড়া শুদ্ধ হয় না, ঠিক তেমনি রাজআহ্ও তার প্রতি নির্দেশনা প্রদানকারী শব্দ ছাড়া শুদ্ধ হয় না। যদি কোনো ব্যক্তি বিবাহের আগে কোনো নারীকে সঙ্গম করে তবে তার সঙ্গম যেমন হারাম, তেমনি তালাক রাজয়ী প্রাপ্ত স্ত্রীকে স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যে সঙ্গম করে তবে সে সঙ্গম হারাম। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী রহ. তার আল-উম্ম গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, রাজআহ স্বামীদের হক, তাদের জন্য স্ত্রীর অনিচ্ছায়ও তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার সাব্যস্ত, ইত্যাদি বর্ণনার পর তিনি বলেন, তালাক প্রত্যাহার হবে শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে। সঙ্গম ও এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে নয়। কেননা এগুলো কোনো প্রকার কথা ছাড়াই প্রত্যাহার। অতএব রাজআহ্র বিষয়ে কথা বলা ছাড়া পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর রাজআহ্ সাব্যস্ত হবে না। যেমন তাদের মধ্যে কথা ছাড়া বিবাহ ও তালাক হয় না। অতএব যদি স্ত্রীর সঙ্গে ইদ্দতের মধ্যে রাজআহ্র কথা বলে। তবেই তার রাজআহ্ সাব্যস্ত হবে।[৪৪]

৪২. আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ২২, পরবর্তী; আল-বিনায়া, খ. ৪, পৃ. ৫৯৫-৫৯৬।
৪৩. আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ৮১; আদ্-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৭০।
৪৪. আল-উম্ম, খ. ৬, পৃ. ২৪৪, আন নাবাবী, রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ২১৭।

www.amarboi.org

হাম্বলীগণ রাজআহ শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গম ও তার নিকট সঙ্গমের মাধ্যমে রাজআহ্ সহীহ্ হবে, কিন্তু তার পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড দ্বারা রাজআহ্ সহীহ্ হবে না। নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো–

**প্রথমত, সঙ্গমের মাধ্যমে রাজআহ্ শুদ্ধ হবার বিধান**

তাদের মতে সঙ্গমের মাধ্যমে সাধারণভাবে রাজআহ্ সাব্যস্ত হবে। তাই স্বামী রাজআহর নিয়ত করুক বা না করুক। যদিও এ ব্যাপারে সে অবহিত না করে।[৪৫]

এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হলো, ইদ্দতের সময়কাল তালাকপ্রাপ্তাকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এভাবে যে, ইদ্দত শেষ হলেই আর রাজ'আহ শুদ্ধ হবে না।

অতএব ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে যখন তার সাথে সঙ্গম করে তখন সে স্ত্রী তার কাছেই ফেরত আসবে।

এ বিধানটি ঈলার বিধানের মতই যখন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ করে, অতঃপর সে তার সাথে সঙ্গম করে তখন ঈলার হুকুম রহিত হয়ে যায়। রাজআহর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। যখন স্বামী স্ত্রীর সাথে ইদ্দতের মধ্যে সঙ্গম করে তখন সে স্ত্রী তার কাছে ফিরে যায়।

অতঃপর তারা আর একটি দলীলের উল্লেখ করেন যা সঙ্গম দ্বারা রাজআহ্ শুদ্ধ হওয়াকে সুদৃঢ় করে। আশ-শারহুল কাবীর আলাল মুকনি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তালাক মূলত মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার কারণ। তবে এর সাথে স্বাধীন ইচ্ছাও (خيار) রয়েছে তাই সঙ্গমের মাধ্যমে মালিকের কর্তৃত্বস্থাপন তার কাছে বাধা প্রদান করে। যেমনিভাবে এর মাধ্যমে তালাকের ক্ষেত্রে উকীল নিযুক্তকরণও রহিত হয়ে যায়।[৪৬]

এর দ্বারাই হাম্বলীগণ তাদের মতের পক্ষে দলিল উপস্থাপন করেন।

**দ্বিতীয়ত, সঙ্গমের পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড**

সঙ্গমের পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড দ্বারা রাজআহ্ শুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে তাদের মাযহাব কি, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আহমদ থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী উত্তেজনাসহ সঙ্গমের স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত, স্পর্শ ও চুম্বনের দ্বারা রাজআহ্ সহীহ্ হবে না। এ বর্ণনার যুক্তি নিম্নরূপ–

১. উল্লিখিত এ কাজগুলো সংঘটিত হলে এর কারণে ইদ্দত পালন করতে হয় না এবং এর ফলে মোহর প্রদানও ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এর দ্বারা রাজআহ্ সহীহ্ হবে না।

---

৪৫. কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৩৪৩।

৪৬. ইবনে কুদামা আল-মাকাদিসী, আশ-শারহুল কাবীর মাআল মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৪৭৫।

www.amarboi.org

২. সঙ্গমের স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ কখনো কখনো স্বামী ছাড়া অন্যদের থেকেও প্রয়োজনবশত সংঘটিত হয়। এ দিক বিবেচনায় এ দ্বারা রাজআহ হয় না।

অন্য এক বর্ণনামতে, এসব কাজের দ্বারা রাজআহ্ সহীহ্ হয়। কেননা এগুলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক সম্ভোগ থেকে মুক্ত নয়।
প্রথম বর্ণনাটিই তাদের মাযহাবে নির্ভরযোগ্য। আর ইমাম আহমদ রহ. এমতটিই বর্ণনা করেছেন।

একইভাবে তারা শুদ্ধ নির্জনবাস দ্বারা রাজআহ সহীহ হয় কি-না, সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের দু'টি মত রয়েছে–
প্রথম মত : 'নির্জনবাস'-এর দ্বারা রাজআহ্ শুদ্ধ হবে। কেননা নির্জনবসের মধ্যে সম্ভোগের পূর্ণ পরিবেশ রয়েছে। আর সে জন্যই 'নির্জনবাস'-এর দ্বারা বিবাহের সব বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় মত : 'নির্জনবাস'-এর দ্বারা রাজআহ শুদ্ধ হবে না। কেননা তালাকের ক্ষেত্রে 'নির্জনবাস'-এর দ্বারা সম্ভোগের পরিবেশ থাকে না। অতএব এ অবস্থায় রাজআহ সহীহ্ হবে না।[৪৭]

## রাজআহর বিধানাবলি

রাজআহর ওপর সাক্ষী রাখা : হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী মাযহাবের নতুন মত এবং ইমাম আহমদের এক বর্ণনা অনুযায়ী রাজআহর ওপর সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব। এ মত ইবনে মাসউদ রা., আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে বর্ণিত। অতএব যে তার স্ত্রীকে রাজআহ্ করল কিন্তু তার ওপর কাউকে সাক্ষী রাখল না তার রাজআহ্ শুদ্ধ হবে। কেননা সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব।

এ বিষয়ে তাদের যুক্তি ও দলীল নিম্নরূপ :
১. রাজআহ্ বিবাহের মতোই। এ হিসেবে যে, তা বিবাহকে আরো দীর্ঘায়িত করে। আর এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, বিবাহ্ দীর্ঘায়িত করা এবং অব্যাহত রাখার জন্য সাক্ষ্য আবশ্যক নয়। অতএব একইভাবে রাজআহর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য অপরিহার্য হবে না।

২. রাজআহ্ স্বামীর অন্যতম অধিকার যা স্ত্রীর সম্মতির প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। এ কারণে এর শুদ্ধতার জন্য সাক্ষ্য শর্ত করা হয়নি। কেননা এ ক্ষেত্রে স্বামী তার একক অধিকার ব্যবহার করছে, আর অধিকার যেহেতু গ্রহণ করা বা অভিভাবকের মুখাপেক্ষী নয় সেহেতু তা শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য শর্ত নয়। তারা বলেন, মহান আল্লাহর বাণী–

---

৪৭. আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৭৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৩৪৩ ও তৎপরবর্তী।

www.amarboi.org

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"তোমরা তোমাদের মধ্যকার ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ"।[৪৮]

এটি একটি নির্দেশ। তবে এ নির্দেশটি মুস্তাহাব-এর অর্থ বহন করে, ওয়াজিব এর অর্থ নয়। যেমনভাবে আল্লাহ্র বাণী–

وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"তোমরা যখন বেচাকেনা করবে তখন সাক্ষী রাখ"।[৪৯] জমহুর ফকীহগণ সাক্ষী ছাড়া সম্পাদিত বেচাকেনা শুদ্ধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। তেমনিভাবে রাজআহর ওপর-সাক্ষী রাখাও মুস্তাহাব করা হয়েছে, পরবর্তীকালে অস্বীকার করা থেকে নিরাপদ থাকা, ঝগড়া নির্মূল করা এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্যের দ্বার রুদ্ধ করার জন্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বেচাকেনার মধ্যে অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা রাজআহর ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার চেয়ে বেশি প্রয়োজন। কেননা বেচাকেনা হলো শরীয়তসম্মতভাবে লেনদেন করার একটি চুক্তি। আর রাজআহ হলো, বৈবাহিক জীবন অব্যাহত রাখতে চাওয়া বা তা ফেরত আনয়ন করা মাত্র। অতএব সাক্ষ্য ছাড়া বেচাকেনা শুদ্ধ হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাক্ষ্য ছাড়া রাজআহ শুদ্ধ হবে।

মালেকীগণ এর সাথে আরো যুক্ত করেছেন যে, স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত রাজআহর ব্যাপারে সাক্ষ্য সাব্যস্ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী যদি তার স্বামীকে সঙ্গম করায় বাঁধা প্রদান করে তাহলে তার এ কাজটি উত্তম হবে, এর বিনিময়ে সে নেকি পাবে এবং সে এর কারণে স্বামীর অবাধ্য বলে গণ্য হবে না।[৫০]

শাফেয়ী মাযহাবের পুরাতন মত ও ইমাম আহমদের দ্বিতীয় মত অনুযায়ী রাজআহর ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। দলীল আল্লাহর বাণী–

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ-

"তোমরা তোমাদের মধ্যকার ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ।" আরো দলীল ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, এক ব্যক্তি তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, যে তার স্ত্রীকে তালাক রাজয়ী প্রদান করেছে। অতঃপর তার সাথে মিলিত হয়েছে, কিন্তু কোনো সাক্ষী রাখেনি। তখন তিনি বললেন,

---

৪৮. সূরা তালাক, ২।

৪৯. সূরা আল-বাকারা, ২৮২।

৫০. আল-বিনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৫৯৫; ব্রাদায়েউস-সানায়ে' খ. ৩, পৃ. ১৮১; সারাখসী, আল-মাবসুত, খ. ৬, পৃ. ২২; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ৩৭৭; কাশ্শাফুল কিনা খ. ৫, পৃ. ৩৪২-৩৪৩; ইবনে কুদামা, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৭২-৪৭৩।

www.amarboi.org

'সে সুন্নত পদ্ধতি ছাড়াই তালাক দিয়েছে এবং সুন্নত পদ্ধতি ছাড়াই রাজআহ করেছে। এর ওপর সাক্ষ্য রাখ এবং এ রকমটি আর করো না'। তাছাড়া রাজআহ যেহেতু হারাম হয়ে যাওয়া স্ত্রী অঙ্গকে হালাল করে নেয়, তাই এর জন্য সাক্ষী রাখা অপরিহার্য। ইমাম নববী বলেন, রাজআহর ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী শর্তও নয়, আবশ্যকও নয়।[৫১]

## স্ত্রীকে রাজআহ্ সম্পর্কে অবহিতকরণ

জমহুর ফকীহগণের মতে, স্ত্রীকে রাজআহর বিষয় অবগত করা মুস্তাহাব। যাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান হয়।

আল্লামা আইনী বলেন, তাকে জানানো মুস্তাহাব করা হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীকে রাজআহর বিষয় অবগত করানো। কেননা কখনো এমন হতে পারে যে, স্ত্রী এমন ধারণা নিয়ে বিবাহ্ বসল যে, তার স্বামী তাকে রাজআহ্ করেনি, অথচ তার ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেছে আর স্বামী তার সাথে সঙ্গম করেছে। তবে স্বামীকে প্রশ্ন না করার কারণে স্ত্রী গোনাহগার হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে অবহিত না করার কারণে পাপের ভাগী হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বে স্ত্রীকে অবগত না করালেও রাজআহ্ শুদ্ধ হবে। কেননা রাজআহ অর্থ প্রতিষ্ঠিত বিবাহ্ অব্যাহত রাখা; নতুন করে বিবাহ্ নয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী তার একান্ত অধিকার প্রয়োগ করেছে। আর কোনো মানুষের একান্ত অধিকার প্রয়োগ করা অন্যের জানার ওপর নির্ভর করে না।[৫২]

## রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে স্বামীর সফর

হাম্বলীগণ ও হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফার-এর মতে, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে স্বামী সফর করতে পারবে। কিন্তু জমহুর ফকীহগণ তাকে নিয়ে সফর করাকে বৈধ মনে করেন না। কেননা এ সময়ে সে সার্বিকভাবে তার স্ত্রী নয়। তাছাড়া স্বামী তাকে ঘর থেকে বের না করার ব্যাপারে আদিষ্ট। মহান আল্লাহর বাণী– لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ

"তাদেরকে তোমরা তাদের বাড়ি থেকে বের করো না।"[৫৩]

---

৫১. রওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ২১৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৬; ইবনে কুদামা আল-মাকাদিসী, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৭২-৪৭৩; কাশশাফুল কিনা খ. ৫, পৃ. ৩৪২-৩৪৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৪৮১।

৫২. আল-বিনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৫৯৭; ইবনে হাযম আজজাহিরী, আল-মুহাল্লা, খ. ১০, পৃ. ২৫১; কুরতুবী, আল-জামিলি আহকামিল কুরআন, খ. ১৮, পৃ. ১৫৯; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ৮৭।

৫৩. সূরা আত্ তালাক : ১।



www.amarboi.org

এছাড়া কখনো এমন হতে পারে যে, তার সাথে সফরে থাকা অবস্থায় তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে তখন সে একজন বেগানা পুরুষের সাথে থাকবে, যা হারাম। এ বিধান যখন স্বামী ইদ্দতের মধ্যে রাজআহ না করে। আর যদি রাজআহ করে তবে তার সাথে সফর করতে পারবে। কেননা তখন সে তার সম্পূর্ণ বৈধ স্ত্রী।[৫৪]

**রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর স্বামীর জন্য রূপচর্চা ও সাজগোজ করা**

স্বামীর উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার অধিকার রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর রয়েছে, যা নারীরা সাধারণত তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্যে পোশাক ও অন্যান্য প্রসাধনির মাধ্যমে করে থাকে। হাম্বলীগণ বলেন, স্ত্রী এ ক্ষেত্রে সাজগোজ ও রূপচর্চা করতে পারবে না।[৫৫] হানাফীগণ বলেন, তার রূপচর্চা ও সৌন্দর্যচর্চা করার অধিকার রয়েছে।[৫৬]

التَّشَوُّف অর্থ মুখমণ্ডলের রূপচর্চা করা। আর التَّزَيُّن (সাজগোজ) শব্দটি التَّشَوُّف থেকে ব্যাপক। কেননা তা মুখমণ্ডলসহ অন্যান্য অঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করে। স্বামীকে রাজআহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ কাজ করা স্ত্রীর জন্য বৈধ। তখন সাজগোজ রাজআর একটি মাধ্যম হবে। সম্ভবত স্বামী তার স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখলে তার নয়ন জুড়িয়ে যাবে এবং তালাক প্রদানের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তাকে রাজআহ করবে।

তারা সাজগোজের বৈধতার দলিল পেশ করেন যে, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্ত্রীর মধ্যে শামিল এবং এদিক দিয়ে এখনো বিবাহ বহাল রয়েছে যে, সে ইদ্দতের মধ্যে রয়েছে।

শাফেয়ীগণ রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রে তার স্বামীর জন্য রূপচর্চা ও সাজসজ্জা বৈধ না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা সে তার জন্য অপরিচিত নারী এবং তাদের দৃষ্টিতে রাজআহ বিবাহের পুনরাবৃত্তি।

এই বিধানে অন্য একটি বিষয় অনুগামী হয়। আর তা হলো, স্ত্রী নিজ কক্ষে থাকা অবস্থায় স্বামীর প্রবেশ। ফকীহগণের মতে, রাজআর নিয়ত না করলে তার কাছে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। কারণ কখনো কাপড় খোলা অবস্থায় থাকতে পারে। এমতাবস্থায় সঙ্গমের স্থানে স্বামীর দৃষ্টি পড়লে যারা একে রাজআহ হিসেবে গণ্য করেন তাদের দৃষ্টিতে রাজআহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর

---

৫৪. ইবনে কুদামা, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৭৪; আল-বিনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৬১১-৬১৩; আদ-দাসুকী, খ. ২, পৃ. ৪২২; আর রাওদা, খ. ৮, পৃ. ২২১।

৫৫. কাশ-শাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ৩৪৩।

৫৬. আল-বিনায়া আলাল হিদায়া; খ. ৪, পৃ. ৬১১-৬১৩।

www.amarboi.org

যদি রাজআহর নিয়ত করে তাহলে তার কাছে প্রবেশ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা তার নিয়তই ছিল স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা। অতএব সে তার স্ত্রী। আর বিশেষ করে রাজআহ এর ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন হয় না।[৫৭]

## রাজআহর ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্য

স্বামী যখন তার রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ব্যাপারে এ দাবি করবে যে, সে তাকে গতকাল বা একমাস পূর্বে রাজআহ করেছে, তখন তাকে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে, যদি তা ইদ্দতের মধ্যে হয়। কেননা সে এমন বিষয়ে অবগত করাচ্ছে যা নতুনভাবে শুরু করার মালিকানা তার রয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে স্বামী অবগত করানোর ব্যাপারে অভিযুক্ত হবে না। কিন্তু সে যদি ইদ্দত সমাপ্তির পর এমন কথা বলে তাহলে তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে না, কেননা সে এমন বিষয় অবগত করাচ্ছে যা নতুনভাবে শুরু করার মালিকানা তার নেই। অতএব ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যদি স্বামী দাবী করে যে, সে ইদ্দতকালেই তাকে রাজআহ করেছে এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করে তবে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা স্বামী এমন সময় তার রাজআহর দাবি করল যখন তার রাজআহ করার অধিকার নেই।

স্বামী যদি ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর এ দাবি করে যে, সে ইদ্দতের মধ্যেই তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে রাজআহ করেছে এবং এর ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করে তবে তার রাজআহ শুদ্ধ হবে।

সারাখসী বলেন, স্বামী যদি তার ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে রাজআহ করলাম, তখন তার জবাবে স্ত্রী বলে, 'আমার ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং রাজআহ সাব্যস্ত হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ এর মতে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং রাজআহ সহীহ হবে। কেননা সে তার ইদ্দত পালন করে চলেছে। তাই ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার বিষয়টি না জানানোর কারণে তা এখনও রয়ে গেছে। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার সংবাদ প্রদানের পূর্বেই রাজআহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব রাজআহ শুদ্ধ হবে এবং ইদ্দত বাতিল হবে। কেননা স্ত্রী ইদ্দত বাতিল হওয়ার পর ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সংবাদ প্রদান করেছে। আর ইদ্দত বাতিল হওয়ার পর এ সংবাদ প্রদান করার কোনো অধিকার স্ত্রীর নেই। যদিও সে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তা অবহিত করে।

---

৫৭. ইবনে কুদামা, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৭৪; কুরতুবী, আল-জামিলি আহকামিল-কুরআন, খ. ১৮, পৃ. ১৫৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ, ৩, পৃ. ৩৩৭; আর রাওদা, খ. ৮, পৃ. ২২১; সারাখসী, আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ২৫।

www.amarboi.org

আর যেহেতু স্বামী কর্তৃক রাজআহ করার পর স্ত্রী ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সংবাদ প্রদানে অভিযুক্ত সেহেতু তার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উকীলকে উকীল নিয়োগকর্তা বলে, আমি তোমাকে অপসারণ করলাম। আর উকীল বলে, আমি তো বিক্রয় সম্পন্ন করে ফেলেছি। ইমাম আবু হানীফা বলেন, ইদ্দত সমাপ্তির অবস্থায় এসে সে রাজআহ করছে। তাই এ রাজআহ শুদ্ধ হবে না। কেননা ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার দ্বারা সাধারণ ইদ্দত বহাল থাকা বুঝায় না। আর রাজআহর ক্ষেত্রে শর্ত হলো তা সাধারণত ইদ্দতের মধ্যেই সংঘটিত হবে।[৫৮]

—মুহাম্মদ রুহুল আমিন

৫৮. আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ২২; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৮৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

www.amarboi.org

# খুলা (خُلْعٌ)

**সংজ্ঞা :** اَلْخَلْعُ খা' বর্ণে যবর পড়লে আভিধানিক অর্থ হবে, মুক্ত করা, খালি করা। আর খা বর্ণে পেশ পড়লে খুলা একটি কর্মের নাম।[১]

আর ফিকহের পরিভাষায় ফিকহবিশারদগণ তাদের স্ব স্ব মাযহাবের ভিন্নতার কারণে খুলা তালাক না-কি ফসখ সে ব্যাপারে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

হানাফী ফকীহগণ খুলার সংজ্ঞায় বলেন, 'স্ত্রীর কাছ থেকে اَلْخُلْعُ শব্দের দ্বারা বিবাহের মালিকানা প্রত্যাহারের বিপরীতে অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা'।[২]

আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে اَلْخُلْعُ এর সংজ্ঞা হলো : স্বামী কর্তৃক তালাক বা খুলা শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট বিনিময় গ্রহণ করে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করা।[৩]

**সংশ্লিষ্ট পরিভাষা**

**১.** اَلصُّلْحُ : সুলহ-মীমাংসা শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে বাবে اَلْمُصَالَحَةُ এর إسم অর্থ হলো : ঝগড়া-বিবাদের পর শান্তি স্থাপন করা, সন্ধি স্থাপন করা। শরীয়তের পরিভাষায় اَلصُّلْحُ বলা হয়, এমন চুক্তি যার দ্বারা বিতর্ক নিরসন হয়। আর اَلصُّلْحُ শব্দটি اَلْخُلْعُ এর সমার্থবোধক তবে সামান্য ব্যবধান আছে। اَلْخُلْعُ বলা হয় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর দেয়া যাবতীয় সম্পত্তি স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়া। আর اَلصُّلْحُ হলো, স্বামীর দেয়া কিছু সম্পত্তি দ্বারা তার সাথে সন্ধি স্থাপন করা।[৪]

**২.** **اَلطَّلَاقُ (তালাক) :** শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে তালাক اَلْخُلْعُ শব্দের অন্তর্ভুক্ত যার আলোচনা অচিরেই আসবে। اَلطَّلَاقُ এর শাব্দিক অর্থ হলো اَلتَّطْلِيقُ (তালাক প্রদান) যেমন, اَلسَّلَامُ অর্থ اَلتَّسْلِيمُ সালাম দেয়া।

---

১. আস-সিহাহ; আল-কামূস; আল-লিসান; আল-মিসবাহ্ শব্দমূল "خلع"।

২. আল-ইখতিয়ার খ. ৩, পৃ. ১৫৬, আল-মারিফা সং.; ফাতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ১৯৯ বূলাক সং.; হাশিয়া ইবনে আবিদীন আলাদ-দুররিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৫৫৬- ৫৫৭, আল-আমীরিয়া সং. তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৬৭, আল-আমীরিয়্যা সং.।

৩. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩০, আল-মারিফা সং.; হাশিয়া আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৭, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আয-যুরকানী, খ. ৪, পৃ. ৬৪, মুদ্রণ : আল-ফিকর; হাশিয়া আল-বুনানী আলায-যুরকানী. খ. ৪, পৃ. ৬৩; মুদ্রণ : আল-ফিকর; আসহালুল-মাদারিক. খ. ২, পৃ. ১৫৭, মুদ্রণ : আছ-ছানিয়া; হাশিয়া আল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, মুদ্রণ : আল-হালবী; রওদাতুত তালেবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৭২, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১২, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৮২, মুদ্রণ : আত-তুরাছ।

৪. আল-মিসবাহ, শব্দমূল "صلح"; আল-জুরজানী আত-তারীফাত, পৃ. ১৭৬, মুদ্রণ : আল-আরাবী; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আত-তিজারিয়াতুল কুবরা।

www.amarboi.org

আর اَلطَّلَاقُ এর শাব্দিক গঠন খোলা ও মুক্তি অর্থ নির্দেশ করে। যেমন : إِطْلَاقُ الْأَسِيْرِ বলা হয়, যখন কোনো বন্দির বন্ধন খুলে দেয়া হয় এবং তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় اَلطَّلَاقُ -এর অর্থ হলো : যথাস্থান (স্ত্রীর) থেকে বিবাহ বন্ধন তুলে নেয়া। খুলার সাথে اَلطَّلَاقُ এর সম্পর্ক হলো, উল্লিখিত অবস্থা ছাড়াও খুলার ক্ষেত্রে ফকীহগণ বিভিন্ন মতপোষণ করেছেন। اَلْخُلْعُ কি তালাকে বায়েন, না তালাকে রাজয়ী না فَسْخٌ তার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।[৫]

হানাফীদের মতে সম্পদের বিনিময়ে তালাক দেয়ার বিধান খুলার মতো। কেননা উভয়টিই সম্পদের বিনিময়ে তালাক প্রদান। অতএব একটির ক্ষেত্রে অপরটির বিধান ধর্তব্য হবে। তবে তাদের মতে, اَلْخُلْعُ ও اَلطَّلَاقُ এর মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে :

**ক. প্রথম পার্থক্য :** ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতানুসারে দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ওপর যে হক আদায় করা আবশ্যিক হয়েছিল যেমন মোহর প্রদান করা, এবং বিবাহকালীন ভরণপোষণ দেয়া এসব খুলা সম্পাদিত হওয়ার পর রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ রহিত হবে না। কেননা সেটি اَلْخُلْعُ এর পূর্বে আবশ্যিক ছিল না। সুতরাং পরে রহিত হওয়ার ধারণা করার অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে সম্পদ নিয়ে তালাক দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কোনো হক রহিত হয় না এবং এর দ্বারা উভয়পক্ষ যে সম্পদ দেয়ার ওপর একমত হয়েছিল তা প্রদান করা আবশ্যিক হবে।

**খ. দ্বিতীয় পার্থক্য :** যদি খুলার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিনিময় বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়, যেমন কোনো মুসলমান মদ, শূকর বা মৃত জন্তুর বিনিময়ে খুলা করল, তাহলে স্বামী কিছুই পাবে না আর ঐ অবস্থায় বিচ্ছেদটি তালাকে বায়েন বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে সম্পদের বিনিময়ে তালাক দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তালাকের বিনিময় বাতিল হলে তিন তালাকের কমের ক্ষেত্রে তালাকে রাজয়ী বলে গণ্য হবে। কেননা খুলা হলো কেনায়া (অস্পষ্ট) তালাক, আর সম্পদ নিয়ে তালাক হলো সারীহ (সুস্পষ্ট) তালাক। বস্তুত তালাকে বায়েন সাব্যস্ত হয়

---

৫. আল-মুগরিব, পৃ. ২৯২, মুদ্রণ : আল-আরাবী এবং আস-সিহাহ ও আল-মিসবাহ, শব্দমূল "طلق"; আল-বিনায়া ফি শারহিল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৩৬৮, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আল-জুরজানী আত-তারীফাত, পৃ. ১৮৩, মুদ্রণ : আল-আরাবী; হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ২৩২, মুদ্রণ : আন-নাসর।

www.amarboi.org

বিনিময় ধার্য করার দ্বারা বিনিময় ধার্য করার বিষয়টি শুদ্ধ হওয়ার শর্তে; আর যখন ধার্যই শুদ্ধ হল না (কারণ শূকর বা মদ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বলে গণ্য হয়না) তখন বিষয়টি মোহর ধার্য না হওয়ার মতো হয়ে গেল, অতএব সারীহ তালাক অবশিষ্ট রইল তাই রাজয়ী الطَّلَاق পতিত হবে।

**গ. তৃতীয় পার্থক্য :** স্বামী যদি ধন-সম্পদ নিয়ে স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে তালাকের সংখ্যা এ ক্ষেত্রে গণ্য হবে না। আর خلع এর ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যে, সেটি কি তালাক হবে, যার মাধ্যমে তালাকের সংখ্যা কমে যাবে না فَسْخ গণ্য হবে ফলে তালাকের সংখ্যা কমবে না?[৬] এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

৩. **الفِدْيَةُ :** (ফিদইয়া-মুক্তিপণ) আভিধানিক অর্থে الفِدْيَةُ : (মুক্তিপণ) সেই সম্পত্তি যা বন্দি মুক্ত করার জন্য প্রদান করা হয় এবং তার বহুবচন হলো فِدًى ও فِدْيَات আর তা باب مفاعلة থেকে ব্যবহৃত হয়। তখন অর্থ হবে : মুক্ত করা ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা। আর বাবে ضرب ও افتعال থেকেও ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ হবে : তালাকের মাধ্যমে স্বামী থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে সম্পদ প্রদান করা। ফিকহবিদদের পরিভাষায়ও ফিদইয়া তার শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর الفِدْيَةُ ও الْخُلْعُ এর (খুলার) অর্থ একই, তা হলো 'তালাক প্রদানের বিনিময়স্বরূপ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে অর্থ সম্পদ দেয়া'। আর الْمُفَادَاة শব্দটি কুরআনে কারীমে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের নিকট صريح (সুস্পষ্ট) শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত।[৭]

৪. **الفَسْخُ (ফসখ)** : এটি الفَسْخُ -এর ক্রিয়ামূল, এর আভিধানিক অর্থ হলো : দূর করা, অপসারণ করা, বাতিল করা, বিচ্ছিন্ন করা। ফিকহবিদদের পরিভাষায় তার দুটি সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে : ইমাম সুয়ূতী ও ইবনে নুজায়ম-এর মতে الفَسْخُ -এর পারিভাষিক অর্থ হলো 'চুক্তির বন্ধন খুলে দেয়া'। আল্লামা যারকাশী রহ. বলেন, الفَسْخُ হলো, উভয় বিনিময়কে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। আর الانفساخ হলো, উভয় বিনিময় প্রত্যেক মালিকের নিকট প্রত্যাপন করা।

---

৬. বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৫২, মুদ্রণ : আল-জামালিয়া; তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৬৮, মুদ্রণ : বুলাক; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৫৭, মুদ্রণ : আল-মারিফা; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২০৫, মুদ্রণ : আল-আরাবিয়্যাহ; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫৬১, মুদ্রণ : আল-মিসরিয়্যাহ বূলাক।

৭. আল-মিসবাহ, শব্দমূল (فدى), বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আত-তিজারিয়াতুল কুবরা; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬৮, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

www.amarboi.org

আর الْخُلْعُ এর সাথে الْفَسْخُ এর সম্পর্ক হলো এক অভিমত অনুযায়ী[৮] الْخُلْعُ শব্দটি الْفَسْخُ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর হাম্বলীদের মতে الْفَسْخُ হলো الْخُلْعُ এর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শব্দ।

৫. الْمُبَارَأَةُ (আল-মুবারাত) : এটি باب مفاعلة এর ক্রিয়ামূল যা উভয় পক্ষের দায়মুক্তিতে অংশগ্রহণ নির্দেশ করে। পরিভাষায় এটি الْخُلْعُ এরই একটি নাম। অর্থ হলো, তালাকের জন্য স্ত্রীর অর্থ ব্যয় করা। কিন্তু এটি স্ত্রীর স্বামীর কাছে প্রাপ্য তার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার সাথে নির্দিষ্ট।[৯]

আর الْمُبَارَأَةُ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট الْخُلْعُ এর মতোই। উভয়টিই স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের ওপর বিবাহের দ্বারা যে অধিকার অপরিহার্য হয়েছিল তা রহিত করে দেয়া। যেমন দেনমোহর, খুলাপূর্ব কালের ভরণপোষণ। অবশ্য ভবিষ্যতে যা অপরিহার্য হবে তাকে রহিত করে না। কেননা الْخُلْعُ শব্দ পৃথক এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকেই ব্যবহৃত হয় خلع النعل خلع العمل জুতো খুলে ফেলেছে এবং কাজ সমাপ্ত করেছে। الْخُلْعُ এটি الْمُبَارَأَةُ এর ন্যায় مطلق তথা শর্তমুক্ত। অতএব বিবাহ ও তার অধিকারসমূহে এবং তার বিধানগুলোর ক্ষেত্রে তা শর্তমুক্তভাবেই প্রযোজ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, الْخُلْعُ ও الْمُبَارَأَةُ এর দ্বারা ধার্যকৃত মোহরই রহিত হবে। কেননা এটি হলো বিনিময়। আর বিনিময়সমূহের ক্ষেত্রে শর্তকৃত বস্তুই ধর্তব্য, অন্য কিছু ধর্তব্য হয় না। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. الْخُلْعُ এর ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর সঙ্গে একমত এবং الْمُبَارَأَةُ এর ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করেছেন। আর الْخُلْعُ এর ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে মতানৈক্য করেছেন এবং الْمُبَارَأَةُ এর মধ্যে তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। কেননা الْمُبَارَأَةُ শব্দটি বাবে مفاعلة এর মাসদার (ক্রিয়ামূল্য) যা براءة (দায়মুক্তি) থেকে নির্গত। সুতরাং তা উভয়পক্ষ হতে দায় মুক্তি চায়। আর তা مطلق আমরা তাকে উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য বিবাহের অধিকারগুলোর সাথে শর্তযুক্ত করেছি। অপরপক্ষে খুলা এর চাহিদা খুলে ফেলা। আর তা বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। বিধানাবলি বিচ্ছিন্ন করার কোনো প্রয়োজন নেই।[১০]

---

৮. আল-মিসবাহ, শব্দমূল (فسخ), আস-সুয়ূতী আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের, পৃ. ২৮৭, মুদ্রণ : আল-ইলমিয়্যাহ; ইবনে নুজাইম আল-আশবাহ ওয়া আন-নাযায়ের, পৃ. ৩৩৮, মুদ্রণ : আল-হিলাল; আল-মানছুর, খ. ৩, পৃ. ২৭৯; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

৯. তালাবাতুত-তালাবা, পৃ. ১২৬, মুদ্রণ : আল-কলম; আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৪৩, মুদ্রণ : আল-মাওসূআ।

১০. ফাতহুল কাদীর মা'আল-ইনায়া, খ. ৩, পৃ. ২১৫-২১৬, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যাহ; তাবঈনুল হাকাইক, খ. ২, পৃ. ২৭২, মুদ্রণ : বূলাক; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৬০, মুদ্রণ : আল-মারিফা।

www.amarboi.org

**খুলা-এর স্বরূপ**

ফিকহ্ বিশারদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, খুলা যদি তালাক শব্দের মাধ্যমে সংঘটিত হয় বা এর দ্বারা তালাক এর নিয়ত করে থাকে তাহলে তালাক হয়ে যাবে। মতভেদ শুধু তালাক শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ দিয়ে খুলা হলে এবং তার দ্বারা সুস্পষ্ট তালাক বা অস্পষ্ট তালাকের নিয়ত না করলে। হানাফীদের ফাতওয়া প্রদত্ত মত, মালেকীদের অভিমত, শাফেয়ীদের নতুন অভিমত এবং হাম্বলী মাযহাবের ইমাম আহমাদ রহ. এর এক বর্ণনা মতে, খুলা তালাক বলে গণ্য হবে। আর শাফেয়ীদের প্রাচীন অভিমত ও ইমাম আহমদ রহ. এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুসারে খুলা তালাক নয়; বরং বিবাহ্ ফসখ্ করার তথা ভেঙ্গে দেয়ার নামান্তর।[১১] যারা বলেন, খুলা তালাক, তারা এ ব্যাপারে একমত যে, খুলা দ্বারা যে তালাক পতিত হয় তা তালাকে বায়েন।[১২] কেননা স্বামী স্ত্রী থেকে বিনিময় এর অধিকারী হয়েছে। অতএব তার কারণে স্ত্রী নিজের অধিক মালিক হবে। আর এজন্যও যে, তার বিনিময় প্রদানের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বামী থেকে নিস্কৃতি লাভ করা। আর তা বায়েন তালাক হওয়া ছাড়া অর্জিত হবে না। তবে হানাফীগণ বলেন, স্বামী যদি খুলা দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা খুলা কিনায়া শব্দের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি খুলা দ্বারা দুই তালাকের নিয়ত করে তাহলেও এক তালাক বায়েন হবে। তবে এ ব্যাপারে ইমাম যুফার রহ.-এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা তার মতে দুই তালাক পতিত হবে। যেমন : হারাম শব্দ অথবা বায়েন শব্দ ব্যবহার করলে পতিত হয়ে থাকে। এটা ইমাম মালিক রহ.-এরও অভিমত।[১৩]

---

১১. আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ১৭১, মুদ্রণ : আস-সাআদাহ; আল-বিনায়া, খ. ৪, পৃ. ৬৫৮, মুদ্রণ : আল-ফিকর; তাবঈনুল হাকাইক, খ. ২, পৃ. ২৬৮, মুদ্রণ : বূলাক; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৫৯, মুদ্রণ : আত-তিজারিয়্যা; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৯, মুদ্রণ : আন-নাজাহ; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১২, মুদ্রণ : বুলাক; শারহুর রিসালা মা'আ হাশিয়াল আদাবী, খ. ২, পৃ. ১০৩, মুদ্রণ : আল মারিফা; রওদাতুত-তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৭৫, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৪৫; আল-মাকতাবুল-ইসলামী সং; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৬, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৬, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৯২-৩৯৩, মুদ্রণ : আত-তুরাছ।

১২. ইবনে হাযম আল-মুহাল্লা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এটা তালাকে রাজয়ী। তবে স্বামী যদি তাকে তিন তালাক প্রদান করে বা তিন তালাকের শেষ তালাক প্রদান করে। অথবা নারী সহবাসকৃতা হয়। স্বামী যদি ইদ্দত পালনরত অবস্থায় রুজু করে তবে তা জায়েয হবে; স্ত্রী সম্মত হোক বা না হোক এবং স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থকড়ি ফিরিয়ে দিবে। আল-মুহাল্লা, খ. ১০, পৃ. ২৩৫, ১৯৭৮খৃ., মুদ্রণ : আল-মুনীরিয়্যা।

১৩. আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ১৭২, মুদ্রণ : আস-সাআদাহ, তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৪৩, মুদ্রণ : আছ-ছানিয়া।

www.amarboi.org

খুলা সম্পর্কে মতপার্থক্যের ব্যাপারটি বস্তুত খুলা সম্পন্ন হওয়ার পর, তার পূর্বে নয়। খুলা কি তালাক না ফসখ এটিই মতানৈক্যের কারণ। বিনিময় নেয়ার ফলে তা তালাকের বিচ্ছেদ থেকে বের হয়ে ফসখ-এর বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কি-না?[১৪]

যারা বলেন, খুলা الفَسْخ তারা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আল্লাহর তাআলার বাণী الطَّلَاقُ مَرَّتَان (তালাক দু' প্রকার) তারপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه "স্ত্রী যদি তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় তাতে কোনো সমস্যা নেই"। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "তার পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে সেই স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করা ছাড়া স্বামীর জন্য বৈধ হবে না"।[১৫] এখানে প্রথমে দুই তালাক এরপর খুলা অতঃপর আবার তালাকের কথা বলা হয়েছে। অতএব খুলা যদি স্বতন্ত্র তালাক হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তালাকের সংখ্যা চার-এ পৌঁছে যাবে। আর তা অসম্ভব। সুতরাং খুলা ফসখ বলে গণ্য হবে।

তা ছাড়া খুলা হলো এমন একটি বিচ্ছেদ, যা সুস্পষ্ট এবং তালাকের নিয়ত থেকে মুক্ত। সুতরাং তা অন্যান্য ফসখ-এর ন্যায় একটি ফসখ বলে গণ্য হবে। এই মতাবলম্বীগণ ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী রহ. বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন। হাদীসটি হলো :

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَة.

"হযরত সাবিত ইবনে কায়েস এর স্ত্রী তার স্বামীর সাথে খুলা করেন অতঃপর নবী স. তাকে এক হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন"।[১৬]

তারা নিম্নোক্ত হাদীসও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, যা ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত রুবায়্যি বিনতে মুআওবিয রা. থেকে বর্ণনা করেছেন :

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَة .

---

১৪. তাবঈনুল হাকাইক, খ. ২, পৃ. ২৬৮, মুদ্রণ : বূলাক; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৬০, মুদ্রণ : আত-তিজারিয়্যা, আল-কুবরা।

১৫. সূরা আল বাকারাহ, আয়াত : ২২৯-২৩০।

১৬. আবু-দাউদ, খ. ২, পৃ. ৬৬৯-৬৭০, সম্পা. ইযযাত উবাইদ দা'আস; তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৪৮২, সম্পা. : আল-হালাবী। ইমাম তিরমিযী (র.) উক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

www.amarboi.org

"তিনি নবী স. এর যুগে খুলা করেছিলেন। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ স. তাকে নির্দেশ দেন অথবা রাবী বলেছেন, তাকে এক হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়"।[১৭]

এ দু'টি হাদীস দ্বারা তারা এভাবে দলীল পেশ করেন যে, খুলা যদি তালাক হতো তাহলে মহানবী সা. এক হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিতেন না।[১৮]

যারা খুলা দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার মতামত দিয়েছেন, তারা এভাবে দলীল প্রদান করেন যে, খুলা এমন একটি শব্দ, যার অধিকার একমাত্র স্বামীই রাখে। সুতরাং তা তালাকই হবে। পক্ষান্তরে খুলা যদি ফসখ হতো তাহলে মোহর এর অতিরিক্ত অর্থের ক্ষেত্রের বৈধতা গ্রহণযোগ্য হতো না। যেমন 'ইকালা'। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ মোহরের চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক সেই সম্পদের মাধ্যমে খুলা করা বৈধ মনে করেন। অতএব বুঝা গেল খুলা তালাক।

তা ছাড়া এক্ষেত্রে স্ত্রী সম্পদ ব্যয় করে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই। আর স্বামী যে বিচ্ছেদ কার্যকরী করার অধিকার রাখে তা তালাকই, ফসখ নয়। সুতরাং খুলা তালাক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তালাক এর বিকল্প অস্পষ্ট (কিনায়া) শব্দ ব্যবহার করেছে, তাই খুলা তালাক হবে। যেমন তালাকের অন্যান্য অস্পষ্ট (কিনায়া) শব্দাবলির দ্বারা তালাক পতিত হয়।

তারা ঐ বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যা হযরত উমর রা., আলী রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে موقوف রূপে বর্ণিত হয়েছে যে, اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ খুলা তালাকে বায়েন।

এর অর্থ مبسوط এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তা ফসখ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। আর খুলা তো বিবাহচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরই হয়ে থাকে। তাই খুলা অর্থ হবে তৎক্ষণাত বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করা রূপক অর্থে। আর বৈবাহিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় শুধু তালাক দ্বারাই; তাই খুলা তালাকই হবে।

আর তারা যে আয়াত উল্লেখ করেছেন তার উত্তর হলো : মহান আল্লাহ্ অত্র আয়াতে বিনিময় ও বিনিময় ছাড়া উভয়ভাবে তৃতীয় তালাক-এর উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তালাকের সংখ্যা চারটিতে উন্নীত হয় না।

আর ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ সম্পর্কে যে বিরোধ উল্লেখ করা হয়েছে তার উত্তর হলো, তিনি পরবর্তীকালে এ মত প্রত্যাহার করেছেন।[১৯]

---

১৭. তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৪৮২, সম্পা. : আল-হালাবী, এটির সনদ শুদ্ধ।

১৮. নাইলুল আওতার, খ. ৭. পৃ. ৩৫,৩৮, মুদ্রণ : আল-জীল; তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৬৮, মুদ্রণ : বূলাক; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৪৩-১৪৪, মুদ্রণ : আছ-ছানিয়া; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

১৯. আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ১৭১-১৭২, মুদ্রণ : আস-সাআদাহ; তাবঈনুল হাকাইক, খ. ২, পৃ. ২৬৮, মুদ্রণ : বূলাক; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৯৬, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

www.amarboi.org

আর খুলা তালাক হওয়ার ওপর ভিত্তি করে এ মাসআলা নির্গত হয় যে, যদি স্বামী খুলা দ্বারা এক তালাকের বেশি নিয়ত করে তাহলে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে সে যা নিয়ত করবে তাই পতিত হবে। আর হানাফীদের মতে স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা খুলা কিনায়া শব্দের সমগোত্রীয় শব্দ। আর যদি সে দুই তালাকের নিয়ত করে তাহলে হানাফীদের মধ্যে ইমাম যুফার রহ. ছাড়া বাকি সকলের নিকট এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা খুলা এর মর্মার্থ হলো হারাম হওয়া। আর হারাম হওয়া তালাকের কোনো সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। তবে তিন তালাকের নিয়ত হলে সেটি কঠিন হারাম বুঝায় তাই বড় ধরনের বায়েন তালাক হিসেবে গণ্য করা হবে। আর খুলা ফসখ হওয়ার ওপর ভিত্তি করে এ মাসআলাও নির্গত হয় যে, কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে দুই বার খুলা করে, তারপর আবার একবার খুলা করে অথবা দুই তালাক দেয়ার পর খুলা করে তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য উক্ত নারীকে বিবাহ করা শুদ্ধ হবে যদিও একশতবার সে নারীর সাথে খুলা করে থাকে। কেননা এ অভিমত অনুসারে খুলাকে তালাকই গণ্য করা হয় না।[২০]

আর শাফেয়ীদের মতে খুলা ফসখ হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি খুলা দ্বারা তালাক কার্যকর করার নিয়ত করে তাহলে তালাক হবে কি-না, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারটির দু'টি অবস্থা হতে পারে :[২১]

ফিকহবিশারদগণ খুলা কি শুধু স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময় চুক্তি, না উভয়ের পক্ষ থেকে এবং খুলা কি শুধু স্বামীর পক্ষ থেকে শপথ (ইয়ামীন), না উভয়ের পক্ষ থেকে শপথ (ইয়ামীন) এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন।

ইমাম আবু হানাফী রহ. বলেন, খুলা স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময়চুক্তি, আর স্বামীর পক্ষ থেকে শপথ (ইয়ামীন)।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, খুলা উভয় পক্ষ থেকে শপথ (ইয়ামীন)। আর খুলা স্বামীর পক্ষ হতে শপথ হওয়ার কারণে সাব্যস্ত হয় যে, স্বামীর খুলা থেকে ফিরে আসা সহীহ নয় এবং স্বামীর জন্য خيار (গ্রহণ করা না করার স্বাধীনতা) এর শর্ত করাও শুদ্ধ হবে না। আর তা স্বামীর মজলিস-এর সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে না। অতএব স্বামী বসা অবস্থা থেকে দাড়ালে খুলা বাতিল হবে না। আর স্ত্রীর গ্রহণ করাটা সে যে মজলিসে অবগত হয়েছে তার উপরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

---

২০. আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ১৭২, মুদ্রণ : আস-সাআদাহ; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৪৩, মুদ্রণ : আছ-ছানিয়া; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৭৫, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৭ মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

২১. আর-রাওদা, খ. ৭, পৃ. ৩৭৫।

www.amarboi.org

খুলা স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময় চুক্তি এর ওপর ভিত্তি করে এ মাসআলা নিগর্ত হয় যে, স্বামী খুলা গ্রহণ করার পূর্বে স্ত্রীর জন্য সে চুক্তি প্রত্যাহার করা শুদ্ধ হবে এবং স্ত্রীর জন্য গ্রহণ-প্রত্যাখ্যানের শর্ত করা শুদ্ধ হবে যদিও তিন দিনের চেয়ে বেশি হয়। আর সেটি মজলিসের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়। আর স্ত্রীর তা গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো, তার অর্থ বুঝতে হবে। কেননা এটি ক্রয়-বিক্রয়ের মতো একটি বিনিময়। তালাক ও দাস মুক্তি এর বিপরীত।

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ এ মত পোষণ করেছেন যে, খুলা উভয় পক্ষ হতে বিনিময় চুক্তি। তবে শাফেয়ীগণ উল্লেখ করেছেন যে, খুলা তালাক, এ কথার ওপর ভিত্তি করে এটি এমন এক বিনিময় যার মধ্যে تعليق এর সংমিশ্রণ আছে। অর্থাৎ তার মধ্যে তালাক পতিত হওয়া সম্পদ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। আর খুলা ফসখ; এ কথার ওপর ভিত্তি করে এটি নিছক একটি বিনিময়, এর মধ্যে تعليق এর কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং এ অবস্থায় খুলা বিক্রয় চুক্তি সূচনার অনুরূপ হবে। আর এ অবস্থায় স্ত্রী খুলা গ্রহণ করার পূর্বেই স্বামীর জন্য তা প্রত্যাখ্যান করা শুদ্ধ হবে। কেননা সমস্ত বিনিময়ের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।

আর হাম্বলীগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, খুলার বিনিময় হলো মোহরের বিনিময়ের মতো, আর ক্রয়-বিক্রয় যদি পাত্র দিয়ে পরিমাপযোগ্য জিনিস কিংবা বাটখারা দিয়ে ওজনযোগ্য জিনিস হয় তাহলে স্বামীর ওপর তার দায়ভার বর্তাবে না এবং আয়ত্ত করা ছাড়া স্বামীর তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না। আর যদি তা কোনো পদ্ধতিতে ওযনযোগ্য বস্তু না হয় তাহলে শুধুমাত্র খুলা করার দ্বারাই তাতে স্বামীর ওপর দায়ভার বর্তাবে এবং তার মধ্যে স্বামীর হস্তক্ষেপও বৈধ হবে।[২২]

## নির্দেশিত বিধান

খুলা সর্বাবস্থায় বৈধ, তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর মিল থাকুক বা অমিল। অবশ্য ইবনুল মুনযির রহ. এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। শাফেয়ীগণ বলেন, মিল-অমিল উভয়াবস্থায় খুলা বৈধ। আর যদি বিরোধ অবস্থায় খুলা হয় বা স্ত্রী স্বামীর অসদাচরণের কারণে কিংবা অধার্মিকতার কারণে কিংবা কোনো অধিকার আদায়ে ত্রুটি করার কারণে স্ত্রী সমস্যা বোধ করে এড়িয়ে চলে, বা স্বামী-স্ত্রীকে শিষ্টাচার শেখাতে প্রহার করে তারপর স্ত্রী মুক্তিপণ দিয়ে খুলা করতে চায় তাহলে এসব অবস্থায় খুলা করা মাকরূহ হবে না। আর শাইখ আবু হামেদ এ সবের সাথে আরো যুক্ত করেছেন যে, যদি স্বামী-স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দেয়

২২. আল-ইনায়া. টীকা ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ১৯৯, মুদ্রণ : বূলাক; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৫৫৮-৫৫৯, মুদ্রণ : আল-মিসরিয়্যা; আশ-শারহুস সাগীর, বিহাশিয়া আস-সাবী, খ. ২, পৃ. ৫১৮, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৬৯, মুদ্রণ : আত-তুরাছুল আরাবী; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬৬, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

www.amarboi.org

বা অন্য প্রয়োজনাদি পূরণ না করে তারপর স্ত্রী তার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ দেয় তাহলে মাকরূহ হবে না।

আল্লামা কালয়ূবী রহ. বলেন, যদি স্বামী-স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয়া থেকে এজন্য বিরত থাকে যে, স্ত্রী বাধ্য হয়ে খুলা করবে তাহলে এটা জবরদস্তির পর্যায়ে গণ্য হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় সম্পদ ছাড়াই তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। রামলী রহ. বলেন, নির্ভরযোগ্য মত হলো, এটা বাধ্য করার পর্যায়ভুক্ত হবে না। আর মুগনী আল-মুহতাজ কিতাবে মাকরূহ হওয়া থেকে দু'টি অবস্থাকে বাদ দেওয়া হয়েছে : ১. যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা কোনো একজন বিবাহের হক আদায় করতে অপরাগ হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে খুলা করা মাকরূহ হবে না। ২. স্বামী যদি অত্যাবশ্যকীয় কাজের ওপর তিন তালাক দেয়ার শপথ করে যেমন সে বলে, 'আমি যদি খাবার খাই ও পানাহার করি এবং প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিই তাহলে তুমি তিন তালাক। তারপর স্বামী খুলা করে। অতঃপর যে কাজের শপথ করেছিল তা করে তারপর তাকে বিবাহ করে তাহলে স্বামীর শপথ ভঙ্গ হবে না, প্রথম কাজের দ্বারা শপথ ভঙ্গ হওয়ার কারণে। কেননা শপথ শুধু প্রথম কাজকেই অন্তর্ভুক্ত করে আর তা পাওয়া গেছে। আর স্বামী যদি খুলা করে এবং শপথকৃত কাজ না করে তাহলে তাতে দু'টি অভিমত রয়েছে : সর্বাধিক শুদ্ধমত হলো, সে শপথ থেকে নিস্কৃতি পাবে। তারপর সে যদি বিবাহের পর শপথকৃত কাজ করে তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা এ শর্তগুলো বিবাহের পূর্বে হয়েছে। ফলে বিবাহে এগুলো কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না। যেমন, বিবাহের পূর্বে তালাককে এমন কাজের ওপর সম্পৃক্ত করলো যা বিবাহের পরে পাওয়া যায় তাহলে এতে কোনো প্রভাব পড়বে না।[২৩]

খুলা বৈধ কিংবা মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো বন্ধনমুক্ত হওয়ার বিনিময়, যেমন সাবী কিতাবের টীকায় আছে। আর খুলাকে তালাক সাব্যস্ত করলে মৌলিক দৃষ্টিতে তা মাকরূহ কিংবা অনুত্তম হবে, রাসূল স. এর এ হাদীসের কারণে, أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল বস্তু হলো তালাক"।[২৪]

---

২৩. তাবঈনুল হাকাইক, খ. ২, পৃ. ২৭২, মুদ্রণ : বূলাক; আশ-শারহুস সাগীর হাশিয়া আস-সাবী, খ. ২, পৃ. ৫১৭-৫১৮, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৭, মুদ্রণ : আল-ফিকর; হাশিয়াতুল আদাবী আলার-রিসালা, খ. ২, পৃ. ১০২-১০৩, মুদ্রণ : মারিফা; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১২, মুদ্রণ : বূলাক; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৩৩, মুদ্রণ : আল-আরাবী; আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৬; রওদাতুত তালিবীন খ. ৭, পৃ. ৩৭২ আল-মাকতাবুল ইসলামী; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬২, মুদ্রণ : আত-তুরাছ।

২৪. আবু-দাউদ, খ. ২, পৃ. ৬৩১-৬৩২; সম্পা. ইজ্জত উবায়দ দা'আস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীস হতে আবু-হাতিম আর-রাযী 'ইলাল নামক গ্রন্থে এ হাদীসটিকে মুরসাল হওয়া সঠিক বলে অভিহিত করেছেন, খ. ১, পৃ. ৪৩১, মুদ্রণ : আস-সালাফিয়্যা।

www.amarboi.org

এ মতাবলম্বীগণ কুরআন, হাদীস, ইজমা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। যেমন আল্লাহর বাণী,

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا – وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"স্বামী-স্ত্রীর ওপর কোনো গোনাহ নেই স্ত্রী যে মুক্তিপণ দেয় তা গ্রহণ করতে"।[২৫] "স্ত্রীর যদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তোমাদেরকে কিছু দেয় তাহলে তৃপ্তি ও আনন্দ সহকারে তা ভক্ষণ করো"।[২৬]

হাদীস : বুখারী শরীফে সাবিত বিন কায়স রা.-এর স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً "বাগানটি গ্রহণ কর এবং তাকে এক তালাক দাও"।[২৭] এটিই ছিল ইসলামে সংঘটিত সর্বপ্রথম খুলা।[২৮] সমস্ত সাহাবী ও মুজতাহিদ খুলা বৈধ হওয়ার ওপর একমত পোষণ করেছেন।

ফকীহগণের যৌক্তিক দলীল হলো, বিবাহের মালিকানা হলো স্বামীর অধিকার। সুতরাং তার জন্য খুলার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে যেমন কিসাসের ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ বৈধ।[২৯]

আর হাম্বলীগণ উল্লেখ করেছেন, খুলা তিন প্রকার :

**১. বৈধ :** তাহলো স্ত্রী যদি স্বামীকে ঘৃণা করার কারণে তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে না চায় এবং স্বামীর প্রতি অনিহার কারণে তার অধিকার আদায়ে আশঙ্কা করে এবং স্বামীর আনুগত্যে থেকে আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে না পারে। তাহলে তার নিজেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ দেওয়া বৈধ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

২৫. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২২৯।

২৬. সূরা নিসা, আয়াত : ৪।

২৭. বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৯৫, মুদ্রণ : আস-সালাফিয়্যা; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত।

২৮. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারীতে আবু বকর ইবন দুরায়দ থেকে তার আমালী গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম খুলা হলো যা আমির ইবন হারি ইবনুজ-জারব ও তার চাচাতো বোনের মাঝে সংঘটিত হয়। ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৯৫-৩৯৮, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; নাইলুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৩৬-৩৭, মুদ্রণ : আল-জীল; আল-বায়হাকী আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৭, পৃ. ৩১৩-৩১৪, ১ম প্রকাশ।

২৯. তাবঈনুল হাকাইক, খ. ২, পৃ. ২৬৭, মুদ্রণ : বূলাক; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আত-তিজারিয়্যাহ; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬২, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; হাশিয়া আল-কালয়ুবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, সম্পা.: আল-হালাবী; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৬, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ৪৫৭, মুদ্রণ : সাদির; বুজায়রিমী আলী আল-খাতীব, খ. ৩, পৃ. ৪১১-৪১২, মুদ্রণ : আল-মারিফা; ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৯৫, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; নাইলুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৩৪, মুদ্রণ : আল-জীল।

www.amarboi.org

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

"তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবেনা তাহলে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই"।[৩০] এমতাবস্থায় স্বামীর জন্যও তার ডাকে সাড়া দেওয়া সুন্নাত। কেননা ইমাম বুখারী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রহ. থেকে বর্ণনা করেন, "হযরত ছাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী নবী কারীম স. এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি সাবিতের ধার্মিকতা বা তার চরিত্রের কোনো দোষ দিচ্ছি না, তবে আমি তার বিবাহে থাকলে কুফুরীর আশঙ্কা করছি। তারপর রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তাহলে তুমি তাকে তার বাগানটা ফিরিয়ে দাও, সে বলল, হ্যাঁ! অতঃপর সে সাবিতকে তার বাগান ফিরিয়ে দিল এবং রাসূলুল্লাহ স. ছাবিতকে নির্দেশ দিলেন, তখন ছাবিত রা. তা স্ত্রীকে ছেড়ে দেন"।[৩১]

তা ছাড়া স্ত্রী যদি বিচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করে অথচ স্ত্রী খুলার বিনিময় ছাড়া নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না, এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য খুলার বিনিময় দেয়া বৈধ করে দেয়া হয়েছে। তবে স্বামীর যদি স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা থাকে তাহলে স্ত্রীর ধৈর্যধারণ করা এবং মুক্তিপণ দিয়ে খুলা না করা উত্তম। ইমাম আহমাদ র. বলেন, স্ত্রীর জন্য ধৈর্যধারণ করা উচিত। আর কাজী বলেন, এটা মুস্তাহাব, তবে খুলা করা মাকরূহ হবে না। কেননা ফকীহগণ অসংখ্য জায়গায় তার বৈধতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

**২. মাকরূহ** : যেমন সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলা সত্ত্বেও কোনো কারণ ছাড়াই যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে খুলা করে। দলীল হযরত সাওবান রা. বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ ফরমান,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"যে নারী কোনো সমস্যা ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করবে তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণও হারাম"।[৩২] আর এ কারণেও যে, এ অবস্থায় খুলা করা অনর্থক, তাই তা মাকরূহ হবে, অবশ্য খুলা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

---

৩০. সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।

৩১. বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৯৫, মুদ্রণ : আস-সালাফিয়্যাহ।

৩২. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৬৬২, সম্পা. ইযযাত উবায়দ দাআস; আল-হাকিম, খ. ২, পৃ. ২০০, মুদ্রণ : দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যা। হাকিম ও ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, শব্দসমূহ আবু দাউদ এর।

www.amarboi.org

"স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করো"।[৩৩] আর ইমাম আহমদ র. এর মতে, খুলা হারাম ও বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কেননা তিনি সাহলা রা.-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, খুলা হলো স্ত্রী-স্বামীকে অপছন্দ করবে এবং তাকে তার মোহর পরিশোধ করে দিবে।[৩৪] এর কারণ আল্লাহ্ তাআলার বাণী,

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যে মোহর দিয়েছো তা থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না"।[৩৫]

**৩. হারাম** : যেমন : কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার জন্য অবরুদ্ধ করে রাখলো এবং অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে তার অধিকার বঞ্চিত করল যেন স্ত্রী মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। এমতাবস্থায় খুলা হারাম হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

"তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না"।[৩৬]

এ অবস্থায় স্বামী যদি বিনিময় নিয়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে স্বামী বিনিময় পাবে না। কেননা এ বিনিময় স্ত্রীকে বাধ্য করে নেয়া হয়েছে। সুতরাং সে তার অধিকারী হবে না। এবং এক তালাক রাজঈ কার্যকর হবে। আর যদি তালাক শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ দ্বারা খুলা করে তাহলে 'খুলা তালাক' এমত অনুযায়ী তার বিধান হলো, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা 'খুলা ফসখ' এমত অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

স্বামী যদি স্ত্রীকে ফরজ কাজ বর্জনের কারণে অথবা অবাধ্যতার কারণে শাসন করে। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী খুলা করে তাহলে হারাম হবে না। কেননা স্বামী ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকে প্রহার করেছে। আর স্ত্রী যদি ব্যভিচার করে তারপর স্বামী স্ত্রীকে অবরুদ্ধ রাখে যেন সে মুক্তিপণ দিয়ে খুলা করতে বাধ্য হয় তা জায়েয ও শুদ্ধ হবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

---

৩৩. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৪।

৩৪. আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৪১-১৪২, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৩, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৮২, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫১, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

৩৫. সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।

৩৬. সূরা আন নিসা, আয়াত : ১৯।



www.amarboi.org

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

"তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচার করে"।[৩৭] নিষিদ্ধ বিধানের ব্যতিক্রম বৈধ; যখন স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে কোনো সম্পদ কুক্ষিগতকরণের ইচ্ছা না করে আর এমতাবস্থায় স্ত্রী খুলা করে তবে খুলা শুদ্ধ হবে, কেননা সে স্ত্রীকে দেয়া কিয়দংশ নেয়ার জন্য অবরুদ্ধ করে রাখেনি।[৩৮]

হাম্বলীগণ একথাও উল্লেখ করেছেন, তালাকের শপথ রহিত করার জন্য কৌশলস্বরূপ যে খুলা করা হয় তা হারাম এবং সে খুলা সহীহ্ হবে না। কেননা কৌশল অবলম্বন করা ধোকা। যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন তা হালাল হতে পারে না।[৩৯]

ইবনুল মুনযির রহ. এর মতে খুলা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না, যতক্ষণ না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্বোতভাবে বিচ্ছিন্নতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী, إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ "যদি না তাদের মধ্যে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘনের আশঙ্কা হয়"[৪০] এর বাহ্যিক অর্থ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। ফকীহ্ তাউস, আশ-শাবী ও তাবেয়ীদের এক জামাত এমত অবলম্বন করেছেন। ইমাম তাবারীসহ্ একদল ফকীহ্ এর প্রতিউত্তরে বলেন, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্ত্রী যদি স্বামীর অধিকার আদায় না করে তাহলে তা স্বামীর ক্রোধের কারণ হবে। একারণেই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। স্বামীর পক্ষ থেকে আশঙ্কা না করার বিষয়টা রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা হযরত ছাবিত রা. এর স্ত্রী যখন ছাবিতকে অপছন্দ করার বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো তখনো রাসূলুল্লাহ্ স. ছাবিতকে একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে অপছন্দ করো কি-না। তদুপরি সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত অত্র আয়াতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সাথেই আশঙ্কার ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা প্রায় সময় ঝগড়া অবস্থায় খুলা সংঘটিত হয়। তা ছাড়া খুলা যেহেতু আশঙ্কা থাকা অবস্থায় বৈধ যখন স্ত্রী সম্পদ ব্যয়ে বাধ্য, তাহলে সন্তুষ্ট অবস্থায় তো আরো উত্তমভাবে বৈধ হবে।[৪১]

---

৩৭. সূরা আন নিসা, আয়াত : ১৯।

৩৮. আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৪৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৩, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৩৮৩-৩৮৫, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৪, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

৩৯. কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২৩১, মুদ্রণ : আন-নাসর।

৪০. সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।

৪১. ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৪০১, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; নাইলুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৩৮, মুদ্রণ : আল-জীল; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬২, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৭৪, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

www.amarboi.org

মালেকীগণ তাদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে সংঘটিত ক্ষতি দূর করার জন্য তার সাথে খুলা করে তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রদানকৃত অর্থ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদিও স্ত্রী সে প্রমাণ রহিত করে দেয় যে, স্ত্রী স্বামীর পক্ষ হতে ক্ষতি দূর করার জন্য খুলা করেছে।

**স্ত্রী থেকে বিনিময় গ্রহণ করার বৈধতা**

মালেকী ও শাফেয়ীগণ এমত অবলম্বন করেছেন যে, স্ত্রীকে বিচ্ছেদের বিনিময়ে স্বামী তার থেকে বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে। তাই সে বিনিময় স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত টাকার সমপরিমাণ হোক অথবা তার চেয়ে কম বা বেশি হোক। যতক্ষণ উভয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। তাই স্ত্রীর পক্ষ হতে বিনিময় দেয়া হোক বা অন্য কারো পক্ষ থেকে হোক। বিনিময় হুবহু মোহর হোক বা অন্য সম্পদ হোক, মোহরের চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক।[৪২]

হাম্বলীগণ এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, স্বামী যে পরিমাণ অর্থ স্ত্রীকে প্রদান করেছে তার থেকে বেশি অর্থ গ্রহণ করা পছন্দনীয় নয়; বরং স্বামী যদি স্ত্রীকে অবরুদ্ধ রেখে বিনিময় দিতে বাধ্য করে তাহলে স্ত্রীর থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হারাম হবে।[৪৩]

হানাফীগণ বিষয়টি এ ভাবে বিশ্লেষণ করে বলেন, স্বামীর পক্ষ থেকে যদি অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহার পাওয়া যায়, তাহলে স্ত্রীর কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমা হবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং কাউকে অঢেল সম্পদ দাও তাহলে তাদের থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না"।[৪৪] তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছেদের মাধ্যমে অর্থ সংকটে ফেলে দিয়েছে। এখন আবার তার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার অর্থসংকট আরো বাড়িয়ে দিবে না। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা পাওয়া যায় তাহলে স্ত্রী থেকে স্বামীর বিনিময় গ্রহণ করা মাকরূহ হবে না। আর বিনিময়ের বিষয়টি শর্তহীন হবার কারণে তা স্বামী প্রদত্ত সম্পদের থেকে কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। আল-জামিউস-সাগীর গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিনিময়ের সম্পদ স্বামী প্রদত্ত সম্পদ থেকে বেশি হলেও সমস্যা নেই। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

---

৪২. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫৬।

৪৩. আশ-শারহুস সাগীর, হাশিয়া আস-সাবী, খ. ২, পৃ. ৫১৭-৫১৮, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৭৪, মুদ্রণঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫২, আর-রিয়াদ।

৪৪. সূরা আন নিসা, আয়াত : ২০।

www.amarboi.org

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

"স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই।"[৪৫] ইমাম কুদূরী রহ. বলেন, অবাধ্যতা স্ত্রীর পক্ষ হতে যদি পাওয়া যায় তাহলে স্বামী যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশি অর্থ গ্রহণ করা মাকরূহ হবে, একথা মাবসূতে বর্ণিত হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ স. সাবিত ইবন কায়সের স্ত্রীর ক্ষেত্রে বলেছেন, যদি বিনিময় বেশি হয় তাহলে নিতে পারবে না।[৪৬] অথচ উক্ত ঘটনায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা পাওয়া গিয়েছিল। আর যদি বেশি সম্পদ গ্রহণ করে তাহলে দুনিয়ার বিচারে তা বৈধ হবে। অনুরূপভাবে স্বামীর পক্ষ হতে অবাধ্যতা পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও বিনিময় গ্রহণ করা হলে তা বৈধ হবে। কেননা ইতোপূর্বে যা উল্লেখ করা হলো, তার দাবিই হলো বিষয়টিকে মুবাহ-এর অন্তর্ভুক্ত করা। আর সাংঘর্ষিক থাকার কারণে মুবাহ-এর ওপর আমল বর্জন করা হয়েছে। সুতরাং অবশিষ্ট বিষয়ে তা আমলযোগ্য থাকবে।[৪৭]

## খুলা বিচারকের মাধ্যমেও বৈধ বিচারকের মাধ্যম ছাড়াও বৈধ

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, বিচারকের মাধ্যমে এবং বিচারকের মাধ্যম ছাড়া উভয় অবস্থায় খুলা জায়েয। এটা হযরত উমর রা. এর অভিমত। ইবনে আবু শাইবা খাইছামা ইবন আব্দুর রহমান থেকে মিলিত সনদে উল্লেখ করেছেন যে, বিশর ইবনে মারওয়ান এর কাছে জনৈক পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংঘটিত খুলার বিষয়টি উত্থাপন করা হলো; কিন্তু তিনি তা অনুমোদন দিলেন না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব খাওলানী তাকে বললেন, হযরত উমর রা.-এর নিকট খুলার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে অতপর তিনি তার অনুমোদন দিয়েছেন।[৪৮]

তাছাড়া যেহেতু তালাক বিচারকের মাধ্যম ও ফায়সালা ছাড়াই বৈধ সুতরাং অনুরূপভাবে খুলাও বৈধ হবে।

হাসান বসরী রহ. বলেন, বাদশাহর ফায়সালা ছাড়া খুলা বৈধ নয়। যেমনটি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

৪৫. সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।

৪৬. হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৪৭. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৬৯, মুদ্রণ : বুলাক; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ৮৩, মুদ্রণ : আল-উলা আল ইলমিয়্যা; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২০৩-২০৪, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা।

৪৮. ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ১৭৩, মুদ্রণ : আস-সাআদাহ; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৭, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৪৪, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৩, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫২, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৭২, সম্পা. আল-হালবী; বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৪৫, মুদ্রণ : আল-জুমালিয়্যা।

www.amarboi.org

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

"তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না তাহলে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃত পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই"।[৪৯]

এবং আল্লাহ্ তাআলার অপর বাণী :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

"তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার পরিবার হতে একজন এবং তার পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে"।[৫০]
তিনি বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা অভিভাবকদের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশঙ্কার কথা বলেননি।

## খুলার সময়

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হায়েয ও যে পবিত্র অবস্থার মধ্যে সঙ্গম হয়েছে তাতে এ উভয় অবস্থায় খুলা বৈধ। কেননা হায়েয অবস্থায় তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, ইদ্দতের দীর্ঘসূত্রিতা। আর খুলা বৈধ করা হয়েছে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দুর্ব্যবহার এবং তার অধিকার আদায়ে ত্রুটি করার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য। আর স্বামীর দুর্ব্যবহারজনিত ক্ষতি দূর করা ইদ্দত দীর্ঘ হওয়ার ক্ষতি দূর করার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব গুরুতর অনিষ্টকে লঘু অনিষ্ট দ্বারা দূর করা বৈধ করা হয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ স. খুলাকারিণীকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন নি। তাছাড়া ইদ্দত দীর্ঘ হওয়ার অনিষ্টতা স্ত্রীর নিজের আবেদনের প্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হয় অতএব তা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি বলে গণ্য হবে এবং স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পাবে।[৫১]

## খুলার রুকন ও তার শর্ত সম্পর্কে ফকীহ্গণের অভিমত

হানাফীগণ ছাড়া অন্যদের নিকট খুলার রুকন পাঁচটি ১. সংঘটক, ২. গ্রহণকারী, ৩. যার বিনিময় প্রদান করা হয়, ৪. বিনিময় ও ৫. খুলার শব্দ।

**সংঘটক :** খুলা সংঘটনকারী হলো স্বামী বা তার অভিভাবক, আর খুলা গ্রহণকারী হলো বিনিময় প্রদানকারী ব্যক্তি। যার বিনিময় প্রদান করা হয় তা হলো স্ত্রী সম্ভোগ। বিনিময় হলো যে বস্তু দ্বারা খুলা করা হয়। খুলার শব্দ হলো ঈজাব-কুবল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) এবং যে সকল শব্দ দ্বারা খুলা সংঘটিত হয়।

---

৪৯. সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।
৫০. সূরা আন নিসা, আয়াত : ৩৫।
৫১. আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৭২. সম্পা. : আল-হালাবী; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫২, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৩, মুদ্রণ : আন-নাসর।

www.amarboi.org

হানাফীদের মতে খুলার রুকন দুটি। যথা : ইজাব কবুল (প্রস্তাব গ্রহণ)। কেননা খুলা হলো বিনিময়ের পরিবর্তে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার চুক্তি। সুতরাং কবুল[৫২] ছাড়া বিচ্ছেদ কার্যকর হবে না এবং বিনিময়েরও অধিকারী হবে না। পক্ষান্তরে বিনিময়হীন খুলা এর ব্যতিক্রম। কেননা স্বামী যদি বলে, 'আমি তোমার সাথে খুলা করলাম', আর সে বিনিময়ের কথা উল্লেখ না করে এবং তালাকের নিয়ত করে তাহলে তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে; স্ত্রী গ্রহণ করুক বা না করুক। কেননা এটা হবে বিনিময়হীন তালাক। অতএব তা কবুল করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর ফকীহগণ প্রত্যেকটি রুকন এর জন্য কিছু শর্ত এবং বিধিবিধান উল্লেখ করেছেন, যা আমরা সামনে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

**প্রথম রুকন : সংঘটক**

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সংঘটক-এর জন্য তালাকের অধিকারী হওয়া শর্ত।[৫৩] এর বিস্তারিত বিবরণ তালাক শিরোনামে রয়েছে।

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ যাকে নিঃস্ব, নির্বুদ্ধিতা ও দাসত্বের কারণে লেনদেন করতে বারণ করা হয়েছে, তালাকের ওপর অনুমান করে এমন লোকদের খুলাকে জায়েয মনে করেন। কেননা এ সমস্ত লোকেরা তালাক সংঘটন করার অধিকার রাখে। অতএব খুলারও অধিকার রাখবে। হাম্বলীদের মতে মোটামুটি ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে এমন শিশুর খুলা জায়েয, তার তালাক প্রদানের সহীহ হওয়ার ওপর ভিত্তি করে। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ উল্লেখ করেছেন যে, খুলাকারীর জন্য নির্বোধ ব্যক্তির কাছে সম্পদ সোপর্দ করা জায়েয নয় বরং সে উক্ত সম্পদ নির্বোধের অভিভাবকের কাছে সোপর্দ করবে। কেননা অভিভাবকই তার পক্ষে সমস্ত পাওনা ও যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন করেন। হাম্বলী মতাবলম্বী কাজী এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বোধজ্ঞানসম্পন্ন

---

৫২. আশ-শারহুস সাগীর, আস সাবীর হাশিয়াসহ, খ. ২, পৃ. ৫১৭, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ, মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬৩, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; বুজায়রিমী আলী আল-খাতীব, খ. ৩, পৃ. ৪১২, আল-মারিফা; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৩-৩৯৫, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, সম্পা. হালাবী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৩-২৩১, মুদ্রণ : আন-নাসর।

৫৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৪৭, মুদ্রণ : আর-জুমালিয়্যা; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৫২, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আশ-শারহুস সাগীর আস-সাবীর হাশিয়াসহ, খ. ২, পৃ. ৫২৬, আল-মাআরিফ; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩২, মুদ্রণ : আল-মারিফা; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; বুজায়রিমী আলী আল-খাতীব, খ. ৩, পৃ. ৪১২, মুদ্রণ : আল-মারিফা; আসনাল-মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ২৪৪, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা;হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, সম্পা., আল-হালাবী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৩, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-মাবদা', খ. ৭, পৃ. ২২২, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৮৬-৮৭, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

www.amarboi.org

শিশুর জন্য বিনিময় করায়ত্ত্ব করা জায়েয। কেননা তার খুলা জায়েয। সুতরাং খুলার বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয। বিষয়টি সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে নিঃস্বতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন বারণ করা হয়েছে। তবে উত্তম হলো, নির্বোধের কাছে খুলার বিনিময় সমর্পণ না করা, যেমন মুগনী কিতাবে আছে। কেননা বারণ করার ফলে সমস্ত আর্থিক হস্তক্ষেপ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছে।[৫৪]

**দ্বিতীয় রুকন : গ্রহণকারী**

স্ত্রী বা অপরিচিত ব্যক্তি হতে খুলা গ্রহণকারীর জন্য শর্ত হলো, গ্রহণকারী লেনদেন করার অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে এবং কোনো জিনিস নিজের দায়িত্বে নেয়ার যোগ্য হতে হবে। অতএব স্বামী যদি তার অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর সাথে তার মোহরের বিনিময়ে খুলা করে তারপর অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী তা গ্রহণ করে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্কা তার স্বামীকে বলে, 'তুমি আমার মোহরের বিনিময়ে খুলা কর'। তারপর স্বামী খুলা করলো তাহলে কোনোরূপ বিনিময় ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই তালাক সংঘটিত হবে। যেমন : হানাফী ও শাফেয়ীগণ এমন একটি অবস্থার বর্ণনা করেছেন। যদি বিনিময়দাতা বোধজ্ঞানহীন হয় তাহলে স্বামী তার প্রদত্ত অর্থ ফিরিয়ে দিবে এবং স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে, যতক্ষণ না স্বামী স্ত্রীর খুলাকে এ কথার সাথে শর্তযুক্ত করবে যে, "এ সম্পদ যদি আমার জন্য নেয়া সম্পন্ন হয়, তাহলে তুমি তালাক"। অথবা স্বামী বলবে, "যদি তোমার সম্পর্কচ্ছেদ সঠিক হয় তবে তুমি তালাক"। যেমনটা মালেকীগণ উল্লেখ করেছেন। এ সকল অবস্থায় অভিভাবক বা প্রশাসন যদি স্বামীর পক্ষ থেকে সম্পদ ফিরিয়ে দেয় তাহলে তালাক হবে না। পক্ষান্তরে অভিভাবক বা বিচারক যদি বুদ্ধিমতী নারী বা বুদ্ধিমান পুরুষকে বলে অথবা তালাক সংঘটিত হওয়ার পর বলে তাহলে তা কোনো উপকারে আসবে না।

হাম্বলীগণ বলেন, অপ্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কারণে বা নির্বুদ্ধিতার কারণে কিংবা পাগলামির কারণে যে নারীকে লেনদেন করতে নিষেধ করা হয়েছে তার খুলা শুদ্ধ হবে না। যদিও অভিভাবক তার অনুমতি দেয়। কেননা, এটা সম্পদের কারবার। আর উক্ত ব্যক্তি সম্পদের লেনদেনের উপযুক্ত নয় এবং অতিরিক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি ধর্তব্য নয়।

আর নিঃস্বতার কারণে যে নারীর ওপর লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার খুলা বৈধ। কেননা তার নিজ জিম্মায় লেনদেন করা বৈধ। যেমনটি বলেছেন

৫৪. আশ-শারহুস সাগীর হাশিয়া-আস-সাবীসহ, খ. ২, পৃ. ৫২৬-৫২৭, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩২, মুদ্রণঃ আল-মারিফা; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৩, মুদ্রণ : মাকতাবুল ইসলামী; হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৭-৩০৮, সম্পা. : আল-হালাবী; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ২৪৪-২৪৫, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৮৭, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

www.amarboi.org

হাম্বলীগণ। পুরুষের জন্য এমতাবস্থায় তার কাছে সম্পদ চাওয়ার অধিকার নেই। যেমন নারী কারো কাছ থেকে তার জিম্মায় কোনো ধার নিল অথবা কেউ মূল্য তার যিম্মাদারিতে রেখে তার কাছে কোনো কিছু বিক্রি করল আর এমতাবস্থায় নারী যে বস্তুর বিনিময়ে খুলা করেছে, তা তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকবে। নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিলে বা নারী ধনী হয়ে গেলে তার থেকে উক্ত পাওনা আদায় করা হবে। আর যদি স্ত্রী তার সুনির্দিষ্ট সম্পদের বিনিময়ে খুলা করে তাহলে, তার সাথে পাওনাদারদের অধিকার জড়িত হওয়ার কারণে তা শুদ্ধ হবে না।[৫৫]

## মুমূর্ষু অবস্থায় বা বিপজ্জনক অসুস্থায় খুলার বিধান

### (ক) স্ত্রীর অসুস্থতা :

বিপজ্জনক অসুস্থ নারীর জন্য তার অসুস্থ অবস্থায় স্বামীর সাথে খুলা করা সকল ফকীহ-এর দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায়ই বৈধ। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় খুলা একটি বিনিময় চুক্তি। তবে কি পরিমাণ টাকা-পয়সা স্বামী উক্ত অবস্থায় স্ত্রী থেকে নিতে পারবে সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

হানাফীগণ বলেন, রুগ্ণ স্ত্রীর এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে খুলা ধর্তব্য হবে। কেননা খুলা একটি অতিরিক্ত কাজ। তাই স্বামী সর্বনিম্ন উত্তরাধিকার পাবে। আর খুলার বিনিময় যদি এক তৃতীয়াংশ থেকে হয়ে যায় তাহলে তো হলো নতুবা উত্তরাধিকারের সর্বনিম্ন অংশ পরিমাণ পাবে। আর স্ত্রী যদি ইদ্দতের মধ্যে মারা যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর হবে। আর যদি ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর মারা যায় অথবা মিলনের পূর্বেই মারা যায় তাহলে স্বামী খুলার বিনিময় পাবে যদি তা এক তৃতীয়াংশ থেকে হয়।[৫৬]

শাফেয়ীগণ বলেন, খুলার বিনিময় যদি মোহরে মিছাল পরিমাণ হয় তাহলে তা কার্যকর হবে, এক তৃতীয়াংশ ত্যাজ্য সম্পদ ধর্তব্য হবে না। আর যদি মোহরে মিছাল এর থেকে বেশি হয় তাহলে স্বামী বেশিই পাবে। অতিরিক্ত অংশটুকু

---

৫৫. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২১৮, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা; বাদায়ে উস-সানায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৪৭, মুদ্রণ; আল-জুমালিয়্যা; আশ-শারহুস সাগীর, হাশিয়া আস-সাবীসহ, খ. ২, পৃ. ৫১৯, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১২, মুদ্রণ : বুলাক; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮, মুদ্রণ : আল-ফিকর; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৪-৩৮৮, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৮; সম্পা. আল-হালাবী; আসনাল-মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ২৪৫-২৪৭, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৪-২১৫, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-মাবদা, খ. ৭, পৃ. ২২৩-২২৬, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

৫৬. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৫৭০, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা; বাদায়েউস-সানায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৪৯, মুদ্রণ : আল-জুমালিয়্যা; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ৮১-৮২, মুদ্রণ : আল-উলা আল-ইলমিয়া; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৬০, মুদ্রণ : আল-মারিফা।

www.amarboi.org

স্বামীর জন্য ওসিয়াত-এর ন্যায় হবে এবং বর্ধিত অংশ এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ধর্তব্য হবে। আর এটা উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়ত করার ন্যায় হবে না। কেননা খুলা দ্বারা স্বামী উত্তরাধিকার থেকে বেরিয়ে গেছে। আর স্ত্রী যদি এমন একটি উটের বিনিময়ে খুলা করে যার মূল্য একশত দিরহাম আর মোহরে মিছালের পরিমাণ হলো পঞ্চাশ দিরহাম। তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সে তার স্বামীকে অর্ধেক উটের দ্বারা সহায়তা করেছে। এমতাবস্থায় দেখতে হবে এ সহায়তা যদি এক তৃতীয়াংশ থেকে বেশি হয় তাহলে পুরো উটটিই তার স্বামীর জন্য হবে বিনিময় ও ওসিয়ত স্বরূপ।

শায়খ আবু হামেদ একটি পন্থা বর্ণনা করেছেন যে, এমতাবস্থায় স্বামী ইচ্ছা করলে উটটি নিতে পারবে অথবা চুক্তি রহিত করে মোহরে মিছাল নিতে পারবে। কেননা স্বামী উটের বিনিময়ে এ চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। বস্তুত প্রথম মতটাই শুদ্ধ। কেননা তাতে কোনো ঘাটতি ও লোকসান নেই। আর যদি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কম হয় এভাবে যে, স্ত্রী এমন ঋণী যা তার পুরো সম্পদ গ্রাস করে নেয় তাহলে স্বামীর প্রতি আনুকূল্য সহীহ হবে না। আর স্বামীর স্বাধীনতা থাকবে, চাইলে অর্ধেক উট নিতে পারবে, যা মোহরে মিছাল-এর সমপরিমাণ এবং লোকসানে সে সন্তুষ্ট থাকবে অথবা ধার্যকৃত পরিমাণ রহিত করবে এবং মোহরে মিছাল পাওনাদারগণ পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নেবে। আর যদি স্ত্রীর আরো ওসিয়ত থাকে, তাহলে স্বামী চাইলে অর্ধেক উট নিতে পারবে এবং বাকি অর্ধেক ওসিয়তকৃতগণ নিজদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে নেবে। আর যদি ধার্যকৃত পরিমাণ রহিত করতে চায় তাও পারবে এবং ওসিয়তকৃতদের পূর্বেই মোহরে মিছাল নিতে পারবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর ওসিয়তের মধ্যে স্বামীর কোনো অংশ থাকবে না। কেননা ওসিয়ত বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত। আর রহিত করার দ্বারা বিনিময় উঠে গেছে।[৫৭]

হাম্বলীগণের মতে যে পরিমাণ সম্পত্তির মধ্যে খুলা হয়েছে স্বামী তাই পাবে। যদি তা তার মীরাস-এর সমপরিমাণ হয় অথবা তা থেকে কম। আর যদি বেশি হয় তাহলে সে ধার্যকৃত পরিমাণ এবং মীরাস হতে যা সর্বনিম্ন তাই পাবে। কেননা এর মধ্যে কোনো সংশয় নেই। পক্ষান্তরে সে মীরাস ও ধার্যকৃত বিনিময়ের মধ্যে যেটা বেশি তা পাবে না। কেননা যদি মীরাস থেকে বেশি টাকায় খুলা করে তাহলে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, স্ত্রী কোনো বিনিময় ছাড়াই অবৈধভাবে স্বামীকে অধিক অর্থ দানের ইচ্ছা করেছে। আর যদি মীরাস থেকে কম হয় তাহলে স্বামী যেহেতু নিজের অধিকার রহিত করে দিয়েছে তাই

---

৫৭. রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৭, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আসনাল-মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ৩৪৭, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

www.amarboi.org

সে সর্বনিম্নটাই পাবে। আর যদি স্ত্রী সেই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে যতটুকু সম্পত্তি দ্বারা খুলা করেছে সে পরিমাণই স্বামী পাবে, যেমন সুস্থ অবস্থায় পায়। কেননা এটা মুমূর্ষু অবস্থা নয়।[৫৮]

মালেকীগণ এমত অবলম্বন করেছেন যে, অসুস্থ স্ত্রীর জন্য খুলা করা বৈধ, যদি খুলার বিনিময় স্বামীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওনা পরিমাণের সমান হয় বা তার চেয়ে কম হয় আর স্ত্রী মারা যায়। আর তারা একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে না। এটা আল্লামা ইবনুল কাসিম উল্লেখ করেছেন। আর যদি খুলার টাকার পরিমাণ বেশি হয় যেমন স্বামী উত্তরাধিকার সূত্রে দশ দিরহাম প্রাপ্য হয়, আর খুলা করলো পনেরো দিরহামের বিনিময়ে অথবা সব সম্পদের বিনিময়ে তাহলে স্বামীর জন্য তা হারাম হবে, স্ত্রীকে হারামের ওপর সহায়তাদানের কারণে এবং তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তবে তারা একে অন্যের ওয়ারিস হবে না যদি স্বামী সুস্থ থাকে। আর স্ত্রী যদিও ইদ্দতের মধ্যে মারা যায়।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, স্ত্রী যদি মুমূর্ষুও অবস্থায় তার পূর্ণ সম্পদ দ্বারা খুলা করে আর স্বামী সুস্থ থাকে তাহলে খুলা বৈধ হবে না এবং স্বামী স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হবে না। বাহ্যত ইবনুল কাসিমের অভিমত ইমাম মালেকের বিরোধী নয় যেমন অধিকাংশ মাশায়েখ বলেছেন।

আর স্বামী উত্তরাধিকার সূত্রে যে পরিমাণ সম্পত্তি পাবে তার চেয়ে অতিরিক্ত অংশ স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিবে। আর সে অতিরিক্ত অংশ স্ত্রীর মৃত্যুর দিনেরটা ধর্তব্য হবে, খুলার দিনের নয়। এমতাবস্থায় যে পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে খুলা করা হয়েছে মৃত্যু পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। যদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিমাণ তার থেকে কম হয় তাহলে তা স্বামীই পাবে। যদি বেশি হয় তা ফিরিয়ে দিবে। তারপর স্ত্রী যদি সুস্থ হয় খুলা সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং যে পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে খুলা করেছে তা পুরোই স্বামী গ্রহণ করবে। যদিও তা স্ত্রীর পুরো সম্পদ হয়। তবে সর্বাবস্থায় কেউ কারো উত্তরাধিকারী হবে না।[৫৯]

### (খ) স্বামীর অসুস্থতা

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মুমূর্ষু স্বামীর খুলা বৈধ এবং তা কার্যকর হবে ধার্যকৃত পরিমাণ অনুযায়ী। ধার্যকৃত সম্পদ মোহরে মিছালের সমান হোক বা তা থেকে কম হোক। কেননা স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বিনিময় ছাড়া তালাক প্রদান করতো তাহলে তা শুদ্ধ হতো। তাই স্বামী কর্তৃক বিনিময় আদায় করে খুলা

---

৫৮. আল-মাবদা', খ. ৭, পৃ. ২৪৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২২৮, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৮৮-৮৯, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

৫৯. আশ-শারহুস সাগীর আস সাবীর হাশিয়াসহ, খ. ২, পৃ. ৫২৮-৫২৯, মুদ্রণ : আল-মা'রিফা।

www.amarboi.org

করলে আরো উত্তমভাবে শুদ্ধ হবে। তা ছাড়া স্বামীর খুলা দ্বারা কোনো উত্তরাধিকারী বঞ্চিত হয় না। এক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি তুলনীয় হবে সেই ব্যক্তির সাথে, যে যোদ্ধা যুদ্ধে সারিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে অথবা এমন ব্যক্তি যাকে হত্যার দায়ে বা ডাকাতির জন্য আটক করা হয়েছে। যেমন মালেকীগণ উল্লেখ করেছেন। তবে তারা বলেছেন, মুমূর্ষু অবস্থায় খুলার সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ নয়। কেননা এতে একজনকে উত্তরাধিকার থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে আর তাদের কেউ কারো উত্তরাধিকারী হবে না তাই স্বামী ইদ্দতের মধ্যে মারা যাক বা তার পরে মারা যাক। এতে মালেকীদের ভিন্নমত আছে। কেননা তাদের মতে অসুস্থ অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে, যদি স্বামী উক্ত রোগে মারা যায় রোগে সে তার স্ত্রীর সাথে খুলা করেছে। যদিও তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় এবং অন্য ব্যক্তির কাছে বিবাহ বসে বা একাধিক বিবাহও যদি ইতোমধ্যে হয়ে যায়। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর সেই মুমূর্ষু অবস্থায় মারা যায়, যার মধ্যে তাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে তাহলে স্বামী স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হবে না, যদিও স্ত্রী অসুস্থ থাকে। কেননা স্বামীই তার নিজের অধিকার রহিত করেছে। আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যদি স্বামীর পক্ষ হতে তার মুমূর্ষ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে খুলা করে, যে মুমূর্ষু অবস্থায় স্বামী মারা গেছে তাহলেও স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী হবে, যদিও সে ইদ্দত পালনরত থাকে, যেমনটি হানাফীগণ উল্লেখ করেছেন। কেননা স্ত্রী উক্ত তালাকে সন্তুষ্ট নয়। ফলে স্বামীকে পলায়নকারী গণ্য করা হবে। আর স্বামী যদি স্ত্রী যে পরিমাণ সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে সে পরিমাণ বা তার চেয়ে কম সম্পদ স্ত্রীর জন্য ওসিয়ত করে তাহলে তা সহীহ্ হবে, যেমনটি হাম্বলীগণ উল্লেখ করেছেন।

কেননা তখন এ অপবাদ দেয়ার অবকাশ নেই যে, স্বামী তার স্ত্রীকে উক্ত সম্পদ দেয়ার জন্য ওসিয়ত করেছে। কেননা স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক নাও দিত তাহলেও স্ত্রী উক্ত সম্পদ তার মীরাস হিসেবে পেত। আর যদি উত্তরাধিকার সূত্রে যে পরিমাণ সম্পত্তি পাবে তার চেয়ে বেশি ওসিয়ত করে তাহলে উত্তরাধিকারীদের জন্য বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে। কেননা তখন অপবাদ দেয়া হবে যে, স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে সম্পত্তি দিতে চেয়েছে। কেননা স্বামীর অধীনে থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে তা পৃথকভাবে দেয়ার কোনো পথ নেই। অতএব একারণে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। যেমন কেউ উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়ত করল।[৬০] এটা যেমন নিষেধ অনুরূপভাবে উক্ত পদ্ধতিও নিষিদ্ধ হবে।

---

৬০. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ৮২, মুদ্রণ : আল-উলা আল-ইলমিয়া; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৫২-৩৫৩, মুদ্রণ : আল-ফিকর; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩২-৩৩৩, মুদ্রণ : আল-মারিফা; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৫২৭-৫২৮, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৮, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী;

www.amarboi.org

**অভিভাবকের খুলা**

মালেকীদের মতে শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য নয় যথা শিশু বা পাগল এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে অভিভাবকের জন্য খুলা করা বৈধ। অভিভাবক স্বামীর পিতা হোক বা ওসী, বিচারক বা স্বামীর প্রতিনিধি হোক। তবে খুলা স্বামীর মঙ্গলের জন্য হতে হবে। আর ইমাম মালেক ও ইবনুল কাসিম রহ. এর মতে শিশু ও পাগলের অভিভাবকের জন্য বিনিময় ছাড়া তাদের স্ত্রীকে তালাক দেয়া বৈধ নয়। ইবনে আরাফা হযরত লাখমী থেকে কল্যাণের কারণে তা বৈধ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। কেননা কখনো বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখলে অনিষ্টতা হতে পারে।

নির্বোধের অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে খুলা করতে পারবে না। কেননা আইনে স্বামীরই একমাত্র তালাক দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, যদিও সে নিবোর্ধ হয় বা কৃতদাস হয়। পিতার হাতে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের কোনো ক্ষমতা নেই। সুতরাং ওসী বা বিচারক মোটেও নির্বোধের পক্ষ থেকে তার স্ত্রীর সাথে খুলা করতে পারবে না এটাই বেশি যুক্তি যুক্ত।[৬১]

আর হাম্বলীগণের মতে যে ব্যক্তির জন্য তালাক প্রদান করা শুদ্ধ তার জন্য খুলা করাও শুদ্ধ। মালিকানার মাধ্যমে হোক বা ওকালতির মাধ্যমে হোক অথবা অভিভাবক হবার মাধ্যমে হোক। যেমন বিরোধপূর্ণ অবস্থায় বিচারক খুলা করতে পারে।[৬২]

আর হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে পিতার জন্য তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের স্ত্রীর সাথে খুলা করা অথবা তাকে তালাক দেয়া বৈধ নয়।[৬৩] বিনিময়ে হোক বা বিনিময় ছাড়া হোক। কেননা রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন :

الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ। "তালাক তার অধিকার, দেহ যার অধিকারে থাকে"।[৬৪]

আর ইমাম আহমাদ র. এর এক বর্ণনা যা কাজী ও তার অনুসারিগণ সমর্থন করেছেন এবং মাবদা-এর রচয়িতা সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাহলো : পিতা তার

---

আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ২৪৮, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২২৯, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-মাবদা, খ. ৭, পৃ. ২৪৩-২৪৪, আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৮৯, মুদ্রণ: আর-রিয়াদ।

৬১. আশ-শারহুস সাগীর আস-সাবীর হাশিয়াসহ, খ. ২, পৃ. ৫২৬-৫২৭, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩২, মুদ্রণ : আল-মারিফা; মাওয়াহিবুল জালীল মাআত তাজ ওয়াল-ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬, মুদ্রণ : আন-নাজাহ।

৬২. কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৩, মুদ্রণ : আন-নাসর।

৬৩. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ১, পৃ. ৫৬৮-৫৬৯, মুদ্রণ : আল-মিসরিয়্যা; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৭২, সম্পা. : আল-হালাবী; আল-মাবদা', খ. ৭, পৃ. ২২৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৮৮, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

৬৪. ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৬৭২, সম্পা. আল-হালাবী; হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। আল্লামা বূসীরী এর সনদ দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

www.amarboi.org

সন্তানের স্ত্রীকে তালাক দেয়া বা খুলা করার অধিকার রাখেন। কেননা হযরত ইবনে উমর রা. তার এক নির্বোধ ছেলের বউকে তালাক প্রদান করেছেন। তা ছাড়া পিতার জন্য তার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে বিবাহ করানো যেহেতু বৈধ, সেহেতু তার জন্য ছেলের পক্ষ থেকে ছেলের বউকে তালাক প্রদান করা ও শুদ্ধ হবে। তবে শর্ত হলো, পিতা অভিযুক্ত না হতে হবে। যেমন বিচারক দরিদ্রতার কারণে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারেন এবং ছোট ছেলেকে বিবাহ করাতে পারেন।[৬৫]

আর পিতা যদি তার অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার খুলা করে তার সম্পদ দ্বারা, তাহলে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে তা জায়েয হবে না। কেননা এতে কন্যার কোনো মঙ্গল নেই। যেমন হানাফীগণ উল্লেখ করেছেন। কেননা এখন তার যৌনাঙ্গ মূল্যহীন আর বিনিময় হলো মূল্যবান। পক্ষান্তরে বিবাহ তার ব্যতিক্রম। কেননা স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় যৌনাঙ্গ মূল্যবান হবে। একারণেই মুমূর্ষু নারীর খুলা তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কার্যকর করা হবে। আর অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তার সমুদয় সম্পত্তি থেকে মোহরে মিছাল-এর বিনিময়ে বিবাহ কার্যকর করা হবে।

তা ছাড়া পিতা কর্তৃক অপ্রাপ্তবয়স্কা নারীর খুলা করার দ্বারা তার মোহর, ভরণ-পোষণ, সম্ভোগ সব কিছুর অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর যখন পিতা কর্তৃক খুলা বৈধ বিবেচনা না করা হবে তখন মোহর এর অধিকার রহিত হবে না। এবং স্বামী তার সম্পদের হকদার হবে না। মুহাযযাব গ্রন্থের বর্ণনামতে খুলা যদি মিলনের পরে হয়ে থাকে তাহলে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া বৈধ হবে। আর হানাফীদের মতে তালাক হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে দুইটি অভিমত আছে, যেগুলোর উৎস হলো ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহ. এর উক্তি। তিনি কিতাবে বলেছেন, لم يجز 'জায়েয হবে না'। কেননা উক্ত ক্রিয়ার মধ্যেকার সর্বনামটি তালাক এর দিকে ফিরতে পারে এবং সম্পদ অবশ্যিক হওয়ার দিকেও ফিরতে পারে। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। এতে বিশুদ্ধ মত হলো, তালাক হয়ে যাবে। আর নাজায়েয হবার বিষয়টি সম্পদ আবশ্যক হবার সাথে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং সম্পদ দেওয়া বৈধ হবে না। এটা মুনতাকা কিতাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কেননা পিতার কথাই কন্যার কথা।

আর মালেকীগণের মতে, জবরদস্তি করার অধিকারসম্পন্ন অভিভাবক যেমন পিতা-তার অধীনস্তের সম্পত্তি দিয়ে তার অনুমতি ছাড়া খুলা করতে পারবে যদিও তার সমুদয় সম্পত্তি লাগে। আর যার জবরদস্তি করার অধিকার নেই যেমন কারো ওসি, তার জন্য তার সম্পত্তি দিয়ে তার অনুমতি ছাড়া তার পক্ষে খুলা করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী অনুমতি দিলেও পারবে না।

---

৬৫. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৮৭-৮৮, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; আল-মাবদা', খ. ৭, পৃ. ২২৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

www.amarboi.org

আর হাম্বলীগণের এক অভিমত, 'মাবদা' গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, যদি সেই ওসী নারীর মঙ্গল মনে করে তাহলে তার জন্য বৈধ। যেমন এমন ব্যক্তির হাত থেকে মেয়েটিকে নিষ্কৃতি দেয়া, যে ব্যক্তি তার সম্পদ ধ্বংস করে ফেলবে এবং যদি আশঙ্কা হয় যে, সে উক্ত মেয়ের জান ও মালের সর্বনাশ ঘটাবে। আর পিতা ও অন্য ব্যক্তি এক্ষেত্রে সমান যখন তারা পাগল নারী, নির্বুদ্ধিতার কারণে বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে লেনদেন করতে নিষিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ থেকে খুলা করবে। মোটকথা যখন তার সম্পদ থেকে খুলা করবে তখন তা জায়েয হবে। এ বিষয়টি শারহ ও অন্যান্য গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যখন অপরিচিত ব্যক্তিই যখন তা করতে পারবে তখন অভিভাবক তো আরো উত্তম ভাবে পারবে।[৬৬]

**তৃতীয় ব্যক্তির খুলা**

তৃতীয় ব্যক্তির খুলার ক্ষেত্রে ফকীহগণের দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে :

**প্রথমত :** হানাফীদের মতে শুদ্ধ ও বৈধ। তবে শর্ত হলো খুলার বিনিময়কে নিজের দিকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করবে যা তার জিম্মায় থাকার কথা বুঝায় কিংবা তার মালিকানা বুঝায়। যেমন বলবে, 'আমি তার সাথে খুলা করছি এক হাজারের বিনিময়ে যা আমার উপরে রয়েছে'। অথবা 'আমি তার জিম্মাদার'। অথবা এই দুই হাজারের বিনিময়ে'। আর যদি সাধারণভাবে খুলা করে এবং বলে 'আমার ওপর এক হাজার আবশ্যক'। অথবা বলে, 'আমার ওপর এই উটটি দেয়া আবশ্যক' এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তা কবুল করে তাহলে স্বামীকে তা সোপর্দ করা স্ত্রীর জন্য জরুরী হবে। আর যদি হুবহু তা সোপর্দ করতে অক্ষম হয় তাহলে তার মূল্য দিবে। আর যদি অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে, যেমন : "অমুকের উটের বিনিময়ে"। অমুকের তা কবুল করা জরুরী।

আর এ পদ্ধতি মালেকীদের নিকটও বৈধ। তাই তৃতীয় ব্যক্তি কোনো মঙ্গল লাভের ইচ্ছায় তা করুক বা অনিষ্ট প্রতিহত করার ইচ্ছায় করুক। কিংবা স্বামী থেকে স্ত্রীর ভরণপোষণ রহিত করার ইচ্ছায় করুক। যেমন জাহেরুল-মুদাওয়ানাতে আছে। তবে মালেকী মাযহাবের ইবনে আব্দুস সালাম র. তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্তারোপ করেছেন। তাহলো, তৃতীয় ব্যক্তি স্বামী থেকে স্ত্রীর ইদ্দতকালীন খোরপোষ রহিত করার ইচ্ছায় এমনটি করতে পারবে না। আর

---

৬৬. ফাতহুল কাদীর আল-ইনায়াসহ, খ. ৩, পৃ. ২১৮, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়া; তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৩, পৃ. ২৭৩-২৭৪, মুদ্রণ : বুলাক; আল-বিনায়া, খ. ৪, পৃ. ৬৮৩-৬৮৪, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১৩, মুদ্রণ : বুলাক; আশ-শারহুস সাগীর আস-সাবীর হাশিয়াসহ, খ. ২, পৃ. ৫২০, মুদ্রণ : আল-মাআরিফ; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৭২, সম্পা. : আল-হালাবী; আল-মাবদা, খ. ৭, পৃ. ২২৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল-ইসলামী; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৪৪, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৮৩-৮৪, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

www.amarboi.org

যদি স্ত্রীর ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ রহিত করতে এরকম করে তাহলে সে ব্যাপারে তিনটি মত বর্ণনা করা হয়েছে :

(ক) স্ত্রীকে সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তালাক বায়েন পতিত হবে। আর ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ রহিত হয়ে যাবে। এটাই যাহেরে মুদাওয়ানাতে বর্ণিত হয়েছে এবং ফকীহ্ বারযালী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

(খ) বিনিময় ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং রাজয়ী তালাক পতিত হবে। আর তার ভরণপোষণ রহিত হবে না। এ অভিমত ইবনে আব্দুস সালাম মালেকী ও ইবনে আরাফা গ্রহণ করেছেন।

(গ) বায়েন তালাক পতিত হবে এবং ভরণপোষণ রহিত হবে না। একই বিধান প্রযোজ্য হবে সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে বিবাহ্ করার জন্য বিনিময় ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছে।

শাফেয়ীদের মতেও তৃতীয় ব্যক্তির খুলা বৈধ। তাই তালাক শব্দ দ্বারা হোক বা খুলা শব্দ দ্বারা হোক। অতএব তাদের মতে এ কথার ওপর ভিত্তি করে তৃতীয় ব্যক্তির খুলা শব্দগত ও বিধানগতভাবে স্ত্রীর খুলা করার ন্যায়।

অধিকাংশ হাম্বলী মাযহাবের মতেও তৃতীয় ব্যক্তির খুলা বৈধ। তা শুদ্ধ হওয়া স্ত্রীর কবুল করার ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তি আবশ্যিক করে নেয়া স্ত্রীর জন্য ফিদইয়াস্বরূপ হবে। যেমন মনিব কর্তৃক দাসকে আযাদ করার জন্য সম্পদ আবশ্যক করে নেয়া। কখনো কখনো তৃতীয় ব্যক্তির এ ক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। যেমন স্ত্রীকে এমন স্বামীর জুলুম থেকে নিস্কৃতি দেয়া; যে তার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং তাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

**দ্বিতীয়ত :** তৃতীয় ব্যক্তির খুলা শুদ্ধ নয়। এ মত পোষণ করেছেন আবু সাওর এবং সে সকল শাফেয়ী ও হাম্বলী, যারা খুলাকে ফসখ বলে অভিহিত করেছেন। আবু সাওর রহ. প্রমাণ পেশ করেন যে, তৃতীয় ব্যক্তি এমন বস্তুর বিনিময়ে সম্পদ ব্যয় করেছে যাতে তার কোনো লাভ নেই। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের কিছু ফকীহ্ দলীল দিয়েছেন যে, কোনো কারণ ছাড়া ফসখ স্বামী এককভাবে করতে পারে না। সুতরাং তার কাছে খুলা চাওয়া শুদ্ধ হবে না।[৬৭]

---

৬৭. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫৬৯, মুদ্রণঃ আল-মিসরিয়্যা; তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৭৪, মুদ্রণ : বুলাক; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ১০১, মুদ্রণ : আল-উলা আল-ইলমিয়্যা; নাতায়েজুল আফকার, খ. ৩, পৃ. ২২১, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা; শারহুয যুরকানী, খ. ৪, পৃ. ৬৪-৬৫, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১২, মুদ্রণ : বুলাক; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩০, মুদ্রণ : আল-মারিফা; শারহুল মিনহাজ,

www.amarboi.org

**খুলার ক্ষেত্রে উকীল নিযুক্ত করা**

ফকীহগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে অর্থ বা কোনো একজনের পক্ষ থেকে খুলার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। এ সম্পর্কে সাধারণ বিধান হলো, যে সকল ব্যক্তি নিজে খুলা করতে পারে তার জন্য উকিল নিযুক্ত করা এবং উকালতি করা উভয়টিই জায়েয। সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী, মুসলমান হোক যা কাফির, নিবোর্ধ হোক বা বুদ্ধিমান। কেননা তাদের প্রত্যেকের জন্যই খুলা করা জায়েয। সুতরাং তারা উকীল ও উকীল নিযুক্তকারী উভয়ই হতে পারবে। বাহরুর রায়েক-এ ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান থেকে বর্ণিত : শিশু ও নির্বোধের পক্ষ থেকে জ্ঞানি, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে খুলার জন্য নিযুক্ত করা সহীহ। শাফেয়ীগণ বলেন, নারীর উকীল নির্বোধ হতে পারবে না। এমনকি অভিভাবক অনুমতি দিলেও নির্বোধ উকীল হতে পারবে না। তবে সম্পদ যদি নারীর আয়ত্তাধীন করা হয়, তাহলে নারী পৃথক হয়ে যাবে এবং সে অর্থ কড়ি নারীকে পরিশোধ করতে হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

শাফেয়ীদের মতে লেনদেনে বারণকৃত ব্যক্তিকে খুলার বিনিময় গ্রহণের জন্য উকিল নিযুক্ত করাও জায়েয নেই। যদি কেউ তাকে উকীল নিযুক্ত করে এবং সে টাকা গ্রহণ করে, এ সম্পর্কে 'তাতিম্মা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, খুলাকারী দায় মুক্ত হয়ে যাবে আর উকীল নিয়োগকর্তা তার সম্পদ নষ্টকারী বিবেচিত হবে। শাইখাইন তা বহাল রেখেছেন।

এ বিষয়ে অধিক শুদ্ধ হলো, তাদের মতে পুরুষ কোনো নারীকেও তার স্ত্রীর খুলার জন্য উকীল বানাতে পারে। কেননা স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে "তুমি তোমাকে তালাক দাও" তাহলে সে নিজের ওপর তালাক প্রয়োগ করতে পারে। আর এটাতো তাকে তালাকের অধিকারী বানানো বা উকীল নিযুক্ত করার নামান্তর।

দ্বিতীয় মত হলো, নারীকে উকীল নিযুক্ত করা শুদ্ধ নয়। কেননা সে স্বতন্ত্রভাবে তালাক প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে না। আর স্ত্রী যদি কোনো নারীকে খুলার উকীল নিযুক্ত করে তাহলে তা সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয; কেননা নারী স্বতন্ত্রভাবে খুলা করার ক্ষমতা রাখে।

হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ব্যতীত সকলের মতে একই ব্যক্তি উভয়ের পক্ষে খুলার উকিল হতে পারবে না। শাফেয়ীগণ বলেন, উভয়পক্ষের খুলার

---

খ. ৩, পৃ. ৩২১, সম্পা. আল-হালাবী; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ২৬০-২৬১, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৪২৭-৪৩০, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৪০৯-৪১২, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৭৬-২৭৭, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; আল-মাবদা, খ. ৭, পৃ. ২২৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৪৪, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

www.amarboi.org

উকীল স্বামী-স্ত্রী কোনো একজনের অথবা তার উকীলের প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষমতা পাবে, প্রস্তাব ও গ্রহণ উভয়টি করতে পারবে না যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। হাম্বলীদের মাযহাব, মুহাম্মদ রহ. এর মত এবং শাফেয়ীদের এক অভিমত হলো, উক্ত ব্যক্তি প্রস্তাব ও গ্রহণ উভয়টিই করতে পারবে, বিবাহের ওপর অনুমান করে। আর তা ছাড়া খুলা কোনো এক পক্ষ থেকে বলাই যথেষ্ট। যেমন স্বামী বলল, "তুমি যদি আমাকে এক হাজার টাকা দাও তাহলে তুমি তালাক" অতঃপর স্ত্রী-স্বামীকে উক্ত টাকা দিল তাহলে খুলা তালাক হয়ে যাবে।

হানাফীদের মতে খুলার উকিল মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার কারণে অপসারিত হবে না।[৬৮] বস্তুত নারী তিনটি ক্ষেত্রে উকীল নিযুক্ত করতে পারে : খুলার আবেদনের ক্ষেত্রে; তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে; বিনিময় ধার্য করা এবং তা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে পুরুষও তিন ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করতে পারে : বিনিময়ের শর্তের ক্ষেত্রে; তা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে এবং তালাক অথবা খুলা সংঘটন করার ক্ষেত্রে।

বিনিময় ধার্য করা হোক বা না হোক উভয় ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা যায়। কেননা এটা একটি বিনিময় চুক্তি, তাই তা শুদ্ধ হবে, যেমন বিবাহ ও ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে। তবে বিনিময়ের পরিমাণ ধার্য করে নেয়া মুস্তাহাব। কেননা তাতে ধোকা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এবং উকীলের জন্য সহজ হয়, তার চিন্তা-গবেষণার আর প্রয়োজন হয় না।[৬৯]

স্বামী বা স্ত্রীর উকীল নিযুক্ত করাও দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয় :
**প্রথমত :** বিনিময় ধার্য করা যেমন একশত টাকা।
**দ্বিতীয়ত :** কোনো পরিমাণ ধার্য না করে কাউকে উকীল নিযুক্ত করা। যেমন শুধুমাত্র খুলার জন্য উকীল বানানো। আর স্বামী বা স্ত্রী দুই জনের উকীলের জন্য

---

৬৮. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ১০২, মুদ্রণ : আল-উলা আল-ইলমিয়া; হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩১১-৩১২, সম্পা. : আল-হালাবী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২৩০, মুদ্রণ : আন-নাসর।

৬৯. নাতায়েজুল আফকার, খ. ৩, পৃ. ২২১, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা; তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৭৫, মুদ্রণ : বুলাক; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ১০২, মুদ্রণ : আল-উলা আল-ইলমিয়া; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৪, মুদ্রণ : আল-মারিফা; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫৫, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আশ-শারহুস-সাগীর, খ. ২, পৃ. ৩০৩, মুদ্রণ : মাদানী; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৭৫, সম্পা. আল-হালাবী; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৯১, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩১১-৩১২, সম্পা. আল-হালাবী; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ২৪৯, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৫৬-১৫৭, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২২৯-২৩০, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-মাবদা, খ. ৭, পৃ. ২৪৪-২৪৫, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৪১৯-৪২০, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৯০-৯৩, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।



www.amarboi.org

উচিত হবে তারা তাদের মক্কেলের কল্যাণ যাতে হয় তাই করবে। অতএব স্বামীর উকিল ধার্যকৃত পরিমাণ কমাবে না বরং বাড়াতে পারলে বাড়াবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর উকীলেরও একই কর্তব্য। কেননা তার ওপর অত্যাবশ্যক হলো স্ত্রীর ধার্যকৃত পরিমাণ না বাড়ানো যদি ধার্যকৃত পরিমাণ কমাতে পারে তাহলে কমানোর চেষ্টা করবে। আর যদি কোনো পরিমাণ ধার্য না করা হয় তাহলে স্বামীর উকীলের উচিত মোহরে মিছালের কমে খুলা না করা; বরং তার চেয়ে বেশি ধার্য করা এবং উক্ত অবস্থায় স্ত্রীর উকীলেরও উচিত মোহরে মিছালের বেশি দ্বারা খুলা না করা।

## খুলাকারিণীর ইদ্দত

জমহুর ফকীহগণ তথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদের মাযহাব মতে, খুলাকারিনীর ইদ্দত হলো তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতের মত। এটিই সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব, সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, উমর ইবন আব্দুল আযীয, হাসান, শা'বী, নাখয়ী, যুহরী প্রমুখের অভিমত।

ইমাম আহমদ র.-এর এক অভিমত হলো, খুলাকারিণীর ইদ্দত হবে এক হায়েয। হযরত উসমান ইবনে আফফান রা., ইবনে উমর রা., ইবনে আব্বাস রা. আবান ইবনে উসমান, ইসহাক, ইবনুল মুনযির প্রমুখ থেকে এমনটিই বর্ণিত আছে।

এক হায়েযের প্রবক্তারা ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

أنَّ امْرَأَةَ ثَابت بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه ثَابتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

হযরত ছাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী তার থেকে খুলা করেন। তারপর নবী কারীম স. তার ইদ্দত এক হায়েয সাব্যস্ত করেন।[৭০]

যারা খুলাকারিণীর ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত বলেছেন, তারা আল্লাহ তাআলার বাণী, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "তালাকপ্রাপ্তাগণ তিন কুরূ পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে" কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।[৭১] তাছাড়া খুলা হলো স্বামী স্ত্রীর সহবাসের পর বিচ্ছিন্নতা, তাই ইদ্দত তিন হায়েয হবে যেমন খুলা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[৭২]

---

৭০. হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৭১. সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৮।

৭২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৬৯, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা; তাবয়ীনুল হাকাইক, খ. ৩, পৃ. ২৬, মুদ্রণ : বুলাক; আদ-দাসূকী মাআশ-শারহিল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৪৬৮, মুদ্রণ :

www.amarboi.org

**তৃতীয় রুকন : যার বিনিময় দেয়া হয় তথা নারীর যৌনাঙ্গ**

তৃতীয় রুকনের শর্ত সম্পর্কে শাফেয়ীদের আর রাওজা নামক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে : নারীর যৌনাঙ্গ স্বামীর মালিকানাধীন হতে হবে। অতএব, যে নারী খুলা দ্বারা বা অন্য কিছু দ্বারা তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা হয়েছে তার খুলা সহীহ নয়। আর মালিকীদের নিকট খুলার শর্ত হলো, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা। সুতরাং স্ত্রী যদি খুলার সময় তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা হয় তাহলে খুলা হবে না। কেননা এ অবস্থায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই; এমতাবস্থায় স্ত্রী-স্বামীকে যে সম্পদ দিয়েছে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এতে স্ত্রী তার সন্তানকে দুধ পান করানো বা গর্ভকালীন খোরপোষ বা প্রতিপালন সংশ্লিষ্ট যদি কোনো দায়িত্ব স্ত্রী তার জিম্মায় নিয়ে থাকে তা রহিত হয়ে যাবে।

আর ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, খুলা শুধু সেই স্ত্রীর সাথে সহীহ হবে, যে স্বামীর বৈবাহিক বন্ধনে রয়েছে; তা প্রকৃত হোক যেমন যে নারী তালাকে বায়েন বা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে পৃথক হয়ে যায়নি যেমন লিআন। অর্থ বা বিধানগতভাবে হোক, যেমন যে নারীকে তার স্বামী রাজয়ী তালাক প্রদান করেছে অথচ তার ইদ্দত এখনো সমাপ্ত হয়নি। কেননা সে তখনো স্ত্রীই আছে। তার মাঝে ও তার স্বামীর মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল আছে এবং স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত বিশেষ বিধানসমূহ তার ওপর কার্যকর হবে।

তাই ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি স্বামী ইন্তেকাল করে তাহলে স্ত্রী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। আর স্বামী যদি বলে 'আমার সকল স্ত্রী তালাক' তাহলে সেই স্ত্রীও তালাকপ্রাপ্তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যে ইদ্দতরত অবস্থায় রয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে এমন স্ত্রীর উপরে তালাক পতিত হবে। তবে হাম্বলীদের মধ্যে খারকী বলেন, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামীর জন্য হারাম। কেননা বাহ্যত তাই বুঝায়। মুগনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, স্বামী এক তালাক, না তিন তালাক প্রদান করেছে তা যদি তার জানা না থাকে তাহলে স্বামীর জন্যে স্ত্রী হারামের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায় কিন্তু হালালের ক্ষেত্রে সংশয় থাকে। আর ইমাম আহমাদ র. থেকেও এমনটাই বর্ণিত হয়েছে। হাম্বলীদের জাহেরী মাযহাব মতে, এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রী মুবাহ যেমনটি কাযী বর্ণনা করেছেন।

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যে খুলা করে তাহলে মালেকীগণের মতে তা সহীহ হবে। আর স্ত্রী স্বামীকে যে সম্পদ দিয়েছে তা

---

আল-ফিকর; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৬৫, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৪৯-৪৫০, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; আল-ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ২৭৯, মুদ্রণ : আত-তুরাছ।

www.amarboi.org

তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না এবং এর দ্বারা স্বামী স্ত্রীর ওপর আরো একটি বায়েন তালাক দিয়ে দিল। শাফেয়ীদের সর্বাধিক সুস্পষ্ট মতেও তা বৈধ এবং খারকী ছাড়া সমস্ত হাম্বলীরাও এমত গ্রহণ করেছেন। কেননা সে এখনো স্ত্রী হিসেবেই আছে। অতএব তাকে তালাক দেয়া সহীহ হবে। সুতরাং তার সাথে খুলা করাও সহীহ হবে, যেমন তালাকের পূর্বে খুলা করা সহীহ।

শাফেয়ীদের এক অভিমত অনুযায়ী বিনিময় দেয়ার প্রয়োজন না থাকায় রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খুলা করা সহীহ নয়। আর শাফেয়ীদের দ্বিতীয় অভিমত, যা ইমাম নববী র. 'রাওজা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কেউ কেউ বলেন, "তালাকে রাজয়ীপ্রাপ্তা স্ত্রীর খুলা করা সহীহ; তৃতীয় তালাকের দ্বারা যাতে বড় বায়েন অর্জিত হয়, দ্বিতীয় তালাকের দ্বারা নয়। হানাফীগণ বলেন, রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তাকে তালাক দেওয়া যায়, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তার সাথে খুলা করাও সহীহ। কেননা তাদের অভিমত হলো, খুলাও তালাক। এ কথার ওপরই তাদের ফাতওয়া।[৭৩]

**চতুর্থ রুকন : বিনিময়**

বিনিময় হলো ঐ সম্পদ যা স্ত্রী থেকে খুলার পরিবর্তে স্বামী গ্রহণ করে। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব অনুযায়ী সাধারণ নিয়ম হলো, বিনিময় মোহর হওয়ার যোগ্য হওয়া। কেননা যা মোহর হতে পারে তা খুলার বিনিময়ও হতে পারে।[৭৪]

---

৭৩. আল-ইনায়া ফাতহুল কাদীর এর টীকা, খ. ৩, পৃ. ১৭২, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫৩৬-৫৩৭, মুদ্রণ : বুলাক; আল-বিনায়া ফী শারহিল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৬১১-৬১২, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ৬০, মুদ্রণ : আল-উলা আল-ইলমিয়া; তাবঈনুল হাকাইক, খ. ২, পৃ. ২৫৬, মুদ্রণ : বুলাক; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৩০৪, মুদ্রণ : আল-মাদানী; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ২১, মুদ্রণঃ বুলাক; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৪, মুদ্রণ : আল মারিফা; আদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫৬; মুদ্রণ : আল ফিকর; শারহুয-যুরকানী, খ. ৪, পৃ. ৭৫, মুদ্রণ : আল-ফিকর; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৮, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ২৪৮, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬৫, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৯০-৩৯১, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; হাশিয়াতুল কালযূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৯, সম্পা. : আল-হালাবী; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ৪৬৮, মুদ্রণ : আল-মায়মানিয়্যা; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৭৯, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ২২৮, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-মাবদা', খ. ৭, পৃ. ৩৯৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

৭৪. আল-বিনায়া ফি শারহিল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৬৬৯-৬৭০, মুদ্রণ : আল-ফিকর; নাতাইজুল-আফকার, খ. ৩, পৃ. ২০৭, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা; তাবঈনুল হাকাইক, খ. ২, পৃ. ২৬৯, মুদ্রণ : বুলাক; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৩৩, মুদ্রণ : আল-আরাবী; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১৩, মুদ্রণ : বুলাক; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৮, মুদ্রণ : আল-ফিকর;

www.amarboi.org

খুলার বিনিময় নির্দিষ্ট সম্পদ বা বর্ণিত কোনো বস্তু হতে পারে এবং স্ত্রীর প্রাপ্য স্বামীর ওপর ঋণও হতে পারে, যার দ্বারা সে নিজেকে স্বামী থেকে ছাড়িয়ে নিবে। কোনো লাভজনক কর্মও হতে পারে, যেমন নিজের গর্ভজাত অথবা অন্যের থেকে হওয়া স্বামীর সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনিময়ে খুলা করলো, সময়সীমা ও মূল্য নির্দিষ্ট করে, যেমন মালেকী ও শাফেয়ীগণ উল্লেখ করেছেন। বা অনির্দিষ্টও হতে পারে যেমন হাম্বলীগণ উল্লেখ করেছেন। চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় যদি দুগ্ধদানকারিণী মহিলা ইন্তেকাল করে অথবা শিশুটি মারা যায় অথবা মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর দুধ শুকিয়ে যায় তাহলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বামী ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। কেননা তা নির্দিষ্ট বিনিময় যা করায়ত্ত করার পূবেই খোয়া গেছে। অতএব তার মূল্য ফেরত দেয়া স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হবে অথবা অনুরূপ বস্তু আবশ্যক হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে এক কাফীয বস্তুর বিনিময়ে খুলা করল; কিন্তু তা করায়ত্ত করার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গেল। তাহলে স্বামী ন্যায্য টাকা পাবে।[৭৫]

খুলার বিনিময়স্বরূপ স্ত্রীকে তার বাসস্থান থেকে বের করে দেয়া বৈধ নয়, যে বাসস্থানে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে। কেননা ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাতে অবস্থান করা আল্লাহর হক। কারো জন্য তা রহিত করা বৈধ নয়; বিনিময় দ্বারা হোক বা বিনিময় ছাড়া হোক। আর স্ত্রী বায়েন হয়ে যাবে, স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুই পাবে না, যেমন মালেকীগণ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তারা স্ত্রী তার সম্পদ দ্বারা ইদ্দতকালীন বাসস্থানের ভাড়া বহন করার বিষয় বাদ দিয়েছেন। কেননা তা বৈধ। এ মাসআলায় শাফেয়ীগণ উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রী বাসস্থান পাবে, আর স্বামী মোহরে মিছাল পাবে।[৭৬]

---

আসহালুল- মাদারিক, খ. ২, পৃ. ১৫৮, সম্পা., আল-হালাবী; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৯, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৫২, মুদ্রণ : আল -মাকতাবুল ইসলামী; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৭৪, সম্পা., আল-হালাবী; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬৫, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৯১, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; বুজায়রামী আলী আল-খাতীব, খ. ৩, পৃ. ৪১৪, মুদ্রণ : আল-মারিফা; হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৩০৯-৩১০, সম্পা., আল-হালাবী; আল-মাবদা, খ. ৭, পৃ. ২২৯, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৮, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৫২, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

৭৫. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ২৯৮, মুদ্রণ : আল-মাদানী; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ২২, মুদ্রণ : বুলাক; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫৭, মুদ্রণ : আল-ফিকর; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৯৯, আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৫৬, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৬৪-৬৫, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

৭৬. আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১৫, মুদ্রণ : বুলাক; আয-যুরকানী, খ. ৪, পৃ. ৬৮, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫০, মুদ্রণ : আল-ফিকর; মুগনী আল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬৫, মুদ্রণ : আত-তুরাছ।

www.amarboi.org

ফকীহগণ এও উল্লেখ করেছেন যে, খুলার বিনিময় যদি নির্দিষ্ট হয়, জ্ঞাত হয়, সম্পদ হয় এবং সোপর্দযোগ্য হয় তাহলে খুলা সহীহ বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ায় বিনিময় যদি ফাসিদ হয়, যেমন বিনিময় অনির্দিষ্ট হলো বা সম্পদ না হয় বা হস্তান্তরযোগ্য জিনিস না হয়, তাহলে খুলা ফাসিদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। মতানৈক্যের কারণ হলো, এ ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত হওয়া যে, খুলার বিনিময় কি বিক্রয়ের বিনিময়ের মত নাকি হিবাকৃত বস্তুর মতো, না অসিয়তকৃত বস্তুর মত। অতএব যারা একে বিক্রয় চুক্তির সাথে তুলনীয় মনে করেন, তারা বিক্রয়ের মধ্যে যা শর্ত এখানেও তদ্রূপ শর্তারোপ করেছেন। আর যারা একে হিবার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেন তারা কোনো শর্তারোপ করেননি।[৭৭]

খুলার বিনিময়ের বিধান দু'টি মাসআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ : ১. অজ্ঞাত, অস্তিত্বহীন ও ধোঁকার বিনিময়ে অথবা যে জিনিস হস্তান্তরযোগ্য নয় তার বিনিময়ে খুলা করা।

হানাফীদের মতে অজ্ঞাত বস্তু দ্বারা খুলা করা বৈধ। কেননা তাদের মতে খুলা হলো রহিতকরণ। বস্তুত তা শর্তযুক্ত করা এবং সম্পূর্ণ বিনিময়মুক্ত হওয়াও বৈধ। আর খুলা এমন জিনিস যার মধ্যে উদারতা প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং অজ্ঞাত বস্তুর দ্বারা, অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খুলা করা বৈধ। এই মূলনীতির ভিত্তিতে স্ত্রী তার জমির ফসলের ওপর এবং তার চতুষ্পদ জন্তুতে আরোহন করার ওপর এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে এমনভাবে খেদমত করার ওপর যার দ্বারা স্বামীর সান্যিধ্যে একাকী যাওয়া আবশ্যক হয় না অথবা অপরিচিত ব্যক্তির সেবার ওপর খুলা করা বৈধ। কেননা এসব কাজ মোহর হওয়ার যোগ্য।[৭৮]

মালেকীদের মতেও অজ্ঞাত ও ধোঁকার সম্ভাবনাময় বস্তু দ্বারা খুলা করা বৈধ। সুতরাং তাদের মতে স্ত্রীর উটনীর গর্ভে থাকা বাচ্চার বিনিময়ে খুলা করা বৈধ। অনুরূপভাবে পলায়নকারী কিংবা ভবঘুরে দাসের বিনিময়ে এবং অপরিপক্ক ফলের বিনিময়ে, অথবা এমন জন্তু বা আসবাবপত্রের বিনিময়ে যার সুনির্দিষ্ট পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি, অথবা অনির্দিষ্ট মেয়াদে খুলা করা বৈধ। আর যে বস্তুর ওপর খুলা হয়েছে তার মধ্যম মানের জিনিস স্বামীকে বিনিময় হিসাবে দেয়া আবশ্যক। সাধারণত মানুষ যা দ্বারা খুলা করে তার মধ্যম মানের বস্তু নয়। আর এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। আর যে গর্ভের বাচ্চার ওপর খুলা করা হয়েছে, সে বাচ্চা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে স্বামী কিছুই পাবে না। কেননা এটিই নির্দিষ্ট করা। আর তালাক বায়েন হবে।[৭৯]

---

৭৭. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৫৮, আত-তিজারিয়্যা।

৭৮. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২০৭, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়্যা।

৭৯. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, খ. ২৩৩, মুদ্রণ : আল-আরাবী; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১৩, মুদ্রণ : বুলাক; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৪৮, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আসহালুল-

www.amarboi.org

হাম্বলীদের জাহেরী মাযহাবমতে অজ্ঞাত বিনিময়ের দ্বারাও খুলা সহীহ হবে এবং যে জিনিসের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে এমন জিনিস দ্বারাও খুলা করা তাদের দৃষ্টিতে সহীহ। কেননা, তালাক এমন কর্ম যা কোনো শর্তাধীন করা জায়েয। সুতরাং অজ্ঞাত বিনিময়ের দ্বারাও তা বাস্তবায়ন করা জায়েয হবে ওসিয়তের ন্যায়। আর তাছাড়া, খুলা হলো স্বামীর জন্য স্ত্রীর যৌনাঙ্গের অধিকার রহিত করা। এক্ষেত্রে কোনো জিনিসের মালিক বানানোর কোনো বিষয় নেই। আর স্ত্রীর যৌনাঙ্গের অধিকার রহিতকরণের মধ্যে উদারতার বিষয় নিহিত থাকে। ফলে এক বর্ণনায় কোনো বিনিময় ছাড়াই খুলা জায়েয় বলা হয়েছে।[৮০]

শাফেয়ীদের মতে অজ্ঞাত বিনিময়ের মতোই যে ক্ষেত্রে ধোকা রয়েছে তা দ্বারা খুলা বৈধ নয়। অজ্ঞাত বিনিময় দ্বারা কিংবা এমন বিনিময় যার অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে তাতে খুলা বৈধ না হওয়ার বক্তব্যটি মূলত হাম্বলী মতাবলম্বী ফকীহ আবু বকর র.-এর। অনুরূপ অনুমান করেন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। আবু মুহাম্মদ আল-জাওযী এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

শাফেয়ীদের মতে অজ্ঞাত বিনিময়ের দ্বারা খুলা করার উদাহরণ হলো হারাম বস্তু দ্বারা খুলা করা। অথবা এমন জিনিস যা স্বামীর পরিপূর্ণ মালিকানায় আসেনি। অথবা এমন বিনিময় যা হস্তান্তরযোগ্য নয়। বস্তুত তাদের দৃষ্টিতে বিবাহ ও ক্রয় বিক্রয়ের মতো উল্লেখিত অবস্থাগুলোতে খুলা সহীহ হবে না। কারণ এটিও একটি বিনিময় চুক্তি।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলোর বিনিময়ে যদি খুলা করে তবে শাফেয়ীদের মতে মহরে মিছালের দ্বারা স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কোনোভাবে বিনিময় নষ্ট হলে মোহরে মিছালই কার্যকর হয়।[৮১]

**পঞ্চম রুকন : খুলার শব্দ**

খুলার শব্দ হলো ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ)।

খুলা যদি বিনিময়ের দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহলে হানাফীদের নিকট ইজাব ও কবুল খুলার রুকন। খলা'র সূচনা যদি স্বামীর পক্ষ থেকে বিনিময়সূচক শব্দের দ্বারা করা হয় যেমন স্বামী বলল, "আমি তোমার সাথে এতো এর বিনিময়ে খুলা

---

মাদারিক, খ. ২, পৃ. ১৫৮, সম্পা. আল-হালাবী; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ২২; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২২, মুদ্রণ : আন-নাজাহ; আল-মুদাওয়ানা, খ. ২, পৃ. ৩৩৮, মুদ্রণ : আল-মিসরিয়্যা।

৮০. আল-মাবদা, খ. ৭, পৃ. ২৩৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

৮১. আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৭৪, সম্পা. : আল-হালাবী; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬৫, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; আল-মাবদা, খ. ৭, পৃ. ২৩৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২২২, মুদ্রণ : আন-নাসর; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৫৩, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী।

www.amarboi.org

করলাম"। তাহলে শাফেয়ীগণের মতে শর্ত হলো, যে কথা বলতে সক্ষম সে কবুল শব্দ উচ্চারণ করবে এবং বোবার পক্ষ থেকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দ্বারা কবুল করতে হবে। অথবা উভয়ের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে কবুল হতে হবে। আরো শর্ত হলো, ইজাব ও কবুলের মধ্যে অপর কোনো ব্যক্তি যার থেকে জবাব চাওয়া হয় তার অধিক কথা প্রতিবন্ধক না হওয়া। কারণ তার দ্বারা ইজাব কবুলের প্রতি বিরূপ মনোভাব বুঝায়। তবে অল্প কথা অথবা যার থেকে জবাব চাওয়া না হয় তার অধিক কথায় কোনো সমস্যা নেই। আরো শর্ত হলো, কবুল প্রস্তাব অনুযায়ীই হতে হবে।

যদি ইজাব ও কবুলের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, যেমন স্বামী বলল, "আমি তোমাকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে তালাক দিলাম" কিন্তু স্ত্রী দুই হাজার টাকার বিনিময়ে তা কবুল করল। কিংবা এর বিপরীত যেমন স্বামী বলল, "আমি তোমাকে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে তালাক দিলাম"। স্ত্রী এক হাজার টাকার বিনিময়ে কবুল করল। কিংবা স্বামী বলল, "আমি তোমাকে এক হাজার এর বিনিময়ে তিন তালাক দিলাম" আর স্ত্রী এক হাজার এর এক তৃতীয়াংশের বিনিময়ে এক তালাক কবুল করল। তবে উল্লিখিত তিনটি মাসআলায় ইজাব ও কবুলের মধ্যে পার্থক্যের কারণে অর্থহীন ও অকার্যকর হয়ে যাবে। যেমনটি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়।

আর স্বামী যদি এমন শব্দ দ্বারা খুলার সূচনা করে, যেসব শব্দ একটা ইতিবাচক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত; যেমন যখন, যখনই, যে সময় বা ওই সময় অথবা বলে, "এমন সময় যখন তুমি আমাকে এই পরিমাণ অর্থ দিবে" তাহলে এমতাবস্থায় শাব্দিকভাবে কবুল করার শর্ত প্রযুক্ত হবে না। কেননা, উল্লিখিত শব্দাবলি শাব্দিক কবুলের শর্ত দাবী করে না এবং ঘটনাস্থলেই তৎক্ষণাৎ বিনিময় পরিশোধের ব্যাপারটিও আবশ্যক হয় না। এর বিপরীতে স্বামী যদি নেতিবাচক অর্থবহ কোনো শব্দের সাথে সম্পৃক্ত করে খুলার সূচনা করে, যেমন স্বামী যদি বলে, "যখন তুমি আমাকে এই পরিমাণ অর্থ দেবে না তখন তুমি তালাক" এমতাবস্থায় বিনিময় তাৎক্ষণিকভাবেই পরিশোধ করতে হবে।

অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে যখন স্ত্রী স্বামীকে বলবে, "তুমি যখন আমাকে তালাক দেবে তখন আমার কাছে তুমি হাজার টাকা প্রাপ্য হবে।" এমন শব্দের জবাব স্বভাবতই তাৎক্ষণিক বিনিময় পরিশোধ করা বুঝাবে।[৮২]

---

৮২. আসনাল মাতালিব, খ. ৩, পৃ. ২৫০-২৫১, মুদ্রণ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৯৫, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬৯-২৭০, মুদ্রণ : আত-তুরাছ।

www.amarboi.org

### খুলা শর্তযুক্ত করা

খুলার প্রস্তাব যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় এবং সেই যদি প্রথমে তালাক চায় তাহলে খুলা কোনো শর্তযুক্ত করা অথবা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, খুলা স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময়। তবে খুলার প্রস্তাব যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয় কোনো শর্তযুক্ত করা অথবা কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হানাফী, শাফেয়ী ও মালিকীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্বামীর পক্ষ থেকে খুলা একটি অঙ্গীকার এটি সম্পদের বিনিময়ে তালাক দেয়ার সাথে তুলনীয়। অবশ্য হাম্বলীদের কাছে খুলা কোনো অবস্থাতেই শর্তযুক্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তারা এটিকে ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে তুলনা করেন।[৮৩]

### খুলার ক্ষেত্রে এখতিয়ারের শর্ত

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে খুলার ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য এখতিয়ারের শর্ত করা সহীহ; কিন্তু স্বামীর পক্ষ থেকে শর্তযুক্ত করা সহীহ নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে স্ত্রীর জন্যও শর্তযুক্ত করা সহীহ নয়। কেননা, খুলার প্রস্তাব গ্রহণ স্বামীর জন্যে অঙ্গীকার। আর অঙ্গীকার থেকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকে না। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, খুলা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সম্পদের সংশ্লিষ্টতার কারণে একটি বিনিময়। ফলে স্ত্রীর এই বিনিময় প্রস্তাব স্বামী কবুলের আগে স্ত্রীর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকা সঠিক হবে। অবশ্য প্রত্যাহারের অধিকারকে শর্তযুক্ত করা কিংবা কোনো শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করা ঠিক নয়।[৮৪]

### খুলার শব্দ

হানাফীদের মতে খুলার শব্দ ৭ (সাতটি)। তা হলো : ১. আমি তোমার সাথে খুলা করলাম, ২. আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করলাম, ৩. আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, ৪. আমি তোমাকে আলাদা করে দিলাম, ৫. তুমি নিজকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে তালাক দাও, ৬. বিক্রয়ের শব্দ দ্বারা যেমন আমি তোমাকে বিক্রি করেছি, ৭. ক্রয়ের শব্দ দ্বারা যেমন আমি তোমাকে ক্রয় করেছি।

---

৮৩. তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৭২, মুদ্রণ : আল-মারিফা, বাদায়েউস-সানায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৫২, মুদ্রণ : আল-জুমালিয়্যা; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৫, মুদ্রণঃ আল-মারিফা; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮২, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২১৭, মুদ্রণ : আন-নাসর।

৮৪. তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৭১-২৭২, মুদ্রণঃ বুলাক; ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ২১৩-২১৪, মুদ্রণ : আল-আমীরিয়া; বাদায়ে উস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৪৫, মুদ্রণঃ আল-জুমালিয়্যা; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫৫৯, মুদ্রণঃ বুলাক; আল-বায়দাবী, কাশফুল আসরার, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫, মুদ্রণ : আল-আরাবী; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ৯২, মুদ্রণঃ উলা আল-ইলমিয়া।

www.amarboi.org

মালেকীদের মতে খুলার শব্দ ৪ (চারটি)।

১. খুলা, ২. ফিদইয়া, ৩. সুলহে, ৪. মুক্তি। সবগুলো শব্দের ব্যাখ্যা একই। আর তা হলো : তালাকের জন্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে আর্থিক বিনিময় দেয়া।

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে খুলার শব্দ দুই প্রকার ১. صريح বা সুস্পষ্ট; ২. كناية বা অস্পষ্ট। আর যে সকল সুস্পষ্ট শব্দের ওপর ঐকমত্য হয়েছে তাদের নিকট তা দুইটি। ১. খুলা শব্দ এবং তা থেকে যা নির্গত হয় এমন শব্দ। কেননা সমাজে তার দ্বারাই খুলার প্রচলন রয়েছে।

اَلْمُفَادَاةُ (আল-মুফাদাত ফিদইয়া দেয়া) শব্দ এবং তার থেকে যা নিগর্ত হয়। কেননা তার দ্বারা খুলা করার বিষয়টি কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। আর হাম্বলীগণ فسخ (ফসখ ভঙ্গ করা) শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। কেননা খুলার প্রকৃত স্বরূপ হলো فسخ আর শাফেয়ীদের মতে فسخ এর অনুরূপ بيع শব্দও খুলার ক্ষেত্রে كناية স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

بَارَأْتُكِ ، وَأَبْرَأْتُكِ ، وَأَبَنْتُكِ 'আমি তোমাকে মুক্ত করলাম, আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করলাম' খুলার শব্দ। আর সুস্পষ্ট খুলা এবং অস্পষ্ট খুলা, সুস্পষ্ট তালাক এবং অস্পষ্ট তালাকের ন্যায়। অতএব কোনো নারী যদি খুলার আবেদন করে এবং বিনিময় দেয় তারপর স্বামী সুস্পষ্ট খুলার শব্দ বা অস্পষ্ট খুলার শব্দ ব্যবহার করে তাহলে নিয়ত ছাড়াই খুলা হয়ে যাবে। কেননা অবস্থার প্রেক্ষিত, খুলার আবেদন এবং সেজন্য বিনিময় প্রদান করার ফলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, যার ফলে নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি অবস্থা বা পরিস্থিতি দ্বারা কোনো কিছু সুস্পষ্ট না হয় এবং স্বামী খুলার সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে তাহলে নিয়ত ছাড়াই খুলা হয়ে যাবে। তাই আমরা তাকে فسخ বলি বা তালাক বলি। আর কিনায়া শব্দ দ্বারা উচ্চারণকারীর সুস্পষ্ট নিয়ত ছাড়া খুলা হবে না। যেমন সুস্পষ্ট তালাকের শব্দ এবং তার অস্পষ্ট শব্দের বিধান।[৮৫]

## খুলা অথবা তার বিনিময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ

স্বামী যদি খুলার দাবি করে আর স্ত্রী অস্বীকার করে তাহলে সর্বসম্মতভাবে স্বামীর স্বীকারোক্তি দ্বারাই স্ত্রী তালাকে বায়েন হয়ে যাবে।

আর স্বামী যদি সম্পদের দাবি করে তবে স্ত্রী পূর্বাবস্থায় বহাল থাকবে যেমনটি হানাফীগণ উল্লেখ করেছেন। আর এক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই ধর্তব্য হবে। কেননা স্ত্রী অস্বীকার করছে। মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলীদের মতে বিনিময় নাকচ করার

---

৮৫. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৫৫৯, মুদ্রণ : বুলাক; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আত-তিজারিয়্যাহ; হাশিয়াতুল জুমাল আলাল-মানহাজ, খ. ৪, পৃ. ৩০২, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৫৭, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা ধর্তব্য হবে শপথের সাথে। আর স্ত্রী যদি খুলার দাবী করে, কিন্তু স্বামী অস্বীকার করে তাহলে খুলা হবে না। যেভাবেই হোক না কেন। যেমনটি হানাফীগণ উল্লেখ করেছেন।

এ ক্ষেত্রে শাফেয়ীদের মতে স্বামীর কথা শপথের সাথে ধর্তব্য হবে। কেননা আসল হলো খুলা না হওয়া। আর হাম্বলীদের মতে স্বামীর কথাই ধর্তব্য হবে এবং তার ওপর কিছুই আবশ্যক হবে না। কেননা সে খুলার দাবী করছে না।

আর মালেকীদের থেকে এ মাসআলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। তবে তারা যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে বুঝা যায় তারা উল্লেখ করেছেন, স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে 'তুমি আমাকে দশ দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান করো, আর স্বামী বলে, বরং দশ দিরহামের বিনিময়ে এক তালাক প্রদান করলাম'। তাহলে শপথ ছাড়াই তার কথা ধর্তব্য হবে এবং বায়েন তালাক পতিত হবে। কেননা স্বামী যা বলেছে স্ত্রী স্বামীর থেকে অতিরিক্ত দাবী করেছে। আর সব রকমের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্তত দু'জন ন্যায়বান সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। তাই এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দাবীর কারণে শপথের দরকার নেই। আর তাদের থেকে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে শপথসহ স্বামীর কথাই গ্রহণ করা হবে; কিন্তু যদি স্বামী শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে বন্দি করা হবে। তখন একথা বলা যাবে না যে, স্ত্রী শপথ করবে এবং সে যা দাবি করেছে, তা প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা স্বামীর অস্বীকারের সাথে সাথে স্ত্রীর শপথের দ্বারা তালাক প্রতিষ্ঠিত হয় না। খুলার ওপর স্বামী-স্ত্রী ঐকমত্য হলে তাদের মধ্যে বায়েন হয়ে যাবে। আর খুলা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তালাকে রাজয়ী কার্যকর হবে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যখন খুলার ব্যাপারে সম্মত হবে; কিন্তু বিনিময়ের পরিমাণের ব্যাপারে কিংবা বিনিময়ের ধরন, বিনিময়ের সূচনা, বিনিময়ের বিলম্ব অথবা বিনিময়ের মান সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য হয়, তাহলে হানাফীদের মতে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং হাম্বলীদের এক বর্ণনা মতেও, যা ফকীহ আবু বকর রহ. আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর মালেকীদের মতেও শপথসহ স্ত্রীর কথাই গ্রহণ করা হবে। কারণ খুলার মূল বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণ যোগ্য হয়, তাই বিনিময়ের বিবরণের ক্ষেত্রেও তার কথাই ধর্তব্য হবে। আর তাছাড়া বিনিময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ও গুণাবলী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্ত্রী অস্বীকারকারিণী, তাই এক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণ করা হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ স. এর বাণী, الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "বিবাদীর জন্য শপথ"।[৮৬]

৮৬. হুবহু এই শব্দেই হাদীসটি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন, খ. ১০, পৃ. ২৫২, মুদ্রণ : দায়েরাতুল-মাআরিফ আল-উছমানিয়্যা; তিনি উক্ত শব্দগুলো شاذ (বিরল) হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি শুদ্ধ সনদে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

www.amarboi.org

অন্য যে বর্ণনায়, 'খুলা বস্তুত একটি فَسْخٌ (ফসখ তথা ভঙ্গকরণ) বলা হয়েছে, সে বর্ণনার প্রেক্ষিতে একথা বলার অবকাশ নেই যে, খুলার সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষ ক্রয়-বিক্রয়ের দু'পক্ষের অনুরূপ কসম করবে। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শপথের প্রয়োজন হয় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রহিত করার জন্য। অথচ খুলা নিজেই একটা فَسْخٌ ফসখ তথা রহিতকরণ। সুতরাং তা فَسْخٌ (রহিতকরণ) করার প্রয়োজন নেই।

ফকীহ কাজী আয়ায রহ. আহমদ ইবনে হাম্বল র. সূত্রে অন্য এক বর্ণনায় বলেন, রহিতকরণের অধিকারের শর্তের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্ত্রী সম্ভোগের ক্ষমতা খুলার দ্বারা রহিত হয়ে যায়। তাই বিনিময়ের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

শাফেয়ীগণ বলেন, বিনিময় নিয়ে মতপার্থক্যের প্রশ্নে কারোরই যদি কোনো প্রমাণ না থাকে অথবা উভয়েরই প্রমাণ থাকে; কিন্তু তা পরস্পর বিরোধী হয় তাহলে উভয়ের কাছ থেকেই শপথ নেয়া হবে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নেয়া হয়ে থাকে। শপথের ধরন এবং কে প্রথম শুরু করবে তা ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায়ই হবে।

বিনিময় বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ হওয়াসহ মোহরে মিছাল ওয়াজিব হবে; যদিও স্বামীর দাবীকৃত সম্পদ মোহরে মিছালের বেশি হয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে এটি প্রার্থিত। আর যদি দু'জনের কারো প্রমাণ থাকে তবে সে প্রমাণ অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে।[৮৭]

—শহীদুল ইসলাম

---

البينة على المدعى واليمين على من أنكر 'বাদীর উপর প্রমাণ এবং অস্বীকারকারীর উপর শপথ বর্তাবে'।

৮৭. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৫৬৪, বুলাক সম্পা.; বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ৯৪, মুদ্রণ : আল-উলা আল-ইলমিয়্যা; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৬, মুদ্রণ : আল-মারিফা; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৬০, মুদ্রণ : আল-ফিকর; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ২০৬, মুদ্রণ : আল-মাদানী; আল-খারশী আল-আদাবীর হাশিয়াসহ, খ. ৪, পৃ. ২৬-২৭, মুদ্রণ : বুলাক; বুজায়রামী আলী আল-খাতীব, খ. ৩, পৃ. ৪১৫, মুদ্রণ : আল-মারিফা, আল-জুমাল আলাল-মানহাজ, খ. ৪, পৃ. ৩১৮-৩১৯, মুদ্রণ : আত-তুরাছ; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৭৭-৭৮, আল-হালাবী সম্পা.; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ১৫৮, মুদ্রণ : আল-মাকতাবুল ইসলামী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ২৩০; আন-নাসর সং.; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৯৩, মুদ্রণ : আর-রিয়াদ।

www.amarboi.org

# লিআন (لِعَانٌ)

**সংজ্ঞা :** লিআন হলো لَاعَنَ -এর ক্রিয়ামূল। এর ত্রিমূলীয় ক্রিয়া (ثلاثى) হলো لَعَنَ যা اللَّعْنُ থেকে নির্গত। অর্থ তাড়ানো, কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে তাড়ানো এবং দূরে সরিয়ে দেওয়া। আর মানুষের সাথে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে গালি দেওয়া। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক লিআন হলো, স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া অথবা বলা যে, জনৈক পুরুষ তার (স্ত্রীর) সাথে ব্যভিচার করেছে।[১]

## হানাফী ও হাম্বলী আলেমগণের মতে লিআনের সংজ্ঞা

স্বামী কর্তৃক অভিশাপ এবং স্ত্রী কর্তৃক ক্রোধ সম্বলিত শপথ বাক্য দ্বারা জোরালো সাক্ষ্যসমূহ, যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত হয়ে থাকে।[২]

## মালেকী আলেমগণের মতে লিআনের সংজ্ঞা

কোনো বিচারকের বিচার সাপেক্ষে "আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাচ্ছি" শব্দের মাধ্যমে শরীয়ত পালনে সমর্থ (মুকাল্লাফ) মুসলিম স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীর ব্যভিচারের ব্যাপারে চার বার শপথ করা অথবা তার মাধ্যমে স্ত্রীর গর্ভ অস্বীকার করার শপথ করা এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামী মিথ্যাবাদী হওয়ার ব্যাপারে চারবার শপথ করা।[৩]

## শাফেয়ী আলেমদের মতে লিআনের সংজ্ঞা

লিআন হলো নির্ধারিত কিছু শব্দমালা, যা ঐ লোকের পক্ষে প্রমাণরূপে ধার্য হয়েছে, যে স্বীয় শয্যা নোংরাকারী ব্যক্তি এবং তাকে অপমানকারী ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অভিযোগ দিতে অথবা সন্তানকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়।[৪]

## সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি

### ক. السَّبُّ (গালি দেওয়া)

السَّبُّ (গালি)-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ : السَّبُّ (গালি)-এর শাব্দিক অর্থ কটাক্ষ করা, মন্দ বলা, বকা দেওয়া। পরিভাষায় প্রতিটি মন্দ কথাই গালি।[৫]

---

১. লিসানুল আরব, বর্ণমূল لعن ।

২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৪৮; কাশশাফুল কিনা খ. ৫, পৃ. ৩৯০।

৩. আশ-শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ৬৫৭।

৪. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭।

৫. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৩০৯; তাজুল আরূস।

www.amarboi.org

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া না দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে গালির দ্বারা কখনো লিআন ওয়াজিব হয় আর কখনো হয় না।

**খ. اَلْقَذْفُ (অপবাদ)**

اَلْقَذْفُ -এর শাব্দিক অর্থ : যে কোনো প্রকার অপবাদ। আর সকল ফিকহবিদের মতে এর পারিভাষিক অর্থ হলো, ব্যভিচারের অপবাদ।[৬]

শাফেয়ী আলেমগণের মতে, اَلْقَذْفُ বলা হয় অপমানকর ক্ষেত্রে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।[৭]

اَلْقَذْفُ (অপবাদ) ও লিআনের মধ্যে যোগসূত্র হলো, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া লিআনের একটি কারণ।

**শরয়ী বিধান**

হানাফী মাযহাবমতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার কারণে লিআন ওয়াজিব হয়। দলীল- আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

"আর যারা স্বীয় স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথচ নিজ সত্তা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দিবে"।[৮] অর্থাৎ, তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নামে চারটি শপথ বাক্য পাঠ করবে। মহান আল্লাহ (স্বামী কর্তৃক) স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদের কারণে যা সাব্যস্ত করেছেন, তা হলো লিআন।[৯]

মালেকী মাযহাবের উলায়শ র. বলেন, তিন কারণে লিআন ওয়াজিব হয়। দু'টি কারণ এমন যাতে সর্বসম্মত মত রয়েছে। আর তা হলো, স্বামী কর্তৃক দাবি করা যে, সে তাকে (স্ত্রীকে) ব্যভিচার করতে দেখেছে যেরূপ সুরমাদানির মধ্যে শলাকা থাকে। আর উক্ত দাবির পর তার (স্ত্রীর) সাথে সহবাস করেনি। অথবা স্বামী গর্ভ অস্বীকার করে দাবি করে যে, পূর্ব থেকে তার রেহেম (সন্তানদানি) পরিষ্কার। তৃতীয় কারণ হলো, ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া তবে সে এমনটি দাবি করে না যে, সে তাকে ব্যভিচার করতে দেখেছে এবং সে গর্ভ অস্বীকার করে না। অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেন, এমতাবস্থায় তাকে অপবাদ আরোপের শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু তার নিকট থেকে লিআন গ্রহণ করা হবে না।[১০]

---

৬. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৩-৪৪; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ২১৫।
৭. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৫৫।
৮. সূরা নূর, ৬।
৯. বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৩৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫১৫।
১০. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৫৭।

www.amarboi.org

শাফেয়ী আলেমগণের মতে, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া অথবা স্ত্রীর গর্ভে তার সন্তান জন্মদানের বিষয়টি অস্বীকার করার শাস্তি এড়ানোর জন্য লিআন একটি প্রয়োজনীয় প্রমাণ। স্বামীর জন্য লিআন আবশ্যক। সন্তানের বংশ অস্বীকার অথবা এমন গর্ভ অস্বীকার করার জন্য লিআন আবশ্যক, যা তার দ্বারা না হওয়ার ব্যাপারে তার জানা আছে। কারণ এক্ষেত্রে সে যদি চুপ থাকে তাহলে এমন সন্তান তার মধ্যে শামিল হবে, যে তার থেকে নয়। আর এমনটি নিষিদ্ধ।[১১]

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহলে লিআনের মাধ্যমে অপবাদের শাস্তি রহিত করতে পারবে।[১২] ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের ফলে অবধারিত শাস্তি হলো স্ত্রীর অধিকার। সুতরাং স্ত্রী যদি বিচার প্রার্থনা না করে অথবা অপবাদের ব্যাপারে স্বামীকে নির্দোষ করে দেয় অথবা স্বীয় অধিকার রহিত করে দেয় অথবা স্ত্রীর ব্যভিচারের ব্যাপারে স্বামী প্রমাণ উপস্থাপন করার পর লিআন করতে চায় তাহলে এ ক্ষেত্রে সন্তানের বংশ অস্বীকার না করলে স্বামী লিআন করার অধিকার রাখে না। আর যদি সন্তানের বংশ অস্বীকার করে তাহলে কাজী রহ. বলেন, অস্বীকারের কারণে স্বামীর লিআন করতে হবে। আর কতিপয় আলেম বলেন, এহেন পরিস্থিতিতে লিআন করা শরীয়তের বিধান না হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে; যেমনিভাবে স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হলে আর স্ত্রী তার সত্যায়ন করলে স্বামীর জন্য লিআন করার প্রয়োজন হয় না।[১৩]

## লিআনের রুকন

হানাফী আলেমগণের মতে লিআনের রুকন হলো ঐ সকল সাক্ষ্য তথা শপথ বাক্য যা সংজ্ঞায় বর্ণিত উপায়ে স্বামী স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং সাক্ষ্য তথা শপথবাক্যসমূহ লিআনের রুকন।[১৪] কারণ সাক্ষ্য তথা শপথ বাক্যের ওপর লিআনের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সাক্ষ্য তথা শপথবাক্য হলো লিআনের মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মালেকী মাযহাবের আলেম ইবনে জাযযী রহ. বলেন, লিআনের রুকন চারটি : এক লিআনকারী (তথা স্বামী), দুই. লিআনকারিণী (তথা স্ত্রী), তিন. কারণ, চার শব্দ।[১৫]

---

১১. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১০৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮২।
১২. আল ইনসাফ, খ. ৯, পৃ. ২৩৫।
১৩. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪০৫।
১৪. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ১২২; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৫৮৫; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৪৭।
১৫. ইবনে জাওযী, আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২১০।

www.amarboi.org

## হানাফী আলেমগণের মতে লিআনের শর্তসমূহ

হানাফী আলেমগণের মতে লিয়ানের বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। কিছু শর্ত স্বামীর জন্য, কিছু শর্ত স্ত্রীর জন্য, কিছু শর্ত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য আর কিছু শর্ত হলো, যে বিষয়ের অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার জন্য প্রযোজ্য। নিম্নে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো–

### ক. যে সকল শর্ত স্বামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, স্বামী স্বীয় ব্যভিচারের অপবাদ সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য প্রমাণ পেশ না করা। কেননা মহান আল্লাহ লিআনের ক্ষেত্রে স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদদানকারী স্বামীর পক্ষ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন না করার শর্ত করেছেন। প্রমাণ আল্লাহর বাণী–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ .

“আর যারা স্বীয় স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথচ আপন সত্তা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই।”[১৬] অতএব যদি কোনো লোক স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে চার জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী উপস্থাপন করে এবং সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় তাহলে স্বামীর লিআন সাব্যস্ত হবে না আর স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কারণ, সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে স্ত্রীর ব্যভিচার প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এখন লিআনের প্রয়োজন নেই।[১৭]

### খ. যে সকল শর্ত স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

লিআন করার জন্য স্ত্রীর মধ্যে দুটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে।

**প্রথমত :** স্ত্রী কর্তৃক ব্যভিচার সংঘটিত হওয়া অস্বীকার করা। সুতরাং স্ত্রী যদি ব্যভিচার করার কথা স্বীকার করে তাহলে লিআন করা ওয়াজিব হবে না বরং স্ত্রীর স্বীকৃতির মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার কারণে তার ওপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

**দ্বিতীয়ত :** ব্যভিচার থেকে স্ত্রীর সতীত্ব। সুতরাং স্ত্রী যদি সতী না হয় তাহলে তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার কারণে লিআন ওয়াজিব হবে না। কেননা যেহেতু সে সতী নয় সেহেতু সে কাজের মাধ্যমে অপবাদকে সত্যায়ন করল। সুতরাং কথার মাধ্যমে আরোপিত অপবদাকে সত্যায়ন করলে যেমন হয় এক্ষেত্রেও তেমনি হবে।[১৮]

---

১৬. সূরা নূর, ৬।

১৭. বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪০; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৯৬৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮১।

১৮. হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ২৬৭; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ৩৪০।

www.amarboi.org

যদি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয় অথবা সন্তান তার থেকে হওয়া অস্বীকার করা হয় তাহলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আরেকটি শর্ত হলো স্ত্রী কর্তৃক বিচারকের নিকট লিআন কার্যকর করার আবেদন করা। আর স্ত্রী যদি বিচারকের নিকট নিজেদের মধ্যে লিআন সম্পাদনের জন্য আবেদন না করে তাহলে তাদের মাঝে লিআন সংঘটিত হবে না। কারণ স্ত্রীর অপমান মোচন করার জন্য লিআন শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং এটি স্ত্রীর অধিকার। তাই অন্যান্য অধিকারের ন্যায় তার দাবি ছাড়া লিআন সম্পাদন হবে না।[১৯]

**গ. যে সকল শর্ত স্বামী-স্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য**

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন সম্পাদনের জন্য ব্যভিচারের অপবাদের সময় উভয়ের মাঝে দাম্পত্য-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা শর্ত। অপবাদ দেওয়াকালীন যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রকৃত দাম্পত্য-সম্পর্ক থাকে তাহলে তাদের উভয়ের মাঝে লিআন সংঘটিত হবে- তাই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হোক বা না হোক। কেননা আল্লাহর বাণী, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

"আর যারা স্বীয় স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়" উক্ত আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ কেবল স্বামী-স্ত্রীর জন্য লিআন নির্ধারণ করেছেন, যা প্রমাণ করে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন হওয়ার জন্য দাম্পত্য-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা শর্ত।

আর যদি বিবাহ ফাসিদ (অশুদ্ধ) হওয়া অবস্থায় স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা তার থেকে সন্তানের বংশ হওয়া অস্বীকার করে তাহলে এই অপবাদের কারণে লিআন সংঘটিত হবে না।[২০] কারণ মহান আল্লাহ লিআনের বিধানকে স্বামী-স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আর এমনটি কেবল ঐ সময় সম্ভব যখন বিবাহ সহীহ শুদ্ধ থাকে। এ ক্ষেত্রে লিআন সংঘটিত না হওয়ার কারণে অপবাদের শাস্তির বিধান কার্যকর হবে।[২১]

এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শর্ত হলো, তারা মুসলমানদের সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য হবে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই মুসলমান, সাবালক, জ্ঞানসম্পন্ন, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হতে হবে। এবং ইতোপূর্বে অপবাদের দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হতে পারবে না। অতএব স্বামী যদি মুসলমান হয় আর স্ত্রী কিতাবী, ইহুদী খ্রিস্টান হয় তাহলে তাদের মাঝে লিআন সংঘটিত হতে পারবে না। এমনিভাবে তাদের যে কোনো একজন বোবা হলে তাদের মাঝে লিআন হবে না যদিও সে ইঙ্গিতে স্পষ্টভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারে।[২২]

---

১৯. আল-হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৫০; আদ-দুররুল মুখতার ও হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৯৬৬।

২০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪১; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৫৮৫।

২১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪১।

২২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪১।



www.amarboi.org

আল্লামা মারগিনানী রহ. বলেন, স্বামী যদি দাস হয় অথবা কাফির হয় অথবা অপবাদের দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় আর সে নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা তার ব্যক্তিগত কারণে লিআন অসম্ভব হওয়ায় মূল কারণের প্রতি ধাবিত হতে হবে। আর এমনটি নিম্নের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আয়াত-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"যারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চার জন সাক্ষী হাজির করেনা, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাইতো সত্যত্যাগী"।[২৩]

স্বামী যদি সাক্ষ্য দানের উপযুক্ত হয় আর স্ত্রী দাসী হয় অথবা কাফের হয় অথবা অপবাদের দায়ে শাস্তি প্রাপ্ত হয় অথবা স্ত্রী এমন হয়, যার অপবাদদাতাকে শাস্তি প্রদান করা হয় না অর্থাৎ স্ত্রী যদি শিশু হয় অথবা পাগল হয় অথবা ব্যভিচারকারিণী হয় তাহলে স্বামীকে শাস্তি দেওয়া হবে না এবং লিআনও গ্রহণ করা হবে না। কারণ সে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত নয় এবং সে সধবা নয়। আর তার কারণেই লিআন সম্ভব হচ্ছে না। সেহেতু শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যাবে যেরূপ স্ত্রী কর্তৃক অপবাদ স্বীকার করলে শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যায়।[২৪]
এমনিভাবে সাক্ষ্যদানের শব্দ এবং বিচারকের উপস্থিতি শর্ত।[২৫]

**ঘ. যে বিষয়ের অপবাদ দেওয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্ত**
হানাফী আলেমগণের মতে লিআন ওয়াজিব বা জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া অথবা সন্তানের বংশ অস্বীকার করা।[২৬]

**হানাফী আলেমগণ ছাড়া অন্যান্য আলেমের মতে লিআনের শর্ত**
মালেকী আলেমগণ বলেন, লিআন কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শর্ত।

**প্রথমত :** বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা। স্বামী-স্ত্রী জ্ঞানসম্পন্ন, সাবালক হওয়া। তাই তারা স্বাধীন হোক কিংবা দাস-দাসী, ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা পাপী। আর স্বামী মুসলমান হওয়া শর্ত।

**দ্বিতীয়ত :** (স্ত্রীকে) ব্যভিচার করতে দেখে অথবা গর্ভ অস্বীকার করে অপবাদ দেওয়া।

---

২৩. সূরা নূর, ৪।
২৪. ফাতহুল কাদীর হিদায়াসহ, খ. ৩, পৃ. ২৫১-২৫২।
২৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪২।
২৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪৩।

www.amarboi.org

**তৃতীয়ত :** গর্ভ অথবা সন্তানের বংশ অস্বীকার করতে হলে (স্বামী কর্তৃক) জানা মাত্র তাড়াতাড়ি লিআন করা।

**চতুর্থত :** ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার পর সহবাস না করা।

**পঞ্চমত :** প্রথম চার বাক্যে أَشْهَدُ (আমি সাক্ষী বানাচ্ছি) শব্দ এবং পঞ্চম বাক্যে স্বামীর পক্ষ থেকে لعن (অভিশাপ) শব্দ এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে غضب (ক্রোধ) শব্দ উল্লেখ করা।

**ষষ্ঠত :** স্বামী প্রথমে শপথ করা। যদি স্ত্রী প্রথমে শপথ বাক্য বলে তাহলে পরে স্ত্রীকে তা আবার বলতে হবে।

**সপ্তমত :** লিআনের জন্য একদল লোক, যাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো চারজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে হবে।[২৭]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, লিআন শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো :

**প্রথমত :** লিআনকারী এমন স্বামী হতে হবে যার তালাক কার্যকর হতে পারে এবং তিনি শপথ করার অধিকার রাখেন। কারণ লিআন হলো الشَّهَادَة শব্দ দ্বারা দৃঢ়কৃত শপথ বাক্য। অর্থাৎ (লিআনকারী) স্বামী অবশ্যই সাবালক, জ্ঞানসম্পন্ন ও স্বাধীন হতে হবে। পূর্বের বিবেচনায় অথবা বাহ্যিকভাবে স্বামী হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ স্বাধীন, দাস, মুসলিম, করদাতা অমুসলিম নাগরিক, সুবোধ, নির্বোধ, মাতাল, সাজাপ্রাপ্ত, রাজয়ী তালাক প্রদানকারী প্রমুখ (সকল প্রকার) যে কোনো শ্রেণীর স্বামীর ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে।

**দ্বিতীয়ত :** ব্যভিচারের অপবাদটি অবশ্যই লিআন সম্পাদনের পূর্বে হতে হবে।

**তৃতীয়ত :** (সরকারি) বিচারক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত লোক কর্তৃক লিআনের নির্দেশ দিতে হবে।

**চতুর্থত :** বিচারক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কর্তৃক লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে লিআনের বাক্যসমূহ শিখাতে হবে।

**পঞ্চমত :** শরীয়তনির্দেশিত সাক্ষ্যদানের বাক্য অর্থাৎ শপথ বাক্য দ্বারা লিআন সংঘটিত হতে হবে।

**ষষ্ঠত :** লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে লিআনের শপথ বাক্যসমূহ পরিপূর্ণ বলতে হবে।

**সপ্তমত :** লিয়ানের বাক্যসমূহ বিরতিহীনভাবে বলতে হবে।

**অষ্টমত :** স্ত্রীর লিআন স্বামীর লিআনের পরে হতে হবে।[২৮]

---

২৭. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৪১; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৬৫৭-৬৬৫।

২৮. রওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৩৪; মুগনী আল-মুহ্তাজ, খ. ২, পৃ. ৩৬৭-৩৭৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১১৩।

www.amarboi.org

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, লিআনের শর্ত তিনটি :

**এক.** জ্ঞানসম্পন্ন সাবালক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন সংঘটিত হতে হবে। তাই তারা মুসলমান হোক কিংবা করদানকারী অমুসলিম নাগরিক, স্বাধীন হোক কিংবা দাস, ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা পাপী। স্বামী স্ত্রী দু'জনই ব্যভিচারের অপবাদে শাস্তি প্রাপ্ত হোক কিংবা একজন শাস্তি প্রাপ্ত হোক।

**দুই.** যোনিপথে কিংবা গুহ্যদ্বারে ব্যভিচার করার অপবাদ হতে হবে। তাই সে অপবাদদানকারী অন্ধ হোক কিংবা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হোক।

**তিন.** লিআন গ্রহণ শেষ হওয়া অবধি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর পক্ষ থেকে আরোপিত অপবাদ অস্বীকার করতে থাকা।[২৯]

## যদ্বারা বিচারকের নিকট লিআন প্রমাণিত হয়

দুই বিষয়ের কোনো একটির দ্বারা বিচারকের নিকট লিআন সাব্যস্ত হয়।

**প্রথম বিষয় :** বিচারকের সামনে স্বামী কর্তৃক ব্যভিচারের অপবাদ স্বীকার করা। সুতরাং স্বামী যখন স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে আর স্ত্রী বিচারকের নিকট উক্ত বিষয় উত্থাপন করবে এবং তার ও স্বামীর মধ্যে পরস্পর লিআনের দাবি পেশ করবে এবং স্বামী স্বীকার করবে যে, সে স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে, তখন লিআন ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকলে বিচারক উভয়ের মাঝে লিআনের ফয়সালা করবেন।

**দ্বিতীয় বিষয় :** প্রমাণ অর্থাৎ স্ত্রী যখন দাবি করবে যে, তার স্বামী তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে আর স্বামী তা অস্বীকার করবে, তখন স্ত্রী স্বীয় দাবির পক্ষে প্রমাণ উত্থাপন করবে। এহেন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর উত্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন করার ফয়সালা দিবেন।

যে প্রমাণের দ্বারা ব্যভিচারের অপবাদ যথাযথ বলে সাব্যস্ত হয় তা হলো দু'জন পুরুষ লোকের সাক্ষ্য। ব্যভিচারের অপবাদের যথার্থতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ লিআন হলো স্বামীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত। আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তির স্থলা ভিষিক্ত। আর মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা শাস্তির আবশ্যিক বিধান সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা মহিলাদের সাক্ষ্যদানের মধ্যে সন্দেহ বিদ্যমান। আর সন্দেহের কারণে শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যায়।

আর এই ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্ত্রী যদি দাবি করে যে, তার স্বামী তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। আর স্বামী স্ত্রীর উত্থাপিত এই দাবি অস্বীকার করে এবং স্ত্রী

---

২৯. কাশ্‌শাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৩৯৪-৩৯৯; নাইলুল মাআরিব, খ. ২, পৃ. ২৬৬-২৬৭।

www.amarboi.org

নিজের উত্থাপিত দাবি প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে স্বামীর জন্য শপথ করতে হবে না এবং শপথ না করার কারণে শাস্তির বিধান আরোপিত হবে না। কারণ শপথের বিধান আরোপ করার স্বার্থকতা হলো শপথ করতে অস্বীকারকারী লোকের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা। আর শপথে অস্বীকৃতি উক্ত দাবির স্পষ্ট স্বীকৃতি নয়। এটি কেবল এক অর্থে (দাবির) স্বীকৃতি। আর এক অর্থে স্বীকৃতির মধ্যে সন্দেহ আছে। আর সন্দেহের দ্বারা শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যায়।[৩০]

**লিআন করার পদ্ধতি**

হানাফী আলেমগণের জাহেরী বর্ণনা মতে, যদি লিআনের মধ্যে ব্যভিচার সংক্রান্ত অপবাদ থাকে তাহলে বিচারকের উচিৎ, তিনি লিআনকারীদেরকে (তথা স্বামী-স্ত্রীকে) নিজের সামনে বরাবর করে দাঁড় করাবেন এবং প্রথমে স্বামীকে নির্দেশ করবেন সে যেন চারবার বলে যে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার উত্থাপিত ব্যভিচারের দাবিতে আমি সত্যবাদী"। আর পঞ্চম বার বলবে যে, "যদি ব্যভিচারের অপবাদে আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ"। অতঃপর বিচারক স্ত্রীকে নির্দেশ করবেন সে যেন চার বার বলে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, সে আমার উপর আরোপিত অপবাদে মিথ্যাবাদী" এবং স্ত্রী পঞ্চমবার বলবে– "সে যদি আমার ওপর আরোপিত অপবাদে সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হোক।"

ইমাম আবু হানিফা র. থেকে হাসান র. বর্ণনা করেন যে, লিআনকারী স্বামীর জন্য মধ্যম পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন। অতএব স্বামী বলবে– "আমি তোমাকে যে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছি (তা সত্য)" আর স্ত্রী বলবে– "তুমি আমাকে যে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছ (তা মিথ্যা)।" আর ইমাম যুফারের এমনই একটা মত রয়েছে।

আর স্বামী যদি সন্তানের বংশ অস্বীকার করে তাহলে ইমাম কারখী র. বলেন, লিআনকারী স্বামী প্রত্যেকবার বলবে, "আমি তোমার সন্তানের বংশ অস্বীকারপূর্বক যে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছি (তা সত্য)"। আর স্ত্রী বলবে, "তুমি আমার সন্তানের বংশ অস্বীকার করত আমার ওপর ব্যভিচারের যে অপবাদ দিয়েছ (তা মিথ্যা)"।

ইমাম তাহাবী র. বলেন যে, স্বামী প্রত্যেকবার বলবে, "আমি তার সন্তানের বংশ অস্বীকার করত ব্যভিচারের যে অপবাদ দিয়েছি (তা সত্য)"। আর স্ত্রী বলবে, "সে তার সন্তানের বংশ অস্বীকার করত আমার উপর ব্যভিচারের যে অপবাদ আরোপ করেছে (তা মিথ্যা)"।[৩১]

---

৩০. বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪৩; দুররুল মুখতার, হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৯০৭-৯০৮; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪০৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯।

৩১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৩৭।

www.amarboi.org

মালেকী আলেমগণ বলেন, যদি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে তাহলে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন স্বামী চারবার বলবে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি অবশ্যই তাকে ব্যভিচার করা অবস্থায় দেখেছি"।

আর অন্ধ হলে বলবে, "আমি অবশ্যই জানি সে ব্যভিচার করেছে অথবা আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, সে ব্যভিচার করেছে"। অতঃপর পঞ্চমবার বলবে, যদি সে তার (স্ত্রীর) ব্যাপারে মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার (স্বামীর) ওপর আল্লাহর অভিশাপ। আর স্ত্রী চারবার বলবে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ব্যভিচার করিনি অথবা সে আমাকে ব্যভিচার করতে দেখেনি" এবং পঞ্চমবার সে বলবে, "সে (স্বামী) যদি তার আরোপিত অপবাদে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার (স্ত্রীর) ওপর আল্লাহর গযব"।

আর যদি গর্ভ অস্বীকারসংক্রান্ত অপবাদ হয় তাহলে স্বামী চারবার বলবে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, এই গর্ভ আমার থেকে নয়"। আর পঞ্চমবার বলবে, "যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ"। আর স্ত্রী চারবার বলবে, 'আমি ব্যভিচার করিনি'। আর পঞ্চমবার বলবে, "যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (স্ত্রীর) ওপর আল্লাহর গযব"।[৩২]

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর আরোপিত ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি রহিত করার জন্য লিআনের প্রয়োজন হয় অথবা এ বিষয়ের পাশাপাশি সন্তান অস্বীকার করার কারণে অথবা শুধু সন্তান অস্বীকার করার কারণে লিআনের প্রয়োজন হয়।

লিআন যদি কেবল (ব্যভিচারের) অপবাদের শাস্তি রহিত করার জন্য হয় তাহলে তার পন্থা এই যে, স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বামী চারবার বলবে, "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার এ স্ত্রীকে আমি যে অপবাদ দিয়েছি তাতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী"। অথবা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বলবে, আমার স্ত্রী অমুকের কন্যা অমুক যার নাম ও বংশ অথবা তার বর্ণনা দিবে যদ্বারা তাকে চেনা যায়। অতঃপর বলবে, সে ব্যভিচার করেছে। আর পঞ্চমবার বলবে, "আমি তার ওপর ব্যভিচারের যে দোষ আরোপ করেছি তাতে যদি আমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ"।

যদি শাস্তি এড়ানো কিংবা সন্তানের বংশ অস্বীকার করার জন্য লিআন করে তাহলে স্ত্রীর উপস্থিতিতে চারবার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে প্রতিবার বলবে, "আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে যে অপবাদ আরোপ করেছি তাতে আমি সত্যবাদী।"

---

৩২. আশ-শারহুল কাবীরসহ হাশিয়াতুদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬; আশ-শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ৬৬৪-৬৬৫।

www.amarboi.org

অথবা, স্ত্রী যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার নাম নিয়ে এবং বংশ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলবে, আমার অমুক স্ত্রী ব্যভিচারকারিণী"। আর সন্তান অনুপস্থিত থাকলে বলবে, তার জন্ম দেওয়া সন্তান আর যদি সন্তান উপস্থিত থাকে তাহলে বলবে, "এ সন্তান ব্যভিচার দ্বারা জন্মপ্রাপ্ত, সে আমার সন্তান নয়"। আবার পঞ্চমবার বলবে, "আমি যদি ব্যভিচারের অপবাদে এবং সন্তান আমার দ্বারা জন্ম না হওয়ার অপবাদে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ"।

আর যদি সন্তানের বংশ অস্বীকার করার জন্য লিআন করা হয়, শাস্তি এড়ানোর জন্য না হয়, তাহলে স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বামী চারবার বলবে- "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার এই স্ত্রীর ওপর আমি যে অপবাদ দিয়েছি তাতে অবশ্যই আমি সত্যবাদী"। অথবা স্ত্রী যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে বলবে- "আমার স্ত্রী অমুকের কন্যা অমুক এই বলে তার নাম, বংশ ও বৈশিষ্ট উল্লেখ করে বলবে, সে আমার শয্যা ছাড়া অন্যের শয্যায় গমন করেছে আর তার দ্বারা সন্তান জন্ম দিয়েছে। আমার মাধ্যমে সন্তান জন্ম হয়নি" এবং পঞ্চমবার বলবে- "আমার দ্বারা সন্তান জন্ম না হওয়ার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে তার ওপর উত্থাপিত অপবাদে আমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি, তাহলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ"। তবে তৃতীয় ক্ষেত্রে স্ত্রী লিআন করবে না। কেননা স্বামীর লিআনের কারণে তার ওপর শাস্তি আসবে না। পক্ষান্তরে প্রথম দুই ক্ষেত্রে স্বামীর লিআনের পর স্ত্রী লিআন করে চারবার বলবে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তার পক্ষ থেকে আমার ওপর আরোপিত ব্যভিচারের অপবাদে সে মিথ্যাবাদী"। স্বামী উপস্থিত থাকলে তার দিকে ইঙ্গিত করবে। অন্যথায় তার ঐরূপ পরিচয় বর্ণনা করবে যেরূপ (পূর্বে লিআনের আলোচনায়) বলা হয়েছে স্বামীর লিআনের ক্ষেত্রে। সন্তানের আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ স্ত্রীর লিআনে সন্তানের সাথে কোন বিধান আরোপিত হয়না। আর পঞ্চমবার বলবে, "তার পক্ষ থেকে আমার ওপর আরোপিত ব্যভিচারের অপবাদে সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমার ওপর আল্লাহর গযব"।

আলেমগণ বলেন, গযবকে স্ত্রীর জন্য নির্ধারণ করার কারণ হলো, ব্যভিচারজনিত অপরাধ যার শাস্তি রহিত করার জন্য স্ত্রী লিআন করেছে তা ব্যভিচারের অপবাদজনিত অপরাধ অপেক্ষা অধিক জঘন্য। গযব অভিশাপ অপেক্ষা মারাত্মক। কারণ গযব অর্থ শাস্তিদানের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ আর অভিশাপ অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া।[৩৩]

---

৩৩. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১০৭-১০৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪।

www.amarboi.org

পাঁচটি শপথবাক্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে লিআনের কোনো বিধান সাব্যস্ত হবে না। অধিকাংশ শপথবাক্য সম্পন্ন হওয়ার দ্বারা যদি বিচারক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের ফয়সালা করেন তাহলে তা কার্যকর হবে না। কারণ সর্বসম্মতভাবে এ ধরনের ফয়সালা অবৈধ। সুতরাং সকল ভ্রান্ত ফয়সালার ন্যায় এ ফয়সালাও কার্যকর হবে না।

বিশুদ্ধতম মতানুসারে لعن (অভিশাপ) ও غضب (গযব) শব্দদ্বয়কে চার শপথ বাক্যের পরে বলা শর্ত এবং শপথের পাঁচটি বাক্য ধারাবাহিকভাবে বলা শর্ত। সুতরাং সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান লিআনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

স্বামী-স্ত্রীর লিআনের ক্ষেত্রে শর্ত হলো বিচারক কর্তৃক লিআন করতে আদেশ করা। সুতরাং বিচারক বলবে– "তুমি বল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি সত্যবাদী ........ শেষ পর্যন্ত। স্ত্রীর লিআন স্বামীর লিয়ানের পরে হওয়া শর্ত। যদি বোবা ব্যক্তির ইঙ্গিতমূলক কথা বোধগম্য না হয় এবং সে লিখতেও না পারে তাহলে তার ব্যভিচারের অপবাদ, লিআন ও এ সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ড শুদ্ধ হবে না।

আর যদি বোবা লোকের ইঙ্গিতমূলক কথা বোধগম্য হয় অথবা সে লিখতে পারে তাহলে ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-তালাক ইত্যাদির ন্যায় তার ব্যভিচারের অপবাদ ও লিআন শুদ্ধ হবে।

আল্লামা মুতাওয়াল্লী উল্লেখ করেন যে, সে যখন ইঙ্গিতের মাধ্যমে লিআন করবে তখন চারবার শাহাদাতের বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করবে। অতঃপর অভিশাপ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করবে। আর যদি লিখে লিআন করে তাহলে সাক্ষ্যদানের বাক্য ও অভিশাপ বাক্য লিখবে এবং সাক্ষ্যদান বাক্যের প্রতি চারবার ইঙ্গিত করবে। তাকে সাক্ষ্যদানের বাক্য চারবার লিখতে বাধ্য করা হবে না। যদি বোবা ব্যক্তি ইঙ্গিতের মাধ্যমে লিআন করে অতঃপর সে বাক্শক্তি ফিরে পায় আর বলে, আমি উক্ত ইঙ্গিতের মাধ্যমে লিআন করতে ইচ্ছা করিনি। তাহলে নিজের বিরুদ্ধ অংশে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং সন্তানের বংশ তার সাথে যুক্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। আর তার নিজের পক্ষের অংশে গ্রহণযোগ্য হবেনা সুতরাং (বিবাহ) বিচ্ছেদের বিধান এবং স্থায়ীভাবে অবৈধ হওয়ার বিধান রহিত হবে না। শাস্তি রহিত করার লক্ষ্যে স্বামীর জন্য তৎক্ষণাৎ লিআন করার অধিকার আছে। অস্বীকার করার সময় শেষ না হলে সন্তানের বংশ অস্বীকার করার জন্য সে লিআন করতে পারবে। যদি সে বলে, আমি মোটেও ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করিনি। তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

যদি কোন বাক্শক্তিসম্পন্ন লোক ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। অতঃপর সে রোগ ইত্যাদির কারণে বাক্শক্তিহীন হয়ে যায় আর তার পুনরায় বাকশক্তি ফিরে

www.amarboi.org

পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সে বোবা লোকের পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে যদি বাকশক্তি ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার তিন অবস্থা :

**এক.** তাকে অবকাশ দেওয়া হবে না, বরং অক্ষমতা থাকার কারণে ইঙ্গিতে লিআন করবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ অবস্থায় মারা গেলে তার সাথে অবৈধ সন্তানের বংশ যুক্ত হয়।

**দুই.** তাকে অবকাশ দেওয়া হবে যদিও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য হোক।
আর বিশুদ্ধতম মত হলো, শুধু তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হবে। ইমাম সাহেব বলেন, ইমামগণ উক্ত মতকে বিশুদ্ধ বলেছেন। অতএব এই ভিত্তিতে বলা যায় যে, যদি তিন দিনের মধ্যে তার বাকশক্তি ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাকে (তিন দিন) অবকাশ দেওয়া হবে। অন্যথায় তাকে মোটেও অবকাশ দেয়া হবে না।

যে লোক আরবী বলতে পারে না সে নিজস্ব ভাষায় লিআন করবে এবং اَلشَّهَادَةُ (সাক্ষ্যদান), لعن (অভিশাপ) ও غضب (গযব) শব্দাবলির অনুবাদের প্রতি যত্নবান থাকবে। আর যদি সে ভালভাবে আরবী বলতে পারে তাহলে তাকে কি আরবীতেই লিআন করতে হবে, না তার ইচ্ছামত অন্য যে কোন ভাষায় লিআন করতে পারবে, সে ক্ষেত্রে দু'টি অভিমত রয়েছে। বিশুদ্ধ অভিমত হলো অন্য ভাষায় লিআন করতে পারবে। যদি অনারবী ভাষায় লিআন করে আর বিচারক উক্ত ভাষা ভালোভাবে বুঝতে পারে তাহলে (অন্য) কোনো অনুবাদকের প্রয়োজন নেই। তবে উক্ত ভাষায় পারঙ্গম চার ব্যক্তি (লিআনের মজলিসে) হাজির থাকা উত্তম। আর যদি বিচারক উক্ত ভাষা ভালোভাবে বুঝতে না পারে, তাহলে দুই জন অনুবাদক থাকতে হবে এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে তারা দু'জন যথেষ্ট হবে। কারণ স্ত্রী তো ব্যভিচার অস্বীকার করার জন্য লিআন করছে। ব্যভিচার সাব্যস্ত করার জন্য লিআন করছে না।

স্বামীর ক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে, যার বিশুদ্ধতম মত হলো, দুইজনই যথেষ্ট যা আবু ইসহাক ও ইবনে সালামার মত। দ্বিতীয় মত হলো : এ ক্ষেত্রে দুটি উক্তি রয়েছে। ব্যভিচারের কথা স্বীকার করার ভিত্তিতে দু'জন সাক্ষী দ্বারা সাব্যস্ত হবে, না-কি চারজন শর্ত? এ ব্যাপারে অধিকতর স্পষ্ট মত হলো দু'জন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাবে।[৩৪]

হাম্বলী আলেমগণের মতে লিআনের বৈশিষ্ট্য হলো, বিচারক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি এমনিভাবে বিচার করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যাকে স্বামী বিচারক হিসেবে নির্ধারণ করেছে- এ সকল লোকের কোনো একজনের

---

৩৪. রওদাতুত্ তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৫১-৩৫৩।

www.amarboi.org

উপস্থিতিতে স্ত্রী উপস্থিত থাকলে স্বামী বলবে, 'আমার এই স্ত্রীকে ব্যভিচারের যে অপবাদ দিয়েছি আমি অবশ্যই তাতে সত্যবাদী'। স্ত্রী বর্তমান থাকলে তার দিকে ইঙ্গিত করবে; তার নাম ও বংশ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আর যদি স্ত্রী মজলিসে বর্তমান না থাকে তাহলে তার নাম ও বংশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে যেন তার এবং অন্য স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং শপথবাক্যটি চারবার পুনরাবৃত্তি করবে। লিআনকারী দুই ব্যক্তি একই সাথে উপস্থিত থাকা শর্ত নয়; বরং তাদের উভয়ের মধ্যে একজন যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে দলীলের ব্যাপকতার কারণে বৈধ হবে। অতঃপর পঞ্চমবার বলবে, "আমি আমার স্ত্রীকে ব্যভিচারের যে অপবাদ দিয়েছি তাতে যদি আমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। অতঃপর স্বামী যদি মজলিসে উপস্থিত থাকে তাহলে স্ত্রী বলবে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার এই স্বামী আমাকে যে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে সে অবশ্যই তাতে মিথ্যাবাদী" এবং স্ত্রী তার প্রতি ইঙ্গিত করবে। আর স্বামী যদি উপস্থিত না থাকে তাহলে স্ত্রী তার নাম ও বংশ উল্লেখ করবে এবং এর পুনরাবৃত্তি করবে। অতপর চারবার বলা শেষে পঞ্চমবার বলবে, 'যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার (আমি স্ত্রীর) ওপর আল্লাহর অভিশাপ'। যদি লিআনকারী দু'জনের একজন পাঁচ বাক্যের কম বলে তাহলে তা লিআন হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কারণ মহান আল্লাহ (পরিপূর্ণ) পাঁচ বাক্যের ওপর লিআনের বিধানসমূহকে সম্পৃক্ত করেছেন। স্বামীর পূর্বে স্ত্রী লিআন আরম্ভ করলে অথবা কোন বিচারকের অবর্তমানে তারা লিআন করলে অথবা اشهد (আমি সাক্ষী রেখে বলছি) শব্দের পরিবর্তে اولى/أحلف/اقسم (আমি শপথ করছি) শব্দ বলে তাহলে তা লিআন হিসেবে গণ্য হবে না। অথবা স্বামী কর্তৃক لعنة (অভিশাপ) শব্দের পরিবর্তে ابعاد (বিতাড়ন) বা غضب (গযব) শব্দ বলা হয় অথবা স্ত্রী কর্তৃক غضب (গযব) শব্দের পরিবর্তে سخط (ক্রোধ) অথবা لعنة (অভিশাপ) শব্দ বলা হয় তাহলে তা লিআন হিসেবে গণ্য হবে না। অথবা পঞ্চম বাক্যের পূর্বেই স্বামী কর্তৃক (অভিশাপ) সংবলিত বাক্যটি বলা হয় তাহলে তা হবে লিআনের সময়ের পূর্বই লিআন গ্রহণ করা। লিআন হিসেবে তা গণ্য করা যাবে না।

যদি তাদের কোনো একজন লিআনকে কোনোভাবে শর্তযুক্ত করে অথবা প্রচলিত পন্থা অনুযায়ী লিআনের বাক্যগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে অথবা আরবী ভালোজানা লোক অনারবী ভাষায় লিআন করে তাহলে তা লিআন হিসেবে গণ্য করা হবে না।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর জন্য শাস্তি প্রদানের দাবি করার পূর্বেই যদি স্বামী লিআন করে এমতাবস্থায় যে, তাদের কোন সন্তান নেই, যার বংশ অস্বীকার করা হবে, তাহলে তা লিআন হিসেবে গণ্য হবে না।

www.amarboi.org

যদি বোবা স্বামীর ইঙ্গিত অথবা লেখা বোধগম্য হয় তাহলে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সাথে লিআন শুদ্ধ হবে, অন্যথায় শুদ্ধ হবে না।[৩৫]

শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমগণের মতে এবং মালেকী আলেমগণের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী যদি বিচারক প্রথমে স্ত্রীর লিআন গ্রহণ করে তাহলে তা লিআন হিসেবে গণ্য হবে না। আর তার উচিত হবে, স্বামীর লিআনের পর স্ত্রী থেকে পুনরায় লিআন গ্রহণ করা। কারণ সে (বিচারক) কুরআন-সুন্নাহর বর্ণিত নিয়মের বিপরীত নিয়মে লিআন গ্রহণ করেছে। তাই উক্ত লিআন শুদ্ধ হবে না। যেমনিভাবে (লিআনকারীদের) এক জনের বক্তব্যের ওপর লিআনকে ক্ষান্ত করলে তা কার্যকর হয় না।

আর এজন্যও যে, স্ত্রীর ব্যভিচার সাব্যস্ত করা এবং তার সন্তানের বংশ অস্বীকার করার জন্য স্বামীর লিআন, আর (ব্যভিচার) অস্বীকার করার জন্য স্ত্রীর লিআন। তাই যেমনিভাবে শপথের পূর্বে সাক্ষ্য উত্থাপন করা হয় তদ্রূপ (অস্বীকারের প্রমাণের পূর্বে) সাব্যস্তকরণের প্রমাণ উত্থাপন করতে হবে।

আর এজন্যও (স্ত্রীর লিআন পূর্বে গ্রহণ করা হলে শুদ্ধ হবে না) যে, স্ত্রীর ওপর থেকে শাস্তির বিধান রহিত করার জন্য স্ত্রী কর্তৃক লিআন করতে হয় আর স্বামীর লিআনের মাধ্যমেই কেবল স্ত্রীর উপর শাস্তির বিধান আরোপিত হয়। অতএব স্বামীর লিআনের পূর্বেই স্ত্রী থেকে লিআন গ্রহণ করা হলে তা হবে লিআনের সময়ের পূর্বেই লিআন গ্রহণ করা। সুতরাং তা শুদ্ধ হবে না। যেমনিভাবে ব্যভিচারের অপবাদের পূর্বে লিআনের বিধান প্রয়োগ করা শুদ্ধ নয়।[৩৬]

হানাফী[৩৭] মাযহাবমতে এবং মালেকী আলেমগণের একটি মতানুসারে[৩৮] লিআনের ক্ষেত্রে স্বামীর সাক্ষ্য প্রথমে নেওয়া ওয়াজিব। কারণ সে হলো বাদী। আর মামলার ক্ষেত্রে বাদীর সাক্ষ্য প্রথমে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং যদি উল্টো হয় অর্থাৎ বিচারক যদি স্বামীর পূর্বে স্ত্রীর লিআন গ্রহণ করে তাহলে সে ভুল করল। অতএব কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ধারবাহিকতা অনুযায়ী লিআন সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে বিচারকের উচিৎ হলো, স্বামীর লিআনের পর স্ত্রী থেকে পুনরায় লিআন গ্রহণ করা।

---

৩৫. কাশ্‌শাফুল কিনা' খ. ৫, পৃ. ৩৯১।

৩৬. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ.৩৬৭; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী খ. ৭, পৃ.৪১৭; আদ-দাসুকী খ. ২, পৃ. ৪৬৫।

৩৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ.৩, পৃ. ২৩৭, ২৩৮; আদ-দুররুল মুখতার হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন খ. ২, পৃ. ৯৯৭।

৩৮. আশ-শরহুল কাবীর হাশিয়াতুদ দাসূকী খ. ২, পৃ. ৪৬৫; মুখতাসার খলীলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আত-তাজ ওয়াল ইকলীল খ. ৪, পৃ. ১৩৭।

www.amarboi.org

যদি বিচারক পুনরায় স্ত্রীর লিআন গ্রহণ না করে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহলে তার বিচ্ছেদকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। কারণ, এটি ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে বিচারকের সিদ্ধান্ত। আর ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে বিচারকের সিদ্ধান্ত হলে তা কার্যকর হয়।

**স্বামী লিআন করা থেকে বিরত থাকলে যা করতে হবে**

মালেকী শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমগণ বলেন, স্বামী যদি লিআন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকে বন্দি করা হবে না তবে তাকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হবে;[৩৯] এটা সকলের মত। আর মালেকী আলেমগণ বলেন, স্বামী যদি লিআন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে স্ত্রী স্বাধীন ও মুসলিম হলে সে (স্বামী) শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হবে। আর স্ত্রী দাসী কিংবা জিম্মী (করদানকারী মুশরিক) হলে সে (স্বামী) শিষ্টাচারমূলক শাস্তি দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হবে।[৪০]

হানাফী আলেমগণ বলেন, বিচারক কর্তৃক স্বামীকে লিআনের আদেশের পর স্বামী যদি লিআন না করে তাহলে লিআন না করা পর্যন্ত অথবা স্ত্রী কর্তৃক তার উত্থাপিত দাবি সত্যায়ন না করা পর্যন্ত অথবা স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত বিচারক তাকে বন্দি করে রাখবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করবে।[৪১]

স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীকে অপবাদের মূল বিধান নিয়ে ইমামগণের মতভেদের ওপর এই মতভেদটি নির্ভরশীল। (অপবাদের) মূল বিধান কি লিআন, নাকি শাস্তি (হদ্দ), আর লিআন হলো উক্ত শাস্তি রহিতকারী? সকল ইমামের মতে অপবাদের মূল বিধান হলো শাস্তি, আর লিআন হলো শাস্তি রহিতকারী। প্রমাণ আল্লাহর বাণী–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

"যারা সধবা নারীদেরকে অপবাদ দেয় অতঃপর চারজন সাক্ষী আনতে পারে না তোমরা তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর।"[৪২] উক্ত আয়াতটি প্রত্যেক অপবাদদাতার উপর শাস্তির বিধান আবশ্যক করে দিয়েছে। তাই সে (অপবাদদাতা) স্বামী হোক কিংবা অন্য ব্যক্তি হোক। অতঃপর নিম্নের আয়াতের অবতারণা ঘটেছে–

---

৩৯. আত্-তাজ ওয়াল ইকলীল খ. ৪, পৃ. ১৩৮; মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪০৪।

৪০. হাশিয়াতুদ-দাসূকী খ.২, পৃ. ৪৬৬।

৪১. বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৩৮; দুররুল মুখতার ও হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন খ. ২, পৃ. ৯৬৬।

৪২. সূরা নূর, ৪।

www.amarboi.org

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

"যারা স্বীয় স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয় অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই তাদের প্রত্যেকেরই সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।" উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, অপবাদদাতা যদি স্বামী হয় তাহলে লিআনের মাধ্যমে নিজের থেকে শাস্তি প্রতিহত করবে। আর সে লিআন করতে বিরত থাকলে মূল বিধান তথা শাস্তি প্রাপ্য হবে।[৪৩]

হানাফী আলেমগণের মতে অপবাদের মূল বিধান হলো লিআন। অতএব স্বামী যখন লিআন থেকে বিরত থাকবে তখন লিআন করা অথবা নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত তাকে বন্দি রাখা হবে অতপর তাকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"আর যারা স্বীয় স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয় অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী, এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর আল্লাহর লানত নেমে আসবে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যা বাদি, এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহ গজব নেমে আসবে।"[৪৪]

এখানে স্বামীর অপবাদের শুদ্ধতার পক্ষে চারজন সাক্ষী আনতে না পারলে আল্লাহ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অপবাদের বিধান নির্ধারণস্বরূপ শুধু লিআনই করেছেন। যদিও এই আয়াতগুলোর পূর্বের আয়াতের ব্যাপকার্থের আবেদন অনুযায়ী অপবাদের বিধান ছিল শাস্তি। আর সে আয়াতটি হলো :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

---

৪৩. ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪০৪; নিহায়াতুল মুহ্তাজ খ. ৭, পৃ. ১১৫।
৪৪. সূরা নূর, ৬-৯।

www.amarboi.org

"আর যারা সাধ্বী স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয় অতঃপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তোমরা তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর।"[৪৫]

এর মাধ্যমে স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদসংক্রান্ত আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। এই ভিত্তিতে যে, হানাফী আলেমগণের স্থিরীকৃত মূলনীতি হলো, বিশেষার্থক বিধানটি যদি ব্যাপকার্থক বিধানের পর অবতীর্ণ হয় তাহলে সংঘর্ষপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষার্থক বিধানটি ব্যাপকার্থক বিধানকে রহিত করে দেয়। আর এখানে বিশেষার্থক বিধান হলো أزواج (স্ত্রীগণ)। কারন কুরআন শরীফে অপবাদ-সংক্রান্ত আয়াতটি লিআন সংক্রান্ত আয়াতের পরে উল্লেখ থাকলেও (মূলত) লিআনের আয়াতটি অপবাদের আয়াতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। যার প্রমাণ হলো, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, শুক্রবার রাতে আমরা মসজিদে ছিলাম। এমন সময় এক আনসারী লোক এসে বলল, যদি কোনো স্বামী স্বীয় স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষকে একাকিত্বে দেখে আর সে (স্বামী) আপত্তিকর কিছু বলে তাহলে তোমরা তাকে বেত্রাঘাত করে থাক। অথবা যদি সে তাকে হত্যা করে তাহলে তোমরা তাকে (স্বামীকে) হত্যা করে থাক। আর যদি সে নীরব থাকে তাহলে ক্রোধ নিয়েই তাকে নীরব থাকতে হয়। আল্লাহর শপথ, আমি এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর সে পরের দিন রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষ লোককে একাকিত্বে দেখতে পেয়ে আপত্তিকর কিছু বলে তাহলে আপনারা তাকে বেত্রাঘাত করে থাকেন। অথবা যদি সে (তাকে) হত্যা করে তাহলে আপনারা তাকে হত্যা করে থাকেন। অথবা সে যদি নীরব থাকে তাহলে তাকে ক্রোধ নিয়েই নীরব থাকতে হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. বললেন– "হে আল্লাহ! তুমি কোন সহজ ব্যবস্থা করে দাও।" তিনি এ ব্যাপারের দোয়া করতে থাকলেন। যার ফলে লিআনের আয়াত নাযিল হলো।[৪৬] আনসারী ব্যক্তির উক্ত "সে যদি আপত্তিকর কিছু বলে তাহলে তোমরা তাকে বেত্রাঘাত করে থাক" প্রমাণ করে যে, লিআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে অপবাদের মূল বিধান ছিল বেত্রাঘাত। অতঃপর স্ত্রীদের সাথে বিশেষিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা লিআন দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। আর এ কারণে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অপবাদের ফলে মূল বিধানস্বরূপ ফলে লিআনই ওয়াজিব হয়েছে। তাই স্বামী লিআন করা থেকে বিরত থাকলে ওয়াজিব তথা বিধান অস্বীকার করার কারণে লিআন না করা পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হবে। যেমনিভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করলে তাকে বন্দি করে রাখা হয়ে থাকে।[৪৭]

---

৪৫. সূরা নূর, ৪।

৪৬. মুসলিম শরীফ, খ. ২, পৃ. ১১৩৩।

৪৭. বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৩৮; হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৫০, ইবনে নুজাইম রচিত আল্-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ১২৪।

www.amarboi.org

**স্ত্রী লিআন করা থেকে বিরত থাকলে যা করতে হবে**

যদি স্বামী লিআন করে আর স্ত্রী লিআন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে স্ত্রীকে ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে লিআন না করা পর্যন্ত অথবা স্বামীর দাবি সত্যায়ন না করা পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হবে। যদি সে স্বামীকে সত্যায়ন করে তাহলে হানাফী মাযহাবমতে বিনা শাস্তিতে তাকে মুক্ত করা হবে। বন্দি করার ক্ষেত্রে ইমামগণের যুক্তি হলো, পূর্বের আলোচনা অনুসারে লিআন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে অপবাদের মৌলিক বিধান। অতএব স্বামীর লিানের পর স্ত্রীর ওপর লিআন ওয়াজিব হবে। আর যদি সে লিআন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে বন্দি করার মাধ্যমে তাকে লিআন করতে বাধ্য করা হবে। যেরূপ ঋণগ্রস্ত লোক ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করলে পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হয়।

স্বামীকে সত্যায়ন করলে বিনা শাস্তিতে স্ত্রীকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে সত্যায়ন ইচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তি নয়, যার মাধ্যমে শাস্তির বিধান সাব্যস্ত হতে পারে। এমনকি ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে যদি স্বামীকে চারবারও সত্যায়ন করে তা সত্ত্বেও এর দ্বারা শাস্তির বিধান সাব্যস্ত হবে না। আর এজন্যও যে, স্ত্রী যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে অতঃপর স্বীয় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। আর স্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাহারকৃত স্বীকারোক্তির তুলনায় লিআন করা থেকে বিরত থাকা ব্যভিচারের প্রতি কম ইঙ্গিতবহ। সুতরাং লিআন করতে অস্বীকার করার কারণে স্ত্রীর ওপর শাস্তি ওয়াজিব (আবশ্যক) না হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।[৪৮]

হাম্বলী আলেমগণ হানাফী আলেমগণের সাথে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, স্ত্রী লিআন করা থেকে বিরত থাকলে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে স্ত্রী লিআন করা থেকে বিরত থাকলে তার সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে সে ব্যাপারে তারা হানাফী আলেমগণের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন।

এক বর্ণনা মতে কাজী সাহেবের উক্তি অনুসারে বিশুদ্ধতম মত-স্ত্রী লিআন না করা পর্যন্ত অথবা ব্যভিচারের কথা চারবার স্বীকার না করা পর্যন্ত স্ত্রীকে বন্দি করে রাখা হবে। স্ত্রী যদি লিআন করে তাহলে তার থেকে শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী (ব্যভিচারের কথা) স্বীকার করে তাহলে তার ওপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। দ্বিতীয় বর্ণনামতে স্ত্রীকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। কারণ তার ওপর শাস্তি ওয়াজিব হয়নি। সুতরাং তাকে ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। যেমনটি করা হয় পরিপূর্ণ প্রমাণ না পাওয়া গেলে।

---

৪৮. আল্-হিদায়া ও ফাত্হুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৫১; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, খ.২, পৃ. ৯৬৭।

www.amarboi.org

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লিআন শেষ হওয়ার পূর্বে দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হবে না এবং সন্তানের বংশ সম্পর্ক রহিত হবে না।[৪৯]

আর মালেকী ও শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, স্বামী লিআন করার পর যদি স্ত্রী লিআন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করা হবে।[৫০]

প্রমাণ আল্লাহর বাণী–

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

"স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, সে (স্বামী) অবশ্যই মিথ্যাবাদী"।[৫১]

মালেকী আলেমগণ আরো বলেন, স্ত্রী মুসলমান হয়ে থাকলে তার ওপর শরীআত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর সে জিম্মী হলে তার ওপর শিষ্টাচারমূলক শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।[৫২]

## লিআনের ফলাফল

### প্রথমত, স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে লিআনের ফলাফল

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর উভয়ের অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু ফলাফল তথা বিধান আরোপিত হয়।

**প্রথমত :** স্বামী-স্ত্রীর ওপর থেকে শাস্তির বিধান রহিত হওয়া। তাই স্বামীর উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। এবং স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। কারণ, শরীয়ত প্রণেতা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য বিধান শিথিল করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি তাদের থেকে শাস্তির বিধান রহিত করার জন্য লিআনকে শরীয়তের বিধানরূপে ধার্য করেছেন। তাই যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লিআন কার্যকর করা হয় তখন স্বামী থেকে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে আর স্ত্রী থেকে ব্যভিচারের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।[৫৩]

---

৪৯. ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪৪৪ ও ৪৪৫; আশ্-শারহুল কাবীরসহ আল্-মুগনী খ. ৯, পৃ. ৩৭৩।

৫০. আত্-তাজ ওয়াল ইকলীল খ. ৩, পৃ. ১৩৮; মুগনী আল-মুহ্তাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০; রওদাতুত্-তালিবীন খ. ৮, পৃ. ৩৫৬।

৫১. সূরা আন-নূর, ৮।

৫২. হাশিয়াতুদ্-দাসূকী খ. ২, পৃ. ৪৬৬; আল্-খারশী খ. ৪, পৃ. ১৩৫।

৫৩. ফাত্হুল কাদীরসহ হিদায়া খ. ৩, পৃ. ২৫০-২৫১; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন খ. ২, পৃ. ৫৮৭; হাশিয়াতুদ্-দাসূকী খ. ২, পৃ. ৪৬৬; আল্-খারশী খ. ৪, পৃ. ১৩৫; মুগনী আল-মুহ্তাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০; কাশ্শাফুল কিনা খ. ৫, পৃ. ৩৯৯-৪০০।

www.amarboi.org

**দ্বিতীয়ত :** হানাফী আলেমগণের মতে, লিআনের বিধান স্ত্রীর সাথে সহবাস ও তাকে ভোগকরা হারাম করে তবে শুধুমাত্র লিআনের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে না।

যদি স্বামী ইঙ্গিতেও নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তাহলে তাকে অপবাদের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে এবং নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার পর তাকে (পুনরায়) বিয়ে করতে পারবে। তাই তাকে শাস্তি প্রদান করা হোক বা না হোক।[৫৪]

ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, লিআনকারী দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তারা আর কখনো একত্রিত হতে পারবে না। উভয়ের মাঝে চিরকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হবে।[৫৫] দুগ্ধদানের ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হওয়ার ন্যায়।

মালেকী ও হাম্বলী আলেমগণের মতে, স্বামী-স্ত্রীর লিআন সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে তাদের মাঝে চিরতরে বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হয়ে যায়।[৫৬] কারণ উমর রা. বলেছেন, "লিআনকারীদ্বয় যখন লিআন করবে তখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করা হবে এবং তারা আর কখনো বৈবাহিক বন্ধনে একত্রিত হতে পারবে না।[৫৭]
শাফেয়ী আলেমগণের মতে স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর আরোপিত ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি এড়ানোর জন্য লিআন করে তাহলে উক্ত লিআনের ওপর ভিত্তি করে তাদের দুইজনের মধ্যে চিরতরের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হবে। আর যদি কেবল সন্তানের বংশ অস্বীকার করার জন্য লিআন করে তাহলে এ লিআনের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না এবং এর দ্বারা তার থেকে শাস্তিও রহিত হবে না। তবে সে স্ত্রীকে পৃথক করে দেবে অথবা স্ত্রী তার শাস্তি ক্ষমা করে দেবে অথবা সে স্ত্রীর ব্যভিচারের ব্যাপারে প্রমাণ উত্থাপন করবে।

ইমামগণ বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হওয়ার ভিত্তি হলো, স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদের দায়ে আরোপিত শাস্তি এড়ানোর জন্য স্বামী কর্তৃক লিআন করা এর ফলে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা বৈধ নয়। কারণ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল স. লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতেন এবং বলতেন, 'তার ওপর তোমার আর কোনো কর্তৃত্ব নেই'[৫৮] আরো দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ স. বলেন, লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন (বিবাহ) বিচ্ছেদ

---

৫৪. আল্-ফাতাওয়া আল্-হিন্দিয়্যা খ. ১, পৃ. ৫১৫; আদ্-দুররুল মুখতার খ. ২, পৃ. ৫৮৫ ও ৫৯০।
৫৫. ফাত্হুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৫৬।
৫৬. হাশিয়াতুদ্-দাসূকী খ. ২, পৃ. ৪৬৭; শারহু মুন্তাহাল ইরাদাত খ. ৩, পৃ. ২১০।
৫৭. উমর রা.-এর হাদীস বায়হাকী, সুনান খ. ৭, পৃ. ৪১০।
৫৮. বুখারী, আল্ ফাত হুলবারী, খ. ৭, পৃ. ৪৫৭; মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৩২।



www.amarboi.org

হয়ে যাবে তখন তারা আর কখনো (বিবাহ বন্ধনে) একত্রিত হতে পারবে না।[৫৯]

**তৃতীয়ত,** স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটা। তবে হানাফী আলেমগণের মতে[৬০] এবং ইমাম আহমদ র.-এর[৬১] এক বর্ণনা অনুসারে বিচারক কর্তৃক বিচ্ছেদের দ্বারাই কেবল (স্বামী-স্ত্রীর মাঝে) বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি লিআন সংঘটিত হয় আর বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ না করেন তাহলে কিছু বিধান যথা উত্তরাধিকারী সম্পত্তি লাভ ও তালাক সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্ক আছে বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং যদি লিআনের পর এবং বিচারক কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে স্বামী স্ত্রীর যে কোনো একজন মারা যায় তাহলে অপরজন তার উত্তরাধিকারী হবে। যদি লিআনের পর এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে তালাক সংঘটিত হবে। আর যদি সেই মুহূর্তে স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তাহলে নতুন ভাবে বিবাহের আকদ করা ছাড়াই স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে। আর এ ব্যাপারে ইমামগণের প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত দুই লিআনকারীর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ স. তাদের দু'জনের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন।[৬২] কারণ এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর লিআনের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। যদি কেবলমাত্র লিআানের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ স. বিবাহ বিচ্ছেদ করতেন না।[৬৩]

আরো দলীল 'উওয়ায়মির আল-আজলানী রা. বর্ণিত হাদীস, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাকে স্ত্রীরূপে রেখে দিই তাহলে তো আমি তার সম্পর্কে মিথ্যা বললাম! অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. তাকে নির্দেশ করার পূর্বেই সে স্ত্রীকে তিন তালাক দিল।[৬৪] সুতরাং এ ঘটনাটি দ্বারা বুঝা যায় যে, লিআনের পর স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখার অবকাশ আছে এবং (লিআনের পর) তালাক সংঘটিত হতে পারবে। যদি লিআনের কারণে পূর্বেই বিবাহ বিচ্ছেদ হতো তাহলে স্বামীর তালাক সংঘটিত হতো না এবং স্ত্রীকে স্বামীর বিবাহাধীনে রাখা সম্ভব হতো না। তা ছাড়া এই বিচ্ছেদের কারণটি বিচারকের ওপর নির্ভরশীল।

---

৫৯. দারা কুতনী (খ. ৩, পৃ. ২৭৬)। ইমাম যাইলাঈ রহ. তার নাসবুর-রায়া গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ২৫১) ইবনে আবদিল হাদীর বরাত দিয়ে বলেন, এর সনদ উত্তম।

৬০. বাদায়েউস্-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪৪।

৬১. ইবনে কুদামা রচিত আল্-মুগনী।

৬২. পূর্বে এর বরাত উল্লিখিত হয়েছে। দ্র. টীকা নং ৫৮।

৬৩. আল্-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪৫।

৬৪. বুখারী (ফাত্হুল বারী খ. ৯, পৃ. ৩৬১), মুসলিম (খ. ২, পৃ. ১২২৯-১২৩০)।

www.amarboi.org

অতএব যৌন অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ন্যায় বিচারকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিচ্ছেদও তার (বিচারকের) সিদ্ধান্ত ছাড়া সংঘটিত হতে পারে না।[৬৫]

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী[৬৬] আলেমগণের মতে বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভলশীলতা ছাড়াই কেবল লিআনের দ্বারা স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ হবে। আর শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, স্বামীর লিআনের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কযুক্ত যদিও স্ত্রী লিআন না করে। কারণ উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, লিআনকারী দ্বয় লিআন করলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করা হবে এবং আর কখনো তারা বিবাহ বন্ধনে একত্রিত হতে পারবে না।[৬৭] আর এজন্যও যে, লিআনের চাহিদাই হলো, স্থায়ীভাবে হারাম হওয়া। সুতরাং তার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য বিচারকের বিচারের প্রয়োজন নেই। যেমনিভাবে দুগ্ধপান করানোর দ্বারা চিরতরের জন্য বিবাহ হারাম হয়ে যায়। তা ছাড়া যদি বিচারকের বিচ্ছেদ করে দেয়া ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত না হতো তাহলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছেদকে অপছন্দ করার ক্ষেত্রে উভয়কে বিচ্ছেদ না করলেও বৈধ হতো। যেমনিভাবে দোষক্রটি ও দারিদ্র্যের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ না করলেও চলে। (এ ক্ষেত্রে) স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ না করা বৈধ হবে না তাই স্বামী-স্ত্রী রাজি হোক অথবা না হোক।[৬৮]

লিআনোত্তর বিবাহ বিচ্ছেদের ধরন নিয়ে ফিকহবিদগণ মতপার্থক্য করেছেন। এটি কি তালাক না-কি ফসখ (বিবাহ ভঙ্গ)? এবং তারা লিআনোত্তর বৈবাহিক সম্পর্ক হারামের ধরন নিয়েও মতপার্থক্য করেছেন। এটি কি চিরস্থায়ী হারাম যার ফলে স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেও তার জন্য স্ত্রী আর কখনো বৈধ হবে না? না-কি সাময়িক হারাম, যা স্বামী-নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার দ্বারা হারাম শেষ হয়ে যায়?

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমগণ এবং হানাফীদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মাযহাব হলো, লিআন দ্বারা সংঘটিত বিবাহ বিচ্ছেদটি ফসখ (বিবাহ ভঙ্গ)।[৬৯] আর এটি স্থায়ী হারাম সাব্যস্ত করে। যেমনিভাবে দুগ্ধপানের

---

৬৫. ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪১০।

৬৬. আত্-তাজ ওয়াল ইকলীল খ. ৩, পৃ. ১৩৮; মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০; ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪১০; কাশ্শাদুল কিনা খ. ৫, পৃ. ৪০২।

৬৭. উক্ত হাদীসের বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। দ্র. টীকা নং ৫৭।

৬৮. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০।

৬৯. ফাত্হুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৫৫' বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪৫; আশ্-শরহুল কাবীর ও হাশিয়াতুদ্-দাসূকী খ. ২, পৃ. ৪৬৭; আল্-বাহ্জা শারহুত-তুহফা, খ. ১, পৃ. ৩৩৪; মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০, ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪১২-৪১৪।

www.amarboi.org

দ্বারা স্থায়ী হারাম সাব্যস্ত হয়। অতএব লিআনকারী স্বামী-স্ত্রী আর কখনো (পরস্পর) পুনরায় বিবাহ্ করতে পারবে না। যদিও স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে অথবা সাক্ষী হওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। অথবা স্ত্রী তার অপবাদকে সত্যায়ন করে। কারণ লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীদ্বয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "তারা কখনো (বিবাহ্ বন্ধনে) একত্রিত হবে না।[৭০]

আরো একটি দলীল হলো, সাহ্ল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, "পরবর্তীকালে লিআনকারী স্বামী স্ত্রীর মাঝে সুন্নত হিসেবে বিচ্ছেদ করার নিয়ম চালু হয়েছে এবং তারা কখনো (বিবাহ্ বন্ধনে) আবদ্ধ হতে পারবে না।"[৭১]

আর এ জন্যও যে, লিআন যা বিবাহ্ বিচ্ছেদের কারণ তা সংঘটিত হয়েছে। আর স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা অথবা স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন সাক্ষ্যদানে অযোগ্য হওয়া উক্ত কারণ বিদ্যমান হওয়ার অন্তরায় নয়। বরং তা (কারণ) বিদ্যমান আছে সুতরাং তার বিধানও বিদ্যমান থাকবে।

তাছাড়া যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে অপবাদের ক্ষেত্রে সত্যবাদী হয় তাহলে স্ত্রীর চারিত্রিক অবস্থা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তার সাথে পুনরায় সংসার করা সমীচীন নয়। যাতে সে দুশ্চরিত্র মহিলার স্বামীরূপে গণ্য না হয়। আর যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে দুর্ব্যবহার করা, মারাত্মক অপবাদ দেওয়া এবং স্ত্রীর মনে কষ্ট দেওয়ার পর তার সাথে আর সংসার করা সম্ভব নয়। লিআন দ্বারা সংঘটিত (বিবাহ্) বিচ্ছেদকে তালাক বিবেচনা করা সম্ভব নয়। কারণ লিআন শব্দটি স্পষ্ট তালাক নয় এবং এর মাধ্যমে স্বামী তালাকের নিয়তও করেনা।

উপরন্তু লিআন যদি তালাকের পর্যায়ে হতো তাহলে স্বামীর লিআনের দ্বারাই তা সংঘটিত হতো স্ত্রীর লিআনের প্রয়োজন হত না। অথচ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লিআন ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শাফেয়ী আলেমগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন।[৭২]

ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহ. বলেন, লিআনের কারণে সংঘটিত বিবাহ বিচ্ছেদ বায়েন তালাক হিসেবে গণ্য হবে, ফসখ (বিবাহ ভঙ্গ) নয়। কারণ এ বিচ্ছেদটি স্বামীর পক্ষ থেকে আর বিচারক তার (স্বামীর) স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বিচ্ছেদ সম্পাদন করে। তাই বিচারকের কাজ স্বামীর। আর বিবাহ বিচ্ছেদ যেহেতু স্বামীর পক্ষ থেকে হয়েছে এবং এ বিচ্ছেদকে তালাক সাব্যস্ত করা সম্ভব সেহেতু এটিকে তালাক গণ্য করা হবে, ফসখ (বিবাহ ভঙ্গ) নয়।

---

৭০. হাদীসের বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। দ্র. টীকা নং ৫৯।

৭১. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৬৮২।

৭২. ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪১৩-৪১৪; মুগনী আল-মুহ্তাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০।

www.amarboi.org

আর বিচারকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে এই তালাককে বায়েন তালাক ধরা হবে। আর যে সকল বিবাহ বিচ্ছেদ বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল তা বায়েন তালাক হিসেবে গণ্য। তারা বলেন, স্বামী যদি নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে অথবা সে সাক্ষ্যদানের অযোগ্য হয়ে যায় অথবা স্ত্রী সাক্ষ্যদানের অযোগ্য হয়ে যায় তাহলে লিআনের ভিত্তিতে যে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে তা আর অবশিষ্ট থাকে না। কারণ স্বামী যদি নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তাহলে তা তার পক্ষ থেকে লিআন প্রত্যাহার হিসেবে গণ্য করা হয়। আর লিআন হলো (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মতামতের ওপর সাক্ষ্য। আর সাক্ষ্য প্রত্যাহারের পর সাক্ষ্যের কোন মূল্য থাকে না। এমতাবস্থায় স্বামীকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে। আর যদি সন্তানের বংশ অস্বীকার সম্পর্কিত অপবাদ দিয়ে থাকে তাহলে তার থেকে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে।

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কেউ সাক্ষ্যদানের অযোগ্য হয়ে যায় তাহলে যে কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছিল সে কারণ অর্থাৎ লিআন কার্যকর থাকবে না। যার ফলে লিআনের বিধান তথা অবৈধতাও রহিত হয়ে যাবে।[৭৩]

**দ্বিতীয়ত : সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে লিআনের ফলাফল**

যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন লিআন সম্পন্ন হয়, যার বিষয়বস্তু হলো সন্তানের বংশ অস্বীকার করা তাহলে স্বামী থেকে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে না; বরং সন্তানকে মায়ের সাথে যুক্ত করা হবে। তবে উক্ত বিধানের জন্য নিম্নের শর্তগুলো প্রযোজ্য।

**প্রথম শর্ত : তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করা**

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে সন্তান জন্মলাভ করার সময় অথবা নবজাতকের জন্মানুষ্ঠানকালে স্বামী কর্তৃক সন্তানের বংশ অস্বীকার করা। জাহিরুর রেওয়ায়াতে ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এ সময়কালের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমার বর্ণনা নেই : বরং সময় নির্ধারণের বিষয়টি বিচারকের বিবেচনায় ন্যস্ত করা হয়েছে। কারণ সন্তানের বংশ অস্বীকার অথবা স্বীকার করার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, সে সন্তানের বংশ অস্বীকার করছে অথচ সে তারই সন্তান। আবার অনেক সময় এমন সন্তানের বংশ স্বীকার করে, যে তার সন্তান নয়। আর এই উভয় কাজই শরীয়ত অবৈধ ঘোষণা করেছে। তাই চিন্তা-ভাবনা করার জন্য স্বামীকে অবশ্যই সময় দিতে হবে। ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে এই সময়টি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং এমন একটি সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, যা সকলের জন্য সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তাই এ বিষয়টি তথা সময় নির্ধারণের বিষয়টি বিচারকের দায়িত্বে ন্যস্ত হবে।

---

৭৩. ফাতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৫৫।

www.amarboi.org

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান র. বলেন, উক্ত অবস্থায় নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ তথা চল্লিশ দিন নির্ধারণ করা হবে। কারণ, নেফাস (প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ-কালীন সময়) হলো সন্তান প্রসবের নিদর্শন। তাই এটি সন্তান প্রসবের বিধান গ্রহণ করবে। অতএব যেমনিভাবে সে সন্তান প্রসবের সময় তার বংশ অস্বীকার করতে পারে তেমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রসবের নিদর্শন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামী সন্তানের বংশ অস্বীকার করতে পারবে।[৭৪]

মালেকী মাযহাবমতে, শাফেয়ী আলেমগণের বর্তমান মাযহাব এবং হাম্বলী আলেমগণের মাযহাবমতে গর্ভ অথবা সন্তান অস্বীকার করার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে দ্রুত অস্বীকার করা শর্ত। গর্ভ অথবা সন্তান সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও যদি তখন অস্বীকার না করে অতঃপর লিআনের মাধ্যমে অস্বীকার করতে চায় তাহলে তাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না এবং তার ওপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তাই তার নীরবতার সময়কাল দীর্ঘ হোক যথা এক মাস। অথবা সামান্য হোক যথা এক দিন বা দুই দিন। তবে উযরের কারণে যদি নীরব থাকে তাহলে তার মাসআলা ভিন্ন।[৭৫]

'মুগনী আল-মুহতাজ' গ্রন্থে আছে, তৎক্ষণাৎ সন্তানের বংশ অস্বীকার করতে হবে। কারণ নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য এ বিষয়টি শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তাই তা ত্বরিত হতে হবে। যেমনিভাবে ক্রুটির কারণে পন্য ফেরত দেওয়া এবং শুফআর দাবির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কোন অসুবিধাবশত সন্তান অস্বীকার করায় স্বামীর বিলম্ব ক্ষমাযোগ্য হতে পারে। যথা– রাত্রিতে তার নিকট সংবাদ পৌছল আর সে সকাল পর্যন্ত বিলম্ব করল। অথবা সে ক্ষুধার্ত ছিল আর সে (সংবাদ আসার পর) খেয়ে নিল। অথবা সে নগ্ন ছিল (সংবাদ আসার পর) কাপড় পরল। স্বামী যদি বন্দি থাকে অথবা রোগী হয় অথবা সম্পদ হারানোর আশংকা করে তাহলে বিচারকের নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করবে যিনি বিচারকের নিকট লিআন করবে অথবা জানাবে যে, সে সন্তানের বংশ অস্বীকারের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। যদি সে এমনটি না করে তাহলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি প্রতিনিধি প্রেরণ করা অসম্ভব হয় তাহলে সম্ভব হলে সাক্ষী রাখবে আর যদি সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষী না রাখে তাহলে তার অধিকার বাতিল হবে।[৭৬]

ইবনে কুদামা রচিত 'আল-মুগনী' গ্রন্থে আছে, স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে আর স্বামী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সন্তানের বংশ অস্বীকার না করে নীরব থাকে তাহলে

---

৭৪. বাদায়েউস্-সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ২৪৬; ফাতহুল কাদীরসহ হিদায়া খ. ৩, পৃ. ২৬০-২৬১।
৭৫. আল্-বাহ্জা ফী শারহিত-তুহফা, খ. ১, পৃ. ৩৩৫; আশ-শারহুস সগীর খ.৩, পৃ. ১৮।
৭৬. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০-৩৮১।

www.amarboi.org

অবশ্যই তার থেকে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে এবং পরবর্তিতে সন্তানের বংশ অস্বীকারের সুযোগ থাকবে না। আর এই অস্বীকারের মেয়াদকাল তিনদিন নির্ধারিত নয়; বরং প্রচলিত অভ্যাস অনুযায়ী ধরে নেওয়া হবে। যদি রাতে অবগত হয় তাহলে সকালে জনসাধারণ রাস্তা-ঘাটে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত অস্বীকারের সুযোগ থাকবে। আর যদি সে ক্ষুধার্ত অথবা তৃষ্ণার্ত হয় তাহলে খাওয়া বা পান করা পর্যন্ত। আর তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে ঘুমানো পর্যন্ত অথবা কাপড় পরিধান এবং যানবাহনে আরোহন করা পর্যন্ত, নামাযের সময় হলে নামায পড়া পর্যন্ত, সম্পদ অসংরক্ষিত হলে তা সংরক্ষণ করা পর্যন্ত অথবা অনুরূপ কাজ করা পর্যন্ত বিলম্বে সন্তানের বংশ অস্বীকার করতে পারবে। যদি এর চেয়ে অতিরিক্ত বিলম্ব করে তাহলে তার অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে না।[৭৭]

### দ্বিতীয় শর্ত : স্বীকার না করা

স্পষ্ট ভাষায় অথবা ইঙ্গিতে স্বামীকর্তৃক সন্তানের বংশ স্বীকার না করা। স্পষ্টভাষায় স্বীকার করার উদাহরণ হলো, স্বামী কর্তৃক বলা যে, এটি আমার সন্তান। অথবা এ সন্তান আমার থেকে জন্ম লাভ করেছে। ইঙ্গিতে স্বীকার করার উদাহরণ হলো, নবজাতকের জন্মানুষ্ঠান অনুমোদন করা অথবা জন্মানুষ্ঠানের সময় নীরব থাকা এবং জন্মানুষ্ঠানের আয়োজনকারীর প্রতি কোন রূপ প্রতিবাদ না করা। কারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোক সাধারণত এমন সন্তানের জন্মানুষ্ঠানে নীরব থাকতে পারে না, যে সন্তান তার নিজের ঔরসজাত নয়। সুতরাং সে যদি নীরব থাকে তাহলে তার নীরবতা ইঙ্গিতমূলকভাবে তার থেকে বংশ স্বীকার করে নেয়া বুঝাবে।[৭৮] অতএব স্বামী যদি স্পষ্টভাষায় অথবা ইঙ্গিতে সন্তানের বংশ স্বীকার করে অথবা বংশ অস্বীকারের ব্যাপারে নীরব থাকে। আর এ অবস্থায় নবজাতকের জন্মানুষ্ঠানের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় অথবা নিফাসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় অথবা এমন সময় কেটে যায় যাতে বংশ স্বীকারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে অস্বীকার করেনি। এরপর সে সন্তানের বংশ অস্বীকার করে তাহলে এর দ্বারা তার থেকে সন্তানের বংশ রহিত হবে না। কেননা এই সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত বংশ অস্বীকার না করে নীরব থাকা সন্তানের বংশের স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। আর বংশের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা যায় না।

---

৭৭. ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪২৪-৪২৫।

৭৮. বাদায়েউস্-সানায়ে খ. ৩, পৃ. ২৪৭; ফাত্হুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৬০; আদ্-দুররুল মুখতার ও হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন খ. ২, পৃ. ৯৭৩; ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ.৭, পৃ. ৪২৬; মুগনী আল-মুহতাজ খ. ২, পৃ. ৯৭৩।

www.amarboi.org

হানাফী আলেমগণের মতে এই পরিস্থিতিতে স্ত্রী তার ও তার স্বামীর মধ্যে লিআন করার দাবি করার অধিকার রাখে। কেননা সে সন্তানের বংশ অস্বীকার করার কারণে স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারী হয়ে গেছে। তাই পারস্পরিক লিআনের মাধ্যমে স্ত্রী স্বীয় অপমান এড়ানোর অধিকার রাখে। যদি স্ত্রীর দাবির ভিত্তিতে উভয়ের মাঝে লিআন সংঘটিত হয় তাহলে লিআনের কারণে স্বামী থেকে সন্তানের বংশ ছিন্ন হবে না। কারণ স্পষ্ট ভাষায় অথবা ইঙ্গিতে স্বীকার করার দ্বারা তার বংশ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং পরবর্তীকালে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।[৭৯]

মালেকী আলেমগণ বলেন, যদি সন্তানের বংশ অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন করা অসম্ভব হয় যথা স্ত্রীকে ব্যভিচার করতে দেখার পর অথবা সন্তান প্রসব করা অথবা সন্তান গর্ভে ধারণ করা সম্পর্কে জানার পর লিআনকারী স্বামী স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা সন্তান গর্ভে ধারণ করা অথবা প্রসব করা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও বিনা কারণে লিআন করতে একদিন অথবা দু'দিন বিলম্ব করে। এ সকল অবস্থায় লিআন করা অসম্ভব হয়ে যায় এবং সন্তানের বংশ তার থেকে সাব্যস্ত হয় আর সে স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকে। স্ত্রী যদি মুসলমান হয় তাহলে স্বামীকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে।[৮০]

**তৃতীয় শর্ত, সন্তান জীবিত থাকা**

হানাফী আলেমগণের মতে লিআন করার সময় এবং (বিচারক কর্তৃক) তার বংশ বিচ্ছেদের রায় দেওয়ার সময় সন্তান জীবিত থাকা শর্ত। সুতরাং স্ত্রী যদি সন্তান জন্ম দেয় আর স্বামী তার বংশ অস্বীকার করে অতঃপর লিআনের পূর্বে সন্তান মারা যায় অথবা পরে কিন্তু (বিচারক কর্তৃক) স্বামীর বংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার রায় দেওয়ার পূর্বে (মারা যায়)। তাহলে বংশ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ মৃত্যুর মাধ্যমে বংশ সুদৃঢ় হয়েছে। আর কোন বস্তু যখন সুদৃঢ় হয়ে যায় তখন তা রহিত করা যায় না। তবে লিআনের পূর্বেই যদি সন্তান মারা যায় তাহলে ব্যভিচারের অপবাদজনিত লজ্জা দূর করার উদ্দেশ্যে স্ত্রী লিআনের দাবি করার অধিকার রাখে।[৮১]

এ ব্যাপারে মালেকী আলেমগণ হানাফী আলেমদেরকে অনুসরণ করেন। তবে তাঁরা বলেন, সন্তান মারা যাওয়ার পর স্বামী তার থেকে অপবাদের শাস্তি দূর

---

৭৯. বাদায়েউস্-সানায়ে খ. ৩, পৃ. ২৪৭; ফাত্হুল কাদীরসহ হিদায়া খ. ৩, পৃ. ২৬০-২৬১; আদ্-দুররুল মুখতার ও হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন খ. ২, পৃ. ৯৭৩।

৮০. আশ্-শারহুল কাবীর ও হাশিয়াতুদ্-দাসূকী খ. ২, পৃ. ৪৬৩।

৮১. বাদায়েউস্-সানায়ে খ. ৩, পৃ. ২৪৭।

www.amarboi.org

করার জন্য লিআনের দাবি করার অধিকার রাখে।[৮২]

শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমগণ বলেন, লিআনের মাধ্যমে সন্তানের বংশ অস্বীকার করার জন্য লিআনের সময় সন্তান জীবিত থাকা শর্ত নয়। কারণ মৃত্যুর কারণে সন্তানের বংশ বিচ্ছিন্ন হয় না; বরং বলা হয় অমুকের সন্তান মারা গেছে। এটি অমুকের সন্তানের কবর। আর স্বামী কর্তৃক তার দাফন-কাফন ওয়াজিব। সুতরাং (মৃত্যুর পর) তার বংশ অস্বীকার করা এবং ব্যয়ভারের দায়িত্ব এড়ানোর বিষয়টি সন্তানের জীবিত থাকার মতই হবে।[৮৩]

**বংশ অস্বীকারকৃত সন্তানকে অপরিচিত ব্যক্তিতে পরিণত করার দিক থেকে লিআনের ফল**

লিআনের ভিত্তিতে যে সন্তানের বংশ পরিচয় পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং মায়ের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয় কতিপয় বিধানের ক্ষেত্রে সে সন্তান অপরিচিত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হয়, আর কতিপয় বিধানের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হয় না।

**নিম্নের বিধানগুলোতে বংশবিচ্ছিন্নকৃত সন্তান অপরিচিত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হবে**

**ক. উত্তরাধিকার :** সর্বসম্মতিক্রমে লিআনকারী এবং ঐ সন্তানের মাঝে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না লিআনের মাধ্যমে যার বংশ অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পিতৃত্বের সম্পর্ক ধর্তব্য হবে না। সুতরাং লিআনের মাধ্যমে যে সন্তানের বংশসম্পর্ক বাতিল করা হয়েছে সে যদি অর্থসম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে পিতৃত্বের সম্পর্ক দ্বারা কেউ তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। তবে ঐ সন্তানের মা ও মায়ের পক্ষের আত্মীয়স্বজন তার উত্তরাধিকারী হবে।[৮৪]

**খ. ব্যয়ভার বহন :** লিআনের মাধ্যমে যার বংশ অস্বীকার করা হয়েছে। সর্বসম্মতভাবে লিআনকারী ও সে সন্তানের মাঝে পিতা কর্তৃক সন্তানের ব্যয়ভার এবং সন্তান কর্তৃক পিতার ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হবে না।[৮৫]

**নিম্নের বিধানগুলোতে সন্তান অপরিচিতের পর্যায়ভুক্ত হবে না**

**ক. সাক্ষ্য :** হানাফী ও মালেকী আলেমগণের মাযহাব হলো, (রক্ত সম্বন্ধীয়) অধস্তন আত্মীয়দের থেকে উর্ধতনের পক্ষে সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে

---

৮২. হাশিয়াতুদ্-দাসুকীসহ আশ্-শরহুল কাবীর খ. ২, পৃ. ৪৫৯; আত্-তাজ ওয়াল ইকলীল খ. ৪, পৃ. ১৩৩; হাশিয়াতুল আদবীসহ শারহুল খারশী খ. ৪, পৃ. ২৬৫; ইবনে কুদামা, আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪১৯।

৮৩. মুগনী আল-মুহ্তাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০।

৮৪. আল্-মাব্সূত, খ. ২৯, পৃ. ১৯৮; মিনাহুল জালীল খ. ৪, পৃ. ৭৫২; রওদাতুত্ তালিবীন খ. ৬, পৃ. ৪৩; শারহু মুসলিম খ. ১০, পৃ. ১২৪; আল্-মুগনী খ. ৬, পৃ. ২৫৯।

৮৫. ফাত্হুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৬২; আল্-হাত্তাব খ. ৪, পৃ. ১৯১; আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৬০৮।

www.amarboi.org

এর বিপরীতে লিআনের মাধ্যমে যার বংশ অস্বীকার করা হয়েছে তার পক্ষে লিআনকারী ও তার উর্ধ্বতন আত্মীয়দের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

বংশ অস্বীকারকারী ও তার উর্ধতন আত্মীয়দের পক্ষে বংশ অস্বীকারকৃত ব্যক্তি ও তার কোনো অধস্তন আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, সে অর্থাৎ সন্তান নিজেকে লিআনকারীর সাথে (বংশের দিক থেকে) সম্পর্কযুক্ত করতে চায়।

**খ. কিসাস তথা মৃত্যুর বিনিময়ে মৃত্যুদণ্ড :** লিআনকারী যদি লিআনের মাধ্যমে যে সন্তানের বংশ অস্বীকার করেছে সেই সন্তানকে হত্যা করে তাহলে লিআনকারীকে হত্যা করা হবে না, যেমন বিধান পিতা কর্তৃক পুত্রকে হত্যা করা হলে।[৮৬]

**গ. অন্যের সাথে বংশ সম্পৃক্তকরণ :** লিআনকারী ছাড়া অন্য লোক যদি লিআনের মাধ্যমে বংশ অস্বীকারকৃত সন্তানের (বংশ নিজের থেকে হওয়ার) দাবি করে তাহলে তার দাবি শুদ্ধ হবে না এবং তার দ্বারা তার থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে না। কারণ লিআনকারী কর্তৃক নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা আছে তখন উক্ত সন্তানের বংশ তার থেকেই সাব্যস্ত হবে ।

**ঘ. মাহরাম হওয়া :** লিআনকারীর যদি অন্য স্ত্রীর পক্ষের কন্যা থাকে আর সে ঐ কন্যাকে এমন লোকের সাথে বিবাহ দিতে চায় লিআনের মাধ্যমে যার বংশ অস্বীকার করেছে অথবা তার সন্তানের সাথে তাহলে উক্ত বিবাহ বৈধ হবে না। কেননা সন্তানটি লিআনকারীর পুত্র হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত যে শয্যা (স্ত্রী) এর মাধ্যমে বংশ সাব্যস্ত হতে পারে জন্মের সময় সে শয্যা বিদ্যমান ছিল। আর এতটুকু সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।[৮৭]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, লিআনের মাধ্যমে যে কন্যা সন্তানের বংশ অস্বীকার করা হয়েছে তার হুকুম হলো লিআনকারী উক্ত কন্যা সন্তানের মায়ের সাথে সঙ্গম না করলেও বংশ অস্বীকারকারীর জন্য উক্ত কন্যাকে বিবাহ করা হারাম হবে। কারণ সে (লিআনকারী) যদি নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তাহলে উক্ত কন্যা সন্তানের বংশ তার সাথে যুক্ত হতে পারে। তাই কন্যা সন্তানটি লিআনকারীর বংশ থেকে নিশ্চিতরূপে পৃথক হতে পারে না।

আর এ জন্যও যে, কন্যা সন্তানটি সঙ্গমকৃত স্ত্রীর কাছে তার পালক কন্যা। তাই তার বৈবাহিক অবৈধতা লিআনকারীর সকল মাহরাম (যাদের সাথে সর্বকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম) পর্যন্ত সংক্রমিত হবে। লিআনের মাধ্যমে বংশ

---

৮৬. হাশিয়াতুদ্-দাসূকী খ. ৪, পৃ. ১৬৮; ফাতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৬২।

৮৭. বাদায়েউস্-সানায়ে খ. ৩, পৃ. ২৪৮; ফাত্হুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ২৬৩; আদ্-দুররুল মুখতার ও হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন খ. ২, পৃ. ৯৭৫।

www.amarboi.org

অস্বীকারকারী কর্তৃক বংশ অস্বীকারকৃত কন্যা সন্তানকে হত্যা করার দ্বারা তার মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব হওয়া এবং সে (বংশ অস্বীকারকারী) কর্তৃক তাকে (উক্ত কন্যা সন্তানকে) অপবাদ দেওয়ার দ্বারা শাস্তি ওয়াজিব হওয়া, তার (উক্ত কন্যা সন্তানের) সম্পদ চুরি করার দ্বারা হাত কর্তন ওয়াজিব হওয়া এর কোনটাই কার্যকর হবেনা উক্ত কন্যা তার পালিত কন্যা হবার কারণে। আর উক্ত কন্যা সন্তানের জন্য লিআনের মাধ্যমে বংশ অস্বীকারকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে দু'ধরনের মতামত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো ওয়াজিব হবে না।[৮৮]

**শাফেয়ী আলেমগণের মতে লিআনের ফলাফলের মধ্যে আরো আছে :**

ক. সঙ্গম করার পূর্বে লিআনকারিণী স্ত্রীর মহর অর্ধেক করা।

খ. স্ত্রী লিআন না করলে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রহিত হওয়া।

গ. লিআনকারিণী স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা এবং তার সাথে অন্য যাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম তাকে বিবাহ করা অথবা তার ইদ্দতের মধ্যে তাকে ছাড়া আরো চারজন বিবাহ করা বৈধ হওয়া।[৮৯]

**লিআন সুদৃঢ় করা**

শাফেয়ী আলেমগণের মাযহাব হলো, লিআনকে সুদৃঢ় করা সুন্নত। হাম্বালী আলেমদেরও অনুরূপ মাযহাব রয়েছে।

মালেকী আলেমগণের মতে এবং শাফেয়ী আলেমগণের একটি মতে তা ওয়াজিব। আর হাম্বলী আলেম কাজী র. মতে কোনো স্থান বা সময়ের দ্বারা লিআনকে সুদৃঢ় করা সুন্নত নয়।

(নিম্নের) যে কোন একটি বিষয় দ্বারা লিআনকে সুদৃঢ় করা যায় :

**ক. সময়ের দ্বারা লিআনকে সুদৃঢ় করা**

মুসলমানের লিআনকে সময়ের দ্বারা সুদৃঢ় করা হবে। যদি দ্রুত করতে চায় তাহলে সে সময়টি হলো প্রতিদিন আসরের নামাযের পর। কারণ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আসরের পরের মিথ্যা শপথের শাস্তি অধিক কঠিন।

হাদীসটি নিম্নরূপ– "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর রাসূলুল্লাহ স. এমন লোককে উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করেছেন, যে আসরের পর

---

৮৮. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ১৭৫।
৮৯. মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮০।

www.amarboi.org

এমন মিথ্যা শপথ করে যার মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে।[৯০]

আর যদি লিআন করার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন না হয় তাহলে প্রতি শুক্রবার আসর নামাযের পর লিআন করে তা সুদৃঢ় করা উত্তম। কারণ এ সময়টি দু'আ কবুল হওয়ার সময়। আর কেউ কেউ শুক্রবার আসরের সাথে আরো কিছু মহৎ সময়কে যুক্ত করেছেন যথা রজব মাস, রমযান মাস, দুই ঈদের দিন, আরাফার দিন ও আশুরার দিন।

**খ. স্থানের দ্বারা লিআনকে সুদৃঢ়করণ**

স্থানের দ্বারা লিআনকে সুদৃঢ় করা যায়। এভাবে যে, দেশের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে লিআন সম্পাদন হবে। কারণ মিথ্যা শপথ থেকে সতর্কীকরণে এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। সুতরাং মক্কায় লিআন হলে সেই স্তম্ভের কাছে হবে যেখানে হাজরে আসওয়াদ রয়েছে এবং মাকামে ইবরাহীমের কাছে হবে। আর মদীনাতে লিআন হলে মসজিদে নববীর মিম্বরের কাছাকাছি যে অংশ রাসূল স.-এর কবরের সাথে মিলিত সেখানে হবে।

আর কিতাবুল উম্ম ও আল-মুখতাসারে উল্লেখ আছে যে, মিম্বরে হতে হবে। আর জেরুজালেমে লিআন হলে মসজিদে আকসায় সাখরা নামক স্থানে হতে হবে। কেননা তা সকল নবীর কেবলা থাকার কারণে মসজিদে আকসার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থান। হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে যে, সাখরা জান্নাত থেকে এসেছে।[৯১]

উক্ত তিন মসজিদের কাছে অবস্থানরত ব্যক্তি উক্ত তিন মসজিদে লিআন করে তাদের লিআনকে সুদৃঢ় করবে। আর যে লোক উক্ত মসজিদে অবস্থানরত নয় তাকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বে সেখানে নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া অন্যান্য জামে মসজিদের মিম্বরের নিকট লিআনকে সুদৃঢ় করা হবে। কারণ এ স্থানটি অধিক সম্মানিত।

ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে অবস্থান হারাম হওয়ার কারণে সে জামে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে লিআন করবে। মুসলমান ছাড়া অন্য আসমানী কিতাবের অনুসারী লোক গীর্জা বা প্যাগোডায় লিআন করবে। ইহুদী বলবে, "আমি ঐ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, যিনি মুসা আ.-এর নিকট তাওরাত

---

৯০. বুখারী, ফাতহুল বারী খ. ৫, পৃ. ৩৪; ইমাম মুসলিম খ. ১, পৃ. ১০৩; যা আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস।

৯১. আল-হাইছামী, মাজমাউয-যাওয়ায়েদ খ. ৯, পৃ. ২১৭-২১৮, তিনি বলেন হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আর উক্ত হাদীসের রাবীদের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ ইবন মাখলাদ আররু'আয়নী। আর এটি তার মুনকার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

www.amarboi.org

নাযিল করেছেন।" আর খ্রিস্টান বলবে, "আমি ঐ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, যিনি হযরত ঈসা আ.-এর নিকট ইঞ্জিল নাযিল করেছেন।"

বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, অগ্নিপূজক লোক অগ্নিগৃহে লিআন করবে। কারণ তারা উক্ত ঘরকে সম্মান করে। কেননা উদ্দেশ্য হলো মিথ্যা বলা থেকে সাবধান করা।

ইমাম মাওয়ারেদীর বর্ণনামতে কাফের ব্যক্তির লিআন সময়ের দ্বারা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হবে ঐ সময়, যা তাদের কাছে মর্যাদাপূর্ণ।

### গ. জনতার উপস্থিতি দ্বারা লিআনকে সুদৃঢ় করা

দেশের ন্যায়পরায়ণ, বরেণ্য ও সৎ লোকদের একটি বড় দলের উপস্থিতি দ্বারা লিআনকে সুদৃঢ় করা। কারণ তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, মিথ্যা থেকে বিরত রাখতে এটি ফলপ্রসূ। এদের সর্বনিম্ন সংখ্যা চারজন হতে হবে। কেননা ব্যভিচার সাব্যস্ত হবার জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। সুতরাং লিআনের সময় এই সংখ্যক লোকের উপস্থিতি মুস্তাহাব। আর বিচারকের উপস্থিতিও আবশ্যক যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে।[৯২]

### লিআনের সুন্নতসমূহ

### ক. বিচারক কর্তৃক লিআনকারীদ্বয়কে উপদেশ প্রদান

বিচারক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য সুন্নত হলো, আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে লিআনকারীদ্বয়কে উপদেশ দান করা। রাসূলুল্লাহ স. হযরত হিলাল রা.-কে বলছিলেন, আখিরাতের শাস্তি অপেক্ষা দুনিয়ার শাস্তি অনেক হালকা।[৯৩] আর লিআনকারীদ্বয়কে এ আয়াত পড়ে শুনাবে–

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং তাদের শপথকে স্বল্প মূল্যে ক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে চাইবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না;

---

৯২. আত্-তাজ ওয়াল ইকলীল টীকাসহ মাওয়াহিবুল জালীল খ. ৪, পৃ. ১৩৭; আদ্-দাসূকী খ. ২, পৃ. ৪৬৪; আশ্-শরহুস সগীর খ. ২, পৃ. ৪৬৪; মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৭৬-৩৭৮; রওদাতুত তালিবীন খ. ৮, পৃ. ৩৫৮-৩৫৬; আল্-ইনসাফ খ. ৯, পৃ. ২৩৯-২৪০; আল্-মুগনী খ. ৭, পৃ. ৪৩৪-৪৩৭; কাশ্শাফুল কিনা খ. ৫, পৃ. ৩৯৩।

৯৩. মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১১৩১।

www.amarboi.org

তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে"।[৯৪] তাদেরকে আরো বলবে, রাসূল স. লিআনকারী দু'জনকে বলেছিলন, "আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী, অতএব তোমরা কেউ কি তাওবা করবে"?[৯৫] চারটি শপথ বাক্য শেষান্তে বিচারক ও বিচারক পর্যায়ের লোকজন লিআনের পঞ্চম বাক্য আরম্ভ করার পূর্বেই লিআনকারীদ্বয়কে উপদেশ ও নসিহত করে অনেক বুঝাবে।

### খ. লিআনকারীদ্বয়ের দাঁড়ানো

লিআনকারীদ্বয়ের জন্য সুন্নত হলো দাঁড়িয়ে লিআন করা, যেন লোকেরা তাদেরকে দেখতে পায় এবং তাদের বিষয়টি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং স্বামী তার লিআনের সময় দাঁড়াবে আর স্ত্রী বসে থাকবে। আর স্ত্রী স্বীয় লিআ্যানের সময় দাঁড়াবে এবং স্বামী বসে থাকবে। আর যদি তাদের মধ্যে একজন দাঁড়াতে অক্ষম হয় তাহলে সে বসে অথবা শুয়ে লিআন করবে।[৯৬]

**–মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান**

---

৯৪. সূরা আলে-ইমরান, ৭৭।

৯৫. মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১১৩২।

৯৬. বরাত প্রাগুক্ত গ্রন্থসমূহ।

www.amarboi.org

# ইদ্দত (عِدَّةٌ)

**সংজ্ঞা : শাব্দিক বিশ্লেষণ :** ইদ্দত শব্দটি আরবী اَلْعَدّ ও اَلْحِسَابُ হতে গৃহীত। عـد শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গণনা করা। যেহেতু ঋতু বা মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালিত হয় সেজন্য তার এরকম নামকরণ করা হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা মহিলার ইদ্দত গণনা করা হয় তার ঋতু বা গর্ভের দিন অথবা চার মাস দশ দিন গণনার মাধ্যমে। ইদ্দত শব্দের বহুবচন ইদাদুন (عِدَدٌ) যেমন সিদরাতুন (سِدْرَةٌ) শব্দের বহুবচন হয় সিদারুন (سِدَرٌ)।

'উদ্দাতুন (اَلْعُدَّةُ) শব্দের অর্থ হলো, যুদ্ধ ইত্যাদির সরঞ্জাম। বহুবচন উদাদুন (عُـدَدٌ) যেমন গুরফাতুন (غُرْفَةٌ) শব্দের বহুবচন হয় গুরাফুন (غُـرَفٌ) ইদ্দুন শব্দের অর্থ হলো, এমন প্রবহমাণ পানি যা বন্ধ হয় না। যেমন- জলাশয় ও কূপের পানি।[১]

**পারিভাষিক অর্থ :** সেই নির্ধারিত সময়কালের নাম, যে সময়ে মহিলা তার গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত কি-না তা জানা অথবা ইবাদাতের জন্য অথবা স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনের জন্য প্রতীক্ষা করে।

**সমার্থক শব্দসমূহ**

**ক. (اَلْاِسْتِبْرَاءُ ) আল- ইসতিবরা**

ইসতিবরা এর আভিধানিক অর্থ হলো, মুক্তির পথ তলব করা, পবিত্র হওয়া এবং দূরে থাকা। অথবা ওজর সাব্যস্ত হওয়া এবং সতর্ক করা। গর্ভসঞ্চারণ হতে মহিলার মুক্তি চাওয়া।[২]

অথবা কোনো সূক্ষ্ম কাজ নিয়ে গবেষণা করা।[৩]

পারিভাষিক অর্থে ইসতিবরা দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় : এক. পেশাব পায়খানার রাস্তার অপবিত্রতা দূর করা।[৪] দুই. বংশের পবিত্রতা কামনা করা। তা এভাবে যে, যৌনসম্পর্ক রয়েছে এমন দাসীর গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত কি-না তা জানার জন্য অথবা ইবাদাতের জন্য উক্ত দাসীর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা।[৫]

---

১. লিসানুল আরাব; আল-মিসবাহুল মুনীর।

২. প্রাগুক্ত।

৩. আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯০।

৪. আর-রাসা', শারহ হুদুদি ইবনে আরাফা, পৃ. ৩৬।

৫.মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০৮।

www.amarboi.org

এদিক দিয়ে ইসতিবরা ইদ্দত শব্দের সমার্থক যে, উভয়টিতে মহিলার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়। তবে ব্যতিক্রমও আছে তা হলো ইদ্দতপালন সর্বাবস্থায় ওয়াজিব হয়, পেটে বাচ্চা না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও; কিন্তু ইসতিবরা'তে সেরকম বাধ্যবাধকতা নেই। এছাড়া দাসীর একটিমাত্র হায়েজ পালনের মাধ্যমে ইসতিবরা' অর্জিত হয়ে যায়। ইদ্দতে তা হয় না।[৬]

**খ. (الإِحْدَادُ) ইহদাদ**

ইহদাদ শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো, বারণ করা। এ থেকেই শোক প্রকাশের জন্য মহিলাকে সাজসজ্জা থেকে বিরত থাকাকে ইহদাদ বলে।[৭]

পারিভাষিক অর্থে বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে সাজসজ্জা এবং এ ধরনের কর্ম হতে মহিলাকে বিরত থাকাকে ইহদাদ বলা হয়।[৮]

ইহদাদ ও ইদ্দতের সাথে সম্পর্ক হলো, ইদ্দত হলো ইহদাদের (সাজসজ্জার) সময় কাল (পাত্র)। ইদ্দতের মধ্যে মহিলাকে তার স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে সাজসজ্জা হতে বিরত থাকতে হয়।

**গ. (التَّرَبُّصُ) তারাব্বুস**

তারাববুস শব্দের অর্থ হলো অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষায় থাকা।[৯] ইরশাদ হচ্ছে :

فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ

"সুতরাং তোমরা এর সম্পর্কে কিছু কাল অপেক্ষা কর।"[১০]

তারাববুস ও ইদ্দতের মাঝে সম্পর্ক হলো, ইদ্দতের জন্য তারাববুস হলো, সময়স্বরূপ (পাত্র-ظرف)। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে অপেক্ষাও শেষ হয়ে যায়। আর তারাব্বুস ইদ্দতের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যেমন ঋণের ক্ষেত্রে সময় প্রদান।

**বাধ্যবাধকতামূলক বিধান**

**ইদ্দতের বিধান ও তার দলীল**

ফুকাহায়ে কেরাম ইদ্দতের বিধান ও তার ওয়াজিব হওয়ার ওপর একমত পোষণ করেছেন। এর কারণ পাওয়া যাওয়া মাত্র মহিলার ওপর তা ওয়াজিব হয়।[১১]

৬.আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২০৩-২০৫।

৭. লিসানুল আরাব; আল-মিসবাহুল-মুনীর; মুখতারুস-সিহাহ।

৮. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ২০৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯।

৯. আল-মিসবাহুল মুনীর।

১০. সূরা আল-মুমিনূন, ২৫।

১১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯০; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৪৮, মাকতাবাতুর রিয়াদিল হাদীসা।

www.amarboi.org

আল-কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা তা প্রমাণিত।

**(ক) আল-কুরআন**

এ সম্পর্কে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১২]

আরও ইরশাদ হয়েছে :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনও রজঃস্বলা হয়নি তাদের। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"[১৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১৪]

**(খ) রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ**

উম্মে আতিয়্যাহ রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

لَا تَحُدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

"কোনো মহিলা তিনদিনের বেশী শোক পালন করতে পারবে না। তবে স্বামী মারা গেলে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।"[১৫]

আরও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সা. ফাতিমা বিনতে কায়স রা.-কে বলেছিলেন, اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم

"তুমি ইবনে উম্মু মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন কর।"[১৬]

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত : أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ .

"বারীরাহ রা.-কে নির্দেশ করা হয়েছিল, সে যেন তিন হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করে।"[১৭]

---

১২. সূরা আল-বাকারা, ২২৮।

১৩.সূরা আত-তালাক, ৪।

১৪. সূরা আল-বাকারা, ২৩৪।

১৫. ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, খ. ২, পৃ. ১১২৭।

১৬.ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, খ. ২, পৃ. ১১১৪।

১৭. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬৭১; আল-বুসীরী মিসবাহুয যুজাজা গ্রন্থে একে সাহীহ বলেছেন, খ. ১, পৃ. ৩৫৭।



www.amarboi.org

**গ) ইজমা**

গোটা উম্মাহ্ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইদ্দত শরীয়তসম্মত এবং তা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সময়কাল হতে অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোনো ফকীহ্ দ্বিমত পোষণ করেননি।[১৮]

**ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণ**

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে ইদ্দত ওয়াজিব হয়। তা মিলনপরবর্তী তালাকজনিত কারণে কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহবন্ধন মুক্ত হলে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন অনুষ্ঠিত হলেও ইদ্দত পালন করতে হয়। যেমনিভাবে ইদ্দত ওয়াজিব হয় স্বামীর মৃত্যুতে, মিলন সংঘটিত না হলেও। বৈধ আকদের পরও ইদ্দত পালন করতে হয়।

শুধু একান্তে বাসের জন্য ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ্গণ বলেন, বৈধ বিয়ের পর যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিশুদ্ধভাবে একান্তে বাস সংঘটিত হওয়ার পর তালাক দেয়া হয়, তাহলে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। আর ফাসিদ বিবাহের পর যদি উভয়ের মাঝে মিলন সংঘটিত হয় তাহলেই কেবল ইদ্দত ওয়াজিব হয়। মিলন সংঘটিত না হলে নয়।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ মনে করেন, মিলন না হলে কেবল একান্তে বাসের ফলে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। (বিস্তারিত দ্র. بُطْلَان وَخَلْوَة শিরোনাম)

**ইদ্দতের মেয়াদে পুরুষ কর্তৃক অপেক্ষা**

ফুকাহায়ে কেরাম মনে করেন, পুরুষের ওপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। ফলে স্ত্রী থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের অপেক্ষা ছাড়াই সে অন্য মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। হ্যাঁ, যদি কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে সে ক্ষেত্রে ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করার বিধান রয়েছে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীর ফুফু, খালা, বোন কিংবা এমন কাউকে বিয়ে করতে চায় যাদেরকে এক সঙ্গে বিবাহবন্ধনে রাখা যায় না। অথবা চতুর্থ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কোনো মহিলাকে যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে রাজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হানাফীগণ মনে করেন, বায়েন তালাকের ইদ্দত হলেও অপেক্ষা করতে হবে। জমহুর ফুকাহার মতে বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব নয়।

---

১৮. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ৭৬।

www.amarboi.org

স্বামীকে বিয়ে হতে বিরত থাকাকে আভিধানিক ও পারিভাষিক কোনো অর্থেই ইদ্দত বলা হয় না। যদিও তা ইদ্দতের অর্থ বহন করে। বিয়ে করতে নিষিদ্ধ সময় আরও রয়েছে। যেমন : ইহরাম ও পীড়িত অবস্থায়; কিন্তু একে ইদ্দত বলা হয় না।[১৯]

## ইদ্দত প্রবর্তনের হিকমত

কতিপয় কারণ ও হিকমতে ইদ্দত প্রবর্তিত হয়েছে। তা হলো :

১. গর্ভাশয়ের সন্তান মুক্ত থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
২. একই গর্ভাশয়ে একাধিক পুরুষের বীর্য একত্রিত না হওয়া, যা মানবজীবনের বংশপরিচয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।
৩. দাম্পত্যজীবনকে মূল্যায়ন করা এবং তার মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
৪. তালাক প্রদানকারীর রাজআতের (পুনঃগ্রহনের) মেয়াদ প্রলম্বিত করা। এর ফলে স্বামী কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হলে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।
৫. স্বামীর অধিকার আদায় করা। সাজসজ্জা হতে বাধাদানের মাধ্যমে স্বামীর বিয়োগব্যথার প্রভাব প্রকাশ করা। এ জন্যই পিতা-পুত্র থেকে স্বামীর জন্য বেশি দিন শোক পালনের বিধান দেয়া হয়েছে।
৬. স্বামীর অধিকার ও স্ত্রীর কল্যাণের ব্যাপারে সতর্কতা সৃষ্টি করা। সন্তানের অধিকার ও আল্লাহর আবশ্যক করা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কেবলমাত্র গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া ইদ্দত পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং এগুলিও তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত।[২০]

## ইদ্দতের প্রকার

ফুকাহায়ে কেরামের মতে শরীয়তের ইদ্দত তিন ধরনের :[২১]

ক) ইদ্দতুল কুরূ' বা কুরূ' (হায়েয বা তুহর) সংক্রান্ত ইদ্দত।
খ) মাস-বিষয়ক ইদ্দত।
গ) প্রসবজনিত ইদ্দত।

---

১৯. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩০৭; ইবনে আবিদীন, আশ-শামী, খ. ২, পৃ. ৫৯৮; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯০; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৪৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৪; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৬৯।

২০. ইলামুল মুআককিঈন, খ. ২, পৃ. ৮৫।

২১. আল-কাসানী, আল-বাদায়ে, খ.৩, পৃ. ১৯১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩০৭; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৫৯৮; আদ-দাসূকী আলাশ-শারহিল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৪৬৮; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫; রওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৬৬, আল-মাকতাবুল ইসলামী; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৪৮।

www.amarboi.org

প্রথমত : ইদ্দতুল কুরূ : আল-ফায়্যুমী বলেন : الْقَرْءُ শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায়। الْقَرْءُ কাফ বর্ণে যবরযোগে। তখন এর বহুবচন হয় কুরূ (قُرُوءٌ) ও আকরু (أَقْرُؤٌ) যেমন : ফালস (فَلْسٌ) এর বহুবচন হয় ফুলুস (فُلُوسٌ) ও আফলুস (أَفْلُسٌ)। الْقُرْءُ কাফ বর্ণে পেশযোগে। তখন তার বহুবচন হয় أَقْرَاءٌ- (আকরা)। যেমন قُفْلٌ (কুফলুন) শব্দের বহুবচন হলো أَقْفَالٌ (আকফাল)। অভিধানবেত্তাদের মতে কুরূ এর অর্থ ঋতুহীনতা তথা তুহর এবং ঋতু অবস্থা তথা হায়েয দু'ধরনেরই হয়ে থাকে।[২২]

কুরূ-এর পারিভাষিক অর্থে ফুকাহায়ে কেরামের দু'ধরনের অভিমত রয়েছে :

**প্রথম মত** : কুরূ' এর অর্থ ঋতুমুক্ত অবস্থা (তুহর)। বহু সাহাবী, মদীনার ফুকাহা, ইমাম মালিক, শাফেয়ী এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদের দু'টি মতের একটি এ অভিমতের অনুকূলে।[২৩] ঋতুমুক্ত অবস্থা বলতে এখানে দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সময়কে বুঝানো হয়েছে। এ অভিমতের পক্ষে দলীল হলো :

ক) আল্লাহ তাআলার এ আয়াত :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা করো তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে।"[২৪]

অর্থাৎ ইদ্দতপালন উপযোগী সময়ে তালাক দিও। لِعِدَّتِهِنَّ -তে لام অব্যয়টি فِي (মধ্যে)-এর অর্থে এসেছে। তা এরূপ যে, মহান আল্লাহ ঋতুহীন অবস্থায় তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, ইজমা মতে হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদান হারাম। সুতরাং ইদ্দত বলতে এখানে ঋতুহীন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে,

খ) রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী :

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

"তাকে আদেশ কর, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর ঋতুমুক্ত হওয়া পর্যন্ত যেন তাকে রেখে দেয়। তারপর ঋতুবতী হয় তারপর ঋতুমুক্ত হয় অতঃপর চাইলে

---

২২.আল-মিসবাহুল মুনীর।

২৩. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৬৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯১; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৬৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১১৩; ইলামুল মুআককিঈন, খ. ১, পৃ. ২৫; ইবনে কুদামা আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৪৫২।

২৪. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ১।

www.amarboi.org

তাকে রাখবে নতুবা তালাক দিবে সঙ্গম হওয়ার পূর্বে। এটিই হলো সে ইদ্দত, যাতে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীগণকে তালাক দিতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।"[২৫]

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ঋতুমুক্ত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, এটিই হলো ইদ্দত। তালাক প্রদানের ইচ্ছে হলে এ সময়েই তা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সুতরাং তুহরই হলো ইদ্দত।

গ) আয়েশা রা.-এর হাদীস : إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ "ঋতুমুক্ত অবস্থাই হলো কুরূ।"[২৬]

ঘ) القُرْءُ শব্দটির মাঝে নিহিত রয়েছে সমষ্টির অর্থ। আরবীতে বলা হয় : قَرَأْتُ كَذَا فِي كَذَا : তুমি এই জিনিসকে ঐ জিনিসের মাঝে একত্রিত করেছ। قرء শব্দের অর্থ যেখানে এরকম হয় সেখানে তা দিয়ে ঋতুমুক্ত অবস্থা অর্থ নেয়াই শ্রেয়। কারণ ঋতুমুক্ত অবস্থায় রক্ত জরায়ূতে জমা থাকে। আর হায়েজ অবস্থা হলো জরায়ু থেকে রক্ত বেরিয়ে যাওয়া। আর মূল ধাতুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করাই হলো উত্তম।[২৭]

**দ্বিতীয় মত :** কুরূ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হায়েয। চার খলীফা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সহ বহু সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী এবং হানাফীগণ এ অভিমত পোষণ করেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও এমত পোষণ করেন ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বলতাম : ইদ্দত হলো তুহর; কিন্তু এখন আমি বলি, এটা হায়েয। ইবনুল কায়্যিম বলেন, ইমাম আহমদ র.-এ মতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাই বর্তমানে এটাই তার মাযহাব।[২৮]

### কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তপূর্ণ দলীলসমূহ নিম্নরূপ

### ক. আল-কুরআনভিত্তিক দলীল

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে।"[২৯]

মহান আল্লাহ তিন কুরূ দ্বারা ইদ্দত পালন করতে বলেছেন। কুরূ' দ্বারা যদি ঋতুমুক্ত অবস্থা (তুহর) মেনে নেয়া হয় তাহলে ইদ্দত হবে দুই কুরূ' এবং

---

২৫. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৩৪৫; ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৯৩; হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত। হাদীসের শব্দগুলো মুসলিম শরীফ থেকে গৃহীত।

২৬. ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ৫৭৭; ইমাম শাফেয়ী, আল-উম্ম, খ. ৫, পৃ. ২০৯, হাদীসটি মাওকূফ।

২৭. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮।

২৮. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৩-১৯৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩০৮; আল-মুগনী খ. ৯, খ. ৮২-৮৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪১৭; ইলামুল মুআককিঈন, খ. ১, পৃ. ২৫।

২৯. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২২৮।

www.amarboi.org

তৃতীয়টির কিছু অংশ। কারণ যে ঋতুমুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে তা ইদ্দতের মাঝে গণ্য হবে। এদিকে তিন হলো নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা। পূর্ণ তিন পাওয়া না গেলে আল-কুরআনের নির্দেশের ওপর আমল করা হলো না। যদি কুরূ শব্দকে হায়েযের ওপর আরোপ করা হয় তাহলে পূর্ণ তিন হায়েয পাওয়া সহজ হয়। কারণ ঋতুমুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া হলে পরবর্তী তিনটি হায়েয পাওয়া যাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ তালাক দেয়া হচ্ছে ঋতুমুক্ত অবস্থায় আর ইদ্দত গণনা করা হচ্ছে তৎপরবর্তী হায়েয দ্বারা।[৩০]

## খ. হাদীসভিত্তিক দলীল

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
"দাসীর তালাক দু'টি আর তার ইদ্দত হলো দু'টি হায়েয"।[৩১]

হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, হায়েয দ্বারাই ইদ্দত পালন করতে হয়। কারণ স্বভাবগত দিক দিয়ে দাসী ও স্বাধীন হওয়ার মাঝে কোনো তফাৎ নেই। পার্থক্য হলো দাসী হওয়ার ফলে শরীয়ত তার ব্যাপারে শিথিলতার হুকুম আরোপ করেছে এবং ইদ্দত কমিয়ে দিয়েছে। সুতরাং হায়েয দ্বারা ইদ্দত গণনা হবে।[৩২]

## গ. শরীয়তের পরিভাষাভিত্তিক দলীল

শরীয়তের পরিভাষায় কুরূ বলতে হায়েযকেই বুঝায়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا "মহিলা তার কুরূর দিনগুলোতে সালাত বর্জন করবে।"[৩৩]

আরও বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সা. ফাতিমা বিনতে আবী হুবায়শ রা.-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

انْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ

"লক্ষ্য রেখো, তোমার কুরূ আসলে নামায আদায় করবে না। কুরূ অতিক্রান্ত হলে তুমি পবিত্র হবে এবং দুই কুরূর মাঝখানে নামায আদায় করবে।"[৩৪]

এসব হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের পরিভাষায় কুরূ বলতে কোথাও তুহর বুঝানো হয়নি; বরং সর্বত্র হায়েযই বুঝানো হয়েছে।

---

৩০. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৪; আল-মুগনী, দারুল কিতাবিল আরাবী, খ. ৯, পৃ. ৮৩।

৩১. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬৭২; বায়হাকী ও দারাকুতনী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তবে ইবনে হাজার একে দুর্বল অভিহিত করেছেন, আত-তালখীস, খ. ৩, পৃ. ২১৩।

৩২. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৪।

৩৩. তিরমিযী, আস সুনান, খ. ১, পৃ. ২২০; আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২০৯; ইমাম আবু দাউদ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৩৪. আবূ-দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯১; বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৪২০।

www.amarboi.org

সুতরাং এখানেও ইদ্দত হিসেবে হায়েযই গণনা করতে হবে।[৩৫]

**ঘ. যুক্তিভিত্তিক দলীল**

যুক্তির কথা হলো, ইদ্দত ওয়াজিব হয় গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। আর সন্তানমুক্ত হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় হায়েয দ্বারা। ফলে বিবেকের দাবি হলো, ইদ্দত হায়েয দ্বারা পালন করা হবে, তুহর দ্বারা নয়।[৩৬]

**তালাক ও বিবাহ ভঙ্গের ক্ষেত্রে ঋতুবতী স্বাধীন মহিলার ইদ্দত**

যে সকল মহিলার নিয়মিত ঋতু আসে জমহুর ফুকাহার মতে তাদের ইদ্দত হলো তিনটি কুরূ।[৩৭] যদিও তাদের হায়েয আসা ও তা বন্ধ হওয়ার মাঝে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশনা হলো :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে।"[৩৮]

মহিলাটির সাথে সাহীহ্ তরীকায় বিবাহ্ সংঘটিত হওয়ার পর সঙ্গত হোক আর ফাসিদ পন্থায় বিবাহের পর সঙ্গত হোক। এতে কোনো তারতম্য নেই। এ হলো জমহুর ফকীহদের মত। তবে শাফেয়ীগণের আধুনিক অভিমত হলো, এতে তারতম্য রয়েছে। (خَلْوَة শিরোনাম দ্র.)।

কুরূ-এর দ্বিমুখী অর্থ সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ ঋতুমুক্ত অবস্থা (তুহর); আর কেউ বলেন এর অর্থ হলো ঋতু (হায়েয)। এ হিসেবে ইদ্দত গণনায় মতভেদ পরিলক্ষিত হবে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

**ক. কুরূ অর্থ ঋতুমুক্ত অবস্থা (তুহর) ধরা হলে ইদ্দতের হিসাব**

মালেকী, শাফেয়ী ও আহমদ র.-এর একটি উক্তিমতে যদি মহিলাকে ঋতুমুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া হয়, আর তার ঋতুমুক্তির কাল সামান্য সময়ও বাকি থাকে তাহলে সেটিও এক ঋতুমুক্তকাল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ ঋতুমুক্ত অবস্থা স্বল্প হলেও তার ওপর কুরূ বিশেষ্যটি আরোপিত হয়। ফলে সেটিও পূর্ণ ঋতুমুক্ত অবস্থার স্থলে গণ্য হবে। কারণ কালামে পাকে মেয়াদের বড় অংশের ওপর বহুবচনের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

---

৩৫. আল-মুগনী ও আশ-শারহুল-কাবীর, খ. ৯, পৃ. ৮৩-৮৪।

৩৬. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৪।

৩৭. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩০৭; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫৯৯-৬০৩; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৬৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; আল-ফাওয়াকিহ, খ. ২, পৃ. ৯১; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪-৩৮৬; রাওদাতু ত্তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৬৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪১৭।

৩৮. সূরা আল-বাকারা, ২২৮।

www.amarboi.org

"নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হলো হজ্জ।"[৩৯]

হজের দিন দু'মাস দশদিন হওয়া সত্ত্বেও এখানে أَشْهُر -মাসগুলো বলে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে। এ জন্যই মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে তৃতীয় হায়েযের স্রাব দেখামাত্র ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

ইমাম আহমদের এক অভিমত অনুযায়ী তৃতীয় হায়েযের রক্ত দেখামাত্র ইদ্দত পূর্ণ হবে না, বরং এ হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসল শেষে ইদ্দত পূর্ণ হবে। এটিই তার গ্রহণযোগ্য অভিমত। কিন্তু এর বিপরীতে তার আরও একটি অভিমত হলো- তৃতীয় হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করা ছাড়াই ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। ইবনে কুদামার বর্ণনামতে ইমামত্রয়ের এ ধরনের অভিমতের সাথে ইমাম যুহরীই কেবল দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যেই ঋতুমুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে তাকে বাদ দিয়ে ইদ্দতের হিসাব করতে হবে। আবু উবায়দ হতে একটি অভিমত এ মর্মে রয়েছে যে, যেই ঋতুমুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে যদি তাতে যৌনকর্ম সম্পাদন করা হয় তাহলে ইদ্দত গণনায় সেটি ধর্তব্য হবে না। কারণ এটি তালাকদানের নিষিদ্ধ সময়। ঋতুকালীন অবস্থার ন্যায় এটি ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হবে না।[৪০]

কেউ যদি হায়েয অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে চতুর্থ হায়েয দেখামাত্র মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। এটি যায়েদ ইবনে সাবিত, ইবনে উমার, আয়েশা রা. কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, সালিম ইবনে আবদিল্লাহ, আবান ইবনে উসমান ও আবু সাওর প্রমুখের অভিমত, যাতে ইদ্দত তিন মাসের অধিক না হয়।

### খ. কুরূ'অর্থ হায়েয ধরা হলে তার ইদ্দত

হানাফী মাযহাব মতে- যা হাম্বালীদের মাযহাবও-তালাক পরবর্তী তিনটি পূর্ণ হায়েয অতিক্রান্ত না হলে ইদ্দত পূর্ণ হয় না। তুহর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দেয়ার পর এ পবিত্র অবস্থাটি ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে না । হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেও সে হায়েজটি ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কারও দ্বিমত নেই। হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। কারণ এর দ্বারা মহিলার ইদ্দত প্রলম্বিত হয়। এছাড়া আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো পূর্ণ তিনটি কুরূ, অপেক্ষা করার। তাই যে হায়েযে তালাক দেয়া হয়েছে তা হিসেবে ধরা যাবে না। কারণ তা হিসেবে ধরলে পূর্ণ তিন হায়েয পাওয়া যাবে না।[৪১]

---

৩৯. সূরা আল-বাকারা, ১৯৭।

৪০. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৬৯; আল-ফাওয়াকিহ, খ. ২, পৃ. ৯১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; রাওদাতুত্তালিবীন, খ. ৮, খ. ৩৬৬-৩৬৭; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫; আল-মুগনী, খ. ৯ পৃ. ৮৫-৮৮।

৪১. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী ভাষ্যসহ, খ. ৯, পৃ. ৮৫-৯৯।

www.amarboi.org

তৃতীয় হায়েয অন্তে গোসল সারার পর অথবা কেবল হায়েয বন্ধ হওয়া লগ্নে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া : হানাফী মাযহাবের আলিম ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমত হলো, হায়েয যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে শেষ হয় তাহলে তৃতীয় হায়েয শেষ হয়ে গেলে গোসল ছাড়াই ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ দশদিনের বেশি হায়েয হয় না। ফলে হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। দশদিনের বেশি হলে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হয় না। সঙ্গত কারণেই তৃতীয় হায়েয অতিক্রান্ত হলে রাজআত করা সাহীহ হয় না; বরং অন্যদের জন্য মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ হয়ে যায়।

আর দশদিনের কমে যদি স্রাব বন্ধ হয় তাহলে গোসল না করা পর্যন্ত তার ইদ্দত অব্যাহত থাকবে। ফলে স্বামীর জন্য তাকে পুনঃগ্রহণ (রাজআহ) করার সুযোগ থাকবে এবং অন্যদের জন্য মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ হবে না। তবে শর্ত হলো পানি পাওয়া সত্ত্বেও গোসল করেনি বা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেনি অথবা তার ওপর সালাতের পূর্ণ একটি ওয়াক্তও অতিক্রান্ত হয়নি।[৪২]

হানাফীগণ আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ, ইজমা ও যুক্তির মাধ্যমে এ সম্পর্কে দলীল উপস্থাপন করেন।

আল-কিতাবের নির্দেশনা হলো : وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"তোমরা স্ত্রীদের নিকট যেয়ো না গোসল না করা পর্যন্ত।"[৪৩]

হাদীসে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

تَحِل لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِل مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ .

"স্বামীর জন্য তাকে পুনঃগ্রহণ (রাজআহ) করা বৈধ হবে যতক্ষণ না সে তৃতীয় হায়েযের গোসল করে।"[৪৪]

ইজমার দাবি হলো, সাহাবায়ে কেরাম ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার জন্য গোসলকে শর্তারোপ করার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আলকামা রহ. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদা উমার রা.-এর নিকট ছিলাম। তখন এক পুরুষ ও এক মহিলা উপস্থিত হলো। পুরুষটি বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবার পুনঃগ্রহণ (রাজআহ) করেছি। মহিলাটি বলল, যা বলছে তা বলতে আমারও বাধা নেই। সে আমাকে তালাক দিয়েছে এবং তৃতীয় হায়েয পর্যন্ত আমাকে ত্যাগ করেছে। অতঃপর তৃতীয়

৪২. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৮৩।

৪৩. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২২২; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৮৮।

৪৪. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, উমর ও আলী রা. হতে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত।

www.amarboi.org

হায়েয শেষে যখন আমার স্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, আমার কাপড় খুলে ফেলেছি গোসলের জন্য পানি রেখেছি। এমন সময় সে দরজার কড়া নেড়ে বলছে, আমি তোমাকে পুনঃগ্রহণ (রাজআহ) করলাম। তখন উমর রা. আমাকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন, এ ব্যাপারে তোমার অভিমত প্রকাশ কর। আমি তখন বললাম, আমার অভিমত হলো, পুনঃগ্রহণ (রাজআহ) করা সহীহ হয়েছে। কারণ এখনও তার জন্য সালাত বৈধ হয়নি। উমর রা. তার অভিমত শুনে বললেন, যদি তুমি এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতে তাহলে সেটিকে আমি যথার্থ মনে করতাম না।

মাকহুল, আবু বকর, উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবুদ-দারদা, উবাদা ইবনেুস সামিত, আবদুল্লাহ ইবনে কায়স আল আশআরী রা. প্রমুখ বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে একটি বা দু'টি তালাক দিলে তৃতীয় হায়েযের গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর তাকে প্রত্যাহার করে নেয়ার অধিকার রয়েছে। এমনকি ইদ্দত অব্যাহত থাকাকালে স্ত্রী তার স্বামীর এবং স্বামী তার স্ত্রীর ওয়ারিস হবে। তাই গোসলের মূল্যায়নে সাহাবায়ে কেরামের এ অভিমত ঐকমত্যে পরিণত হয়েছে।

আর যুক্তির দাবি হলো, দশদিনের কমে যদি স্ত্রীলোকের হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তাহলে হায়েয শেষ হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ তা চূড়ান্ত মেয়াদের ভিতর ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। তাই এমতাবস্থায় নিশ্চিতরূপে বলা যাবে না যে, হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে। আর তুহরও নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত হচ্ছে না। তাই ইদ্দত যেমনটি নিশ্চিতরূপে ছিল তেমনটি অবশিষ্ট রয়েছে। কারণ নিশ্চিত বিষয় কখনো সন্দেহজনক বিষয়ের দ্বারা রহিত হয় না।

স্রাব তো একসাথে আসে না, একবার বন্ধ হয় তো আবার আসে। দশদিনের ভিতর তা আসলে সেটি হায়েয হিসেবেই গণ্য। তাই তুহর তথা ঋতুহীনতার কাল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না এ ভিত্তিতেই ৩য় হায়েয অন্তে স্রাবের অনিশ্চিত বন্ধকালে গোসল করে নিলে স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। কারণ ঋতুহীনকালে যেসকল বিধান তার ওপর আরোপ হয় তার একটি হলো, সালাত আদায় করা, গোসল সেরে ফেলার পর যখন তার ওপর একটি বিধান আরোপ হয়ে গেল তখন অন্যান্য বিধান আরোপ হওয়ার অন্তরায়ও কেটে গেল। কারণ ঋতুবতী মহিলার জন্য তা আদায় করা বৈধ নয়। ফলে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার কারণে প্রত্যাহার করার সুযোগটিও হাতছাড়া হয়ে গেল। অনুরূপভাবে স্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসল করতে বিলম্ব করল। ফলে এক ওয়াক্ত সালাতের সময় পার হয়ে গেল। এমতাবস্থায়ও স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। পানি না পাওয়ায় গোসল না করে তায়াম্মুম দিয়ে নামায আদায় করলেও প্রত্যাহারের (রাজআহ) সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

www.amarboi.org

তবে তায়াম্মুম করল; কিন্তু এখনও নামায আদায় করেনি এমন সন্ধিক্ষণে ইদ্দত শেষ হয়ে প্রত্যাহারের সুযোগ হাতছাড়া হবে কি-না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ র. বলেন, ইদ্দতও শেষ হয়নি এবং প্রত্যাহারের সুযোগও হাতছাড়া হয়নি। ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং প্রত্যাহারের সুযোগও নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, তায়াম্মুম করামাত্র পবিত্র হওয়ার বিধান সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাহলো নামাযের উপযুক্ত হওয়া। তাই হায়েয আর অবশিষ্ট থাকবে না।[৪৫]

তৃতীয় হায়েয অন্তে গোসলের মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে হাম্বলীগণের দু'ধরনের অভিমত পাওয়া যায় :

১ম অভিমত : গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত মহিলার ইদ্দত অব্যাহত থাকবে। ফলে স্বামীর জন্য সে পর্যন্ত তাকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সুযোগ থাকবে এবং অন্যের জন্য তাকে বিয়ে করা বৈধ হবে না।

২য় অভিমত : তৃতীয় হায়েয বন্ধ হয়ে গেলেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। আবুল খাত্তাব এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "তিন কুরূ পর্যন্ত তারা প্রতীক্ষায় থাকবে।"[৪৬] আর তৃতীয় হায়েযের স্রাব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তা পূর্ণ হয়ে গেল। কারণ তখন থেকেই তার ওপর গোসল করা, নামায আদায় করা, রোযা পালন করা ইত্যাদি আবশ্যক হয়ে যায়।

## মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন

দু'টি অবস্থায় মাস হিসেবে ইদ্দত পালিত হয়।[৪৭] তা হলো :

**১ম অবস্থা :**

তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো মহিলা, যারা কোনো রোগের কারণে অথবা নাবালিকা হওয়ার কারণে অথবা হায়েয আসার সময়কাল অতিক্রমের কারণে অথবা বালেগা কিন্তু কোনো কারণবশত তার হায়েজ বন্ধ রয়েছে এ ধরনের মহিলার ইদ্দত তিন মাস। এটি আল-কুরআনুল কারীম দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে :

---

৪৫. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৮৩-১৮৫।

৪৬. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২২৮; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১১৬-১১৭।

৪৭. আল-কাসানী, আল-বাদায়ে, ৩, খ. পৃ. ১৯২; হাশিয়াতুদ দাসূকী ২ খ. পৃ. ৪৭০; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী ২, খ. পৃ, ৯১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, ১, খ. পৃ. ৩৮৫; মুগনী আল-মুহতাজ ৩, খ. ৩৮৬; রাওদাতুত তালিবীন ৮, খ. পৃ. ৩৭০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী মাআশ শারহ ৯, খ. পৃ. ৮৯; তাফসীরুল কুরতুবী, ১৮, খ. পৃ. ১৬২।

www.amarboi.org

وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ

"তোমাদের যেসকল স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত' সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনও রজঃস্বলা হয়নি তাদের।"[৪৮]

যুক্তিরও দাবি হলো, তিন মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করা। কারণ এখানে মাস হলো কুরূ'র স্থালাভিষিক্ত। তাই কুরূ যেহেতু তিনটি গণনা করতে হয় মাসও সেহেতু তিনটি হতে হবে।

রজঃস্বলা নয় এমন নাবালিকা মেয়ের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক ও তার অনুসারীগণের অভিমত হলো, সে মিলন উপযোগী হতে হবে। ঋতুবতী হওয়া থেকে নিরাশ মহিলার ক্ষেত্রে তাদের অভিমত হলো, সে সত্তর ঊর্ধ্ব বয়সের হতে হবে।[৪৯] বয়ঃবৃদ্ধা হওয়ার কারণে যার হায়েয বন্ধ হয়েছে তার বিষয়টি একটি বিতর্কযোগ্য মাসআলা।

মাসযোগে ইদ্দত পালন করার পর যদি মহিলার হায়েয শুরু হয় তাহলে তার ইদ্দত পালন শেষ হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। কুরূ হিসেবে তা আর পালন করতে হবে না। মাসযোগে ইদ্দত পালনরত অবস্থায় যদি হায়েয শুরু হয়ে যায় তাহলে কুরূ হিসেবে ইদ্দত পালনের দিকে ফিরে যেতে হবে। জমহুর ফুকাহার মতে পালিত মাসগুলো এক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না। বিকল্প পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মূল পেয়ে যাওয়ার কারণে এ প্রত্যাবর্তন। যেমন তায়াম্মুমকারী যদি তায়াম্মুমের মাঝখানে পানি পেয়ে যায় তাহলে তাকে পানি দিয়েই পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।[৫০]

**২য় অবস্থা :**

মৃত্যুজনিত ইদ্দত, যা কোনো কিছুর বিকল্প নয়; বরং মৌলিকভাবে ওয়াজিব হয়। সহীহ পন্থায় বিবাহ হওয়ার পর স্বামীর মৃত্যু হলে এ ইদ্দত পালন করতে হয়। তাই স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার পূর্বে মৃত্যু হোক কিংবা পরে এর মাঝে কোনো তফাৎ নেই। স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়া বা না হওয়ার মাঝেও কোনো পাথক্য নেই। তবে শর্ত হলো স্ত্রী গর্ভবতী হবে না। ওফাতজনিত ইদ্দতের মেয়াদ হলো চার মাস দশ দিন। এসম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকবে।"[৫১]

---

৪৮. সূরা: আত-তালাক, আয়াত : ৪।

৪৯. আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯১; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০২; রাওদাতুত-তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭০; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৩।

৫০. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬।

৫১. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৪; আল-মাবসুত, খ. ৬, পৃ. ৩০।

www.amarboi.org

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী হলো :

لاَ يَحِل لامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَالٍ ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

"আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো মহিলার জন্য তিনদিনের বেশি কোনো মৃতের প্রতি শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়; শুধু স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন শোক প্রকাশ করতে হয়"।[৫২] চারমাস দশদিন মেয়াদ নির্ধারণের যুক্তি হলো, সন্তান তার মায়ের পেটে বীর্যস্বরূপ চল্লিশদিন অবস্থান করে; অতঃপর চল্লিশদিন থাকে জমাটবাধা রক্তস্বরূপ। তারপর চল্লিশদিন থাকে গোশতের টুকরাস্বরূপ। তৎপরবর্তী দশদিনে তার মাঝে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। এ কারণে এ মেয়াদকাল পর্যন্ত মহিলাকে প্রতীক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তার মাঝে গর্ভ সঞ্চারিত হলে তা প্রকাশ হয়ে যাবে।[৫৩]

যে বিয়ে ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে এমন বিয়ের পর যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে মালেকী মতাবলম্বীগণের মতে মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। তবে জমহুর ফুকাহার অভিমত এ মতের বিপরীতে। তবে যে বিয়ের ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন এমন ফাসিদ বিয়ের পর স্বামী মারা গেলে মালেকীগণের মতেও তার ইদ্দত পালন করতে হবে না । যেমন : পঞ্চমা স্ত্রী কেউ গ্রহণ করলে স্বামী মারা যাওয়াজনিত কারণে কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না। তবে শর্ত হলো বিয়ে করার পর তার সাথে মিলিত না হওয়া। যদি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকে এবং স্ত্রীটিও সেজন্য উপযুক্ত হয় সেক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তার ন্যায় সে ইদ্দত পালন করবে।[৫৪]

## ইদ্দতের মাস গণনার পদ্ধতি

তালাক, বিবাহভঙ্গ ও স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে মাসভিত্তিক যে ইদ্দত পালন করা হয় তা চান্দ্রমাসের হিসেবে পালন করতে হবে। সৌরমাসের এখানে কোনো মূল্যায়ন নেই। তালাক বা ওফাত যদি মাসের প্রথম দিকে হয় তাহলে মাস গণনা করা হবে চাঁদের হিসেবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

---

৫২. বুখারী ও মুসলিম, বরাত আল-লু'লু' ওয়াল মারজান, ওয়াযারাতুল আওকাফ, কুয়েত ২৫৮-২৫৯।

৫৩. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯২-১৯৫; ফাতহুল কাদীর খ. ৪, পৃ. ৩১১; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৩; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৩; রাওদাতুত-তালিবীন খ. ৮, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০৬-১০৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৪১৫।

৫৪. আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৩।

www.amarboi.org

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা মানুষ এবং হজের জন্য সময় নির্দেশক।"[৫৫]

এমনকি মাসের প্রথম দিকের কয়েকদিন পরও যদি তালাক বা ওফাত হয় তবুও চাঁদের ভিত্তিতে মাসের গণণা করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাসের দ্বারা ইদ্দত গণনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ "তাদের ইদ্দতকাল হবে তিনমাস ......।"[৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "চার মাস দশ দিন ...।"[৫৭]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে মাসের হিসেবে ইদ্দত গণনা করতে। মাস ত্রিশ দিনের হোক বা তার চেয়ে কমদিনের হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

এছাড়া রসূলুল্লাহ সা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا "মাস এভাবে এভাবে এভাবে।"[৫৮]

মাস দ্বারা গণনার সময় দিনের কোনো গুরুত্ব নেই। জমহুর ফুকাহা এ অভিমত পোষণ করেন।[৫৯]

বিচ্ছেদ যদি মাসের মাঝামাঝি সময়ে হয়, সেক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম দু'ধরনের অভিমত পোষণ করেন :

**প্রথম মত** : তালাক যদি মাসের মাঝামাঝি সময়ে হয় তাহলে দু'মাস চাঁদের হিসেবে ধরা হবে এবং চতুর্থ মাসে ভাঙ্গা দিনগুলো প্রথম মাসের ভাঙ্গা দিনগুলোর সাথে মিলিয়ে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। ভাঙ্গা দিনগুলো সংখ্যায় যতই কম হোক না কেন।

অনুরূপভাবে মাস দ্বারা ওফাতের ইদ্দত গণনা করার ক্ষেত্রে ভাঙ্গা মাস দিন হিসেবে গণনা করবে এবং অবশিষ্ট মাসগুলো চাঁদের দ্বারা গণনা করবে। তাই প্রথম ভাঙ্গা মাসটি চতুর্থ মাসের দিন গণনার মাধ্যমে পূর্ণ করবে।[৬০]

---

৫৫. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৯।

৫৬. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ৪।

৫৭. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪।

৫৮. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৬১; ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ১১৯।

৫৯. আল-কাসানী, আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৫; আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯১; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬-৩৯৫; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭০-৩৯৮; ইবনি কুদামা, আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ১০৪-১০৫।

৬০. রাওদাতুত-তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৯৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫।

www.amarboi.org

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ এ অভিমত পোষণ করেন। হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফেরও অনুরূপ একটি অভিমত রয়েছে।

তারা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন, মাসের দ্বারা ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর মাস হলো চাঁদের নাম। তাই ইদ্দতের ক্ষেত্রে মাস হলো চাঁদের হিসাব। সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা মানুষ এবং হজের জন্য সময়নির্দেশক।"[৬১]

আল্লাহ্ তাআলা এখানে চাঁদকে সময়নির্দেশক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেখানে চাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে সেখানে বাধ্য হয়ে দিবসের দিকে যেতে হবে। প্রথম মাসটিতেই চাদের সমস্যা হওয়ায় শুধু তাতে দিবস হিসেবে গণনা পূর্ণ করতে হবে; কিন্তু পরবর্তী মাসগুলিতে সমস্যা না হওয়ায় চাঁদের হিসেবে মাস গণনা করা হবে।[৬২]

**দ্বিতীয় মত** : দিবস হিসেবে ইদ্দত গণনা করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা এ অভিমত পোষণ করেন। আবু য়ুসুফ ও ইমাম শাফেয়ীর মেয়ে পক্ষের নাতিরও এরূপ অভিমত রয়েছে। ফলে তাদের অভিমত হলো, তালাকের ইদ্দত নব্বই দিন গণনা করতে হবে এবং ওফাতের ইদ্দত একশত ত্রিশ দিন পালন করবে। কারণ চাঁদের হিসেব যখন প্রথম মাসেই ভেঙ্গে গেল তখন এ ভাঙ্গন অন্যান্য মাসেও অব্যাহত থাকবে। তাদের কিয়াস হলো লাগাতার দু'মাস সাওম পালন করার ওপর, যখন মাসের অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর সাওম পালন করা শুরু করে। তাদের আরও যুক্তি হলো, ইদ্দতের বিষয়টি সতর্কতানির্ভর। যদি দিবসের হিসাব ধরা হয় তাহলে মাসের ওপর তা বর্ধিত হবে। আর যদি চাঁদের হিসাব ধরা হয় তাহলে তা দিবস থেকে কম হবে। সুতরাং বর্ধিতটি ইদ্দত হিসেবে গণনা করাই হবে অধিকরত সতর্কতা।

**ইদ্দতের মাস গণনার শুরু**

যে সময় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেবে তখন থেকেই মাস গণনা শুরু হবে। রাত বা দিনের যে সময়ে তালাক দেবে সে সময় হতে মাসের শুরু হবে। মহিলা সে সময় হতে ইদ্দত পালন শুরু করে এ ধরনের সময়ে এসে তা শেষ করবে।

---

৬১. সূরা : বাকারা, ১৮৯।

৬২. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৬; আল-ফাওয়কিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯২; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭০; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬; ইবনে কুদামা, আল মুগনী ওয়াশশারহুল কাবীর, খ. ৯ পৃ. ১০৪-১০৫।

www.amarboi.org

হানাফী, হাম্বালী ও শাফেয়ীগণ এ ধরনের অভিমত পোষণ করেন। তাদের দলীল হলো : فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ "তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস।"[৬৩] আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াত : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "চারমাস দশ দিন ...।"[৬৪]

বিনা দলীলে এ সময়সীমার ওপর বৃদ্ধি করা যাবে না। সময়ের প্রহরগুলো গণনার মধ্যেও কোনো সমস্যা নেই। ফলে আল্লাহর নির্ধারিত মুহূর্তগুলোর ওপর কোনো কিছু বৃদ্ধি করা জায়েয হবে না।

মালেকীগণ বলেন, ফজরের পর যদি তালাক দেয় তাহলে তালাক প্রদানের দিনটি হিসাবে আসবে না। অনুরূপভাবে মৃত্যুর দিনটিও হিসাবে আসবে না।[৬৫]

**মাস হিসেবে ওফাতের ইদ্দত পালনে দশ দিনের গণনা**

জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, ওফাতের ইদ্দত গণনায় যে দশের কথা উল্লেখ রয়েছে তাতে দশ রাতের সাথে দশদিনও ধর্তব্য হবে। ফলে দশ দিনের সাথে দশ রাতও ইদ্দত পালন করতে হবে।

আল-কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকবে।"[৬৬]

আরবগণ সাধারণত সংখ্যার ক্ষেত্রে স্ত্রী লিঙ্গের শব্দকে প্রাধান্য দিয়ে তা ব্যবহার করে বিশেষভাবে পুংলিঙ্গের শব্দকেও তার মধ্যে শামিল করে নেয়। তাই তারা স্ত্রীলিঙ্গের শব্দসমূহ ব্যবহার করে দিনসহ রাতকে বুঝায়।

হযরত যাকারিয়া আ. সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

"তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি (সুস্থ থাকা সত্ত্বেও) কারো সাথে তিন দিন বাক্যালাপ করবে না।"[৬৭]

এখানে لَيْل-এর বহুবচন لَيَالٍ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিনসহ রাত। এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ তাআলা একই অর্থে অন্যত্র ইরশাদ করেন : آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا

"তোমার নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না।"[৬৮]

---

৬৩. সূরা : তালাক, আয়াত : ৪।

৬৪. সূরা : বাকারা, আয়াত : ২৩৪।

৬৫. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৯; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯২; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭০; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ২০১; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০৫-১০৬।

৬৬. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪।

৬৭. সূরা : মারয়াম, আয়াত : ১০।

৬৮. সূরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ৪১।

www.amarboi.org

এখানে يوم-এর বহুবচন ايام শব্দ প্রয়োগ হয়েছে; কিন্তু এর অর্থ হলো রাতসহ দিন। অনুরূপভাবে কেউ যদি মান্নত করে, রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করবে। তাহলে তার রাতসহ দশদিন ইতিকাফ করতে হবে। আবু উবায়দ ও ইবনুল মুনযির অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। এর বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন আওযায়ী ও আসাম্ম। তারা বলেন, চারমাস দশরাত নয়দিন ওফাতের ইদ্দত পালন করতে হবে। তাদের যুক্তি হলো عشر শব্দকে পুংলিঙ্গ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী এখানে রাত উদ্দেশ্য হবে।

এ সম্পর্কিত হাদীসটি নিম্নরূপ :

لاَ يَحِل لامْرَأة تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الأُخِرِ أنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا .

“যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তার জন্য তিনদিনের বেশি কোনো মৃত ব্যক্তির ওপর শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন শোক পালন করতে হবে”।[৬৯]

এখানে রাতই বুঝানো উদ্দেশ্য। যদি দিন বুঝানো হতো তাহলে অবশ্যই عشر শব্দটির স্ত্রী লিঙ্গ عشرة ব্যবহার করা হত।[৭০]

## তৃতীয়ত : প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হবে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে। তা তালাকের ইদ্দত হোক বা সন্দেহমূলক মিলনের ফলে গর্ভধারিণীর ইদ্দত হোক। উভয়ের একই হুকুম। ইরশাদ হয়েছে : وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।”[৭১]

এর পিছনে যুক্তি হলো, ইদ্দতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। আর তা প্রসবের মাধ্যমে অর্জিত হয়।[৭২]

---

৬৯. হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৭০. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৫; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩১৩; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৪; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৯৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০৭; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ২০১।

৭১. সূরা : তালাক আয়াত : ৪।

৭২. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯২-১৯৬; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ১১০।



www.amarboi.org

গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। মেয়াদ দীর্ঘ হোক আর স্বল্প হাক। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরও যদি মহিলা সন্তান প্রসব করে তাতেও ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। আর অন্যদের জন্য সে বিয়ের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।[৭৩]

জমহুর উলামা উপর্যুক্ত আয়াতের সাধারণ অর্থ হতে এ অভিমত পোষণ করেছেন। এ আয়াতটি (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) বিশিষ্ট করেছে মৃতব্যক্তির ওফাতের ইদ্দত সংবলিত নিম্নোক্ত আয়াতকে :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে।"[৭৪]

এ মতের অনুসারীগণ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের উক্তি দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ যার স্বামী মারা গেছে তার স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, সে যদি সন্তান প্রসব করে এমতাবস্থায় যে, তার স্বামীর মৃতদেহ খাটিয়ার ওপর রাখা রয়েছে। এতেও তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে অন্যের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।[৭৫]

এ সম্পর্কে আরও দলীল রয়েছে যে, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. বলেন, সুবাইআ আল-আসলামিয়্যা রা. তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই নিফাস মুক্ত হলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে অনুমতি দিলে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলেন।[৭৬]

কেউ কেউ বলেন, তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করেছিলেন। ইমাম যুহরী বলেন, স্ত্রীর নিফাস অবস্থায় তার বিয়ে হওয়ার ব্যাপারে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। তবে হ্যাঁ, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সংগত হওয়া যাবে না।[৭৭]

---

৭৩. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৬; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৪; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৬৪; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৪, পৃ. ৪৫৪; ইবনে কুদামা, আল মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১১০; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৭৪।

৭৪. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪।

৭৫. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৬; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৭৪।

৭৬. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ মাআ শারহিন নববী বৈরূত, খ. ১০, পৃ. ১১০।

৭৭. সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ১৯৬-১৯৭; শাওকানী, নায়লুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৮৫; আল-বাদায়ে, খ. ৩, প. ১৯৭।

www.amarboi.org

আলী রা., ইবনে আব্বাস রা., ইবনে আবী লায়লা ও সাহনূনের মতে, গর্ভবতী মহিলা যার স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দত হবে দু'ধরনের ইদ্দতের মাঝে যেটি তুলনামূলক দীর্ঘতর সেটি। হয়তো গর্ভ প্রসবের দ্বারা কিংবা চার মাস দশদিন গণনার দ্বারা। এদু'টির যেটি দীর্ঘতর হবে সেটির দ্বারাই মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হবে।[৭৮]

তারাও সূরা বাকারার পূর্বোক্ত আয়াত[৭৯]

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

এবং সূরা তালাকের[৮০] পূর্বোক্ত আয়াত :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ কে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।

তাদের বক্তব্য হলো, প্রথম আয়াতটি এক হিসেবে ব্যাপক অর্থবোধক (عُمُومٌ) এবং এক হিসেবে সংকীর্ণ অর্থবোধক (عُمُومٌ)। ব্যাপক অর্থবোধক এ হিসেবে যে, এতে বিধবা মহিলার ইদ্দতের কথা ব্যক্ত হয়েছে সে গর্ভবতী হোক আর না হোক। আর সংকীর্ণ অর্থে চারমাস দশদিনের কথা উক্ত হয়েছে। এমনিভাবে সূরা তালাকের আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক ও সঙ্কীর্ণ অর্থবোধক (عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ) কারণ, এতে বিধবা ও সধবা উভয়ের কথা অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিশেষভাবে এতে প্রসবের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর একটিকে অন্যটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়া থেকে দু'টি আয়াতের ওপর আমল করাই উত্তম। এটি উসূলবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত। যখন তুলনামূলক দীর্ঘতর ইদ্দত পালন করা হবে, তখন উভয় আয়াতের ওপর আমল করা সম্ভব। অপরদিকে প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করলে ওফাতের ইদ্দত সংবলিত আয়াত বাদ দিতে হয়। তাই একটিকে বাদ দেয়া হতে উভয় আয়াতের ওপর একসঙ্গে আমল করাই উত্তম।[৮১]

## যেই গর্ভ প্রসবান্তে ইদ্দত পূর্ণ হয়

মানব-আকৃতির গর্ভ প্রসব হলে ইদ্দত পূর্ণ হয় বলে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম মনে করেন। তা মৃত হোক বা গোশতের টুকরার

---

৭৮. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৭; মুসলিম, সহীহ, খ. ১০, পৃ. ১০৯-১১০; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ১৯৬; নায়লু'ল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৮৫; তাফসীরু'ল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

৭৯. সূরা : বাকারা, আয়াত : ২৩৪।

৮০. সূরা : তালাক, আয়াত : ৪।

৮১. তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৭৫; মুসলিম, সহীহ, খ. ১০, পৃ. ১১০; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ১৯৬; আশ-শাওকানী, নায়লুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৮৫; আল-কাসানী, আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

www.amarboi.org

মাঝে আকৃতি ফুটে উঠুক; এতে কোনো তারতম্য নেই। অস্পষ্ট আকৃতি হলেও চলবে। তবে তা যে মানবাকৃতি সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ধাত্রী মহিলাগণের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। তবে গোশতখণ্ডের ওপর যদি মানব আকৃতি ফুটে না ওঠে আর নির্ভরযোগ্য ধাত্রীগণ সাক্ষী দেয় যে, এটি মানব পয়দা হওয়ার প্রাথমিক স্তর। অবশিষ্ট থাকলে তাতে আকৃতি অচিরেই ফুটে ওঠতো। এমতাবস্থায় মহিলার ইদ্দত শাফেয়ীগণের মতে পূর্ণ হয়ে যাবে। এটি হাম্বলীদেরও একটি অভিমত। তাদের যুক্তি হলো-এর ফলে গর্ভাশয়মুক্ত হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

হানাফীগণ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ হতেও এ ধরনের একটি উক্তি পাওয়া যায়। উক্ত মত অনুযায়ী এ অবস্থায় প্রসবের দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হবে না। তাদের যুক্তি হলো, কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পেলে গর্ভ খালাস হয়েছে বলে অনুভূত হয় না।

মহিলা যদি কেবল বীর্য, রক্তপিণ্ড কিংবা রক্ত অথবা গোশতের টুকরার ন্যায় কিছু প্রসব করে যার মধ্যে কোনো আকৃতি নেই, তাহলে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত অনুযায়ী এ প্রসবের দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হবে না। মালেকীগণ বলেন, গর্ভ যদি জমাটবাধা রক্ত হয় তাহলেও তা প্রসবের কারণে মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। রক্তটি গর্ভ ছিল বলে নিশ্চিত হওয়ার উপায় হলো এর ওপর গরম পানি ঢাললে তা বিগলিত হয় না।[৮২]

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের একমতে যেই গর্ভের দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হবে তার জন্য শর্ত হলো, সন্তানটি ইদ্দতওয়ালার অর্থাৎ স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। উক্ত সম্পৃক্ততা প্রকাশ্যভাবেও হতে পারে, আবার সম্ভাব্যভাবেও হতে পারে।

উদাহরণ হলো, মহিলার পেটের বাচ্চাকে আপন সন্তান বলে অস্বীকার করা। তাই যখন সে গর্ভস্থ সন্তান অস্বীকার করবে সেক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হবে। উক্ত সন্তান তার থেকে হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার কারণে।

ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, গর্ভে যখন সন্তান একটিমাত্র হয় তখন গর্ভবতীর পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা হলো :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"[৮৩]

---

৮২. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৪।

৮৩. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ৪।

www.amarboi.org

তবে তারা দু'টি মাসআলায় মতভেদ করেছেন :

**প্রথম মাসআলা :** সন্তানের অধিকাংশ বের হয়ে গেলে ইদ্দত পূর্ণ হয় কি-না? হানাফীদের জাহিরী রেওয়ায়াত এবং শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকীগণের নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, সন্তানের বেশিরভাগ অংশ বের হয়ে গেলে ইদ্দত পূর্ণ হয় না। ফলে এ সময়ে মহিলাকে পুনঃগ্রহণ (রাজআত) করা বৈধ হয়। অন্যান্য পুরুষের জন্য সে বৈধ বলে সাব্যস্ত হয় না। সন্তান তার মা হতে পূর্ণভাবে খালাস হলে ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। তবে মালেকী মাযহাবের অনুসারী ইবনে ওয়াহাব বলেন, সন্তানের দু'তৃতীয়াংশ বের হয়ে গেলে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে। তাঁর অভিমতের ভিত্তি হলো, অধিকাংশ পূর্ণতারই নামান্তর।[৮৪]

হানাফীগণের একটি মতে মাসআলাটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সন্তানের বেশিভাগ অংশ বের হয়ে গেলে এক অনুপাতে ইদ্দতপূর্ণ হয়ে যায়; কিন্তু অন্য অনুপাতে পূর্ণ হয় না। ফলে সাবধানতা বশত মহিলাকে পুনঃগ্রহণ (রাজআত) করা সহীহ হবে না এবং এমতাবস্থায় মহিলা অন্য স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

মাসআলাটিকে শাফেয়ীগণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সন্তানের অংশবিশেষ বের হলে ইদ্দত পূর্ণ হবে না। বের হওয়ার সুরতটি পৃথকভাবে হোক আর জড়ানোভাবে হোক। সন্তানের বাকি অংশ বের না হওয়া পর্যন্ত মহিলাকে পুনঃগ্রহণ (রাজআত) করা যাবে, তাকে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন মারা গেলে অন্যজন তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।[৮৫]

**দ্বিতীয় মাসআলা :** গর্ভ যখন দুই বা ততোধিক হয়। এ মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরাম দু'টি অভিমতে বিভক্ত।

**প্রথম অভিমত :** হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ মনে করেন, গর্ভ একাধিক হলে সর্বশেষটি প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দতপূর্ণ হবে না। কারণ জরায়ুর সবকিছু মিলেই হলো গর্ভ। ইদ্দত প্রবর্তিত হয়েছে একথা জানার জন্য যে, জরায়ু সন্তানমুক্ত। দ্বিতীয় সন্তান আর তৃতীয় সন্তানের বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে যখন অবহিত হওয়া যায় তখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইদ্দত যে উদ্দেশ্যে ওয়াজিব হয় তা এখনও বাকি রয়েছে, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সন্তানমুক্ত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এদিকে প্রথম সন্তান প্রসব হওয়ার পর যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়া মেনে নেয়া হয় তাহলে মহিলার জন্য অন্যকে বিবাহ করা বৈধ মেনে নিতে হবে। অনুরূপভাবে

---

৮৪. হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৪।

৮৫. রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭৫।

www.amarboi.org

সন্তান প্রসব হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় সন্তান থাকার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাতেও ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা যাবে না, কেবল যখন সন্তান না থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে তখনই ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হবে।[৮৬]

মহিলা যদি দুই বা ততোধিক সন্তান ধারণ করে আর তা হতে একটি প্রসব করে, তাহলে দ্বিতীয় বা শেষ সন্তান প্রসব করার পূর্বে তাকে পুনঃগ্রহণ (রাজআত) করা যাবে যদি সে রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকে। কারণ তখনো ইদ্দত অবশিষ্ট আছে। একসাথে দু'সন্তান প্রসব করলে তদেরকে যমজ সন্তান হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে দু'সন্তানের মাঝে যদি ছয় মাসের কম সময় হয় তাও যমজ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর উভয়ের মাঝখানের সময় যদি ছয় মাস বা তার অধিক হয় তাহলে দ্বিতীয়টিকে স্বতন্ত্র গর্ভ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৮৭]

**দ্বিতীয় অভিমত :** ইকরিমা, আবু কিলাবা ও হাসান আল-বাসরী বলেন, প্রথম সন্তান প্রসব হওয়ার মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে শেষ সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সে কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তাদের দলীল হলো :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

এখানে আল্লাহ তাআলা মাহিলাদের গর্ভজনিত ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে حَمْلَهُنَّ বলে একবচন শব্দের ব্যবহার করেছেন। ফলে একটি সন্তান প্রসব হওয়ার মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।[৮৮]

এ অভিমতের আলোকে মহিলা যদি রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকে তাহলে প্রথম সন্তান প্রসব হওয়ার পর তাকে পুনঃগ্রহণ (রাজআত) করা যাবে না। কারণ এখন আর ইদ্দত অবশিষ্ট নেই। তবে মহিলার জন্য এমতাবস্থায় অন্য স্বামী গ্রহণ করাও বৈধ নয়। কেবল সর্বশেষ সন্তান প্রসব হওয়ার পর মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। এ দ্বিতীয় অভিমতটি জমহুর উলামার অভিমতের পরিপন্থী।

**প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে কখন বিবাহ করা জায়েয**

এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম দু'টি অভিমত পোষণ করেন :

**প্রথম অভিমত :** জমহুর উলামা ও ফুকাহার মতে মহিলাকে সন্তান প্রসব করার পর বিবাহ করা জায়েয। সে নিফাস অবস্থায় থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।[৮৯] কারণ সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তার ইদ্দত পূর্ণতা পেয়েছে। ফলে তার জন্য স্বামী

---

৮৬. ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৪; আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৮; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৪; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৪, পৃ. ৪৪৬; আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ১১২।

৮৭. রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭৫; মুগনী আল-মুহতাজ খ. ৩, পৃ. ৩৮৮।

৮৮. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ১৯৮।

www.amarboi.org

গ্রহণ করা বৈধ। তবে স্বামীর জন্য তার সাথে যৌন মিলন করা বৈধ হবেনা। কারণ এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে : وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
"এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করবে না।"[৮৯]

**দ্বিতীয় অভিমত** : প্রসব হওয়ার পরও নিফাস অবস্থায় মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ নয়। কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:-

فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ "মহিলা যখন নিফাস হতে পবিত্র হবে তখন বিবাহের প্রস্তাব লাভে সাজসজ্জা গ্রহণ করবে।"[৯০]

**ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার গর্ভধারণ সম্পর্কে সন্দেহ**

ঋতুস্রাবের মাধ্যমে কিংবা মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা যখন গর্ভের কোনো আলামত দেখতে পায় তা পেটে বাচ্চার নড়াচড়ার মাধ্যমে কিংবা পেট স্ফীত হওয়া ইত্যাদির দ্বারা এবং এর ফলে মহিলা যদি গর্ভ হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হয়, তাহলে এ ধরনের সন্দেহমূলক মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরাম তিন ধরনের অভিমত পোষণ করেন :

**প্রথম অভিমত** : মালেকীগণ বলেন, ইদ্দত পালনকারিণী যদি গর্ভের ব্যাপারে সন্দিহান হয় আর তা গর্ভের শেষ সীমানা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সীমানা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে তা পাঁচ বছর না চার বছর। এ মেয়াদ যদি অতিক্রান্ত হয় আর সন্দেহ দীর্ঘায়িত না হয়, তাহলে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে মেনে নিয়ে মহিলার জন্য নতুন স্বামী গ্রহণ করা বৈধ হবে। পেট বড় দেখানোর ফলে যদি সন্দেহ দীর্ঘায়িত হয় তাহলে সন্দেহ দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত মহিলা অপেক্ষা করবে। আবার এক রেওয়ায়াত মতে পাঁচ বছর কিংবা চার বছর পার হওয়ার পর সন্দেহ দীর্ঘায়িত হলেও মহিলার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা বৈধ। গর্ভের ব্যাপারে সন্দেহপোষণকারী মহিলা যদি পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার চার মাস পূর্বে বিবাহ করে অতঃপর এ বিবাহের পাঁচ মাসের মাথায় সন্তান জন্ম দেয় তাহলে পূর্বের স্বামী ও দ্বিতীয় স্বামীর মধ্য হতে কারও সাথে সন্তানের সম্পর্ক কায়েম হবে না। দ্বিতীয় বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ তা গর্ভ অবস্থায় হয়েছে বলে মনে করা হবে। এদিকে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গেও তার নসব (বংশ) মিলানো যাবে না। কারণ সে চূড়ান্ত মেয়াদের (৫ বছর) এক মাস পর ভূমিষ্ঠ হয়েছে। দ্বিতীয় স্বামীর নসবের সাথেও মেলানো যাবে না। কারণ সে গর্ভের নিম্নতর মেয়াদ ছয় মাসের ভিতরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।[৯১]

---

৮৯. সূরাঃ আল-বাকারা আয়াতঃ ২২২।

৯০. ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, খ. ৬, পৃ. ১৯৫; রাবী সুবাইআহ আল-আসলামিয়্যা।

৯১. হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৪; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৪; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৭।

www.amarboi.org

**দ্বিতীয় অভিমত :** শাফেয়ীগণ বলেন, গর্ভে সন্তান হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে মহিলা যদি ইদ্দতের ব্যাপারে সন্দিহান হয়। আর এসন্দেহ সৃষ্টি হয় ভার ভার অনুভূতি কিংবা পেটে নড়াচড়ার কারণে। তাহলে এ মহিলা সে পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ করবে না যে পর্যন্ত তার সন্দেহ দূরীভূত না হয়। এজন্য তাকে এতটুকু সময় অপেক্ষা করতে হবে, যা অতিক্রান্ত হলে মহিলাগণ মনে করে, আর সন্তান জন্মাবে না। কারণ নিশ্চিতভাবে তার ওপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছে। ফলে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তা হতে পরিত্রাণ লাভ হবে না। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে বিবাহ করলে সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হীনতা ও যৌনাঙ্গের হিফাজতে সাবধানতার নিমিত্তে। এছাড়া কথা হলো, চুক্তিকৃত জিনিসের ওপর সন্দেহের সৃষ্টি হলে তা চুক্তিকেই বাতিল করে দেয়।

ইদ্দত পূর্ণ হওয়া এবং অন্য স্বামী গ্রহণ করার পর যদি ইদ্দতের ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহলে দ্বিতীয় বিবাহ বহাল থাকবে। হ্যাঁ, যদি এ বিবাহ থেকে নিয়ে ছয় মাসের ভিতর সন্তান জন্মায় তাহলে এ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ তখন প্রমাণিত হবে, বিবাহকালে মহিলা গর্ভবতী ছিল। আর সন্তানটি যদি প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ছয় মাস বা তার অধিককাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলা সন্তান জন্মায় তা হলে সেটি হবে দ্বিতীয় স্বামীর। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করার পূর্বে যদি মহিলা সন্দিহান হয় তাহলে সে সতর্কতামূলক ভাবে অন্য স্বামী গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে যাতে সন্দেহ মুক্ত হয়।[৯২] এ-ব্যাপারে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ
"যে জিনিস তোমাকে সন্দেহযুক্ত করে তাকে তুমি সেদিকে নিয়ে যাও যেখানে গেলে আর সন্দেহ থাকবে না"।[৯৩]

**তৃতীয় অভিমত :** ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা গর্ভবতী কি-না, এ সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত হলে হাম্বলীগণের মতে তার তিনটি অবস্থা :

**এক.** ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি সন্দেহের সঞ্চার হয় তাহলে মহিলা সন্দেহের অপনোদন না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে থাকবে। যদি গর্ভ প্রকাশ পায় তাহলে প্রসব হওয়ার মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হবে। আর যদি প্রকাশ পায় সে গর্ভবতী ছিল না তাহলে কুরূ'র মাধ্যমে বা মাসের মাধ্যমে তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। সন্দেহ দূরীভূত হওয়ার পূর্বে যদি মহিলা কারও

---

৯২. মুগনী আল-মুহতাজ'ত, খ. ৩৮৯।

৯৩. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬৬৮; নাসাঈ, আল-সুনান, খ. ৮, পৃ. ৩২৮; ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে "হাসান সহীহ" বলে অভিহিত করেছেন।

www.amarboi.org

সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ বাহ্যত সে ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিবাহ করেছে। গর্ভের অনুপস্থিতি যদি প্রকাশ পায় তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরই বিবাহ করেছে।

**দ্বিতীয় :** ইদ্দত পূর্ণ হওয়া এবং বিবাহ করার পর যদি সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহলে বিবাহ শুদ্ধ বলে মনে করতে হবে। কারণ, বাহ্যত এ সন্দেহ ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে। গর্ভের সন্দেহ করা সন্দেহযুক্ত জিনিস। এর ফলে শুদ্ধ জিনিসকে অশুচি মনে করা হয় না। তবে স্বামীর জন্য তার সাথে সংগত হওয়া বৈধ নয়। কারণ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আরোপিত হয়েছে। এদিকে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাদের জন্য অন্যের খামারে আপন পানি সিঞ্চন করা বৈধ নয়। অতঃপর যদি বিবাহের পর ছয় মাসের ভিতর সন্তান প্রসব করে তাহলে দ্বিতীয় বিবাহটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ দ্বিতীয় বিবাহটি ইদ্দতের মাঝে হয়েছিল বলে প্রতিভাত হবে। আর যদি মহিলা ছয় মাসের পর সন্তান প্রসব করে তাহলে বিবাহ শুদ্ধ ছিল বলে গণ্য হবে এবং সন্তানও দ্বিতীয় স্বামীর বলে গণ্য হবে।

**তৃতীয় :** ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পূর্বে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহলে মহিলার জন্য বিবাহ করা বৈধ হবে না। যদি সে বিবাহ করে তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে অন্য এক বর্ণনামতে মহিলার জন্য বিবাহ করা হালাল ও শুদ্ধ হবে।[৯৪]

**এক ধরনের ইদ্দত হতে অন্য ধরনের ইদ্দতে স্থানান্তর**

ইদ্দতের ধরন ৩টি : ১. কুরূ গণনার মাধ্যমে, ২. মাস গণনার মাধ্যমে এবং ৩. গর্ভ প্রসবান্তে। কোনো কোনো সময় এক ধরন হতে অন্য ধরনে স্থানান্তরিত হতে হয়।

**১ম অবস্থা :** মাস গণনা হতে কুরূ'র প্রতি স্থানান্তরিত হওয়া। এটি নাবালিকা বা স্রাবহীন মহিলার ক্ষেত্রে।

নাবালিকা বা বালিকা মেয়ে যার এখনও স্রাব আসেনি সে যদি মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত শুরু করে আর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার স্রাব শুরু হয়, তাহলে এর মাধ্যমে তার ইদ্দত পুনরায় পালন করতে হবে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার এক মুহূর্ত পূর্ব হতে স্রাব শুরু হলেও। কারণ মাস দিয়ে ইদ্দত পালন হলো বিকল্প ব্যবস্থা। যখন মূলটি পাওয়া যায় তখন বিকল্প ব্যবস্থা এমনিতেই বাতিল হয়ে

---

৯৪. ইবনে কুদামা, আল মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০৪; এসকল বিবরণ ছিল ফুকাহায়ে কিরামের তদানীন্তন যুগে। তখন এছাড়া গর্ভ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোন মাধ্যম ছিল না। আধুনিককালে গর্ভ সঞ্চার হওয়া এবং না হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার বহু মাধ্যম রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান এসম্পর্কে খুবই অগ্রসর।

www.amarboi.org

যায়। পানি পাওয়া গেলে যেমন তায়াম্মুম বাতিল হয়।[৯৫] মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর যদি স্রাব শুরু হয় যদিও তা এক মুহূর্ত পূর্বেই পূর্ণ হয় তাহলে আর স্থানান্তরের প্রয়োজন নেই। কারণ তা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরতে হবে। অনেকদিন পর হায়েজ শুরু হওয়ার যে হুকুম এক্ষেত্রেও সেই একই হুকুম। এ রীতিকে অস্বীকার করারও কোনো উপায় নেই। মাস গণনার ইদ্দতকে অস্বীকার করলে স্রাবহীন মহিলার ইদ্দত পালনের কোনো সুযোগই থাকবে না।[৯৬]

স্রাবহীন মহিলা যদি মাস গণনার মধ্যমে ইদ্দতের কিছু অংশ পালন করে ফেলে অতঃপর তার স্রাব শুরু হয় তাহলে শাফেয়ী ও হানাফীগণের মতে তার ইদ্দত কুরূ'র মাধ্যমে পালন করতে হবে। হানাফীগণের এটি জাহিরী মত। কারণ, যখন তার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেল তখন মনে করতে হবে যে, সে স্রাবহীন নয় বরং সে ধারনায় ভুল করেছে, ফলে মাসের মাধ্যমে ইদ্দতপালন করার তার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এটি বিকল্প ব্যবস্থা।

হানাফীগণের এক অভিমত হলো, স্রাবহীনা হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। ঐ বয়সে যাওয়ার পর মহিলাকে স্রাবহীনা গণ্য করা হয়। এ সময়সীমায় উপনীত হওয়ার পর স্রাব আসলে এটিকে হায়েয হিসেবে গণ্য করা হবে না। যেমন এমন ছোট্ট মেয়ে যার হায়েয আসার সময় হয়নি তার স্রাব দেখা গেলে সেটিকে হায়েয গণ্য করা হবে না। তবে হ্যাঁ, খাঁটি রক্তস্রাব দেখা গেলে তাকে হায়েযই ধরতে হবে এবং মাস গণনার ইদ্দত বাতিল বলে গণ্য হবে। জাসসাস সূত্রে আল-কাসানী বলেন, এসব বিশ্লেষণ সে মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যার স্রাবহীনা হওয়ার ব্যাপারে ধারণা করা হয়। নিশ্চিত স্রাবহীনা মহিলার যদি ঋতুস্রাব পরিলক্ষিত হয় তাহলে সেটি হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ এসব মহিলার হায়েয আসা হলো নবীগণের মুজিযা। মুজিযার সুরত ছাড়া একে হায়েয গণ্য করার কোনো উপায় নেই।[৯৭]

মালেকী ও হাম্বলীগণ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। মালিকীগণ বলেন, মহিলা যখন পঞ্চাশ বছর পর এবং সত্তর বছরের পূর্বে স্রাব দেখবে তখন সেটি সন্দেহযুক্ত স্রাব হবে। তবে হাম্বলীগণ সত্তরের স্থলে ষাট বছর সময়সীমা নির্ধারণ

---

৯৫. আল-কাসানী, আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০২।

৯৬. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০০; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৬; হাশিয়া দাসূকী 'আলাশ শারহিল-কাবীর, খ. ২, পৃ. ৪৭৩; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯২; আল-কাওয়ানীনুল-ফিকহিয়্যা ২৯৯; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭০; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০২; উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ দারুল কিতাবিল আরাবী হতে প্রকাশিত।

৯৭. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০০; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৬; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬।

www.amarboi.org

করেছেন। মহিলাগণের এ ব্যাপারে মতামত নিতে হবে যে, এটি হায়েয কি-না? সে মুতাবিক ফয়সালা হবে। তবে হাম্বালীগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, মহিলা যদি পঞ্চাশোর্ধ হওয়ার পর তার পূর্বেকার অভ্যাসের মতো একই ধরনের স্রাব দেখে তাহলে সাহীহ অভিমত অনুযায়ী সেটি হায়েয বলে গণ্য হবে। কারণ সম্ভাব্য সময়ে রক্ত দেখা হলো হায়েয হওয়ার দলীল। দুর্লভ হলেও সেটি সম্ভাব্য সময় বলে ধরে নেয়া যায়। মহিলার ষাট বছর পূর্তি হয়ে গেলে নিশ্চিত হওয়া যায়, এটি হায়েয নয়। ফলে এ বয়স উতরে যাওয়ায় স্রাব দেখা গেলেও তাকে মাসের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করতে হবে।[৯৮]

শাফেয়ীগণ বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, স্রাব পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ মহিলা যখন তিনমাস পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত দেখতে পায় তখন তার হুকুম তিন ধরনের হতে পারে :

**এক.** মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে কুরূ'র মাধ্যমে আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। যেমন নাবালিকা মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালনশেষে স্রাব দেখতে পেলে হয়ে থাকে। এটি জমহুর ফুকাহার আভিমত।

**দুই.** নিরাশ মহিলার জন্য স্রাব দ্বারা ইদ্দত আবার পালন করতে হবে। কারণ এর দ্বারা প্রমাণ হলো, সে প্রকৃতপক্ষে স্রাব থেকে নিরাশ নয়। কিন্তু নাবালিকার হুকুম ভিন্ন। ইদ্দত পালন শেষে তার স্রাব আসলে পূর্বে সে ঋতুমতী হওয়ার উপযুক্ত ছিল বলে ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই।

**তিন.** মাস গণনার পর যদি মহিলার বিবাহ হয়ে যায় তাহলে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং বিবাহও শুদ্ধ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় তার ওপর আবশ্যক হবে কুরূ'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা। এটি তাদের সর্বাধিক জাহিরী অভিমত।[৯৯]

**দ্বিতীয় অবস্থা : কুরু'র** মাধ্যমে ইদ্দত পালন হতে মাস গণনার প্রতি স্থানান্তরিত হওয়া।

যে মহিলার একটি বা দু'টি হায়েয আসার পর হায়েয বন্ধ হয়ে যায় এবং হায়েয আসা থেকে সে নিরাশ হয়ে যায়, তার ইদ্দত মাস গণনার মাধ্যমে পালন করতে হবে। এটি জমহুর ফুকাহার অভিমত। এসম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

"তোমাদের যেসকল স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস"।[১০০]

---

৯৮. শারহুয যারকানী, খ. ৪, পৃ. ২০৪; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৪৪, আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪২০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ৯২, ১০৮।
৯৯. রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭৩; ইবনে কুদামা আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০৩।
১০০. সূরা: আত-তালাক, আয়াত: ৪

www.amarboi.org

মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন হলো হায়েযের বিকল্প, যখন আসলটি পাওয়া না যাবে তখন বিকল্পের দিকে স্থানান্তরিত হওয়াই নিয়ম। আসল ও তার বিকল্পকে এক সাথে বিবেচনা করা যায় না। এদিকে ইদ্দতের মাঝে দু'ধরনের জিনিসকে একত্রিত করা যায়না। হায়েয দ্বারা যখন ইদ্দত গণনা অসম্ভব হয় তখন মাস দ্বারাই তা পালন করা আবশ্যক হয়।[১০১]

মহিলার নিরাশ হওয়ার বয়স হলো, যে বয়সে পৌছার পর সাধারণত হায়েয আসা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ বয়সে পৌছার পর যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বাহ্যিকভাবে ধরে নিতে হবে মহিলা হায়েয হতে নিরাশ। হায়েয হতে নিরাশ হওয়ার বয়স নির্ধারণে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে কয়েকটি মত রয়েছে।[১০২]

স্রাব হতে নিরাশ হওয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে যদি হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার বিধান সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

**তৃতীয় অবস্থা :** তালাকের ইদ্দত হতে ওফাতের ইদ্দতের প্রতি ধাবিত হওয়া।

কোনো লোক তার স্ত্রীকে রাজয়ী তালাক দেয়ার পর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় যদি মারা যায় তাহলে মহিলার তালাকের ইদ্দত রহিত হয়ে যায় এবং স্বামীর ওফাতের সময় হতে তাকে চারমাস দশদিন ওফাতের ইদ্দত পালন করতে হয়। কারণ রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দতের ভিতর স্ত্রী হিসেবেই বিবেচিত হয়। তার ওপর আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী প্রযোজ্য হয় :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকবে"।[১০৩]

ইবনুল মুনযির এ ব্যাপারে আহলে ইলমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দাবি করেছেন। কারণ রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্ত্রী হিসেবেই গণ্য, তাকে তালাক দিলে তা পতিত হয় এবং সে স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, সুস্থ অবস্থায় স্ত্রীকে বায়েন তালাকদানের পর স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে মহিলা তালাকের ইদ্দতই পালন করবে, ওফাতের ইদ্দতের

---

১০১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১৪৬; আল-কাসানী, আল-বাদায়ে' খ. ৩, পৃ. ২০০; হাশিয়াতুদ দাসূকী, রাওদাতুত তালিবীন খ. ৮, পৃ. ৩৭১; ইবনে কুদামা, আল মুগনী খ. ৯, পৃ. ১০৩।

১০২. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১৪৫; মাওয়াহিবুল জালীল খ. ৪, পৃ. ১৪৪; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪২০।

১০৩. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০৮।

www.amarboi.org

প্রতি তাকে স্থানান্তরিত হতে হবে না। কারণ, বায়েন তালাকদানের সাথে সাথে দাম্পত্যজীবন শেষ হয়ে যায়। এ কারণে বায়েন তালাকের ইদ্দত পালন অবস্থায় স্বামী মারা গেলে তাদের মাঝে উত্তরাধিকারিত্ব কায়েম হয় না।

একই ধরনের বিধান হলো, স্ত্রীর তালাক চাওয়ার ভিত্তিতে যদি স্বামী তাকে বায়েন তালাক দেয়।

মুমূর্ষু অবস্থায় স্ত্রীর তালাক চাওয়া ছাড়াই যদি স্বামী তাকে বায়েন তালাক দেয় অতঃপর স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতরেই যে মারা গেলে আবু হানীফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের মতে তালাক ও ওফাতের দুই ইদ্দতের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি সময়ের ইদ্দত মহিলাকে পালন করতে হবে। এমতাবস্থায় স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হবে। এর ফলে বিবাহ কায়েম রয়েছে বলে সন্দেহ থাকায় সতকর্তা হলো, তুলনামূলক দীর্ঘতর ইদ্দতটি পালন করা।

যদি আমরা ধরে নিই, স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে মহিলার দু'টি হায়েয অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তৃতীয় হায়েয আসার পূর্বেই তার ওফাতের ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেছে তাহলে মহিলা তালাকের ইদ্দত পূর্ণ করবে। পক্ষান্তরে ওফাতের পর যদি তৃতীয় হায়েয সম্পন্ন হয়ে যায় তাও আবার ওফাতের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাহলে মহিলাকে ওফাতের ইদ্দতই পালন করতে হবে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু উবায়দ, আবু সাওর, আবু ইউসুফ ও ইবনুল মুনযির বলেন, বায়েন তালাক দেয়ার ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় স্ত্রীকে তালাকের ইদ্দতই পালন করতে হবে।

সে তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে না। স্ত্রীকে সম্পত্তি হতে বঞ্চিতকরণের অসৎ উদ্দেশ্যের ফলে তাকে স্বামীর উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। এর ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক বাকি থাকা বুঝায় না। ওফাতের ইদ্দত পালন করা হয় শোক দুঃখ বেদনার নিমিত্তে।[১০৪]

**চতুর্থ অবস্থা :** কুরূ বা মাস গণনার ইদ্দত হতে প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালনের দিকে ধাবিত হওয়া : কুরূ বা মাসের মাধ্যমে ইদ্দত পালনকালে বা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর যদি প্রকাশ পায় যে, মহিলা স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী ছিল তাহলে ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। মাস বা কুরূর মাধ্যমে পালিত ইদ্দত রহিত

---

১০৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ১৪২; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৫; আল-বাদায়ে', খ.৩, পৃ. ২০০; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, ২৪২; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ১৫০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০৮।

www.amarboi.org

হয়ে যাবে। এটি মাযহাব চতুষ্টয়ের জমহুর উলামার অভিমত। এটিও প্রমাণিত হবে যে, স্রাব যা পরিলক্ষিত হয়েছিল তা হায়েযের ছিল না। কারণ গর্ভবতী মহিলা স্রাবযুক্ত হয় না। ওপরন্তু সন্তান প্রসব হলো জরায়ুর পূত: ও পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার সবচেয়ে বড় উপায়।[১০৫]

**ইদ্দতের সূচনা ও সমাপ্তি.**

তালাকের ইদ্দত তালাকের পর পরই এবং ওফাতের ইদ্দত ওফাতের পর পরই শুরু হবে বলে হানাফীগণ মনে করেন। কারণ ইদ্দতের প্রয়োজনই হলো তালাক এবং ওফাতের কারণে। ফলে হেতু পাওয়ার সময় থেকেই ইদ্দতের সূচনা ধর্তব্য হবে। মহিলা তালাকের কথা না জানলে অনুরূপভাবে স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত না হলেও যদি ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, আমাদের মাশাইখে কেরাম তালাকের ক্ষেত্রে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন যে, তালাকের কথা স্বীকার করার সময় হতে ইদ্দত শুরু হবে। যাতে পরস্পর যোগসাজসের অভিযোগ বিদূরীত হয়। বাবারতী বলেন, এটি এ কারণে যে, স্বামী ও স্ত্রীর জন্য তালাক ও ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে একমত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে অসুস্থ স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর পক্ষে ঋণের কথা এবং কোনো কিছুর ওসিয়তের কথা বলা সহীহ্ হবে।

ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারেও তারা একমত হতে পারবে, যাতে স্বামীর জন্য স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে এবং তাকে ছাড়া চারজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে।[১০৬]

মালেকীগণ মনে করেন, তালাকের কথা জানার সময় হতে ইদ্দত পালনের সূচনা হবে। সুস্থ্ থাকা অবস্থায় যদি স্বামী পূর্বে তালাকদানের কথা স্বীকার করে আর এটি এমন সময়ে যে, এ স্বীকারোক্তির পূর্বেই ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মহিলা স্বীকারোক্তির সময় হতে ইদ্দত গণনা শুরু করবে। এমতাবস্থায় মহিলা স্বামীর ওয়ারিস হবে। কারণ তার ইদ্দত অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তার ওয়ারিস হবে না। কারণ তার স্বীকারোক্তিতে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যদি পূর্বে তালাকদানের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে ইদ্দত পালিত হবে। এ বিবরণ হলো, রাজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে। বায়েন তালাকের পর স্বামী স্ত্রীর কেউই কারও ওয়ারিস হবে না এবং ওফাতের ইদ্দত মারা যাওয়ার পর থেকেই শুরু হবে।[১০৭]

---

১০৫. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০১; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১২৯।

১০৬. আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১৫৪।

১০৭. আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১৪৬।

www.amarboi.org

শাফেয়ীগণ বলেন, ওফাতের ইদ্দত মৃত্যুর সময় হতে এবং তালাকের ইদ্দত তালাকের সময় হতে শুরু হবে। কারণ এ দু'টি সময়ই হলো তালাক ওয়াজিব হওয়ার সময়। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর যদি মহিলার নিকট স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পৌছে অনুরূপভাবে তালাকের সংবাদ পৌছে তাহলে ইদ্দত হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। মহিলার ওপর আর কোনো কিছু পালন করা আবশ্যক হবে না। কারণ নাবালিকা মেয়ের ইচ্ছাশক্তি না থাকা সত্ত্বেও তার ইদ্দত পালিত হয়ে যায়।[১০৮]

হাম্বলীগণ বলেন, স্ত্রী হতে বহু দূরে বসবাসকারী স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় কিংবা স্বামী মারা যায় তাহলে তালাকদানের সময় হতে, অনুরূপভাবে স্বামীর মৃত্যুর সময় হতে ইদ্দত গণ্য হবে। তালাক ও মৃত্যু সম্পর্কে জানার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। হাম্বলীগণের এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত। ইমাম আহমদ র. হতে একটি অভিমত বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেন : এ সম্পর্কে কোনো দলীল কায়েম থাকলে বিধান সেরূপই হবে। যদি কোনো দলীল না থাকে তাহলে মহিলার নিকট যেদিন খবর পৌছবে সেদিন হতে সে ইদ্দত পালন করবে।[১০৯]

ইদ্দতের সমাপ্তি তার ধরন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। মহিলা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সম্পূর্ণরূপে প্রসব করার পর তা সমাপ্ত হবে। কুরূ'র মাধ্যমে যদি ইদ্দত পালনকারিণী হয় তাহলে তিন কুরূ'র সমাপ্তিতে ইদ্দত পূর্ণ হবে। মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালনকারিণী হলে বিচ্ছেদের সময় হতে কিংবা স্বামীর ওফাতের সময় হতে তা গণনা করে তিন মাস বা চার মাস দশদিন অতিক্রান্ত হলে ইদ্দত পূর্ণ হবে।

আল-কাসানী বলেন, ইদ্দত পূর্ণ হয় দুইভাবে : এক. কথার মাধ্যমে, দুই. কাজের মাধ্যমে।

**কথার মাধ্যমে :** যেমন ইদ্দত পালনকারিণী ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা এমন সময়ে বলে, যার মধ্যে এ ধরনের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া সম্ভব হয়। মহিলা যদি আযাদ হয় আর সে মাসের মাধ্যমে ইদ্দত গণনাকারী হয় তাহলে তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে তার তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

অনুরূপভাবে চার মাস দশদিনের কমসময়ে তার ওফাতের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। মহিলা যদি আযাদ স্রাবওয়ালী হয় আর সে ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী হয় তাহলে চার মাস দশদিনের কম সময়ে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। মহিলা যদি তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী হয় আর এমন মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পর সে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবি করে যাতে সাধারণত ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মেয়াদের মধ্যে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া সম্ভব না হয়

---

১০৮. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৩৯।
১০৯. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৮৮।

www.amarboi.org

সেক্ষেত্রে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথা তখনই গৃহীত হয় যখন বাস্তবতা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত না করে। আর বাস্তবতা এক্ষেত্রে মহিলাকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করেছে। তবে মহিলা যদি শপথ করে তার দাবিকে ব্যাখ্যা করে তাহলে ব্যাখ্যাসহ তার ইদ্দত পূর্তির দাবি গৃহীত হবে। কারণ ব্যাখ্যা সঙ্গে থাকায় বাস্তবতা তাকে অস্বীকার করেছে না। ইমাম আবু হানীফা র. বলেন, স্রাবধারী মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবি বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার সর্বনিম্ন মেয়াদ হলো ষাট দিন। আর ইমাম আবু ইউসুফও মুহাম্মাদ র.-এর মতে উনচল্লিশ দিন।

**কাজের মাধ্যমে :** সাধারণত যতদিন পর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা ততদিন সময় পার করার পর মহিলার অন্য স্বামী গ্রহণ করা। এমনকি এ ধরনের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলা যদি বলে, আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়নি তাহলে তাকে সত্যবাদী আখ্যায়িত করা যাবে না। পূর্ববর্তী স্বামী এবং পরবর্তী স্বামী কারো অধিকারের ক্ষেত্রে নয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্বামীর জন্য সে বৈধ। কারণ এ ধরনের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলার বিবাহের প্রতি অগ্রসর হওয়াই প্রমাণ করে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে।[১১০]

## মুসতাহাযা (স্রাবজনিত রোগগ্রস্ত) মহিলার ইদ্দত

রোগজনিত কারণে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে মহিলার স্রাব প্রবাহিত হওয়াকে ইসতিহাযা বলে। যে মহিলার এমন স্রাব আছে তাকে মুসতাহাযা বলে। হায়েযের স্রাব আসার যে সময় তা পার হওয়ার পরও যদি মহিলার রক্ত ঝরা বন্ধ না হয় তা হলে তার অবস্থা দু'ধরনের হয়ে থাকে :

**প্রথম অবস্থা :** গন্ধ, রঙ, আধিক্য, স্বল্পতা বা অভ্যাস ইত্যাদি দ্বারা যদি হায়েয ও ইসতিহাযার মধ্যে মহিলা পার্থক্য করতে পারে তাহলে তাকে গায়র মুতাহায়্যিরা (غَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ) বা ইতস্ততহীনা বলে। এ ধরনের মহিলা কুরূ' দ্বারা ইদ্দত পালন করবে।[১১১]

কারণ এ সম্পর্কিত দলীলগুলো ব্যাপক অর্থবোধক ইরশাদ হয়েছে :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে"।[১১২]

---

১১০. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৮; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩১২।

১১১. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩১২; আদ-দাসূকী, খ. ২,পৃ. ৪৭০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৬৯।

১১২. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২২৮।

www.amarboi.org

**দ্বিতীয় অবস্থা :** মুসতাহাযা মুতাহায়্যিরা বা ইতস্ততবোধকারিণী মহিলা হলো, যে হায়েয ও ইসতিহাযার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। সে তার পূর্ব অভ্যাসের হায়েযের দিনের পরিমাণও ভুলে গেছে। বা এমন ধরনের মহিলা, যার একদিন স্রাব আসে আর একদিন তা বন্ধ থাকে। এটিই মহিলার প্রথম হায়েয হোক আর পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্না হোক। এ ধরনের মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম তিন ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

**১ম অভিমত :** হানাফী মাযহাবের জমহুর ফুকাহার অভিমত, শাফেয়ীগণের বিশুদ্ধ অভিমত, এক উক্তি অনুযায়ী হাম্বলীগণের অভিমত, অনুরূপ ইকরিমা, কাতাদা ও আবু উবায়দার অভিমত হলো, এ ধরনের মুসতাহাযা মহিলা তিন মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। এ অভিমতের পক্ষে দলীল হলো, প্রতিমাসে নিতান্তপক্ষে তো একটি হায়েয আসে। আর প্রতিটি মাস তো হায়েয ও পবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ থাকে। এদিকে মহিলাতো ইদ্দত প্রলম্বিত করে নিরাশ হওয়ার বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না। এছাড়া মহিলা তো নিম্নোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল :

إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

"ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস।"[১১৩]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ স. হামনা বিনত জাহশ রা. -কে বলেছিলেন :

تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

"তুমি মুখ বন্ধ করে রেখো এবং প্রতিমাসে একটি হায়েয গণনা কর, তা আল্লাহর ইলম অনুযায়ী ছয় বা সাত দিন হতে পারে।"[১১৪]

রাসূলুল্লাহ স. এ মুসতাহাযা মহিলার জন্য প্রতিমাসে একটি হায়েয নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে সে সালাত ও সাওম বর্জন করবে এবং তাতে হায়েযের সকল বিধান কার্যকর হবে। এতে প্রমাণিত হয়, এর দ্বারা ইদ্দতও পূর্ণ হবে। কারণ এটিও হায়েযের অন্যতম বিধান।

**দ্বিতীয় অভিমত :** ইসতিহাযাওয়ালী ইতস্ততবোধকারিণী মহিলার ইদ্দত পূর্ণ একবছর বলে অভিমত পোষণ করেন মালেকী মাযহাব অনুসারীগণ। এটি হাম্বলী গণেরও এক অভিমত। ইমাম ইসহাকও এ অভিমত পোষণ করেন। মালেকীগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সন্তান মুক্তিসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নয় মাস মহিলা অপেক্ষা করবে। অতঃপর তিনমাস ইদ্দত পালন করবে। এইমোট একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলা অন্যান্য পুরুষের জন্য বিয়ের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

---

১১৩. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ৪।

১১৪. তিরমিযী আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২২৩; ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ২০৫; ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান সাহীহ বলে অভিহিত করেছেন।



www.amarboi.org

**তৃতীয় অভিমত :** সন্তানসম্ভবা হওয়ার বয়স পার হওয়ার পর এ ধরনের মহিলা তিনটি মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। এটি শাফেয়ীগণের অভিমত। অথবা চারবছর পর্যন্ত মহিলা অপেক্ষা করবে অথবা নয় মাস অপেক্ষা করবে। এ অভিমত সতর্কতার ভিত্তিতে।[১১৫]

## সন্দেহ পোষণকারী বা দীর্ঘ তুহরওয়ালী মহিলার ইদ্দত

গর্ভের কারণে নয় বা সন্তান প্রাপ্তি হতে নিরাশার কারণে নয় এমন ঋতুমতী মহিলার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে তা দীর্ঘতর হলে এমন ধরনের মহিলাকে (مرتابة) সন্দেহ পোষণকারিণী বা দীর্ঘ তুহরওয়ালী অভিহিত করা হয়। এমন মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিলে তার স্রাব যদি জানা কোনো কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় যেমন মহিলা যদি স্তন্যদানকারিণী হয় বা নিফাসওয়ালী অথবা এমন রোগী হয় যা আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে ইদ্দত পালনের জন্য মহিলার ওপর ওয়াজিব হলো স্রাব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অতঃপর সে কুরূ দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। অথবা সে সন্তানসম্ভবা হওয়ার বয়স পার হওয়ার সীমানায় পৌঁছে যাবে। যাতে তিন মাস গণনার মাধ্যমেই ইদ্দত পালন করবে। আর দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার কোনো ধার ধারবে না। আলী, উসমান ও যায়েদ ইবনে সাবিত রা. প্রমুখ সাহাবীগণ এ অভিমত পোষণ করেন।

ঋতুমতী মহিলার হায়েয আসার পর যদি কোনো কারণ ব্যতিরেকে তা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইদ্দত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারিণী এমন মহিলার জন্য বাঞ্ছনীয় হলো নয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা। একে গর্ভের সর্বোচ্চ মেয়াদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হযরত উমর, ইবনে আব্বাস রা. হাসান বসরী ও মালেকী মাযহাব অনুসারীগণ এ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ীরও এটি পুরাতন অভিমত। হাম্বলীগণের মাযহাবও তাই। কারণ নয় মাস অতিক্রান্ত হলে সন্তানসম্ভবা না হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। অতঃপর তিন মাস গণনা করে ইদ্দত পালন করবে এবং অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ করার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এ অভিমত পোষণকারীগণের দলীল হলো, হযরত উমর রা.-এর যুগে এক মহিলাকে তার স্বামী তালাক প্রদান করার পর সে এক বা দুই হায়েয পেয়েছিল। অতঃপর অকারণে তার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। উমর রা. তখন তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, সে নয় মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তার গর্ভ প্রকাশ না পেলে সে তিন মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। ইবনুল মুনযির

---

১১৫. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩১২; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩,পৃ ৩৮৫।

www.amarboi.org

বলেন, মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে উমর রা. এ রায় দিয়েছিলেন। কেউ তাতে দ্বিমত পোষণ করেন নি।[১১৬]

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণের সর্বশেষ অভিমত হলো, এ ধরনের মহিলার জন্য হায়েয আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা অথবা নিরাশ হওয়ার বয়সে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হায়েয আসলে কুরূ'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। আর নিরাশ হলে মাসের মাধ্যমে তা পালন করবে।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের প্রাচীন একটি অভিমত হলো, মহিলাকে গর্ভের সর্বোচ্চ মেয়াদ চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন, শাফেয়ী মাযহাবের প্রাচীন অভিমত ছিল গর্ভের নিম্নতর মেয়াদ ছয়মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের সর্বশেষ অভিমতের আলোকে বলা হয়, নিরাশের বয়সে উপনীত হওয়ার পর মাসের মাধ্যমে ইদ্দত পালনকালে তিনমাসের ভিতরে যদি মহিলার হায়েয আসা শুরু হয় তাহলে তাকে কুরু'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করতে হবে।

কারণ বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করার পূর্বেই আসল জিনিস ফিরে এসেছে। আর যদি তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পর হায়েয আসে তাহলে সেক্ষেত্রে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, তিন মাসের পর মহিলা যদি বিবাহ করে ফেলে তাহলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে এবং বিবাহ সাহীহ হয়েছে বলে গণ্য হবে। বিবাহ না করলে কুরূ'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কারণ প্রমাণিত হলো, মহিলা নিরাশ হওয়ার বয়সে উপনীত হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, বিবাহ করুক আর নাই করুক মহিলাকে কুরূ'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করার দিকে ফিরতে হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে মহিলার বিবাহ হোক আর না হোক আর কুরূ'র দিকে ফেরার প্রয়োজন নেই। কারণ দৃশ্যত তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। একথার পিছনে যুক্তি হলো, নাবালিকা মেয়ের ইদ্দত মাস গণনার মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার হায়েয আসলে সেক্ষেত্রে ইদ্দত দোহরাতে হয় না।[১১৭]

**অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তার মানের কারো স্ত্রীর ইদ্দত**

ফুকাহায়ে কেরামের মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন, স্ত্রী যদি গর্ভবতী না হয়। প্রাপ্তবয়স্ক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর এক্ষেত্রে

---

১১৬. বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৫; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৬; হাশিয়া দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭০; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা , খ. ২, পৃ. ৪১; জাওয়ারিুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭।

১১৭. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭৪১।

www.amarboi.org

কোনো তারতম্য নেই। তবে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে দু'টি অভিমতের ভিত্তিতে তারা ইখতিলাফ করেছেন।

**১ম অভিমত :** স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় আর স্বামী এমন অল্প বয়স্ক অবস্থায় মারা যায়, যে বয়সে সন্তান জন্মদানে সক্ষম হওয়ার কথা নয়, তাহলে মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মাযহাব হলো, তার স্ত্রীর ইদ্দত হবে চার মাস দশদিন। কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এটি স্বামীর গর্ভ নয়। এর দলীল হলো এ স্বামীর সাথে সন্তানের সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। ফলে প্রসবের দ্বারা ইদ্দত পালন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যেমন যিনার ফলে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সৃষ্ট গর্ভের কারণে প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করার বিধান নেই।[১১৮]

স্বামী যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা লিঙ্গকর্তিত হয় তাহলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে নেই। স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত হোক আর তালাকদানের ইদ্দত হোক; বরং মহিলা তিনটি কুরূ'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে তালাকের ক্ষেত্রে। মহিলার নেফাস একটি হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। স্বামী মারা গেলে মহিলার ওপর দু'ধরনের ইদ্দতের মাঝে তুলনামূলক দীর্ঘতর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। দু'ধরনের ইদ্দত বলতে সন্তান প্রসব ও চারমাস দশদিনকে বুঝায়। এটি মালেকীগণের অভিমত।[১১৯]

হানাফীগণ বলেন, মিলনের উপযুক্ত এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বামী যার বীর্যপাত হওয়ার ধারনা করা যায়, সে যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে সে স্ত্রীর সাথে একান্তে বাস করলেও ইদ্দত ওয়াজিব হবে। তাই তা বিশুদ্ধ পন্থায় হোক আর ফাসিদ পন্থায় হোক। স্বামীর বয়স স্বল্পতার কারণে যদি মিলিত হতে অসমর্থ হয় অথবা সে স্ত্রীর সাথে একান্তে বাস না করে তাহলে তালাকদানের ফলে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না।

শাফেয়ীগণের অভিমত হলো, অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর মিলনের ফলে তালাকের ইদ্দত ওয়াজিব হবে। যদিও সে সন্তান জন্মদানের বয়সে উপনীত না হয়। কারণ তালাকের ইদ্দত পালন করার দলীলসমূহে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা নেই এছাড়া যে বীর্যপাতের দরুন সন্তান আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় তা ব্যক্তি ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে শরীয়ত এর গুণাগুণ বিবেচনা না করে শুধুমাত্র তার কারণ মিলনের প্রতি লক্ষ্য করে ইদ্দত পালনকে আবশ্যক করেছেন। ফলে মিলন বা বীর্য প্রবেশ পাওয়া গেলেই ইদ্দত ওয়াজিব হবে। যেমন মুসাফির হলেই বিধানের মাঝে শিথিলতা আসে; কষ্টের সফর হোক

---

১১৮. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৭; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪,পৃ. ৩২৩; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৪; আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ৫২।

১১৯. আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯১।

www.amarboi.org

আর আরামের সফর তাতে কোনো বৈষম্য নেই। যারকাশী বলেন, মিলনের উপযোগী কিশোরের মিলনের ফলে ইদ্দত ওয়াজিব হয়। ইমাম গাযালী এরই আলোকে ফাতওয়া প্রদান করেন।[১২০]

**দ্বিতীয় অভিমত :** ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর মতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে যদি মারা যায় আর তার স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহলে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব করার দ্বারা। এটি ইমাম আহমদ র.-এর এক অভিমত। কারণ সার্বিকভাবে আল্লাহ তাআলা গর্ভ প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালনের কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"এবং গর্ভবতী নারীদের কাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত"।[১২১]

আরও যুক্তি হলো, ইদ্দত ওয়াজিব হয় জরায়ুর সন্তান মুক্ত হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য। আর সন্তান প্রসব করা জরায়ু মুক্ত হওয়ার নিশ্চিত দলীল; মাস গণনার ইদ্দত নিশ্চিতভাবে তা বুঝায় না। তাই যেটা নিশ্চিত সেটাই ধর্তব্য হবে। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভ প্রকাশ পেলে সেটার দ্বারা ইদ্দত পালন করা হবে না; বরং চার মাস দশদিনের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করতে হবে।

কারণ ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে"।[১২২]

যুক্তি হলো, মৃত্যুর সময় যখন গর্ভ ছিল না তখন মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে গেছে। তা নতুন গর্ভের দ্বারা পরিবর্তন হবে না। আর মৃত্যুর সময় যখন গর্ভ বিদ্যমান ছিল তখন তো গর্ভের মাধ্যমেই ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয়েছে। তাই সন্তান প্রসবের দ্বারা ইদ্দত পালন করতে হবে। তবে কোনো অবস্থায়ই সন্তানের বংশ এ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের থেকে প্রমাণিত হবে না। কারণ সাধারণত বীর্য ছাড়া সন্তান লাভ হয় না। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের বীর্যই সৃষ্টি হয়নি। সন্তান আসবে কোত্থেকে![১২৩]

---

১২০. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৬৫; শারহুল মিনহাজ বিহাশিয়াতিল কালয়ূবী ও উমায়রা, খ. ৪, পৃ. ৩৯।

১২১. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ৪।

১২২. সূরা, আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪।

১২৩. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯৭; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১১৯।

www.amarboi.org

**লিঙ্গকর্তিত, নপুংসক ও লিঙ্গহীন ব্যক্তির স্ত্রীর ইদ্দত**

মালেকী মাযহাবের অভিমত হলো, লিঙ্গকর্তিত ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর তালাকের ইদ্দত পালন করা আবশ্যক নয়, যেমনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হয় না। মিলনের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে ইদ্দত পালন আবশ্যক না হওয়ার ন্যায়। কেউ কেউ বলেন, লিঙ্গকর্তিত ব্যক্তি যদি মিলনে সক্ষম হয় এবং তার বীর্যপাত হয় তাহলে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। প্রথম অভিমতটি খলীলের এবং দ্বিতীয়টি ইয়াযের। গর্ভাবস্থায় যদি লিঙ্গকর্তিত ব্যক্তির স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয় অথবা স্বামী মারা যায় তাহলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা অবশ্যক নয়। তাই স্বামীর মৃত্যু হোক আর স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হোক। বরং তালাকপ্রাপ্তা হলে মহিলা তিনটি কুরূ'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। এরূপ ক্ষেত্রে মহিলার নেফাসকে একটি হায়েয গণ্য করা হবে। আর স্বামীর মৃত্যু হলে সন্তান প্রসব অথবা চারমাস দশ দিনের দু'টি মেয়াদের মধ্যে অধিকতর দীর্ঘটি তার ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে।[১২৪]

মালেকী মাযহাবের কারো কারো মতে স্বামী যদি লিঙ্গকর্তিত বা অণ্ডকোষকর্তিত হয় তাহলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হবে না। আর যদি অণ্ডকোষ কর্তিত হয় আর লিঙ্গ অক্ষয় থাকে তাহলে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। কারণ লিঙ্গের মাধ্যমে মিলিত হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি লিঙ্গকর্তিত হয় আর অণ্ডকোষ অক্ষয় থাকে তাহলে দেখতে হবে এ ধরনের মানুষ সন্তান জন্মদানে সক্ষম কি-না? যদি সন্তান জন্মদানে সক্ষম হয় তাহলে ইদ্দত পালন করতে হবে, অন্যথায় নয়। কেউ কেউ বলেন, লিঙ্গ বা অণ্ডকোষ কর্তিত হলে ডাক্তার বা অভিজ্ঞ মহিলার মতামত নিয়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে হবে।[১২৫]

লিঙ্গ বা অণ্ডকোষহীন ব্যক্তির হুকুম হলো এমন শিশুর ন্যায়, যার সন্তান জন্মদানের কোনো ক্ষমতা নেই। নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী এ ধরনের ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর তালাক বা বিবাহ ভঙ্গের কারণে কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না। স্বামীর মৃত্যু জনিত ইদ্দত পালন করা অবশ্য তার ওপর ওয়াজিব। কারণ এ ধরনের ইদ্দত এক হিসেবে ইবাদত। লিঙ্গকতির্ত স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর গর্ভ প্রকাশ পেলে তার বংশ সাব্যস্ত হবে না। সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তার ইদ্দতও পূর্ণ হবে না। কারণ যে গর্ভের মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ হয় শুধু তাকেই পিতার দিকে সম্পৃক্ত করা যায়। এ ধরনের মহিলা দুই মেয়াদের মধ্য হতে অধিকতর দীর্ঘটি দ্বারা ইদ্দত পালন করবে : তা হলো প্রসব অথবা চার মাস দশ দিন।[১২৬]

---

১২৪. আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯১; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৬৮-৪৭৩।
১২৫. আদ-দাসূকী, খ. ২,পৃ. ৭৩২; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ২৮৫-৩৮৬।
১২৬. শারহু মিনাহিল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৭২।

www.amarboi.org

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ বলেন, লিঙ্গকর্তিত না হলে নপুংসক স্বামীর মিলনের ফলে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয়। যদিও সে অণ্ডকোষহীন হয়। তবে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে স্বামী একদম লিঙ্গহীন না হলে সন্তান হওয়ার সম্ভবনা থাকায় পিতার সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে। স্বামী তার সন্তান হওয়ার কথা অস্বীকার করলেও প্রসবের মাধ্যমে স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে। আর লিঙ্গহীন স্বামী হলে তার সন্তান সাব্যস্ত হবে না। তালাকদানের কারণে স্ত্রীর ওপর ইদ্দতও ওয়াজিব হবে না।[১২৭]

হাম্বলীগণ মনে করেন, লিঙ্গকর্তিত পুরুষত্বহীন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিলে অথবা মারা গেলে অতঃপর মহিলা সন্তান জন্ম দিলে পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক করা যাবে না। আর ইদ্দতও প্রসবের মাধ্যমে পূর্ণ হবে না। প্রসবান্তে মহিলা তালাকের ক্ষেত্রে তিনটি কুরূ'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে এবং ওফাতের ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন গণনা করে ইদ্দত পালন করবে। কাজী ইয়ায বলেন, ইমাম আহমদের কথা দ্বারা বুঝা যায়, এক্ষেত্রে সন্তান পিতার বলে বিবেচিত হবে। কারণ কোনো কোনো অবস্থায় তার বীর্যপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এ প্রসবের দ্বারা তার ইদ্দতও শেষ হবে। তবে অভিজ্ঞতার কথা হলো, এমন পিতার প্রতি সন্তানের সম্পর্ক করা যাবে না। যেমন দশ বছরের কম শিশুর সন্তান জন্মদান কল্পনা করা যায় না।[১২৮]

হানাফীগণ বলেন, ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গকর্তিত ও অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তির (খাসী) স্ত্রীর হুকুম হলো পুরুষত্বহীনের স্ত্রীর মত।[১২৯] ইমাম সারাখসী বলেন, অণ্ডকোষকর্তিত ব্যক্তির স্ত্রীর হুকুম হলো, স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটলে সক্ষম পুরুষের স্ত্রীর মতো ইদ্দত পালন করবে। অনুরূপভাবে লিঙ্গকর্তিত পুরুষের বীর্যপাত ঘটলে সক্ষম পুরুষের স্ত্রীর মতো ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব।[১৩০]

## নিখোঁজ ও তার মতো ব্যক্তির স্ত্রীর ইদ্দত

নিখোঁজ বলতে এমন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে বুঝায়, যার খবরাখবর পাওয়া যায় না। তবে তার সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষ যখন তার স্ত্রী থেকে গায়েব হয়ে যায় তখন এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণে দু'টি পদ্ধতি :

**এক.** স্বামী গায়েব হয়েছে ঠিকই; কিন্তু এমন পর্যায়ের নয় যে, তার খবরাখবরই পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য অন্যত্র বিয়ে করা সকল আলেমের

---

১২৭. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪; রাওদাতুত-তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৬৫।
১২৮. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ১২০।
১২৯. ফাতহুল-কাদীর, খ. ৪, পৃ. ২৯৭; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৩৪০-৪২৬-৫৯৩।
১৩০. আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ৫৩।

www.amarboi.org

মতে জায়েয নয়। যদি স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে খোরপোষ দেয়া দুষ্কর হয় বা স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা হয় অথবা মহিলা এ কারণে কোনো অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা রয়েছে غَيْبَة (নিখোঁজ) শিরোনামে তা দেখা যেতে পারে।

**দুই.** যদি স্বামী এরূপ নিরুদ্দেশ হয় যে, তার খবরা খবরপাওয়া যায় না। কোথায় রয়েছে, তারও হদিস মিলে না এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় সম্পর্কে দু'ধরনের অভিমত রয়েছে :

**প্রথম অভিমত :** সাধারণভাবে যদি অনুমিত হয় যে, নিখোঁজ স্বামী এখনও বেঁচে আছে তাহলে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হবে না। কেবল স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে অথবা তালাকপ্রাপ্ত হলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে। স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার পর যদি এতদিন অতিক্রান্ত হয় যে, এর চেয়ে বেশি দিন মানুষ জীবিত থাকে না। তাতেও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এতে বিচারকের অঘোষিত কর্তৃত্ব রয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হলে মহিলা ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর অন্য স্বামী গ্রহণের জন্য সে হালাল বলে বিবেচিত হবে। ইবনে শুবরুমা, ইবনে আবী লায়লা, সাওরী, ইমাম আবু হানীফা র. এ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী র.-এর সর্বশেষ অভিমত ও তাই। হাম্বলীগণেরও এটি একটি অভিমত।[১৩১] এর পক্ষে দলীল হলো, ইমাম শাফেয়ী র. কর্তৃক বর্ণিত হযরত আলী রা.-এর নিম্নোক্ত মাওকূফ রেওয়ায়াত। তিনি বলেন, امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ ، فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ "নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী বিপদগ্রস্ত মহিলা। তাই নিশ্চিতভাবে তার মৃত্যুর সংবাদ আসা পর্যন্ত সে যেন ধৈর্যধারণ করে।"

আরো দলীল মুগীরা ইবনে শুবা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

"নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী তারই স্ত্রী। স্ত্রীর নিকট তথ্য আসার পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে"।[১৩২] কারণ তার আকদ নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নিশ্চিত সংবাদ ছাড়া তা ভঙ্গ হবে না।

---

১৩১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৩১৩, আল-আমীরিয়্যা বুলাক ১৩১৫ হিঃ; ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৩২; যায়লাঈ, খ. ৩, পৃ. ৩১২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪০০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৩০; কাশশাফুল কিনা, খ. ২, পৃ. ৫৯০।

১৩২. আদ-দারাকুতনী, খ. ৩, পৃ. ৩১২; যায়লাঈ হাদীসটিকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। নাসবুর-রায়া, খ. ৩, পৃ. ৪৭৩।

www.amarboi.org

ইমাম আবু হানীফা র. হতে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, নিখোঁজ ব্যক্তির বয়স যখন জন্ম হতে একশ' বিশ বছরে উপনীত হবে তখন তাকে মৃত বলে ফয়সালা করা হবে। ইমাম আবু ইউফের অভিমত হলো, এজন্য একশ' বছর ধার্য করা হবে। কেউ কেউ বলেছেন নব্বই বছর।

কেউ কেউ মনে করেন, এ ব্যক্তির সমবয়সীগণের মাঝের সর্বশেষ ব্যক্তির ইনতিকালে তার মৃত্যুর হুকুম আরোপ করা হবে। অনেকে মনে করেন, কাজির বিবেচনাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। স্বামীর মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মহিলা মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর সে অন্যের সাথে বিবাহের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে।[১৩৩]

আহমদ ইবনে আসরাম র. ইমাম আহমদের একটি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নিখোঁজ ব্যক্তির জন্মের দিন হতে নব্বই বছর অতিক্রান্ত হলে তার সম্পদ ভাগ করে দেয়া হবে। এ অভিমতের সারকথা হলো, তার স্ত্রী ওফাতের ইদ্দত পালন করবে অতঃপর অন্যকে বিবাহ করতে পারবে।[১৩৪]

**দ্বিতীয় অভিমত :** নিখোঁজ যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, বাহ্যত মনে করা হয় তার মৃত্যু হয়ে গেছে, তাহলে স্বামীর মাল হতে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকলে চার বছর পর্যন্ত স্ত্রী অপেক্ষা করবে। অতঃপর ওফাতের ইদ্দত পালন করার পর অন্য পুরুষের সাথে তার বিয়ে হালাল বলে গণ্য হবে।[১৩৫]

এটি হযরত উমর রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের অভিমত। ইমাম মালিক, শাফেয়ী র.-এর প্রাচীন অভিমতও তাই। হাম্বলীগণেরও একটি রেওয়ায়াত রয়েছে এরই সমর্থনে। তাঁদের দলীল হলো, হযরত উমর রা.-এর নিম্নোক্ত উক্তি تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন করবে।"[১৩৬]

উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনুয যুবায়ের রা. প্রমুখ সাহাবী এ অভিমত পোষণ করেন। আতা, উমর ইবনে আবদিল আযীয, হাসান, যুহরী, কাতাদাহ, লায়ছ, আলী ইবনুল মাদীনী, আবদুল আযীয ইবনে আবী সালামা প্রমুখ তাবেয়ী এ অভিমত পোষণ করেন।[১৩৭]

---

১৩৩. ফাতহুল কাদীর, আমীরিয়্যা প্রকাশনা, খ. ৩, পৃ. ৩১৩; যায়লাঈ, নাসবুররায়া, খ. ৩, পৃ. ৩১২।

১৩৪. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ৩১৩।

১৩৫. হাশিয়া দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৯; শারহু মিনাহিল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৮৫; শারহুয-যারকানী, খ. ৪, পৃ. ২০২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭; রাওদাতুত্‌তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪০০; কাশশাফুল কিনা, খ. ২, পৃ. ৫৯০।

১৩৬. সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ২০৭।

১৩৭. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৩২।

www.amarboi.org

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন, যুদ্ধের ময়দানে নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য অনূর্ধ্ব একবছর অপেক্ষা করবে। কারণ এ অবস্থায় নিহত হওয়ার আশঙ্কা অধিকতর প্রবল থাকে। মালেকীগণ বলেন, স্ত্রী যখন স্বামীর খবরাখবর পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় তখন থেকে চার বছর পর তার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হবে। কেউ কেউ বলেন, কাজীর আদলতে বা শাসকের দরবারে বা মুসলিম সমাজে বিষয়টি উত্থাপনের পর থেকে চার বছর।[১৩৮] অতঃপর মহিলা ওফাতের ইদ্দত পালন করবে।

হাম্বলীগণের অভিমত এ ব্যাপারে দু'ধরনের :

**এক.** মেয়াদের সূচনা ধর্তব্য হবে কাজি বা শাসক কর্তৃক নির্ধারিত করে দেয়ার পর। বিষয়টি বিতর্কিত হওয়ায় কাজির রায়ের প্রতি মুক্ষপেক্ষী হতে হয়।

**দুই.** মেয়াদ গণনা শুরু হবে যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার পর থেকে। কারণ এটিই প্রমাণ করে তার মৃত্যু হয়েছে।[১৩৯]

**কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রীর ইদ্দত**

কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রী নিশ্চিতভাবে তার স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত হলেই কেবল অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে, অন্যথায় নয়। ফুকাহায়ে কেরাম এঅভিমত পোষণ করেছেন। নাখয়ী, যুহরী, ইয়াহইয়া আল-আনসারী ও মাকহূল প্রমুখেরও এ অভিমত।[১৪০]

**মুরতাদের স্ত্রীর ইদ্দত :**

মিলন বা এজাতীয় কিছুর পর মুরতাদের স্ত্রীর সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটলে ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত হলো, স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। ইদ্দতের ভিতরে যদি সে ইসলামে ফিরে আসে তাহলে বিবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকবে। অন্যথায় তাদের মাঝে বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। ফলে মাস হোক আর কুরূ কিংবা সন্তান প্রসব এগুলোর মাধ্যমে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

স্ত্রীর ইদ্দত পালন অবস্থায় মুরতাদ স্বামী যদি মারা যায় কিংবা শাস্তিস্বরূপ তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় তাহলে তার ইদ্দত পালনের ধরন নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন। ইখতিলাফটি দু'টি অভিমতের ভিত্তিতে, তাহলো :

**১ম অভিমত :** তালাকের ইদ্দত ছাড়া অন্য কোনো ইদ্দত তার ওপর ওয়াজিব হবে না। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক তো মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমে বাতিল হয়েছে। আর

---

১৩৮. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৯; শারহু মিনাহিল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৮৫; যারকানী, খ. ৪, পৃ. ২১২।

১৩৯. রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮,পৃ. ৪০১; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৩৫।

১৪০. আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়্যাহ, খ. ২, পৃ. ২৯৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ২৮; আল- মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৩০।

www.amarboi.org

ওফাতের ইদ্দত তো কেবল স্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়। মালেকী, শাফেয়ী এবং হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ র. এ অভিমত পোষণ করেন।

**২য় অভিমত :** স্ত্রীর ইদ্দতপালনের মাঝে যদি মুরতাদ স্বামী মারা যায় বা তার মৃত্যুদণ্ড হয় তাহলে তার ওপর ওফাতের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় তাকে স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিসও গণ্য করা হবে। সম্পত্তি পাওয়ার ভয়ে তালাক দানকারী স্বামীর তালাকদানের ওপর কিয়াস করে এ হুকুম দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ র. এ অভিমত পোষণ করেন। এ ইদ্দত পালন করার নিয়ম হলো, তা চার মাস দশদিনের মধ্যে পালন করবে যার মাঝে তিনটি ঋতু স্রাব থাকতে হবে। চার মাস দশদিনের মাঝে যদি তিনটি স্রাব পাওয়া না যায় তাহলে স্রাব পাওয়া পর্যন্ত তা প্রলম্বিত হবে। যেকোন ইদ্দত পালনকারিণী যদি স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিস হয় তাহলে তার ওপর ওফাতের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয়। ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে বিবাহকে অটুট রাখা হলে ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে তা আরো প্রবলতর হবে। কারণ ইদ্দতের ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর।

## আহলে কিতাব ও জিম্মী মহিলার ইদ্দত

স্বামী যদি মুসলিম হয় তাহলে আহলে কিতাব ও জিম্মী মহিলার ওপর মুসলিম মহিলার মত ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। তাই তা তালাকের হোক আর বিবাহ ভঙ্গের কিংবা ওফাতের হোক। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, সাওরী ও আবু উবায়দ এ অভিমত পোষণ করেছেন। কারণ ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত দলীলসমূহে এ ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা নেই। ইদ্দত মূলত ওয়াজিব হয় আল্লাহর হক ও স্বামীর হক রক্ষার্থে। ইরশাদ হচ্ছে :

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"তোমাদের জন্য তাদের ওপর পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে।"[১৪১]

এ আয়াতাংশে দেখানো হচ্ছে যে, ইদ্দত পালন করা স্বামীর হক। এদিকে আহলে কিতাব ও জিম্মী মহিলাগণ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনে বাধ্য। ফলে তাদের ওপরও ইদ্দত পালন ওয়াজিব। স্বামীর ও সন্তানের অধিকার রক্ষার্থে তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করা হবে। কারণ মানবাধিকার পালনে তারা উপযুক্ত।

জিম্মী মহিলা যদি জিম্মী পুরুষের অধীনে থাকে তাহলে তার ইদ্দত পালন করতে হবে কি-না সে ব্যাপারে ফকীহগণ দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেন :

---

১৪১. সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৪৯।

www.amarboi.org

**১ম অভিমত :** ইসলামী দেশে বসবাস করার অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো বিধর্মী জিম্মী যদি স্বধর্মীয় স্ত্রীকে তালাক দেয় বা স্ত্রীকে রেখে মারা যায় তাহলে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালনের কোনো বিধান নেই। এতে শর্ত হলো, তাদের নিজ ধর্মে ইদ্দত পালনের প্রথা না থাকা। ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও মালেকীগণ এ অভিমত পোষণ করেন। এর ফলে মহিলা কোনো ধরনের অপেক্ষা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ে করতে পারবে। কারণ ইদ্দত পালন করা হয় হক্কুল্লাহ ও স্বামীর অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্তে। স্বামী যখন এটিকে তার অধিকার মনে করে না তখন স্বামীর অধিকার হিসেবে তা (ইদ্দত) ওয়াজিব করার কোনো পন্থাই নেই। হক্কুল্লাহ হিসেবেও ইদ্দত ওয়াজিব করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ ইদ্দত পালনে পুণ্যের প্রশ্ন রয়েছে। জিম্মী মহিলাতো পুন্য লাভের উপযোগীই নয়। হ্যাঁ, জিম্মী স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তাকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা হতে নিবৃত্ত করা হবে। কারণ দ্বিতীয় স্বামীর মিলনে বংশ প্রমাণে সন্দেহের সৃষ্টি করবে। বংশ সংরক্ষণ করা সন্তানের অধিকার। আর সন্তানের এ অধিকার খর্ব করা সমীচীন নয়। বিচারকের কর্তব্য হলো, প্রসবের পূর্বে মহিলাকে দ্বিতীয় বিয়ে হতে বারণ করে সন্তানের অধিকার নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে মালেকীগণের একটি ব্যতিক্রম ধর্মী মত রয়েছে। তারা বলেন, আযাদ জিম্মী মহিলাকে তার জিম্মী স্বামী যদি তালাক দেয় অথবা তার স্বামী মারা যায় আর এ মহিলাকে কোনো মুসলিম বিয়ে করতে ইচ্ছা পোষণ করে, মহিলাটি যদি এমন হয় যে, তার সাথে পূর্বের স্বামী মিলিত হয়েছে অথচ তার গর্ভ সঞ্চার হয়নি তাহলে মহিলাটি তিন কুরূ'র মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। আর যদি পূর্বের স্বামী তার সাথে মিলিত না হয় তাহলে কোনো ইদ্দত ছাড়াই সে বিয়ের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। [১৪২]

**২য় অভিমত :** যিম্মী মহিলার ওপর ইদ্দত ওয়াজিব। তার স্বামী জিম্মী হলেও তাতে কোনো তফাৎ নেই। এটি হাম্বলী, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের অভিমত। কারণ যিম্মীতো বলা হয় দারুল ইসলামে বসবাসকারী ভিন্নধর্মী মানুষকে। সুতরাং মুসলিমগণের ওপর যে সকল হুকুম আরোপ হয় তার ওপরও তা প্রযোজ্য হবে। কারণ ইদ্দত সম্পর্কিত আয়াতে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা নেই। মিলনের পর বিচ্ছেদ ঘটায় সে মুসলিম মহিলার হুকুমের আওতায় এসে যায়। ফলে মুসলিম মহিলার মত তার ওপর ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। আরো এ কারণে যে, মহিলাটি ওফাতের ইদ্দত পালন করার ক্ষেত্রে সে মুসলিম মহিলার মতো হয়ে যায়।[১৪৩]

---

১৪২. আল-কাসানী, আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩, আল হালাবী, সম্পা., খ. ৩, পৃ. ২৮৯; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৪; শারহু মিনাহিল জালীল আলা মুখতাসারি খালীল, খ. ২, পৃ. ৩৮১; হাশিয়া দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৮৮।

১৪৩. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ৭৬।

www.amarboi.org

## খুলাকারিণীর ইদ্দত

তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত আর খুলাকারিণীর ইদ্দত একই। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ এ ব্যাপারে অভিন্নমত পোষণ করেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, সালিম ইবনে আবদিল্লাহ, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, উমর ইবনে আবদিল আযীয, হাসান, শাবী, নাখয়ী ও যুহরী প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। তারা দলীল উপস্থাপন করেন আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১৪৪]

এর পিছনে যুক্তি হলো, খুলা স্বামী স্ত্রীর মাঝে জীবিত অবস্থায় বিচ্ছেদ, তাও আবার মিলনের পর। ফলে তালাকপ্রাপ্তার মতো তার ইদ্দত হবে তিনটি কুরূ। ইমাম আহমদের একটি অভিমত হলো, খুলাকারিণীর ইদ্দত একটিমাত্র হায়েয। এটি উসমান ইবনে আফফান, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস রা., আবান ইবনে উসমান, ইসহাক ও ইবনুল মুনযির প্রমুখের অভিমত। তারা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি :

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

"সাবিত ইবনে কায়েস রা.-এর স্ত্রী তার স্বামীর সাথে খুলা করলে রাসূলুল্লাহ্ সা. তার ইদ্দত একটিমাত্র হায়েয নির্ধারণ করেন।"[১৪৫]

এছাড়া উসমান রা.ও এর অনুকূলে রায় প্রদান করেছিলেন।[১৪৬]

(বিস্তারিত خلع খুলা শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

## লিআনকারিণী মহিলার ইদ্দত

লিআনকারী মহিলার ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তার ন্যায়। এটি জমহুর ফুকাহার অভিমত। কারণ এটি জীবিত অবস্থায় ঘটে যাওয়া বিচ্ছেদ। ফলে তা তালাকের সদৃশ। ইবনে আব্বাস রা. এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন, তার মতে লিআনকারিণী মহিলার ইদ্দত নয় মাস।[১৪৭]

---

১৪৪. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২২৮।

১৪৫. ইমাম আবূ-দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৬৬৯; ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, আল হালাবী সম্পা., খ. ৩, পৃ. ৪৮২।

১৪৬. তাফসীরুল কুরতুবী, বৈরুত, তা,বি, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; ফাতহুল কাদীর, আল-আমীরিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৬৯; হাশিয়া দাসূকী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৪৬৮; রাওদাতুত তালিবীন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, খ. ৮, পৃ. ৩৬৫; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাআশ শারহিল-কাবীর, খ. ৯, পৃ. ৭৮।

১৪৭. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ৭৮।

www.amarboi.org

**যিনাকারিণী মহিলার ইদ্দত**

যিনাকারিণীর ইদ্দত সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত তিন ধরনের। তা নিম্নরূপ :

**এক.** হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের অভিমত হলো, যিনাকারিণীর কোনো ইদ্দত নেই। এটি সাওরীরও অভিমত। সে গর্ভবতী হোক আর না হোক। আবু বকর, উমর ও আলী রা. হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "বিছানা যার সন্তান তার এবং যিনাকারীর জন্য রয়েছে প্রস্তরাঘাত।"[১৪৮]

এর পিছনে যুক্তিও রয়েছে। তাহলো, ইদ্দত প্রবর্তিত হয়েছে বংশ পরম্পরা সংরক্ষণ করার নিমিত্তে। কিন্তু যিনার সাথে বংশ সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে তার কারণে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। কেউ যদি যিনার দ্বারা গর্ভবতী কোনো মহিলাকে বিয়ে করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদের মতে বিবাহ বৈধ হয়েছে। তবে সন্তান প্রসবের পূর্বে তার সাথে সংগত হওয়া বৈধ হবে না। যাতে অন্যের ক্ষেতে আপন পানি সিঞ্চন করা না হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : لاَ يَحِل لاِمْرِئ يُؤْمِنُ بِاللّٰه وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِه
"আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জন্য আপন পানি অন্যের ক্ষেত্রে সিঞ্চন করা বৈধ নয়।"[১৪৯]

রাসূলুল্লাহ সা. হতে আরও বর্ণিত : لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ
"সন্তান প্রসবের পূর্বে গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম হওয়া যাবে না।"[১৫০]

শাফেয়ী মাযহাবের একদল অনুসারী বলেন, যিনার ফলে গর্ভধারী মহিলার সাথে বিয়ে ও সঙ্গম উভয়ই বৈধ। কারণ এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

**দুই.** যিনাকৃত মহিলা তালাকপ্রাপ্তার মতো ইদ্দত পালন করবে। এটি মালেকী ও হাম্বলীগণের নির্ভরযোগ্য অভিমত। ইমাম হাসান ও নাখয়ীর অভিমতও অনুরূপ। কারণ মিলনের ফলে জরায়ুসন্তান ধারনের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। তাই ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। মহিলাটি আযাদ হওয়ার ফলে পূর্ণ একটি ইদ্দতের মাধ্যমে তার সন্তানমুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া ওয়াজিব। সংশয়মূলক ভাবে

---

১৪৮. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ২৯২; ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, খ. ২, প, ১০৮০; বর্ণনাকারিণী হযরত আয়েশা রা.।

১৪৯. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৬১৫; ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪৩৭; রুওয়ায়ফা' ইবনে সাবিত রা. হতে বর্ণিত এ হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

১৫০. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৬১৪।

www.amarboi.org

কোনো মহিলার সাথে মিলিত হয়ে গেলে যেভাবে তার ওপর ইদ্দত ওয়াজিব এক্ষেত্রেও তা বিবেচ্য। আর যুক্তি হলো, এ ধরনের মহিলা ইদ্দত পালন ছাড়া যদি কারও সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তার সন্তান সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হবে যে, এটি জারজ সন্তান, না স্বামীর সন্তান। ফলে বংশ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবেনা। দাসূকী বলেন, মহিলা যিনা করলে বা অপহৃত হলে তার ওপর তিনটি হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। যাতে মিলনের ফলে সন্তান সম্ভবানা হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে শর্ত হলো, সে আযাদ মহিলা হতে হবে।

যিনা বা অপহরণের ফলে যদি মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে সন্তান প্রসবের পূর্বে তার সাথে মিলিত হওয়া স্বামীর জন্য হারাম হবে । এটি সর্বসম্মত অভিমত। যিনাকারিণী যদি অবিবাহিতা হয় তাহলে ইসতিবরা'র মেয়াদে সন্তানসম্ভবা কি-না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার সময় আকদ করা বৈধ হবে না। যদি এ মহিলা কারও সাথে আকদ করে ফেলে তাহলে তার ওপর ওয়াজিব তা ভঙ্গ করে ফেলা।

**তিন.** যিনাকারিণী একটিমাত্র হায়েয দ্বারা তার সন্তান সম্ভবা হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। এটি মালিকীগণের একটি মত। হাম্বলীগণ হতেও এরূপ একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তাদের দলীল হলো :

لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .

"অন্যের দ্বারা গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম হওয়া যাবে না সন্তান প্রসব হওয়ার পূর্বে। গর্ভহীনের সাথেও নয় একটি হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে।"[১৫১]

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শিরোনাম ইস্তিবরা (اِسْتِبْرَاء)

## ফাসিদ পন্থায় বিবাহিতা মহিলার ইদ্দত

যে বিবাহ ফাসিদ কি-না সে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে সে ধরনের বিয়ের ফলে যদি মহিলার সাথে মিলিত হয় অতঃপর বিচারকের রায়ে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে মহিলার ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব বলে উলামায়ে কেরাম মনে করেন। যেমন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ অথবা অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে বিবাহ। সর্বসম্মত ফাসিদ বলে বিবেচিত বিয়ের পর যদি মহিলার সাথে মিলিত হয় তাতেও ইদ্দত ওয়াজিব হবে। যেমন : ইদ্দত পালনরতার সাথে বিবাহ,

---

১৫১. হাদীসটির সূত্র প্রাগুক্ত, ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত দেখা যেতে পারে কাসানীকৃত বাদায়ে' গ্রন্থ, খ. ৩, পৃ. ১৯২; হাশিয়াহ দাসূকী, আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৪৭১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৭৫; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ২০৭; শারহু মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৭৫; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী আশ শারহ, খ. ৯, পৃ. ৭৯।

www.amarboi.org

অন্যের স্ত্রীর সাথে বিবাহ এবং মাহরামের সাথে বিবাহ, তাতে এক ধরনের সন্দেহ থাকায় যখন যিনার শাস্তি রহিত হয়। যেমন : এমন ধরনের মহিলার সাথে যে বিবাহ হারাম তা সে জানে না। বিবাহ হারাম একথা জানার পরও যদি মিলিত হয় তাতেও মালেকী, হাম্বলী ও কিছু সংখ্যক হানাফীগণের মতে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। তবে এক্ষেত্রে ইদ্দতের স্থলে ইসতিবরা শব্দের প্রয়োগ হয়। এর কারণ হলো ইদ্দতের মূলে রয়েছে গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। ইদ্দত কেবল বিয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। দেখুন না, ফাসিদ বিবাহের মাঝে তো কোনো অধিকার নেই তা যেকোন ধরনেরই হোক না কেন। শাফেয়ী ও কিছু সংখ্যক হানাফীদের মতে বিবাহ করা হারাম একথা জানার পরও যদি বিবাহ করে তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। কারণ এতে যিনার শাস্তি রহিত করার কিছুই নেই। এমনকি এর দ্বারা বংশও প্রমাণিত হবে না।[১৫২]

সর্বসম্মতভাবে যে বিয়ে ফাসিদ বলে বিবেচিত হয় তাতে ওফাতের ইদ্দত পালনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সকল ফুকাহায়ে কেরাম এ অভিমত পোষণ করেন। তবে যে বিয়ে ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে তাতে ওফাতের ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া এবং ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের দু'টি অভিমত রয়েছে :

**১ম অভিমত :** হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ মনে করেন, বিতর্কিত বিবাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ওফাতের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়। যেমনটি সর্বসম্মতভাবে ফাসিদ বলে বিবেচিত বিবাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়। তাদের দলীল হলো, ওফাতের ইদ্দত ওয়াজিব হয় বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রে। কারণ এটি আল্লাহ তাআলা স্ত্রীগণের ওপর ওয়াজিব করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১৫৩]

আয়াতে স্ত্রীদের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। বৈধ বিবাহ ছাড়া তো প্রকৃত স্ত্রীই হতে পারে না। আরো যুক্তি হলো, বিয়ের মতো বিরাট নিয়ামত হাতছাড়া হওয়ায়

---

১৫২. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩০৭-৩২০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৬; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ২১৯; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৭৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১১৯।

১৫৩. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪।

www.amarboi.org

শোক প্রকাশার্থে ইদ্দত পালন করা হয়। এটি নিয়ামত তখনই বিবেচিত হয় যখন তা বৈধ হয়। আর অবৈধ কিছুতো আল্লাহর দান হিসেবে গণ্য হয় না।[১৫৪]

**২য় অভিমত :** মালেকীগণ মনে করেন, বৈধ ও অবৈধ হওয়া নিয়ে যে বিয়ের ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে তাতে ওফাতের ইদ্দত ওয়াজিব হবে। এটি হাম্বলীগণের এক অভিমত। কারণ এর ফলে বংশ সাব্যস্ত হয়। ফলে ইদ্দতও ওয়াজিব হবে।[১৫৫]

## সংশয়বশত সঙ্গত হওয়া মহিলার ইদ্দত

রাতে কোনো পুরুষের বিছানায় শায়িতাকে আপন স্ত্রী মনে করে তার সাথে মিলিত হলে তাকে সংশয়বশত সঙ্গম হওয়ার আওতাভুক্ত গণ্য করা হয়। পুরুষটি যখন দাবি করে সাদৃশ্যের ফলে সে ঐ মহিলার সাথে মিলিত হয়েছে তখন এমন মহিলার জন্য তালাকপ্রাপ্তার মতো ইদ্দত পালন করতে হয়। এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ এর দ্বারা মহিলার সন্তানসম্ভবা না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এমনিভাবে বৈধ বিবাহের ফলে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়ার দ্বারা যেভাবে বংশ সাব্যস্ত হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়। এর পিছনে আরও যুক্তি হলো, সাদৃশ্য সাবধানতার ক্ষেত্রে মূল জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হয়। ইদ্দত ওয়াজিব করাও সাবধানতার পর্যায়ভুক্ত।

যে স্ত্রীর সাথে সংশয়মূলকভাবে মিলন সংঘটিত হয়েছে তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার সাথে মিলিত হওয়া স্বামীর জন্য জায়েয নয়। এতে বীর্যের সংমিশ্রণ ও বংশের ব্যাপারে সংশয়মুক্ত থাকা যাবে। যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য স্থান দিয়ে স্ত্রীর সাথে অভিসার করা যাবে। যেমনটি ঋতুমতী মহিলার সাথে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য স্থান দিয়ে ভোগ করা যায়।[১৫৬]

## অনির্দিষ্ট কিংবা অস্পষ্ট তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত

স্বামী যখন তার দুই বা ততোধিক স্ত্রীর মধ্যে অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্টভাবে একজনকে তালাক প্রদান করে তখন তার ইদ্দত সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে যা নিম্নরূপ :

---

১৫৪. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩২০; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৯৯; আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ১৪৫।

১৫৫. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৭; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ১৪৫।

১৫৬. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৯২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩২০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৬; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭১; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৭৫; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৬৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৬; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ৭৯।



www.amarboi.org

তালাক শব্দকে যখন অজ্ঞাত স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তখন তালাক হয় অস্পষ্ট তালাক (طَلَاقٌ مُّبْهَمٌ)। তা আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে ঃ

**এক.** তালাক শব্দটি শুরুতেই অজ্ঞাতের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়।

**দুই.** নির্দিষ্টভাবে কোনো এক স্ত্রীকে তালাকদানের পর কাকে তালাক দিয়েছে সে কথা ভুলে গিয়েছে। অস্পষ্ট তালাকের মধ্যে স্ত্রীর ইদ্দত হবে অন্যান্য তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মতো। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১৫৭]

তবে ইদ্দতের সূচনা কখন থেকে হবে, এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ র. বলেন, বিষয়টি খোলাসা করার পর থেকে ইদ্দত পালন করবে, তালাকের সময় হতে নয়। কারণ বিষয়টি খোলাসা করার পূর্বেতো তালাক পতিত হয় না; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, তালাকদানের সময় হতে মহিলা ইদ্দত পালন করবে যেমনটি অন্যান্য তালাকপ্রাপ্তাগণ পালন করে থাকে। কারণ তালাক তো অনির্ধারিতভাবে হলেও হয়ে গিয়েছে।[১৫৮]

দুই স্ত্রীর মধ্য হতে কাকে তালাক দিয়েছে, সে কথা খোলাসা করার পূর্বে যদি স্বামী মারা যায় তাহলে দু'জনের ওপরই ওফাতের ও তালাকের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কারণ এদের একজন তো বিবাহিতা এবং অপরজন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। বিবাহিতার ওপর ওফাতের ইদ্দত আর তালাকপ্রাপ্তার ওপর তালাকের ইদ্দত আরোপিত হয়; কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা নির্ধারিত না হওয়ায় কার ওপর কোনোটি আরোপিত হবে সেটি পরিষ্কার নয়। সুতরাং উভয়ের ওপর দু'ধরনের ইদ্দত ওয়াজিব হওয়াই হলো সাবধানতার বিষয়। কারণ ইদ্দতের বিষয়টি সতর্কতার ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়ে থাকে।[১৫৯]

দুই স্ত্রীর কোনো একজনকে নির্দিষ্টভাবে বা অনির্দিষ্টভাবে যদি তালাক প্রদান করা হয়। যেমন বলল, তোমাদের দু'জনের একজন তালাক। এর দ্বারা কাউকে নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করল অথবা নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করল না। আবার কাকে নির্দিষ্ট করেছে তা ব্যক্ত করার পূর্বেই স্বামী মারা গেল। স্বামী যদি মৃত্যুর পূর্বে এদের কারো সাথে সংগত না হয় তাহলে উভয়েই স্বামীর ওফাতের ইদ্দত পালন

---

১৫৭. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২২৮।

১৫৮. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২২৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ১৫৯।

১৫৯. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২২৮।

www.amarboi.org

করবে। তা হলো চারমাস দশদিন। এ হুকুম সতর্কতার ভিত্তিতে। কারণ উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে তালাক বা ওফাতের ফলে বিচ্ছেদ ঘটার। এটি শাফেয়ী মাযহাবের অভিমত। অনুরূপ হুকুম হলো, স্বামী যদি উভয় স্ত্রীর সাথে সংগত হয় আর উভয় স্ত্রীই মাস গণনার দ্বারা ইদ্দত পালনের উপযোগী হয় আর তালাক হয় বায়েন বা রাজয়ী। অথবা উভয় স্ত্রী যদি ঋতুমতী হয় আর আরোপিত তালাক হয় রাজয়ী তাতেও উভয় স্ত্রী ওফাতের ইদ্দত পালন করবে। আরোপিত তালাক যদি বায়েন তালাক হয় আর স্ত্রীগণ হয় ঋতুমতী, তাহলে উভয়েই ওফাত এবং তিন কুরূ' বিশিষ্ট ইদ্দত হতে তুলনামূলক দীর্ঘতর ইদ্দতটি পালন করবে। কারণ উভয়ের ওপরই ইদ্দত ওয়াজিব। তবে তাদের ওপর কোন্‌টি আরোপিত হবে তা নিয়ে তারা সন্দিগ্ধ। ফলে তাদের ওপর এমনভাবে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব যাতে সন্দেহের অপনোদন হয় এবং নিশ্চিত তালাকও হয়। ওফাতের ইদ্দত হিসাব করা হবে মউতের পর হতে আর কুরূ'র হিসেব হবে তালাকের পর হতে।

দুই স্ত্রীর অবস্থা যদি ভিন্ন প্রকৃতির হয়। যেমন যদি একজন এমন হয় যে, স্বামী তার সাথে সংগত হয়েছে বা সে গর্ভবতী এবং অপরজন হয় এর বিপরীত তাহলে উভয়ের ওপর সাবধানতার ভিত্তিতে হুকুম আরোপ করা হবে।[১৬০]

হাম্বলীগণ বলেন, স্ত্রীদের মধ্য হতে যদি অনির্দিষ্টভাবে কোনো একজনকে তালাক দেয়া হয়। তাহলে লটারীর মাধ্যমে তাকে চিহ্নিত করতে হবে। ইদ্দতও কেবল তার ওপরই ওয়াজিব হবে, অন্যদের ওপর নয়। ইদ্দতের সূচনা ধরতে হবে তালাকের সময় হতে, লটারির পর হতে নয়।

স্বামী যদি নির্দিষ্ট এক স্ত্রীকে তালাক দেয় অতঃপর সে কাকে তালাক দিয়েছে সেকথা ভুলে যায় তাহলে সহীহ মতে সকল স্ত্রী তার ওপর হারাম হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে সকল স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব এবং তা হবে ওফাত ও তালাকের ইদ্দতের মধ্যে হতে তুলনামূলক দীর্ঘতর ইদ্দতটি। এ বিধান আরোপ হবে যদি তালাকটি বায়েন হয়ে থাকে। যদি তালাক রাজয়ী হয় তাহলে স্ত্রীর ওপর মৃত্যুর পর হতে ওফাতের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। আর যদি সে ঋতুমতী হয় তাহলে তালাকের সময় হতে ইদ্দত পালন করবে।

অতঃপর সকল স্ত্রীকে যদি তিন তালাক প্রদান করে তাহলে তাদের সকলের ওপর তালাকের সময় হতে তালাকের ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণের মতে স্বামী যদি অনির্দিষ্টভাবে এক স্ত্রীকে তালাক

---

১৬০. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৬; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৯৯।

www.amarboi.org

প্রদান করে তাহলে দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় সকলের ওপর তালাক কার্যকর হবে। এটি তাদের প্রসিদ্ধ অভিমত। যদি নির্দিষ্টভাবে একজনকে তালাকদানের নিয়ত করে, অতঃপর কাকে তালাক দিয়েছে সে কথা ভুলে যায় তাহলে সকল স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে। যদি দুই স্ত্রীর একজনকে বলে, তুমি তালাক এবং অপরজনকে বলে, অথবা তুমি; কোনো নিয়ত ছাড়াই। এমতাবস্থায় দু'জনের যাকে পছন্দ তালাকদানের স্বামীর অধিকার থাকবে। হাম্বলীগণও এ অভিমত পোষণ করেন।[১৬১]

**এক ইদ্দত অন্য ইদ্দতের মাঝে প্রবেশ করা**

এক ইদ্দত অন্য ইদ্দতের মাঝে প্রবেশ করার অর্থ হলো, ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা নতুন ভাবে ইদ্দত পালন করতে শুরু করার পর প্রথম ইদ্দতের অবশিষ্ট ইদ্দত দ্বিতীয় ইদ্দতের মধ্যে প্রবেশ করবে। দু'টি ইদ্দত একই শ্রেণীর হোক আর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হোক। ইদ্দতটি একই ব্যক্তির কারণে হোক আর দু' ব্যক্তির কারণে হোক তাতে কোনো তারতম্য নেই। ইদ্দতের একটির মাঝে অপরটির প্রবেশ করা জায়েয কি-না? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো,[১৬২] মহিলার জন্য যখন একজাতীয় দু'টি ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হয় আর দু'টি ইদ্দতই ওয়াজিব হয় একই ব্যক্তির কারণে তখন ইদ্দতের ধরন ও লক্ষ্য একই হওয়ার কারণে একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করবে। যেমন-স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করল। অতঃপর ইদ্দতের মাঝে তাকে আবার বিয়ে করে তার সাথে মিলিত হলো, আর বলল আমার তো ধারনা সে আমার জন্য হালাল। অথবা স্ত্রীকে কিনায়া শব্দ দ্বারা তালাক দিল অতঃপর ইদ্দতের মাঝে তার সাথে মিলিত হয়ে গেল। এতে আবশ্যক হওয়া দু'টি ইদ্দতের একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করবে। ফলে মহিলা ইদ্দতের মাঝে ঘটে যাওয়া মিলনের পরবর্তী কালে

---

১৬১. আয-যারকানী, খ. ৪, পৃ. ১২৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৫৫; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪২০।

১৬২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৫; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬০৯; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৩৮৪, ৩৯৪; আল-কালয়ুবী ও উমায়রা, খ. ৪, পৃ. ৪৬; শীরাযী, আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ১৫১; দারুল মারিফা প্রকাশিত, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৩২-১৩৫; আল-কাফী, খ. ৩, পৃ. ৩১৬-৩২০, আল-মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশিত; কাশশাফুল কিনা, খ. ২, পৃ. ৪২৫-৪২৮, আন-নাসর প্রকাশিত; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১২১, দারুল কিতাবিল আরাবী প্রকাশিত; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯১; আল-মাবসূত, খ. ৬, পৃ. ৪০১; আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খ. ১১, পৃ. ৯১।

www.amarboi.org

তিনটি কুরূ' দ্বারা ইদ্দত পালন করবে, আর প্রথম ইদ্দতের বাকি দিনগুলো দ্বিতীয় ইদ্দতের মাঝে প্রবেশ করবে। ইমাম নববী র. বলেন, মহিলার ইদ্দত দু'টি যখন একই ব্যক্তির কারণে হবে আর ইদ্দতগুলো হয় এক জাতীয়। যেমন :

স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করল। অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত পালন করা শুরু করে দিল। তা কুরূ'র মাধ্যমে হোক আর মাস গণনার দ্বারা হোক, তাতে কোনো তারতম্য নেই। এমতাবস্থায় অজ্ঞতাবশত ইদ্দতের মাঝে স্বামী তার উক্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে গেল তাও আবার বায়েন তালাকদানের পর অথবা রাজয়ী তালাকদানের পর জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে হোক স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো, এতে এক ইদ্দত অপর ইদ্দতের মাঝে প্রবেশ করবে।

تداخل পরস্পরে প্রবিষ্ট হওয়া বলতে বুঝায়, মহিলা মিলিত হওয়ার সময় হতে তিন কুরূ' বা তিনটি মাসের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করছিল এর সাথে তালাকের ইদ্দতের অবশিষ্ট দিনগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ অবশিষ্ট দিনগুলো উভয় দিকের ইদ্দতের দিন হিসেবে গণ্য হবে। যদি রাজয়ী তালাক প্রদান করে থাকে তাহলে এ সময়ের মাঝে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে। পরবর্তীতে পুনঃগ্রহণের সুযোগ পাবে না। যদি তিন তালাক না দেয় তাহলে এসময়ের ভিতর বিয়ে নবায়ন করারও সুযোগ পাবে তার স্বামী। এটিই বিশুদ্ধ কথা। যদি মহিলা একই স্বামীর কারণে দু'শ্রেণীর ইদ্দত পালন করে, যেমন : একটি পালন করছে গর্ভ খালাসীর সাথে আর অপরটি কুরূ'র সাথে। তাই স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় তালাকদানের পর তার সাথে মিলিত হোক অথবা স্ত্রী গর্ভধারণে অক্ষম ছিল অতঃপর তাকে গর্ভবতী করে ফেলে। এমতাবস্থায় হানাফীগণের অভিমত হলো, দু'টি ইদ্দত পরস্পরের মাঝে প্রবিষ্ট করবে। এটি শাফেয়ীগণেরও বিশুদ্ধ অভিমত। হাম্বলীগণেরও অন্যতম অভিমত। কারণ দু'টি ইদ্দতই একই ব্যক্তির কারণে। এক জাতীয় দু'টি ইদ্দত হলে প্রবিষ্ট হওয়ার যে হুকুম এক্ষেত্রেও সেই একই হুকুম। শাফেয়ীগণের বিশুদ্ধ অভিমতের বিপরীতে একটি অভিমত হলো, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ইদ্দত হওয়ায় একটি অপরটির মাঝে প্রবিষ্ট হবে না। হাম্বলীগণেরও রয়েছে অনুরূপ একটি অভিমত।

প্রবিষ্ট হওয়ার অভিমতের সারকথা হলো, সন্তান প্রসবের মাধ্যমে দু'টি ইদ্দতই পূর্ণ হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে রাজয়ী তালাক দিয়ে থাকে তাহলে সন্তান প্রসব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে যদি তালাকের ইদ্দত গর্ভের সাথে সংযুক্ত হয় অথবা শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী কুরূ'র সাথে সংযুক্ত হয়। অপরদিকে প্রবিষ্ট না হওয়ার অভিমতের সার কথা হলো গর্ভ যখন তালাকের ইদ্দতের সাথে সংযুক্ত হয় তখন সন্তান প্রসব হওয়ার পর স্ত্রী তিনটি কুরূ'র

www.amarboi.org

মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। গর্ভের মেয়াদকালেই কেবল সে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে, পরবর্তীকালে নয়। গর্ভ যদি সঙ্গত হওয়ার ইদ্দতের সাথে যুক্ত হয় তাহলে মহিলা সন্তান প্রসবের পর তালাকের ইদ্দতের অবিশষ্ট দিনগুলো পূরন করবে। প্রসবের পুর্বে এ অবশিষ্ট দিনগুলোতে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার স্বামীর অধিকার থাকবে বলে শাফেয়ীগণের অভিমত রয়েছে। এটি তাদের একাধিক অভিমতের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত। দু'টি ইদ্দত যদি দু'ব্যক্তির কারণে হয়ে থাকে, তাই তা দু'জাতীয় হোক আর এক জাতীয় হোক। দুই ধরনের দুই ইদ্দতের উদাহরণ হলো বিধবা মহিলার সথে যখন কেউ সন্দেহমূলকভাবে সংগত হয়। এক ধরনের দুই ইদ্দতের উদাহরণ হলো- তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতের মাঝে যখন দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে তার সাথে সংগত হয়ে যায় অতঃপর তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়া হয়। এ ধরনের দুই ইদ্দতের ব্যাপারে শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের অভিমত হলো, একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করবে না। তাদের যুক্তি হলো, এ দু'টি ইদ্দত দুই ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। দু'টি ঋণ হলে যেমন একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করে না এক্ষেত্রেও তেমনি একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করবে না। তাদের আরও যুক্তি হলো, ইদ্দত পালন করা হলো আবদ্ধ রাখা। এটি স্ত্রীদের ওপর স্বামীগণের অধিকার। তাই ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার ওপর দু'জন পুরুষের আবদ্ধ রাখার কোনো বৈধ অধিকার থাকতে পারে না। স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখার অধিকারের মতো এ অধিকার। ফলে মহিলার ওপর ওয়াজিব হলো প্রথম স্বামীর ইদ্দত আগে পালন করা অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালন করা। দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত প্রথম স্বামীর ইদ্দতের পূর্বে মহিলার জন্য পালন করা বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ, গর্ভ হলে আগ পিছ করা ভিন্ন কথা।

হানাফীগণ বলেন, দু'টি ইদ্দত একটি অপরটির মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। কারণ উভয়টিই হলো সময়সীমা। আর সময়সীমা একটি অপরটির মাঝে প্রবিষ্ট হয়। মহিলার জন্য ওয়াজিব হলো বিচ্ছেদ ঘটার পর পরই ইদ্দত পালন করা। প্রথম ইদ্দতের যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা দ্বিতীয় ইদ্দতের মাঝে প্রবিষ্ট হবে। কারণ ইদ্দতের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো, গর্ভাশয় শূন্য থাকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর তা একটি ইদ্দতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে যায়। ফলে একটির মাঝে অপরটি প্রবেশ করতে কোনো বাধা নেই। হানাফীগণ এ কারণে বলেন, ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার সাথে যখন কেউ সন্দেহবশত যৌনকর্মে লিপ্ত হয় তখন সে মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। এর ভিতর সে যে হায়েয দেখবে তাও হিসাব রাখবে, যাতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্পর্কে যতদূর সম্ভব নিশ্চিত হতে

www.amarboi.org

পারে। যদি ওফাতের ইদ্দত পালনকালে কোনো স্রাব দেখতে না পায় তাহলে মহিলার ওপর ওয়াজিব হলো ওফাতের ইদ্দতের মাস গণনার পর তিনটি হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা।[১৬৩]

মালিকীগণ বলেন, দুই ইদ্দতের প্রবিষ্ট হওয়ার মাঝে বিস্তর কথাবার্তা রয়েছে। ইবনে জামী এসম্পর্কে কতিপয় বিশ্লেষণ করেছেন।[১৬৪] তা নিম্নরূপ :

**এক.** কোনো মহিলাকে রাজয়ী তালাকদানের পর যদি তার স্বামী মারা যায় তাহলে তার তালাকের ইদ্দত ওফাতের ইদ্দতের সাথে মিলে যাবে। কারণ মৃত্যু রাজয়ী তালাকের ইদ্দতকে রহিত করে দেয়। তবে বায়েন তালাকের বিধান ভিন্ন ধরনের।

**দুই.** স্ত্রীকে রাজয়ী তালাকদানের পর যদি ইদ্দতের মাঝে তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেয় অতঃপর আবার তালাক দেয়, তাহলে দ্বিতীয় তালাকের পর হতে নতুন ভাবে ইদ্দত পালন করবে। তাই স্ত্রীর সাথে সংগত হোক আর না হোক। কারণ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা ইদ্দতকে রহিত করে দেয়। ইদ্দতের মাঝে যদি পুনঃগ্রহণ করা ছাড়াই দ্বিতীয় তালাক দেয় তাহলে সর্বসম্মতভাবে পূর্বের ইদ্দতই কার্যকর থাকবে। দ্বিতীয় তালাকদানের পর যদি স্ত্রীকে ইদ্দতের মাঝে পুনঃগ্রহণ করে নেয় অথবা ইদ্দতের পর অতঃপর আবার তাকে তালাক প্রদান করে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়া ছাড়াই, তাহলে পূর্বের ইদ্দতই কার্যকর থাকবে। আর যদি সঙ্গত হওয়ার পর স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে দ্বিতীয় তালাকের পর হতে নতুনভাবে ইদ্দত গণনা করবে।

**তিন.** মহিলা যদি তালাকের ইদ্দত পালনকালে অন্যত্র বিয়ে করে আর দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সঙ্গত হওয়ার পর তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে প্রথম স্বামীর ইদ্দতের বাকি দিনগুলো পূর্ণ করার পর দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পূর্ণ করবে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামীরই ইদ্দত পালন করবে আর এর মাধ্যমে দুই স্বামীর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে বলে ঐকমত্য রয়েছে।[১৬৫]

মালেকীগণ আরও বলেন, ওফাত বা তালাকের কারণে হঠাৎ যদি ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার মত কিছু ঘটে, তাহলে সাধারণভাবে প্রথম ইদ্দত বাতিল হয়ে যাবে। দু'টি ইদ্দত ওয়াজিবকারী ব্যক্তি একজন হোক আর দু'জন হোক। যেমন কেউ

---

১৬৩. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ২২০-৩৮৪-৩৯৩-৩৯৪।

১৬৪. ইবনে জাওযী, আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, ১৫৭; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৯৯; যারকানী, খ. ৪, পৃ. ২৩৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৯৮; কুরতুবী, আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

১৬৫. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা লি ইবনে জাওযী, ১৫৭।

www.amarboi.org

তার বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করল। অতঃপর তার সাথে মিলিত হওয়ার পর আবার তালাক দিল। এতে প্রথম তালাকের ইদ্দত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং দ্বিতীয় তালাক সংঘটিত হওয়ার পর নতুনভাবে ইদ্দত গণনা করবে। যদি মিলিত হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয়বার তালাক প্রয়োগ করে তাহলে প্রথম পর্যায়ের তালাকের ইদ্দতই কার্যকর থাকবে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর যদি স্বামী মারা যায় তাহলে মিলিত হোক আর না হোক প্রথম পর্যায়ের তালাকের ইদ্দত বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুনভাবে ওফাতের ইদ্দত কার্যকর হবে।

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি তাকে পুনঃগ্রহণ করা হয়, পুনঃগ্রহণের পর তার সাথে স্বামী মিলিত হোক আর না হোক আবার যদি তাকে তালাক প্রদান করে অথবা স্বামী মারা যায় তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ের তালাকের পর হতে নতুনভাবে ইদ্দত পালন করবে। অথবা স্বামী মারা যাওয়ার পর হতে ওফাতের ইদ্দত পালন করবে। কারণ তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়ায় প্রথম ইদ্দতের কার্যক্রম বাতিল হয়ে গেছে, যা ছিল রাজয়ী তালাকজনিত ইদ্দত।[১৬৬]

## ইদ্দত পালনকালে তালাক প্রদান

হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারীগণের অভিমত হলো, রাজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরত অবস্থায় মহিলাকে তালাক প্রদান করলে তা সম্পৃক্ত হয়। কারণ রাজয়ী তালাকের ইদ্দতকালে দাম্পত্যজীবনের বিধি-বিধানসমূহ বিদ্যমান থাকে। হাম্বলী মাযহাব অনুসারীগণও তাই মনে করেন।[১৬৭]

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ পুনঃগ্রহণ করার অধিকার থাকায় তার ওপর কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকে। ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, আল-কুরআনের পাঁচটি আয়াতের কারণে রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। তাঁর এ অভিমতের লক্ষ্য হলো, তাকে তালাক দিলে তা যুক্ত হবে, তার সাথে যিহার করা শুদ্ধ হবে এবং লিআন, ঈলা ও উত্তরাধিকারিত্ব ইত্যাদি কার্যকর হবে।[১৬৮]

---

১৬৬. আদ-দাসূকী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৪৯৯-৫০১; আল-খারশী, খ. ৪, পৃ. ১৭২-১৭৫; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৭৫-১৭৮।

১৬৭. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৩৪-১৮০; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২১-৬৪; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৪৭৪; আদ-দাসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ২. পৃ. ৪২২; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৬৪; শারহুয যারকানী, খ. ৪, পৃ. ৮০-১৪৫-১৬৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯৩; রাওদাতুত-তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ২২২; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১০৮; খ. ৮, পৃ. ২৩৫।

১৬৮. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৩৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৯; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৬৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯২; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

www.amarboi.org

বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ওপর তালাক যুক্ত হয় না বলে জমহুর ফুকাহার অভিমত। বায়েন তালাক ছোট ধরনের হোক আর বড় ধরনের, তার একই হুকুম। যেমন খুলা এবং ফাসখ বা চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ। তালাক যুক্ত না হওয়ার কারণ হলো, বায়েন তালাকদানের পর মহিলা আর স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয় না। অথবা মৌলিক ভাবে এবং বিধানগত অর্থে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। যেমনটি ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে হয়ে থাকে। হানাফীগণ জমহুর ফুকাহার সাথে একমত পোষণ করেন বড় ধরনের বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ব্যাপারে। তাদের অভিমত হলো বড় ধরনের বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতের মাঝে তাকে তালাক প্রদান করা হলে সেটি যুক্ত হয় না।

ছোট ধরনের বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতের মাঝে তাকে স্পষ্ট তালাক (الطلاق الصريح) প্রদান করলে তা যুক্ত হয়।[১৬৯]

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা কিংবা খুলা কৃতার ইদ্দতের মাঝে তাকে কিনায়া (অস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগে তালাক) তালাক দিলে হানাফী মাযহাবের জাহেরী বর্ণনামতে তা যুক্ত হবে। তবে শর্ত হলো, কিনায়া তালাকটি রাজয়ী তালাকের অর্থবহ হতে হবে। কারণ এ ধরনের কিনায়া শব্দ দ্বারা রাজয়ী তালাক পতিত হয়। ফলে তা হবে সারীহ বা স্পষ্ট তালাকের অর্থবহ।

ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে, কিনায়া তালাক অধিকার কায়েম থাকলে কেবল কার্যকর হয়, অন্যথায় নয়। ফলে এমন কিনায়া যা দ্বারা রাজয়ী তালাক পতিত হয় তা বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনরতার সাথে যুক্ত হবে না।

এমন কিনায়া শব্দ যা বায়েন তালাকের অর্থবহ হয় তা প্রদান করলে যে তা যুক্ত হবে না, এ ব্যাপারে হানাফীগণের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। যেমন 'তুমি বায়েন' বা বিচ্ছিন্ন, এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে যদি তালাকের নিয়ত করে। কারণ বায়েন তালাক মানে হলো বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। কথাটি এভাবেও বলা যায়, বায়েন তালাক দেয়া মানে শরীয়তসম্মতভাবে হারাম করে দেয়া। হারামকৃতাকে আবার হারাম করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।[১৭০] ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, বড় ধরনের বায়েন তালাকপ্রাপ্তা যখন ইদ্দত পালনরত থাকে তখন সে আর

---

১৬৯. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৩৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৯; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৬৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯২; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

১৭০. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৩৫; আল-কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৪৭।

www.amarboi.org

তালাক লাভের উপযোগী থাকে না। কারণ তখন সে বৈবাহিক সম্পর্ক শূণ্য এবং তার ওপর কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকার ছিন্ন হয়ে গেছে; তালাক লাভের ক্ষেত্র হওয়ার উপযোগীতাও বিদূরিত হয়ে গেছে।[১৭১]

**ইদ্দত পালনরতাকে বিয়ের প্রস্তাব**

অন্য পুরুষের ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রীকে অথবা কারো সাথে বিবাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হারাম বলে ফুকাহায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন। তাই সে ইদ্দত রাজয়ী তালাকের হোক কিংবা বায়েন তালাকের অথবা ওফাতের ইদ্দত হোক। অনুরূপভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ বা সন্দেহবশত সঙ্গত হওয়া মহিলার ইদ্দতের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।[১৭২]

তবে ইদ্দত পালনরতাকে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাবদানের বৈধতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে শিরোনাম خطبة- (বিবাহের প্রস্তাব) অনুচ্ছেদ।

**ইদ্দত পালনরতার সাথে অন্যের বিবাহ**

ইদ্দত পালনরতাকে অন্য লোকের জন্য বিয়ে করা বৈধ নয়। ইদ্দতটি তালাকের হোক বা মৃত্যুর হোক বা বিবাহ ভঙ্গের হোক বা সন্দেহ বশত সঙ্গমের যে কোনো ধরনের হোকনা কেন। তালাকের ইদ্দত হয়ে থাকলে তা রাজয়ী তালাকের হোক অথবা বায়েন তালাকের হোক। বায়েন তালাকের হলে তা ছোট ধরনের বায়েন হোক অথবা বড় ধরনের। এতে কোনো তারতম্য নেই।[১৭৩] এ অবৈধতার অভিমতের পক্ষে সকল ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা বংশ সংরক্ষণার্থে, বংশের মিশ্রণরোধে এবং পূর্বের স্বামীর অধিকার সমুন্নত রাখার নিমিত্তে। কেউ যদি ইদ্দতের মাঝে ইদ্দত পালনকারিণীর সাথে আকদ করে ফেলে তাহলে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম এ অভিমতের পক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত :

---

১৭১. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৮৭; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৯; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৬৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ২৪৩-৪৭১।

১৭২. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৪; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ২৭৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৩৫-১৩৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১৮।

১৭৩. আল-কাসানী, আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৪; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ২৭৬-২৮৩; আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৩; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ২১৭; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৮; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৪৩; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৩৫; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১২০-১২৬।

www.amarboi.org

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কাজ সম্পন্ন করার সংকল্প তোমরা করো না।"[১৭৪]

আল-কাসানী বলেন, এর যৌক্তিকতা হলো, রাজয়ী তালাকের পরও বিবাহ সকল অবস্থায়ই অবশিষ্ট থাকে আর তিন তালাক ও বায়েন তালাকের পর ইদ্দত পর্যন্ত বিবাহের কিছু লক্ষণাদি অবশিষ্ট থাকায় এক ধরনের বিবাহ অবশিষ্ট থাকে। আর অবৈধতার ক্ষেত্রে এক ধরনের অবশিষ্ট থাকা আর সকল পন্থায় অবশিষ্ট থাকা সাবধানতার ভিত্তিতে একই সমান। যার কারণে ইদ্দত পালন করতে হচ্ছে সেই স্বামীর জন্য ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়েয আছে যদি প্রদত্ত তালাকের সংখ্যা তিনটি না হয়। বিবাহ করতে নিষেধাজ্ঞা হলো, নতুন স্বামী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। এটি বর্তমান স্বামীর জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ তালাকের ইদ্দত হলো, স্বামীর অধিকার সংরক্ষণার্থে। কারণ স্ত্রীকে তালাকদানের পরও সে তার স্বামীর বিবাহে এক হিসেবে অবশিষ্ট থাকে। এর ফলে নতুন স্বামীর জন্য তাকে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়; এ নিষেধাজ্ঞা স্বামীর জন্য প্রযোজ্য হয় না। কারণ আপন অধিকার হতে বারণ করা বৈধ নয়।[১৭৫]

মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তুলায়হা আল-আসাদিয়্যা ছিলেন রাশীদ আস-সাকাফীর স্ত্রী। তিনি তাকে তালাক দিলে তুলায়হা ইদ্দতের মাঝেই অন্য স্বামী গ্রহণ করলেন। বিষয়টি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. অবহিত হলে স্ত্রী ও তার স্বামীকে তরবারী দ্বারা হালকাভাবে প্রহার করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। অতঃপর উমর রা. ঘোষণা দিলেন, যে মহিলা ইদ্দতের মাঝে বিবাহ করবে সে স্বামী যদি তার সাথে মিলিত না হয় তাহলে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে। অতঃপর প্রথম স্বামীর কারণে তার ওপর যে ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছিল সেটির অবশিষ্ট দিনগুলো পালন করবে। ইদ্দত শেষ হলে এ স্বামী চাইলে এ মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাবকারী হিসেবে থাকতে পারবে। আর বিয়ে করার পর যদি এ স্বামী মহিলার সাথে মিলিত হয়ে যায় তাহলেও তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মহিলা প্রথম স্বামীর ইদ্দতের অবশিষ্ট দিনগুলো পূর্ণ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর মিলনজনিত কারণে ইদ্দত পালন করবে। পরবর্তীতে সে আর তাকে বিয়ে করতে পারবে না।[১৭৬]

---

১৭৪. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৫।

১৭৫. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৪।

১৭৬. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৫; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, আল-হালাবী সম্পা.; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬২১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৯১; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৪; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৭-৯৯;

www.amarboi.org

**ইদ্দত পালনের স্থান**

জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, তালাক, বিবাহ ভঙ্গ অথবা স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে মহিলার ওপর যে ইদ্দত ওয়াজিব হয় তা পালন করবে স্বামীর সে বাড়িতে যেখানে বিচ্ছেদ ঘটার পূর্বে সে বসবাস করত। ওফাতের ইদ্দতের ক্ষেত্রে যেখানে স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে সে বাস করত অথবা যেখানে বাস করা অবস্থায় তার কাছে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছেছে। মহিলা সেখানে সে সকল ওয়ারিসের বেলায় পর্দা রক্ষা করে চলবে যারা তার জন্য মাহরাম নয়।

মহিলা যদি পিত্রালয়ে বেড়াতে যায় আর সেখানে স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে; কিংবা তথায় অবস্থানকালে স্বামী মারা যায় তাহলেও তার ওপর ওয়াজিব হলো, ইদ্দত পালনের জন্য স্বামীর সে বাড়িতে ফিরে আসা যেখানে সে বাস করত। বিচ্ছেদ ঘটার কালে যদি মহিলা অন্যত্র অবস্থান করে তবুও তার ওপর ওয়াজিব হবে দাম্পত্যজীবন কালের বাসগৃহে ইদ্দত পালন করা। কারণ এটি পালনীয় একটি ইবাদত। অসুবিধা বা ওজর ছাড়া তা রহিত হয় না এবং পরিবর্তনও হয় না।

ফুকাহায়ে কেরামের এ অভিমতের মূলে রয়েছে আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী :

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

"এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় কর তোমরা ওদেরকে ওদের বাস গৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং ওরাও যেন বের না হয়, যদি না ওরা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়।"[১৭৭]

আয়াতের সারকথায় দেখা যায়, মহিলার বসবাসের ঘরটিকে আল্লাহ্ তাআলা তারই ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর তা হলো সে ঘর যেখানে সে স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে বা স্বামীর ইনতিকালের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বাস করত। সুতরাং তার পূর্ব চেনা ঘরটিতে তার ইদ্দত পালনই সংগত কাজ।

এছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

আল-ফারীআ বিনতে মালিক রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, তার স্বামী আপন কতিপয় গোলামের খোঁজে বের হয়েছিলেন। তারা তাকে কুড়ালের আঘাতে হত্যা করে ফেলেছে। তিনি বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ স.-কে

---

মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৯৪; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪১০; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০১; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, ১৭০; শাওকানী, নায়লুল আওতার, আল-জায়ল, প্রকাশনা, খ. ৭, পৃ. ১০০।

১৭৭. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ১।

www.amarboi.org

জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার আপনজনের বাড়িতে ফিরে যেতে পারব? কারণ আমার স্বামী তার মালিকানাধীন কোনো বাসস্থান রেখে যাননি। খোরপোষও দিয়ে যাননি। তিনি তৎক্ষণা সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছিলেন যে, হ্যাঁ তুমি যেতে পার। আমি যখন তার নিকট থেকে ফিরে কামরায় বা মসজিদে চলে গেলাম তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলেছিলে? আমি পুনরায় তাকে ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার গৃহেই ইদ্দত পর্যন্ত বসবাস কর। আল-ফারীআ বলেন, অতঃপর আমি সে গৃহেই চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন করলাম। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফানের রা. শাসনকালে তিনি আমার নিকট দূত মারফত বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেছিলাম। তিনি তা মেনে নিয়ে সে আলোকে ফয়সালা দিয়েছিলেন।[১৭৮]

এ হাদীস হতে প্রতিভাত হয়, রাসূলুল্লাহ স. দাম্পত্যজীবনের বাসগৃহে ইদ্দত পালন অবশ্যক করেছিলেন। এরই আলোকে উসমান রা. একদল সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে ফয়সালা দিয়েছিলেন; কিন্তু কেউই তাতে দ্বিমত পোষণ করেননি। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উম্মু সালামাহ রা. আস-সাওরী ও আওযাঈ হতে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। বিষয়টি যখন প্রমাণিত হলো, তখন স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো, স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী যে গৃহে বাস করত সেখানেই ইদ্দত পালন করা। আর যে গৃহে বাস করার কালে স্বামী তাকে তালাক প্রদান করেছে তাতেই তালাকের ইদ্দত পালন করা।[১৭৯]

হাম্বলীগণ মনে করেন, চূড়ান্ত তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য মুস্তাহাব হলো সেই স্থানে বাস করা যেখানে স্বামী তাকে তালাক প্রদান করেছে।[১৮০]

জাবির ইবনে যায়েদ, আল-হাসান বসরী ও আতা প্রমুখ তাবেয়ী বলেন, বিধবা মহিলা যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করবে। এটি আলী রা., ইবনে আব্বাস রা., জাবির রা. ও আয়েশা রা. হতেও বর্ণিত। তারা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন নিম্নোক্ত আয়াত। ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

১৭৮. ইমাম মালিক, আল-মুআত্তা, খ. ২,পৃ. ৫৯১; ইবনুল কাত্তান ও অন্যান্যরা রাবী অজ্ঞাত থাকায় হাদীসটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। (ইবনে হাজার আল-আসকালানী, আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৪০)।

১৭৯. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৭০-১৭১।

১৮০. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৮২।

www.amarboi.org

"আর তোমাদের মাঝে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে তারা চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১৮১]

এ আয়াতটি রহিত করে দেয় সে আয়াতকে যাতে বিধবার ইদ্দত পূর্ণ এক বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল। সে আয়াতটি হলো :

اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

"তোমাদের মাঝে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের একবছরের ভরণপোষণের ওসীয়ত করে।"[১৮২]
লক্ষণীয় যে, চার মাস দশদিনের অতিরিক্ত মেয়াদ রহিত করা হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য সকল বিধান তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতঃপর উত্তরাধিকারের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে বাসস্থানের বিধান রহিত হয়ে গেছে। অপরদিকে স্ত্রীর অধিকার সম্পৃক্ত হয়েছে স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে। ফলে মহিলা যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে।

**ইদ্দতস্থল হতে ইদ্দত পালনরতার বের হওয়া বা তাকে বের করে দেয়া**
তালাকের ইদ্দত হোক আর বিবাহ ভঙ্গের কিংবা স্বামীর ওফাতের ইদ্দত হোক, সর্বাবস্থায় ইদ্দত পালনকারিণীর জন্য ইদ্দতকালে গৃহে বাস করা ওয়াজিব। প্রয়োজন বা ওযর ছাড়া মহিলার জন্য ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি নেই। ঘর হতে বের হলে সে গুনাহগার হবে বলে ফুকাহায়ে কেরাম মনে করেন। তালাক ও বিবাহ ভঙ্গের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার আছে তাকে বের হতে বাধা দেয়ার। ওফাতের ইদ্দতের ক্ষেত্রে ওয়ারিসদের অধিকার আছে তাকে বের হতে বাধা প্রদানের। স্বামী ও ওয়ারিসদের জন্য মহিলাকে ইদ্দত পালনের ঘর হতে ইদ্দতকালে বের করে দেয়া জায়েয নয়। যদি তারা তা করে তাহলে গুনাহগার হবে। কারণ গৃহকে আল্লাহ তাআলা সে সকল মহিলার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ "তোমরা ওদেরকে ওদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করো না।"[১৮৩]

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলার বাণী : لَا تُخْرِجُوهُنَّ -তোমরা ওদেরকে বহিষ্কার করো না, বাক্যটি হতে বুঝা যায় এতে স্বামীগণের অধিকার জড়িত রয়েছে।

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী : وَلَا يَخْرُجْنَ "ওরা ও যেন বের না হয়" বাক্যটি হতে প্রতিভাত হয় যে, এতে স্ত্রীগণেরও দায়বদ্ধতা রয়েছে। যাতে আল্লাহ তাআলা ও স্বামীগণের অধিকার রক্ষায় তারা সচেতন থাকে।

---

১৮১. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪।
১৮২. সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৪০।
১৮৩. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ১।

www.amarboi.org

আল্লাহর হক যেখানে জড়িত সেখানে উভয়ের বোঝাপড়ায় তা রহিত হতে পারে না। কারণ মানুষের তা রহিত করার কোনো ক্ষমতা নেই। এটিই মৌলিক ভাষ্য। তবে হ্যাঁ, ওজর এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হওয়া যায়,[১৮৪] যার বিবরণ সামনে বর্ণিত হবে। বের হওয়ার দূরত্ব নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তা স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিবেচিত হতে পারে।

**রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তার ঘর হতে বের হওয়া**

হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফুকাহার মতে রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তার জন্য রাত বা দিন কোনো সময়েই ইদ্দতের ঘর হতে বের হওয়া জায়েয নেই।[১৮৫] এ মাযহাবের ফকীহগণের দলীল হলো নিম্নোক্ত আয়াত :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

"তোমরা ওদেরকে ওদের বাস গৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং ওরাও যেন বের না হয়।"[১৮৬]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বামীগণকে ওদেরকে বের করে দিতে এবং স্ত্রীগণকে বের হতে নিষেধ করেছেন। তবে হ্যাঁ, স্ত্রীগণ যদি যিনায় লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বাণী রয়েছে :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস করো তাদেরকে সে স্থানে বাস করতে দাও।"[১৮৭]

বাস করতে দেয়ার আদেশ মূলত বের করে দেয়া এবং বের হওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ।

ইমাম নববী বলেন, স্ত্রী যদি রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হয় তাহলে সে স্বামীর স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। মহিলার জন্য যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ সুযোগ দিয়ে তাকে

---

১৮৪. আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খ. ১৮, পৃ. ১৪৫; আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৫; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩৪৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৯১-৩৯৩; আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০২; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪১৫; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৭০; শাওকানী, নায়লুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ১০০।

১৮৫. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৫; ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩৪৪; সারাখসী, আল-মাবসুত, খ. ৬,পৃ. ৩২-৩৬; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ১৪৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০৩।

১৮৬. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ১।

১৮৭. সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ৬।

www.amarboi.org

বাস করতে দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব। ফলে মহিলা তার অনুমতি ছাড়া বের হবে না।[১৮৮]

আল-কাসানী বলেন, রাজয়ী তালাকদানের পরও মহিলা সব দিক দিয়ে তার স্ত্রী। কারণ বিয়ের মালিকানা তখনও কায়েম থাকে। ফলে তালাকদানের পূর্বে যেমন স্ত্রীর জন্য বের হওয়া বৈধ নয়, তেমনি তালাকদানের পরও তা বৈধ হয় না। তবে এ দুই অবস্থার মাঝে তফাৎ হলো, রাজয়ী তালাকদানের পর স্বামী অনুমতি দিলেও মহিলার জন্য বের হওয়া বৈধ হয় না। কারণ তালাকদানের পর বের হওয়া হারাম। এজন্য যে, সে ইদ্দত পালন করছে। তার ইদ্দত পালনে আল্লাহর হক জড়িত। আল্লাহর হক বাতিল করা স্বামীর কোনো অধিকার নেই। পক্ষান্তরে তালাকদানের পূর্বের অবস্থার সাথে কেবল স্বামীর অধিকার জড়িত। তখন তার অধিকার সংরক্ষণ কল্পে স্ত্রীর বের হওয়া হারাম। এ অধিকার বাতিল করতে স্বামীর ক্ষমতা রয়েছে।[১৮৯] বের হওয়ার অনুমতি দিয়ে সে এক্ষেত্রে উদারতা দেখাতে পারে।

মালেকী ও হাম্বলী ফুকাহায়ে কেরাম এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন। তারা বলেন রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা দিনের বেলা তার প্রয়োজন পূরণে ঘর হতে বের হতে পারবে। তবে রাতের বেলা তাকে ঘরে ফিরতেই হবে। কারণ রাতে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তারা জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রা.-এর হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। বর্ণিত হয়েছে :

طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلاَثًا ، فَخَرَجَتْ تَجدُّ نَخْلاً لَهَا ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَال لَهَا : اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَك لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا .

"জাবির রা. বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক দেয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি তার জন্য খেজুর সংগ্রহের জন্য বের হয়েছিলেন। তখন তার সাথে জনৈক লোকের সাক্ষাত হলে তাকে বের হওয়া থেকে বারণ করেছিলেন। তখন তিনি নবী করীম স.-এর নিকট এসে তার কাছে বিষয়টি বললেন। রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি বের হয়ে তোমার খেজুর সংগ্রহ কর। কারণ তা হতে তুমি সাদকহ করতে পারবে অথবা কোনো কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে।[১৯০]

মালেকী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বিষয়টিকে আরও খোলাসা করেছেন। তারা বলেন, ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য নিজের প্রয়োজন মিটাতে

---

১৮৮. রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪১৬।

১৮৯. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৫।

১৯০. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১১২১; ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৭২০; বক্ষ্যমান শব্দ সুনানে আবুদাউদ হতে উৎকলিত।

www.amarboi.org

নিরাপদ সময়গুলোতে ঘর হতে বের হওয়া জায়েয। তা স্থান ও কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। শহরগুলোতে মধ্যাহ্নে বের হওয়া নিরাপদ। আর শহর বহির্ভূত এলাকায় সকাল ও বিকাল নিরাপদ। তবে ইদ্দতের বাসগৃহ ছাড়া মহিলা অন্যত্র রাতযাপন করতে পারবে না।[১৯১]

## বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার বের হওয়া

বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ঘর হতে বের হওয়া সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম দুই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন :

**প্রথম মত :** মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ এবং সাওরী, আওযাঈ ও লায়ছ ইবনে সাদ মনে করেন, বায়েন তালাকপ্রাপ্তার জন্য দিনের বেলা এবং সকাল ও বিকালে আপন প্রয়োজন পূরণের জন্য ইদ্দত পালনের বাসগৃহ হতে বের হওয়া জায়েয আছে। আবশ্যকীয় আসবাপত্র ক্রয় করাও প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আবশ্যকীয় আসবাব বলতে বুঝায় পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ-পত্র কেনা ও সূতা বিক্রয় করা। মহিলা যদি ঘরের বাইরে শ্রমজীবী হয় যেমন ধাত্রী, বিউটিশিয়ান বা অন্য কোনো পেশাজীবী তাতেও তার গৃহের বাহিরে যাওয়া জায়েয। বায়েন তালাকটি হালকা ধরনের হোক আর ভারী হোক, উভয়ের একই রকম হুকুম। তারা এর পক্ষে জাবির রা.-এর পূর্বোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন :

طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا ، فَخَرَجَتْ... "আমার খালাকে তিন তালাক দেয়া হয়ে ছিল অতঃপর ফল পাড়ার জন্য তিনি বের হয়েছিলেন ..........”। ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, ফল পাড়ার কাজ সাধারণত দিনের বেলা হয়ে থাকে। তার অভিমতের মূল কথা হলো, যে সকল ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার খোরপোষ দান করা ওয়াজিব নয় এবং এমন কেউই তার নেই, যে তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবে- এমন মহিলার জন্য ইদ্দতের মাঝে বাসগৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু যে সকল মহিলার খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব সে অনুমতি ছাড়া কিংবা প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না। যেমন স্ত্রী; কারণ স্বামীর দেয়া খোরপোষ তার জন্য যথেষ্ট। তাই বাইরে যাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

ইমাম শাফেয়ী র. বায়েন তালাকপ্রাপ্তার বেলায় রাত্রিকালে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যদি তার প্রয়োজন দিনের বেলা পূর্ণ করা সম্ভব না হয়। অনুরূপভাবে সূতা কাটা কিংবা গল্প করা ইত্যাদি বিনোদনের জন্যও বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো, ঘর হতে তার জন্য বের হওয়া নিরাপদ হতে হবে

১৯১. আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৯।



www.amarboi.org

এবং তার কাছে এমন কেউ বাস না করা যে তাকে সঙ্গ ও শান্ত্বনা দেবে। এও শর্ত যে, ইদ্দতের গৃহে সে ফিরে আসবে এবং সেখানেই রাত যাপন করবে। কারণ মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا .

"উহুদ দিবসে অনেক পুরুষ শাহাদত বরণ করেছিলেন অতঃপর তাদের স্ত্রীগণ বিধবা হয়ে পড়েছিল। তারা একটি বাড়িতে একে অপরের প্রতিবেশী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রাতের বেলা নিঃসঙ্গবোধ করি ফলে আমরা আমাদের একজনের গৃহে রাত যাপন করি। সকালবেলা আমরা আমাদের গৃহে দ্রুত চলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমাদের একজনের নিকট যত ইচ্ছা গল্পগুজব কর। যখন তোমরা ঘুমের ইচ্ছা করবে তখন সকলেই তোমার আপন আপন গৃহে চলে যাবে।"[১৯২]

**দ্বিতীয় মত** : হানাফীগণ বলেন, তিন তালাক ও বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য রাতে এবং দিনে বের হওয়া জায়েয নয়। কারণ এ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা ব্যাপকতর। আর মানুষের সিঞ্চন করা পানি সংরক্ষণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়াও এর অন্যতম কারণ।[১৯৩]

## ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার বের হওয়া

ফুকাহায়ে কেরাম মনে করেন, ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা রাতের বেলা গৃহ ত্যাগ করবে না। প্রয়োজনের তাগিদে দিনের বেলা ঘরের বাইরে যেতে কোনো দোষ নেই।[১৯৪] আল-কাসানী বলেন, ব্যয়ভার নির্বাহ করতে দিনের বেলা

---

১৯২. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৮৬; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৯৩; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, ক. ৩,পৃ. ৯৯; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ১৮, পৃ. ১৫৪; মুগনী আল-মুহতাজ, ৪০৩; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪১৬; সহীহ মুসলিম, খ. ১০, পৃ. ১০৮, ইহইয়াউত তুরাস; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ২০৩; শাওকানী, নায়লুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৯৭; উহুদ যুদ্ধে শাহাদতের হাদীসটি ইমাম বায়হাকী মুজাহিদ সূত্রে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন, সুনান বায়হাকী, খ. ৭, পৃ. ৪৩৬।

১৯৩. আল-বাদায়ে', খ. ২, পৃ. ২০৫।

১৯৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৩৪৪; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৯৩; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৮৬; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৯৬; আল-ফাওয়াকিহুদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০৩; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪১৬;

www.amarboi.org

উপার্জনের উদ্দেশ্যে সে বের হতে বাধ্য। কারণ স্বামীর ওফাতের ফলে তার ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করতে হয়। খাওয়াখরচা কামাতে তাকে ঘরের বাইরে যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। রাতের বেলা প্রয়োজন না থাকায় সে রাতে ঘরের বাইরে যাবে না। প্রয়োজনের তাগিদে দিনের বেলা বাইরে গেলেও ইদ্দতের গৃহছাড়া অন্যত্র সে রাতযাপন করতে পারবে না।[১৯৫]

আল-মুতাওয়াল্লী বলেন, মহিলা যদি অন্ত:স্বত্তা হয় এবং খোরপোষের পাওনাদার হয় তাহলে প্রয়োজন ছাড়া তার ঘরের বাইরে যাওয়া বৈধ নয়। ফুকাহায়ে কেরাম পূর্বে উল্লিখিত ফারীআর হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেন।[১৯৬]

এছাড়া আলকামা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হামদানের কিছু সংখ্যক মহিলার নিকট তাদের স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পৌছলে তারা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট গিয়ে বলল, আমরা নিঃসঙ্গবোধ করি। তিনি তাদেরকে দিনের বেলা একত্রিত হয়ে মতবিনিময় করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু রাতের বেলা যার যার ঘরে চলে যেতে বললেন।[১৯৭]

## সন্দেহবশত মিলনের ও ফাসিদ বিবাহের ইদ্দত

সন্দেহবশত মিলনের এবং ফাসিদ বিয়ের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার বিধান ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার মতো। সে যেরূপ প্রয়োজনের তাগিদে ইদ্দত পালনের সময় ঘর হতে বের হতে পারে এও তেমন বের হতে পারবে। এটি হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফুকাহার অভিমত।[১৯৮]

হানাফীগণ মাসআলাটির ব্যাখ্যা এরূপ করেন, ফাসিদ বিয়ের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য ইদ্দতের বাসগৃহ হতে বের হওয়া বৈধ। তবে স্বামী যদি তার পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে বের হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে তাহলে মহিলার এ অধিকার রহিত হবে। নাবালিকা স্ত্রীর সাথে যদি এমনভাবে বিচ্ছেদ ঘটে যার ফলে আর তাকে পুনঃগ্রহণের অবকাশ থাকে না তাহলে ইদ্দতকালে তার জন্য ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে। এক্ষেত্রে স্বামী তাকে অনুমতি প্রদান

---

আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৭৬;তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ১৮, পৃ. ১৫৪; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ২০৩; নায়লুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ১০২।

১৯৫. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৫; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৮৬।

১৯৬. হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

১৯৭. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৭৬; সহীহ মুসলিম, খ. ১০, পৃ. ১০৮; শাওকানী, নায়লুল আওতার, খ.৭,পৃ. ১০২; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ২০৩।

১৯৮. রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪১৬।

www.amarboi.org

করুক বা না করুক। কারণ ইদ্দত পালনকারিণীর ওপর ঘরে অবস্থান করা ওয়াজিব হওয়ার হেতু হলো, আল্লাহর হক ও স্বামীর হক সংরক্ষণ করা। স্ত্রীটি অপ্রাপ্তবয়স্কা হওয়ায় তার ওপর আল্লাহর হক আদায় করা ওয়াজিব হয় না। এদিকে স্বামীর অধিকার তার ওপর সন্তানের সুরক্ষা কল্পে। আর মেয়েটি নাবালিকা হওয়ায় সন্তান সম্ভবা হওয়ার সুযোগ নেই। আর বিচ্ছেদ যদি পুনঃগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া নাবালিকার বাহিরে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ রাজয়ী তালাকের ইদ্দতের মাঝে সে তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। স্বামীরও অধিকার থাকে তাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়ার।

ইদ্দত পালনকারিণী পাগল মহিলার ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে। কারণ সে নাবালিকার মতো শরীয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট নয়। তবে তার স্বামীর অধিকার রয়েছে, স্বীয় পানি হেফাজতের লক্ষ্যে তাকে ঘরের বাইরে যেতে বাধা দেয়ার। আহলে কিতাবের অনুসারী ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য ঘরের বাইরে গমন করার অধিকার রয়েছে। কারণ ইদ্দতকালে গৃহবাস একদিক দিয়ে আল্লাহর হক। এদিক দিয়ে তা একটি ইবাদত হিসেবে বিবেচিত হবে। অথচ বিধর্মীরা ইবাদত পালনে অযোগ্য। তবে হ্যাঁ, স্বামী তার পানি সংরক্ষণের জন্য তাকে বের হওয়া থেকে বারণ করতে পারবে। ইদ্দত পালনকালে যদি ভিন্নধর্মী স্ত্রী ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যায় তাহলে ইদ্দতকালে মুসলিম মহিলার ওপর যা যা ওয়াজিব হয় তার ওপরও তা ওয়াজিব হবে।[১৯৯]

**ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য কোন্ কোন্ প্রয়োজনে বের হওয়া ও স্থান বদল করা বৈধ**

তালাক, বিবাহ ভঙ্গ ও ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য জরুরী অবস্থায় ঘর থেকে বের হওয়া এবং ইদ্দতের স্থান বদল করা বৈধ। আল-কাসানী বলেন, ঘর পড়ে যাওয়া এবং সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করলে বাধ্য হয়ে মহিলার জন্য ঘর হতে বের হওয়ার বিধান রয়েছে। ভাড়া ঘরে যদি ওফাতের ইদ্দত পালন করে আর ভাড়া পরিশোধের যদি কোনো উপায় না থাকে কিংবা ঘরটি ছিল স্বামীর মালিকানাধীন তার ইনতিকালের পর মহিলা যে অংশ পায় তাতে বাস করা যথেষ্ট হয় না। অথবা মহিলা যদি শংকিত হয় যে, এঘরে বসবাস করলে স্বামীর ওয়ারিসদের হাত থেকে তার সামান সংরক্ষণ করতে পারবে না, তাহলে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার স্থানান্তর হতে কোনো বাধা নেই। কারণ বাসগৃহে অবস্থান করা ওয়াজিব হলো ইবাদতরূপে মহিলার ওপর আল্লাহর হক। আর ইবাদতের ব্যাপারে বিধান হলো, ওযরের কারণে তা রহিত হয়ে যায়। ওযরের কারণে মহিলা যে ঘর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্যঘরে আশ্রয়

---

১৯৯. আল-কাসানী, আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৭।

www.amarboi.org

নেয় তার হুকুম হলো আসল ঘরের ন্যায়, তা হতে বের হওয়া নিষিদ্ধ। ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এখানেই তাকে অবস্থান করতে হবে।[২০০]

মালেকী মাযহাবের ব্যাখ্যা হলো, ওযর অবস্থায় মহিলার স্থানান্তর হওয়া বৈধ। যেমন, ইদ্দত পালনকারিণী বেদুঈন মহিলার পরিবার যখন স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় তখন পরিবার পরিজনের সাথে তারও স্থানান্তর হওয়া জায়েয আছে। কারণ ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর পরিবারের সাথে তার মিলিত হওয়া কঠিন হবে। মহিলা যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হয় যার ফলে সে স্থানে বসবাস করা সম্ভব নয়, যেমন বাড়ি ভেঙ্গে পড়া; অথবা খারাপ প্রতিবেশী ও চোরের আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য স্থানান্তর হওয়া বৈধ। তবে এ ব্যাপারে কথা হলো, সেখানে সে এমন কোনো বিচারকও পায় না, যে সমস্যার প্রতিকার করে দেবে। যদি প্রতিকার করে দেয়ার মত কোনো বিচারক পায় তাহলে স্থানান্তর হওয়া যাবে না। মহিলা শহরে হোক আর গ্রামে বাসকারী হোক এতে কোনো তারতম্য নেই। স্থানান্তারিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বাসস্থানে তাকে অবস্থান করতে হবে। হ্যাঁ, যদি আবার কোনো ওযর দেখা দেয় তাহলে ভিন্ন কথা। বিনাকারণে যদি মহিলা স্থানান্তরিত হয় তাহলে বিচারের মাধ্যমে বলপূর্বক তাকে পূর্বের বাসস্থানে বাস করতে বাধ্য করা হবে। কারণ ইদ্দতের গৃহে অবস্থান করা আল্লাহর হক, তা লঙ্ঘন করার অধিকার কারো নেই।[২০১]

এ ব্যাপারে শাফেয়ী মাযহাবের বর্ণনা হলো, যে ওযরের কারণে মহিলা ইদ্দতের স্থান হতে বের হতে পারবে তা হলো :

যদি সে আপন প্রাণের বা মালের ব্যাপারে আশঙ্কা করে, তা ঘর ভেঙ্গে পড়ার বা জ্বলে যাওয়ার অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার অথবা চোরের উপদ্রবের অথবা দুস্কৃতকারীদের কিংবা মন্দ প্রতিবেশীর যাতনার আশঙ্কা হতে পারে। এমতাবস্থায় মহিলা ইদ্দতের ঘরের পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানে ঘর তালাশ করবে। দারুল হারব বা শত্রুদেশে যদি মহিলার ওপর ইদ্দত আবশ্যক হয় তাহলে সে দারুল ইসলামে স্থানান্তর হতে পারবে। তবে মুতাওয়াল্লী বলেন, যদি এমন কোনো স্থানে বাস করে যেখানে নিজের প্রাণ ও দীনের ব্যাপারে কোনো আশঙ্কাবোধ করে না তাহলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে স্থান ত্যাগ করবে না। যদি ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার ওপর কিছু ওয়াজিব হয়ে যায় যা পূর্ণ করা আবশ্যক হয়; কিন্তু ইদ্দত পালনের গৃহে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় যেমন মহিলার ওপর কোনো ধরনের শাস্তি কার্যকর করা

---

২০০. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৫; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৮৫।
২০১. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৯৯; জাওয়াহিরুল- ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৯৩।

www.amarboi.org

বা কোনো দাবির পিছনে কসম করা যদি আবশ্যক হয়ে পড়ে তাহলে মহিলার চাল চলন সম্পর্কে খোঁজ নেয়া প্রয়োজন। যদি সে খোলা মেলা চলতে অভ্যস্থ হয় তাহলে সে ঘর হতে বেরিয়ে আসবে এবং তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা হবে বা শপথ করবে। অতঃপর ইদ্দতের স্থানে চলে যাবে। অপরদিকে মহিলা যদি পর্দানশীন হয় তাহলে বিচারক তার কাছে কোনো প্রতিনিধি পাঠাবে অথবা তিনি সশরীরে তার নিকট উপস্থিত হবেন।

ইদ্দতের বাসগৃহ যদি ধার নেয়া হয় বা ভাড়াটে হয় আর মালিক তা ফেরত নিতে চায় বা ভাড়ার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে সেখানে থেকে বেরিয়ে আসা আবশ্যক হয়ে যাবে।

হাম্বলীগণের মাযহাব হলো, উপর্যুক্ত কোনো কারণেই বের হওয়া যাবে না।[২০২] ফুকাহায়ে কেরাম দলীল দেন আয়েশা রা.-এর আমল দ্বারা। বর্ণিত আছে, তিনি আপন বোন উম্মু কুলছুম বিনতে আবী বাকর রা. কে স্থানান্তর করেছিলেন যখন তালহা রা. শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর এ আমল প্রমাণ করে, ওজরবশত স্থানান্তর হওয়া জায়েয।[২০৩]

**ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণীর হজ, সফর অথবা ইতিকাফের উদ্দেশ্যে বের হওয়া**

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো, ওফাতের ইদ্দত পালন কারিণীর জন্য হজের সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। কারণ হলো হজ ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই; কিন্তু ইদ্দত ছুটে যাবে। মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী যদি হজের বা উমরার ইহরাম বেঁধে ফেলে তাহলে আপন অবস্থায় স্থির থাকবে। ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্যে বাসস্থানে ফিরে আসবে না।

তেমনি ফুকাহায়ে কেরাম মনে করেন, হজ ও উমরা ছাড়া অন্য কোনো সফর ইদ্দত পালনকারিণীর জন্য জায়েয নয়। সফরকারী মহিলার ওপর যদি ইদ্দত পালন করার ক্ষেত্র তৈরী হয়ে যায়, তাহলে সে সফর অব্যাহত রাখবে, না চলে আসবে. এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে।

ইতিকাফকারী মহিলার জন্য আবশ্যক হলো, ইদ্দত পূর্ণ করার জন্য বাসগৃহে ফিরে আসা। কারণ ইদ্দতপালন হলো, উদ্ভুত প্রয়োজনের খাতিরে। এটি হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযাহাবের ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত। তবে

২০২. রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮,পৃ. ৪১৫-৪১৭; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১৭৬।

২০৩. আল-কাসানী, আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২০৬।

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের ফুকাহা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, ইতিকাফরত থাকাকালে যদি তার ওপর ইদ্দত আরোপ হয়। তাহলে ইতিকাফকারী মহিলা ইতিকাফেই রত থাকবে। তা ওফাতের ইদ্দত হোক আর তালাকের। রাবী'আ ও ইবনুল মুনযির ও এঅভিমত পোষণ করেন। হ্যাঁ, যদি ইদ্দত পালনকালে কোনো কারণে তার ওপর ইতিকাফ আরোপ হয় তাহলে মহিলা ইতিকাফ করার জন্য ইদ্দতের ঘর হতে বের হবে না। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে ঘরেই অবস্থান করবে। হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া কিছুর জন্য বের হবে না; বরং পূর্বের অবস্থায় সচেষ্ট থাকবে।[২০৪]

## ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার সাজসজ্জা বর্জন করা

কাপড়, অলংকার ও সুঘ্রাণ ইত্যাদি প্রসাধনী দ্রব্য বিশেষ মেয়াদে, বিশেষ অবস্থায় বর্জন করাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ইহদাদ' বলে। ওফাত, রাজয়ী তালাক ও বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার ইহদাদের বিধান ভিন্ন ভিন্ন। সহীহ পন্থায় অনুষ্ঠিত বিয়ের পর যার স্বামী মারা যায়, তাহলে ওফাতের ইদ্দত পালনের সময় ইহদাদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বে যদি স্বামী মারা যায় তাকেও ইহদাদ পালন করতে হয়। তবে ফাসিদ বিয়ের পর যদি মিলনের পূর্বে স্বামী মারা যায় তাহলে ভিন্ন কথা।[২০৫]

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত পালনের সময় ইহদাদ করতে হবে না। কারণ তখনও তার ওপর বিয়ের বহু বিধি-বিধান অবশিষ্ট থাকে। বিপরীতে ইদ্দতকালে তার জন্য এমন ধরনের সাজগোজ করা মুসতাহাব যার ফলে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়। হয়ত আল্লাহ এর পর কোনো উপায় করে দেবেন। বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য ইহদাদ আবশ্যক কি-না, সে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তা ছোট বায়েন হোক আর বড় বায়েন।

---

২০৪. তাবঈনুল হাকায়েক, আল-আমীরিয়্যা সং., খ. ১, পৃ. ৩৫১; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ২, পৃ. ৩২৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ১, পৃ. ২১২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৯৮; হাশিয়াতুদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৮৫; আল-মাজমূ, খ. ৬, পৃ. ৪৪৫; আল-জুমাল, খ. ৪,পৃ. ৪৬৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০৪; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ২০৭।

২০৫. আল-বাদায়ে, খ. ৩, পৃ. ২০৮; ফাতহুল কাদীর, খ.৪,পৃ. ৩৪২; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪৭৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮৯, মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩৮৪; আল-ফাওয়াকিহ, খ. ২, পৃ. ৯৪; আল-বাজী আলাল মুআত্তা, খ. ৪, পৃ. ১৪৫; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪০৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৮; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ১৬৬; ইবনে কুদামা, আল-কাফী, খ. ২, পৃ. ৯৫০।

www.amarboi.org

## ইদ্দত পালনরতার খোরপোষ

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তাকে বাসস্থান, খোরপোষ, কাপড়চোপড় ও জীবন-জীবিকার অন্যান্য উপকরণ দেয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সে গর্ভবতী হোক আর না হোক। কারণ ইদ্দতকালে বৈবাহিক জীবনের অনেক কিছু বিদ্যমান থাকে। এরূপ ফুকাহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাকে বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব। তবে ফুকাহায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন এমন বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রে, যে সন্তানসম্ভবা নয়। অনুরূপ মতভিন্নতা দেখা যায় ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার ক্ষেত্রে।

## ইদ্দতকালে ওয়ারিস হওয়া

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দতকালে মারা গেলে অথবা ইদ্দতকালে তার স্বামী মারা গেলে একে অপরের ওয়ারিস হয় বলে ফুহাকায়ে কেরামের অভিমত। কারণ ইদ্দত চলাকালে বৈবাহিক সম্পর্কের বহু বিষয় অটুট থাকে। সুস্থ সবল থাকা অবস্থায় স্বামী যদি বায়েন তালাক প্রদান করে এ তালাক স্ত্রীর সন্তুষ্টিতে হোক আর অসন্তুষ্টিতে হোক, ইদ্দত পালনকালে কেউ কারো ওয়ারিস হয় না।

মুমূর্ষু অবস্থায় প্রদত্ত বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে ফুকহায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় একে طَلَاقُ الْفَارِّ 'পলায়নপরের তালাক' নামে অভিহিত করা হয়।[২০৬] হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের প্রাচীন অভিমত হলো মুমূর্ষু অবস্থায় বায়েন তালাক প্রদান করলে ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী ওয়ারিস হবে। তবে শর্ত হলো :

১. তালাক প্রদান যেন স্ত্রীর সম্মতিতে না হয়।

২. যে রোগে স্বামী তালাক দিয়েছিল মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে রোগেই স্বামীর মৃত্যু হতে হবে।

৩. তালাক প্রদানের সময় স্ত্রীকে উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য হতে হবে এবং সে যোগ্যতা অব্যাহত থাকবে স্বামীর সাধারণ মৃত্যু পর্যন্ত। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বামী তালাক দিয়েছে; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরিবর্তে ইদ্দতকালে উল্টো স্ত্রী যদি মারা

---

২০৬. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৮০; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ১৫০; ইবনে আবিদীন, খ. ২,পৃ. ৫২০, খ. ৪. পৃ. ৪৬৫; আল-মাবসূত, খ. ৩, পৃ. ১৫৫; হাশিয়া দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৩; আল-ফাওয়াকিহ, খ. ২, পৃ. ৫৬; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯৪; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৭২; শারহুয যারকানী, খ. ৪, পৃ. ৭০; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২১৭।

www.amarboi.org

যায় তাহলে তালাকদাতা স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তিতে ওয়ারিস হবে না। তার অসৎ উদ্দেশ্যের ফলে এ হুকুম আরোপ করা হয়েছে। কারণ বায়েন তালাক দেয়ায় স্ত্রীর সম্পত্তিতে তার যে অধিকার ছিল তা সে নিজেই রহিত করে দিয়েছে।[২০৭]

মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ বলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিলে কিংবা লিআন করলে অথবা স্ত্রীর সাথে খুলা করলে অতঃপর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। এ তালাকে স্ত্রী সম্মত থাকুক আর না থাকুক একই হুকুম। এমনকি ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করলেও সে ওয়ারিস হবে। একাধিক স্বামী গ্রহণ করলেও তাতে কোনো বাধা নেই। তবে এমতাবস্থায় স্ত্রী মারা গেলে উক্ত স্বামী তার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। স্ত্রীটি যদিও তখন অসুস্থ হয়ে থাকে। কারণ বায়েন তালাক দিয়ে সে নিজেই তার অধিকার খর্ব করেছে।[২০৮]

শাফেয়ীগণের নতুন অভিমত হলো, মহিলা ওয়ারিস হবে না। কারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের আরো যুক্তি হলো, স্ত্রী মারা গেলেও তো সবার মতে স্বামী তার ওয়ারিস হয় না।[২০৯]

শাফেয়ীগণের প্রাচীন অভিমত হলো, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ওয়ারিস হয়। তাতে কয়েকটি মত রয়েছে :

**এক.** ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওয়ারিস হবে। **দুই.** অন্যত্র বিয়ে না করা পর্যন্ত ওয়ারিস হবে অথবা একেবারেই বিয়ে হবে না।

প্রাচীন অভিমতের কয়েকটি শর্ত রয়েছে : **এক.** স্ত্রী ওয়ারিস হওয়া, **দুই.** এসময় বায়েন তালাকপ্রাপ্তিতে স্ত্রীর কোনো ইখতিয়ার থাকবে না এবং স্বামীর মৃত্যু এ কারণেই হতে হবে। **তিন.** বায়েন তালাক কেবল তালাকের মাধ্যমেই হতে হবে লিআন বা ফাসখ ইত্যাদির মাধ্যমে নয়।

হাম্বলীগণের মতে, মুমূর্ষু অবস্থায় বায়েন তালাকদানের পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, স্বামীর এমতাবস্থায় তালাকদানের মাঝে স্ত্রীর অনুরাগ বা ইচ্ছা থাকবে না। স্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে স্বামী তার ওয়ারিস হবে না। ইমাম আহমদ র.-এর প্রসিদ্ধ মত হলো, অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইদ্দতের পরও স্ত্রী ওয়ারিস হবে। এটিও তার থেকে বর্ণিত যে, ইদ্দতের পর স্বামী মারা গেলে ওয়ারিস হবে না।

---

২০৭. প্রাগুক্ত সূত্রসমূহ।

২০৮. আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৩৫৩; আল-ফাওয়াকিহ, খ. ২, পৃ. ৫৬; আল-ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩৩; যারকানী, খ. ৪, পৃ. ২০৯।

২০৯. রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৭২, ২২২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৯৪।

www.amarboi.org

## ইদ্দত পালনরতার সাথে জীবনযাপন ও বসবাস

বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার বিধান হলো অপরিচিতা মহিলার বিধানের মত। তালাকদাতার জন্য তার সাথে জীবনযাপন করা, একান্তে সময় কাটানো এবং তার প্রতি তাকানো জায়েয নয়। কারণ বৈবাহিক সম্পর্কের সকল বিষয় এর দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। হালকা ধরনের বায়েন তালাক হলে নতুন আকদ ও নতুন মহর দান ছাড়া মহিলা বৈধ হয় না। আর বড় ধরনের বায়েন তালাক হলে অন্য স্বামী গ্রহণ করা এবং তৎকর্তৃক বিচ্ছেদ হওয়া ছাড়া সে হালাল হয় না।

রাজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার সাথে জীবনযাপন করা, তাকে ভোগ করা এবং একান্তে সময় কাটানোর ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম দু'টি অভিমত পোষণ করেছেন :

মালেকী, শাফেয়ী ও এক রেওয়ায়াত মতে হাম্বলীগণের অভিমত হলো, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তার সাথে তার ইদ্দতের মাঝে একই গৃহে জীবনযাপন করা জায়েয নয়। কারণ এর ফলে স্বামীকে একান্তে বাস করার দিকে ধাবিত করবে। অথচ এটি স্বামীর জন্য হারাম করা হয়েছে। এটি মহিলাকে কষ্ট দেয়াও বটে। অথচ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো : وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"তাদেরকে উত্ত্যক্ত করোনা সংকটে ফেলার জন্য।"[২১০]

তাদের আরও যুক্তি হলো, তালাক দেয়া হয় বিবাহ ও তার প্রাথমিক বিষয় আশয় বিদূরীত করার জন্য। তাই ইদ্দত পালনরতার নিকট প্রবেশ করা, তার সাথে খাওয়া দাওয়া করা, তাকে স্পর্শ করা এবং তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয হবে না। বরং উল্টো স্বামীর ওপর ওয়াজিব হলো মহিলার ঘর হতে বের হয়ে যাওয়া। বসবাস করার গৃহটি যদি বড় ধরনের হয় এবং মহিলার সাথে বিবেকবান মাহরাম পুরুষও বসবাস করে আর সে চক্ষুস্মান হয় তাহলে একই গৃহে বাস করার মাঝে কোনো বাধা নেই।[২১১]

হানাফীগণের মতে, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের সময় তার সাথে একান্তে বাস করা, তাকে স্পর্শ করা ও তার প্রতি তাকানো জায়েয আছে। তবে তা পুনঃগ্রহণের উদ্দেশ্যে হতে হবে। হাম্বলী মাযহাবের বাহ্যত অভিমতও এরই আলোকে। পুনঃগ্রহণের নিয়ত ছাড়াও হানাফীগণের মতে মাকরূহে তানযীহীর

---

২১০. সূরা আত-তালাক, ৬।

২১১. সুবুলুস সালাম, খ. ৩. পৃ. ১৮২; নায়লুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৪৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৬৪; আল-ফাওয়াকিহ, খ. ২, পৃ. ৯৭; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ৪১৮; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০৭; আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৪৮৩।

www.amarboi.org

সাথে তা জায়েয আছে। যুক্তি হলো, ইদ্দতের মাঝে সে স্ত্রীর মত। স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াও স্বামী তাকে পুনঃগ্রহণের ক্ষমতা রাখে।[২১২]

**ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট দাবিসমূহ**

রাজয়ী তালাকের ইদ্দত ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইদ্দতে পুনঃগ্রহণ করা যায় না বলে ফুকাহায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন। আল-কিতাব, আস-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা তা প্রমাণিত।[২১৩] (বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম رَجْعَة)

এর সাথে কতিপয় দাবি সংশ্লিষ্ট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ বা পুনঃগ্রহণের তারিখ নিয়ে মতবিরোধ।

এ সম্পর্কে কতিপয় পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে শিরোনাম (رَجْعَة) এর মধ্যে এখানে আরো কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো, যা কিছু সংখ্যক ফকীহ বর্ণনা করেছেন। মালেকী মাযহাবের ফুকাহা মনে করেন, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা যদি এমন সময় ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবি করে যখন তা কুরূ এর মাধ্যমে পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়া যাবে। প্রসবের দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার স্ত্রীর দাবিও গ্রহণযোগ্য হবে যদি ভ্রূণটি স্বামীর সাথে যুক্ত হয় অথবা স্বামীর ঔরসভুক্ত করা সঠিক হয়। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবির ক্ষেত্রে স্ত্রীর কাছে কসম তলব করার প্রয়োজন নেই; স্বামীর ওপরও কোনো কসম আবশ্যক হবে না। অতঃপর মহিলাকে পুনঃগ্রহণ করা সহীহ হবে না; বরং সে অন্য স্বামীর জন্য বৈধ বলে স্বীকৃত হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি কুরূর মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবি এমন সময় উত্থাপন করে যাতে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া দুষ্কর হয়। যেমন সে এক মাসের ভিতরে বলে, আমি তিনবার ঋতুমতী হয়েছি। তাহলে এ সম্পর্কে মহিলাদের নিকট মতামত চাওয়া হবে। যদি তারা সাক্ষী দেয়, এ সময়ের মধ্যে মহিলারা তিনটি ঋতুর অধিকারী হতে পারে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।[২১৪] শাফেয়ী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যদি স্বামী দাবি করে, সে ইদ্দতের মাঝে ইদ্দত পালনকারিণীকে পুনঃগ্রহণ করেছে; কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করে।

---

২১২. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৮০; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬২২; আল-মাবসূত, খ.৬, পৃ. ৩৬; ইবনে কুদামা , আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

২১৩. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৮০; আদ-দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪১৫; আল-ফাওয়াকিহ, খ. ২, পৃ. ৫৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৬২; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ২১৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৩৪১; আর-রাওদুল মুরাববা', খ. ৬, পৃ. ৬০১; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ১৮২।

২১৪. হাশিয়া দাসূকী, খ. ২, পৃ. ৪২১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৬৪।

www.amarboi.org

এরূপ অবস্থায় লক্ষ্যণীয় হবে, তাদের মতবিরোধ স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণের পূর্বে হচ্ছে না পরে। অন্য স্বামী গ্রহণের পূর্বে মতানৈক্য হলে দেখতে হবে, ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে, না এখনও বাকি রয়েছে। এক্ষেত্রে যদি তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময়ের ব্যাপারে একমত হয়, যেমন বলে, জুমুআর দিন ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে। তবে স্বামীর দাবি হলো, আমি বৃহস্পতিবার পুনঃগ্রহণ করেছি। পক্ষান্তরে স্ত্রী বলে শনিবার পুনঃগ্রহণ করেছে। এরূপ মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সমাধান হলো, সহীহ অভিমত অনুযায়ী স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে তবে শর্ত হলো, তাকে হলোফ করে বলতে হবে যে, বৃহস্পতিবার পুনঃগ্রহণ করার কথা সে জানে না। কারণ বাস্তবতা হলো, শনিবার পর্যন্ত পুনঃগ্রহণ না করা। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এক্ষেত্রে হলোফের সাথে স্বামীর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। যদি স্বামী-স্ত্রী ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময়ের ব্যাপারে একমত না হয়; বরং পুনঃগ্রহণের সময় নিয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। যেমন শুক্রবার দিবসে পুনঃগ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু স্ত্রী বলে, আমি বৃহস্পতিবার ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ করেছি। পক্ষান্তরে স্বামী বলে ইদ্দতের মেয়াদ শনিবার শেষ হবে। এরূপ মতভেদের ক্ষেত্রে হলোফ সহকারে স্বামীর কথা গ্রহণ যোগ্য হবে এটি বিশুদ্ধ অভিমত। কারণ শুক্রবারের পূর্বে ইদ্দত পূর্ণ না হওয়াই আসল কথা। কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্বে যে দাবি করেছে তার কথা গ্রহণযোগ্য।[২১৫]

## ইদ্দতের মাঝে বংশ সাব্যস্ত হওয়া

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফুকাহার মতে ইদ্দতের মাঝে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। তবে তা হতে হবে তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুর সময় হতে গর্ভের চূড়ান্ত মেয়াদের ভিতরে। লিআন ছাড়া তা অস্বীকার করা যাবে না। ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা স্বীকার করুক আর না করুক।[২১৬]

হানাফীগণ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারী মহিলার সন্তানের বংশ প্রমাণের ব্যাপারে পার্থক্য করেন। অনুরূপভাবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ও ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে তারা পার্থক্য করেন।[২১৭]

---

২১৫. মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৪০; রাওদাতুত তালিবীন, খ. ৮, পৃ. ২২৩-২২৪।

২১৬. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮০; আল-মাওয়াক বিহামিশিল হাত্তাব, খ. ৪,পৃ. ১৩৫; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১১৭, ১১৮; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ২৯০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯,পৃ. ১১৬-১১৯।

২১৭. আল-বাদায়ে', খ. ৩, পৃ. ২১১।

www.amarboi.org

মহিলা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা স্বীকার করার পর যদি ছয় মাসের কম সময়ের মাঝে সন্তান প্রসব করে তাহলে সবার মতে সন্তানের বংশ প্রমাণিত হবে। কারণ নিশ্চিতভাবে তার দাবির বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং তার অবস্থা হয়ে গেল যেমন সে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা স্বীকারই করেনি।

যদি ছয়মাস বা তার চেয়ে বেশি কাল পর সন্তান প্রসব করে তাহলে হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে সন্তানের বংশ প্রমাণিত হবে না। কারণ তার দাবির বিপরীত কিছু প্রকাশ পায়নি। ফলে তা পরবর্তীতে সৃষ্ট কোনো নতুন গর্ভের সন্তান বলে বিবেচিত হবে। এটি হানাফীগণের মত। এর পিছনে আরো যুক্তি হলো যে, মহিলা সন্তান প্রসব করেছে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ফয়সালা হওয়ার পর। এমনকি অন্যের সাথে তার বিবাহ হালাল হওয়ার সাথে গর্ভের মেয়াদও এতে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ফলে তার পূর্বের স্বামীর সন্তান হিসেবে বংশ সাব্যস্ত হবে না। যেমনটি কোনো মহিলা যদি গর্ভের মেয়াদে সন্তান প্রসব হওয়ার মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ করার পর যদি সন্তান ধারণ করে সেটিরও বংশ প্রমাণিত হয় না। হাম্বলী ফিকহের অনুসারীগণ এ হেতুগুলো তলিয়ে দেখিয়েছেন।[২১৮] মালেকী ও শাফেয়ী ফিকহের অনুসারীগণের মতে মহিলা যে পর্যন্ত না বিয়ে করবে অথবা চার বছর অতিক্রান্ত হবে ততক্ষণ সন্তানের বংশ প্রমাণিত হবে। কারণ এ মেয়াদে সন্তানটি স্বামীর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর চার বছরই হলো গর্ভের চূড়ান্ত মেয়াদ। সন্তানেরও তার চেয়ে নিকটবর্তী কেউ নেই।[২১৯]

## ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে যাকাত দেয়া

ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার খোরপোষ যখন স্বামীর ওপর ইদ্দতের মেয়াদে ওয়াজিব হয় তখন তাকে যাকাতের টাকা পয়সা দেয়া জায়েয হবে না; কিন্তু ইদ্দতের মাঝে যদি স্বামীর ওপর খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব না হয় অথবা মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে। কারণ, স্বামীর ওপর খোরপোষ দান করা ওয়াজিব নয়।[২২০]

–ফয়সল আহমদ জালালী

---

২১৮. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৭৯; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ১১৮ ও খ. ৭, পৃ. ৪৭৯; আল-মাওসূআ, খ. ১০, পৃ. ১৪৪।

২১৯. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৮০; মুগনিআল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৭৩।

২২০. ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬২; ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ২২; সারাখসী, আল- মাবসুত, খ. ৫, পৃ. ২০১; হাশিয়া দাসূকী, খ. ১, পৃ. ৪৯৯; আল-কালয়ূবী ও উমায়রা, খ. ৩, পৃ. ১৯৬; আল-মাজমূ, খ. ৬, পৃ. ১৯২-২৩০; আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ৬৪৯।

www.amarboi.org

# উত্তরাধিকার (إِرْثٌ)

**সংজ্ঞা :** إِرْثٌ এর আভিধানিক অর্থ হলো الأَصْلُ। অর্থাৎ মূল। পুরাতন জিনিস যা পরবর্তী কালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। এর দ্বারা প্রতিটি জিনিসের অবশিষ্টাংশ বুঝানো হয়ে থাকে।[১]

إِرْثٌ বা উত্তরাধিকার বলতে কোনো একটি জিনিস একদল লোকের নিকট থেকে অন্য একদল লোকের কাছে হস্তান্তর করা বুঝানো হয়ে থাকে। এর দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে-প্রাপ্ত বস্তুকেও বুঝানো হয়ে থাকে।[২]

এ অর্থের নিকটবর্তী শব্দ হলো : التَّرِكَةُ।

عِلْمُ الْمِيرَاثِ বা উত্তরাধিকার শাস্ত্র (যাকে عِلْمُ الفَرَائِضِ বা ফারায়েজ শাস্ত্রও বলা হয়) ফিকহশাস্ত্র ও হিসাব-নিকাশের এমন কিছু মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের নাম যার সাহায্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে হকদারদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে জানা যায়।[৩]

## إِرْثٌ (উত্তরাধিকার) এর পারিভাষিক অর্থ

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের কাজী আফজালুদ্দীন আল-খাওয়ানজী প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো, উত্তরাধিকার বন্টনযোগ্য এমন একটি হক, যা কোনো জিনিসের মালিকানা স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুর পর আত্মীয়তা বা অন্য কোনো কারণে প্রাপকগণ পেয়ে থাকেন।[৪]

## উত্তরাধিকারের গুরুত্ব

দীনের রুকনসমূহের (أَرْكَان) ব্যাপারে জ্ঞানলাভের পর ফারায়েজশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জ্ঞান অর্জন ও তা শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স. উৎসাহিত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন :

---

১. আল-কামূস আল-মুহীত, খ. ১, পৃ. ১৬৭।
২. আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৬; হাশিয়াতুল-বাকারী, পৃ. ১০।
৩. আদদুররুল-মুখতার ও হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৯৯; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৫৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ২; আল আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৬২।
৪. আল আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৬; হাশিয়াতুল-বাকারী, পৃ. ১০।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِل بَيْنَهُمَا

"তোমরা নিজেরা কুরআন শিখো এবং অন্যদের তা শিক্ষা দাও। ফারায়েজ শিখো এবং অন্যদেরকেও তা শিক্ষা দাও। কারণ, অচিরেই আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। আর আমার (মৃত্যুর) পর এ জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে। অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, ফারায়েজের কোনো ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে বিবাদ হলে তা মীমাংসার জন্য তারা কোনো লোক পাবে না।[৫]

সাহাবায়ে কেরাম যখন কোথায়ও একত্রিত হতেন তাদের অধিকাংশ আলোচনাই হত ইলমে ফারায়েজ বা ফারায়েজশাস্ত্র সম্পর্কে। আর এজন্য তারা প্রশংসিত হয়েছেন।

## ফিকহ্ শাস্ত্রের সাথে إِرْثٌ বা উত্তরাধিকার শাস্ত্রের সম্পর্ক

বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আলোচনাকালে তাদের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়কে কিতাবুল ফারায়েজ তথা ফারায়েজ অধ্যায় নামে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন।[৬] কোনো কোনো ফিকহবিদ ফিকহ-এর গ্রন্থ থেকে আলাদা করে 'ফারায়েজশাস্ত্র' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকে ফিকহী মাসআলা বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ণের সূচনাকাল থেকেই এ ধারারও সূচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের দিকে যারা ফারায়েজশাস্ত্র সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে ইবনে শুবরুমা, ইবনে আবী লায়লা ও আবু সাওর উল্লেখযোগ্য।

উক্ত দুই শতকে রচিত ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থসমূহে ফারায়েজ সম্পর্কিত কোনো আলোচনা ছিল না । এর উদাহরণ হিসেবে ইমাম সাহনূনের আল মুদাউওয়ানাহ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের আল-জামে আল-কাবীর ও আল-জামে' আস-সাগীর এবং ইমাম শাফেয়ীর 'আল-উম্ম' উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু হাদীস গ্রন্থসমূহের অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে সাধারণ ফিকহী বিধি-বিধানের সাথে ফারায়েজের বিধি-বিধানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন : ইমাম মালেকের মুয়াত্তা, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

---

৫. হাদীসটি হাকেম, (খ. ৪, পৃ. ৩৩৩, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল উসমানিয়্যা) ও তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৬, পৃ. ২৬৫; আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা সম্পা. বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী র.. বলেন : হাদীসটিতে বিভ্রান্তি আছে।

৬. আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ২; প্রকাশক, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৬৫; আর-রিয়াদ সম্পা..।

www.amarboi.org

চতুর্থ শতকের পূর্বে ফিকহ গ্রন্থসমূহে ফারায়েজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত হওয়া শুরু হয়নি। যেমন ইবনে যায়েদ মালেকীর 'রিসালাহ' এবং হানাফীদের মুখতাসার আল-কুদূরী। অতঃপর এ ধারা অব্যাহত থাকে।

**উত্তরাধিকার শরীয়তসম্মত হওয়ার দলীল**

উত্তরাধিকারের বিধান কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মাজীদ থেকে এর প্রমাণ হলো উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত। সুন্নাহ থেকে এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ স.-এর কয়েকটি হাদীস। যেমন নবী স. বলেছেন–

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

'প্রাপকদেরকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে দাও। (তাদের অংশ দেয়ার পর) যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটাত্মীয় পুরুষ (অর্থাৎ আসাবাদের জন্য)।[৭] আর নানীর উত্তরাধিকারিত্বের প্রমাণ হচ্ছে : হযরত মুগীরা রা. ও হযরত ইবনে সালামা রা.-এর হযরত উমর রা. র সামনে এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, নবী স. নানীকে উত্তরাধিকারী হিসেবে অংশীদার করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই।[৮]

এরপর থাকে উম্মতের ইজমা। যেমন : দাদীর ওয়ারিস হওয়ার বিষয়। এটি হযরত উমর রা.-এর ইজতিহাদ দ্বারা প্রমাণিত এবং সাধারণভাবে ইজমা'র অন্ত র্ভুক্ত। এতে কিয়াসের কোনো দখল নেই।

**উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধানের ধারাবাহিকতা**

জাহেলী যুগে উত্তরাধিকারের ভিত্তি ছিল দু'টি : বংশ ও কারণ।

বংশের ভিত্তিতে নারী ও শিশু উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করত না। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র তারাই উত্তরাধিকারী হতো যারা যুদ্ধ করতে এবং গনীমতের মাল আহরণ করতে পারত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের প্রমুখ থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি নাযিল করেন : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ থেকে وَالْمُسْتَضْعَفِينَ الْوِلْدَانِ مِنَ পর্যন্ত। 'লোকেরা তোমার কাছে মহিলাদের বিষয়ে ফতোয়া চায়। তুমি বলে

---

৭. বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ১২, পৃ. ১১; সালাফিয়্যা সম্পা.., মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২৩৩; সম্পা. ঈসা আল-হালাবী।

৮. সুনান আবূ দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৮১, আল-মাতবাআতুল আনসারিয়্যা দিল্লী, সম্পা..। সুনান আত-তিরমিযী, খ. ৬, পৃ. ২৭৭-২৭৮, তুহফাতুল আহওয়াযী, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা। ইবনে হাজার প্রমুখ হাদীসটিকে সনদ ছিন্নতার কারণে মা'লূল বলেছেন। আত-তালখীসুল হুবায়ের, খ. ৩, পৃ. ৮২; মুদ্রিত শিরকাতু আত-তাবাআল ফান্নিয়া আল-মুত্তাহিদাহ কায়রো ও হাশিয়া ইবন আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৯৯, আল আমীরিয়্যা ৩য় সম্পা..।



www.amarboi.org

দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন যে ...........।[৯] এবং দুর্বল সন্তানদের বিষয়ে পর্যন্ত .......... নাযিল হয়। আল্লাহ আরো নাযিল করেন : يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান'।[১০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পরও বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাহেলী যুগের রীতি-নীতি চালু ছিল। পরে ঐ সব রীতি-নীতি বাতিল করে তাদেরকে শরয়ী বিধি-বিধান প্রদান করা হয়।

ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আতা রহ. -কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ ব্যাপারটি অবহিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে বিয়ে, তালাক কিংবা উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি-নীতির ওপরই জীবনযাপন করতে অনুমতি দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, এটাই আমরা জেনেছি।[১১]

সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালত দান করার পর কোনো বিষয়ে আদেশ-নিষেধ না আসা পর্যন্ত মানুষ পূর্ব থেকে প্রচলিত জাহেলী যুগের রীতি-নীতি অনুসারেই জীবনযাপন করত এবং সে সব রীতি-নীতিই তাদের মধ্যে চালু থাকত।

যে সব কারণ উত্তরাধিকার বণ্টনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করত তা ছিল মূলত দু'টি। এর একটি ছিল চুক্তি এবং অপরটি ছিল কাউকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করা। ইসলামের আগমনের পরও কিছুদিন যাবত এ নিয়মই বিদ্যমান ছিল। পরে তা রহিত করা হয়। এ কারণে কিছু সংখক লোক বলে যে, কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশে তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের বিষয় মীমাংসা হতো। পরে তা রহিত হয়। আয়াতটি হলো : وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ 'আর যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ তাদের অংশ দিয়ে দাও'।[১২] এ আয়াত সম্পর্কে শায়বান র. কাতাদার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, জাহেলী যুগে এক

৯. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২৭।

১০. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১।

১১. আল-জাসসাস, খ. ১১, পৃ. ৯০।

১২. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৩। عَقَدَتْ আসেম, হামযা ও কিসাঈ-এর কিরাআত। কিন্তু সাত কারীর মধ্যে অবশিষ্ট চার জনের কিয়াআতে عاقدت পড়া হয়েছে। দ্র. আল-জাসসাস, খ. ২, পৃ. ৯০-৯১; মুদ্রণ, আল-বাহিয়্যা।

www.amarboi.org

ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে এ কথা বলে চুক্তি করত যে, আমার রক্ত যেন তোমার রক্ত এবং আমার সম্মানহানি যেন তোমার সম্মানহানী। আমি তোমার উত্তরাধিকারী হবো। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে। আর আমার প্রয়োজনে তুমি ও তোমার প্রয়োজনে আমি। এভাবে তারা ইসলামী যুগেও পরস্পরের পরিত্যক্ত মোট সম্পদের এক ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হতো। এ অংশ প্রদানের পর অন্য উত্তরাধিকারীরা অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তাদের প্রাপ্য লাভ করত। এরপর এ নিয়ম রহিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ

'এবং রক্ত সম্পর্কের অধিকারীরা একে অপরের অধিক নিকটবর্তী'।[১৩]

**পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকার এবং তার ক্রমবিন্যাস**

إِرْثٌ (উত্তরাধিকার) শব্দের আভিধানিক অর্থসমূহের একটি হচ্ছে التَّرِكَةُ (পরিত্যক্ত সম্পদ)।[১৪] সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের পরিভাষায় মৃত ব্যক্তি যে সম্পদ ও অধিকার রেখে যায় তাই হচ্ছে উত্তরাধিকার। হানাফীদের মতে মৃতের রেখে যাওয়া এমন সম্পদ যার মধ্যে অন্য কারো কোনো রকম অধিকার নেই। তাই হানাফীদের দৃষ্টিতে নীতি ও বিধান হলো, কেবল এমন সব অধিকারে উত্তরাধিকারিত্ব প্রযোজ্য, যা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বা সম্পদ বলে বিবেচিত।

অবশ্য ভ্রমজনিত হত্যা কিংবা ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে আপসের ভিত্তিতে প্রদেয় রক্তপণ (দিয়াত) কিংবা নিহতের কোনো অভিভাবকের ক্ষমার কারণে কিসাসের পরিবর্তে যে অর্থ প্রদান ওয়াজিব হয়ে যায় তা সর্বসম্মতভাবে মীরাসী সম্পদের অন্ত ভুক্ত হবে এবং তা থেকে মৃতের ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করা হবে।[১৫]

মালেকী ও শাফেয়ী মযহাবমতে এবং হানাফীদের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতমতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ হতে সর্বপ্রথম তার ঋণ পরিশোধ করা হবে, যে ঋণ নগদ অর্থের সাথে সম্পৃক্ত এবং যা মৃত্যুর পূর্বে করা হয়েছে। যেমন বন্ধকী সম্পদ। কেননা মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় ঐ বস্তুতে অধিকার বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না যাতে অন্যের অধিকার সম্পৃক্ত হয়েছে। সেহেতু তার মৃত্যুর পর তাতে তার কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে না।

যদি পরিত্যক্ত সম্পদের পুরোটাই ঋণের বিনিময়ে বন্ধক রাখা থাকে তাহলে ঋণ পরিশোধ না করে তার কাফন-দাফন করা যাবে না অথবা ঋণ পরিশোধের পর

---

১৩. সূরা আহযাব, আয়াত : ৬ ও পূর্বোক্ত সূত্র

১৪. আল-কামূস

১৫. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৩; আশ-শারহুল-কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৫৭।

www.amarboi.org

অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তার কাফন-দাফন হবে। ঋণ পরিশোধের পর যদি তার পরিত্যক্ত সম্পদের কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তাহলে জীবিত অবস্থায় যাদের ওপর তার ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তাতো তাদের ওপর তার কাফন-দাফনের দায়িত্বও বর্তাবে।[১৬]

হাম্বলী মাযহাব ও হানাফীদের অনুল্লেখযোগ্য একটি বর্ণনা অনুসারে কেউ মারা গেলে অন্য কাজের পূর্বে সর্বপ্রথম তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যেমন দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির ভরণপোষণের বিষয়টিকে তার ঋণ পরিশোধের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।[১৭]

তবে কাফন-দাফনের পরে পরিশোধযোগ্য ঋণের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীদের মতে, ঋণ বান্দার হলে কাফন-দাফনের পর অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করতে হবে। তবে পুরোপুরি পরিশোধ করা সম্ভব না হলে এবং ঋণদাতা একজন হলে অবশিষ্ট অর্থের সবটাই তাকে প্রদান করা হবে। এরপরও যদি মৃতের কাছে তার আরো ঋণ অবশিষ্ট থাকে তাহলে সে ইচ্ছা করলে তা ক্ষমা করে দেবে কিংবা কিয়ামত দিবসের জন্য রেখে দেবে।

আর যদি ঋণদাতার সংখ্যা একাধিক হয় এবং পুরো ঋণ মৃতের অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার সুস্থতাকালের হয়, যা প্রমাণ বা স্বীকৃতির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে থাকে কিংবা সবার ঋণই রোগভোগকালের হয় এবং তা প্রমাণ বা স্বীকৃতির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রত্যেক ঋণদাতার নিজ নিজ ঋণের পরিমাণ ও অনুপাত অনুসারে অবশিষ্ট সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

যদি গৃহীত ঋণ সুস্থতাকালীন ও রোগ ভোগকালীন এই উভয়বিধ হয়ে থাকে তাহলে পরিশোধের জন্য সুস্থতাকালে গৃহীত ঋণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা ঋণ হিসেবে সেটিই শক্তিশালী। কারণ রোগভোগকালে সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিকাংশ দান না করার ব্যাপারে তার ওপর বাধ্যবাধকতা আছে। এমতাবস্থায় তার স্বীকৃতির মধ্যেও এক ধরণের দুর্বলতা আছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

যদি মৃত ব্যক্তি রোগভোগকালে এমন কোনো ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতি দান করে যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা সম্ভব, যেমন এমন কোনো মালের পরিবর্তে তার ওপর ঋণ বর্তেছে যে মাল তার মালিকানাভুক্ত হয়েছে অথবা যা সে ব্যয় করেছে সে ক্ষেত্রে উক্ত ঋণ সুস্থতাকালীন ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ তার স্বীকৃতি ছাড়াই তা প্রমাণিত। সুতরাং তা সুস্থাতাকালীন ঋণের সমপর্যায়ভুক্ত হবে।

---

১৬. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩, ৪৮৩; শারহুস সিরাজিয়্যা, পৃ. ৪; আশ-শারহুল-কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৫৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৭।

১৭. আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৩, সম্পা. মুস্তাফা আল-হালাবী।

www.amarboi.org

আর ঋণ যদি আল্লাহ্ তাআলার হক হয়, যেমন : রোযা, নামায, যাকাত, ফরয হজ, নযর ও কাফফারা এবং মৃত ব্যক্তি যদি তা আদায়ের জন্য ওসিয়ত করে যায় তাহলে বান্দার ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের একতৃতীয়াংশ দ্বারা তার ওসিয়ত পূরণ করা অত্যাবশ্যক। তবে ওসিয়ত না করে মারা গেলে তা জরুরী বলে গণ্য হবে না।[১৮]

মালেকীদের মতে মানুষের কাছে মৃত ব্যক্তির যে ঋণ আছে তার জামানত থাক বা না থাক এবং তা নগদ পরিশোধের ঋণ হোক বা মেয়াদী, কাফন-দাফনের পরে প্রথমে তা পরিশোধ করতে হবে। কেননা মেয়াদি ঋণের ধার্যকাল মৃত্যুর পর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এরপর সে জামরাতুল আকাবায় রমী (পাথর নিক্ষেপ) করার পর মৃত্যুবরণ করলে তামাত্তু হজের হাদী বা কুরবাণী আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে সে ওসিয়ত করে থাকুক বা না থাকুক। এরপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে, যা আদায়ে সে গাফলতি করেছে। তা ছাড়া অন্যান্য কাফফারাসমূহ আদায় করতে হবে, যা আদায়ে ত্রুটি রয়ে গেছে। যেমন : কসম, রোযা, জিহার এবং হত্যার কাফফারা যদি সে সুস্থাবস্থায় এর দায় স্বীকার করে স্বাক্ষী রেখে থাকে। সে ক্ষেত্রে ওসিয়ত করে থাক বা না থাক সবই তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করা হবে। কেননা মালেকীদের এটা সিদ্ধান্ত যে, কারো কাছে আল্লাহ্র কোনো অধিকার থাকলে এবং সুস্থাবস্থায় সে তার স্বাক্ষীও রেখে গেলে সে ক্ষেত্রে সে ওসিয়ত করে থাকুক বা না থাকুক তার পরিত্যক্ত গোটা সম্পদ থেকে তা আদায় করা হবে। তবে যদি ওসিয়ত করে থাকে; কিন্তু সাক্ষী না রেখে থাকে তাহলে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তা আদায় করা হবে। আর যে সব কাফফারার সাক্ষী রেখে গিয়েছে মালেকীদের মতে তা উক্ত সম্পদের যাকাতস্বরূপ, যা আদায় করার সময় হয়ে গিয়েছে এবং সে তার জন্য ওসিয়তও করে গেছে। অনুরূপভাবে গবাদি পশুর যাকাতও যা আদায়ের সময় সমুপস্থিত; কিন্তু তা সংগ্রহকারী নেই এবং যাকাত হিসেবে যে বয়সের পশু দিতে হবে তেমন পশুও নেই। আর যদি অনুরূপ বয়সের পশু বিদ্যমান থাকে তাহলে তা হবে এমন ঋণ সদৃশ, যা কোনো অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং তা মৃতের কাফন-দাফনের পূর্বেই আদায় করতে হবে।[১৯]

শাফেয়ীদের মতে হক আল্লাহর হোক বা বান্দার এবং ওসিয়ত করে থাক বা না থাক মৃতের দায়িত্বে যে ঋণ আছে তা তার কাফন-দাফনের পরে অবশিষ্ট সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে হবে। কারণ তা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে আল্লাহর হক যেমন

---

১৮. শারহুস সিরাজিয়্যা, পৃ. ৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, সম্পা. মুস্তাফা আল-হালাবী।

১৯. হাশিয়াতুদ-দাসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪০৮; মুদ্রিত, দারুল ফিকর।

www.amarboi.org

: যাকাত ইত্যাদী বান্দার হকের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে। এ নীতি প্রযোজ্য হবে সম্পদ ধ্বংস হয়ে থাকলে। আর সম্পদ যদি অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তার সাথে যাকাতের অধিকারও সম্পৃক্ত হবে এবং সে কারণে কাফন-দাফনের পূর্বেই তা পরিশোধ করত হবে। যেমনটি মালেকীদের অভিমত। আর ঋণের সংশ্লিষ্টতা যদি নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর সাথে হয় তাহলে তা কাফন-দাফনের পূর্বেই পরিশোধিত হতে হবে।[২০] যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

হাম্বলীদের মতে, কাফন-দাফনের পরে বন্ধকী দায় পরিশোধ করতে হবে। এর পরও বন্ধক গ্রহীতার কোনো ঋণ অনাদায়ী থাকলে তা অন্য ঋণদাতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে সে তাদের সমপর্যায়ভুক্ত। আর যদি বন্ধকী মালের মূল্য পরিশোধের পর কিছু বেঁচে থাকে তাহলে তা অবশিষ্ট মালের সাথে মিলিয়ে পাওনাদারদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এরপর মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে যে সব ঋণ প্রমাণিত কিন্তু নগদ অর্থ কড়ির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তা পরিশোধ করতে হবে। মৃতের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পদের সাথেই ঋণদাতাদের প্রাপ্যতার অধিকার সম্পৃক্ত; তা আল্লাহর ঋণও হতে পারে যেমন : যাকাত, কাফফারা, ফরজ হজ, আবার বান্দার ঋণও হতে পারে যেমন : করয, মূল্য ও পারিশ্রমিক। ঋণের পরিমাণ যদি পরিত্যক্ত সম্পদ অপেক্ষা অধিক হয় এবং আল্লাহর ঋণ ও বান্দার ঋণ পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ সম্ভব না হয় তাহলে ঋণ আল্লাহর হোক বা বান্দার হোক অথবা উভয়ের হোক প্রত্যেকের ঋণের অনুপাত অনুসারে তা প্রদান করা হবে, যেমন দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। ঋণসহ তিনটি হক আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) নয় এমন লোকদের অনুকূলে কৃত ওসিয়ত কার্যকর করতে হবে। কোনো উত্তরাধিকারীর অনুকূলে ওসিয়ত করে থাকলে অন্য উত্তরাধিকারী যাদের অনুকূলে ওসিয়ত করা হয়নি তাদের সম্মতি অবশ্যই নিতে হবে। আর যদি ওসিয়ত উত্তরাধিকারী নয় এমন লোকদের অনুকূলে করা হয়ে থাকে তাহলে ওসিয়তের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক অংশের কার্যকারিতা প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর সম্মতির ওপর নির্ভর করবে।[২১]

ফিক্‌হবিদদের ইজমা হচ্ছে, ঋণ ওসিয়তের ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কারণ, হযরত আলী রা. বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন যে, ঋণ ওসিয়তের পূর্বে পরিশোধ করতে হবে। আর এ কারণেও যে,

---

২০. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৮৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

২১. আল-আযবুল ফায়েদ শারহু উমদাতুল ফারেদ, খ. ১, পৃ. ১৩।

www.amarboi.org

ঋণের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অধিক হওয়ায় তা অগ্রগণ্যতা লাভ করবে। যেমন প্রথমে তার কাফন-দাফনের জন্য ব্যয় করতে হয় তারপর তার ওসিয়ত কার্যকর করতে হবে।

কুরআন মাজীদের আয়াত– مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ 'তোমরা যে ওসিয়ত করো তার বাস্তবায়ন অথবা ঋণ পরিশোধের পর'[২২] এখানে ঋণের উল্লেখের পূর্বে ওসিয়তের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, ওসিয়ত কোনো বিনিময় ছাড়াই প্রদান করা হয়। এদিক থেকে তা মীরাস বা উত্তরাধিকারেরই মতো। সুতরাং উত্তরাধিকারীদের পক্ষে তা প্রদান করা কষ্টদায়ক এবং সে কারণেই এক্ষেত্রে মনের সংকীর্ণতা কাজ করে। পক্ষান্তরে ঋণ পরিশোধের প্রতি মানসিক ঝোঁক সব সময়ই থাকে। তাই ওসিয়তের বিষয়টি প্রথমে উল্লেখ করে তা বাস্তবায়নে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, ওসিয়তের বাস্তবায়ন ঋণ পরিশোধের মতই ওয়াজিব এবং তা সত্বর করা উচিত। এ উদ্দেশ্যেই وَصِيَّةٍ ও دَيْنٍ শব্দ দু'টির মাঝখানে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা এ দুটি বিষয়ের সমান হওয়া নির্দেশ করে। তা ছাড়া ওসিয়ত যদি শুধুমাত্র স্বেচ্ছাকৃত দান হয়ে থাকে এবং মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা তার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব না হয় তাহলে ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকে যে ওসিয়ত বাস্তবায়নের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে তা আপনা থেকেই সুস্পষ্ট। কারণ, ঋণ পরিশোধ ব্যক্তির জন্য ফরয। জীবদ্দশায় তা আদায় করতে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়। অথচ ওসিয়ত নফলের পর্যায়ভুক্ত। আর এটাতো সুস্পষ্ট যে, ফরয নফল অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[২৩]

কাফন-দাফন ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা ওসিয়ত বাস্তবায়ন করতে হবে। হানাফী মাযহাবের খাহারযাদা ছাড়া এটা চার মাযহাবেরই সিদ্ধান্ত। মূল সম্পদের থেকে নয় কারণ। কাফন-দাফন ও ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত যে বক্তব্য ওপরে বর্ণিত হয়েছে তা মৃতের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এখন যে মাল অবশিষ্ট আছে তাই মূলত তার পরিত্যক্ত সম্পদ এবং ওসিয়তের জন্য এ সম্পদেরই এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ের এখতিয়ার তার ছিল। তা ছাড়া অনেক সময় মূল মালের এক তৃতীয়াংশ তার অবশিষ্ট সম্পদ এর পুরোটারই সমান বা তা থেকে বেশি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ওসিয়ত বাস্তবায়ন করলে ওয়ারিশগণ বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর এটাই সঠিক। এ বিধান কার্যকর হবে ওসিয়ত সাধারণভাবে করা হোক বা কোনো নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে করা হোক-সব ক্ষেত্রে।

---

২২. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১।
২৩. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৪-৫।

www.amarboi.org

হানাফী মাযহাবের শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা বলেন : ওসিয়ত নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে হলে তা উত্তরাধিকারের ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। আর নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে না হয়ে সাধারণভাবে হলে যেমন এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের জন্য হলে তা মিরাস বা উত্তরাধিকারের সমার্থক বলে গণ্য হবে। কারণ এ ওসিয়ত পরিত্যক্ত সম্পদের পুরোটার সাথেই সম্পর্কিত। সুতরাং যে ব্যক্তির অনুকূলে ওসিয়ত করা হয়েছে সে সমস্ত উত্তরাধিকারির সাথে পরিত্যক্ত সম্পদে অংশীদার। তাই সে উত্তরাধিকারীদের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে না। মৃতের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পদে ওয়ারিশদের অধিকারের মত ওসিয়তের অধিকার পরিব্যাপ্ত থাকার প্রমাণ এই যে, ওসিয়ত করার পর সম্পদ বৃদ্ধি পেলে উভয়ের (উত্তরাধিকারী ও যার অনুকূলে ওসিয়ত করা হয়েছে) হকও পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং হ্রাস পেলে উভয়ের হকের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তাই ওসিয়তকালে মৃতের সম্পদ যদি এক হাজার থেকে থাকে এবং পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার হয় তাহলে ওসিয়ত মূলে প্রাপকও দুই হাজারের এক তৃতীয়াংশের হকদার হবে। অন্যথায় এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে।[২৪]

কাফন-দাফন, ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত পূরণ করার পর মৃতের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট মাল আল্লাহর কিতাব থেকে প্রমাণিত ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে যাদের উল্লেখ আছে। অথবা যাদের ওয়ারিশ হওয়ার বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত থেকে প্রমাণিত। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- أَطْعِمُوا الْجَدَّاتِ السُّدُسَ 'দাদী-নানীদেরকে এক ষষ্ঠাংশ দাও'। অথবা যাদের ওয়ারিশ হওয়ার বিষয় ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন : দাদা, পৌত্র ও পৌত্রী এবং অন্য আরো যে সব ওয়ারিশেদের উত্তরাধিকার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।[২৫]

## উত্তরাধিকারের রুকনসমূহ

রুকন (الرُّكْنُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসের মজবুত প্রান্ত। এর পারিভাষিক অর্থ হলো কোনো বস্তুর স্বকীয় ও অপরিহার্য মূল্যমানের অংশ। এ কথা

---

২৪. আস-সিরাজিয়্যাহ, পৃ. ৬-৭; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৬১৮; হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৭; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৫।

২৫. প্রাগুক্ত। اطعموا الجدات السدس হাদীসটি আল-জুরজানী তার শারহু-সিরাজিয়্যাহ গ্রন্থে (পৃ. ৭; সম্পা. মুস্তাফা হালাবী) উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মুয়াত্তা মালেক, মুসনাদে আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়ে হযরত মুগীরা ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির মূল পাঠ হচ্ছে : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس (আমার উপস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করলেন)। ইবনে হিব্বান ও হাকেম এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, নাসবুর রায়াহ, খ. ৪, পৃ. ৪২৮।

www.amarboi.org

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার (إِرْثٌ) বলতে প্রাপ্যতা বুঝায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে إِرْثٌ এর তিনটি রুকন। এ তিনটি রুকনের সবগুলো এক সাথে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কোনো একটি রুকনও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর হবে না।

**প্রথম রুকন :** সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণকারী অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি অথবা মৃত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তি।

**দ্বিতীয় রুকন :** ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী যারা মৃত বা মৃত বলে গণ্য ব্যক্তির পরে জীবিত আছে এবং জীবিত হিসেবে যাদেরকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।

**তৃতীয় রুকন :** পরিত্যক্ত সম্পদ। এর দ্বারা শুধু মাল বুঝায় না; বরং মাল ও অন্যান্য সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত।[২৬]

এতএব, কেউ যদি ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী রেখে মৃত্যুবরণ করে; কিন্তু তার কোনো মাল-সম্পদ না থাকে তাহলে উত্তরাধিকারিত্ব-এর প্রশ্ন আসবে না।[২৭] অনুরূপভাবে যে মৃত্যুবরণ করে আর তার কোনো ওয়ারিশ থাকে না সেক্ষেত্রেও إِرْثٌ তথা উত্তরাধিকারের কোনো প্রশ্ন নেই। যারা বায়তুল মালকে ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য করেন না এটা তাদের মত। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

## উত্তরাধিকারের শর্তাবলি

الشَّرْطُ (শর্ত) এর আভিধানিক অর্থ হলো 'আলামত' বা চিহ্ন। পরিভাষায় শর্ত বলা হয় এমন বিষয়কে, যার অবর্তমানে সংশ্লিষ্ট বস্তুরও অস্তিত্বহীনতা অনিবার্য হয়ে যায়; কিন্তু তার বর্তমানে এর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী নয়। এটা তার মূল সত্তার অন্তর্গত নয়।

## উত্তরাধিকারিত্বের তিনটি শর্ত

**প্রথম শর্ত :** উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর প্রমাণ অথবা বাস্তবে তার ওপর মৃত ব্যক্তির হুকুম জারি করা হয়েছে। যেমন : নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিচারক যখন তাকে মৃত হিসেবে ঘোষণা করে। অথবা অনুমানভিত্তিক, যেমনটি গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি গর্ভবতী নারীকে মারপিট করার ফলে তার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায় যার ফলে জরিমানা দিতে হয়।

**দ্বিতীয় শর্ত :** উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর জীবিত থাকার প্রমাণ অথবা বাস্তবে তাকে জীবিত হিসেবে গণ্য করা। যেমন : গর্ভস্থ

---

২৬. আল-কামূস, আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৬

২৭. ইবন আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৮২; প্রথম মুদ্রণ, বুলাক, আত-তুহফাতুল খাইরিয়া (আশ-শানশুরিয়া) পৃ. ৪৭; সম্পা. আল-হালাবী; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৬, সম্পা. আল-হালাবী।

www.amarboi.org

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এতটা সময় সম্পূর্ণ জীবিত থাকা যাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সে উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর সময় জীবিত ছিল। যার বিস্তারিত বিবরণ গর্ভের উত্তরাধিকার অধ্যায়ে আসছে।

**তৃতীয় শর্ত :** উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠাকারী সম্বন্ধ ও সম্পর্কের বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা। যেমন, স্বামী-স্ত্রী হওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা অথবা দাসমুক্তির পর তার 'ওয়ালা' বা অভিভাককত্ব (সম্পর্কে অবগতি) এবং সম্পর্কের প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট হওয়া, যেমন : পুত্র, পিতা, মা, ভাই, চাচা হওয়া এবং এতটা জানা থাকা, যদ্বারা মৃত ব্যক্তি ও তার ওয়ারিশের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক নিরূপন করা যায়।[২৮]

## উত্তরাধিকারিত্বের কারণসমূহ

السَّبَبُ শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন বিষয় যার সাহায্যে অন্য একটি বিষয়ে উপনীত হওয়া যায়। আর পারিভাষিক অর্থে এমন একটি জিনিস যার বর্তমানে তার নিজের অস্তিত্ব এবং অবর্তমানে অস্তিত্বহীনতা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উত্তরাধিকারিত্বের কারণ চারটি। এর তিনটির বিষয়ে চারজন ইমামই একমত। আর একটি কারণের ব্যাপারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।

ঐকমত্য কারণ তিনটি হলো, বিয়ে, 'ওয়ালা' বা দাসমুক্তির পর অভিভাবকত্ব এবং আত্মীয়তা। হানাফীদের মতে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা। চতুর্থ যে কারণটি বিতর্কিত তা হচ্ছে ইসলাম। এ মতের সমর্থক হলেন মালেকী ও শাফেয়ীগণ। এ কারণটির ফলে উত্তরাধিকার লাভ করে বায়তুল মাল।[২৯]

উল্লিখিত কারণসমূহের প্রত্যেকটি কারণের ফলে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উত্তরাধিকার লাভ করে।[৩০]

## উত্তরাধিকারে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

**প্রতিবন্ধক :** যার বর্তমানে উত্তরাধিকার বাতিল হয়ে যায়।[৩১] চার ইমামের ঐকমত্য ভিত্তিক উত্তরাধিকারে প্রতিবন্ধক হলো, তিনটি : 'রিক্ব' (দাসত্ব), হত্যা ও দীনের ভিন্নতা। আর অন্য তিনটি প্রতিবন্ধক তার ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছেন। সেগুলো হলো : ইরতিদাদ তথা ইসলাম ত্যাগ, দেশের ভিন্নতা ও

---

২৮. ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৮৬, বুলাক সম্পা..; আত-তুহফা, পৃ. ৪৭, সম্পা. আল-হালাবী; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৭-১৮, সম্পা. আল-হালাবী।

২৯. আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৮; আল-মারদীনী, শারহুর রাহাবিয়্যা, পৃ. ১৮; সাবীহ সম্পা..।

৩০. ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৮৬, আমীরিয়্যা মুদ্রিত; আত-তুহফা, পৃ. ৪৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৩১. আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ২৩।

www.amarboi.org

'দাওর হুকমি' অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মৃত ব্যক্তির এমন কোনো আপনজন আছে বলে স্বাক্ষ্য বা স্বীকৃতি দেয়া যার বংশ পরিচয় অজ্ঞাত। শেষোক্ত ব্যক্তির আত্মীয়তার স্বীকৃতির ফলে প্রথমোক্ত উত্তরাধিকারী ব্যক্তি উত্তরাধিকারীত্ব হতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হবে।

মালেকীদের মতে আরো একটি প্রতিবন্ধক হলো, উত্তরাধিকারীর মৃত্যু উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর পরে হওয়ার বিষয়টি অজ্ঞাত হওয়া। শাফেয়ীদের কারো কারো মতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লিআন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে তাও উত্তরাধিকারলাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। সবগুলো প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।[৩২]

## দাসত্ব

চার ইমামের মতেই পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব উত্তরাধিকারলাভের প্রতিবন্ধক। কারণ দাসের সমস্ত সম্পদ তার প্রভুর মালিকানাভুক্ত। আমরা যদি তাকে তার আত্মীয়দের ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য করি তাহলে তার ওয়ারিশসূত্রে লব্ধ অর্থ তার প্রভুর মালিকানাভুক্ত হবে, যা কোনো কারণ বা যুক্তি ছাড়াই কোনো অপরিচিতকে ওয়ারিশ বানানোর নামান্তর। আর এটা ইজমার ভিত্তিতে বাতিল।[৩৩]

## হত্যা

চার ইমামের সর্বসম্মত মতানুসারে যে হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয় তা যদি প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান হত্যাকারী সরাসরি হত্যা করে থাকে তাহলে সে হত্যা উত্তরাধিকারলাভের প্রতিবন্ধক হবে।[৩৪]

কিসাস অনিবার্য করে এরূপ হত্যা বলতে কি বুঝায় সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। অনুরূপভাবে হত্যাকারী শিশু বা পাগল হলে কিংবা সরাসরি হত্যা না করলে অথবা ভুলবশত হত্যা করা হলে সে ক্ষেত্রেও কিসাসের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিন ইমাম (ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদ) এবং হানাফী মাযহাবের ইমাম আব ইউসুফ ও মুহাম্মদ-এর মতে শত্রুতাবশত ইচ্ছাকৃত হত্যার ফলে কিসাস অবধারিত হয়। তা এভাবে হয়, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে মানুষ এবং হত্যা নিষিদ্ধ জেনেও তাকে হত্যা করে।

ইমাম আবু হানীফার মতে, কিসাস অনিবার্যকারী ইচ্ছাকৃত হত্যা তাই, যা অস্ত্রের আঘাতে সংঘটিত হয় কিংবা এমন কিছু দ্বারা ঘটানো হয়, যা অস্ত্রের মতই টুকরো

---

৩২. শারহুর রাহাবিয়্যা, পৃ. ২৩।

৩৩. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৮, সম্পা. আল-হালাবী; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫, সম্পা. আল-হালাবী; আত-তুহফা, পৃ. ৫৭, সম্পা. আল-হালাবী; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ২৩।

৩৪. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৯; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ২৮।

www.amarboi.org

টুকরো করতে সক্ষম। যেমন ধারালো কাষ্ঠখণ্ড অথবা পাথর। হানাফীদের বক্তব্য হলো, কতল শিবহে আমাদ (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ) প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা)ও মিরাস লাভের প্রতিবন্ধক। কতল শিবহে আমাদ এর উদাহরণ হচ্ছে, হত্যাকারী কর্তৃক নিহতকে এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা যাতে সাধারণত মৃত্যু সংঘটিত হয় না। আর এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রে হানাফীদের মতে হত্যাকারীর অভিভাবকের ওপর দিয়াত (রক্তপন) প্রদান করা ওয়াজিব হয় এবং অপরাধী গোনাহকারী সাব্যস্ত হয় ও তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হয়।

'কতল-ই খাতা' এর উদাহরণ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি শিকারকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল; কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোনো মানুষকে বিদ্ধ করল। অথবা নিদ্রিতাবস্থায় পাশ ফিরতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে চাপা দিল, যার কারণে সেই (চাপা পড়া) ব্যক্তি মারা গেল। অথবা কোনো ব্যক্তি কোনো জন্তুর পিঠে সওয়ার থাকাবস্থায় ঐ জন্তুটি কাউকে পদদলিত করল এবং সে মারা গেল। অথবা কোনো ব্যক্তি ছাদ হতে কারো ওপর পতিত হওয়ায় সেই ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল। অথবা কারো হাত থেকে পাথর কোনো ব্যক্তির ওপর পড়লে সে মারা গেল। এ ধরনের হত্যার ঘটনায় কাফফারা এবং অভিভাবকের ওপর দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং এ জন্য তার কোনো গোনাহ হবে না। উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে হত্যাকারী মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে যদি তা অন্যায় হত্যা বলে প্রমাণিত হয়।[৩৫]

হত্যা যদি সরাসরি সংঘটিত না হয়ে কোনো মাধ্যম বা কারণ দ্বারা সংঘটিত হয় যেমন : অন্যের মালিকানাভুক্ত জায়গায় কূপ খনন করা বা পাথর রাখার কারণে উক্ত কূপে বা পাথরের ওপর পড়ে কেউ মারা গেল; কিংবা হত্যাকারী শিশু অথবা পাগল হলে উল্লিখিত অবস্থা সমূহে হত্যাকারী মিরাস তথা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।[৩৬]

হাম্বলী ও মালেকীদের প্রধান মত হলো, ইচ্ছাকৃত হত্যা তা সরাসরি করুক বা তার কারণে হোক যেভাবেই সংঘটিত হোক না কেন হত্যাকারী সম্পদ ও দিয়াতে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি সে শিশু কিংবা পাগল হলেও এবং এমনকি হত্যার ক্ষেত্রে যদি এমন সন্দেহ বিদ্যমান থাকে যার ফলে কিসাস রহিত হয় তবুও। যেমন : পিতা তার সন্তানের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল এবং সন্তান মারা গেল।

মালেকীদের আরো একটি মত হলো, শিশু ও উন্মাদের 'কতলে আমাদ' তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা 'কতলে খাতা তথা ভ্রমবশত হত্যার ন্যায়। সুতরাং সে সম্পদে

---

৩৫. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৮; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৮৬; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ২৯।

৩৬. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৮।

www.amarboi.org

উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু দিয়াতে হবে না। এটিই তাদের গৃহীত মত।[৩৭] কেউ যদি উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তিকে 'কিসাস' অথবা 'হদ্দ' অথবা নিজের আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করে তাহলে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীদের মতে সে 'মিরাস' (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত হবে না।[৩৮]

শাফেয়ীদের মতে, যে কোনোভাবে হত্যার সাথে সংশ্লিষ্টতা উত্তরাধিকার লাভের প্রতিবন্ধক, তা ন্যায়সংগত হত্যা হলেও। যেমন : কিসাস গ্রহণকারী, ইমাম ও কাজী এবং ইমাম ও কাজীর নির্দেশ পালনকারী জল্লাদ, সাক্ষী, তাযকিয়া (প্রত্যয়ন) কারী। এরা সবাই 'মিরাস' (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত হবে। হত্যাকারী হত্যার উদ্দেশ্য ছাড়া হত্যা করলেও মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন : ঘুমন্ত ব্যক্তি, পাগল ও শিশু কর্তৃক হত্যা। আর যদি কোনো ভালো উদ্দেশ্যে এরূপ কাজ করে থাকে, যেমন : পিতা সন্তানকে আদব শিক্ষাদানের জন্য প্রহার করে অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আহত স্থান খুলে দেয় এবং এর ফলে সে মারা যায়। তবে শাফেয়ীদের মতে নিহত ব্যক্তি যদি বলে যায় যে, তাকে ওয়ারিশ হিসেবে গ্রহণ করবে তাহলে সেটি ওসিয়ত বলে গণ্য হবে।

যদি দুই ব্যক্তি যারা একে অপরের ওয়ারিশ ওপর থেকে নীচে পড়ে এবং একজন আরেকজনের ওপরে থাকে আর নীচের জন মারা যায় তাহলে ওপরের জন তার ওয়ারিশ হবে না। কারণ সেই তার হত্যাকারী। আর যদি ওপরের জন মারা যায় তাহলে নীচের জন তার ওয়ারিশ হবে, কেননা সে তার হত্যাকারী নয়।[৩৯]

হানাফীদের মতে, কারণজনিত হত্যার কারণে কেউ মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। তার অনকূলে দলীল এই যে, কারণজনিত হত্যাকারী প্রকৃতপক্ষে হত্যাকারী নয়। কারণ সে যদি তার মালিকানাভুক্ত কোনো ভূমিতে কূপ খনন করত এবং তার মু'রিস (উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তি) তাতে পড়ে মারা যেতো তাহলে সে জন্য তাকে কোনো জবাবদিহি করতে হতো না। অথচ হত্যাকারীকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় তা সে নিজের মালিকানাভুক্ত কোনো জায়গায় করুক বা অন্য কোনো লোকের মালিকানাভুক্ত জায়গায় করুক। যেমন তীর নিক্ষেপকারী। তাছাড়া হত্যাকাণ্ড নিহত ব্যক্তি ছাড়া পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। কিন্তু কারণজনিত হত্যার ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। কারণ, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কূপের সম্পৃক্ততা ছিল ভূমির সাথে কোনো জীবিতের সাথে নয়। আর কূপ খননকালে খননকারীকে হত্যাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়

---

৩৭. হাশিয়াতুদ দাসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৮৬

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. আত-তুহফাতুল খায়রিয়্যা, পৃ. ৫৬।

www.amarboi.org

না। কেননা, যে সময় কেউ ঐ কূপে পতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করছে তখন হয়তো কূপ খননকারী জীবিতই নেই। আর যেহেতু সে প্রকৃতপক্ষে হত্যাকারী নয় সেহেতু হত্যার শাস্তি মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া বা কাফফারা তার প্রতি আরোপ করা যাবে না। আর শিশু ও পাগল ব্যক্তি হত্যার কারণে মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা যে হত্যা নিষিদ্ধ তার প্রতিদান হচ্ছে মিরাস থেকে বঞ্চনা। অথচ শিশু ও পাগলের কাজ এমন নয় যে, তা শরীয়তের বিধান মোতাবেক নিষিদ্ধ ও হারাম বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ, শরীয়তের বিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তা ছাড়া 'মিরাস' থেকে বঞ্চিত করা হয় সতর্কতার ব্যাপারে গাফলতি করার কারণে। কিন্তু শিশু ও পাগলের সাথে গাফলতির বিষয় সম্পৃক্ত করার কথা চিন্তাও করা যায়না।[৪০]

শাফেয়ীগণ তাদের মতের সপক্ষে হাদীস থেকে দলীল পেশ করেন। হাদীসটি হলো : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ 'হত্যাকারীর জন্য 'মিরাসে' (উত্তরাধিকারে) কোনো অংশ নেই'। তারা এ হাদীসের ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, হত্যায় যার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে জন্য উত্তরাধিকারে কিছু নেই।

এর কারণ হলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যাকারী কর্তৃক তার মুরিস (উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তি)-কে হত্যা করার মাধ্যমে অবিলম্বে 'মিরাস' লাভের মানসিকতা কার্যকর থাকার সম্ভাবনা থাকে। আর এটা তখনই হবে, যখন সে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে। তাই مَنِ اسْتَعْجَلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ 'যথোপযুক্ত সময় আসার পূর্বেই কেউ কোনো জিনিস পেতে চাইলে তার শাস্তি হচ্ছে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা' এ নীতি অনুসারে যুক্তি ও বিবেকের দাবি হচ্ছে, তাকে 'মিরাস' থেকে বঞ্চিত করা। তার এ তাড়াহুড়া কেবল ধারণা ও বাহ্যিক বিবেচনায়। অবশিষ্ট অন্য সব ক্ষেত্রে হত্যা রোধ করাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা সংঘটিত হয়। যেমন : ঘুমন্ত ব্যক্তি, পাগল ও শিশু কর্তৃক হত্যা।

মুফতি (ফতোয়া দানকারী) ভুল ফতোয়া দিয়ে থাকলেও এবং সেটা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে হলেও হত্যার সাথে সে সংশ্লিষ্ট হবে না। কারণ তার ফতোয়া বাধ্যতামূলক হয় না। অনুরূপভাবে ঘটনা বর্ণনাকারী এবং বদনজর দ্বারা হত্যাকারীও হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না। আর এমন কোনো ব্যক্তিও হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না, যে তার স্ত্রীর জন্য গোশত কিনে আনার পর সাপ তাতে মুখ দেয়ায় স্ত্রী সেই গোশত খেয়ে মারা গেল।

---

৪০. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

www.amarboi.org

কেউ তার 'মুরিস' বা উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করলে এবং সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে (মুরিসকে) বেত্রাঘাত করা হলে অতপর তার ফলে সে মারা গেলে এ বিষয়টি ভেবে দেখার মত। তবে বাহ্যিক বিচারে এটাও উত্তরাধিকার লাভের পথে প্রতিবন্ধক।[৪১]

## দীনের ভিন্নতা

ফকীহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, হাম্বলী ফকীহদের মধ্যে থেকে আবু তালেব সাহাবীদের মধ্যে হযরত আলী রা., যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. এবং অধিকাংশ সাহাবী রা. এর মত হচ্ছে কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না, এমনকি পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টিত হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলেও। কারণ, মুরিসের মৃত্যু হওয়ায় তার উত্তরাধিকারীদের হক তথা প্রাপ্য অধিকার ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক, বৈবাহিক সম্পর্ক হোক বা দাসমুক্তিসূত্রে অভিভাবকত্বের সম্পর্ক হোক কোনো অবস্থাতেই ওয়ারিশ হবে না।

ইমাম আহমদ র.-এর মতে, কাফের যদি পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টিত হওয়ার পূর্বে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সে মুসলমানের ওয়ারিশ হবে। কারণ, নবী স. বলেছেন : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ 'কেউ কোনো উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলে সেটি তার প্রাপ্য'।[৪২] তা ছাড়া এ কারণেও সে ওয়ারিশ হবে যে, ওয়ারিশ বানানোর মাধ্যমে তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে এটাও তার সিদ্ধান্ত যে, কাফের তার আযাদকৃত মুসলমান দাসের ওয়ারিশ হবে।[৪৩]

অধিকাংশ ফকীহর মতে কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের ওয়ারিশ হবে না। হযরত মুআয ইবনে জাবাল, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, হাসান রা., মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ও মাসরূকের মতে মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে।

এ বিষয়ে চার ইমামের দলীল হচ্ছে নবী স. এর হাদীস لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَلٍ شَتَّى 'পরস্পর ভিন্ন ধর্মের (দীন) অনুসারীরা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে না'।[৪৪] অন্য

---

৪১. আত-তুহফা, পৃ. ৫৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৪২. হাদীসটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, খ. ৯, পৃ. ১৩, দায়েরাতুল মাআরিফিল উছমানিয়্যা সম্পা..। সাঈদ ইবনে মনসূর এটি তার সুনান গ্রন্থে (ভারতের আলী প্রেসে মুদ্রিত) হাদীস নং ১৮৯ এ বর্ণনা করেছেন।

৪৩. আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৩১

www.amarboi.org

একটি হাদীস : لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . 'মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না।[৪৫] ও তাদের দলীল। মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে, এমত পোষণকারীদের দলীল হচ্ছে, এ হাদীস : الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى। 'ইসলাম সবার ওপরে তথা বিজয়ী হবে, তার ওপরে উঠা তথা তাকে বিজিত করা যাবে না'। আর উপরে থাকা তথা বিজয়ী হবার দাবী হলো, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ।[৪৬]

উপর্যুক্ত মতের বিরোধীরা এভাবে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করেন যে, মূল ইসলামই বুলন্দ তথা বিজয়ী হবে। এর অর্থ হলো, ইসলাম যদি এক দিক থেকে মহিমান্বিত হয় এবং অপর একটি দিক থেকে তা না হয়। তবু সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী হবে। অথবা এর অর্থ এই যে, যুক্তি-প্রমাণের দিকে থেকে অথবা প্রভাব ও প্রতিপত্তির দিক থেকে ইসলামই বিজয়ী হবে। শেষ পরিণতিতে মুসলমানদেরকেই সাহায্য করা হবে।[৪৭]

**মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) এর উত্তরাধিকার**

সব মাযহাবের ফকীহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে মুরতাদ অর্থাৎ যে স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করে, সে এমন কারো ওয়ারিশ হবে না যাদের ও তার মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লাভের কোনো কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তারা মুসলমান হোক বা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ যে ধর্ম গ্রহণ করেছে তার অনুসারী হোক। অথবা তৃতীয় অন্য কোনো ধর্মের হোক তাতে এ বিধানের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। কারণ, তাকে এই নতুন ধর্ম মেনে চলতে দেয়া হবে না যা সে গ্রহণ করেছে। আরো এ কারণে যে, এখন সে মৃত হিসেবে পরিগণিত। অনুরূপ মুরতাদ নারীও কারো ওয়ারিশ হবে না। কারণ 'মুরতাদ' সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো, সে যদি পুরুষ হয় তাহলে তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাকে হত্যা করা হবে যদি সে ইসলাম ত্যাগের ক্ষেত্রে অবিচল থাকে। আর যদি সে নারী হয় তাহলে তাকে বন্দি করে রাখা হবে যতদিন না সে তওবা করবে অথবা

---

৪৪. হাদীসটি সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, খ. ৩, পৃ. ৮৫; 'আওনুল-মা'বূদ আনসারিয়া প্রেস, দিল্লী মুদ্রিত; সুনান ইবন মাজা (হাদীস নং ২৭৩১, ঈসা হালাবী সম্পাদিত) এবং মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ১৭৮, ১৯৫, আল মায়মানিয়া সং। বর্ণনাকারী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর।

৪৫. আহমাদ, বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৬. এ হাদীসটি দারাকুতনী, খ. ৩, পৃ. ২৫২, দারুল মাহাসিন; মিসর সং., বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ২০৫, দায়েরাতুল মা'আরিফিল উছমানিয়্যা বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে এটিকে হাসান বলেছেন, খ. ৩, পৃ. ২২০, সালাফিয়্যা সং. ।

৪৭.

www.amarboi.org

মারা যাবে। সুতরাং একথা বলার আদৌ কোনো অর্থ হয় না যে, সে মুসলিম বা অমুসলিম কারো ওয়ারিশ হবে।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, অন্য কেউ তার ওয়ারিশ হবে কিনা ? এ প্রশ্নে মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাব এবং হাম্বলীদের প্রসিদ্ধ মত যার সম্পর্কে কাজী বলেছেন, এটিই হাম্বলীদের বিশুদ্ধ মত-এই যে, মুসলিম বা অমুসলিম যাদের ধর্ম সে গ্রহণ করেছে কেউই মুরতাদ এর ওয়ারিশ হবে না। তার সমস্ত মাল-সম্পদ সে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করুক বা 'মুরতাদ হওয়ার কারণে হত্যা করা হোক গণিমাত সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং বায়তুল মালে জমা হবে।
ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান র.-এর মত এবং ইমাম আহমদ র.-এর অন্য একটি মত এই যে, মুরতাদের মুসলমান ওয়ারিশগণ তার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবে। হযরত আবু বকর, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে মুসায়্যাব, জাবের ইবনে যায়েদ, হাসান, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, শা'বী, ছাওরী, আওযায়ী ও ইবনে শুবরুমা এ মতই পোষণ করেছেন। এ মতের সপক্ষে দলীল হচ্ছে, খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবু বকর রা. ও হযরত আলী রা. এর কর্ম। এর আরেকটি কারণ হলো, কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে সাথে সাথে তার সম্পদ হস্তান্তরিত হয়ে যায়। সুতরাং অবশ্যই তা তার মুসলমান উত্তরাধিকারীদের বরাবর হস্তান্তরিত হবে, যেমনটি মৃত্যুর কারণে হয়ে থাকে।[৪৮]

ইমাম আবু হানীফা র. মুরতাদ নারী ও মুরতাদ পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাই মুরতাদ নারীর মুসলমান আত্মীয়স্বজন তার সমুদয় মাল ও সম্পদের রেখে যাওয়া ব্যক্তির তা সে মুসলমান থাকাবস্থায় উপার্জন করে থাকুক বা মুরতাদ হওয়ার পর, রেখে যাওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে।

পুরুষ মুরতাদের মুসলিম ওয়ারিশগণ তার মুসলিম থাকাবস্থায় উপার্জিত মাল-সম্পদের ওয়ারিশ হবে, কিন্তু মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত মাল-সম্পদের ওয়ারিশ হবে না; বরং তা মুসলমানদের জন্য গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য হবে।[৪৯]

তবে তার মুসলমান ওয়ারিশদের মধ্যে কারা তার ওয়ারিশ হবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। যারা তার মুরতাদ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিল তারাই কি তার ওয়ারিশ হবে, নাকি যারা তার মৃত্যুর সময় হাজির ছিল তারা, নাকি তার দারুল হারবে চলে যাওয়ার সময় যারা উপস্থিত ছিল তারা, নাকি তার মুরতাদ হওয়ার সময় এবং মৃত্যুর সময় যারা হাজির ছিল তারা তার ওয়ারিশ হবে?

---

৪৮. আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৮৬; আত-তুহফা, পৃ. ৬১; আল-আযবুল ফায়েদ, পৃ. ৩৪; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩০০, খ. ৮, পৃ. ১২৮

৪৯. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৭৫

৩২—

www.amarboi.org

এ প্রশ্নে ইমাম আবু হানীফা র. থেকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। হাসানের উদ্ধৃত বর্ণনায় বলা হয়েছে, মুরতাদের ওয়ারিশ হবে সেই, যে তার মুরতাদ হওয়ার সময় ওয়ারিশ ছিল এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত ছিল। এ সময়ের পরে যে তার ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে সে ওয়ারিশ হবে না। অতএব, তার কোনো আত্মীয় যদি তার মুরতাদ হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা মুরতাদ হওয়ার পর মায়ের গর্ভে তার কোনো সন্তান স্থিতি লাভ করে এবং জন্ম নেয় তাহলে এ বর্ণনা অনুসারে সে তার ওয়ারিশ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্বের কারণ তার মুরতাদ হওয়া। সুতরাং মুরতাদ হওয়াকালীন যে বিদ্যমান ছিল না তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর মাধ্যমে অধিকার পরিপূর্ণতা পায়। অতএব, কারণ পূর্ণতালাভ করা পর্যন্ত ওয়ারিশের বর্তমান থাকা শর্ত।

ইমাম আবু হানীফা থেকে ইমাম আবু ইউসুফের উদ্ধৃত বর্ণনায় আছে যে, মুরতাদ হওয়ার সময় ওয়ারিশের বর্তমান থাকাই বিচার্য হবে। মুরতাদের মৃত্যুর পূর্বে তার মৃত্যুর কারণে অধিকার বাতিল হয় না। কারণ, উত্তরাধিকারিত্বের ব্যাপারে মুরতাদ হওয়া মৃত্যুবরণের শামিল। সুতরাং মুরিস বা উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের পূর্বে কোনো ওয়ারিশ মারা গেলে তার অধিকার বাতিল হবে না; বরং তার ওয়ারিশ তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ইমাম আবু হানীফা র. থেকে ইমাম মুহাম্মদ র. কর্তৃক উদ্ধৃত বর্ণনাটি যা সর্বাধিক সঠিক তা এই যে, মৃত্যু অথবা হত্যার সময় তার ওয়ারিশ হওয়ার বিষয়টি বিচার্য। মুরতাদ হওয়ার সময় বর্তমান থাকা অথবা মুরতাদ হওয়ার পর অস্তিত্ব লাভ করা নয়। কেননা, কারণ বিদ্যমান থাকলে তা পূর্ণতালাভ করার পূর্বে অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু কারণের প্রারম্ভকালেই বিদ্যমান বলে ধরে নেয়া হবে। যেমন : হস্ত গত হওয়ার পূর্বে বিক্রীত দ্রব্যের মধ্যে কোনো প্রবৃদ্ধি সাধিত হলে তা বিক্রয় চুক্তিকালেই বিদ্যমান ছিল বলে ধরা হয় এবং হস্তগত করার সময় তাও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করা হয়। আর পরিশোধিত মূল্যের মধ্যে তার জন্যও একটা অংশ থাকে। এ ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

মুরতাদের দারুল হারবে চলে যাওয়াকে ইমাম মুহাম্মদ র. তার মৃত্যু হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই সে 'দারুল হারবে' চলে গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করে দেয়া হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফের মতে বিবেচ্য বিষয় হলো, আদালত (কাজী) যে সময় তার দারুল হারবে চলে যাওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন সেই সময়ে সে তার ওয়ারিশ হবে। আর সে যদি মৃত্যুবরণ করে বা মৃত্যু বরণ করেছে বলে সিদ্ধান্ত হয় এবং তার স্ত্রী ইদ্দত পালনরতা হয় তাহলে সে তার ওয়ারিশ হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের র. মত।

www.amarboi.org

কারণ মুরতাদ হওয়ার ফলে তার ও তার স্ত্রীর মধ্যেকার বিবাহ বন্ধন যদিও রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু সে যেন তার স্ত্রীকে উত্তরাধিকার প্রদান না করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরূপ পলায়ণপর ব্যক্তির স্ত্রী যদি তার মৃত্যুর সময় ইদ্দত পালনরতা থাকে তাহলে উক্ত স্ত্রী তার ওয়ারিশ বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবু হানীফা র. হতে ইমাম আবু ইউসুফ র. কর্তৃক উদ্ধৃত বর্ণনা মোতাবেক তার মৃত্যুর সময় স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে থাকেলও স্ত্রী তার ওয়ারিশ হবে। কেননা, স্বামীর মুরতাদ হওয়ার সময় স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর উত্তরাধিকারিত্বের কারণ বর্তমান ছিল। কারণ, এই বর্ণনার ভিত্তিতে মুরতাদ হওয়ার প্রারম্ভকালে কারণের বিদ্যমানতাই বিচার্য বিষয়।[৫০]

## অমুসলিমদের মধ্যে 'দীন' (ধর্ম)-এর ভিন্নতা

হানাফী মাযহাব মতে, শাফেয়ী মযহাবের অনুসরীদের বিশুদ্ধতর মতে এবং ইমাম আহমদ র.-এর একটি বর্ণনা মতে কাফের (অমুসলিম)গণ একে অন্যের ওয়ারিশ হবে। কারণ, তারা একই জাতি (আর তা হলো, বিধর্মী)। এ কারণে ইহুদীগণ নাসারা (খৃস্টান)দের এবং নাসারা তথা খ্রিস্টানগণ ইহুদীদের ওয়ারিশ হবে। অগ্নিপূজারী ও মূর্তিপূজারীগণ খ্রিস্টান ও ইহুদীদের ওয়ারিশ হবে এবং খ্রিস্টান ও ইহুদীগণও অগ্নিপূজারী ও অন্যান্যদের ওয়ারিশ হবে।

শাফেয়ীদের বিশুদ্ধতম এ মতটির বিপক্ষে একটি বক্তব্য হলো, যেহেতু তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং সে কারণে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। তাই তারা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে না। অর্থাৎ ইহুদীগণ খ্রিস্টানদের এবং খ্রিস্টানগণ ইহুদীদের ওয়ারিশ হবে না।[৫১]

মালেকীদের বলিষ্ঠ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, কুফরী ৩টি জাতিতে বিভক্ত : ইহুদী একটি জাতি, খ্রিস্টান একটি জাতি এবং এ ছাড়া আর যা আছে সব মিলে আর একটি জাতি। এটি ইমাম আহমদ র. এর মত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া কাজী শুরাইহ, আতা, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, জাহহাক, হাকাম, শুরাইক, ইবনে আবী লাইলা, হাসান ইবনে সালেহ এবং ওয়াকী র.-এর মতও এটিই।

মালেকীদের আরো একটি মত আছে এবং সেটিকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা আল-মুদাওওয়ানা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদী ও খ্রিস্টান মূলত একটি জাতি এবং এ দু'টি বাদে আর যা আছে তা সব ভিন্ন ভিন্ন জাতি। মালেকীদের কোনো কোনো গ্রন্থে এ মতটিকেই প্রসিদ্ধ এবং মাযহাবসিদ্ধ মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৫০. আল-মাবসূত, খ. ১০,পৃ. ১০২-১০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, দারুল মা'রিফা লেবানন।
৫১. আশ-শানশূরিয়া ভাষ্যসহ, পৃ. ৬০।

www.amarboi.org

ইবনে আবী লাইলার মতে, ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ একে অপরের ওয়ারিশ হবে। অগ্নিপূজকরা তাদের ওয়ারিশ হবে না এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানগণও অগ্নিপূজকদের ওয়ারিশ হবে না।

যাদের মতে কাফেররা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে না তাদের দলীল হচ্ছে এ হাদীস : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَلٍ شَتَّى "দু'টি ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীগণ একে অন্যের ওয়ারিশ হবে না"।[৫২] এরা যে দু'টি ভিন্ন ধর্মের অনুসারী তার প্রমাণ মহান আল্লাহর এ বাণী : وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارَىْ "আর যারা ইহুদী ও নাসারা হয়েছে"।[৫৩] এ আয়াতটিতে نَّصَارَىْ শব্দটিকে الَّذِيْنَ هَادُوْا (যারা) ইহুদী শব্দের ওপর عطف বা তার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম হলো, যেটিকে পূর্বের সাথে সংযুক্ত করা হয় তা একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। عطف এর উদ্দেশ্যও তাই। মহান আল্লাহ আরো বলেছেন : وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصَارَىْ حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ "ইহুদী ও খ্রিস্টান আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন"।[৫৪] আর ইহুদীরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না ইহুদী ধর্মের অনুসরণ করা ব্যতীত। নাসারাদের অবস্থাও তাই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের প্রত্যেকের ধর্ম আলাদা। তাদের ধর্ম আলাদা, তার আরো প্রমাণ হলো, খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা আ.-কে নবী হিসেবে এবং 'ইনজীল'-কে আসমানী কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করে, আর ইহুদীরা তা অস্বীকার করে।

এ ক্ষেত্রে ইবনে আবী লাইলার যুক্তি হচ্ছে, ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ তাওহীদের দাবির ক্ষেত্রে সমঅংশীদার। তবে তাদের মতবাদ ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা উভয় গোষ্ঠীই হযরত মূসা আ.-এর নবুওয়াত ও তাওরাতে বিশ্বাসের ব্যাপারে একমত। কিন্তু অগ্নিউপাসকদের বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা তাওহীদে বিশ্বাস করে না, হযরত মূসা আ.-এর নবুওয়াতেও বিশ্বাস করে না। এমনকি কোনো আসমানী কিতাবকেও স্বীকার করে না। ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ এ বিষয়ে তাদের সাথে একমত নন। অতএব, তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। এর দলীল হচ্ছে, বিয়ে ও যবেহকৃত পশু হালাল হওয়া। এ ক্ষেত্রে ইহুদী ও নাসারাগণ এক পর্যায়ভুক্ত। তাদের যবেহকৃত পশু মুসলমানদের জন্য হালাল। পক্ষান্তরে অগ্নি উপাসকদের যবেহকৃত পশু হালাল নয়।

---

৫২. এ হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৫৩. সূরা বাকারা, আয়াত : ৬২

৫৪. সূরা বাকারা, আয়াত : ১২০

www.amarboi.org

হানাফী ও তাঁদের সাথে ঐকমত্য পোষণকারীদের দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা দীন (ধর্ম) -কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটি দীনে হক (সত্য-সঠিক ধর্ম) এবং অপরটি দীনে বাতেল (অসত্য ও বাতিল ধর্ম)। মহান আল্লাহর বাণী :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন"।[৫৫] তিনি মানুষকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত কারেছেন : তিনি বলেন,

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ "একদল জান্নাতে ও একদল জাহান্নামে"।[৫৬] জান্নাতে প্রবেশকারী দল নিঃসন্দেহে মুসলমান এবং জাহান্নামে প্রবেশকারী দল সকল শ্রেণীর কাফের। আল্লাহ তাআলা প্রতিপক্ষও বানিয়েছেন দু'টি। তিনি বলেন : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ "এরা প্রতিপক্ষ দু'টি দল যারা তাদের রবের বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত"।[৫৭] এর দ্বারা মুসলমানদের প্রতিপক্ষ সকল কাফেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতি। কিন্তু মুসলমানদের বিরোধিতায় তারা যেন একই জাতি ও একই ধর্মের অনুসারী। এর কারণ, মুসলমানগণ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালত ও কুরআনকে স্বীকার করে। আর তারা সকলে তা অস্বীকার করে। আর অস্বীকার করার কারণেই তারা কাফের। তাই শিরক অনুসরণ করার কারণে মুসলমানদের বিপরীতে তারা একই জাতি এবং একই ধর্মের অনুসারী। এ হাদীসটি সে দিকেই ইঙ্গিত করে لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "পরস্পর ভিন্ন দু'টি জাতিও মযহাবের অনুসারী একজন আরেকজনের ওয়ারিশ হতে পারে না"। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন দু'টি জাতি ও ধর্মের ব্যাখ্যায় বলেছেন :

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না"।[৫৮] কারণ, তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কুফরীকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও তারা একই জাতি ও একই ধর্মের অনুসারীর ন্যায়।[৫৯] (অতএব, তারা যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন যেহেতু কুফরীর বৈশিষ্ট্য তাদের সবার মধ্যে বর্তমান, তাই তারা কেউ-ই মুসলমানদের ওয়ারিশ হবে না এবং কোনো মুসলমানও তাদের ওয়ারিশ হবে না।

---

৫৫. সূরা কাফেরূন, আয়াত : ৬।

৫৬. সূরা শূরা আয়াত : ৭।

৫৭. সূরা হজ্জ, আয়াত : ১৯।

৫৮. হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, (খ. ১২, পৃ. ৫০ ফাতহুল বারী; মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২৩৩, সং আল-হালাবী)।

৫৯. আল মাবসূত, খ. ৩০, পৃ. ৩০; এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, আস-সা'আদাহ সং.।

www.amarboi.org

**অমুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে দেশের ভিন্নতা**

দেশের ভিন্নতা বলতে ফিকহবিদগণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিন্নতা বুঝিয়েছেন। প্রতিরক্ষার ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, সেনাবাহিনী ও শাসকের ভিন্নতা। যেমন : একজন হিন্দুস্থানে ও অন্যজন তুর্কিস্তানে বাস করে। এ ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের দেশ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আলাদা। তাই তাদের একজনের ওপর অন্যজনের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান ও যত্নের দায়-দায়িত্ব নেই। এমনকি একে অন্যকে হত্যা করাও বৈধ মনে করে।[৬০]

ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, মুসলমানগণ নিজেরা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে। তাদের অঞ্চল, দেশ ও নাগরিকত্ব যত ভিন্নই হোকনা কেন। কারণ, ইসলামের কর্তৃত্বাধীন এলাকা সব এক দেশ হিসেবে গণ্য। মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই"।[৬১]

নবী স. বলেছেন : اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ "মুসলমান মুসলমানের ভাই"।[৬২] আর এ জন্য ও যে, সব মুসলমানের পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব ইসলামের নিমিত্তেই। এর ভিত্তিতেই এবং এর কারণেই তারা একে অন্যকে সাহায্য করে থাকে।

এ ক্ষেত্রে বিচার্য হচ্ছে, আইনগতভাবে দেশের ভিন্নতা, বাস্তবে ভিন্নতা নয়। সুতরাং কোনো মুসলমান যদি দারুল হারবে মৃত্যুবরণ করে তাহলে দারুল ইসলামে বসবাসকারী তার মুসলমান আত্মীয়-স্বজন তার ওয়ারিশ হবে যদিও ঐ সময় বাস্তবে দেশের ভিন্নতা বিদ্যমান। কেননা, দারুল হারবের সেই মুসলমান আইনগতভাবে দারুল ইসলামের অধিবাসী। কারণ সে তার প্রয়োজন পূরণ ও কর্ম সম্পাদনের জন্য নিরাপত্তা নিয়ে সেখানে গিয়েছে এবং পুনরায় সে দারুল ইসলামে ফিরে আসবে। অতএব, আইনগত বিচারে তা একই দেশ। বাস্তব ভিন্নতা কেবল তখন বিচার্য হবে যখন আইনগত ভিন্নতা তার প্রতিবন্ধক হবে না।[৬৩]

এমনিভাবে অমুসলিমদের দেশের ভিন্নতাও উত্তরাধিকার লাভের প্রতিবন্ধক নয়। এটা মালেকী মাযহাব এবং হাম্বলীদের কারো কারো মত। তা ছাড়া এটা শাফেয়ীদেরও একটা মত। সুতরাং এর ভিত্তিতে অমুসলিম তার অমুসলিম আত্মীয়স্বজনের ওয়ারিশ হবে যদিও দেশ ও নাগরিকত্ব ভিন্ন হয়। কেননা

---

৬০. ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৮৯।

৬১. সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১০।

৬২. হাদীসটি বুখারী, (ফাতহুল বারী, সালাফিয়্যা, সং, খ. ৫, পৃ. ৯৭) ও মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬, (ঈসা আল-হালাবী সম্পাদিত) কর্তৃক বর্ণিত।

৬৩. হাশিয়াতুল ফান্নারী আলাস সিরাজিয়্যাহ, পৃ. ৭৯ এবং তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

www.amarboi.org

উত্তরাধিকার লাভের কারণ ও শর্ত বিদ্যমান থাকার পর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো প্রমাণ পাওঁয়া যায় না।[৬৪]

ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে দেশের ভিন্নতা অমুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে উত্তরাধিকার লাভে প্রতিবন্ধক হবে। এটি শাফেয়ী মাযহাবের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত এবং হাম্বলীদেরও কারো কারো বক্তব্য। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, তাদের দেশ আলাদা হবার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতি-বন্ধন নেই। অথচ পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতিবন্ধনই উত্তরাধিকারের ভিত্তি।[৬৫]

কোনো কোনো মাযহাবের দৃষ্টিতে আরো কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন : লি'আন ও যিনা। তবে এ দু'টি প্রতিবন্ধক বংশ পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া এবং লি'আনের কারণে বিবাহ বন্ধন বাতিল হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## পরিত্যক্ত সম্পদের হকদার

১. আসহাবুল ফুরূয (আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত অংশসমূহের হকদার)।
২. বংশগত দিক থেকে আসাবা। অতপর কারণগত দিক থেকে আসাবা।
৩. রদ্দ (পুনর্বন্টন) এর কারণে হকদার। কাদের জন্য রদ্দ হবে এবং কাদের জন্য হবে না তার বর্ণনা। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর জন্য রদ্দের ব্যাপারে মতভেদসহ বিস্তারিত আলোচনা ।
৪. যাবিল আরহাম (রক্তসম্পর্কের আত্মীয়) যাবিল আরহামকে ওয়ারিশ বানানো এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে মতভেদসহ বিস্তারিত বর্ণনা।
৫. মাওলাল মাওয়ালাত তথা পরস্পর চুক্তি মূলে অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণ মতভেদসহ বিস্তারিত।
৬. যাকে নিজের বংশগত বলে স্বীকার করা হয়েছে কিছু মতভেদসহ বিস্তারিত।
৭. যার অনুকূলে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত করা হয়েছে।
৮. বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)।[৬৬]

## নির্ধারিত অংশ

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত নির্ধারিত অংশ ৬টি : তা হলো : অর্ধাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ ও এক ষষ্ঠাংশ।

---

৬৪. আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৮৬; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৩৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৭।
৬৫. হাশিয়াতুল ফান্নারী আলাস সিরাজিয়্যা, পৃ. ৭৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৭; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৩৭।
৬৬. শারহুস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১১; শারহুর রাহাবিয়্যা, পৃ. ১০; সং মুহাম্মাদ আলী সুবায়হ।

www.amarboi.org

**প্রথম** : অর্ধাংশ : কুরআন মজীদের তিনটি স্থানে আল্লাহ তাআলা এ অংশটির কথা উল্লেখ করেছেন।

(ক) কন্যা সন্তানের অংশ। আল্লাহ বলেন: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "কন্যা সন্তান যদি মাত্র একজন হয় তাহলে তার জন্য হবে অর্ধাংশ"।[৬৭]

(খ) স্বামীর অংশ, মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "আর তোমাদের স্ত্রীগণ যে সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে যদি তার সন্তান না থাকে তাহলে তোমরা তার অর্ধেক লাভ করবে"।[৬৮]

(গ) বোনের অংশ, আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ 'কেউ মারা গেলে যদি কোনো সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং কেবলমাত্র বোন থাকে তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক লাভ করবে'।[৬৯]

**দ্বিতীয়** : এক চতুর্থাংশ : কুরআন মাজীদে দুই জায়গায় এর উল্লেখ করা হয়েছে : (ক) স্বামীর প্রাপ্য উত্তরাধিকারের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ "যদি তাদের (স্ত্রীদের) সন্তান থাকে তাহলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদে তোমাদের হক এক চতুর্থাংশ"।[৭০]

(খ) স্ত্রীর প্রাপ্য উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ "তোমাদের কোনো সন্তান না থাকলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ প্রাপ্য"।[৭১]

**তৃতীয়** : এক অষ্টমাংশ : স্ত্রীদের প্রাপ্য হিসেবে কুরআন মাজীদে অষ্টমাংশের কথা বর্ণিত হয়েছে - فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ "তবে যদি তোমাদের সন্তান থাকে সে ক্ষেত্রে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশ লাভ করবে"।[৭২]

**চতুর্থ** : দুই তৃতীয়াংশ : এ অংশের কথা মহান আল্লাহ কন্যাদের প্রাপ্য অংশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন : فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

---

৬৭. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১
৬৮. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২
৬৯. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৭৬
৭০. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২
৭১.. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২
৭২.. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২

www.amarboi.org

"আর যদি দুইয়ের অধিক কন্যা সন্তান থাকে তাহলে তারা তোমাদের সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ লাভ করবে"।[৭৩]

**পঞ্চম :** এক তৃতীয়াংশ : আল্লাহ্ তাআলা এ অংশটির কথা পবিত্র কুরআনের দুই জায়গায় উল্লেখ করেছেন :

(ক) فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ "আর যদি তার কোনো সন্তানাদি না থাকে এবং পিতামাতাই কেবল উত্তরাধিকারী হয় সে ক্ষেত্রে মা তার পরিত্যক্ত সম্পদের একতৃতীয়াংশ লাভ করবে"।[৭৪]

(খ) আওলাদুল উম্ম বা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ "তাদের সংখ্যা যদি এর (দুইয়ের) অধিক হয় সেক্ষেত্রে তারা এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে।[৭৫]

**ষষ্ঠ :** এক ষষ্ঠাংশ : এ অংশটির বিষয় আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে তিন জায়গায় উল্লেখ করেছেন :

(ক) وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "(তার উত্তরাধিকার পরিত্যাগকারীর) সন্তান থাকলে তার পিতা মাতার প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে।[৭৬]

(খ) فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ "আর যদি উত্তরাধিকার পরিত্যাগকারীর ভাই-বোন থাকে তাহলে তার মা লাভ করবে এক ষষ্ঠাংশ"।[৭৭]

(গ) وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "যদি কোনো পুরুষ বা নারী মারা যায় এবং তার পিতা মাতা বা সন্তান না থাকে; বরং তার এক ভাই বা এক বোন থাকে সে ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে"।[৭৮]

**নির্ধারিত অংশের হকদার :**

আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত উপর্যুক্ত অংশসমূহের প্রাপক বারজন। উক্ত বারজনের চারজন পুরুষ এবং আটজন নারী। পুরুষ চারজন হলেন : পিতা, দাদা ও তদুর্ধ, বৈপিত্রেয় ভাই ও স্বামী। আর নারী আটজন হলেন : স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী (যত নিচেরই হোক), সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, মা ও আপন দাদী।

---

৭৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১
৭৪. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১
৭৫. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২
৭৬. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১
৭৭. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১
৭৮. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২

www.amarboi.org

স্বামী ও স্ত্রীকে আসহাবে ফুরূয সাবাবিয়্যা তথা কারণের ফলে নির্ধারিত অংশের হকদার বলা হয়। কারণ তাদের উত্তরাধিকারিত্ব আত্মীয়তার জন্য নয়, বরং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে। এ দুইজন (স্বামী ও স্ত্রী) ছাড়া আর যত আত্মীয় আছে তাদেরকে আসহাবে ফুরূয নাসাবিয়্যা তথা বংশগত কারণে নির্ধারিত অংশের হকদার বলা হয়। কেননা, আত্মীয়তাকেই নাসাব বা বংশ বলা হয়। কোনো কোনো সময় 'যাবিল ফুরূয' ও আসাবা একই সাথে উত্তরাধিকারে অংশীদার হয়।

আসহাবে ফুরূয উত্তরাধিকারের হকদার হয় যখন উত্তরাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার মত কোনো উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকে।

### উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে পিতার অবস্থা

পিতার জন্য সন্তানের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা রয়েছে :

**প্রথম অবস্থা :** শুধুমাত্র কিতাবুল্লাহ নির্ধারিত অংশের প্রাপক হবে, যখন মৃত পুত্রের পুত্র (পৌত্র) বা আরো নিম্নবর্তী কোনো পুরুষ বর্তমান থাকবে। সে ক্ষেত্রে পিতা পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশের প্রাপক হবেন।

**দ্বিতীয় অবস্থা :** কিতাবুল্লাহ নির্ধারিত অংশ এবং 'আসাবা' হওয়া উভয় দিক থেকেই তিনি মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন। মৃতের সন্তান তথা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেবল মহিলা থাকলে এ বিধান কার্যকর হবে এবং সে পৌত্রী এবং পৌত্রীর কন্যা বা আরো যত নিম্নেরই হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে সে এক ষষ্ঠাংশের হকদার হবে।

এক্ষেত্রে পিতা প্রথমত : যাবিল ফুরূয (আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত অংশের অংশীদার) হিসেবে এবং তারপর আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেন। এজন্য যে, তাকে যদি শুধু আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করা হয় তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই জরুরী হচ্ছে, প্রথমত : তিনি নির্ধারিত অংশের হকদার হিসেবে উত্তরাধিকারী হবেন যার ফলে তিনি এক ষষ্ঠাংশের প্রাপক হবেন।

**তৃতীয় অবস্থা** : শুধুমাত্র 'আসাবা' হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারী হবেন। এ বিধান কার্যকর হবে তখন যখন উত্তরাধিকারী হিসেবে মৃতের কোনো সন্তান থাকবে না। তাই সেক্ষেত্রে মৃতের পিতা তার পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন অথবা নির্ধারিত অংশসমূহের প্রাপকগণকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ তার পিতা লাভ করবে। এর দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার বাণী :

www.amarboi.org

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ

"যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা তার ওয়ারিশ হয় তাহলে মা তিন ভাগের একভাগ পাবে। তবে যদি মৃতের ভাই বোন থাকে তা হলে মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে"।[৭৯]

আয়াতটিতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মৃত পুত্রের সন্তান থাকলে তারা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তার পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা-মাতা প্রত্যেকে ছয় ভাগের একভাগ প্রাপ্য হবে। তবে যদি সন্তান ছেলে হয়, সে ক্ষেত্রে বাপ-মাকে তাদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুত্রের প্রাপ্য হবে। কারণ সে সবচে' নিকটাত্মীয় হওয়ায় আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের সেই অধিক হকদার। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ 'নির্ধারিত অংশের প্রাপকদের তাদের নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে দাও এবং এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ নিকট আত্মীয়ের হক'।[৮০] সুতরাং এ ভিত্তিতে নির্ধারিত অংশ হিসেবে উত্তরাধিকারে পিতার অংশ হবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এটা হলো, বাপের প্রথম অবস্থা।

আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান কন্যা অথবা পৌত্রী কিংবা আরো নিচের কেউ হয় এবং তার সাথে কোনো ছেলে সন্তান না থাকে যে তাকে আসাবা বানিয়ে দেবে, তাহলে কন্যা অথবা পৌত্রির প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ পিতার প্রাপ্য হবে। এর সাথে তার জন্য নির্ধারিত অংশ ছয় ভাগের এক ভাগও তিনি লাভ করবেন। কারণ, তিনিই মৃত ব্যক্তির সবচে' নিকটাত্মীয় বা 'আসাবা'। এটা হলো পিতার দ্বিতীয় অবস্থা।

যদি মৃত ব্যক্তির আদৌ কোনো সন্তান না থাকে এবং কেবল পিতা মাতা তার উত্তরাধিকারী হন। আবার মৃতের কোনো ভাই-বোন না থাকে, তাহলে মা পরিত্যক্ত সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ লাভ করবেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ (দুই তৃতীয়াংশ) পিতা 'আসাবা' হিসেবে লাভ করবেন। এটা হলো পিতার তৃতীয় অবস্থা। কারণ উপরোক্ত আয়াতে ভাইয়ের অবর্তমানে মায়ের অংশ তিন

৭৯. সূরা আন-নিসা, ১১
৮০. হাদীসটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

www.amarboi.org

ভাগের এক ভাগ এবং ভাইয়ের বর্তমানে ছয় ভাগের এক ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভাইদের অবর্তমানে পিতার প্রাপ্য অংশ কি হবে আয়াতে তার উল্লেখ নেই। এর অর্থ হলো, মায়ের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সবটাই পিতার প্রাপ্য হবে। কারণ, আসাবাদের ব্যাপারটাই এরূপ। বর্ণিত এ বিধানগুলোর ব্যাপারে চার মাযহাবের ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন।

**মায়ের উত্তরাধিকার**

উত্তরধিকারে মায়ের তিনটি অবস্থা :

**প্রথম অবস্থা :** নির্ধারিত অংশের প্রাপক হিসেবে উত্তরাধিকারী হবে। এ বিধান তখন হবে যখন মৃতের কোনো সন্তান থাকবে অথবা একাধিক ভাই থাকবে। সন্তান যারা নির্ধারিত অংশের প্রাপক অথবা 'আসাবা' হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারী হবে সে ক্ষেত্রে মা ছয় ভাগের এক ভাগ লাভ করবে। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "আর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে বাপ ও মা প্রত্যেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে, যদি মৃতের কোনো সন্তান থাকে।"[৮১]

وَلَدٌ শব্দটি নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীকেই বুঝায় এবং কোনো একটি শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করার জন্য এখানে কোনো ইঙ্গিত বিদ্যমান নেই, যেমন এর মধ্যে এক ও একের অধিক সংখ্যার অর্থও বিদ্যমান। তা ছাড়া এর দ্বারা পুত্র, পুত্রের পুত্র এবং তার অধস্তনদেরও বুঝায়। কারণ وَلَدٌ শব্দটির অর্থ তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। তা ছাড়া এটাও কারণ যে, মাকে ওয়ারিশ বানানোর ক্ষেত্রে পুত্রের সন্তানগণ আপন সন্তানের পর্যায়ভুক্ত। এ ব্যাপারে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত মত বিদ্যমান। আর إِخْوَةٌ (ভাইয়েরা) শব্দের অর্থ দুই বা দুয়ের অধিক ভাই বা বোন, তা আপন, বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় যাই হোক না কেন। এমনকি প্রতিবন্ধকতার (الْحَجْبُ) কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও। কারণ, আল্লাহ তাআলার বাণী : فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ "যদি মৃত ব্যক্তির ভাই-বোন থাকে তাহলে মা ছয় ভাগের এক ভাগ লাভ করবে"।[৮২] আর إِخْوَةٌ শব্দটি সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা সবাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। অধিকাংশ সাহাবা ও ফিক্‌হবিদ এই মাযহাবের সমর্থক। ইবনে আব্বাস রা. এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তার মতে, দুইজন নয়; বরং ভাইবোন তিনজন থাকলে হাজাব (الْحَجْبُ) হওয়ার কারণে মা বঞ্চিত হবেন। এ কারণে ভাইবোন দুইজন থাকলেও

৮১. সূরা আন-নিসা, ১১
৮২. সূরা আন-নিসা, ১১

www.amarboi.org

তাঁর মতে মা তিন ভাগের একভাগ উত্তরাধিকারী হিসেবে লাভ করবেন। কেননা, আয়াতটিতে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয় উল্লেখিত হয়েছে যে, মাকে এক তৃতীয়াংশ থেকে বঞ্চিত করে এক ষষ্ঠাংশ প্রদানকারী হচ্ছে إِخْوَةٌ শব্দটি। إِخْوَةٌ শব্দটি বহুবচন। আরবী ভাষায় বহুবচন তিন বা ততোধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দুই সংখ্যার ক্ষেত্রে নয়।

## জমহূর ফিকহবিদের যুক্তি

প্রথমত : মিরাস বা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দুই বা দুয়ের অধিক সংখ্যার বেলায় হুকম (حُكْم) বা ফয়সালায় কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, দুইজন কন্যা সন্তান থাকলে তারা উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ লাভ করে। যেমন বহুবচন তথা দুইয়ের অধিক সংখ্যক হওয়ার ক্ষেত্রেও তাই লাভ করে। অর্থাৎ দুই বোন যেমন দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হয় তেমনি দুইয়ের অধিক বোনও দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হয়। তাই 'হাজাব' বা বঞ্চিতকরণের ক্ষেত্রেও দুইয়ের বিদ্যমান থাকার ফলাফলও দুইয়ের অধিক সংখ্যার ফলাফলের অনুরূপ হবে।

দ্বিতীয়ত : দুই সংখ্যার ক্ষেত্রেও বহুবচনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন :

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

"তোমার কাছে কি পৌঁছেছে মামলাকারীদের খবর, যারা দেয়াল টপকে তার মহলে পৌঁছে গিয়েছিলো? যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছল, তাদেরকে দেখে সে ঘাবড়ে গেল। তারা বললো, ভয় পাবেন না, আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে"।[৮৩] আয়াতটিতে বহুবচনের الضَّمِير (সর্বনাম) কে বার বার দুই সংখ্যার (দ্বি-বচন) অর্থাৎ خَصْمَانِ শব্দটির প্রতিভূ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতেও দ্বি-বাচনিক অর্থ বুঝাতে বহুবচনের প্রতিনিধিত্বকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তওবা করো (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম) কারণ, তোমাদের মন সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে"।[৮৪]

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন, দুই ভাই বর্তমান থাকলে মা

৮৩. সূরা সোয়াদ, ২১-২২
৮৪. সূরা আত-তাহরীম, ৪।

www.amarboi.org

ছয় ভাগের এক ভাগ পায় কেন? যদিও আল্লাহ তাআলা বলেছেন: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ (যদি মৃতের إِخْوَةٌ তথা অনেক ভাই থাকে)। আপনার কওমের ভাষায় الأَخَوَانِ অর্থ দুই ভাই এবং إِخْوَةٌ (বহুবচন) অর্থ দুইয়ের অধিক ভাই এক কথা নয়। এ কথা শুনে হযরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন : আমি কি এমন বিষয়ে কোনো ব্যত্যয় ঘটাতে পারি, যা আমার পূর্ব থেকেই চলে আসছে, মানুষ বংশ পরম্পরায় তা ভোগ করে আসছে এবং বিভিন্ন জনপদে তা প্রচলিত আছে[৮৫]? হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত হাসান বাসরী রহ. থেকে বর্ণিত যে, মা কেবলমাত্র মহিলা (বোন)দের দ্বারা মাহজুব অর্থাৎ বঞ্চিত হয় না। তাই যতক্ষণ ভাই অথবা মহিলা (বোন)দের সাথে ভাই না থাকবে ততক্ষণ মা তিন ভাগের এক ভাগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ প্রাপ্তির দিকে নেমে যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ "তার যদি إِخْوَةٌ থাকে। আয়াতে উল্লেখিত إِخْوَةٌ শব্দটি পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত বহুবচন। অতএব, এ নির্দেশ শুধুমাত্র মহিলা (বোন) দের বর্তমানে কার্যকর হবে না। অপর পক্ষ যুক্তি দিয়ে বলেছেন, إِخْوَةٌ শব্দটি প্রাধান্য দেয়ার নীতি অনুযায়ী শুধুমাত্র বোনদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

**দ্বিতীয় অবস্থা :** কুরআন নির্ধারিত অংশের প্রাপক হিসেবে ওয়ারিশ হবে। এ ক্ষেত্রে তার নির্ধারিত অংশ হবে পরিত্যক্ত মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের কোনো সন্তান অথবা একাধিক ভাই ও স্বামী বা স্ত্রী কেউই ওয়ারিশ না থাকে এবং তার সাথে কেবল বাপ ছাড়া আর কেউ না থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

"মৃতের যদি সন্তান থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা-মাতা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ পাবে। আর যদি সন্তান না থাকে এবং শুধুমাত্র পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয় তাহলে মায়ের প্রাপ্য হবে তিন ভাগের এক ভাগ"।[৮৬]

**তৃতীয় অবস্থা :** তৃতীয় অবস্থা হলো, মা কুরআন নির্ধারিত অংশের প্রাপক হিসেবে ওয়ারিশ হবে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে এবং তার স্ত্রী জীবিত থাকলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর। আর মৃত ব্যক্তি স্ত্রী হলে এবং তার স্বামী জীবিত থাকলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের তিনভাগের একভাগ লাভ করবে মা; পরিত্যক্ত গোটা সম্পদের তৃতীয়াংশ নয়। এটা হবে এমন অবস্থায় যখন মৃত

৮৫. হাশিয়াতুল ফান্নারী আলাস সিরাজিয়্যা, পৃ. ৮৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।
৮৬. সূরা আন-নিসা, ১১।

www.amarboi.org

ব্যক্তির মা বাপ এবং স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো এক জনকে রেখে যদি মারা যায় এবং যদি একের অধিক ভাই না থাকে। এই তৃতীয় অবস্থার দু'টি অংশের প্রত্যেকটিকে 'উমরিয়া' মাসআলা বলা হয়। কারণ এ দু'টি বিষয়ে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন। এ মাসআলাটি প্রসিদ্ধ হবার কারণে একে মাসআলাহ গারাবিয়্যাও অর্থাৎ প্রসিদ্ধ মাসআলা বলা হয়।[৮৭] একে আবার মাসআলা গারীবাও বলা হয়।

**দাদার অবস্থা**

**(ক) ভাইদের অবর্তমানে**

দাদা : মৃতের সাথে যার সম্পর্কের জন্য মাঝখানে মায়ের প্রয়োজন নেই। যেমন : বাপের বাপ (দাদা) এবং বাপের দাদা অনুরূপ আরো উর্ধতন। দাদা একদিকে যেমন যাবিল ফুরূয তথা নির্ধারিত অংশের অধিকারী, অপরদিকে তেমনি আসাবা। বাপের বর্তমানে দাদা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তাই বাপের বর্তমানে দাদা ওয়ারিশ হবে না। তবে যদি বাপ জীবিত না থাকে তাহলে দাদা বাপের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং বাপের মতই ওয়ারিশ হবে। এ কারণে বাপের মতোই তার তিনটি অবস্থা হবে। অর্থাৎ মৃতের পুত্র সন্তান থাকলে যাবিল ফুরূয তথা নির্ধারিত অংশের হকদার হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ লাভ করবে। মৃতের কন্যা সন্তান থাকলে 'যাবিল ফুরূয' ও আসাবা এবং মৃতের ছেলে বা মেয়ে কোনো প্রকার সন্তান না থাকলে আসাবা হওয়ার ভিত্তিতে পরিত্যক্ত পুরো সম্পদ বা অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করবে।[৮৮]

এ সব অবস্থায় পিতার উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রমাণই দাদারও উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রমাণ। মিরাস বা উত্তরাধিকার লাভ এবং আরো কতিপয় বিধানে দাদা পিতার পর্যায়ভুক্ত। মহান আল্লাহ দাদাকে কুরআন মজীদে পিতা বলে উল্লেখ করেছেন যেমন তিনি বলেন, كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ "যেভাবে (সে শয়তান) তোমাদের বাপ-মাকে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত করেছে"।[৮৯] এখানে বাপ মা বলতে হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা উদ্ধৃত করে আল্লাহ তাআলা বলেন : وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ "আমি আমার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের দীনকে অনুসরণ করি"।[৯০]

---

৮৭. আত-তুহফা, পৃ. ৮৫ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, আল-হালাবী সং, আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১২৭ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, আল-কুরদী সং।

৮৮. হাশিয়াতুল ফান্নারী আলাস সিরাজিয়্যা, পৃ. ৮৯ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৮৯. সূরা আল-আরাফ, ২৭।

৯০. সূরা ইউসুফ, ৩৮।

www.amarboi.org

হাদীসে এর দৃষ্টান্ত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের বাণী :
. ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا "হে ইসমাঈলের সন্তানগণ, তীরান্দাজির চর্চা করো। কারণ তোমাদের পিতা ইসমাঈল তীরান্দাজ ছিলেন"।[৯১]

এ বিধানটি তখন প্রযোজ্য হবে, যখন দাদার সাথে মৃতের একাধিক ভাই বর্তমান থাকবে না।

## (খ) ভাইদের বর্তমানে দাদার অবস্থা

এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ একমত যে, দাদার সাথে বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন ওয়ারিশ হবে না। তবে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই দাদার সাথে বর্তমান থাকলে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইমাম আবু হানীফা র. এর দুই শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে তারা ওয়ারিশ হবে।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা র.-এর মত হলো, বাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান দাদার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তাই দাদা মৃতের ভাইদের মাহজুব তথা বঞ্চিত করবে। ইবনে জারীর তাবারী, মুযানী ও শাফিঈ মাযহাবের আবু সাওরও এ মতই প্রদান করেছেন। ইমাম আবু হানীফা র. দাদাকে বাপের পর্যায়ে গণ্য করলেও দু'টি মাসআলাকে এর ব্যতিক্রম হিসেবে গ্রহণ করেছেন যার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম আবু হানীফা র. ও তার সহমত পোষণকারীদের দলীল হলো, দাদা বাপ। অতএব, বাপের অবর্তমানে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং ভাইদেরকে মাহজুব (مَحْجُوبٌ) বা বঞ্চিত করে দেবেন, যেমন বাপ ভাইদেরকে বঞ্চিত করেন। কুরআন ও হাদীসে দাদাকে বাপ বলা হয়েছে। বহু বিধানের ক্ষেত্রে দাদা বাপের মত সিদ্ধান্ত লাভ করে থাকে। সে কারণে ভাইদের মাহজুব (مَحْجُوبٌ) বা বঞ্চিত করার ক্ষেত্রেও সে বাপের পর্যায়ভুক্ত হবে। তা ছাড়া মৃতের বংশ তালিকায় আপন দাদার অবস্থান সবার উর্ধে এবং সরাসরি আপন পৌত্রের (পুত্রের পুত্র) অবস্থান সবার নিচে এবং তারা (দাদা ও পৌত্র) প্রত্যেকেই কেবল একটি মাধ্যম ও একটি স্তরে সম্পৃক্ত। ফিক্হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পুত্রের পুত্র (পৌত্র) মৃতের ভাইদেরকে বঞ্চিত করে। অতএব, দাদাও একই মর্যাদার অধিকারী হবে।

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও তারা যুক্তি তুলে ধরেন :
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "যাবিল ফুরূয (নির্ধারিত অংশের প্রাপক) দেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। তাদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট

---

৯১. বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ৬, পৃ. ৯১, আস-সালাফিয়্যা সং.।

www.amarboi.org

থাকবে তা নিকটবর্তী পুরুষ আত্মীয় (عَصَبَةٌ) দের হক”।[৯২] আর ভাইয়ের তুলনায় দাদা মৃতের অধিক নিকটবর্তী। কারণ দাদার সম্পর্ক হচ্ছে অভিভাবকত্ব ও শাখা-প্রশাখার উৎস হিসেবে। যেমন পিতার সম্পর্ক। পিতা ছাড়া আর কেউ-ই দাদাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। ভাই ও বোনদের বিষয়টা তার থেকে ভিন্ন। তাদেরকে তিনজন অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পৌত্র বঞ্চিত করে। দাদা বাপের মতই যাবিল ফুরূয (নির্ধারিত অংশ) ও আসাবা হওয়ার ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়; কিন্তু ভাই কেবল এর কারণের যে কোনো একটির ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

দাদার সাথে ভাইদের উত্তরাধিকারী হওয়ার সমর্থকদের দলীলসমূহ নিম্নরূপ :

**প্রথমত :** সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইদের ওয়ারিশ হওয়ার বিষয় কুরআন থেকে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন : وَإِن كَانُوا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ “আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তাহলে এক পুরুষের দুই নারীর অংশের সমান”।[৯৩] আর কুরআন ও হাদীসের এমন কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যা তাদেরকে উত্তরাধিকারী হতে বাধা দেয়।

**দ্বিতীয়ত :** দাদা ও ভাই মৃতের সাথে নৈকট্যের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের। কারণ দাদা ও ভাই প্রত্যেকেই মৃতের সাথে একই মাধ্যম ও একই স্তরে সম্পৃক্ত। তাদের প্রত্যেকেই বাপের সূত্রে সম্পর্কিত। তাই দাদা পিতার পিতা এবং ভাই পিতার সন্তান। পুত্র হওয়ার সম্পর্ক পিতৃত্বের সম্পর্ক থেকে কোনো অংশে কম নয়।

**তৃতীয়ত :** সর্বক্ষেত্রে দাদা বাপের স্থলাভিষিক্ত হয় না; বরং কোনো কোনো হুকুম বা বিধানে সে পিতা থেকে ভিন্ন অবস্থানের অধিকারী। যেমন : কোনো শিশু দাদার মুসলমান হওয়ার কারণে মুসলমান হিসেবে সাব্যস্ত হয় না।

## ভাইদের বর্তমানে দাদার অংশ

ভাইদের বর্তমানে দাদার মিরাসের পরিমাণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোনো নস (نَصٌّ) বা সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। তবে সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়।

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতে, মৃতের বোনদের সাথে ভাই না থাকলে বোনদের অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পদ দাদা পাবেন। তবে শর্ত হলো, অবশিষ্ট সম্পদ সমস্ত সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগের কম

৯২. হাদীসটির বরাত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৯৩. সূরা আন-নিসা, ১৭৬।



www.amarboi.org

হতে পারবে না। অন্যথায় দাদাকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিত্যক্ত সম্পদ সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টণ করতে হবে। আরো শর্ত থাকে যে, এ বন্টনে যেন দাদার অংশ এক ষষ্ঠাংশ থেকে কম না হয় এবং কন্যা বা পুত্রের কন্যাদের কেউ-ই যেন বর্তমান না থাকে। অতএব যদি বোনদের বর্তমানে তার অংশ ছয় ভাগের এক ভাগের কম হয় অথবা বোনদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ এক ষষ্ঠাংশের কম হয়ে যায় অথবা তার সাথে মৃতের কোনো কন্যা বা পৌত্রী থাকে তাহলে দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই আরেক বর্ণনায় আছে যে, দাদা সর্বাবস্থায় তাদের একজনের সমপর্যায়ের হবে।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.-এর মতে দাদা ভাই-বোনদের সাথে আসাবা হবেন। তাই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের সবার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বণ্টিত হলে দাদার অংশ কোনো অবস্থায়ই এক তৃতীয়াংশের কম হতে পারবে না। কারণ, তাঁর মতে দাদা ভাই ও বোনদেরকে আসাবা বানিয়ে দেয় তাই তারা শুধু পুরুষ হোক বা শুধু নারী, কিংবা নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণী মিলে বর্তমান থাকলেও। আর যদি দাদা মৃতের সহোদার ভাইদের সাথে উত্তরাধিকারে অংশীদার হন তাহলে একজন সহোদর ভাইয়ের মতই সমান অংশ লাভ করবেন। আর যদি (দাদা) মৃতের বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে অংশীদর হন তাহলে একজন বৈমাত্রেয় ভাই হিসেবেই বন্টনে অংশ লাভ করবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, কোনো অবস্থায় তার অংশ এক তৃতীয়াংশের কম হতে পারবে না। এটা ইমাম মালেক র. ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল র. এবং হানাফীদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মত। শাফেয়ীগণ এর সঙ্গে এ শর্ত জুড়েছেন যে, তার সাথে যাবিল ফুরূয (নির্ধারিত অংশের প্রাপক)দের কেউ থাকবে না। যাবিল ফুরূযদের কেউ থাকলে সে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যেটি দাদার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে সেটিই দাদা গ্রহণ করতে পারবেন। উক্ত তিনটি বিষয় হলো, বন্টণ, অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অথবা গোটা সম্পদের এক তৃতীয়াংশ।

হাম্বলী ও তাদের সহমত পোষণকারীদের সম্পর্কে ইবনে কুদামা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তা হলো, দাদার সাথে যদি দুই ভাই অথবা চার বোন অথবা এক ভাই ও দুই বোন উত্তরাধিকারে অংশীদার হয় তাহলে দাদা গোটা পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে। কারণ, সে ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত গোটা সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ও সমবন্টনের অংশ একই হবে। আর যদি তা থেকে কম হয় তাহলে এক তৃতীয়াংশই হবে দাদার অংশ। তাই এ ক্ষেত্রে তাকে সেটাই বন্টন করা হবে। আর যদি অধিক হয় তাহলে এক তৃতীয়াংশই তার জন্য

www.amarboi.org

উত্তম। সুতরাং তাই তাকে প্রদান করা হবে। তাই ভাই ও বোন এক পিতার ঔরসজাত হোক বা দুই পিতার।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর মত হলো, দাদার সাথে ওয়ারিশ হিসেবে যদি কেবলমাত্র বোনরা বর্তমান থাকে, তাদের সাথে কোনো ভাই বা সন্তান না থাকে যারা তাদের (বোনদের)-কে আসাবা বানিয়ে দিতে পারে তাহলে সে ক্ষেত্রে বিধান হলো, বোন ও তাদের সাথে বর্তমান যাবিল ফুরূযদের অংশ প্রদানের পর আসাবা হওয়ার কারণে দাদা অবশিষ্ট পুরো সম্পদ লাভ করবেন। তবে শর্ত হলো, তার অংশ এক তৃতীয়াংশের কম হতে পারবে না। অর্থাৎ উক্ত অবস্থায় দাদার অংশ এক তৃতীয়াংশের কম হলেও তাকে এক তৃতীয়াংশই দিতে হবে।

তার দলীল হলো, যদি মৃতের উত্তরাধিকারী হিসেবে শুধু মেয়েরাই থাকত তাহলে তাদের সাথে দাদার প্রাপ্য অংশ তিন ভাগের এক ভাগ থেকে কম হতো না। অতএব, মৃত ব্যক্তি যদি দাদা ও ভাইদের রেখে মারা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রেও একই বিধান হওয়া উচিত। কারণ, পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্কের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। আর মৃতের সন্তানদের উপস্থিতিও যখন দাদার প্রাপ্য অংশ তিন ভাগের এক ভাগ থেকে হ্রাস করতে পারে না তখন শুধু তার (মৃতের) ভাইদের উপস্থিতিতে তার এক তৃতীয়াংশের প্রাপ্যতা আরো অধিক জোরদার হবে।[৯৪]

দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা র. মিরাস ও হাজাব (উত্তরাধিকার ও তা থেকে বঞ্চিত হওয়া) এর ক্ষেত্রে যে দু'টি মাসআলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা হলো :

**এক** : মৃত ব্যক্তি যদি স্বামী, মা ও দাদাকে রেখে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে মা পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে। আর যদি দাদার স্থলে পিতা বর্তমান থাকত তাহলে মা অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ লাভ করত।

**দুই** : মৃত ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মা ও দাদাকে রেখে যায় তাহলে মা সমুদয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে। ইমলা-এর লেখক ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য অনুসারে এ দু'টি অবস্থায়ই মা অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে।

---

৯৪. আত-তুহফাতুল খায়রিয়্যাহ, পৃ. ১৩০ ও তৎপরবর্তী, সং আল-হালাবী; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ২১৮।

www.amarboi.org

কুফাবাসীগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ মতটিই বর্ণনা করেছেন। আর বসরাবাসিগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে স্বামী সম্পদের অর্ধেক প্রাপ্ত হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ মা ও দাদার মধ্যে সমান দুই ভাবে ভাগ করে দেয়া হবে। যায়েদ ইবনে হারূনের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পদের চারভাগের একভাগ লাভ করবে এবং এরপর অবশিষ্ট সম্পদ মা ও দাদার মধ্যে সমান দুইভাগে ভাগ করে দেয়া হবে। সমস্ত বর্ণনাকারী এ বর্ণনাটি যায়েদ ইবনে হারূন কর্তৃক বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি ভুল বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে স্বামী, মা ও দাদা সম্পর্কিত এ মাসআলাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত।[৯৫]

## দাদী-নানীদের মিরাস

দাদী-নানী দুই প্রকার : জাদ্দাহ সহীহা প্রকৃত দাদী-নানী ও জাদ্দাহ গায়ের সাহীহা অপ্রকৃত দাদী-নানী।

প্রকৃত দাদী-নানী হলো সেই দাদী-নানী মৃতের সাথে যার সম্পর্ক নিরূপণে বাপের মধ্যস্থতা আসবে না। অথবা মৃতের সাথে যার সম্পর্ক কোনো আসাবা বা যাবিল ফুরূয (নির্ধারিত অংশের প্রাপক) নারীর মাধ্যমে হবে। যেমন : মায়ের মা অর্থাৎ নানী।

অপ্রকৃত দাদী-নানী : অপ্রকৃত দাদী-নানী তারাই, মৃতের সাথে যাদের সম্পর্ক এমন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, যে আসাবা বা নির্দিষ্ট অংশের প্রাপক কোনোটাই নয়। যেমন : নানার মা।

দাদী-নানীর উত্তরাধিকারের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে তা বিখ্যাত হাদীস থেকে প্রমাণিত। হাদীসটি মুগীরা ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদ্দাহ তথা দাদী-নানীকে ছয় ভাগের এক ভাগ প্রদান করেছেন। আর এ বিষয়টিই সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমাম ও মুজতাহিদদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃত দাদী-নানী যাবিল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত এবং অপ্রকৃত দাদী-নানী যাবিল-আরহাম বা নিকটাত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত।

---

৯৫. আল-মাবসূত, ২৯/১৮০, আস-সা'আদাহ সং.।

www.amarboi.org

## প্রকৃত দাদী-নানীর মিরাসী স্বত্ব লাভের দু'টি অবস্থা

**প্রথম অবস্থা :** প্রকৃত দাদী-নানী নির্ধারিত অংশের হকদাঁর হিসেবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। তার প্রাপ্য অংশ ছয় ভাগের এক ভাগ। একাকী হলে এ অংশের পুরোটাই তার প্রাপ্য হবে। আর যদি একাধিক হয় তাহলে সবাই মিলে ছয় ভাগের এক ভাগে অংশগ্রহণ করবে। তারা মায়ের পক্ষেরও হতে পারে, যেমন : মায়ের মা অর্থাৎ নানী। আবার বাপের পক্ষেরও হতে পারে যেমন : বাপের মা অর্থাৎ দাদী। আবার একসাথে উভয় পক্ষেরও হতে পারেন। যেমন : নানী যিনি দাদারও মা।

যদি দু'দিক থেকে আত্মীয়তার বন্ধনে যুক্ত নানী বা দাদীর সাথে একদিক থেকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ নানী বা দাদী উত্তরাধিকারী হিসেবে একত্রিত হয় তাহলে উভয়েই এক ষষ্ঠাংশের অর্ধেক লাভ করবেন। এটা ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মত। শাফেয়ী মাযহাবেরও বিশুদ্ধ মত এটাই। আর মালেকীদের মতে কিয়াসের হুকুমও এটাই। কারণ আত্মীয়তার দু'টি বন্ধনে আবদ্ধ নানী বা দাদী দুই দিক থেকে নানী বা দাদী হওয়ার কারণে কোনো নতুন নামে অভিহিত হয় না এবং এ কারণে সে উত্তরাধিকারীও হয় না; বরং উভয় আত্মীয়তার বন্ধন থাকা সত্ত্বেও তারা নানী বা দাদী হিসেবেই গণ্য হয়।

হানাফীদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, যুফার ও আল-হাসান ইবন যিয়াদ-এর মতে এবং শাফেয়ীদের অধিকতর বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মতে, এক ষষ্ঠাংশকে তিন ভাগ করে তাদের দুই জনের মধ্যে বণ্টন করা হবে। দুই দিক থেকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ দাদী বা নানী দুই তৃতীয়াংশ এবং এক দিক থেকে আত্মীয় দাদী বা নানী এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে। কেননা, ওয়ারিশ হওয়ার কারণ মওজুদ থাকার ওপর ভিত্তি করেই উত্তরাধিকারের প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই কারো মধ্যে দু'টি কারণ পাওয়া গেলে তা এক হলেও দু'টির কারণেই সে উত্তরাধিকারী হবে। যেমন দুই আত্মীয়তার দিক থেকে দাদী বা নানী প্রকৃত পক্ষে একজন দাদী বা নানী হওয়া সত্ত্বেও দুই দাদী বা নানীর মত হবে যদিও বাস্তবে মানুষ হিসেবে তিনি একজনই। তা সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাকে একাধিক গণ্য করতে হবে। অতএব, এই সংখ্যার দাবি অনুসারে দু'টি কারণের ভিত্তিতেই সে হকদার হবে। এর উদাহরণ যেমন একই ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্বের দু'টি ভিন্ন কারণ পাওয়া গেলে সর্বসম্মত মতে সে দু'টি কারণেই ওয়ারিশ হবে। যেমন একজন মহিলা স্বামী রেখে মারা গেল, যে স্বামী তার আপন চাচাতো ভাই। অতএব, এ ক্ষেত্রে সে 'যাবিল ফুরূয' বা নির্ধারিত অংশের প্রাপক হিসেবে অর্ধেক সম্পদ লাভ করবে। কারণ, সে তার (মৃতের)

www.amarboi.org

স্বামী। এরপর 'আসাবা' হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করবে। কারণ, সে তার আপন চাচাতো ভাই।[৯৬]

**দ্বিতীয় অবস্থা :** মায়ের বর্তমানে সব রকমের দাদী-নানী বঞ্চিত হবে। নানী বঞ্চিত হবে কারণ; মায়ের মাধ্যমেই মৃতের সাথে তার সম্পর্ক। আর দাদী বঞ্চিত হবে কারণ, তারা নানীর মতই; বরং তার চেয়েও দুর্বল সম্পর্ক। আর এ কারণেই সন্তানদের লালন-পালনে নানী দাদীর চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

পিতার বর্তমানে দাদী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এটি হযরত উসমান, আলী ও যায়েদ ইবনে ছাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখের মত। কিন্তু হযরত উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পিতার মা (দাদী) পিতার সাথে ওয়ারিশ হবে। শুরাইহ, হাসান ও ইবনে সীরীন র. এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতার বর্তমানে দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন।

নিকট সম্পর্কর দাদী-নানী দূর সম্পর্কের দাদী-নানীকে বঞ্চিত করে। হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মত এটিই। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে দু'টি বর্ণনার একটি এ মতকে সমর্থন করে। তাছাড়া এটিই হানাফীদের মাযহাব। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অন্য রেওয়ায়াতটি হলো, দাদী যদি নিকট সম্পর্কের হয় এবং নানী যদি দূর সম্পর্কের হয় সে ক্ষেত্রে উভয়েই সমমর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে গণ্য হবে। শাফেয়ীদের গ্রন্থসমূহে এ দু'টি বক্তব্যের পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টিতে সঠিক মত হচ্ছে, নিকট সম্পর্কের দাদী দূর সম্পর্কের নানীকে বঞ্চিত করে না। প্রথমোক্ত রেওয়ায়াত অনুসারে চার প্রকারের ক্ষেত্রে হাজাব (বঞ্চিতকরণ) কার্যকর এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে তিন প্রকারের ক্ষেত্রে হাজাব কার্যকর। এই রেওয়ায়েত মতেই ফয়সালা দেয়া হয়েছে ইমাম মালেক র. ও ইমাম আহমদ র. এর মাযহাবে এবং এটিই ইমাম শাফেয়ী র.-এর দু'টি বক্তব্যের মধ্যে বিশুদ্ধ বক্তব্য।[৯৭]

---

৯৬. আল-মাবসূত, খ. ২৯, পৃ. ১৬৫ ও এর পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, আস-সাআদাহ সং; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৬৬; আত-তুহফাতুল খায়রিয়া, পৃ. ৯৮-৯৯, সং আল-হালাবী।

৯৭. হাশিয়াতুল ফান্নারী আলাস-সিরাজিয়্যাহ, পৃ. ১৪০ ও ১৪১, আল-কুর্দী সং; আত-তুহফাতুল খায়রিয়্যাহ, পৃ. ১০০, আল-হালাবী সং।

www.amarboi.org

**স্বামী-স্ত্রীর উত্তরাধিকার**

স্বামী ও স্ত্রীর মিরাস বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; ওসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর"।[৯৮]

আয়াতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকে কেবল সুনির্দিষ্ট অংশের হকদার হিসেবে ওয়ারিশ হবে এবং প্রত্যেকের দু'টি করে অবস্থা।

**স্বামীর অবস্থা**

**(ক)** যাবিল ফুরূয তথা নির্ধারিত অংশের হকদার হিসেবে স্বামী ওয়ারিশ হবে এবং তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক লাভ করবে, যদি স্ত্রীর কোনো সন্তান না থাকে, যারা 'যাবিল ফুরূয' বা 'আসাবা' হিসেবে উত্তরাধিকারী হতে পারে। অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র বা আরো অধস্তন কেউ অথবা কন্যা, দৌহিত্রী বা আরো অধস্তন কেউ না থাকবে। তারা বর্তমান স্বামীর সন্তান হোক বা পূর্বতন স্বামীর সন্তান যাই হোক না কেন। স্ত্রীর যদি কোনো সন্তানই না থাকে কিংবা সন্তান থাকলেও তারা 'যাবিল ফুরূয' বা নির্দিষ্ট অংশের হকদার না হয় বা 'আসাবা' হিসেবে ওয়ারিশ না হয় যেমন : মেয়ের মেয়ে (দৌহিত্রী) বা মেয়ের ছেলে (দৌহিত্র)। এ দু'টি ধরনও এই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

**(খ)** স্বামী 'যাবিল ফুরুয' বা নির্ধারিত অংশের হকদার হিসেবে পরিত্যক্ত সম্পদের চার ভাগের এক ভাগের ওয়ারিশ হবে। এটা এমন অবস্থায় হবে যখন স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ থাকবে, যে 'যাবিল ফুরূয' বা 'আসাবা' হওয়ার ভিত্তিতে ওয়ারিশ হবে। এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী সেই সন্তান বর্তমান স্বামীর ঔরসজাত হোক বা আরেক স্বামীর ঔরসজাত হোক।

---

৯৮. সূরা আন-নিসা, ১২।

www.amarboi.org

**স্ত্রীর অবস্থা**

স্ত্রী কেবল 'যাবিল ফুরূয' বা নির্ধারিত অংশের হকদার হিসেবে ওয়ারিশ হবে এবং তার দুইটি অবস্থা :

**প্রথম অবস্থা :** স্ত্রীর প্রথম অবস্থা হলো, তার নির্ধারিত অংশ এক-চতুর্থাংশ। এটা তখনই হবে যখন 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে, বা আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারী হতে পারে, স্বামীর এমন কোনো সন্তান না থাকবে। 'যাবিল ফুরূয' বা 'আসাবা' হতে পারে এমন সন্তান হচ্ছে, পুত্র, পৌত্র বা আরো অধস্তনগণ এবং কন্যা, কন্যার কন্যা বা আরো অধস্তনগণ। তারা স্বামীর উক্ত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হোক বা অন্য কোনো স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হোক। আর যদি স্বামীর কোনো সন্তানই না থাকে, কিংবা এমন সন্তান থাকে যারা 'যাবিল ফুরূয' বা 'আসাবা' হিসেবে উত্তরাধিকারী নয় যেমন দৌহিত্র বা দৌহিত্রী, তাহলে সে ক্ষেত্রটিও এ অবস্থার মধ্যেই গণ্য হবে।

**দ্বিতীয় অবস্থা :** দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, স্ত্রী নির্ধারিত অংশ আট ভাগের এক ভাগ প্রাপ্য হবে। আর তা হবে এমন ক্ষেত্রে যখন স্বামীর ওয়ারিশ কোনো সন্তান থাকবে, সে উক্ত স্ত্রীর নিজের গর্ভজাত হোক বা স্বামীর অন্য কোনো স্ত্রীর গর্ভজাত হোক।

**দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার লাভের দু'টি শর্ত**

**প্রথম শর্ত :** প্রথম শর্ত হলো, বিশুদ্ধ দাম্পত্য সম্পর্ক থাকতে হবে। দাম্পত্য সম্পর্ক যদি অবৈধ হয় তাহলে এ ধরনের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উত্তরাধিকার কার্যকর হবে না। যদিও এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই আমৃত্যু তাদের উভয়ের মধ্যে মিলে মিশে জীবন যাপন অব্যাহত থাকে। এটা ইমাম আবু হানীফা র., ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম আহমদ র. এর মাযহাব।

ইমাম মালেক র. বলেন : অবৈধ সম্পর্কের কারণ যদি এমন হয়, যে বিষয়ে সবার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, যেমন : চারজন স্ত্রীর বর্তমানে পঞ্চম স্ত্রী হিসেবে কোনো নারীকে বিয়ে করা অথবা দুগ্ধপানজনিত কারণে হারাম কোনো নারীকে হারাম হওয়ার কারণ সম্পর্কে অনবহিত থাকায় বিয়ে করা। এ ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে না। তাই তাদের উভয়ের কোনো একজন দাম্পত্য বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা বৈবাহিক বন্ধন বাতিল হওয়ার পূর্বে কিংবা পরে মারা গেলেও। আর যদি দাম্পত্য সম্পর্ক অবৈধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইমামগণের ঐকমত্য না থাকে, যেমন : প্রাপ্তবয়স্কা ও বিচার-বুদ্ধির অধিকারী নারীর বিয়েতে ওয়ালী বা অভিভাবক না থাকা। এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্যু যদি বিয়ে বাতিল হওয়ার পর হয় তাহলে তারা কেউ কারো উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা, উত্তরাধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠার কারণ বর্তমান নেই এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয়ে

www.amarboi.org

গিয়েছে। আর যদি বৈবাহিক বা দাম্পত্য সম্পর্ক বাতিল হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে উত্তরাধিকারিত্ব প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ, যারা এ বিয়েকে বিশুদ্ধ মনে করেন তাদের মতে দাম্পত্য বন্ধন বহাল আছে।

**দ্বিতীয় শর্ত** : দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, মৃত্যুর সময় দাম্পত্য বন্ধন বাস্তবে বা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যেমন ইদ্দত পালনরত রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী।

তবে স্ত্রী 'বায়েন তালাক' প্রাপ্তা হলে উত্তরাধিকার পাবেনা যদিও ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়। তবে কেউ স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করার এ উপায়কে যদি এমন অবস্থায় গ্রহণ করে যাতে মনে হয় যে, সে স্ত্রীর উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি এড়াতে এ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে তাহলে সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্ব বহাল থাকবে। যেমন : মৃত্যুশয্যায় থেকে স্ত্রীকে তালাক প্রদান।

একজন স্ত্রী থাকলে সে একাই চার ভাগের এক ভাগ এবং আট ভাগের এক ভাগ প্রাপ্ত হবে। আর যদি স্ত্রীর সংখ্যা একাধিক তথা দুই বা তিন বা চার হয় তাহলে সবার মধ্যে তা (চারভাগের এক ভাগ বা আটভাগের এক ভাগ) সমভাবে বণ্টিত হবে।[৯৯]

**কন্যাদের অবস্থা**

মৃতের কন্যাদের মিরাস বা উত্তরাধিকারের বিধানসমূহ কুরআন মাজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতটিতে এক সাথে বর্ণনা করা হয়েছে :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন : এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ"।[১০০]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে নিজ ঔরসজাত কন্যাদের উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে তিনটি অবস্থা জানা যায় :

**প্রথম অবস্থা** : কন্যাদের সাথে যদি এক বা একাধিক ঔরসজাত পুত্র সন্তান থাকে তাহলে সবাই আসাবা হিসেবে গণ্য হবে এবং একজন পুরুষের অংশ দুইজন মেয়ের অংশের সমান হবে। আর তারাই মৃতের পরিত্যক্ত পুরো সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। তবে শর্ত হলো, এ ক্ষেত্রে মৃতের উত্তরাধিকারীদের

---

৯৯. হাশিয়া ইবন আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৯১, বুলাক থেকে মুদ্রিত; আল-খারাশী, খ. ৫, পৃ. ৪৪২, আশ-শারকিয়্যা সং., আত-তুহফা, পৃ. ৭৮, আল-হালাবী সং আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৫১।

১০০. সূরা আন-নিসা, ১১।

www.amarboi.org

মধ্যে কোনো 'যাবিল ফুরূয' বা নির্ধারিত অংশের হকদার বর্তমান থাকবে না। আর যদি 'যাবিল ফুরূয' থাকে তাহলে তাদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ পুত্র ও কন্যাগণ লাভ করবে।

**দ্বিতীয় অবস্থা :** মৃতের যদি দুই বা দু'য়ের অধিক কন্যা সন্তান থাকে এবং তাদের সাথে কোনো পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে কন্যা সন্তানগণ তার পরিত্যক্ত সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ লাভ করবে, যা তাদের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হবে।

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে দুই কন্যার প্রাপ্য উত্তরাধিকার তিন ভাগের দুই ভাগ। এর দলীল হলো, উহুদ যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে রাবী রা. শাহাদত লাভ করলেন।[১০১] রেখে গেলেন দুই কন্যা ও এক স্ত্রীকে। এমতাবস্থায় তার (সা'দ ইবনে রাবী')-এর ভাই সমস্ত সম্পদ দখল করে নিলে তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরজ করল : হে আল্লাহর রাসূল, সা'দ আপনার সাথে যুদ্ধে গিয়ে শাহাদত লাভ করেছেন। তিনি দু'টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। কিন্তু তাদের চাচা সমস্ত সম্পদ কব্জা করে নিয়েছে। আর মেয়েদের বিয়েতে অর্থ-সম্পদই আকর্ষণের কারণ। অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে; অর্থ সম্পদ না থাকলে তাদের বিয়ে হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : لَمْ يُنْزِلِ اللّٰهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ شَيْئًا "এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কোনো বিধান নাযিল করেন নি" এর পরপরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী নাযিলের লক্ষণ দেখা দিল। তাঁর থেকে ওহীর প্রভাব অপসৃত হলে তিনি বললেন :

قِفُوا مَالَ سَعْدٍ ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مَا إِنْ بَيَّنَهُ لِي بَيَّنْتُهُ لَكُمْ

"সাদের মাল আটকে রাখো। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বিধান নাযিল করেছেন। আমাকে যদি তিনি পূর্বে এ বিষয়টি জানাতেন তাহলে আমিও তা তোমাদের জানাতাম।" এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচে উল্লিখিত আয়াত لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ (মা বাপ ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ রেখে যায় তাতে পুরুষদের অংশ আছে) আয়াতটি এবং পরে নিচে উদ্ধৃত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"তোমাদের সন্তানদের (মিরাসের) ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন : একজন পুরুষের অংশ দুইজন মেয়ের অংশের সমান"। এরপর তিনি সা'দ

---

১০১. 'উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলেন' তিরমিযীতে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা ও একইরূপ বর্ণনা করেছেন। দেখুন, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/২৬৭-২৬৮, আল-ফাজালা সং.।

www.amarboi.org

ইবনে রাবীর ভাইকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন, তিন ভাগের দুই ভাগ সা'দের দুই মেয়েকে এবং আট ভাগের এক ভাগ তার স্ত্রীকে দিতে। আর অবশিষ্ট সম্পদ তাকে নিতে বললেন। বলা হয়, ইসলামে এটাই প্রথম মিরাস বন্টন।[১০২]

অনুরূপভাবে এ আয়াত দ্বারাও দলিল পেশ করা হয়েছে :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"তোমাদের সন্তানদের (মিরাসের) ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন : একজন পুরুষের অংশ দুইজন মেয়ের অংশের সমান"।

এখানে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এ কথা প্রমাণ করা যে, ছেলে ও মেয়ে মিশ্র বা সম্মিলিতভাবে উত্তরাধিকারী হওয়ার সংখ্যাগত সর্বনিম্ন পর্যায় হলো এক পুত্র ও এক কন্যার ওয়ারিশ হওয়া। আর এ ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে মৃতের সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে পুত্র। আয়াত থেকে এ ইঙ্গিত বা দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, দুই কন্যার প্রাপ্য অংশ সোজাসাপ্টা তিন ভাগের দুই ভাগ। আর এটা তখনই হবে, যখন দুইজন কন্যাই কেবল উত্তরাধিকারী হবে। অতএব, তাদের অবস্থা বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং দুই জনের অধিক হলে বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। সে জন্য আয়াতে বলা হয়েছে : فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুইয়ের অধিক কন্যা সন্তান হয়"।[১০৩] এর অর্থ হলো, তারা যদি দু'য়ের অধিক হয় তাহলে তাদের সংখ্যা যাই হোকনা কেন তাদের জন্য দুই তৃতীয়াংশই প্রাপ্য যা দুইজন কন্যা সন্তানেরও প্রাপ্য, তার অধিক নয়। আর এভাবেও প্রমাণিত হয় যে, দুইজন বোনের তুলনায় দুইজন কন্যা সন্তানের আত্মীয়তার বন্ধন অধিক শক্তিশালী। দুই বোন যেহেতু দুই তৃতীয়াংশের অীধকারী হয়, সেহেতু দুইজন কন্যা সন্তান তুলনামূলকভাবে দুই তৃতীয়াংশ পাওয়ার অধিক হকদার।

তা ছাড়া আরো এ কারণে যে, বোন যদি তার ভাইয়ের সাথে একত্রে অংশীদার হয় তাহলে তাকে তিন ভাগের এক ভাগ প্রদান অনিবার্য। অতএব, তার সাথে যদি আরো একজন বোন থাকে তাহলে তাকেও আরো এক তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের আরো এক ভাগ দিতে হবে। কন্যার ব্যাপারটিও অনুরূপ। নিজ বোনের সাথে সে ততটাই পায়, যতটা সে একাকী তার ভাইয়ের সাথে পায় (অর্থাৎ এক

১০২. তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/২৬৭, আস-সালাফিয়্যা সং.); আবু দাউদ (৩/৮০, আল-মাতবায়াতুল আনসারিয়্যা দিল্লী, সং.); আল-হাকেম (৪/৩৩৪, দায়েরাতুল মাআরেফ আল-উসমানিয়্যা, সং.)।

১০৩. আল-কুরআন, ৪ : ১১।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

## পৌত্রী (পুত্রের কন্যা)দের অবস্থা[১০৬]

পৌত্রী : মৃতের সাথে যার সম্পর্ক তার (মৃতের) পুত্রের মাধ্যমে। সেই পৌত্রীর পিতা যত অধস্তন স্তরেরই হোক না কেন। এ হিসেবে পুত্রের কন্যা পুত্রের পুত্রের (পৌত্রে) কন্যা (পর পৌত্রী) প্রমুখ আরো অধস্তন স্তরের কন্যা সন্তানও এর অন্তর্ভুক্ত।

মিরাস বা উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পৌত্রীর (পুত্রের কন্যা) ছয়টি অবস্থা : এর মধ্যে তিনটি অবস্থা প্রযোজ্য হয় যখন সে মৃতের ঔরসজাত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয়। আর এ অবস্থা আসে তখন, যখন সে পৌত্রীর সাথে তার থেকে নিকটতর মর্যাদার কোনো পুরুষ বা নারী সন্তান মৃতের না থাকে। অপর তিনটি অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন, যখন সে (পৌত্রী) মৃতের ঔরসজাত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয় না।

পৌত্রী যখন মৃতের ঔরসজাত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হবে, তখন যে তিনটি অবস্থা তা নিম্নরূপ :

**প্রথম অবস্থা :** 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের প্রাপক) হিসেবে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেকের ওয়ারিশ হবে। এটা হবে তখন, যখন সে একাকী হবে এবং তাকে 'আসাবা' বানিয়ে দিতে পারে এমন কেউ তার সাথে ওয়ারিশ হবে না।

**দ্বিতীয় অবস্থা :** 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের প্রাপক) হিসেবে পৌত্রীরা তিনভাগের দুই ভাগের ওয়ারিশ হবে। এটা হবে এমন ক্ষেত্রে যখন তাদের সংখ্যা একাধিক হবে এবং তাদেরকে 'আসাবা' বানিয়ে দিতে পারে এমন কেউ তাদের সাথে ওয়ারিশ না হয়।

**তৃতীয় অবস্থা :** আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারী হবে। এটা হবে এমন অবস্থায় যখন একজন পৌত্রী বা একাধিক পৌত্রীর সাথে এমন কোনো ওয়ারিশ বর্তমান থাকবে, যে তাদের কে 'আসাবা' বানিয়ে দিতে পারে।

পৌত্রী যখন মৃতের ঔরসজাত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হবে না, এভাবে যে, পৌত্রীর সাথে মৃতের কোনো ওয়ারিশ সন্তান থাকবে, যে পৌত্রী থেকে নিকট মর্যাদার। এ অবস্থায় উত্তরাধিকার লাভে পৌত্রীর তিন অবস্থা, যা নিম্নরূপ :

**প্রথম অবস্থা :** পৌত্রী একজন হোক বা একাধিক, নির্ধারিত অংশের প্রাপক হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগের (এক ষষ্ঠাংশের) ওয়ারিশ হবে দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগকে পূর্ণতা দানের জন্য। আর এটা হবে তখনই যখন পৌত্রীর সাথে মৃতের এমন কোনো কন্যা সন্তান থাকবে, মর্যাদাগতভাবে যে পৌত্রীর চেয়ে উচ্চ অবস্থানের। সে ঔরসজাত হোক বা না হোক তবে শর্ত হলো, পৌত্রীর সাথে যুগপৎ এমন কোনো ওয়ারিশ থাকবে না যে তাকে আসাবা

১০৬. আস-সিরাজিয়্যাহ মা'আ হাশিয়াতিল ফান্নারী, পৃ. ১০৬।

www.amarboi.org

বানিয়ে দেবে। আর যদি থাকে তবে পৌত্রী আসাবা হিসেবে ওয়ারিশ হবে, 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে নয়।

**দ্বিতীয় অবস্থা** : এ অবস্থায় মৃতের কন্যাদের অংশ দেয়ার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর এ অবস্থা আসে, যখন উক্ত পৌত্রীর সাথে মৃতের দুই অথবা ততোধিক ঔরসজাত কন্যা অথবা এমন কোনো পৌত্রী বর্তমান থাকে যার স্তর অন্য পৌত্রীদের উচ্চে থাকে। এক্ষেত্রে যদি তার সাথে এমন কোনো ওয়ারিশ থাকে, যে তাকে আসাবা বানিয়ে দেয় তাহলে সে 'আসাবা' হিসেবে ওয়ারিশ হবে। অন্যথায় সে কিছুই পাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, একজন বা কয়েকজন পৌত্রী দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করতে ছয় ভাগের এক ভাগ লাভ করবে। কারণ, তার মতে, দুইজন কন্যা সন্তান ও একজন কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত কার্যকর। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : মৃতের দুইজন কন্যা সন্তানের সাথে যদি একজন বা কয়েকজন পৌত্র বর্তমান থাকে তাহলে পৌত্রীরা সে ক্ষেত্রে ওয়ারিশ হবে না। সে ক্ষেত্রে বরং অবশিষ্ট সম্পদ পৌত্রগণ লাভ করবে। কারণ এ অবস্থায় পৌত্রীদেরকে সম্পদের অংশীদার করা হলে কন্যাদের অংশ দুই তৃতীয়াংশের অধিক হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাদের প্রাপ্য দুই তৃতীয়াংশই নির্ধারণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য যারা ভিন্নমত পোষণ করেছেন তাদের যুক্তি হলো, কন্যা সন্তান কয়েকজন থাকলে মহান আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ হিসেবে দুই তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের দুই ভাগ নির্ধারন করেছেন। আর পৌত্রীদেরকে আসাবা হিসেবে হকদার বানিয়েছেন। এ দু'টি অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই একটি অধিকারকে আরেকটি অন্য শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে মিলিয়ে ফেলা যাবে না। তাই দুই তৃতীয়াংশ থেকে বাড়তিও কিছু হচ্ছে না।

**তৃতীয় অবস্থা** : পৌত্রী সংখ্যায় একজন হোক বা একাধিক এবং 'আসাবা' বানিয়ে দিতে পারে এমন উত্তরাধিকারী সাথে থাক বা না থাক পৌত্র কোনো উত্তরাধিকার পাবেনা। এটা প্রযোজ্য হবে সেই ক্ষেত্রে যখন তাদের সাথে মৃতের পুত্র অথবা এমন পৌত্র বর্তমান থাকবে যার অবস্থান ও মর্যাদা পৌত্রীর চেয়ে উচ্চতর।

সব অবস্থায়ই সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেবলমাত্র দ্বিতীয় অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু ব্যতিক্রমী মত পোষণ করেছেন।[১০৭]

---

১০৭. শারহুস সিরাজিয়্যা, পৃ. ১০৯; আল-কুর্দী সং।

www.amarboi.org

## আপন বোনদের অবস্থা

আপন বোনদের পাঁচটি অবস্থা। এ পাঁচ অবস্থার মধ্যে কোনোটা আল্লাহর পবিত্র কিতাব কুরআন মাজীদ দ্বারা, কোনোটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত দ্বারা এবং কোনোটা আবার 'ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত।

## প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা

বোন যদি মাত্র একজন হয় এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাকে বঞ্চিত করার মত কেউ অথবা তার আপন ভাই না থাকে তাহলে সে মৃতের সমুদয় সম্পদের অর্ধাংশ লাভ করবে। আর বোনের সংখ্যা যদি দুই বা দুইয়ের অধিক হয় এবং তাদের সাথে আপন ভাই বর্তমান না থাকে তাহলে বোনেরা দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করবে। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

"লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, 'পিতা-মাতাহীন নি:সন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান"।[১০৮]

আয়াতটিতে أُخْتٌ (বোন) বলতে আপন ও বৈমাত্রেয় উভয় প্রকার বোনদের বুঝানো হয়েছে। কারণ, কোনো কোনো অবস্থায় এরাই 'আসাবা' হিসেবে উত্তরাধিকারী হয়। আর বৈপিত্রেয় বোনেরা কেবলমাত্র 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে নির্ধারিত অংশের ওয়ারিশ হয়। মহান আল্লাহ এ বিষয়টি সূরার প্রথমে كَلَالَة সম্পর্কিত আয়াতে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে একই সূরার শেষ আয়াতে আপন ও বৈমাত্রেয় বোনদের প্রাপ্য অংশের বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।

বোনের সংখ্যা দুইয়ের অধিক হলে তারা দুই তৃতীয়াংশ লাভ করবে। এর দলীল হলো, পুত্র সন্তানদের অংশ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বাণী :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

১০৮. আল-কুরআন, ৪ : ১৭৬।

www.amarboi.org

"তোমাদের সন্তাদের ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন : পুরুষদের অংশ মেয়েদের দু'জনের অংশের সমান। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দু'জনের বেশি মেয়ে হয় তাহলে তারা পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ"। মৃতের সাথে অতি নিকট ও অত্যন্ত দৃঢ় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যেখানে কন্যা সন্তান তিন বা তিনের অধিক হলে তারা মৃতের সম্পদের দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হয় সেখানে সহোদর বোনেরা দুই তৃতীয়াংশের বেশি পাবে না, সেটাই অধিক যুক্তিসংগত। আয়াতটিতে দুইয়ের অধিক বোনের প্রাপ্য অংশের বিষয় সুস্পষ্টভাবে না বলার কারণ হলো, পুত্র সন্তানদের অংশ সম্পর্কে যে আয়াতে বলা হয়েছে সেই বিশেষ আয়াতেই তা বিবৃত হয়েছে।

**তৃতীয় অবস্থা :** একজন সহোদর বোন অথবা সহোদর বোনের সাথে সহোদর ভাই থাকলে 'যাবিল ফুরূয'দের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ তাদের (সহোদর ভাই ও বোনের) প্রাপ্য হবে এবং একজন পুরুষের অংশ দু'জন মহিলার অংশের সমান হবে। কেননা উক্ত ভাইয়ের কারণে তারা আসাবা হয়ে গিয়েছে। এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহ বাণী : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ "আর যদি কয়েকজন ভাই ও বোন মিলে উত্তরাধিকারী হয় তাহলে একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান হবে"[১০৯] মালেকী ও হাম্বলী ফিকহবিদদের মতে সহোদর অথবা বৈমাত্রেয় বোন দাদার বর্তমানে আসাবা হবে। তাকে আসাবা বানানোর মত ভাই যদি না থাকে তবে তা হবে 'আসাবা বিল গায়ের" (الْعَصَبَة بِالْغَيْرِ) অর্থাৎ অন্যের কারণে 'আসাবা'। এমতাবস্থায় দাদার প্রাপ্য হবে বোনের প্রাপ্য অংশের দ্বিগুণ।

**চতুর্থ অবস্থা :** একজন সহোদর বোন বা একাধিক সহোদর বোন 'আসাবা মাআল গায়র' (الْعَصَبَة مَعَ الْغَيْرِ) অর্থাৎ অন্যের সাথে আসাবা হবে। এর ক্ষেত্র হলো, যখন এক বা একাধিক সহোদর বোন বর্তমান থাকে এবং তাদের সাথে কোনো সহোদর ভাই বর্তমান না থাকে, আর মৃত ব্যক্তি সন্তান হিসেবে একজন মাত্র কন্যা রেখে যায়। তাহলে উত্তরাধিকার লাভকারী কন্যা তার প্রাপ্য অংশ নেয়ার পর মৃতের এক বা একাধিক সহোদর বোন আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : اجْعَلُوا الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً . "বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা হিসেবে গ্রহণ করো"।[১১০] আবদুল্লাহ ইবনে

১০৯. আদ-দাসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৫৯; আল-মুওয়াক, খ. ৬, পৃ. ৪১০ এবং আল-আযব, খ. ১, পৃ. ৯০।

১১০. اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة হাদীসটি ইমাম বুখারী র. ترجمه الباب বা অনুচ্ছেদ শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনুচ্ছেদ : 'কন্যাদের সাথে আসাবা হিসেবে

www.amarboi.org

মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতোয়াও এটাই। তিনি বলেছেন : এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও সিদ্ধান্ত।[১১১]

**পঞ্চম অবস্থা** : বঞ্চিত হওয়া। এর ক্ষেত্র হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যখন তার উত্তরাধিকারী হিসেবে পুত্র সন্তান অথবা পিতাকে রেখে যাবে। দাদার বর্তমানে তাদের উত্তরাধিকারিত্বের ব্যাপারে মতভেদ আছে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

## বৈমাত্রেয় বোনদের অবস্থা

বৈমাত্রেয় বোনদের সাত অবস্থা :

১. মাত্র একজন হলে অর্ধেক অংশ। যখন তার সাথে সহোদর বোন বর্তমান না থাকে অথবা বৈমাত্রেয় ভাই না থাকে, যে তাকে আসাবা বানিয়ে দেবে।

২. দুই অথবা দুইয়ের অধিক সংখ্যক হলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে যদি তাদের প্রকৃত বোন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমান না থাকে। কারণ, ভাই তাদেরকে আসাবা বানিয়ে দেবে। এ দু'টি অবস্থার দলীল হচ্ছে সূরা আন-নিসার শেষের কালালাহ্ (الْكَلَالَة পিতামাতা ও সন্তানহীন ব্যক্তি) সম্পর্কিত আয়াতটি। আয়াতটি হচ্ছে يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ 'লোকেরা তোমার কাছে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তির (পরিত্যক্ত সম্পদ) সম্পর্কে বিধান জানতে চায়। বলে দাও 'আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ'র বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন'।

৩. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোনের সাথে মৃতের একজন সহোদর বোন থাকলে দুই-তৃতীয়াংশ তথা তিন ভাগের দুই ভাগকে পূর্ণতা দানের জন্য এক ষষ্ঠাংশ তথা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। কারণ, একজন সহোদর বোনের প্রাপ্য মৃতের সমুদয় সম্পদের অর্ধেক। তার সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকা ঠিক কন্যার সাথে পৌত্রী থাকার ন্যায়। তাই দুই-তৃতীয়াংশকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য সে (বৈমাত্রেয় এক বোন) বা তারা (বৈমাত্রেয় একাধিক বোন) এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে। তবে এ ক্ষেত্রে

---

বোনদের উত্তরাধিকার'। ফাতহুল বারী, খ. ৮, পৃ. ৪৪৮; আল-আযবুল-ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৯১।

১১১. আল-মাবসূত, খ. ২৯, পৃ. ১৫১; শারহুর রাহবিয়্যাহ, পৃ. ৩২ এবং তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।



www.amarboi.org

যদি তার সাথে বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমান থাকে তাহলে সে তাকে (বৈমাত্রেয় বোনকে) 'আসাবা' বানিয়ে দেবে। আর এটা হচ্ছে, চতুর্থ অবস্থা যার আলোচনা পরে আসছে। যদি মৃতের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ 'যাবিল ফুরূয'দের প্রাপ্য দিতে ফুরিয়ে যায়, তাহলে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের প্রাপ্যতা একই সাথে বাতিল ও রহিত হয়ে যাবে। কেননা, বোনদের প্রাপ্য অংশ হলো, তিন ভাগের দুই ভাগ। মহান আল্লাহ বলেন : فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ "দুই বোন যদি মৃতের উত্তরাধিকারী হয় তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে"। (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৭৬)।

৪. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কারণে 'আসাবা' হওয়া। এ কারণে পুরুষ মেয়েদের প্রাপ্য অংশের দ্বিগুণ পাবে।

৫. কন্যাদের অথবা পৌত্রীদের (যত অধস্তন স্তরেরই হোক) অথবা কন্যা ও পৌত্রী উভয়ের সাথে 'আসাবা' হওয়ার কারণে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। তাই তারা একজন হোক বা একাধিক। আসাবা হওয়ার কারণে কন্যাদের ও পৌত্রীদের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের অবশিষ্ট অংশ লাভ করবে। তবে নির্দিষ্ট অংশের প্রাপকদেরকে তাদের অংশ দিতে যদি পরিত্যক্ত পুরো সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে তার (বৈমাত্রেয় বোন) বা তাদের (বৈমাত্রেয় বোনদের) প্রাপ্যতা বাতিল হয়ে যাবে এবং সে বা তারা কিছুই পাবে না।

৬. বৈমাত্রেয় বোন দুইজন সহোদর বোনের বর্তমানে বঞ্চিত হবে। তবে যদি তার সাথে বৈমাত্রেয় ভাইও বর্তমান থাকে তাহলে তারা উভয়ে (বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন) আসাবা হবে এবং আসাবা হওয়ার কারণে অবশিষ্ট সম্পদ প্রাপ্ত হবে এবং ভাইয়ের অংশ বোনের অংশের দ্বিগুণ হবে।

৭. বৈমাত্রেয় বোনের সাথে আসাবা বানানোর মত বৈমাত্রেয় ভাই থাক বা না থাক মৃতের পিতা, পুত্র, পৌত্র (যত অধস্তনই হোক), সহোদর ভাই ও সহোদর বোন মৃতের কন্যা অথবা পৌত্রীর সাথে আসাবা হলে তাদের কারণে বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হয়ে যাবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে সহোদর বোন আসাবা হওয়ার ব্যাপারে সহোদর ভাইয়ের মতই মৃতের অধিক নিকটবর্তী।[১১২]

---

১১২. আল-মাবসূত, খ. ২৯, পৃ. ১৫৬; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৫৯-৪৬০; আল-আযবুল-ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৯১।

www.amarboi.org

**বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের উত্তরাধিকার**

**বৈপিত্রেয় ভাই-বোন অর্থ শুধু মায়ের সম্পর্কের বা মা-শরীক ভাইবোন।**

মা-শরীক ভাই-বোনেরা কেবল মাত্র 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে ওয়ারিশ হয়। তারা আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকার পায় না যদিও তাদের মধ্যে ভাই বর্তমান থাকে। কারণ, মৃতের সাথে তার সম্পৃক্ততা শুধু মায়ের কারণে। বৈপিত্রেয় বা মা-শরীক ভাই-বোন না আসাবা বিলগায়র (অন্যের কারণে আসাবা) হয়, না আসাবা মাআল গায়র (অন্যের সাথে মিলে আসাবা) হয়। বৈপিত্রেয় বা মা-শরীক ভাই-বোন (নারী ও পুরুষ) শুধু পুরুষ হোক অথবা শুধু নারী অথবা নারী ও পুরুষ উভয়ই হোক সর্বাবস্থায় সমান গণ্য হয়ে থাকে। তাই উত্তরাধিকারে তাদের পুরুষ নারীর চাইতে অধিক অংশ পায় না।

**বৈপিত্রেয় বোনদের তিনটি অবস্থা**

**প্রথম অবস্থা :** তাদের কেউ একাকী ওয়ারিশ হলে সে পুরুষ হোক বা নারী মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ লাভ করবে এবং তা হবে এমন ক্ষেত্রে যখন মৃতের সন্তানদের থেকে পুরুষ বা নারী অথবা ঊর্ধতন স্তরের কোনো পুরুষ ওয়ারিশ থাকবে না। যেমন : পিতা, দাদা বা আরো ঊর্ধতন কেউ।

**দ্বিতীয় অবস্থা :** নারী হোক, পুরুষ হোক বা উভয় শ্রেণীর হোক সংখ্যা একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে 'যাবিল ফুরূয' হিসেবে তিন ভাগের এক ভাগ লাভ করবে এবং তাদের মধ্যে সমান অংশে তা বন্টিত হবে। এটা হবে এমন ক্ষেত্রে যখন মৃতের সন্তানদের মধ্যে কোনো ওয়ারিশ অথবা ঊর্ধতন কোনো পুরুষ ওয়ারিশ বর্তমান থাকবে না।

**তৃতীয় অবস্থা :** মৃতের পুত্র, পৌত্র এবং আরো অধস্তন কোনো ওয়ারিশ, কন্যা, পৌত্রী ও আরো অধস্তন কোনো ওয়ারিশ এবং পিতা, দাদা ও আরো ঊর্ধতন কোনো ওয়ারিশের কারণে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন মাহজুব বা বঞ্চিত হয়ে যায়।

উপরোক্ত মাসআলাসমূহের দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

"আর যদি মৃত পুরুষ বা স্ত্রীলোকের (যার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টিত হবে) সন্তান না থাকে এবং পিতা-মাতাও জীবিত না থাকে কিন্তু এক ভাই বা এক বোন থাকে তাহলে ভাই ও বোন প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে"।[১১৩] এ আয়াতে যে ভাই ও বোনের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ যে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন সে বিষয়ে

---

১১৩. আল-কুরআন, ৪ : ১২।

www.amarboi.org

'ইজমা' তথা ফিকহবিদদের ঐকমত্য বিদ্যমান। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে হযরত উবাই ও হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কিরাআত وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِن الامِ ও দিক নির্দেশনা দান করে।

উত্তরাধিকারে বৈপিত্রেয় বা মা-শরীক ভাই-বোনদের প্রাপ্য অংশ যে সমান এবং তাদের প্রাপ্য যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয় তার দলীল মহান আল্লাহর এ বাণী- فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ "তাদের সংখ্যা যদি এর অধিক হয় সে ক্ষেত্রে তারা এক-তৃতীয়াংশে শরীক হবে"। কারণ, শরীক হওয়ার অর্থ সমভাবে অংশগ্রহণ। আর একের অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অংশকে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

যেহেতু মৃতের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের সম্পৃক্ততা মায়ের মাধ্যমে। তাই উত্তরাধিকারে তাদের একজনের জন্য প্রাপ্য অংশ মায়ের প্রাপ্য সর্বনিম্ন অংশের সমান। অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং একের অধিক জনের জন্য মায়ের প্রাপ্য সর্বোচ্চ অংশ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের জন্য এর চেয়ে বেশি নির্ধারণ না করার কারণ হলো, মায়ের মাধ্যমে তারা মৃতের সাথে সম্পৃক্ত। তাইমার চেয়ে যেন তাদের অংশ অধিক না হয়। আর অংশ প্রাপ্তি ও বন্টনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাকে সমান করা হয়েছে। এ কারণে যে, উত্তরাধিকারে অংশপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে আসাবা হওয়ার কারণে; কিন্তু মায়ের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। এ কারণে বন্টন ও প্রাপ্তি কোনো ক্ষেত্রেই তাদের (মা-শরীক ভাই ও বোনদের) পুরুষকে নারীর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি।[১১৪]

## আসাবা হওয়ার কারণে উত্তরাধিকার প্রাপ্তি

আভিধানিক অর্থে কোনো ব্যক্তির আসাবা হচ্ছে তার পুত্রগণ এবং পিতার সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন। তাদেরকে আসাবা এ কারণে বলা হয় যে, 'আসাবা' (عَصَبَةٌ) শব্দের অর্থ পরিবেষ্টিত করা। এ সব আত্মীয়স্বজন দ্বারাও সে পরিবেষ্টিত থাকে। যেমন একদিকে থাকে পিতা, একদিকে পুত্র, একদিকে চাচা এবং একদিকে ভাই।[১১৫]

---

১১৪. আল-ফান্নারী আলাস সিরাজিয়া, পৃ. ৯৪ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; আল-আযবুল ফায়েদ, পৃ. ৫৪-৬৩; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪১১; আত-তুহফা মা'আশ শারওয়ানী, খ. ৬, পৃ. ১৭।

১১৫. মুখতারুস সিহাহ, পৃ. ৪৩৫, দারুল কিতাব সং.।

www.amarboi.org

এক বা একাধিক ব্যক্তি এবং নারী ও পুরুষ সবাইকে 'আসাবা' বলা হয়। এর ক্রিয়া-বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় عصوبة। ইসলামী উত্তরাধিকার বিধানে কতিপয় ক্ষেত্রে পুরুষ নারীদেরকে 'আসাবা' বানিয়ে দেয়।[১১৬]

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় عَصَبَةٌ بِنَفْسِه তথা সরাসরি আসাবা বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে একাকী ওয়ারিশ হলে মৃতের পরিত্যক্ত পুরো সম্পদ লাভ করে অথবা 'যাবিল ফুরূয'দের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ পুরোটাই লাভ করে। 'আসাবা' বলতে এটাই বুঝানো হয়।[১১৭]

আস-সিরাজিয়্যা গ্রন্থকার 'আসাবা'র সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'আসাবা' বলা হয় এমন পুরুষ ব্যক্তিকে, মৃতের সাথে যার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো নারী মাধ্যম থাকে না। এ সম্পর্কের মধ্যে কোনো নারী থাকলে সে আসাবা নয়। যেমন বৈমাত্রেয় তথা মা-শরীক ভাই-বোন।[১১৮]

'আসাবা' দুই প্রকারের। 'আসাবা নাসাবিয়্যা' বা বংশগত আসাবা, যার সংজ্ঞা পূর্বেই দেয়া হয়েছে এবং 'আসাবা সাবাবিয়্যা' বা কারণগত আসাবা অর্থাৎ ক্রীতদাসকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তকারী।

বংশগত আসাবা (আসাবা নাসাবিয়্যা) তিন ভাগে বিভক্ত : 'আসাবা বিনাফসিহি' অর্থাৎ সরাসরি আসাবা, 'আসাবা বিগাইরিহি' অর্থাৎ অন্যের কারণে আসাবা এবং 'আসাবা মা'আ গাইরিহি' অর্থাৎ অন্যের সাথে মিলে আসাবা।

সরাসরি আসাবা শ্রেণীর মধ্যে চার ধরনের লোক গণ্য। তারা হলো : ১. মৃতের অংশ, ২. মৃতের মূল, ৩. মৃতের পিতার অংশ এবং ৪. মৃতের দাদার অংশ। সরাসরি আসাবার এ চারটি শ্রেণী ও এর অন্তর্ভুক্তদের ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তীদের ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অর্থাৎ আত্মীয়তায় অপেক্ষাকৃত অধিক নৈকট্যের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তাই উত্তরাধিকার লাভের সর্বাধিক হকদার মৃতের পুত্র। তারপর পুত্রের পুত্র (পৌত্র) এবং তার অধস্তনগণ। এর পরবর্তী হকদার মৃতের মূল অর্থাৎ তার পিতা। অতঃপর পিতার পিতা (দাদা) এবং তার ঊর্ধতনগণ। মৃতের পুত্রকে তার পিতার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ, পুত্র হচ্ছে মৃতের শাখা বা নিজ অস্তিত্বের অংশ এবং পিতা তার মূল তথা উৎস। মূল বা উৎসকে শাখার সংগে সংযুক্ত করার তুলনায় মূলের সাথে শাখার সংযুক্তি অধিক স্পষ্ট। কারণ, অংশ বা শাখা

---

১১৬. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৪৬; আল-আযবুল ফায়েদ, পৃ. ৭৪।

১১৭. আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ.৪১৪; আত-তুহফাতু মাআল হাশিয়া, খ. ৬, পৃ. ২৮; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৭৫।

১১৮. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৪৬।

www.amarboi.org

তার উৎসের অনুগত ও অধীন হয় এবং উৎসের উল্লেখ করলে শাখার উল্লেখ হয়ে যায়। কিন্তু বিপরীত ক্ষেত্রে তা হয় না। এ কারণে ভূমি বিক্রি করলে ঐ ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা ও বৃক্ষ নিজ থেকেই উক্ত বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয় যদিও তা বিক্রির আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে না, কিন্তু স্থাপনা ও বৃক্ষ বিক্রির ক্ষেত্রে ভূমি উক্ত বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে বিক্রির সময় ভূমির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলে তা ভিন্ন কথা। নিচের স্তরের হলেও পৌত্রদের পিতার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ জন্য যে, এখানেও প্রাপ্যতার কারণ হলো, পুত্রত্ব যা পিতৃত্বের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। পিতা যে দাদার থেকে অধিক আপন সে বিষয়টি তেমনি সুস্পষ্ট, যেমন পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পুত্র তার পিতার কাছে অধিক আপন হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। আর যখন جد শব্দ দ্বারা পিতার পিতা (দাদা) অর্থ করা হবে তখন মায়ের পিতা (নানা) তা থেকে বাদ পড়ে যাবে। এ পর্যন্ত যাদের কথা বলা হলো তাদের পরে মিরাসে অগ্রাধিকার পাবে বাবার অংশ অর্থাৎ ভাইয়েরা। তারপর পাবে ভাইদের সন্তানেরা বা তাদের অধস্তন ওয়ারিশগণ। ভাইদেরকে দাদার পর উত্তরাধিকার প্রদানের ব্যাপারটি ইমাম আবু হানীফার রহ. মত। তবে এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এরপর উত্তরাধিকার পাবে দাদার অংশ (সন্তানগণ) অর্থাৎ চাচা, চাচার পুত্র ও আরো অধস্তন পুরুষগণ।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এবং হাম্বলী ফিকহবিদদের মতে 'আসাবা' হওয়ার কারণ ও ক্ষেত্র ছয়টি : ১. সন্তান হওয়া, ২. পিতা হওয়া, ৩. ভাইদের সাথে দাদা হওয়া, ৪. ভাইয়ের সন্তান হওয়া, ৫. চাচা হওয়া এবং ৬. ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা (অর্থাৎ কারণবশতঃ আসাবা) হওয়া।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে, 'আসাবা' হওয়ার কারণ ও ক্ষেত্র পাঁচটি : ১. সন্তান হওয়া; ২. পিতা হওয়া; ৩. ভাই হওয়া; ৪. চাচা হওয়া; ৫. ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা হওয়া। দাদা ও তার ঊর্ধতন পুরুষগণ পিতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ ভাবে ভাইয়ের সন্তানেরা এবং তার অধস্তন পুরুষগণ ভাইদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে, 'আসাবা' হওয়ার কারণ ও ক্ষেত্র সাতটি: ১. সন্তান হওয়া; ২. পিতা হওয়া; ৩. ভাইদের সাথে দাদা হওয়া; ৪. ভাইদের পুত্র হওয়া; ৫. চাচা হওয়া; ৬. ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা হওয়া; ৭. বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার।[১১৯]

---

১১৯. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৪৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৭৫ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪১৪ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; আত-তুহফা মাআল হাশিয়াহ, খ. ৬, পৃ. ২৮।

www.amarboi.org

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 'আসাবা' যদি মাত্র একজন হয়, সে যে কোনো দিক বা অবস্থান থেকেই হোক না কেন 'যাবিল ফুরূয'দের কেউ না থাকলে সে সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পদের হকদার হবে। তবে যদি 'যাবিল ফুরূয'দের কেউ বর্তমান থাকে তাহলে তার প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ 'আসাবা'র প্রাপ্য হবে। আর যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তাহলে 'আসাবা' কিছুই পাবে না।

'আসাবা'র সংখ্যা যদি একাধিক হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের হয় তাহলে পুত্র হওয়ার দিক অগ্রগণ্য হবে, যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি 'আসাবা'র সংখ্যা একাধিক হয় এবং কারণ ও ক্ষেত্রও একই হয় তাহলে তাদের মধ্যে অধিকতর নিকট আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তাই পুত্রকে পৌত্র থেকে এবং পিতাকে দাদা থেকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম স্তরের দাদার সন্তানদের যত অধস্তনই হোক তারা দ্বিতীয় স্তরের দাদার সন্তানদের থেকে তাই তারা যত ওপরের স্তরের হোক না কেন অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কেননা তারা আত্মীয়তার দিক থেকে অধিকতর নিকটবর্তী।

যদি আত্মীয়তার দিক ও স্তর একই হয় তাহলে অধিকতর নিকটাত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অর্থাৎ যার আত্মীয়তা পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে তাকে শুধুমাত্র পিতার দিকের 'আসাবা'র চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অতএব, সহোদর ভাইকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। ঠিক একইভাবে সহোদর ভাইয়ের পুত্রকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং সবক্ষেত্রে এ নিয়মই প্রযোজ্য হবে।

যদি 'আসাবা'দের সংখ্যা একাধিক হয় এবং তাদের সবার আত্মীয়তার দিক স্তর ও আত্মীয়তা বন্ধনের দৃঢ়তা সমান হয় তাহলে তারা সবাই 'মিরাস' লাভের হকদার বলে গণ্য হবে। কেননা, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বিদ্যমান নেই এবং একজনকে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার দানেরও কোনো কারণ বিদ্যমান নেই। তাই 'আসাবা' হিসেবে তারা সবাই সমান বলে বিবেচিত হবে।

**অন্যের কারণে 'আসাবা'**

'আসাবা' বিল গায়ের তথা অন্যের কারণে আসাবা সেইসব মহিলা, যারা অন্যদের সাথে 'আসাবা' হিসেবে গণ্য হয়। চার শ্রেণীর নারী অন্যের কারণে 'আসাবা' হয়। তারা হচ্ছে :

১. ঔরসজাত কন্যা, ২. কন্যার অবর্তমানে পুত্রের কন্যা, ৩. সহোদর বোন এবং ৪. সহোদর বোনের অবর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন। এই চার প্রকার নারী তাদের সমপর্যায়ের ভাইদের কারণে 'আসাবা' হয়। আর পুত্রের কন্যারা তাদের

www.amarboi.org

সমপর্যায়ের চাচাতো ভাইদের কারণেও 'আসাবা' হয়। অনুরূপভাবে তারা তাদের ভাইয়ের পুত্র ও চাচার পৌত্রদের কারণেও 'আসাবা' হয় যদি পৌত্রীদের উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির জন্য তাদের প্রয়োজন হয়।

মালেকীদের মতে, দাদার কারণেও সহোদর অথবা বৈমাত্রেয় বোন 'আসাবা' হয়। এ ধরনের আসাবা অন্যের কারণে 'আসাবা' (আসাবা বিল গায়র) হিসেবে গণ্য হবে।[১২০]

এ ক্ষেত্রে হাম্বলী ফিকহবিদগণও একই মত পোষণ করেন। অর্থাৎ তাকে 'আসাবা' বানিয়ে দেয় এমন ভাই যদি তার না থাকে তাহলে দাদার কারণে সে 'আসাবা' হবে।

তাদের মধ্যে যারা আবার নির্ধারিত অংশ পাবে না তাদেরকে তাদের নিম্নস্তরের পুত্রের পুত্রও 'আসাবা' বানিয়ে দেয়। এর পক্ষে দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহর এ বাণী : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, (মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদে) পুরুষদের একজনের অংশ মেয়েদের দু'জনের অংশের সমান।[১২১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন : وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ "আর যদি ভাই ও বোন কয়েকজন হয় তাহলে পুরুষদের একজনের অংশ মেয়েদের দু'জনের অংশের সমান হবে"।[১২২]

যার ভাই 'আসাবা' কিন্তু তার নিজের জন্য নির্ধারিত অংশ নেই সে তার ভাইয়ের কারণে 'আসাবা' হয় না। কেননা, পুরুষদের কারণে মেয়েদের 'আসাবা' হওয়ার বিষয়ে কুরআন মাজীদের আয়াতে যে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে তা দু'টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে: কন্যারা পুত্রদের সাথে এবং বোনেরা ভাইদের সাথে 'আসাবা' হবে। এ দু'টি ক্ষেত্রেই মেয়েরা 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের আবশ্যিক হকদার)। তাই যে সব মেয়েদের জন্য নির্ধারিত অংশ নেই, যেমন : ভাইয়ের কন্যা (ভাতিজী) তার ভাইয়ের সাথে এবং ফুফু চাচার সাথে, আল্লাহর বাণী তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। ভাইয়ের সাথে বোন একাকী হলে ভাই তাকে তার নির্ধারিত প্রাপ্য থেকে স্থানান্তরিত করে 'আসাবা' বানিয়ে দেয় যাতে নারী-পুরুষের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত না হয় বা দু'য়ের মধ্যে এ ব্যাপারে সমতা না হয়।

---

১২০. আল-মুওয়াক, খ. ৬, পৃ. ৪১০; আদ-দাসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৫৯; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৯০।

১২১. আল-কুরআন, ৪ : ১১।

১২২. আল-কুরআন, ৪ : ১৭৩।

www.amarboi.org

**আসাবা মাআল গায়র' (الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ) বা অন্যের সাথে আসাবা**

তারা সেই সকল মহিলা, যারা অন্য মহিলার সাথে মিলে আসাবা হয়। এরকম আসাবা হলো সহোদর বোন অথবা বৈমাত্রেয় বোন যখন কন্যার সাথে থাকে। তাই সে কন্যা মৃতের ঔরসজাত হোক অথবা পুত্রের কন্যা হোক। আর সে একজন হোক বা একাধিক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : اجْعَلُوا الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً "বোনদেরকে তোমরা কন্যাদের সাথে 'আসাবা' হিসেবে গণ্য করো"।[১২৩] বহুবচনে ব্যবহৃত 'বোন' ও 'কন্যা' এ দু'টি শব্দই বোন ও কন্যা শ্রেণীকেই বুঝিয়েছে, তাদের সংখ্যা এক হোক বা একাধিক।

অন্যের কারণে 'আসাবা' (الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ) এবং অন্যের সাথে আসাবা (الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ) এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, অন্যের কারণে 'আসাবা' হওয়ার ক্ষেত্রে 'অন্য ব্যক্তিটি নিজে সরাসরি 'আসাবা' হয়ে থাকেন। ফলে যাকে তিনি 'আসাবা' বানিয়ে থাকেন সেই নারী পর্যন্তও তার ক্রিয়া কার্যকরী হয়; কিন্তু অন্যের সাথে 'আসাবা' হওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি 'আসাবা' এমন কেউ থাকে না।[১২৪]

**কারণবশত আসাবা (عَصَبَةٌ سَبَبِيَّةٌ)-এর উত্তরাধিকার**

সব ফিকহবিদ এ বিষয়ে একমত যে, ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা পুরুষ বা নারী তার দ্বারা মুক্ত ক্রীতদাসের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ অথবা অবশিষ্ট সম্পদের ওয়ারিশ হবে। তবে শর্ত হলো, উভয়ের দীন (ধর্ম) এক হতে হবে এবং মুক্ত ক্রীতদাসের কোনো ওয়ারিশ থাকবে না। অথবা এমন ওয়ারিশ থাকবে, যে পরিত্যক্ত সম্পদের কিছু অংশের ওয়ারিশ হবে। আর যদি তাদের উভয়ের দীন ভিন্ন হয় তাহলে অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, তারা একে অপরের ওয়ারিশ হবে না। এ ক্ষেত্রে হাম্বলী ফিকহবিদদের বিশুদ্ধতর মত হলো, মুসলমান তার মুক্ত কাফের ক্রীতদাসের ولاء বা মালিক হবার কারণে উত্তরাধিকারী হবে এবং বিপরীত ক্ষেত্রে কাফেরও মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে।[১২৫]

**বন্ধুত্ব-চুক্তি**

হানাফী আলিমদের মতে, বন্ধুত্ব-চুক্তি উত্তরাধিকার লাভের একটি কারণ। এ চুক্তির মর্যাদা ক্রীতদাস মুক্তকরণের ফলে অর্জিত মালিকানার পরেই। তাই কোনো ব্যক্তির হাতে কেউ মুসলমান হলে এবং তার সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করার

---

১২৩. এ হাদীসটির বরাত ১১১ নং টীকায় উল্লেখিত হয়েছে।

১২৪. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৫৪-১৫৬; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৮৮-৯৩; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪১৪; আত-তুহফা মা'আল হাশিয়া, খ. ৬, পৃ. ২৭।

১২৫. মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৬২৫।

www.amarboi.org

পর মারা গেলে যদি সে ছাড়া তার আর কোনো ওয়ারিশ না থাকে তাহলে যার হাতে সে মুসলমান হয়েছে সে ব্যক্তি তার 'মিরাস' লাভ করবে।

হযরত উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান ও ইবরাহীম নাখঈ থেকে এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন আল্লাহর এ বাণী : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ "আর যে সব লোকের সাথে তোমাদের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও"। এ আয়াতে নাফে র.-এর কিরাআত বা পাঠ হচ্ছে عَاقَدَتْ অতএব, আয়াতের দ্বারা উক্ত হুকুম প্রমাণিত হলো এবং তা এর শব্দাবলির দাবি অনুসারে কার্যকর হবে। অর্থাৎ আত্মীয়দের অবর্তমানে এরূপ ব্যক্তির মিরাসের বিষয় সপ্রমাণিত হবে।

আত্মীয়দের অবর্তমানেও এ নির্দেশের বিদ্যমানতা ও প্রামান্যতার পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও আমাদের সামনে আছে। তামীম আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, যদি কেউ কোনো মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার বিধান কী ? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه "সে তার জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী ও হকদার"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর তাৎপর্য ও দাবি হচ্ছে, তার উত্তরাধিকারিত্বের অধিক হকদার সেই। কারণ, মৃত্যুর পরে তাদের দু'জনের মাঝে উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছুতেই পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা থাকে না।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইবনে শুবরুমা, সাওরী ও আওযায়ীর মতে মুসলমানরা সামষ্টিকভাবে তার উত্তরাধিকার লাভ করবে।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন : সে যদি ইসলামের শত্রুদের এলাকা থেকে এসে কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে সেই তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করবে। আর যদি কোনো জিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) কোনো মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সব মুসলমান তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

মালেকী ও তাদের সহমত পোষণকারীগণ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "যে মুক্তিদান করে মুক্ত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদের অধিকার কেবল তার"।[১২৬] এ হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেন। তাছাড়া উত্তরাধিকার লাভের কারণসমূহ رَحِم বা

---

১২৬. انما الو لاء لمن اعتق হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন ইমাম বুখারী র., খ. ৫, পৃ. ৩১৩; ফাতহুল বারী, আস-সালাফিয়্যা সং, এবং মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১৪৫, আল-হালাবী সং।

www.amarboi.org

রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা, বিয়ে ও দাসমুক্তির সম্পদ (وَلَاء)-এর মধ্যে সীমিত। আর এ অবস্থাটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তা ছাড়া উল্লেখিত আয়াতটি উত্তরাধিকারের বিধান সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত। এ কারণেই রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের বর্তমানে সে (বন্ধুত্বের চুক্তিধারী) মিরাস থেকে কিছুই লাভ করবে না। উপরন্তু وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ আয়াতটি 'মানসূখ' হয়ে গিয়েছে।

হাসান বাসরী র. বলেন, وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله (আর আল্লাহর কিতাবে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পরের বেশি হকদার) আয়াতটি উক্ত আয়াতকে 'মানসূখ' বা রহিত করে দিয়েছে। মুজাহিদ র. বলেন, فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ অর্থ হলো, তাদেরকে রক্তপণ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করো। আর এটা ওসিয়াত নয়। কারণ, الْوَصِيُّ তথা ওয়িসতকারী রক্তপণে শরীক হয় না। তাই ইসলাম গ্রহণকারীর তা থেকে প্রত্যাহারের অধিকার থাকবে।[১২৭]

## বায়তুল মাল

বায়তুল মাল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব অর্থ এসে জমা হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি তার মালিক হয় না। যেমন 'ফাই'[১২৮] (বিনা যুদ্ধে লব্ধ শত্রু-সম্পত্তি) এর অর্থ। শাফেয়ী ফিকহবিদগণ একে جهة الاسلام বা ইসলামের ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেন।[১২৯]

হানাফী ও হাম্বলী ফিকহবিদদের মত এবং মালেকীদের একটি অপ্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, বায়তুল মাল উক্ত অর্থের উত্তরাধিকারী নয়। পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ অথবা তার অবশিষ্টাংশ বায়তুল মালে জমা হয় এ কারণে যে, তা এমন সম্পত্তি যার নির্দিষ্ট কোনো হকদার নেই। অতএব, বায়তুল মলেই তা জাম হবে। মালিকবিহীন হারানো মাল বায়তুল মালে জমা হবে এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হবে। যেমন কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ। শাফেয়ীদের মধ্যে মুযানী ও ইবনে সুরাইজ এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

মালেকী ও শাফেয়ী ফিকহবিদদের মতে বায়তুল মাল হচ্ছে 'আসাবা' ও ক্রীতদাসের মুক্তিদাতার পরেই তার স্থান।

---

১২৭. আল-মাবসূত, খ. ৩০, পৃ. ৪৩-৪৬; আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৮৬, দারুল কিতাব সং.; আল-বাহজাহ শারহু আত-তুহফা, পৃ. ৫৯৩; শারহুল মাহাল্লী, খ. ৩, পৃ. ১৩৭; হাশিয়া কালইউবী ওয়া উমায়রাহ, আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩৮১; রিয়াদ সং.।

১২৮. আবু ইয়ালা, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ২৩৫।

১২৯. আত-তুহফা, হামেশ আশ-শারওয়ানী, খ. ৬, পৃ. ৮।

www.amarboi.org

মালেকীদের মতে এখানে বায়তুল মাল বলতে তার নিজ দেশের বায়তুল মালকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার মৃত্যু তার নিজ দেশে হোক বা বিদেশে, আর তার অর্থ সম্পদ নিজ দেশে থাক বা অন্য কোনো জায়গায়, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। আর তার নিজের যদি কোনো দেশ না থাকে তাহলে যেখানে তার অর্থ-সম্পদ আছে সেটাকেই তার দেশ বিবেচনা করতে হবে। অন্য একটি মতানুসারে যে দেশে তার মৃত্যু হয়েছে সেটাকেই তার দেশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। তারা বায়তুল মালকে 'আসাবা' মনে করে। এ কারণে তা এমন ওয়ারিশের ন্যায় যার বংশ পরিচিতি সুবিদিত। এটাই তাদের প্রসিদ্ধ মত, তাই সে দেশের বায়তুল মাল সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত হোক বা না হোক।

এ ক্ষেত্রে আরো একটি মত হচ্ছে, বায়তুল মাল অব্যবহৃত ও অনর্থক পড়ে থাকা অর্থ সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান। তা ওয়ারিশ হতে পারে না। তবে এটি একটি বিরল মত। এ মতটির ভিত্তিতে কোনো মানুষের জন্য তার সমুদয় সম্পদের ওসিয়ত করা জায়েয, যদি তার কোনো বংশগত উত্তরাধিকারী না থাকে। অনুরূপভাবে তার কোনো ওয়ারিশ না থাকলে কাউকে ওয়ারিশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়াও বৈধ। পক্ষান্তরে যে মতটিতে বায়তুল মালকে উত্তরাধিকারী বলা হচ্ছে তার ভিত্তিতে সমুদয় সম্পদের ওসিয়ত করা বা কোনো উত্তরাধিকারীর স্বীকৃতি দেয়া বৈধ নয়।[১৩০]

শাফেয়ী মতের অনুসারীগণ এ বিষয়ে মালেকীদের সাথে একমত যে, বায়তুল মালের স্থান হলো, বংশগত 'আসাবা' ও কারণবশত 'আসাবা'র পরে। তাদের মতে, বায়তুল মাল অসংগঠিত ও অবিন্যস্ত হলেও তা মৃতের সমুদয় অথবা অবশিষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। এর দায়িত্বশীল অত্যাচারী হলেও কিংবা এর দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তার না থাকলেও। কেননা এর উত্তরাধিকারিত্ব ইসলামী বিধানের কারণে এবং সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো জুলুম পরিলক্ষিত হয়নি, তাই ইমাম বা সরকার প্রধান জালেম হওয়ায় তাদের অধিকার বাতিল হতে পারে না। তাদের বক্তব্যের মূল কথা এটাই।

এ বিষয়ে পরবর্তীকালের ফিকহবিদদের ফতোয়া হচ্ছে, যদি বায়তুল মাল সুসংগঠিত না হয় অর্থাৎ মুসলমানদের কোনো ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান না থাকে এবং থাকলেও তার মধ্যে ইমাম হওয়ার কিছু গুণাবলী অনুপস্থিত থাকে, যেমন সে যদি অত্যাচারী হয় তাহলে সম্পদ 'যাবিল ফুরূয'দের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। কারণ, পরিত্যক্ত সম্পদ ব্যয়ের খাত 'যাবিল ফুরূয' ও বায়তুল মালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতএব, বায়তুল মাল তা গ্রহণের অযোগ্য হলে তার প্রাপক হিসেবে 'যাবিল ফুরূয'ই সুনির্দিষ্ট হবে।

---

১৩০. হাশিয়াতুদ-দাসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪১৬।

www.amarboi.org

**প্রতিবন্ধকতা : আল-হাজাব (الْحَجْبُ)**

হাজাব (الْحَجْبُ)এর আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া। এ কারণেই পর্দাকে হিজাব বলা হয়। কারণ, তা দেখতে বাধা দেয়। গার্ড বা দ্বাররক্ষীকে 'হাজেব' (حَاجِبٌ) বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, সে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।[১৩১]

আস-সিরাজী গ্রন্থকার 'হাজাব' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়েছেন এ ভাবে : কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি কোনো নির্দিষ্ট ওয়ারিশকে তার মিরাসের আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ পেতে বাধা হওয়া।[১৩২] অন্য সব মাযহাব কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

**হাজাব মূলত দুই প্রকার :**

১. 'হাজাব বিল ওয়াসফ' (حَجْبٌ بِوَصْفٍ) অর্থাৎ কোনো গুণ ও বৈশিষ্টের কারণে 'হাজাব'। ফারায়েজশাস্ত্রবিশারদগণ এটিকে প্রতিবন্ধক (مَانِعٌ)ও বলে থাকেন। যেমন হত্যাকারীকে মিরাস লাভে বাধা দেয়া। ২. 'হাজাব বিশ শাখস (حَجْبٌ بِشَخْصٍ) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কারণে 'হাজাব'। সাধারণভাবে হাজাব বলতে এটিকেই বুঝানো হয়। এটি দুই প্রকার :

১. 'হাজাবু হিরমান' (حَجْبُ حِرْمَانٍ) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতকারী 'হাজাব'। এটার কারণে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে দেয়। তবে ছয় শ্রেণীর ওয়ারিশের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থায় এটা প্রযোজ্য হয় না। এ ব্যাপারে সবাই একমত। উক্ত ছয় শ্রেণীর ওয়ারিশ হলেন : পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী ও স্ত্রী। একটি সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টি এ ভাবে বর্ণনা করা যায় : এ শ্রেণীর উত্তরাধিকারী তারাই যারা মৃতের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। তবে দাসমুক্তকারী এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. 'হাজাবু নুকসান' (حَجْبُ نُقْصَانٍ) অর্থাৎ অংশ হ্রাসকারী 'হাজাব'। এর অর্থ ওয়ারিশকে বেশি অংশ পেতে বাধা সৃষ্টি করে অপেক্ষাকৃত কম অংশের প্রাপক বানিয়ে দেয়া। এটা পাঁচ শ্রেণীর ওয়ারিশের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তারা হচ্ছে: ১. স্বামী ও ২. স্ত্রী। কারণ মৃতের সন্তান অথবা পুত্রের সন্তানের বর্তমানে স্বামীর অংশ অর্ধেক থেকে হ্রাস পেয়ে এক চতুর্থাংশ হয়ে যায় এবং স্ত্রীর অংশ এক চতুর্থাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে এক অষ্টমাংশ হয়ে যায়। ৩. মা, কেননা মৃতের সন্তান অথবা পুত্রের সন্তান অথবা দুই ভাই বোনের বর্তমানে তার প্রাপ্য অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে হ্রাস পেয়ে এক ষষ্ঠাংশ হয়ে যায়। ৪. পৌত্রী, কারণ

---

১৩১. আল-মিসবাহ।

১৩২. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৭১।

www.amarboi.org

ওরসজাত কন্যার সাথে তার অংশ অর্ধেক থেকে হ্রাস পেয়ে এক ষষ্ঠাংশ হয়ে যায় দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য এবং ৫. বৈমাত্রেয় বোন, সহোদর বোন তার অংশকে অর্ধেক থেকে হ্রাস করে এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) করে দেয়।

চার ইমামসহ অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে যে ব্যক্তি নিজে কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে অন্য কাউকে মিরাস থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত করতে পারে না। না পূর্ণাঙ্গভাবে বঞ্চিত করতে পারে, আর না আংশিকভাবে। কারণ, তার অস্তিত্ব অস্তিত্বহীনতারই শামিল।

এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে কাফের সন্তান, কাফের ভাই, ক্রীতদাস ভাই এবং হত্যাকারী ভাইয়ের কারণে স্বামী, স্ত্রী ও মায়ের প্রাপ্য বড় অংশ হ্রাস পেয়ে ছোট অংশে রূপান্তরিত হবে। শেষ তিনটি অবস্থা (কাফের ভাই, ক্রীতদাস ভাই ও হত্যাকারী ভাই)-এর ক্ষেত্রে দাউদ যাহেরী র. তার মতের সমর্থক। আর শুধুমাত্র হত্যাকারীর বিষয়ে হাসান বসরী, হুসাইন ইবনে সালেহ ও ইবনে জারীর তাবারী রহ. তার মতের অনুসারী ও সমর্থক।

এ কারণে যদি মৃত ব্যক্তির কাফের পুত্র, স্ত্রী ও আপন ভাই থাকে তাহলে স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ এবং অবশিষ্ট সম্পদ আপন ভাই লাভ করবে। এ ব্যাপারে চার ইমামই একমত।

যে ওয়ারিশ 'হাজাব হিরমান' এর কারণে উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়েছে সে কোনো কোনো সময় অন্য ওয়ারিশদের জন্য 'হাজাব নুকসান' বা অংশ হ্রাসকারী হাজাব হতে পারে। অতএব, যদি মৃতের মা, বাপ ও ভাই বর্তমান থাকে তাহলে ভাই যদিও বাপের কারণে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে; কিন্তু সে মায়ের অংশকে হ্রাস করে ছয় ভাগের এক ভাগ করে দেবে।

ফিকহবিদগণ হাজাবের কিছু নিয়মকানুন প্রণয়ন করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

**এক.** মৃতের সাথে যে ব্যক্তির সম্পর্ক কোনো ওয়ারিশের মাধ্যমে সেই ওয়ারিশের বর্তমানে ঐ ব্যক্তি 'হাজাব হিরমান' সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যাবে। কারণ, যে ক্ষেত্রে এরূপ কোনো ব্যক্তি এবং এমন ওয়ারিশ যার কারণে সে মৃতের সাথে সম্পর্কিত এক সাথে বর্তমান থাকে, সে ক্ষেত্রে উক্ত ওয়ারিশ ব্যক্তিই মিরাস লাভের অধিক হকদার। কারণ সে তুলনামূলকভাবে মৃতের অধিক নিকটবর্তী। মৃতের সাথে দূরসম্পর্কের ব্যক্তিটি মৃতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে নিকট সম্পর্কের ব্যক্তির মধ্যস্থতায় এবং তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে। আর মূলের বর্তমানে তার প্রতিনিধি হকদার হয় না।

www.amarboi.org

'আসাবা'দের ক্ষেত্রে এ নীতি ব্যতিক্রমহীনভাবে কার্যকর। তাই পিতা দাদাকে বঞ্চিত (মাহজুব) করবে এবং সহোদর ভাই তার ছেলেকে (ভাতিজা) বঞ্চিত করবে একইভাবে এ নিয়ম অন্যান্য 'আসাবা'দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ নিয়ম বহু সংখ্যক যাবিল ফুরূয (নির্ধারিত অংশের প্রাপক)-এর ক্ষেত্রেও কার্যকর। সুতরাং পিতা দাদাকে তার নির্ধারিত অংশ থেকে বঞ্চিত করবে এবং মা নানীকে বঞ্চিত করবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার 'যাবিল ফুরূয'দের ব্যাপারে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। যেমন মা-শরীক ভাই-বোন। কারণ তারা মায়ের বর্তমানেও ওয়ারিশ বয়ে। তবে তাদের সংখ্যা একাধিক হলে তারা মায়ের জন্য 'হাজাব নুকসান' (মায়ের প্রাপ্য অংশ হ্রাসকরা)-এর কারণ হবে। বাপ ও দাদা মা-শরীক ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে দেয়। অথচ, মা-শরীক ভাই ও বোন তাদের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান এ ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দিয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি 'কালালা' হবে অর্থাৎ তার বাপ, মা ও সন্তান থাকবে না।

**দুই.** নিকট সম্পর্কের অধিকারী অপেক্ষাকৃত দূর সম্পর্কের অধিকারীকে বঞ্চিত করবে যখন গুণ ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে সেটাই তার প্রাপ্য হয়। এ নিয়মটি প্রথমোক্ত নিয়মটির চেয়ে অধিক ব্যাপক। কারণ এর অধীনে এমন দূর সম্পর্কীয়ও এসে যায়, যে তার চেয়ে নিকট সম্পর্কধারীর মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পৃক্ত। আবার এমন ব্যক্তিও আসে, যে তার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন : পুত্র পৌত্রকে বঞ্চিত করে যদিও সে (পুত্র) তার (উক্ত পৌত্রের) পিতা না হয়। দুইজন কন্যা 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের হকদার) হিসেবে পৌত্রীকে বঞ্চিত করে দেয়। ভাই চাচাকে বঞ্চিত করে যদিও চাচা ভাইয়ের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত নয়। আর নিকটসম্পর্কের দাদী-নানী দূর সম্পর্কের দাদী-নানীকে বঞ্চিত করে যদিও দূরবর্তীগণ নিকটবর্তীদের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত নয়। এ নিয়মটির প্রয়োগ 'আসাবা' ও 'যাবিল ফুরূয' উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর হয়ে থাকে।

**তিন.** অধিক নিকটতম আত্মীয় দুর্বলতম আত্মীয়কে বঞ্চিত করবে। এ কারণে সহোদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাইকে বঞ্চিত করবে এবং বৈমাত্রেয় বোন আপন বোনের বর্তমানে অর্ধাংশ পাবে না। এ নীতি সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব ক্ষেত্রে স্তর এক হবে এবং আত্মীয়তা-বন্ধনের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর স্তর একই হলে বঞ্চিত হওয়ার জন্য আত্মীয়তার নৈকট্য বা দৃঢ়তা বিচার্য।[১৩৩]

---

১৩৩. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৭১-১৮০; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৯৩-১০০; আশ-শারহুল- কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪১৫; আত-তুহফা আলাশ শারওয়ানী, খ. ৬, পৃ. ১৮-২২।

www.amarboi.org

**আওল' (اَلْعَوْل)**

আওল' (اَلْعَوْل) শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ হলো, বৃদ্ধি। যেমন আরবীতে বলা হয় : عَالَتِ الْفَرِيضَةُ فِي الْحِسَابِ অর্থাৎ হিসাবে নির্ধারিত অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অতীতকালের ক্রিয়ারূপ হচ্ছে عَالَ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ারূপ হচ্ছে يَعُول وَتُعِيل ।[১৩৪]

ফারায়েজশাস্ত্রের পরিভাষায় 'আওল' (اَلْعَوْل) হলো, 'যাবিল ফুরূয' (যাদের অংশ নির্ধারিত)দের প্রাপ্য অংশসমূহ মূল একক থেকে বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের অংশের অনুপাতে পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের অংশ হ্রাস করে বণ্টন করার নাম। এ বিধানকেই আতল বলে। যেমন কোনো মহিলা স্বামী, মা ও একজন সহোদর বোন রেখে মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে স্বামী লাভ করবে নির্ধারিত অংশ অর্ধেক। মা লাভ করবে নির্ধারিত অংশ তিন ভাগের এক ভাগ এবং সহোদর বোন লাভ করবে নির্ধারিত অংশ হিসেবে অর্ধেক। এ ক্ষেত্রে স্বামী, বোন ও মায়ের নির্ধারিত অংশ হিসেবে প্রাপ্য অংশসমূহের সংখ্যা যে মূল একক ধরে পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করা হয় তার থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইসলামে এটিই সর্বপ্রথম 'আওল' সম্পর্কিত মাসআলা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আর কেউ কেউ বলেন, 'আওল' সম্পর্কিত প্রথম মাসআলা ছিল, এক মহিলা তার স্বামী ও দুই বোনকে রেখে মারা যায়। এটা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালের প্রথম দিকের ঘটনা। বিষয়টি নিয়ে তিনি সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর সাথে পরামর্শকালে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, আল্লাহ তোমাদের কাকে অগ্রাধিকার দান করেছেন আর কাকে পিছিয়ে রেখেছেন। আমি যদি প্রথমে স্বামীকে দিয়ে বণ্টন শুরু করি এবং তার পুরো প্রাপ্য দিয়ে দেই তাহলে দুই বোনের জন্য তাদের প্রাপ্য অংশ পুরোটা অবশিষ্ট থাকে না। আর যদি দুই বোনকে দিয়ে শুরু করি এবং প্রথমে তাদের প্রাপ্য অংশ পুরোপুরি দিয়ে দেই তাহলে স্বামীর প্রাপ্য অংশ পুরোটা অবশিষ্ট থাকে না। বিখ্যাত রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. অন্য একটি রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রা. অথবা অন্য বর্ণনায় হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. আওল করার পরামর্শ দেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমীরুল-মু'মিনীন, যদি কোনো ব্যক্তি ছয়টি দিরহাম রেখে মারা যায় এবং এক ব্যক্তি তার কাছে তিন দিরহাম এবং অপর এক ব্যক্তি চার দিরহাম পাওনা থাকে তাহলে

---

১৩৪. আল-কামূস, খ. ৪, পৃ. ২৩।

www.amarboi.org

আপনি কী করবেন? তার সম্পূর্ণ মাল (ছয় দিরহাম)কে সাত ভাগে ভাগ করবেন, তাই নয় কি? হযরত উমর রা. বললেন : হ্যাঁ, তাই। হযরত আব্বাস রা. বললেন : এ ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাই। অতপর, হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু 'আওল' (বৃদ্ধি) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফারায়েজের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন পরিস্থিতিতে 'আওল' এর সূচনা করেন যখন তার জন্য অংশসমূহের বণ্টন কঠিন হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো নির্ধারিত অংশ অন্য অংশসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছিলো। তখন তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কাকে পিছিয়ে রেখেছেন? তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও তাকওয়াসম্পন্ন মানুষ। তাই তিনি বললেন, আমার সামনে একটা রাস্তাই খোলা আছে। আর তা হলো, যার যার অংশ অনুপাতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিই। আর নির্ধারিত অংশ যা বেড়েছে তা প্রত্যেক প্রাপকের ওপর বণ্টন করে দেই। তার খিলাফত আমলে কেউ-ই তার এ ফয়সালার বিরোধিতা করেননি। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল শুরু হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এ কথা বলে দ্বিমত প্রকাশ করলেন যে, মহান আল্লাহ যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাকে অগ্রাধিকার দিলে এবং যাকে পিছিয়ে রেখেছেন তাকে পিছিয়ে রাখলেও ফরয অংশসমূহ বণ্টনের ক্ষেত্রে কখনো 'আওল' করতে হতো না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ কাকে আগে রেখেছেন এবং কাকে পেছনে রেখেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা স্বামী, স্ত্রী, মা ও দাদী নানীকে আগে রেখেছেন এবং কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় বোনদের পেছনে রেখেছেন।

অন্য একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মহান আল্লাহ যাকে একটি নির্ধারিত অংশ থেকে আরেকটি নির্ধারিত অংশে নামিয়ে দিয়েছেন তাকেই তিনি অগ্রগামী করেছেন। আর যাকে একটি নির্ধারিত অংশ থেকে একটি অ-নির্ধারিত অংশে নামিয়ে দিয়েছেন তাকেই পিছিয়ে রেখেছেন।

'আওল' এর সমর্থকদের দলীল হচ্ছে, সমস্ত ওয়ারিশ তাদের উত্তরাধিকার লাভের কারণের ক্ষেত্রে সমান। এর যৌক্তিক দাবি হলো, তা প্রাপ্তির অধিকারের ক্ষেত্রেও তারা সমান হবে। তাই অবকাশ থাকলে তারা প্রত্যেকে তার পূর্ণ হক নিয়ে নেবে। আর যদি সে সুযোগ না থাকে তাহলে পাওনাদারদের ন্যায় তাদের নিজ নিজ অংশ অনুপাতে হিসাবমত পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে গ্রহণ করবে। কোনো একজন



www.amarboi.org

ওয়ারিশের অধিকার রহিত করা ঠিক হবে না। কারণ, প্রমাণিত সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে সে তার অংশের প্রাপক। এটাই ইমাম চতুষ্টয়ের রায়।[১৩৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর দলীল হচ্ছে, সম্পদে সবার হক সমান নয়। তাই সেই সম্পদের সাথে যদি এমন অধিকার সম্পর্কিত থাকে যা বিদ্যমান সম্পদ দ্বারা পূরণ হওয়ার নয়, তাহলে অধিক শক্তিশালী পাওনাদারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ কারণেই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে কাফন-দাফন, ঋণ, ওসিয়ত ও মিরাসকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। তাই যখন 'যাবিল ফুরূয'দের প্রাপ্য অংশ থেকে পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ কম হবে তখন অধিক শক্তিশালী অংশকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আর যাকে একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে স্থানান্তর করে আরেকটি নির্দিষ্ট অংশে নিয়ে যাওয়া হয়, সে যে কোনো বিচারেই নির্দিষ্ট অংশের হকদার। অতএব, সে এমন ব্যক্তির চেয়ে শক্তিশালী হকদার যাকে একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে স্থানান্তরিত করে অ-নির্দিষ্ট অংশের হকদার করা হয়। সুতরাং এক বিচারে সে নির্দিষ্ট অংশের হকদার হলেও আরেক বিচারে 'আসাবা' হিসেবে গণ্য। তাই তার প্রাপ্য অংশ হ্রাস করা অথবা তাকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা অধিক যুক্তিসংগত। কেননা, 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের হকদার) 'আসাবা'দের চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, 'আওল' হওয়ার মতো মৌলিক মাসআলাগুলো হচ্ছে ছয়, বারো ও চব্বিশ সংখ্যার।

যে মাসআলার মূল সংখ্যা ছয় তা সাত, আট, নয় এবং দশ পর্যন্ত আওল হয়।

প্রথমটির উদাহরণ : স্বামী ও দুই সহোদর বোন। কারণ এ ক্ষেত্রে স্বামীর প্রাপ্য (পরিত্যক্ত সম্পদের) অর্ধেক। আর তা হলো তিন অংশ এবং দুই বোনের প্রাপ্য তিন ভাগের দুই ভাগ। আর তা হলো চার অংশ। সুতরাং যোগফল মোট সাত।

আট সংখ্যায় আওলের উদাহরণ : স্বামী, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও মা। স্বামীর প্রাপ্য (পরিত্যক্ত সম্পদের) অর্ধেক তা হলো তিন অংশ। দুই বোনের প্রাপ্য তিন ভাগের দুই ভাগ তা হলো চার অংশ এবং মায়ের প্রাপ্য ছয় ভাগের এক ভাগ তা হলো এক অংশ, মোট আট অংশ হলো।

নয় সংখ্যায় আওলের উদাহরণ : স্বামী, দুই সহোদর বোন, মা-শরীক দুই ভাই। স্বামীর প্রাপ্য (পরিত্যক্ত সম্পদের) অর্ধেক তা হলো তিন অংশ। দুই সহোদর

---

১৩৫. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৯৫-১৯৬; আল-মাবসূত, খ. ২৯, পৃ. ১৬১-১৬২, দারুল মারেফা সং.; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৬৫।

www.amarboi.org

বোনের প্রাপ্য তিন ভাগের দুই ভাগ তা হলো চার অংশ এবং মা-শরীক ভাইদের প্রাপ্য তিন ভাগের এক ভাগ তাহলে দুই অংশ মোট নয় অংশ।

দশ সংখ্যায় আওলের উদাহরণ : স্বামী, এক সহোদর বোন, এক বাপ-শরীক বোন, মা-শরীক দুই ভাই ও মা। এ ক্ষেত্রে স্বামীর প্রাপ্য (পরিত্যক্ত সম্পদের) অর্ধেক, তিন অংশ। সহোদর বোনের প্রাপ্য অর্ধেক তিন অংশ। বাপ-শরীক বোনের প্রাপ্য ছয় ভাগের এক ভাগ এক অংশ। মা-শরীক দুই ভাইয়ের প্রাপ্য অংশ তিন ভাগের এক ভাগ, দুই অংশ এবং মায়ের প্রাপ্য ছয় ভাগের এক ভাগ, দুই অংশ মোট দশ।

মূল মাসআলা যখন বারো সংখ্যার হবে তখন কখনো তার 'আওল' তের হবে। যেমন স্ত্রী, মা ও বাপ-শরীক বোন। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রাপ্য (পরিত্যক্ত সম্পদের) চার ভাগের এক ভাগ; মায়ের প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ এবং বাপ-শরীক বোনের প্রাপ্য অর্ধেক। অতএব, মূল মাসআলা হবে বারো। স্ত্রীর জন্য তিন অংশ, বোনের জন্য ছয় অংশ এবং মায়ের জন্য চার অংশ মোট তের।

বারো সংখ্যার 'আওল' আবার কখনো পনের হবে। যেমন স্বামী, দুই মেয়ে, মা, ও বাপ। স্বামীর প্রাপ্য চার ভাগের এক ভাগ তাহলো তিন অংশ। মেয়েদের জন্য আট অংশ এবং মা ও বাপ প্রত্যেকের দুই অংশ করে মোট পনের।

বারো সংখ্যার 'আওল' কখনো সতেরও হয়। যেমন স্বামী, মা, বাপ-শরীক দুই বোন এবং মা-শরীক দুই ভাই। স্ত্রীর প্রাপ্য চার ভাগের একভাগ অর্থাৎ তিন অংশ। মায়ের প্রাপ্য ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই অংশ। বাপ-শরীক বোনদের প্রাপ্য তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ আট অংশ এবং মা-শরীক ভাইদের প্রাপ্য তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চার অংশ; সর্বমোট সতের অংশ।

মূল মাসআলা যখন চব্বিশ দ্বারা হবে তখন তার 'আওল' হবে সাতাশ। যেমন স্ত্রী, দুই কন্যা, মা ও বাপ। স্ত্রীর প্রাপ্য (পরিত্যক্ত সম্পদের) আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ তিন অংশ। দুই কন্যার প্রাপ্য তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ ষোল অংশ এবং বাপ ও মা প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চার অংশ করে আট অংশ, মোট সাতাইশ অংশ।

উপরোক্ত মাসাআলাসমূহের মূল সংখ্যা ছাড়া অন্যান্য মাসআলার মূল সংখ্যায় 'আওল' হয় না। এ ধরণের মাসআলাসমূহের মূল সংখ্যাগুলো হচ্ছে, দুই, তিন, চার ও আট। দুই সংখ্যায় 'আওল' হয় না। কারণ, দুই সংখ্যা তখনই হয় যখন তাতে দুই অর্ধাংশ থাকে। যেমন স্বামী ও একজন সহোদর বোন। অথবা এক অর্ধাংশ ও অবশিষ্টাংশ। যেমন স্বামী ও একজন সহোদর ভাই।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে তিন সংখ্যার ক্ষেত্রে 'আওল' হয় না। কারণ, এ থেকে যে অংশ আসবে তা হবে তিন ভাগের এক ভাগ ও অবশিষ্টাংশ। যেমন মা ও সহোদর ভাই অথবা তিন ভাগের দুই ভাগ (দুই তৃতীয়াংশ) ও অবশিষ্টাংশ। যেমন দুই কন্যা ও একজন বাপ-শরীক ভাই। অথবা তিন ভাগের এক ভাগ (এক তৃতীয়াংশ) ও তিন ভাগের দুই ভাগ (দুই তৃতীয়াংশ)। যেমন মা-শরীক দুই বোন ও আপন দুই বোন।

চার সংখ্যায় 'আওল' হয় না। কারণ, এ থেকে যে অংশ বের হবে তা হবে চার ভাগের এক ভাগ (এক চতুর্থাংশ) ও অবশিষ্টাংশ। যেমন স্বামী ও পুত্র অথবা চার ভাগের এক ভাগ (এক চতুর্থাংশ), দুই ভাগের এক ভাগ (অর্ধাংশ) ও অবশিষ্টাংশ। যেমন স্বামী, এক মেয়ে ও একজন সহোদর ভাই, অথবা চার ভাগের এক ভাগ (এক চতুর্থাংশ) ও অবশিষ্টের তিন ভাগের এক ভাগ (এক তৃতীয়াংশ)। যেমন স্ত্রী ও বাপ-মা।

আট সংখ্যায়ও 'আওল' হয় না। কারণ, এ থেকে যে অংশ বের হয় তা হবে আট ভাগের এক ভাগ (এক অষ্টমাংশ) ও অবশিষ্টাংশ। যেমন স্বামী, এক মেয়ে ও এক সহোদর ভাই।[১৩৬]

## রদ্দ (الرَّدّ) বা পুনঃবন্টনের কারণে উত্তরাধিকার লাভ

রদ্দ (الرَّدّ) শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরিয়ে দেয়া। বলা হয়ে থাকে : رَدَدْتُ অর্থাৎ আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। অনুরূপভাবে বলা হয় : رَدَدْتُ عَلَيْه الْوَدِيعَةَ আমি তাকে আমানত ফেরত দিয়েছি। رَدَدْتُهُ إِلَى مَنْزِله فَارْتَدَّ إِلَيْه আমি তাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছি তাই সে ফিরে গিয়েছে।[১৩৭]

ফারায়েজ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'রদ্দ' বলা হয় বংশগত 'যাবিল ফুরূয'দের জন্য নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর আর কোনো হকদার না থাকলে। অবশিষ্ট মাল তাদের প্রত্যেকের নির্ধারিত অংশ অনুপাতে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া তথা পুনঃবন্টন করা।[১৩৮] 'রদ্দ' বাস্তবায়নের জন্য দু'টি বিষয় থাকা জরুরী :

**এক.** নির্ধারিত অংশসমুহ প্রদানের ফলে পরিত্যক্ত সব সম্পদ নি:শেষ না হওয়া। কারণ সব সম্পদ নি:শেষ হলে পুনঃবন্টর জন্য কোনো সম্পদ থাকবে না।

**দুই.** বংশগত আসাবা কিংবা কারণজনিত 'আসাবা'দের কেউ না থাকা। বিষয়টি সম্পর্কে অবশ্য কিছু মতভেদ রয়েছে। যদি কোনো বংশগত 'আসাবা' থাকে

১৩৬. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

১৩৭. আল-মিসবাহুল মুনীর, ক্রিয়ামূল رد।

১৩৮. আল-ফান্নারী আলাস সিরাজিয়্যা, পৃ. ২২৮।

www.amarboi.org

এবং সে 'যাবিল ফুরূয' (যাদের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত)দের অন্তর্ভুক্ত কেউ হয় যথা বাপ, দাদা তাহলে নির্ধারিত অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত মাল সে 'আসাবা' হওয়ার কারণে গ্রহণ করবে।

'রদ্দে'র বিষয়টিতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান ছিল। এ বিষয়টি সম্পর্কে তারা দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর সাথে আবার কিছু সংখ্যক তাবেয়ী এবং মুজতাহিদ ইমামগণও সম্পৃক্ত।

সাহাবায়ে কেরামের একটি দল 'যাবিল ফুরূয'দের অনুকুলে 'রদ্দে'র সমর্থক। ইমাম আবু হানীফা র.-এর মত এবং ইমাম আহমদ র.-এর দু'টি বর্ণনার প্রসিদ্ধ বর্ণনাও তাদের অনুরূপ। তবে কাদের অনুকূলে 'রদ্দ' হবে সে বিষয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুসারী।

এ বিষয়ে হযরত আলী রা. এর মত হচ্ছে, 'যাবিল ফুরূযে'র সাথে যদি বংশগত 'আসাবা' ('আসাবা নাসাবিয়া') বা কারণজনিত 'আসাবা' (আসাবা সাবাবী) না থাকে তাহলে 'যাবিল ফুরূয'দের প্রাপ্য অংশ অনুসারে তাদের অনুকূলে 'রদ্দ' হবে। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর অনুকূলে 'রদ্দ' হবে না। এটা হানাফীদেরও মত। আর হাম্বলীদের কাছে এটিই বিশুদ্ধতর মত।

এ বিষয়ে হযরত উসমান রা.-এর মত হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর অনুকূলেও 'রদ্দ' হবে। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.ও একই মতের অনুসারী। হযরত উসমান রা.-এর মতের দলীল হলো, أَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ 'ক্ষতির বিনিময়ে লাভ আসে'। যেহেতু 'আওলে'র কারণে স্বামী ও স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় সেহেতু রদ্দের দ্বারা তা বৃদ্ধি পাওয়া জরুরী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, 'যাবিল ফুরূয'দের অনুকুলে 'রদ্দ' হবে। তবে ছয়টি শ্রেণী এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা হচ্ছে : ১. স্বামী, ২. স্ত্রী ও ৩. পৌত্রী ওরসজাত কন্যার সাথে, ৪. বাপ-শরীক বোন সহোদর বোনের সাথে, ৫. বৈপিত্রেয় ভাই-বোন মায়ের সাথে, ৬. দাদী ও নানী যে কোনো অংশীদারের সাথে।

ইমাম আহমদ র. থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, স্বামী, স্ত্রী, মায়ের বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাইবোন ও দাদী নানীর ওপর রদ্দ হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিন শ্রেণীর 'যাবিল ফুরূয' ছাড়া আর সবার অনুকূলে 'রদ্দ' হবে। উক্ত তিন শ্রেণীর 'যাবিল ফুরূয' হচ্ছে, ১. স্বামী, ২. স্ত্রী এবং ৩. দাদী নানী।[১৩৯]

---

১৩৯. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ২২৯; আল-মাবসূত, খ. ২৯, পৃ. ১৯২, দারুল মা'রিফা সং.; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ২৯৬ ও হাশিয়াতুশ শারওয়ানী, খ. ৬, পৃ. ১২।

www.amarboi.org

চতুর্থ শতকের পরবর্তী কালের শাফেয়ী ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, 'যাবিল ফুরূয'দের অনুকুলে 'রদ্দ' হবে এবং 'যাবিল আরহাম'দের উত্তরাধিকারী করা হবে বায়তুল মাল সুসংগঠিত না হলে। যেমন যদি কোনো ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানই না থাকে। অথবা থাকলেও তার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলির কিছু বর্তমান না থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, ইমামের মধ্যে কিছু শর্তাবলির ঘাটতি থাকলেও তার মধ্যে যদি ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা থাকে এবং হকের প্রাপকদের কাছে হক পৌঁছিয়ে দেয় তাহলে বায়তুল মাল সুসংগঠিত আছে বলে ধরে নেয়া হবে।

**রদ্দের সমর্থকদের দলীল**

স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া অন্যদের অনুকূলে রদ্দের সমর্থকদের দলীলসমূহ নিম্নরূপ :

**এক** : মহান আল্লাহর বাণী : وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ "আর তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পরের মিরাসের বেশি হকদার"।[১৪০] এর অর্থ হচ্ছে, আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে তারা একে অপরের মিরাসের অধিক হকদার। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'যাবিল আরহাম' (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ) আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে পুরো মিরাসের হকদার। এ আয়াতে উল্লিখিত 'মিরাস' বলতে গোটা 'মিরাস' বা উত্তরাধিকার বুঝাচ্ছে। এর দ্বারা বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তা আংশিক মিরাসের অর্থ গ্রহণ করার পরিপন্থী। অতএব, এখানে এ অস্পষ্টতা নেই যে, আয়াত থেকে যে অগ্রগণ্যতা ও অগ্রাধিকার বুঝা যাচ্ছে তা নির্ধারিত অংশের প্রাপক প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দিয়ে দিলেই তার অর্থ পূর্ণতা লাভ করবে। কারণ, নির্ধারিত অংশের প্রাপককে তার প্রাপ্য দেয়ার বিষয়টি অন্য একটি আয়াত (সূরা আন-নিসা) থেকে প্রমাণিত। সুতরাং সূরা আনফালের এ আয়াতটিকে নির্ধারতি অংশ সম্পর্কিত নির্দেশের তাকিদ হিসেবে গ্রহণ না করে একটি নতুন নির্দেশের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করাই উত্তম। তাহলে, দুটি আয়াতের নির্দেশই পালন করা হয়ে যাবে। এ কারণেই স্বামী ও স্ত্রীর অনুকূলে 'রদ্দ' হবে না। কারণ, তাদের দু'জনের মধ্যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন নেই।

**দুই**. হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস রা. অসুস্থ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তখন হযরত সা'দ রা. বললেন : আমার উত্তরাধিকারী যেহেতু আমার একমাত্র কন্যা। তাই আমি কি তার জন্য আমার সমুদয় সম্পত্তি ওসিয়ত করে যাব? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১৪০. সূরা আনফাল, আয়াত : ৭৫।

www.amarboi.org

বললেন : الثلث خير و الثلث كثير 'এক তৃতীয়াংশ উত্তম এবং এক তৃতীয়াংশই অনেক'।[১৪১] হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা ছিল মেয়েই গোটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম তার অস্বীকৃতি জানালেন না। তিনি তাকে এক তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করতে নিষেধ করলেন। অথচ একমাত্র মেয়ে ছাড়া তার আর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। এ থেকে জানা গেল যে, 'রদ্দ' বা পুনঃবন্টনের বিষয় সঠিক। কারণ, তার মেয়ে রদ্দের মাধ্যমে তার নির্ধারিত অংশ অর্ধেকের অধিক যদি না পেতো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য অর্ধেকের বেশি সম্পত্তির ওসিয়ত বৈধ করতেন।

**তিন.** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিআনকারী নারীকে তার পুত্রের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ বানিয়েছেন। আর এটা কেবল 'রদ্দ' বা পুনঃবন্টনের মাধ্যমেই হতে পারে। আর ওয়াসেলা ইবনে আসকা রা., বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ مِيرَاثَ لَقِيطِهَا وَعَتِيقِهَا وَالاِبْنِ الَّذِي لُوعِنَتْ بِهِ .

"নারী তার কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ, মুক্ত করা দাস এবং যে পুত্রের কারণে তার সাথে লি'আন করা হয়েছে তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে"।[১৪২]

**চার.** 'যাবিল ফুরূয'গণ মুসলমানদের সাথে ইসলামে অংশগ্রহণ করেছে এবং আত্মীয়তার কারণে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়েছে। 'যাবিল ফুরূয'দের মাঝে শুধু আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে যদিও 'আসাবা' হওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে না। তা সত্ত্বেও উক্ত আত্মীয়তার কারণে তার অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন সহোদর ভাইয়ের ক্ষেত্রে মায়ের আত্মীয়তা ও নৈকট্য। কেননা, মায়ের আত্মীয়তা ও নৈকট্য যদিও এককভাবে 'আসাবা' হওয়ার দাবিদার নয়, কিন্তু তার দ্বারা অগ্রাধিকার অর্জিত হয়। আর যে কারণে সে নির্ধারিত অংশ লাভের দাবিদার হয়েছে সে কারণেই যেহেতু অগ্রাধিকার তাই এ অগ্রাধিকারের ভিত্তি উক্ত নির্ধারিত অংশ। অতএব, অবশিষ্ট সমুদয় সম্পদ 'যাবিল ফুরূয'দের প্রাপ্য অংশ অনুপাতে তাদের মধ্যে 'রদ্দ' বা পুনর্বন্টন করে দেয়া হবে। আর যেভাবে মূল অংশের ক্ষেত্রে

---

১৪১. বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. ১৬৪ ও খ. ৯, পৃ. ৪৯৭; সালাফিয়্যা সং. এবং মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২৫৩, ঈসা হালাবী সং।

১৪২. হাদীসটি যে ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে : المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عنه হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী (তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৬, পৃ. ২৯৮ ও ২৯৯; প্রাকশিত আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা); আবু দাউদ খ. ৩, পৃ. ৮৪, মাতবাআতুল আনসারিয়া, দিল্লী, সং.; বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ২৪০, দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া সং.। বায়হাকী বলেছেন, এটি প্রমাণিত নয়।

www.amarboi.org

দৃঢ়তর ও নিকটতর হওয়ার বিবেচনা বাতিল বলে গণ্য হবে সেভাবে 'রদ্দে'র বিবেচনায়ও তা বাতিল হবে।[১৪৩]

অন্য একদল আলিমের মত হচ্ছে, 'যাবিল ফুরূয'দের কারো অনুকূলেই 'রদ্দ' হবে না। অতএব, গোটা পরিত্যক্ত সম্পত্তি যদি নির্ধারিত অংশসমূহের মধ্যে বণ্টিত না হয়; বরং নির্ধারিত অংশসমূহ দেয়ার পরও তা থেকে কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যায় এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কোনো 'আসাবা' না থাকে তাহলে বায়তুল মাল উক্ত অবশিষ্ট মালের হকদার হবে। কারণ এ দলটি 'যাবিল আরহাম'দের ওয়ারিশ হওয়ার সমর্থক নয়। এটি যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর মত। উরওয়া, যুহরী, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী র. প্রমুখ এ মতেরই সমর্থক।

আসাবা নাসাবী (বংশগত আসাবা) বা আসাবা সাবাবী (কারণজনিত আসাবা) এর অবর্তমানে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মালে প্রদানের ক্ষেত্রে মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো ফিকহবিদ এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, ইমামকে এমন আদল তথা ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও বিশ্বস্ত হতে হবে, যাতে তিনি শরীয়তসম্মত খাতসমূহে তা ব্যয় করেন। তিনি যদি আদল না হন তা হলে অবশিষ্ট মাল 'যাবিল ফুরূয'দের মধ্যে পুনরায় বন্টিত হবে। কিন্তু 'যাবিল ফুরূয' না থাকলে তা বায়তুল মালের প্রাপ্য হবে। কারণ, তারা বায়তুল মালকে আসাবা হিসেবে গণ্য করেন। তাদের মতে, বংশগত ও কারণজনিত 'আসাবা'র পরই বায়তুল মালের মর্যাদা ও অবস্থান।

### 'রদ্দ' বিরোধীদের দলীল

**এক.** যারা 'রদ্দ' বা পুনর্বণ্টনের বিরুদ্ধে তাদের দলীল হচ্ছে, সূরা আন-নিসার আয়াত, যাতে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বর্ণনা বিদ্যমান। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ 'যাবিল ফুরূয' ওয়ারিশদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ কি তা বর্ণনা করেছেন। 'নস' (نص) দ্বারা প্রমাণিত পরিমাণের সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ করা যায় না। কারণ এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির অর্থ শরীয়তের সীমা লংঘন করা। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতের শেষে বলেছেন :

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ "আর যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হবে ও তার বিধি-নিষেধের সীমা লংঘন করবে তাকে তিনি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[১৪৪] আল্লাহ তাআলা শরীয়তের সীমা লংঘনকারীর শাস্তির বিষয়টি মিরাসের আয়াতের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

---

১৪৩. শারহুস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ২৩৯ ও ২৪১।

১৪৪. আল-কুরআন, ৪ : ১৪।

www.amarboi.org

**দুই.** নির্দিষ্ট অংশসমূহের অতিরিক্ত সম্পদ এমন সম্পদের ন্যায় যার কোনো হকদার নেই। অতএব, তা বায়তুল মালের প্রাপ্য। যেমনটি হয়ে থাকে সে কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে গেলে । কারণ, 'রদ্দ' হবে নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্তির বিবেচনায় অথবা 'আসাবা' হওয়ার ভিত্তিতে কিংবা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার কারণে। এখানে নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্তির বিবেচনায় হবে না। এ কারণে যে, নির্দিষ্ট অংশের প্রাপকগণ তাদের প্রত্যেকের অংশ নিয়ে নিয়েছে। 'আসাবা' হওয়ার ভিত্তিতেও হবে না। এ কারণে যে, 'আসাবা' হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী 'আসাবা'কে তুলনামূলকভাবে দূরবর্তী 'আসাবা'র চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার কারণে হবে না। এজন্য যে, 'যাবিল আরহামে'র উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রেও অধিক নিকটবর্তীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এ সব ক'টি অবস্থাই যখন বাতিল তখন 'রদ্দ' হওয়ার বিষয়টিও বাতিল।[১৪৫]

## 'রদ্দ' বা পুনর্বণ্টনের শ্রেণীবিভাগ

'রদ্দ' বা পুনর্বণ্টনের বিষয়টি চার প্রকার। এর কারণ হলো, বিষয়টির সংগে জড়িত থাকবে হয়তো এক বা একাধিক শ্রেণী, অতিরিক্ত সম্পদ যাদের ওপর রদ্দ করা হবে। উভয় অবস্থাতেই হয়তো বিষয়টিতে এমন কেউ থাকবে, যার জন্য 'রদ্দ' প্রযোজ্য নয় অথবা এমন কেউ থাকবে না। এভাবে এটি চার শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

**প্রথম শ্রেণী :** যাদেরকে তাদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদও পুনর্বণ্টন করা যাবে তারা একই শ্রেণীর (অর্থাৎ এক প্রকারের ওয়ারিশ) হবে এবং এমন কেউ থাকবে না, যার অনুকূলে 'রদ্দ' হয় না। যেমন : মৃত ব্যক্তি দুই কন্যা অথবা দুই বোন অথবা দুই দাদী বা নানীকে রেখে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে দুই দিয়ে মাসআলাটির সমাধান হবে এবং প্রত্যেককে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধাংশ অর্থাৎ দুই ভাগের একভাগ দেয়া হবে। কেননা, অধিকারের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান।

**দ্বিতীয় শ্রেণী :** মাসাআলাটিতে দুই অথবা তিনটি শ্রেণী থাকবে, যাদের অনুকূলে 'রদ্দ' বা পুনর্বণ্টন হয় এবং এমন কেউ থাকবে না, যাদের অনুকূলে 'রদ্দ' হয় না। অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে জানা গিয়েছে যে, যাদের অনুকূলে 'রদ্দ' হয় তাদের শ্রেণী তিনের অধিক নেই। তাই এ ক্ষেত্রে মূল মাসআলাটি হবে প্রাপকদের সকলের অংশের যোগফল অনুসারে। এ কারণে মাসআলায় যদি দুই ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ছয় ভাগের দুই ভাগ থাকে যেমন: দাদী বা নানী ও মা-শরীক বোনের ক্ষেত্রে হয় তাহলে যেহেতু মাসআলাটি ছয় দ্বারা সমাধা হবে এবং তারা

১৪৫. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ২৩৯-২৪০।

www.amarboi.org

প্রত্যেকে নির্ধারিত অংশ হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ লাভ করবে (এবং আর কোনো ওয়ারিশ না থাকার কারণে মোট চার অংশ অবশিষ্ট থাকবে)। সে কারণে মূল মাসআলা নির্ধারণ করা হবে দুই সংখ্যাকে। এভাবে সম্পত্তি দুই ভাগ করে অর্ধেক হিসাবে 'জাদ্দাহ্' বা দাদী-নানী ও মা-শরীক বোনের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। কারণ উভয়ের প্রাপ্য অংশ সমান।

আর যখন মাসআলায় এক তৃতীয়াংশের তথা তিন ভাগের এক ভাগের প্রাপক এবং এক ষষ্ঠাংশ তথা ছয় ভাগের এক ভাগের প্রাপক থাকে, যেমন : বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের দুই জন যদি মায়ের সাথে বর্তমান থাকে তাহলে মূল মাসআলাটি হবে ছয় সংখ্যা দ্বারা। যেহেতু ওয়ারিশদের সর্বমোট প্রাপ্য অংশ তিন। তাই তিনকেই মূল মাসআলা হিসেবে গণ্য করা হবে। এবং পরিত্যক্ত সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ করে প্রত্যেক ওয়ারিশকে প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে মা-শরীক দুই ভাই বোন প্রত্যেকে লাভ করবে এক ভাগ করে মোট তিন ভাগের দুই ভাগ এবং মা লাভ করবে তিন ভাগের এক ভাগ।

**তৃতীয় শ্রেণী :** তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে তারা যাদের অনুকূলে 'রদ্দ' বা পুনর্বণ্টন হয় তাদের একটি গ্রুপের সাথে এমন ওয়ারিশও বর্তমান থাকে যাদের ওপর 'রদ্দ' হয় না। যেমন: স্বামী অথবা স্ত্রী। এ ক্ষেত্রে যার অনুকূলে 'রদ্দ' হয় না তার নির্ধারিত অংশ মাসআলার মূল সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যা থেকে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ যেসব ওয়ারিশের অনুকূলে 'রদ্দ' হয় তাদের মধ্যে সংখ্যানুপাতে মাথাপিছু সমানভাবে বণ্টন করে দেয়া হবে, যদি ভগ্নাংশ ছাড়া বণ্টন করা যায়। যেমন : ওয়ারিশদের মধ্যে যদি স্বামী ও তিন কন্যা থাকে তাহলে যাদের অনুকূলে 'রদ্দ' হয় না তাদেরকে বিবেচনায় রেখে এ মাসআলাটি মূলত চার দ্বারা হবে। স্বামীকে এক অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ কন্যাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেয়া হবে।

যদি অবশিষ্ট সম্পত্তি ঐ সব ব্যক্তিবর্গের সংখ্যানুপাতে সঠিকভাবে বণ্টন করা না যায় তাহলে যাদের অনুকূলে 'রদ্দ' বা পুনর্বণ্টন হয় তাদের সংখ্যাকে যাদের অনুকূলে 'রদ্দ' হয় না তাদের মূল মাসআলা তার সাথে গুণ দিতে হবে। যদি তাদের সংখ্যা ও অবশিষ্ট সংখ্যা বিভাজ্য হয় তাহলে গুণফল যা হবে তা দ্বারাই মাসআলাটির 'তাসহীহ' বা বিশুদ্ধকরণ হবে। যেমন : স্ত্রী ও ছয় কন্যা। এ ক্ষেত্রে যেসব ওয়ারিশদের অনুকূলে 'রদ্দ' হয় না (স্ত্রী তাদের অন্তর্ভুক্ত) তাদের দিকটির বিবেচনায় মাসআলাটির সমাধানের সর্বনিম্ন সংখ্যা হবে চার। স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট থাকে তিন। তাই এটি ছয় কন্যার মধ্যে মাথাপিছু হিসাবে বণ্টনযোগ্য নয়; কিন্তু দু'টি সংখ্যা (ছয় কন্যার ছয় সংখ্যা ও স্বামীর

www.amarboi.org

অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট তিন অংশের তিন সংখ্যা) এর নিঃশেষে ভাজক তিন (সংখ্যা)। তাই কন্যাদের সংখ্যার উৎপাদক দুই দ্বারা চারকে গুণন করলে গুণফল হবে আট। এর মধ্যে স্বামীকে দুই অংশ প্রদান করে অবশিষ্ট ছয় অংশ ছয় কন্যার মধ্যে বণ্টন করা হবে।

আর যদি অবশিষ্ট অংশ এবং ওয়ারিশদের সংখ্যার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য না হয় তাহলে তাদের (ব্যক্তিদের) মূল সংখ্যাকে যাদের অনুকুলে 'রদ্দ' হয় না তাদের মূল মাসআলার সাথে গুণ করতে হবে। মোটকথা, এ ক্ষেত্রে মোট সংখ্যা তাই হবে যা ব্যক্তিদের সংখ্যার উৎপাদককে মূলের সাথে গুণ দিলে পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাযুজ্য থাকতে হবে। তবে যদি ব্যক্তির সংখ্যা ও মূল মাসআলায় সামঞ্জস্য তথা বিভাজ্যতা না থাকে বরং বৈপরীত্য থাকে তাহলে ওয়ারিশদের সংখ্যাকে মূল মাসআলার সাথে গুণন দিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তা হবে মোট সংখ্যা। এর উদাহরণ হচ্ছে, স্বামী ও পাঁচ কন্যা। এর মূল মাসআলা হবে বার দ্বারা। কারণ, এতে এক চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ) ও দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) একই সাথে জমা হয়েছে। এ ধরনের মাসআলা চার সংখ্যা দিয়ে করা হয়ে থাকে। কারণ, চার হচ্ছে যে সব ওয়ারিশের অনুকূলে 'রদ্দ' হয় না তাদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশের সর্বনিম্ন পর্যায়। এভাবে স্বামীকে এক অংশ দিলে তিন অংশ অবশিষ্ট থাকে। আর তিন অংশ পাঁচ জনের ওপর ভাগ করা যায় না। সুতরাং মূল মাসআলা চার (সংখ্যা) কে কন্যাদের সংখ্যার সাথে গুণন করতে হবে যার গুণফল হবে বিশ। এভাবে মাসআলাটি সঠিক হয়ে যাবে। এরপর স্বামীর প্রাপ্য অংশ এক (সংখ্যা) কেও পাঁচ দ্বারা গুণন করতে হবে। এভাবে স্বামীর প্রাপ্য অংশ পাঁচ হবে। অবশিষ্ট পনের অংশ কন্যাদের সংখ্যা অনুপাতে ভাগ করতে হবে। ফলে প্রত্যেক কন্যা তিন অংশ করে লাভ করবে।

**চতুর্থ শ্রেণী :** একাধিক শ্রেণীর 'যাবিল ফুরূয' যাদের অনুকুলে 'রদ্দ' হয়। আবার তাদের সাথে এমন ওয়ারিশও আছে যাদের অনুকুলে 'রদ্দ' হয় না। এ ক্ষেত্রে মূল মাসআলা হবে স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজন নির্ধারিত অংশের 'মাখরাজ' (مَخْرَج) বা উৎস। এ উৎস থেকে তার নির্ধারিত অংশ দিয়ে দেয়া হবে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ সেই সব 'যাবিল ফুরূয'দের প্রাপ্য অংশ অনুসারে বণ্টন করে দেয়া হবে যাদের অনুকুলে 'রদ্দ' হয়। আর মাসআলাটি যদি বিশুদ্ধ (তাসহীহ- تَصْحِيح) করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে পূর্বোক্ত বিশদ আলোচনার আলোকে তা করতে হবে। যেমন : মৃত ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মা ও মা-শরীক (বৈপিত্রেয়) দুই ভাই রেখে মারা যায় তাহলে মাসআলাটি চার সংখ্যা দ্বারা

www.amarboi.org

হবে। এ থেকে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ (চার ভাগের একভাগ) যা একটি নির্ধারিত অংশ। এরপর মা ও মা-শরীক দুই ভাই অবশিষ্ট তিন অংশ লাভ করবে। মা লাভ করবে একটি অংশ 'নির্ধারিত অংশ' ও 'রদ্দ' হিসেবে এবং মা-শরীক দুই ভাই লাভ করবে দুই অংশ 'নির্ধারিত অংশ' ও 'রদ্দ' হিসেবে।

মৃত ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মা ও দুই পৌত্রী রেখে যায় তাহলে মূল মাসআলা আট সংখ্যা দ্বারা হবে। স্ত্রী আট অংশের এক অংশ লাভ করবে এবং অবশিষ্ট সাত অংশ মা ও দুই পৌত্রীর মধ্যে $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অর্থাৎ ৪ ও ১ এর অনুপাতে বণ্টন করা হবে। যার মোট সংখ্যা হবে পাঁচ। সাত-পাঁচের মধ্যে বিভাজ্য নয়। তাই পাঁচ সংখ্যা দ্বারা আটকে গুণন করে মাসআলাটির বিশুদ্ধিকরণ করতে হবে। এর ফলাফল হবে চল্লিশ। স্ত্রীকে এর এক অষ্টমাংশ (আট ভাগের একভাগ) অর্থাৎ পাঁচ ভাগ দেয়া হবে। মা লাভ করবে সাত এবং দুই পৌত্রী লাভ করবে আটাশ অংশ।[১৪৬]

## 'যাবিল আরহাম' (ذَوِي الأَرْحَامِ) তথা নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকার

الرَّحِمُ শব্দের আভিধানিক অর্থ সন্তান জন্মের ঘর ও তার পাত্র, গর্ভাশয়, নৈকট্য ও আত্মীয়তা অথবা আত্মীয়তার মূল ও কারণ। এর বহুবচন أَرْحَامٌ ।[১৪৭] শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক নিকটাত্মীয়।

ফারায়েজশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় এর অর্থ সেই সব আত্মীয়, যারা আল্লাহর কিতাব অথবা আল্লাহর রাসূলের স. সুন্নত অথবা উম্মতের ইজমা'র ভিত্তিতে নির্ধারিত অংশের হকদার নয় অথবা আসাবাও নয় যে, কেবল তারাই ওয়ারিশ হলে মৃতের সমুদয় সম্পত্তি লাভ করে।[১৪৮]

'যাবিল আরহাম'দের ওয়ারিশ বানানোর ক্ষেত্রে সাহাবয় কেরাম, তাবেয়ী ও পরবর্তীকালের ফকীহদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। তাদের কেউ কেউ 'যাবিল আরহাম'দের ওয়ারিশ বানানোর পক্ষপাতী। আর কেউ কেউ তাদেরকে ওয়ারিশ বলে স্বীকার করেন না।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা তাদেরকে ওয়ারিশ হিসেবে স্বীকার করেন তারা হলেন: হযরত আলী রা., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুসারে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., মুআয ইবনে জাবাল রা., আবুদ- দারদা রা. ও আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.। আর তাবেয়ীদের মধ্যে শুরাইহ রহ., হাসান রহ., ইবনে সীরীন রহ., আতা রহ. ও মুজাহিদ রহ.।

---

১৪৬. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ২৪১-২৪৮।

১৪৭. আল-কামূস।

১৪৮. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ২৬৫; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ২, পৃ. ১৫।

www.amarboi.org

আর যারা যাবিল আরহাম'দের ওয়ারিশ বানানোর বিষয়টি অস্বীকার করেন, তাদের মধ্যে আছেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা., আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. (এক বর্ণনা অনুসারে), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ. ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ.। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বিষয়টি হযরত আবু বকর রা., হযরত উমর রা. ও হযরত উসমান রা. থেকেও উদ্ধৃত করেছেন। তবে তা সঠিক নয়। কারণ, বর্ণিত আছে যে, মু'তাযিদ কাজী আবু হাযেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন যে, 'যাবিল আরহাম'কে ওয়ারিশ বানানোর ব্যাপারে একমাত্র যায়েদ ইবনে সাবেত রা. ছাড়া সব সাহাবীর 'ইজমা' আছে। সুতরাং সমস্ত সাহাবী 'ইজমা'র বিপরীতে শুধুমাত্র যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর ভিন্ন মতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ফিকহ্বিদদের মধ্যে 'যাবিল আরহাম'দের ওয়ারিশ বানানোর সপক্ষে মত পোষণকারীগণ হলেন, হানাফীগণ, ইমাম আহমদ, পরবর্তী কালের মালেকীগণ, শাফেয়ীগণ, ঈসা ইবনে আবান এবং আহলে তানযীলগণ রহ.।

তাদেরকে ওয়ারিশ বানাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে আছেন : সুফিয়ান সাওরী রহ. এবং পূর্ববর্তীকালের মালেকী ও শাফেয়ী ফিকহ্বিদগণ।

**অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের দলীল**

'যাবিল আরহাম'দের উত্তরাধিকার অস্বীকারকারীদের দলীল নিম্নরূপ :

**এক :** আল্লাহ্ তাআলা উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতগুলোতে 'যাবিল ফুরুয' (নির্ধারিত অংশের হকদার) ও 'আসাবা' (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়)দের বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। 'যাবিল আরহাম'দের সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "তোমার রব ভুলে যাওয়ার মত সত্তা নন"।[১৪৯] তাই অন্তত এ কথা বলা যেতে পারে যে, 'যাবিল আরহাম'দের ওয়ারিশ বানানো আল্লাহর কিতাবের ওপর অতিরিক্ত করা। আর শুধু কিয়াস বা 'খবরে ওয়াহেদ' (প্রতি যুগে তিনজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস)-এর ওপর নির্ভর করে আল্লাহর কিতাবের ওপর কিছু বাড়ানো যায় না।

**দুই :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফুফু ও খালার মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : نَزَل جِبْرِيل عَلَيْه السَّلَامُ وَأَخْبَرَنِي إِلاَّ مِيرَاثَ لِلْعَمَّة وَالْخَالَة "জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে জানালেন যে, ফুফু ও খালার কোনো মিরাস নেই"।[১৫০]

---

১৪৯. আল-কুরআন, ১৯ : ৬৪।

১৫০. দারাকুতনী, (খ. ৪, পৃ. ৮০, দারুল মাহাসিন, কায়রো মুদ্রিত); হাকেম (খ. ৪, পৃ. ৩৪৩, দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া মুদ্রিত)। ইবনে হাজার হাদীসটি আত-তালখীস

www.amarboi.org

## ওয়ারিশ বানানোর সমর্থকদের দলীলসমূহ

ওয়ারিশ বানানোর পক্ষপাতীদের দলীলসমূহ নিম্নরূপ :

**এক :** আল্লাহ তাআলার বাণী : وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ 'আর আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের বেশি হকদার'।[১৫১] কেননা, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা ('যাবিল আরহাম') পরস্পরের বেশি হকদার। আয়াতটিতে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (রাহেম رَحِم এর বৈশিষ্ট্য) বর্ণিত হওয়ার কারণে 'যাবিল আরহাম'দের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'যাবিল ফুরূয' বা 'আসাবা' হওয়ার বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে না থাকলেও 'যাবিল আরহাম' হওয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে তারা হকদার হবে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাপ্যতা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাপ্যতার মধ্যে কোনো পারস্পরিক বিরোধ নেই। অতএব, তা কিতাবুল্লাহর ওপর বাড়তি কিছু যোগ করাও নয়।

**দুই :** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী :

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ . 'যার কোনো বন্ধু বা অভিভাবক নেই আল্লাহ ও তার রাসূলই তার বন্ধু ও অভিভাবক। আর যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই মামাই তার উত্তরাধিকারী'।[১৫২]

অপর একটি হাদীসে আছে :

الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ ، يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ

"যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই মামাই তার উত্তরাধিকারী। সে তার উত্তরাধিকারী হবে ও তার পক্ষ থেকে দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করবে"।[১৫৩]

মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো ইমামের মত হচ্ছে, যে ক্ষেত্রে ওয়ারিশ হিসেবে 'যাবিল ফুরূয' অথবা 'আসাবা'দের কেউ-ই বর্তমান থাকবে না এবং ন্যায়পরায়ণ কোনো ইমামও থাকবে না 'যাবিল আরহাম' কেবল তখনই ওয়ারিশ হবে।

---

(খ. ৩, পৃ. ৮১; শারিকাতুত তাবাআতিল ফাননিয়্যা, কায়রো কর্তৃক মুদ্রিত)-এ উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদ দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

১৫১. আল-কুরআন, ৮ : ৭৫।

১৫২. الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث له হাদীসটি তিরমিযী (খ. ৬, পৃ. ২৮১, প্রকাশক আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া); ইবনে মাজা (খ. ২, পৃ. ৯১৪, ঈসা আল-হালাবী সং) ও ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১২২৭ আস-সালাফিয়া সং.) রেওয়ায়েত করেছেন।

১৫৩. আবু দাউদ (খ. ৩, পৃ. ৮২; মাতবাআতুল আনসারিয়া দিল্লী কর্তৃক মুদ্রিত); ইবনে হিব্বান (হাদীস নং ১২২৫ ও ১২২৬, আল-মাতবা'আতুল সালাফিয়া সং.); আহমদ খ. ৪, পৃ. ১৩১, আল-মায়মানিয়্যা সং.।

www.amarboi.org

এ বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাবের পরবর্তীকালের ফিকহবিদদের এ মর্মে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, বায়তুল মাল যদি সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত না হয় এবং 'যাবিল ফুরুয' ও 'আসাবা'দের কেউ বর্তমান না থাকে তাহলে 'যাবিল আরহাম'গণ ওয়ারিশ হবে। আর বায়তুল মাল সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে, মৃতদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যথানিয়মে বায়তুল মালে জমা হওয়ার পর ইমাম (রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান) কর্তৃক তা শরীয়তসম্মত খাতে ব্যয়িত না হওয়া।

হানাফী ও হাম্বলী ফিকহবিদদের ন্যায় মালেকী ও শাফেয়ী ফিকহবিদগণেরও সিদ্ধান্ত এই যে, যে সব 'যাবিল ফুরূয'-এর প্রাপ্য অংশসমূহে মৃতের পরিত্যক্ত পুরো সম্পদ অন্তর্ভুক্ত হয়না তাদের বর্তমানে অবশিষ্ট সম্পদ তাদেরই অনুকূলে 'রদ্দ' করতে হবে। কারণ, এ অবস্থায় 'যাবিল আরহাম'দের তুলনায় তারাই অগ্রগণ্যতা লাভের অধিক হকদার। তবে 'যাবিল ফুরূয'দের অবর্তমানে পূর্বোল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে 'যাবিল আরহাম'রাই উত্তরাধিকারী হবে।[১৫৪]

'যাবিল আরহাম'দের মধ্যে কেউ যদি এককভাবে উত্তরাধিকারী হয়, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক সে ক্ষেত্রে সে একাই মৃতের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি লাভ করবে। আর তাদের সংখ্যা একাধিক হলে সে ক্ষেত্রে তাদের উত্তরাধিকারিত্বের সমর্থকগণ তা প্রদানের পদ্ধতির ব্যাপারে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, যা নিম্নরূপ :

১. কারাবতপন্থীগণ
২. রাহেমপন্থীগণ
৩. তানযীলপন্থীগণ

**কারাবত সম্পন্নগণঃ** সেই সব লোক যারা যাবিল আরহামদের ওয়ারিশ বানানোর ক্ষেত্রে আত্মীয়তার দৃঢ়তাকে বিবেচ্য মনে করেন এবং অপেক্ষাকৃত অধিক নিকটবর্তীকে অগ্রাধিকার দান করেন। যেমনটি 'আসাবা'দের উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রে হয়। এ কারণেই তাদেরকে 'আহলে কারাবত' তথা কারাবাত পন্থীগণ বলা হয়ে থাকে।

তাই বংশগত (নাসাবী نسبى) 'আসাবা'দের যেমন চারটি দিক আছে, তেমনি 'যাবিল আরহাম'দেরও চারটি দিক হবে। কারণ যেসব আত্মীয় নির্ধারিত অংশের প্রাপক নয় এবং 'আসাবা'ও নয় তারা হয়তো মৃতের শাখা-প্রশাখা তথা সন্তানাদি হবে অথবা তার মূল কেউ হবে অথবা তার পিতা-মাতার শাখা-প্রশাখা কিংবা তার দাদা-নানা ও দাদী-নানীর শাখা-প্রশাখা হবে। অধিক নিকটবর্তী আত্মীয়কে অগ্রাধিকার প্রদানই হানাফীদের মাযহাব। ইমাম আহমদের একটি রেওয়ায়াত

---

১৫৪. হাশিয়াতুল বাকারী আলার রাহবিয়া, পৃ. ১১।

www.amarboi.org

এর সমর্থক। তা ছাড়া শাফেয়ীদের মধ্য থেকে ইমাম বাগাবী ও মুতাওয়াল্লী দৃঢ়তার সাথে এটিই উল্লেখ করেছেন।

**তাদের মতানুসারে যাবিল আরহামদের চারটি শ্রেণী :**

**প্রথম শ্রেণী :** যারা মৃতের সাথে সম্পর্কিত। তারা মৃতের কন্যাদের সন্তান, আরো নিচের স্তরের হলেও এবং মৃতের পুত্রের কন্যাদের সন্তান, আরো নিম্ন ধাপের হলেও।

**দ্বিতীয় শ্রেণী :** মৃত ব্যক্তি যাদের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ মৃতের নানা ও নানার বাপ (আরো উর্ধ স্তরের হলেও) এবং মৃতের নানার মা ও নানার মায়ের মা। এ নানা ও নানীকে 'জাদ্দে ফাসেদ' (جَدٌّ فَاسِدٌ) ও 'জাদ্দাহ ফাসেদাহ' (جَدَّةٌ فَاسِدَةٌ) বলে অভিহিত করা হয়।

**তৃতীয় শ্রেণী :** যারা মৃতের পিতা-মাতা অথবা তাদের কোনো একজনের সাথে সম্পর্কিত। তারা হলো, বোনদের সন্তান যত নিচের ধাপেরই হোক এবং নারী পুরুষ যাই হোক না কেন। আর বোনেরা সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় যাই হোক না কেন। অনুরূপভাবে ভাইদের কন্যাও যত নিচু ধাপেরই হোক না কেন। আর ভাই সহোদর বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় যাই হোক না কেন এবং মা-শরীক ভাইদের পুত্র আরো নিচের স্তরের হলেও।

**চতুর্থ শ্রেণী :** যারা মৃতের দাদা ও নানা উভয়ের সাথে বা যে কোনো একজনের সাথে অথবা দাদী ও নানী উভয়ের সাথে অথবা শুধু দাদী বা নানীর সাথে সম্পর্কিত। আর সব ফুফু, পিতার বৈপিত্রেয় তথা মা শরিকী ভাই, মৃতের সব ধরণের চাচাতো, মামাতো ও খালাতো বোন (নিচের ধাপের হলেও) এবং তাদের সন্তান সবাই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

**এ সব শ্রেণীর মধ্যে উত্তরাধিকার কার্যকর করার পদ্ধতি**

উপরোল্লিখিত শ্রেণীসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি শ্রেণীকে অন্য কোনো একটি শ্রেণীর ওপর অগ্রাধিকারদানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। আবু সুলায়মান রহ. মুহম্মাদ ইবনুল হাসানের মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সব শ্রেণীর মধ্যে মৃতের অধিক নিকটবর্তী এবং তার উত্তরাধিকারী বানানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারলাভের অধিক হকদার হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণী। আর তারা হলো মৃতের নানা ও নানার বাপ (আরো ঊর্ধতন স্তরের হলেও) এবং মৃতের নানার মা ও নানার মায়ের মা (এবং আরো যত উপরের হোক না কেন)। এরপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হলো প্রথম শ্রেণী (যত নিম্ন স্তরেরেই হোক না কেন)। তারপরের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হলো তৃতীয় শ্রেণী (যত নিম্নস্তরেরেই হোক না কেন) এবং সর্বশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হচ্ছে, চতুর্থ শ্রেণী (উর্ধতন ও অধস্তন যত দূরেরেই হোক না কেন)। ঈসা ইবনে আবান র.

www.amarboi.org

মুহাম্মদ রহ.-এর মাধ্যমে আবু হানীফা থেকে এ রেওয়ায়তের ক্ষেত্রে আবু সুলায়মানকে অনুসরণ করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও হাসান ইবনে যিয়াদ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে এবং ইবনে সুমা'আ ইমাম মুহাম্মাদের রহ. মাধ্যমে আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, এ সব শ্রেণীর মধ্যে মৃতের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিক হকদার হচ্ছে প্রথম শ্রেণী। তারপর ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী এবং তা 'আসাবা'দের ধারাক্রমের মত। 'আসাবা'দের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য পুত্র, তারপর পিতা, তারপর দাদা এবং তারপর চাচা। ফতোয়ার জন্য এ বক্তব্যটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত দু'টি বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মাধ্যমে আবু সুলায়মান বর্ণিত রেওয়ায়েতটি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রথম উক্তি এবং ইমাম আবু ইউসুফ বর্ণিত রেওয়ায়েতটি তার দ্বিতীয় উক্তি।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ বোনদের সন্তান, ভাইদের কন্যা ও মা-শরীক ভাইদের ছেলেরা নানার চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য। অথচ দাদা সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের তুলনায় সমানহারে বণ্টন দাদার জন্য লাভজনক হলে সে ভাইবোনদের সাথে সমানহারে বণ্টনে অংশগ্রহণ করবে। তাই কিয়াসের দাবি হচ্ছে, তৃতীয় শ্রেণীকে নানার ওপর অগ্রাধিকার না দেয়া।

ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত দু'টি রেওয়ায়েতের যৌক্তিকতা হলো, প্রথমটিতে তিনি 'আসাবা'দের ব্যাপারে তার নিজের মাযহাবের 'কিয়াস' অনুসরণ করেছেন। তাই তিনি নানাকে মৃতের পিতার সন্তানদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই তারা নানার সাথে উত্তরাধিকারী হবে না। আর নানা এখানে দাদার মর্যাদায় অভিষিক্ত। তার থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে 'যাবিল আরহাম'দের মধ্যে মৃতের সন্তাদেরকে নানার ওপর অগ্রাধিকার দানের বিষয়টি আসাবাদের ক্ষেত্রে তার নিজের মাযহাবে প্রচলিত আছে। সেখানে পৌত্র দাদার ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

## প্রত্যেক শ্রেণীকে ওয়ারিশ বানানোর পদ্ধতি

### প্রথম শ্রেণী

কন্যা ও পৌত্রীদের সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকার লাভের অধিক হকদার তারাই যারা মৃতের অধিক নিকটবর্তী। যেমন : মেয়ের মেয়ে (নাতনী), ছেলের মেয়ের মেয়ের তুলনায় মেয়ের মেয়ে উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিক হকদার। কেননা,



www.amarboi.org

মেয়ের মেয়ে শুধু একটি মাধ্যম দ্বারা মৃতের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু শেষোক্ত জন দু'টি মাধ্যম দ্বারা সম্পর্কিত।

তারা যদি একই স্তরের হয় অর্থাৎ সবাই মৃতের সাথে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় স্তর থেকে সম্পর্কিত হয় সে ক্ষেত্রে ওয়ারিশের সন্তানদেরকে 'যাবিল আরহামে'র সন্তানদের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। যেমন : পুত্রের কন্যার কন্যা। কেননা সে কন্যার কন্যার পুত্র থেকে অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ, প্রথমটি পুত্রের কন্যার সন্তান। আর পুত্রের কন্যা নির্ধারিত অংশের হকদার। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি 'যাবিল আরহামে'র অন্তর্ভুক্ত । এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের কারণ বাস্তব ও সত্যিকার নৈকট্য। সত্যিকারের নৈকট্য বর্তমান থাকলে সেটিই অগ্রাধিকার লাভ করবে এবং তা বর্তমান না থাকলে অনুজ্ঞামূলক নৈকট্যই অগ্রাধিকার পাবে।

যদি নৈকট্যের বিচারে সবার মর্যাদা সমান হয় এবং তাদের মধ্যে কেউ কোনো ওয়ারিশের সন্তান না হয়। যেমন : কন্যার পুত্রের কন্যা এবং কন্যার কন্যার পুত্র অথবা সবাই এক ওয়ারিশের মাধ্যমে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। যেমন : কন্যার পুত্র ও কন্যার কন্যা সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদের মতে সমস্ত রের শাখার ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং তাদের পুরুষ ও নারী হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। পুরুষ ও নারী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মূলের সাথে একীভূত হোক বা না হোক তা দেখার বিষয় নয়। আর যদি তারা প্রত্যেকে শুধুমাত্র নারী হয় অথবা প্রত্যেকে শুধু পুরুষ হয় তাহলে সমান অংশে বন্টন করে দেয়া হবে। তবে যদি পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীর ওয়ারিশ থাকে তাহলে পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান হবে। বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের মূল নারী ও পুরুষ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা র. থেকে বর্ণিত একটি বিরল রেওয়ায়েত।

পুরুষ বা নারী হওয়ার দিক দিয়ে যদি শাখা (নিম্ন ধাপের) ওয়ারিশগণের মূল ওয়ারিশদের সাথে মিল বা সাদৃশ্য থাকে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ রহ. শাখা ওয়ারিশের ব্যক্তিদের মিরাসের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বলে গণ্য করেন। আর যদি শাখা ওয়ারিশদের পুরুষ ও নারী হওয়ার বৈশিষ্ট্য মূল ওয়ারিশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে বরং ভিন্ন হয় তাহলে মূল ওয়ারিশদের (মিরাসের ক্ষেত্রে) বিবেচ্য বলে গণ্য করেন। এ অবস্থায় শাখাদের মূলের মিরাস প্রদান করা হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফের প্রথম মত এবং ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত দু'টি রেওয়ায়েতের মধ্যে এটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি হলো, শাখা উত্তরাধিকারীর প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় তার নিজের মধ্যে কোনো কারণ বর্তমান থাকায়। অন্য কারো

www.amarboi.org

মধ্যে বিরাজিত কোনো কারণে নয়। আর সেই কারণটি হলো আত্মীয়তা। এখানে সবার পক্ষেই কারণ একটি এবং তা হলো সন্তান হওয়া। অতএব, তাদের অধিকার ও প্রাপ্যতাও সমান হবে মূল ওয়ারিশের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হলেও। এর নজির হচ্ছে, কুফরী বা দাসত্ব। যার মাধ্যমে সম্পর্কিত সে কাফের বা দাস হলেও তা বিবেচ্য হবে না বরং সম্পর্কিত ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্যই কেবল বিবেচিত হবে। অনুরূপ ভাবে এ ক্ষেত্রেও কেবল নারী বা পুরুষ হওয়ার দিকটি বিবেচিত হবে।

ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি হলো, মৃত ব্যক্তি যদি ফুফু ও খালাকে রেখে যায়, তাহলে ফুফু পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের দুই ভাগ এবং খালা পাবে এক তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের একভাগ। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম সবাই একমত। শাখা ওয়ারিশদের ব্যক্তিগণ যদি বিবেচ্য হতো তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হতো এবং ফুফু ও খালা প্রত্যেকে অর্ধেক লাভ করত। অতএব, বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য হবে সেই ব্যক্তি যার মাধ্যমে সম্পর্কিত। ফুফুর ক্ষেত্রে সে হচ্ছে বাপ এবং খালার ক্ষেত্রে মা।

মৃত ব্যক্তি যদি কন্যার পুত্রের কন্যা এবং কন্যার কন্যার পুত্র রেখে যায় তাহলে আবু ইউসুফ ও হাসানের মতে পরিত্যক্ত সম্পদ তিন ভাগ করতে হবে। পুরুষ হওয়ার কারণে দুই তৃতীয়াংশ পাবে কন্যার কন্যার পুত্র এবং এক তৃতীয়াংশ পাবে কন্যার পুত্রের কন্যা।

ইমাম মুহাম্মাদের মতে, পরিত্যক্ত সম্পদ মূল ওয়ারিশ অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপের ওয়ারিশদের মধ্যে তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে বন্টিত হবে। দ্বিতীয় ধাপ বা স্তর সেই ধাপ ও স্তর যেখানে প্রথমে পুরুষ ও নারী বিষয়ে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে এবং তা হয়েছে কন্যার কন্যা ও কন্যার পুত্রকে নিয়ে। অতএব, পরিত্যক্ত সম্পদ তিন ভাগ করে তাদের মধ্যে বন্টিত হবে। এর দুই ভাগ পাবে নাতির কন্যা। কারণ, তার পিতার প্রাপ্য এটাই। আর নাতনীর পুত্র পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কারণ, তার মায়ের প্রাপ্য এটাই। ইমাম মুহাম্মাদের মতে যেভাবে দ্বিতীয় ওয়ারিশ গ্রুপের মূল ওয়ারিশদের অবস্থা বিবেচ্য ঠিক তেমনিভাবে একাধিক মূল ওয়ারিশের অবস্থাও বিবেচ্য হবে। যদি সমপর্যায় ও মর্যাদার কন্যাদের সন্তানদের মধ্যে বিভিন্ন ওয়ারিশ গ্রুপ (بطن) থাকে সে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ হওয়ার ভিত্তিতে ভিন্ন হওয়া মূল ওয়ারিশদের সর্বপ্রথম ওয়ারিশ গ্রুপের মধ্যে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ 'পুরুষের প্রাপ্য অংশ দুইজন নারীর প্রাপ্য অংশের সমান' নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। অতঃপর, সর্বপ্রথম যেখানে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে সেখান থেকে পুরুষদের আলাদা করে দেয়া হবে এবং মেয়েদেরও স্বতন্ত্র গ্রুপে পৃথক করা

www.amarboi.org

হবে। আর তা করা হবে নারী ও পুরুষদেরকে পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করে দেয়ার পর। ভিন্নতার বৈশিষ্ট্যধারী সর্বপ্রথম ওয়ারিশ গ্রুপের পুরুষ ওয়ারিশরা যা প্রাপ্ত হয়েছে তা একত্রিত করে তাদের শাখা ওয়ারিশদেরকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুপাতে প্রদান করা হবে যদি তাদের ও তাদের শাখা ওয়ারিশদের মধ্যে পুরুষ ও নারী হওয়ার দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্য না থাকে এবং তা হতে হবে এমনভাবে যে, মাঝে যারা আসবে তারা সবাই হয় নারী হবে অথবা পুরুষ হবে।

যদি মধ্যবর্তী বিভিন্ন ওয়ারিশ গ্রুপে বৈচিত্র বা বিভিন্নতা থাকে অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয় লিংগের ওয়ারিশ থাকে তা হলে পুরুষরা যা প্রাপ্ত হয়েছে তা একত্রিত করে তাদের সন্তানদের মধ্যে নারী ও পুরুষ হওয়ার বিবেচনায় বিভিন্নতার ধারক ঊর্ধতন সর্বপ্রথম মূল ওয়ারিশ গ্রুপের মর্যাদা ও স্তর অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে এবং পূর্বে উল্লিখিত নিয়মে পুরুষ ও নারীদের আলাদা দুটি দল গঠন করা হবে। একইভাবে নারীরা যা লাভ করেছে তা তাদের শাখা বা অধস্তন ওয়ারিশদেরকে দেয়া হবে, যদি তাদের নিজেদের মধ্যেকার বিভিন্নতার বৈশিষ্ট্য তাদের ঊর্ধতন মূল ওয়ারিশদের মধ্যে না থাকে। আর যদি থাকে তবে তারা যা লাভ করেছে তা একত্রিত করে পূর্বোল্লেখিত নিয়মে বণ্টন করে দেয়া হবে। অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে এ নিয়মই কার্যকর থাকবে। 'যাবিল আরহামে'র মাসআলার ক্ষেত্রে বুখারীর শায়েখগণও ইমাম আবু ইউসুফের মত গ্রহণ করেছেন। কারণ তা সহজ।[১৫৫]

**দ্বিতীয় শ্রেণী :**

এরা رَحِم সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় অর্থাৎ নানা ও নানী। এদের ওয়ারিশ বানানোর বিধান হলো, তাদের মধ্যে যে মৃতের অধিক নিকটবর্তী সে বাপ বা মা যে দিক থেকেই সম্পর্কিত হোক না কেন মিরাস (উত্তরাধিকার) লাভের অধিক হকদার। এ কারণে নানা নানীর বাপের চেয়ে অধিক হকদার।

নৈকট্যের স্তরে সমান হওয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কোনো ওয়ারিশের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত সে এমন ব্যক্তির তুলনায় অগ্রাধিকার লাভ করবে, যে কোনো ওয়ারিশের মাধ্যমে সম্পর্কিত নয়। এটা আবু সাহল ফারাযী, আবু ফাযল আল-খাফফাফ ও আলী ইবনে ঈসা বাসরীর সিদ্ধান্ত। তাদের মতে, নানীর বাপ নানার বাপ থেকে অগ্রাধিকারলাভের অধিক যোগ্য। কারণ, দুইজনই সমপর্যায়ের হলেও নানীর বাপ একজন ওয়ারিশের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত। আর সেই ওয়ারিশ হলেন নানী। পক্ষান্তরে নানার বাপ ওয়ারিশ নয় এমন ব্যক্তির মাধ্যমে

---

১৫৫. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ২৭৪-২৮২।

www.amarboi.org

মৃতের সাথে সম্পর্কিত। আর তিনি হলেন 'জাদ্দ রাহেমী' (اَلْجَدُّ الرَّحِمِيُّ) অর্থাৎ নানা। নানা মায়ের সাথে ওয়ারিশ হয় না।

আবু সুলায়মান আল-জূরজানী ও আবু আলী আল-বুসতি'র মতে, ওয়ারিশের মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তির ও ওয়ারিশ নয় এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তির কোনো অগ্রাধিকার নেই। তাই উপরোল্লেখিত ক্ষেত্রে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করা হবে, যার দুই ভাগ লাভ করবে নানার বাপ এবং একভাগ লাভ করবে নানীর বাপ। তার যুক্তি হলো, ওয়ারিশের মাধ্যমে সম্পর্কিত হওয়ার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দানের ফলে মূল ওয়ারিশ অর্থাৎ নানা ও নানীকে শাখা ওয়ারিশের অধীন করতে হবে যা যুক্তির পরিপন্থী।

যদি নৈকট্য ও দূরত্বের বিবেচনায় তাদের মর্যাদা সমান হয় এবং সেই সাথে কোনো ওয়ারিশের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত কেউ তাদের মধ্যে না থাকে। যেমন : দাদীর দাদা এবং দাদীর দাদী। অথবা সবাই কোনো ওয়ারিশের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত যেমন : দাদার দাদীর বাপ এবং দাদীর নানির বাপ। আর যেসব ওয়ারিশের মাধ্যমে সম্পর্কিত তারা সবাই পুরুষ ও নারী হওয়ার বৈশিষ্ট্যেও সমান, সে ক্ষেত্রে নানা ও নানী এমনভাবে সেই ব্যক্তির মধ্যে একীভূত যার মাধ্যমে তারা উভয়েই মৃতের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, যার মাধ্যমে সম্পর্কিত তার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মতভেদের সুযোগ থাকবে না। ফলে তাদের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বন্টিত হবে এবং পুরুষদের একজনের প্রাপ্য অংশ দুইজন নারীর প্রাপ্য অংশের সমান হবে। অতএব, দাদীর দাদা পাবে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) এবং দাদীর দাদী পাবে এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের একভাগ)।

## তৃতীয় শ্রেণী :

এরা যে কোনো প্রকার বোনদের সন্তান, ভাইদের কন্যা এবং মা-শরীক (বৈপিত্রেয়) ভাইদের পুত্র।

এদের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিধান হলো, তাদের মধ্যে যে মৃতের সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয় সেই মিরাস লাভের অধিক হকদার। অতএব, বোনের কন্যা (ভাগ্নি) ভাইয়ের কন্যার ছেলে (ভাতিজির পুত্র) অপেক্ষা অধিক হকদার। কেননা, আত্মীয়তার দিক দিয়ে সে অধিক নিকটবর্তী। নৈকট্যের মর্যাদায় সমান হলে 'আসাবা' ('যাবিল ফুরূযে'র পর রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়)দের সন্তনেরা 'যাবিল আরহামে'র সন্তনেদের চেয়ে অধিক হকদার। যেমন : ভাইয়ের ছেলের মেয়ে (ভাতিজার কন্যা) এবং বোনের কন্যার পুত্র (ভাগ্নির পুত্র) উক্ত ভাই ও বোন আপন ভাই-বোন কিংবা বাপ-শরীক (বৈমাত্রেয়) অথবা ভিন্ন কোনো রকমের ভাই বোন

www.amarboi.org

হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে ভাইয়ের পুত্রের কন্যা (ভাতিজার মেয়ে) পুরো সম্পদের ওয়ারিশ হবে। কারণ, সে 'আসাবা'র সন্তান। তবে মাসআলাটিতে যদি ভাইয়ের পুত্রের কন্যা (ভাতিজার মেয়ে) এবং মা-শরীক (বৈপিত্রেয়) ভাইয়ের কন্যার পুত্র (ভাতিজার পুত্র) থাকে তাহলে তাদের দুইজনের মধ্যে সম্পদ 'একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান' নীতির ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফের মত। এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ হওয়ার দিক দিয়ে ওয়ারিশদের বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ, মিরাস বণ্টনের নীতি হচ্ছে, পুরুষ নারীর ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। মা-শরীক বা বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রে এ নীতি 'নস' (نص) এর পরিপন্থী কিয়াস হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত। উক্ত 'নস'টি হলো, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ তারা এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে।

ইমাম মুহাম্মদের মতে, সম্পত্তি মূল ওয়ারিসের অবস্থা বিবেচনা করে উভয়ের মধ্যে সমান দুই ভাগ করে বণ্টন করা হবে। এর কারণ, মায়ের নৈকট্যের কারণে তারা উভয়ে মিরাসের হকদার। আর এ বিবেচনায় নারীর ওপর পুরুষের কোনো অগ্রাধিকার নেই; বরং অনেক সময় নারীকেই পুরুষের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। কারণ, মায়ের মা (নানী) নির্ধারিত অংশের প্রাপক। অথচ নানা তা নয়। তাই এ অবস্থায় নারীকে অগ্রাধিকার না দেয়া হলেও অন্তত সমতা বজায় থাকবে।

তারা যদি নৈকট্যের দিক দিয়েও সমান হয় এবং তাদের মধ্যে কেউ 'আসাবা'র সন্তান, এবং কেউ 'যাবিল আরহামে'র সন্তান না হয়ে থাকে, যেমন : সবাই 'আসাবা'র সন্তান হয়, যেমন : সহোদর ভাইয়ের কন্যা (ভাতিজি) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা, কিংবা সবাই 'যাবিল ফুরূযে'র সন্তান হয়, যেমন : তিনজন বিভিন্ন শ্রেণীর বোন (একজন সহোদর, একজন বৈমাত্রেয় ও একজন বৈপিত্রেয়) এর তিন সন্তান অথবা সবাই 'যাবিল আরহামে'র সন্তান হয়, যেমন : ভাইয়ের কন্যার কন্যা (ভাতিজির মেয়ে) এবং অপর এক ভাইয়ের কন্যার পুত্র কিংবা তাদের কেউ 'আসাবা'র সন্তান এবং কেউ 'যাবিল ফুরূযে'র সন্তান হয়, যেমন : তিনজন বিভিন্ন শ্রেণীর ভাইয়ের তিন কন্যা, সে ক্ষেত্রে এ মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ আত্মীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করেন। তার মতে, সম্পত্তি প্রথমত: সহোদর ভাই ও বোনদের সন্তানদের দেয়া হবে। যদি আপন ভাই ও বোনদের সন্তান না থাকে তাহলে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানদেরকে এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তান না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানদের দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান হবে।

যদি অধিক দৃঢ় আত্মীয়তা সম্পর্কের কেউ না থাকে বরং সবার সম্পর্কের দৃঢ়তা একই পর্যায়ের হয় তাহলে সম্পদ তাদের সবার মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং

www.amarboi.org

প্রত্যেক পুরুষ দুইজন নারীর অংশের সমান অংশ পাবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ভাই ও বোনদের মধ্যে সম্পদ ঠিক সেইভাবে বন্টন করার সিদ্ধান্ত দেন যেমন তাদের উত্তর পুরুষরা ওয়ারিশ না হয়ে নিজেরা হলে হতো। এর সাথে তিনি শাখা ওয়ারিশ (فروع)-দের সংখ্যা ও মূল ওয়ারিশদের দিকটিও বিবেচনা করেন। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রকাশ্য মত এটিই। তা ছাড়া মূল ওয়ারিশদের প্রত্যেক গ্রুপ যা লাভ করেছে তা শাখা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে, যেমনটা প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, মৃত ব্যক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর ভাইদের তিন কন্যা, বিভিন্ন শ্রেণীর বোনদের তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গিয়েছে যাদের অবস্থা হলো :

১. সহোদর ভাইয়ের কন্যা (আপন ভাতিজি)
২. সহোদর বোনের এক পুত্র ও এক কন্যা (আপন ভাগ্নে ও ভাগ্নি)
৩. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের এক কন্যা
৪. বৈমাত্রেয় বোনের এক পুত্র ও এক কন্যা
৫. বৈপিত্রেয় ভাইয়ের এক কন্যা
৬. বৈপিত্রেয় বোনের এক পুত্র ও এক কন্যা

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে এ ক্ষেত্রে সমস্ত সম্পদ সহোদর ভাইয়ের শাখা ওয়ারিশ তথা সন্তানদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এরপর নিম্নবর্ণিত ধারাক্রম অনুসারে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের সন্তান ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের সন্তানদের মধ্যে 'একজন পুরুষের প্রাপ্য অংশ দুইজন নারীর প্রাপ্য অংশের সমান' নীতির ভিত্তিতে সম্পদ চার ভাগ করে সন্তানদের মধ্যে তাদের ব্যক্তি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে বন্টন করা হবে। সহোদর ভাইয়ের কন্যাকে অর্ধেক, সহোদর বোনের কন্যাকে এক চতুর্থাংশ (চারভাগের এক ভাগ) এবং সহোদর ভাই ও বোনের সন্তান না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের সন্তানদেরকে তা বন্টন করে দেয়া হবে। ব্যক্তি ও সংখ্যা অনুসারে তাদের মধ্যেকার এ বন্টনও চার ভাগে হবে। বৈমাত্রেয় বোনের পুত্রকে অর্ধেক, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যাকে এক চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ) এবং বৈমাত্রেয় বোনের কন্যাকে এক চতুর্থাংশ দেয়া হবে। যদি বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের সন্তান না থাকে সে ক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের শাখা ওয়ারিশ তথা তাদের সন্তানদের ওপরও তাদের শ্রেণী অনুসারে চার ভাগ করে বন্টন করা হবে। বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের সন্তানদের বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের সন্তানদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ, বাপের সম্পর্ক মায়ের সম্পর্কের তুলনায় দৃঢ় ও শক্তিশালী। তাদের মতানুসারে মূল মাসআলাটি চার দ্বারা হবে এবং এর বিশুদ্ধকরণ (তাসহীহ)ও চার দ্বারা হবে। ইমাম মুহাম্মদ

www.amarboi.org

রহ.-এর মতে পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের মধ্যে সমান তিন ভাগ করে বন্টন করা হবে। কারণ, ঊর্ধতন মূল ওয়ারিশগণের সবাই বন্টনের ক্ষেত্রে সমান। যদি বোনদের ব্যাপারে শাখা ওয়ারিশদের সংখ্যার বিষয়টি বিবেচ্য হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তারা দুই বৈপিত্রেয় বোনের মত হয়ে যাবে এবং দুই তৃতীয়াংশ সম্পদের হকদার আর বৈপিত্রেয় ভাই এক তৃতীয়াংশের হকদার হবে। অতঃপর ভাই যা লাভ করেছে অর্থাৎ সম্পদের এক নবমাংশ (নয় ভাগের একভাগ) তা তার কন্যার অধিকারে চলে যাবে, বোন যা লাভ করেছে অর্থাৎ সম্পদের এক নবমাংশ (নয় ভাগের এক ভাগ) তা সমান ভাগে তার পুত্র ও কন্যার মালিকানায় চলে যাবে এবং দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) সম্পদ সহোদর দুই ভাই-বোনের মধ্যে সমান হারে বন্টিত হয়ে তাদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। বিবেচ্য হচ্ছে, মূল ওয়ারিশদের মধ্যে শাখা ওয়ারিশদের সংখ্যা। অর্ধেক পাবে ভাইয়ের কন্যা (ভাতিজি), যা তার পিতার অংশ এবং অপর অর্ধেক পাবে বোন, যাকে বোনদের স্থলাভিষিক্ত ধরে নেয়া হয়েছে। তার প্রাপ্ত এই অর্ধাংশ তার দুই সন্তান পাবে এবং তা তাদের জনসংখ্যার বিচারে তিন অংশে ভাগ করা হবে। পুরুষের অংশ হবে দুইজন মেয়ের অংশের সমান। বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের সন্তান কিছুই পাবে না। কারণ, সহোদর ভাই-বোনের বর্তমানে তারা বঞ্চিত (মাহজুব) হয়ে যায়, যা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, এ মাসআলার বিশুদ্ধি হবে নয় দ্বারা। এর তিন অংশ পাবে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের শাখা সন্তান বা ওয়ারিশরা যা তাদের মধ্যে সমান অংশে বন্টিত হবে। তিন অংশ পাবে সহোদর ভাইয়ের কন্যা (আপন ভাতিজি) এবং তিন অংশ পাবে সহোদর বোনের দুই সন্তান। 'একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান' নীতি অনুসারে।

**চতুর্থ শ্রেণী :**

এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ তারাই যারা মৃতের দাদা বা নানা কিংবা দাদী বা নানী কোনো একজনের সাথে সম্পর্কিত। সর্বপ্রকারের ফুফু, বৈপিত্রেয় চাচা এবং সব রকমের মামা ও খালাও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এদের মিরাস বা উত্তরাধিকার লাভের বিধান হলো, যদি তাদের কেউ একাকী উত্তরাধিকারী হয় তাহলে সে মৃতের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির হকদার হবে। কেননা, আর কেউ তার প্রতিপক্ষ নেই। তাই মৃত ব্যক্তি যদি একজন মাত্র ফুফু অথবা একজন বৈপিত্রেয় চাচা, অথবা একজন মামা অথবা একজন খালা রেখে যায় তা হলে সেই একজনই পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি লাভ করবে, যেমন অন্য শ্রেণীগুলোর ক্ষেত্রেও এ বিধান কার্যকর।

www.amarboi.org

তাদের সংখ্যা যদি একাধিক হয় এবং তাদের সবার আত্মীয়তার দিক বা সম্পর্ক একই হয়, যেমন : মা-শরীক চাচা অথবা একাধিক ফুফু (কারণ, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কেবল পিতার দিক থেকে) অথবা শুধু মামা ও খালা (কারণ, তারা মায়ের দিক থেকে আত্মীয়) হয় তাহলে বিধান এই যে, অধিক দৃঢ় ও শক্তিশালী আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে 'ইজমা' অনুসারে তারাই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিক হকদার। সহোদর ভাই বৈপিত্রেয় ভাই থেকে অগ্রাধিকার পাবে, বৈমাত্রেয় ভাই বৈপিত্রেয় ভাই থেকে অগ্রাধিকার পাবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর কোনো পার্থক্য নেই। অতএব, সহোদর ফুফু বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ফুফু এবং চাচা থেকে অগ্রাধিকার পাবে। কারণ, তাদের আত্মীয়তা অধিক শক্তিশালী। একইভাবে সহোদর মামা ও খালাও উত্তরাধিকার লাভের অধিক হকদার।

এ শ্রেণীর ওয়ারিশগণ যদি পুরুষ ও নারী দুই প্রকারেরই হয় এবং তাদের আত্মীয়তার দিক একই হয় এবং আত্মীয়তার শক্তি ও দৃঢ়তাও সবার সমান হয়, যেমন : সবাই আপন অথবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় হয় তাহলে একজন পুরুষের প্রাপ্য অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান হবে। যেমন : বৈপিত্রেয় চাচা ও ফুফু অথবা আপন মামা ও খালা অথবা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় খালা। কারণ, চাচা ও ফুফুর মূল বা উৎস (তাদের বাপ) এক। অনুরূপভাবে মামা ও খালার উৎসও এক (মা)। আর যে ক্ষেত্রে মূল বা উৎস এক সে ক্ষেত্রে বন্টনের বেলায় বিবেচ্য তাদের সবারই ব্যক্তি ও তার বৈশিষ্ট্য।

যদি তাদের আত্মীয়তার দিক ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন: কারো আত্মীয়তা পিতার দিক থেকে এবং কারো মায়ের দিক থেকে তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্কের শক্তি ও দৃঢ়তা বিবেচ্য নয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তি যখন সহোদর ফুফু, বৈপিত্রেয় খালা অথবা আপন মামা ও বৈপিত্রেয় ফুফুকে রেখে যাবে তখন পিতার পক্ষের আত্মীয়রা পাবে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ)। কারণ, পিতার প্রাপ্য অংশ এটাই। অতএব, পিতার আত্মীয়রা এ অংশই লাভ করবে এবং মায়ের প্রাপ্য অংশ এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) মায়ের ওয়ারিশরা প্রাপ্ত হবে।

**চতুর্থ শ্রেণীর সন্তানদের ওয়ারিশ হওয়ার পদ্ধতি :**

চতুর্থ শ্রেণীকে ওয়ারিশ করার পূর্বেল্লিখিত বিধান তাদের সন্তানদের জন্য কার্যকরী হবে না। কারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক যেদিক থেকেই হোক না কেন সন্তানদের মধ্যে যে মৃতের সর্বাধিক নিকটবর্তী সেই তার মিরাস লাভের অধিক হকদার। সুতরাং ফুফুর কন্যা অথবা তার পুত্র ফুফুর মেয়ের কন্যা (নাতনী) ও পুত্র (নাতী)-এর তুলনায় মিরাস লাভের অধিক হকদার। কারণ, তারা উভয়েই মৃতের অধিক নিকটবর্তী।

www.amarboi.org

তারা সবাই যদি মৃতের সাথে আত্মীয়তার বিবেচনায় সমান হয়, যেমন : প্রত্যেকের আত্মীয়তা মৃতের বাপ অথবা মায়ের দিক থেকে হয় তাহলে যার আত্মীয়তার বন্ধন শক্তিশালী সে 'ইজমা'র ভিত্তিতে যার আত্মীয়তার বন্ধন শক্তিশালী নয় তার চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য। অতএব, মৃত ব্যক্তি যদি বিভিন্ন প্রকারের তিন ফুফুর তিন সন্তান রেখে যায় তাহলে সহোদর ফুফুর সন্তান সমস্ত সম্পদ লাভ করবে। যদি সহোদর ফুফুর সন্তান না থাকে তাহলে বৈমাত্রেয় ফুফুর সন্তান লাভ করবে। যদি বৈমাত্রেয় ফুফুর সন্তানও না থাকে তাহলে বৈপিত্রেয় ফুফুর সন্তান। আর তাও যদি না থাকে তাহলে বিভিন্ন প্রকার মামা ও খালার সন্তানরা তা লাভ করবে। কেননা, তাদের বেলায়ও একই বিধান কার্যকর।

যদি তারা সবাই স্তর, মর্যাদা ও আত্মীয়তার দৃঢ়তার দিক দিয়েও সমান হয় এবং আত্মীয়তার দিকও একই হয়, যেমন : সবাই মৃতের পিতার দিকের আত্মীয় অথবা মায়ের দিকের আত্মীয় তাহলে 'আসাবা'দের সন্তান যারা আসাবা নয় তাদের সন্তানের চেয়ে উত্তম ও অধিক হকদার। যেমন : চাচার কন্যা (চাচাতো বোন) ও সহোদর ফুফুর পুত্র অথবা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ফুফুর পুত্র। এ ক্ষেত্রে চাচার কন্যা (চাচাতো বোন) সমুদয় সম্পত্তি লাভ করবে। কারণ, সে 'আসাবা'র সন্তান। ফুফুর পুত্র বা ফুফাতো ভাই ওয়ারিশ হবে না। কারণ, সে 'যাবিল আরহামে'র সন্তান।

উক্ত চাচা বা ফুফু যদি সহোদর হয় এবং আর একজন বৈমাত্রেয় চাচা বা ফুফুর কন্যা থাকে তাহলে আপন চাচার কন্যা (চাচাতো বোন) সমুদয় সম্পদ লাভ করবে। কারণ, তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক মজবুত ও শক্তিশালী। অতএব, মৃত ব্যক্তি যদি আপন ফুফুর পুত্র (ফুফাতো ভাই) এবং বৈমাত্রেয় চাচার কন্যা (চাচাতো বোন) রেখে যায় তাহলে আপন ফুফুর পুত্র (ফুফাতো ভাই) সমুদয় সম্পদ লাভ করবে। হানাফীদের মতে এটিই যাহেরী রেওয়ায়াত। কেননা, ফুফুর পুত্রের আত্মীয়তার বন্ধন অতীব মজবুত যা চাচার কন্যার নেই, যদিও সে ওয়ারিশের কন্যা।

কোনো কোনো হানাফী আলেম অস্পষ্ট ও গুরুত্বহীন রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, উল্লিখিত ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় চাচার কন্যা (চাচাতো বোন) সমুদয় সম্পত্তির হকদার হবে। কারণ, সে 'আসাবা'র সন্তান। পক্ষান্তরে ফুফুর পুত্র (ফুফাতো ভাই) হচ্ছে 'যাবিল আরহামে'র সন্তান।

যদি নিকটাত্মীয় হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সবাই সমপর্যায়ের হয় এবং আত্মীয়তার দিক ভিন্ন ভিন্ন হয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ বাপের পক্ষের এবং কেউ মায়ের পক্ষের আত্মীয় হয় তাহলে 'যাহেরুর রেওয়ায়াত' বা সুস্পষ্ট রেওয়ায়াত অনুসারে আত্মীয়তার দৃঢ়তা বা 'আসাবা'র সন্তান হওয়া কোনোটিই বিবেচ্য হবে

www.amarboi.org

না। অতএব, আপন ফুফুর সন্তান আপন মামা বা আপন খালার সন্তান থেকে অগ্রাধিকারযোগ্য হবে না। কারণ, ফুফুর সন্তানের আত্মীয়তার দৃঢ়তা বিবেচ্য নয়। অনুরূপভাবে আপন চাচার কন্যা (চাচাতো বোন) আপন মামা অথবা আপন খালার কন্যা থেকে অগ্রাধিকারযোগ্য হবে না। কারণ, চাচার কন্যার 'আসাবা'র সন্তান হওয়ার কোনো গুরুত্ব নেই। তবে সম্পদ যে দৃষ্টিকোণ থেকে বন্টিত হবে তা হচ্ছে, বাপের আত্মীয়রা পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং মায়ের আত্মীয়রা পাবে এক তৃতীয়াংশ। কারণ, বাপের আত্মীয়রা বাপের স্থলাভিষিক্ত এবং মায়ের আত্মীয়রা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে, বাপের পক্ষের হোক বা মায়ের পক্ষের হোক প্রতিটি গ্রুপ যা পেয়েছে তা তাদের সন্তানদের মধ্যে আত্মীয়তার দিক ও সংখ্যা বিবেচনায় রেখে বন্টন করা হবে।

ইমাম মুহাম্মাদের মতে প্রথমে যেখানে গিয়ে বিভক্তি হয়েছে তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে শাখা ওয়ারিশদের মধ্যে সংখ্যা এবং মূল ওয়ারিশদের আত্মীয়তার দিক বিবেচনা করে। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে যেরূপ করা হয়েছে এখানেও তাই করা হবে।[১৫৬]

এগুলোই হলো আত্মীয়দের মধ্যে 'যাবিল আরহাম'দের ওয়ারিশ করার বিধান।

**আহলে তানযীল (স্থলাভিষিক্ত)-এর বিধান ও মাযহাব**

তানযীল (التَّنْزِيل)এর অর্থ, 'যাবিল আরহাম'দের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কোনো একজন ওয়ারিশের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত সে উক্ত মাধ্যম ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হবে। তাই কন্যাদের সন্তান, পৌত্রীদের সন্তান এবং বোনদের সন্তান, সে বোন (সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) যে দিকেরই হোক না কেন তারা তাদের মায়ের ন্যায়। আর ভাইদের কন্যা, আপন চাচা অথবা বৈমাত্রেয় চাচাদের কন্যা, তাদের পুত্রদের কন্যা, বৈপিত্রেয় ভাইদের সন্তান এবং বৈপিত্রেয় চাচাদের সন্তান (মিরাসের ক্ষেত্রে) তাদের পিতার ন্যায়। আলকামা, শা'বী, মাসরুক, নাঈম ইবনে হাম্মাদ, আবু নাঈম ও আবু উবায়দা আল-কাসেম ইবনে সাল্লামের মতও তাই।

এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব এবং ইমাম আহমদের একটি মত। তবে তারা দু'জন দু'টি মাসআলাকে এ নীতির বাইরে রেখেছেন যা নিম্নরূপ :

১. বিশুদ্ধতর মতানুসারে এ দুই ইমাম মামা ও খালা বাপের পক্ষ থেকে হলেও তাদের দু'জনকে মায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং মৃতের বৈপিত্রেয় নানাকে মায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

---

১৫৬. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৬৫-৩০০; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ২, পৃ. ১৫ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ।

www.amarboi.org

**২. বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে ইমামদ্বয় বৈপিত্রেয় চাচা ও ফুফুকে সে (সহোদর বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয়) যেদিকেরই হোক না কেন পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন।**

উক্ত ইমামদ্বয় 'আহলে তানযীলে'র মাযহাবকেই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মত দিয়েছেন। কেননা, এটাই সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীকালে 'যাবিল আরহামে'র উত্তরাধিকারিত্বের সমর্থকদের মাযহাব। অতএব, মৃত ব্যক্তি যদি কন্যার কন্যা (দৌহিত্রী) এবং পৌত্রীর কন্যা রেখে যায় তাহলে 'আহলে তানযীলে'র মতানুসারে সম্পত্তি তাদের দু'জনের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। সে ক্ষেত্রে কন্যার কন্যা (দৌহিত্রী) পাবে সম্পত্তির তিন চতুর্থাংশ (চার ভাগের তিন ভাগ) এবং পৌত্রীর কন্যা পাবে এক চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ)। এ বণ্টন হবে নির্ধারিত অংশ ও 'রদ্দ' (পুনর্বণ্টন) হিসেবে।

'আহলে কারাবত' (أَهْلُ الْقَرَابَةِ) নিকটাত্মীয়দের সিদ্ধান্তের মতো 'আহলে তানযীল'দের মাযহাবেরও সিদ্ধান্ত এই যে, 'যাবিল আরহামে'র কেউ একাকী ওয়ারিশ হলে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদই সে লাভ করবে। তবে তাদের একাধিক ব্যক্তির বর্তমানে দুই মাযহাবের সিদ্ধান্তে পার্থক্য হবে। এ ক্ষেত্রে মাযহাবে 'আহলে তানযীল' এর মতানুসারে শাখা ওয়ারিশ (فروع) দেরকে তাদের মূল (ঊর্ধতন) ওয়ারিশের স্থলাভিষিক্ত করবে এবং তারা তাদের নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ নিয়ে নেবে। যদি তারা কোনো 'আসাবা'র মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে 'আসাবা' হিসেবেই তাদের অংশ লাভ করবে আর যদি কোনো 'যাবিল ফুরূযে'র মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে তারা 'ফরয' (নির্ধারিত অংশ) ও 'রদ্দ' হিসেবে তাদের অংশ পাবে। এক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানহারে বণ্টন করা হবে। এটা ইমাম আহমদের মত। কেননা, সে কেবল 'যাবিল আরহাম'দের একজন হওয়ার কারণে ওয়ারিশ হয়েছে। তাই সবার সমান পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে, যেমন : বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রে হয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, একজন পুরুষের প্রাপ্য অংশ দুইজন নারীর প্রাপ্য অংশের সমান হবে।

অতএব, মাসআলাটি হবে : মেয়ের মেয়ে (নাতনী) একজন, এক পুত্র এবং অপর এক মেয়ের মেয়ে (নাতনী)। শেষোক্ত মেয়ের মেয়ে (নাতনী) যদি এক স্তর ওপরের হয় তাহলে বাস্তবে অবস্থা দাঁড়ায় দুই কন্যার মত। সে ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তি সমান দুই ভাগ করে কন্যার কন্যা অর্ধেক পাবে এবং ছেলে ও অপর কন্যা অপর অর্ধাংশ পাবে। ইমাম আহমদের মাযহাব অনুসারে মাসআলাটি চার দ্বারা বিশুদ্ধিকরণ বা 'তাসহীহ' হবে এবং ইমাম শাফেয়ীর মতে ছয় দ্বারা বিশুদ্ধিকরণ হবে। কারণ, মূল মাসআলাটির সমাধান মূলত তিন দ্বারা। এ

www.amarboi.org

মাসআলা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন-এর ক্ষেত্রে নয়। কারণ, বৈপিত্রেয় ভাইবোন 'নস'-এর দ্বারাই সমান অংশ পাওয়ার হকদার।[১৫৭]

## আহলে রাহেম-এর মাযহাব

'আহলে রাহেম' হলো, যারা 'যাবিল আরহামে'র উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমতার সমর্থক। তাদের মতে, এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের মধ্যে, এক স্তর অন্য স্তরের মধ্যে এবং শক্তিশালী আত্মীয়তার বন্ধনের অধিকারী 'যাবিল আরহামে'র ও দুর্বল আত্মীয়তার অীধকারী 'যাবিল আরহামে'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই মৃত ব্যক্তি যদি এক ভাগ্নি ও এক নাতনী (মেয়ের কন্যা) রেখে যায় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের মধ্যে সমানহারে বন্টিত হবে। আবার যদি এক ভাগ্নে ও ভাতিজার কন্যাকে রেখে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে সম্পদ সমান ভাগে বন্টিত হবে। এর কারণ, মিরাস বা উত্তরাধিকার অনিবার্যকারী হচ্ছে 'রাহেম' (رحم)। এটা ব্যক্তিক্রমহীনভাবে সবার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু এটা সবার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে তাই এর সর্বজনগ্রাহ্য একটা মূল্য আছে। অতএব, মিরাস সবার জন্যই সমান। হাসান ইবনে মাইসার ও নূহ ইবনে যারাহ ছিলেন এ মতের সমর্থক । কিন্তু বিখ্যাত মাযহাবগুলোর কোনোটিই তাদের এ মত গ্রহণ করেনি।[১৫৮]

## স্বামী-স্ত্রীর কারো সাথে 'যাবিল আরহামে'র উত্তরাধিকার

'যাবিল আরহাম'দের উত্তরাধিকারের সমর্থকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তাদের কেউ যদি স্বামী বা স্ত্রীর কারো সাথে ওয়ারিশ হয় তাহলে তারা (স্বামী বা স্ত্রী ও 'যাবিল আরহাম'দের যে ওয়ারিশ হয়েছে) প্রত্যেকে তার পুরো প্রাপ্য অংশ লাভ করবে। কোনো 'যাবিল আরহামে'র কারণে স্বামীর প্রাপ্য অংশ অর্ধেক (দুই ভাগের এক ভাগ) থেকে হ্রাস পেয়ে এক চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ) হবে না কিংবা স্ত্রীর অংশও এক চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ) থেকে হ্রাস পেয়ে এক অষ্টমাংশ (আট ভাগের এক ভাগ) হবে না। এর কারণ হলো, স্বামী ও স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ 'নস' অর্থাৎ কুরআন বা হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু 'যাবিল আরহামে'র ওয়ারিশ হওয়ার বিষয়টি 'নস' দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং যাবিল-আরহাম-এর অংশ স্বামী-স্ত্রীর অংশে কোনো ব্যত্যয় সৃষ্টি করতে পারবে না। অতএব, স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে সংশ্লিষ্টজনের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাই 'যাবিল আরহাম' লাভ করবে।

---

১৫৭. আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ২, পৃ. ১৮ এবং তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

১৫৮. আল-মাবসূত, খ. ৩০, পৃ. ৪, দারুল মাআরিফ সং.।

www.amarboi.org

তবে তাদেরকে ওয়ারিশকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। 'আহলে কারাবত'দের বক্তব্য হচ্ছে, প্রথমে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ বের করা হবে। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ 'যাবিল আরহাম'দের সবার মধ্যে বণ্টিত হবে যেমনটি কেবল তারাই ওয়ারিশ হলে সবার মধ্যে বন্টিত হতো।

এ মাসআলার ব্যাপারে 'আহলে তানযীল'গণ দু'টি মাযহাবে (দু'টি মতের অনুসারীতে) বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে বিশুদ্ধতর মত সেটিই যেটি 'আহলে কারাবত'গণ বলেছেন। ইমাম আহমদ রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, তারা অবশিষ্ট সম্পদের ওয়ারিশ হবে, যেমন যদি কেবল তারাই ওয়ারিশ হতো তাহলে সমুদয় সম্পদ তারাই লাভ করত। আবু উবায়েদ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, হাসান ইবনে যিয়াদ আল-লু'লুঈ এবং 'যাবিল আরহাম'দেরকে ওয়ারিশকরণের সব সাধারণ সমর্থকদের বক্তব্য এটাই।

অপর মাযহাবটির বক্তব্য হচ্ছে, স্বামী বা স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ যেসব ওয়ারিশের মাধ্যমে 'যাবিল আরহাম' মৃতের সাথে সম্পর্কিত, স্বামী বা স্ত্রীর সাথে (ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে) সেই ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশ অনুপাতে তা বন্টিত হবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম ও দিরার এর বক্তব্যও তাই। প্রথম মাযহাবটির সমর্থকদেরকে 'ই'তিবারু মা বাকিয়া' (অবশিষ্ট অংশ গণ্য করা)-এর সমর্থক বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং দ্বিতীয় মাযহাবটির সমর্থকদের 'ই'তিবারুল আসল' (মূল অংশ গণ্য করা)-এর সমর্থক বলে আখ্যায়িত করা হয়। 'যাবিল আরহাম' যদি শুধু 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের প্রাপক) অথবা শুধু 'আসাবা'র মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য নেই। মতানৈক্য কেবল তখনই হবে যখন কেউ 'আসাবা'র মাধ্যমে এবং কেউ 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের প্রাপক) এর মাধ্যমে সম্পর্কিত হবে। সুতরাং মৃত ব্যক্তি যদি স্বামী, কন্যার কন্যা (নাতনী), খালা এবং আপন চাচা অথবা বৈমাত্রেয় চাচার কন্যাকে রেখে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে 'আহলে কারাবতে'র মতে, স্বামী পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক এবং অবশিষ্ট সম্পদ পাবে কন্যার কন্যা (নাতনী)। আর 'আহলে তানযীলে'র মতে, স্বামী পাবে অর্ধেক এবং কন্যার কন্যা (নাতনী) পাবে অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধেক, খালা পাবে অবশিষ্ট অংশ (অর্ধেকের অর্ধেক)-এর এক ষষ্ঠাংশ বা ছয় ভাগের এক ভাগ এবং এরপর অবশিষ্ট দুই ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের দুই ভাগ) পাবে চাচাতো বোন। অপর মতানুসারে তানযীল (تنزيل) (সন্তানকে তার মূলের স্থলাভিষিক্ত মেনে নেয়া)-এর নীতি অনুসারে করলে স্বামীর সাথে মা, চাচা ও কন্যাও থাকবে। এই কন্যা প্রকৃত অর্থে পুত্রের কন্যা। আর পুত্রের কন্যা মর্যাদায় আপন কন্যার মত। সে হাজাব (حجب) এর মধ্যে পড়বে না। অতএব, মাসআলার সমাধান হবে বারো দ্বারা। প্রথমে স্বামীকে তার প্রাপ্য অংশ তিন (এক

www.amarboi.org

চতুর্থাংশ) দেয়া হবে। এরপর স্বামীকে তার প্রাপ্য অংশ সম্পূর্ণ অর্ধাংশের অর্ধাংশ (তিন) দেয়া হবে। এখন অবশিষ্ট থাকবে ছয় অংশ যা নয় জনের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। অতএব, মাসআলার 'তাসহীহ' (تصحيح) বা বিশুদ্ধিকরণ হবে আঠার দ্বারা। স্বামী নয়, কন্যার কন্যা (নাতনী) ছয়, খালা দুই এবং চাচাতো বোন পাবে এক।

## দুই দিক থেকে ওয়ারিশ হওয়া

কখনো কখনো কোনো ওয়ারিশ দুই দিক থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে। দু'টি দিকই যদি 'আসাবা' হওয়ার সূত্রে হয়ে থাকে তাহলে সে অধিক শক্তিশালী দিকটির সূত্রে ওয়ারিশ হবে। তাই যখন কোনো নারী একপুত্র রেখে মারা যাবে আর সে তার চাচাতো ভাইয়ের পুত্র (অর্থাৎ চাচাতো ভাই তার স্বামী) তখন সে (চাচাতো ভাইয়ের ছেলে) মহিলার পুত্র হিসেবে উক্ত নারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি লাভ করবে। অন্য কোনো আত্মীয়তার কারণে সে কিছুই পাবে না। কারণ, পুত্র হওয়া চাচাতো ভাই হওয়ার চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সম্পর্ক।

ওয়ারিশ হওয়ার যদি পরস্পর ভিন্ন দু'টি দিক থাকে এবং প্রতিটি দিকই যদি উত্তরাধিকারিত্বের দাবিদার হয় তাহলে দু'টি দিক থেকেই ওয়ারিশ হবে। অতএব, মৃত ব্যক্তি যদি বৈপিত্রেয় দুই ভাই রেখে যায়, যাদের একজন আপন চাচার পুত্র তাহলে বৈপিত্রেয় ভাইদের জন্য ফরয তথা নির্ধারিত অংশ হিসেবে এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) কে দুই ভাগ করে প্রত্যেকে এক ভাগ (এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক) করে পাবে এবং অবশিষ্ট সমুদয় সম্পদ সেই বৈপিত্রেয় ভাই একাই পাবে, যে আপন চাচার পুত্র। কেননা, সে 'আসাবা'। তাই সে অবশিষ্ট সম্পদও লাভ করবে।

কোনো কোনো সময় কোনো ব্যক্তি কোনো এক দিক থেকে মিরাস লাভের ব্যাপারে মাহজুব (বঞ্চিত) হলেও আরেক দিক থেকে ওয়ারিশ হয়ে যায়। কারণ, সেদিক থেকে তাকে বঞ্চিত করার মত কেউ থাকে না। যেমন মৃত ব্যক্তি কন্যা এবং আপন চাচার দুই পুত্র রেখে গেল যাদের মধ্যে একজন বৈপিত্রেয় ভাই। এ ক্ষেত্রে ফরয বা নির্ধারিত অংশ হিসেবে কন্যা পাবে সমুদয় সম্পদের অর্ধেক। অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পদ 'আসাবা' হওয়ার কারণে চাচার দুই পুত্র (চাচাতো ভাই) অর্ধাংশ হিসেবে লাভ করবে। বৈপিত্রেয় ভাই হওয়ার কারণে অপর চাচাতো ভাই বাড়তি কিছুই পাবে না। কেননা, কন্যার কারণে সে মাহজুব (বঞ্চিত)।

## হিজড়া (الْخُنْثَى) বা উভয়লিঙ্গধারীদের উত্তরাধিকার

الْخُنْثَى শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন মানুষ যার দেহে পুরুষ ও নারী উভয়েরই বিশেষ অঙ্গ বর্তমান। এ শব্দটির বহুবচন خَنَاثَى ও خِنَاث।[১৫৯]

---

১৫৯. আল-কামূসুল-মুহিত।

www.amarboi.org

এর পারিভাষিক অর্থ হলো, এমন মানুষ যার পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীর বিশেষ অঙ্গ আছে অথবা তার কোনোটিই নেই। শা'বীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, এক নবজাতকের জন্ম হয়েছে যার পুরুষ অঙ্গ বা নারী অঙ্গ কোনোটিই নেই। তার নাভী থেকে গাঢ় পেশাবের ন্যায় পদার্থ বের হচ্ছে। মিরাসে তার প্রাপ্য কি হবে? জবাবে শা'বী তাকে নারী হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

হিজড়া দুই রকম। مُشْكِل (মুশকিল) জটিল ও غَيْر مُشْكِل (গায়ের মুশকিল) স্বাভাবিক। যার দেহে পুরুষ বা নারীর চিহ্নসমূহ স্পষ্ট এবং সে নারী না পুরুষ তা বুঝা যায়, সে জটিল শ্রেণীর হিজড়া নয়; বরং সে একজন বাড়তি অঙ্গধারী পুরুষ বা নারী।

**হিজড়াদের উত্তরাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে ইসলামের বিধান**

হিজড়াদের মধ্যে পুরুষ বা নারী-যার লক্ষণসমূহ পাওয়া যাবে সেই লক্ষণ অনুসারে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। ফিকহবিদ পণ্ডিতদের বক্তব্য অনুসারে তার পেশাবের অঙ্গ বিবেচ্য হবে। ইবনুল মুনযির বলেন : আমাদের জানা মতে, উলামাদের 'ইজমা' হচ্ছে, হিজড়াদেরকে তাদের পেশাবের অঙ্গ বিবেচনা করে ওয়ারিশ বানানো হবে। পুরুষ যে অঙ্গ দিয়ে পেশাব করে সেও যদি সেই অঙ্গ দিয়ে পেশাব করে তাহলে সে পুরুষ। আর যদি নারী যে অঙ্গ দিয়ে পেশাব করে সেও সেই অঙ্গ দিয়ে পেশাব করে তাহলে সে নারী। যাদের থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন হযরত আলী রা., হযরত মুআবিয়া রা., সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ., জাবের ইবনে যায়েদ রা., কুফাবাসী ও আরো অনেক পণ্ডিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নারী অঙ্গ ও পুরুষ অঙ্গধারী এক শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কোনো অঙ্গের বিবেচনায় তাকে ওয়ারিশ বানানো হবে? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : مِنْ حَيْثُ يَبُول "যে অঙ্গ দিয়ে সে পেশাব করে"। আরো বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনসারদের এক হিজড়াকে আনা হলে তিনি বললেন :

وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّل مَا يَبُول مِنْهُ "তাকে তার সেই অঙ্গ অনুসারে ওয়ারিশ বানাও যে অঙ্গ দিয়ে প্রথমে সে পেশাব করে"।[১৬০]

---

১৬০. হাদীসটি ইবনে আদী আল-কামিল গ্রন্থে কালবী-আবূ সালেহ-ইবনে আব্বাস রা.-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী তার সুনানে (খ. ৬, পৃ. ২৬১, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য সং.) এটি বর্ণনা করে বলেছেন, কালবী প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব নয় এবং ইবনুল জাওযী আল-মাওদু'আতে (খ. ৩, পৃ. ২৩০, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা সং.) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

তাছাড়া পেশাব করা একটা বড় লক্ষণ যা ছোট বড় সবারই আছে। পক্ষান্তরে অন্য আলামতগুলো বড় হওয়ার পর প্রকাশ পায়। যেমন : দাড়ি দেখা দেয়া, স্তনের স্ফীতি, বীর্যস্খলন, মাসিক হওয়া ও গর্ভধারণ করা। যদি সে দু'টি অঙ্গ দ্বারাই পেশাব করে তাহলে অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে যে অঙ্গ থেকে প্রথমে পেশাব বের হয় সেটি বিবেচ্য হবে।

যদি দু'টি অঙ্গ থেকে একই সাথে পেশাব নির্গত হয় এবং একটুও আগে বা পাছে না হয় সে ক্ষেত্রে একটি রেওয়ায়াত অনুসারে ইমাম আহমদ বলেছেন : যে অঙ্গের মাধ্যমে বেশি পেশাব নির্গত হয় সেটির বিবেচনায় ওয়ারিশ হবে। ইমাম আওযাঈ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ থেকেও এমতটিই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা এ বিষয়ে কিছু বলেননি। ইমাম শাফেয়ী দু'টি অবস্থার একটিকেও বিবেচনাযোগ্য মনে করেননি। দু'টি অঙ্গ থেকে সমপরিমাণে পেশাব নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ বলেছেন, এ বিষয়টি আমাদের জানা নেই। হাম্বলী ইমামগণ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে সে জটিল শ্রেণীর হিজড়া বলে পরিগণিত হবে।

হিজড়া ব্যক্তির উত্তরাধিকার পরিত্যাগকারী (الْمُوَرِّث) মারা গেলে অধিকাংশ ফিকহবিদ-এর মতে : তার উত্তরাধিকারের বিষয়টি সে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে, যাতে তার মধ্যে পুরুষের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন: দাড়ি গজানো, পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্যস্খলিত হওয়া এবং তা পুরুষের বীর্য হওয়া অথবা নারীর লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমন : মাসিক আরম্ভ হওয়া, গর্ভ সঞ্চার হওয়া ও স্তনের স্ফীতি ও গোলাকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠা। মায়মুনীর রেওয়ায়াতে ইমাম আহমদ রহ. এগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন।

যদি মিরাস (উত্তরাধিকার বা পরিত্যক্ত সম্পদ) বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাকেসহ সব ওয়ারিশদেরকে তাদের নিশ্চিত পরিমাণ প্রাপ্য অংশ (যে পরিমাণের কম কেউই পাবে না) প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদের বণ্টন তার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে বণ্টনের সময় একবার তাকে পুরুষ ধরে হিসাব করা হবে এবং আরেকবার নারী ধরে হিসাব করা হবে। দু'টি হিসাব অনুপাতে প্রত্যেক ওয়ারিশের সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশ যা হবে সেটাই তাকে দেয়া হবে। অবশিষ্ট সম্পদের বণ্টন তার (হিজড়া) বয়প্রাপ্তি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে।

যদি সে (হিজড়া) বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই মারা যায় অথবা মৃত্যুর সময়ে জটিল শ্রেণীর হিজড়া হিসেবে থেকে যায় অর্থাৎ পুরুষ বা নারী প্রমাণিত হওয়ার পক্ষে কোনো লক্ষণ স্পষ্ট না হয় সে ক্ষেত্রে হাম্বলী ফিকহবিদদের মতে মিরাসে তার প্রাপ্য অংশ হিসেবে একজন পুরুষ ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশের অর্ধেক এবং একজন নারী ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশের অর্ধেক দেয়া হবে। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস,



www.amarboi.org

শা'বী, ইবনে আবী লায়লা, মদীনা ও মক্কাবাসী ফকীহগণ, আছ-ছাওরী, আল-লু'লুঈ, শারীক, হাসান ইবনে সালেহ, আবু ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, দিরার ইবনে জারাদ ও নাঈম ইবনে হাম্মাদের মত। ইমাম আবু হানীফা রহ. তার সর্বাপেক্ষা খারাপ অবস্থা অনুপাতে বিবেচনা করে ওয়ারিশ করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী ও তার সহমতপোষণকারীগণ তাকে তার নিশ্চিত প্রাপ্য অংশ দিয়ে তার বিষয়টি সুস্পষ্ট না হয়ে যাওয়া অথবা ওয়ারিশগণ পরস্পর সমঝোতা না করা পর্যন্ত অবশিষ্ট সম্পদ বন্টন স্থগিত রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। আবু সাওর, দাউদ ও ইবনে জারীরও একই মত পোষণ করেছেন। এ মাসআলাটির ব্যাপারে আরো কিছু অপ্রসিদ্ধ বক্তব্য ও মতামত আছে।[১৬১]

হিজড়া ব্যক্তি যদি তার মাসিক হওয়া অথবা বীর্য অথবা পুরুষ বা নারীর প্রতি আকর্ষণের কথা জানায় তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে; কিন্তু পরে তা অস্বীকার করতে চাইলে তার অস্বীকৃতি গ্রহণ করা হবে না। তবে তার পূর্বের কথা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হলে তা ভিন্ন কথা। যেমন : সে নিজের পুরুষ হওয়া সম্পর্কে অবহিত করে পরে সন্তান প্রসব করল। এক্ষেত্রে তার পূর্বের কথা অনুযায়ী কৃত কাজ তথা গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে হবে।[১৬২]

### গর্ভস্থ সন্তানের মিরাস

গর্ভস্থ সন্তানও ওয়ারিশদের অন্তর্ভুক্ত হবে যদি জানা থাকে যে, মুরিস তথা সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণকারীর মৃত্যুর সময় সে গর্ভে ছিল এবং তার মৃত্যুর পরে মায়ের গর্ভ থেকে জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছে। মাতৃগর্ভে সে ছিল তা প্রমাণিত হবে যদি সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণকারীর মৃত্যুর পর গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদকালের মধ্যে সে ভূমিষ্ট হয়। সর্বনিম্ন এই মেয়াদকাল হচ্ছে ছয় মাস। তবে শর্ত হচ্ছে, মুরিসের (الْمُورِثْ) মৃত্যুর সময় গর্ভস্থ সন্তানের পিতা-মাতার দাম্পত্য বন্ধন বহাল থাকা। কারণ, সব ফিকহবিদের মতে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস।

মহিলা যদি 'ইদ্দত' পালনরত হয় এবং স্বামীর মৃত্যু অথবা বায়েন তালাকের কারণে বিচ্ছেদ ঘটার পর দুই বছরের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে সেই সন্তান ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হবে। এটা হানাফীদের মাযহাব এবং ইমাম আহমদের একটি মত। ইমাম আহমদের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, গর্ভধারণের সর্বাধিক

---

১৬১. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১১৩-১১৫, আল-মানার সং.; আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩০৪ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; আশ-শারহুল কাবীর মা'আ হাশিয়াতিদ দাসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৫৩; শারহুর রাহবিয়া, পৃ. ৪১।

১৬২. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩০৬।

www.amarboi.org

সময়কাল চার বছর। এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব এবং মালেকীদের একটি মত। মালেকীদের আরেকটি মত হচ্ছে, গর্ভধারণের সর্বাধিক সময়কাল পাঁচ বছর। মালেকীদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আবদিল-হাকামের মতে তা এক বছর।

গর্ভধারণের সর্বাধিক সময়কাল সম্পর্কে হানাফীদের দলীল হলো, হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস :

لاَ يَبْقَى الْوَلَدُ فِي رَحِمِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ

'বাচ্চা মায়ের গর্ভে দুই বছরের অধিক সময় থাকে না, তা চরকার চাকার ঘূর্ণনের সময়টুকুও না'।[১৬৩] এ ধরনের জ্ঞানলাভ কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেই হতে পারে, কিয়াস বা অনুমানের ভিত্তিতে নয়।[১৬৪]

গর্ভধারণের সর্বাধিক সময়কাল সম্পর্কে শাফেয়ীদের দলীল হলো, যুক্তি ও অনুসন্ধানভিত্তিক। তাছাড়া এটাও তাদের দলীল যে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে হযরত উমর রা. বলেছেন : تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ "(নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রী) চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর 'ইদ্দত' পালন করা শুরু করবে"। চার বছর নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, এটাই গর্ভধারণের সর্বাধিক সময়কাল।[১৬৫]

ইবনে রুশদ বলেন : এ মাসআলাটির ব্যাপারে সচরাচর যা ঘটতে দেখা যায় তার এবং অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হবে। ইবনে আব্দুল হাকামের বক্তব্য নিত্যদিনের আচার-অভ্যাসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। তাই আচার-অভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তই ওয়াজিব হবে। বিরল কোনো ঘটনা অনুসারে নয়। আর তা অসম্ভবও হতে পারে।[১৬৬]

মৃত ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিশদের মধ্যে কোনো গর্ভবতী মহিলা রেখে যায় তাহলে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত মিরাস বণ্টন স্থগিত থাকবে। ওয়ারিশগণ যদি মিরাস

---

১৬৩. দারাকুতনী (খ. ৩, পৃ. ৩২২, দারুল মাহাসেন, কায়রো সং.) যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন তা হলো : ما تزيد المرأة فى الحمل على سنتين ولاقدر مايتحول ظل عود هذا المغزل 'মেয়েদের গর্ভধারণকাল দুই বছরের বেশি হয় না, এমনকি চরকার চাকার ছায়া ঘূর্ণনের সময়টুকু পর্যন্তও নয়, দারা কুতনী অনেকটা একই ভাষায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বায়হাকীও (খ. ৭, পৃ. ৪৪৩; দায়েরায়ে মাআরিফে উসমানিয়া সং.) দারাকুতনীর বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন।

১৬৪. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩১৪ ও ৩১৫।

১৬৫. শারহুর রাওদ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩; আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা সং.।

১৬৬. ইবনে রুশদ, খ. ২, পৃ. ৩৫৮, আল-হালাবী সং; মাওসূআ সম্পাদনা পরিষদ মনে করে যে, ইবনে আব্দুল হাকামের মতটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের অধিক কাছাকাছি। এ জাতীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসরণ করা হয়।

www.amarboi.org

বণ্টনের দাবি করে তাহলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি বণ্টন করা যাবে না। তবে উক্ত গর্ভস্থ শিশুর কারণে যে ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পাবে না তাকে তার পুরো অংশ দিয়ে দেয়া যাবে; কিন্তু যার অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হবে তাকে তার সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশ দেয়া হবে। আর যে ওয়ারিশ গর্ভস্থ সন্তানের কারণে বঞ্চিত হবে তাকে (এই অগ্রিম বণ্টনে) কিছুই দেয়া হবে না।

গর্ভস্থ সন্তান তখনই ওয়ারিশ হবে যখন সে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কালের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবে। অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে এ বিষয়ে যে সব ভিন্ন মত উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুসারে গর্ভ ধারণের সর্বাধিক সময়কালের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হলেও সে ওয়ারিশ হবে। কিন্তু এ সময়কালের পরে ভূমিষ্ঠ হলে ওয়ারিশদের সম্মতি ছাড়া ওয়ারিশ হবে না।

গর্ভস্থ সন্তান দু'টি শর্তে ওয়ারিশ হয় :
**প্রথম শর্ত :** জীবিত ভূমিষ্ঠ হবে, যাতে তার জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণকে মাতৃগর্ভের জীবনের ধারাবাহিকতা এবং সেখানে জীবন্ত থাকার প্রমাণ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ 'নবজাতক বাচ্চা চিৎকার করে থাকলে ওয়ারিশ হবে'।[১৬৭] তা ছাড়া সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে,

قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَ . 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়ে চিৎকার না করলে ওয়ারিশ হবে না'।[১৬৮]

মায়ের ওপর কোনো প্রকার নির্যাতন ছাড়াই অর্থাৎ মাকে কোনো রকম মারপিট করা ছাড়াই যদি নবজাতক মৃত ভূমিষ্ঠ হয় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তার জীবিত থাকার কোনো প্রমাণও না থাকে তাহলে সব ফিকহবিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সে ওয়ারিশ হবে না। কারণ মিরাস লাভের শর্ত হচ্ছে ওয়ারিশকে জীবিত হতে হবে। আর যদি মায়ের ওপর কোনো প্রকার অত্যাচারের (মারপিট ইত্যাদি) ফলে গর্ভপাত হয়ে থাকে তাহলেও অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে সে (নবজাতক) ওয়ারিশ হবে না। কারণ তার জীবিত থাকার কোনো প্রমাণ নেই। তবে হানাফী

---

১৬৭. হাদীসটি আবু দাউদ (খ. ৩, পৃ. ৮৭, আল-মাতবাআতুল আনসারিয়্যা, দিল্লী, সং, এবং তার থেকে বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ২৫৭, দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া সং.) বর্ণনা করেছেন।
১৬৮. হাদীসটি ইবনে মাজা (হাদীস নং ২৭৫১, ঈসা আল-হালাবী সং) হযরত জাবের ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

www.amarboi.org

ফিক্‌হবিদদের মতে সে ওয়ারিশ হবে। কারণ এ জুলুম ও অত্যাচারের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে শরীয়ত তাকে জীবিত মনে করেছে। যার কারনে জুলুম ও অত্যাচারকারীর ওপরে শাস্তি আরোপ করেছে। আর এ অনিবার্য শাস্তি জীবিতদের প্রতি জুলুমের কারণে দেয়া হয় মৃতের ওপর জুলুমের কারণে নয়। অনুরূপভাবে তাদের মতে সে (নবজাতক) তার মৃত মু'রিস (الْمُورِثُ) বা উত্তরাধিকার রেখে মৃত্যু বরণকারীর ওয়ারিশ হবে, যে তার মাতৃগর্ভে থাকাকালে মারা গেছে। অতঃপর সে যখন মৃত অবস্থায় মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে এসেছে তখন তার ওয়ারিশগণ তার উত্তরাধিকারী হবে।

হানাফীদের মতে নবজাতকের দেহের বেশিরভাগ অংশ জীবিতাবস্থায় মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসাটাই যথেষ্ট। মাতৃগর্ভ থেকে তার বেরিয়ে আসা যদি স্বাভাবিকভাবে হয় এবং মাথাটা আগে বেরিয়ে আসে এবং সে জীবিত থাকা অবস্থায় তার বক্ষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসে অথবা সে যদি উল্টোভাবে (পায়ের দিকে থেকে) বেরিয়ে আসে এবং তখনও জীবিত থেকে থাকে কিংবা নাভি পর্যন্ত বেরিয়ে আসে, তারপর মারা যায় তাহলে তাদের মতে সে ওয়ারিশ হবে। কারণ, বেশিরভাগ অংশ সম্পূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য হবে।[১৬৯]

তিন ইমামের মতে শর্ত হলো, নবাজতককে জীবিতাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হতে হবে। সশব্দে চিৎকার হবে তার জীবন্ত হওয়ার প্রমাণ। চিৎকার ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ বা আলামতের বিষয়ে ফিকহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদল ফিকহবিদ বলেছেন, আওয়াজ না করা পর্যন্ত ওয়ারিশ হবে না। অন্য কোনো আলামত বা লক্ষণ এর বিকল্প হবে না। অতপর চিৎকার বা আওয়াজ করা বলতে কি বুঝায় সে বিষয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদল বলেছেন : জোরে চিৎকার না করে থাকলে ওয়ারিশ হবে না। এটাই ইমাম আহমদ রহ. থেকে প্রসিদ্ধতর বর্ণনা। তাছাড়া বহু সংখ্যক সাহাবী রা. ও তাবেঈ থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে। إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ 'নবজাতক যদি চিৎকার করে তাহলেই ওয়ারিশ হবে, নবী কারীম (স.) থেকে বর্ণিত এ হাদীসই তাদের দলীল।

এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে, চিৎকার না করে থাকলে মৃত নবজাতক ওয়ারিশ হবে না। আরো এ কারণে যে, চিৎকার করা জীবিত মানুষেরই কাজ। পক্ষান্তরে নড়াচড়া ও অন্য কিছু জীবনহীনদের থেকেও হতে পারে। ইমাম আহমদ র. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন : গর্ভপাতের ক্ষেত্রে অপরিণত সন্তান চিৎকার করলে সেও ওয়ারিশ হবে এবং অন্যরাও তার ওয়ারিশ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ ক্ষেত্রে চিৎকার (الإِسْتِهْلَال) বলতে কি বুঝায় ? তিনি বললেন : চিৎকার করা, হাঁচি দেয়া বা কাঁদা।

---

১৬৯. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩২১-৩২২।

www.amarboi.org

এ দৃষ্টিকোণ থেকে নবজাতকের এমন প্রতিটি শব্দই চিৎকার হিসেবে গণ্য হবে যা তার জীবিত হওয়ার প্রমাণ দেয়। যুহরী ও কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের মতও তাই। কারণ এটা এমন শব্দ যা তার জীবিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ কারণে ঐ আওয়াজ যেন চিৎকারের ন্যায়। ইমাম আহমদ থেকে তৃতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে, শব্দ, নড়াচড়া, দুধপান অথবা অন্য কিছু থেকে যদি তার মধ্যে জীবন আছে বলে জানা যায়, তাহলে সে ওয়ারিশ হবে এবং এসব বিষয় তার ক্ষেত্রে চিৎকার বলে প্রমাণিত হবে। কারণ সে জীবিত। এটা সাওরী, আওযাঈ, শাফেয়ী, আবু হানীফা ও তার সাথীদের মত।[১৭০]

**দ্বিতীয় শর্ত :** ইদ্দত চলাকালীন ভূমিষ্ঠ হতে হবে। যদি গর্ভবতী মহিলা ইদ্দত শেষ হওয়ার দাবি করে এবং ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে তবে তার সেই দাবি মিথ্যা। সে ক্ষেত্রে উক্ত নবজাতক ওয়ারিশ হবে এবং ইদ্দত শেষ হয়েছে বলে দাবির ক্ষেত্রে তার মিথ্যাকথন স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা না বলে এবং গর্ভ ধারণের সর্বাধিক সময়কাল পূর্ণ হয় অথবা তার চেয়ে কম সময়ে তাকে প্রসব করে, সে ক্ষেত্রেও সে ওয়ারিশ হবে। কারণ এ বিষয়টি তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মিরাস রেখে যাওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই এ ভ্রূণ তার গর্ভে স্থিতি লাভ করেছিলো।

যদি গর্ভধারণের সর্বাধিক মেয়াদকাল (এ বিষয়ে যে মতভেদ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা বিবেচনায় রেখে) শেষ হওয়ার পর প্রসব করে তাহলে সে ওয়ারিশ হবে না। কেননা, সে ক্ষেত্রে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ ভ্রূণ মিরাস রেখে যাওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্থিতি লাভ করেছে।

যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে কোনো গর্ভধারিণী মহিলা থাকে এবং এ অবস্থায় পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মতে, গর্ভস্থ সন্তানকে চার পুত্র বা চার কন্যা ধরে নিয়ে যাদের (পুত্র ও কন্যার) প্রাপ্য অংশের পরিমাণ বেশি হবে তা গর্ভস্থ সন্তান বা সন্তানদের জন্য রেখে অবশিষ্ট সম্পদ অন্য ওয়ারিশদের মধ্যে তাদের সর্বনিম্ন প্রাপ্য অনুপাতে বণ্টন করে দিতে হবে। এটা মালেকী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধতর মতের পরিপন্থী মত। শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধতর মত হচ্ছে, এ বিষয়ে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম বা বিধান নেই। সর্বাধিক প্রাপ্য অংশের উদাহরণ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির গর্ভবতী স্ত্রী, চাচা অথবা ভাই রেখে মারা যাওয়া। কন্যাদের সর্বাধিক প্রাপ্য অংশের উদাহরণ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি তার গর্ভবতী স্ত্রী এবং মা-বাবাকে রেখে মৃত্যু বরণ করা। এ ক্ষেত্রে মাসআলাটি চব্বিশ দ্বারা সমাধা হবে।

---

১৭০. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১৯৭-২০০ প্রথম মুদ্রণ।

www.amarboi.org

স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ (আট ভাগের এক ভাগ) এবং পিতা মাতার প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ)। এরপর অবশিষ্ট থাকবে তের। আর তা লাভ করবে 'আসাবা'গণ। যদি চার পুত্র বা চার কন্যা ধরা হয় তাহলে তারা পাবে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) অর্থাৎ চব্বিশ ভাগের ষোল ভাগ।

অতঃপর গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সংশয় দূর হয়ে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেলে সে স্থগিত রাখা পুরো সম্পদের প্রাপক হলে তা নিয়ে নেবে এবং বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যাবে। আর যদি সে এর অংশবিশেষের প্রাপক হয় তাহলে প্রাপ্য অংশ নিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। আর যে ওয়ারিশের যতটুকু প্রাপ্যতা স্থগিত ছিল, তা তাকে দিয়ে দেয়া হবে।

ইমাম আবু হানীফা ও তার সহমতপোষণকারীদের মাযহাবই শারীক আন-নাখঈর মাযহাব। তিনি বলেছেন : আমি কুফাতে একই মায়ের গর্ভ থেকে আবু ইসমাঈলের চার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে দেখেছি। পূর্ববর্তী আলিমদের কারো থেকে এমন কোনো উক্তি পাওয়া যায় না যে, কোনো নারীর গর্ভ থেকে একই সাথে চারটির অধিক সন্তান জন্ম লাভ করেছে।

ইমাম মুহাম্মাদের মতে তিনটি পুত্র সন্তান অথবা তিনটি কন্যা সন্তানের প্রাপ্য অংশের মধ্যে যেটার পরিমাণ অধিক হবে সেই পরিমাণ সম্পদের বণ্টন স্থগিত থাকবে। লাইছ ইবনে সা'দ রহ. এটি ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদের অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, দুই পুত্রের অথবা দুই কন্যার প্রাপ্য অংশের মধ্যে যেটা পরিমাণে বেশি সেই পরিমানের বণ্টন স্থগিত থাকবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটি মত। এর কারণ, এক গর্ভে এক সাথে চারটি মানব শিশুর জন্ম অতিশয় বিরল ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর ওপর কোনো বিধানের ভিত্তি হতে পারে না। মোট কথা, সচরাচর যা হয়ে থাকে অর্থাৎ যমজ বা দুই শিশুর জন্মই হবে এ বিধানের বুনিয়াদ। খাসসাফ রহ. ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক পুত্র বা এক কন্যার প্রাপ্য অংশের মধ্যে যেটা অধিক হবে ঠিক সেই পরিমাণ সম্পদের বণ্টন মওকুফ করা হবে এবং এর ওপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। কেননা, সাধারণ নিয়ম হলো, নারী একবারে একটি সন্তানই প্রসব করে। অতএব, ব্যতিক্রমী কোনো কিছু অবগতিতে না আসা পর্যন্ত এটাই হবে সিদ্ধান্তের ভিত্তি।

ফাতাওয়া আহলে সামারকান্দ (সমরখন্দবাসীর ফতোয়া) গ্রন্থে আছে : গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যদি নিকটবর্তী হয়ে থাকে তাহলে উত্তরাধিকার বণ্টন বন্ধ রাখা হবে। কেননা, তাড়াহুড়ার কারণে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এ বণ্টন বাস্তব অবস্থার পরিপন্থী এবং সে কারণে অর্থহীন হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। আর প্রসবের সময়ে যদি বিলম্ব থাকে তাহলে বণ্টন মওকুফ হবে না। কারণ, সে

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে অন্য ওয়ারিশদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রসবকাল নিকটবর্তী হওয়া বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নয়; বরং প্রচলিত নিয়ম ও রীতিই বিবেচ্য হবে। একটা মত হচ্ছে, এক মাসের কম সময় থাকলে সেটাই নিকটবর্তী হওয়া বুঝাবে। ইমাম আবু ইউসুফের রেওয়ায়াত অনুসারে কাজী ওয়ারিশদের কাছে এ মর্মে জামানত বা নিশ্চয়তা চাইবেন যে, গর্ভে একাধিক সন্তান থাকলে তারা দায়িত্ব বহন করবে।[১৭১]

ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব হলো, গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দুইজন পুত্র সন্তানের প্রাপ্য অংশ ও দুইজন কন্যা সন্তানের প্রাপ্য অংশের মধ্যে যেটা অধিক সেই পরিমাণ উত্তরাধিকারের বণ্টন মওকুফ থাকবে। এটাই আব ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর দু'টি মতের একটি, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এর যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যমজ বাচ্চার জন্ম প্রায়ই হয়ে থাকে যা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অধিক বাচ্চার একসাথে জন্মলাভ বিরল ঘটনা। আর বিরল কোনো ঘটনা কোনো নিয়ম-বিধানের ভিত্তি হতে পারে না। দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে যাদের প্রাপ্য অংশ অধিক সেই পরিমাণের বণ্টন স্থগিত রাখার নিয়ম-রীতি হচ্ছে, যদি নির্ধারিত (ফরজ) অংশ (এক তৃতীয়াংশের) অধিক হয় তাহলে মেয়েদের অংশ বেশি হবে। সে ক্ষেত্রে তাদের জন্য দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) নির্দিষ্ট হবে এবং প্রাপ্য অংশ অনুপাতে প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তবে নির্ধারিত অংশ যদি এক তৃতীয়াংশের কম হয় তাহলে দুই পুত্রের মিরাস বেশি হবে। আর যদি নির্ধারিত অংশ সমান হয়, যেমন : মৃত ব্যক্তির মা-বাপ ও গর্ভস্থ সন্তান তাহলে দুই পুরুষ ও দুই নারীর মিরাস সমান হবে।

## নিরুদ্দেশ (اَلْمَفْقُوْدُ) ব্যক্তির মিরাস

اَلْمَفْقُوْدُ এর আভিধানিক অর্থ নিখোঁজ, নিরুদ্দেশ।[১৭২]

পারিভাষিক অর্থ : এমন নিরুদ্দেশ ব্যক্তি যার কোনো খবর নেই এবং সে জীবিত না মৃত, তাও কারো জানা নেই।[১৭৩] শামসুল আয়েম্মা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে : এমন অস্তিত্বমান ব্যক্তি যে তার প্রাথমিক অবস্থার বিবেচনায় জীবিত; কিন্তু শেষ অবস্থার বিবেচনায় মৃতের মত।[১৭৪] এটিই নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সব চেয়ে উত্তম সংজ্ঞা বলে বলা হয়ে থাকে।

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মিরাস লাভের বিধান হচ্ছে, তার সম্পত্তি ও সম্পদের ব্যাপারে তাকে জীবিত বলে বিবেচনা করা হবে। তাই কেউ তার ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু

---

১৭১. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩১৭-৩১৮; আর-রাহূনী, খ. ৮, পৃ. ৩৪৩, বুলাক সং.; রাওদাতুত তালেবীন, খ. ৬, পৃ. ৩৯; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ২, পৃ. ৮৯।

১৭২. আল-কামূস।

১৭৩. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩২৬।

১৭৪. হাশিয়াতুল ফান্নারী, পৃ. ৩২৬।

www.amarboi.org

অন্যের সম্পদের ব্যাপারে তাকে মৃত বলে বিবেচনা করা হবে। তাই সেও কারো ওয়ারিশ হবে না। এর মূল কারণ হলো, তাকে জীবিত গণ্য করা হবে যতক্ষণ না এর বিপরীত কিছু প্রকাশ পাবে ততক্ষণ অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। তার অবস্থার কারণে তাকে জীবিত ধরে নেয়া হয়েছে। এটা এমন এক অবস্থা যা প্রাপ্যতাকে বাধা দেয় এবং নিজেকেও অন্যের মিরাসে প্রাপক হতে দেয় না। তার সম্পদ বণ্টন ততদিন মওকুফ থাকবে যতদিন তার মৃত্যুর সঠিক সংবাদ না পাওয়া যাবে অথবা তার নিরুদ্দেশের পর এতটা সময় অতিবাহিত না হবে যে সময়ের পরে তার সমবয়সীরা জীবিত থাকবে না। এটাই ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর মত এবং হানাফীদেরও অন্যতম সিদ্ধান্ত।

যে মেয়াদকাল বা সময় সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে হানাফীদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তাদের সুস্পষ্ট বর্ণনাটি হলো, যখন তার শহরে তার বয়সের আর একজনও অবশিষ্ট থাকবে না তখন তার মৃত্যু হওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হবে। অপর একটি মত অনুযায়ী যখন গোটা জনবসতিতে তার সমবয়স্ক কেউ থাকবে না। তবে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধতর। কেননা, দ্বিতীয় মত অনুযায়ী কাজ করা কঠিন। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় মানুষের বয়সেও পার্থক্য হয়ে থাকে।

হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবু হানীফা র. থেকে বর্ণনা করেন, এই মেয়াদকাল হচ্ছে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্ম থেকে একশ' বিশ বছর। ইমাম মুহাম্মদ বলেন, একশ' দশ বছর, ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, একশ' পাচ বছর এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকেই আরেকটি বর্ণনা রয়েছে একশ' বছর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নব্বই বছর। কেননা এর চেয়ে বেশি বয়স একেবারেই বিরল। অতএব, তার ওপর নির্ভর করে শরীয়তের বিধি-বিধান হতে পারে না। ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান রচিত হয় গরিষ্ঠ সংখ্যক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে। ইমাম তামারতাশী বলেন, এ মতটির ওপরেই ফতোয়া। কারো কারো মতে উক্ত মেয়াদকাল সত্তর বছর। কারণ, একটি মাশহূর হাদীসে এই উম্মতের বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে : . أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ سِتِّينَ إِلَى سَبْعِينَ "আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে"।[১৭৫] আবার কেউ বলেছেন : নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পদ ও সম্পত্তির বিষয় সমকালীন ইমাম (সরকার বা রাষ্ট্র প্রধান) এর 'ইজতিহাদ' (গবেষণা) মূলক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল হবে। শারহ ফারায়েজে উসমানিয়া থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ. কোনো চূড়ান্ত মেয়াদকাল নির্ধারণ করেন নি। বরং তা নির্ধারণের বিষয় সংশ্লিষ্ট কালের

---

১৭৫. হাদীসটি তিরমিযী, (খ. ৬, পৃ. ৬২৩, খ. ৯, পৃ. ৫৩৭, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা সং.) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হাসান গারীব। ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে, (খ. ১১, পৃ. ২৪০, আস-সালাফিয়্যা সং.) এটিকে হাসান বলেছেন।

www.amarboi.org

কাজী তথা বিচারকদের 'ইজতিহাদ' ও গবেষণার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা ইজতিহাদ-গবেষণা করে যে মেয়াদকালকে যুক্তিযুক্ত মনে করবেন সেটি উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন এবং বিদ্যমান ওয়ারিশদের মধ্যে তার সম্পদ বণ্টন করে দেবেন। এটিই ফতোয়া হিসেবে গৃহীত।[১৭৬]

মালেকী ফিকহবিদগণ এর কোনো মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করেননি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে সময়কালের পর তার মত মানুষ বেঁচে থাকে না সেই সময়কালে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত নিরুদ্দেশ ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে তার সম্পদ বণ্টন করা হবে না।[১৭৭]

শাফেয়ী ফিকহবিদগণও এই একই মতপোষণ করেছেন। তারা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যাকে বন্দি করা হয়েছে অথবা যে নিরুদ্দেশ বা নিখোঁজ রয়েছে, যে পর্যন্ত তার মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না যায় অথবা এমন একটা সময়কাল অতিবাহিত না হয় যখন এরূপ দৃঢ় ধারনা করা যাবে যে, এরপর সে আর বেঁচে থাকতে পারে না। তাদের বিশুদ্ধ মতানুসারে এর নির্দিষ্ট কোনো সময়-সীমা নেই। অতএব, কাজী তার 'ইজতিহাদে'র সাহায্যে তার মৃত্যুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অপর একটি মত হলো, এর জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট আছে সত্তর বছর, নব্বই বছর এবং একশ বিশ বছর।[১৭৮]

**হাম্বলীদের মতে নিরুদ্দেশ দুই প্রকার**

**প্রথম প্রকার :** যে নিরুদ্দেশ ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বেশির ভাগ থেকেই তার মৃত্যুর ধারণা সৃষ্টি হয়। ধ্বংসাত্মক স্থান থেকে যে ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়। যেমন : এমন কোনো ব্যক্তি যে যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের কাতার বা সারি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় অথবা এমন কোনো জঙ্গলে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয় যেখানে সাধারণত মানুষ মারা যায় অথবা পরিবারের লোকজনের মধ্যে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় অথবা ইশা বা অন্য কোনো নামাযের জন্য বাড়ির বাইরে যায় অথবা নিকটেই কোনো জরুরী প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে আর ফিরে না আসে এবং তার কোনো খরবও জানা যায় না। এসব ক্ষেত্রে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। এর পরও যদি তার কোনো হদিস পাওয়া না যায় তাহলে তার সম্পদ (উত্তরাধিকারীদের মধ্যে) বণ্টন করে দেয়া হবে এবং তার স্ত্রী মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালন করবে এবং সে ইদ্দত শেষে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম আহমদ র. এসব বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই

১৭৬. আস-সিরাজিয়্যা, হাশিয়াতুল ফান্নারী, পৃ. ৩২৬-৩২৮।
১৭৭. আস-সিরাজিয়্যা, হাশিয়াতুল ফানারী, পৃ. ৩২৬-৩২৮।
১৭৮. আশ-শিরওয়ানী আলাত তুহফা, খ. ৬, পৃ. ৪২-৪৩ কিছু পরিবর্তন সহ।

www.amarboi.org

আবু বকর রহ. গ্রহণ করেছেন। কাজী উল্লেখ করেছেন যে, তার সম্পদ বন্টিত হবে না যতক্ষণ না চার বছর পর মৃত্যুজনিত ইদ্দত কাল অতিবাহিত হয়। কেননা, এসবের পরই কেবল তার স্ত্রীর পুনর্বিবাহ জায়েয হবে। প্রথম মতটিই অধিকতর সঠিক। কেননা, ইদ্দত পালিত হবে মৃত্যুর পরে। এখন যেহেতু তার মৃত্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সেহেতু তার সম্পদ বণ্টন মওকুফ রাখার কোনো কারণ নেই।

**দ্বিতীয় প্রকার** : এ প্রকারের নিরুদ্দেশের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা থাকে তা সাধারণত : মৃত্যু বা ধ্বংসের কারণ হওয়ার মত নয়। যেমন : ব্যবসায় বা জ্ঞানার্জন বা ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য সফরে বের হওয়ার পর কোনো খবর না পাওয়া। এ বিষয়ে দু'টি বর্ণনা রয়েছে :

**প্রথম বর্ণনা** : এরূপ ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন হবে না এবং তার স্ত্রীও বিয়ে করতে পারবে না যতক্ষণ না তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয় অথবা এমন একটা সময়কাল অতিবাহিত হয়, যার পর তার মত মানুষ সাধারণত : জীবিত থাকে না। এক্ষেত্রে বিচারকের 'ইজতিহাদী' সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। আল-মুগনী গ্রন্থকার বলেন : কারণ এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো তার জীবিত থাকা। সময়সীমা নির্ধারণ অন্য সব কিছু মওকুফকরণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর এখানে মওকুফ নেই সুতরাং বিষয়টি স্থগিত রাখা জরুরী।

**দ্বিতীয় বর্ণনা** : তার জন্মকাল থেকে নব্বই বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। কারণ, সাধারণত : এরপর সে আর জীবিত থাকবে না।

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্য অপেক্ষার মেয়াদকালে তার 'মুরিস' (المُورِث) বা উত্তরাধিকার পরিত্যাগকারী ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্য অংশ বণ্টন থেকে বাদ রাখা হবে এবং মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পরও তার কোনো হদিস না পাওয়া গেলে বণ্টন মওকুফকৃত উক্ত মাল 'মুরিসে'র ওয়ারিশদের ফিরিয়ে দেয়া হবে।

সব ফিকহবিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সেই সব ওয়ারিশরাই কেবল তার ওয়ারিশ হবে যারা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের সময় জীবিত থাকবে। যে বা যারা এর একদিন পূর্বেও মারা যাবে সে বা তারা তার উত্তরাধিকার লাভ করবে না।

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কোনো নিরুদ্দেশ ব্যক্তি থাকে, সে ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ ফিকহবিদের মত হচ্ছে, প্রত্যেক ওয়ারিশকে তার প্রাপ্য নিশ্চিত অংশ দিয়ে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ তার বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া অথবা

www.amarboi.org

অপেক্ষাকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত মওকুফ থাকবে। এটা হবে কেবল তখনই যখন নিরুদ্দেশ ব্যক্তির বর্তমানে অন্য ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তি যদি অন্য ওয়ারিশদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করার কারণ ( حَجْبُ حِرْمَان) হয়ে দাঁড়ায়, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছুই দেয়া হবে না, বরং পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ তার মৃত্যু হওয়া অথবা জীবিত থাকার বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত মওকুফ থাকবে।[১৭৯]

**বন্দিদের মিরাস**

আরবী শব্দ الأَسِيرُ। অর্থ বন্দি। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রেফতারকৃত কয়েদি ও বন্দী। الأَسِيرُ। শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রেফতার হওয়া যে কোনো ব্যক্তি, তাকে বেঁধে রাখা হোক বা বন্ধনমুক্ত রাখা হোক।[১৮০]

বন্দীদের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, তার জীবিত থাকার বিষয় জানা গেলে সে ওয়ারিশ হবে।[১৮১]

যদি সে তার দীন (ইসলামী জীবনবিধান) পরিত্যাগ করে তাহলে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে। কেননা, 'দারুল ইসলামে' বসবাসকালে 'মুরতাদ' হয়ে 'দারুল হারবে' (অমুসলিমদের দেশ) চলে যাওয়া এবং 'দারুল হারবে' 'মুরতাদ' হয়ে সেখানেই থেকে যাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থাতেই সে 'হারবী' বলে গণ্য হবে।

যদি তার 'মুরতাদ' হওয়া, জীবিত থাকা বা মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে কিছুই জানা না থাকে তাহলে সে নিরুদ্দেশ বলে পরিগণিত হবে। এ বিষয়ে পূর্বে মতভেদসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদি তার ওয়ারিশগণ দাবি করে যে, সে 'দারুল হারবে' 'মুরতাদ' হয়ে গিয়েছে তা হলে দুইজন সৎ ও বিশ্বস্ত মুসলমানের সাক্ষ্য ছাড়া তাদের কথা মেনে নেয়া হবে না। কারণ, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী তার মুসলমান হওয়ার বিষয় জানা ছিল। এ কারণে অমুসলিমের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার ইসলাম ত্যাগের কথা মেনে নেয়া যাবে না। কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সাক্ষ্য যেখানে গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দীনী বিষয়ে তার সাক্ষ্য আরো অধিক অগ্রহণযোগ্য। এরূপ নিরুদ্দেশ ব্যক্তি যদি তার 'মুরতাদ' হয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর এসে হাজির হয় এবং 'মুরতাদ' হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে তাহলে

---

১৭৯. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩২৯; আল-হাত্তাব, খ. ৬, পৃ. ৪২৩; আত-তুহফা, খ. ৬, পৃ. ৪৪; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ২০৫-২০৮।

১৮০. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩৩৫।

১৮১. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩৩৫-৩৩৭।

www.amarboi.org

বিচারক তার সিদ্ধান্ত বাতিল করবেন না। তাকে তার সম্পদ ও স্ত্রী ফিরিয়ে দেয়া হবে না। তবে তার কোনো অর্থ বা সম্পদ যদি তার কোনো ওয়ারিশের কাছে অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে উক্ত সম্পদ তাকে ফেরত দেয়া হবে। ঠিক যেমন : অতি পরিচিত কোনো 'মুরতাদ'ও তওবা করে ফিরে আসলে করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই করা হবে।[১৮২]

## পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তিদের মিরাস

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন, একাধিক ব্যক্তি একসাথে পানিতে ডুবে বা আগুনে পুড়ে মারা গেলে কে আগে মারা গিয়েছে তা যদি জানা না যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা., হযরত উমর রা. ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. একমত যে, তারা (মৃত ব্যক্তিগণ) পরস্পর পরস্পরের ওয়ারিশ হবে না। তাদের মিরাস তাদের জীবিত ওয়ারিশগণ পাবে। ইয়ামামার যুদ্ধের শহীদ, 'আমওয়াসে'র মহামারিতে মৃত ব্যক্তিবর্গ এবং হাররাহ যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। জামাল ও সিফফীন যুদ্ধের শহীদদের ব্যাপারে হযরত আলী রা. এর সিদ্ধান্তও তাই ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের রায়ও এটাই। অধিকাংশ ফিকহবিদ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

অন্য একটি রেওয়ায়াতে হযরত আলী রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে। তবে যে সম্পদ তারা একে অন্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে লাভ করবে সে সম্পদে ওয়ারিশ হবে না। কেননা, তাদের প্রত্যেকের অন্যের মিরাসে হকদার হওয়ার কারণ তার জীবিত থাকা। কিন্তু বঞ্চিত হওয়ার কারণটি সন্দেহযুক্ত। তাই যতক্ষণ না অন্য কোনো নিশ্চিত অবস্থা প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ সে জীবিত আছে বলে মেনে নেয়া আবশ্যক। কিন্তু বঞ্চিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, অপরজনের মৃত্যুর আগেই তার মৃত্যু। আর এ বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। তাই সন্দেহবশত বঞ্চিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে যে সম্পদ তারা একে অন্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে লাভ করেছে প্রয়োজনে তা থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা, আমরা যখন তাদের কাউকে অন্য কারো মিরাস দিয়ে দিচ্ছি তখন অন্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে সে যে সম্পদ লাভ করেছে তা লাভের ক্ষেত্রে সে জীবিত ছিল বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এ অবস্থার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, তার মৃত্যুর আগেই অন্যজনের মৃত্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া। আর প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে না। তারা একে অন্যের ওয়ারিশ হিসেবে যে সম্পদ লাভ

---

১৮২. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৩৩৫-৩৩৭।

www.amarboi.org

করেছে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকৃত বা মূল অবস্থা বিবেচ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সেই মূলনীতিটি মেনে চলতে হবে, যাতে বলা হয়েছে : إِنَّ الْيَقِينَ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ 'সুনিশ্চিত বিষয় সন্দেহের ভিত্তিতে বাতিল হয় না'। এটা বহু সংখ্যক বিধি-বিধানের মূলনীতি।

মিরাস বিরোধীদের দলীল হলো, তাদের সবার একে অন্যের মিরাসের হকদার হওয়ার কারণ নিশ্চিতভাবে জানা নেই। আর প্রাপ্যতা কারণের ওপর নির্ভরশীল হয়। তাই যতক্ষণ কারণ নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ প্রাপ্যতাও প্রতিষ্ঠিত হবে না। ফিকহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মূলনীতি হচ্ছে : أَنَّ الاِسْتِحْقَاقَ لاَ يَثْبُتُ بِالشَّكِّ সন্দেহ থাকলে প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।[১৮৩]

## জারজ সন্তানের মিরাস

জারজ (অবৈধ) সন্তান বলা হয় এমন সন্তানকে যে মায়ের ব্যভিচারের ফলে জন্ম লাভ করে। জারজ সন্তানের ক্ষেত্রে বিধান হলো, তার বংশ পরিচিতি হবে মায়ের দিক থেকেই। সে শুধু মায়ের দিক থেকেই উত্তরাধিকারী হবে। কারণ, মায়ের সাথে তার সম্পর্ক বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ। এ সম্পর্কের মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। জমহূর (অধিকাংশ) ফকীহদের মতে ব্যভিচারী ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্ক ও তার থেকে তার বংশ সাব্যস্ত হবে না, এমনকি সে যদি এ কথা স্বীকারও করে যে, জন্মলাভকারী শিশু তারই ব্যভিচারজাত সন্তান। কারণ বংশ পরিচয় একটি নেয়ামত। আর ব্যভিচার একটি পাপ। তাই ব্যভিচারের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর ব্যভিচারের ফলে বাচ্চা হয়েছে, এ কথা যদি সে সুস্পষ্টভাবে না বলে এবং বাচ্চার মা অবিবাহিতা হয় আর স্বীকৃতির শর্তাবলি পূরণ হয়ে থাকে, তাহলে কল্যাণকর দিক বিবেচনা করে তার থেকে তার বংশ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের কেউ মারা গেলে তারা একে অন্যের ওয়ারিশও হবে।[১৮৪]

ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ ও ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের মত হচ্ছে, ব্যভিচারীর বংশ পরিচয়ই হবে তার জারজ সন্তানের বংশ পরিচয়, যদি অবিবাহিতা বা স্বামীহীনা নারীর সাথে ব্যভিচারের ফলে উক্ত সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। কেননা, তার ব্যভিচার স্বীকৃত বাস্তবতা। যেভাবে তার মায়ের বংশের সাথে তার বংশ পরিচয় প্রমাণিত তেমনিভাবে ব্যভিচারীর দিক থেকেও তার বংশ পরিচয় প্রমাণিত ও স্বীকৃত হবে। যাতে সন্তান বংশ পরিচয়হীন না হয় এবং যে অপরাধ সে (শিশুটি) করেনি সে অপরাধের কারণে তাকে ক্ষতি ও লজ্জাকর পরিস্থিতির

১৮৩. আল-মাবসূত, খ. ৩০, পৃ. ২৭-২৮, দারুল মারিফা সং., কিছুটা পরিবর্তনসহ।
১৮৪. তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৬, পৃ. ২৪১।

www.amarboi.org

সম্মুখীন হতে না হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "কেউ অন্য কারো বোঝা বহন করবে না"।[১৮৫]

এ সিদ্ধান্তের দাবি হচ্ছে, তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ, উত্তরাধিকার হলো বংশ সম্পর্কের একটি শাখা। আর উপরোল্লিখিত অবস্থায় তাঁরা বংশ পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

**লিআন ও লিআনকারীদের সন্তানের মিরাস**

হানাফী ও অন্য চারটি মাযহাবের মতে লিআনকৃত শিশু ও লিআনকারী পুরুষ পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে না।

ইবনে কুদামা বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে লিআন করে সন্তানকে অস্বীকার করে এবং কাজী তাদের (স্বামী ও স্ত্রী) মধ্যে বিচ্ছেদের রায় দিয়ে দেন তাহলে সেই সন্তান তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। লি'আনকারী পুরুষের পক্ষ থেকে ঐ সন্তানের সাথে 'আসাবা' হওয়ার সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতএব, সে নিজে অথবা তার 'আসাবা'দের মধ্য থেকে কেউ তার ওয়ারিশ হবে না। তার মা তার ওয়ারিশ হবে এবং তার 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের ওয়ারিশ) গণ তাদের নির্ধারিত অংশ লাভ করবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের জানা মতে এ বিষয়ে ফিকহ্বিদদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

তবে যদি লিআন সম্পন্ন হবার পূর্বে তাদের (স্বামী ও স্ত্রীর) কেউ মারা যায় তাহলে যে দুই জন থাকবে তারা উক্ত মৃতের ওয়ারিশ হবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, স্বামীর লি'আন যদি পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তারা (স্বামী ও স্ত্রী) একে অন্যের ওয়ারিশ হবে না। ইমাম মালেক রহ. বলেন, স্বামী যদি তার লিআন সম্পন্ন করার পর মারা যায় এবং তার পরে স্ত্রী লিআন করে তাহলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না এবং তাকে শোকও পালন করতে হবে না। আর স্বামীর মৃত্যুর পরে যদি স্ত্রী লিআন না করে তাহলে সে স্বামীর ওয়ারিশ হবে এবং তাকে শোকও পালন করতে হবে। আর স্বামীর লিআন করার পর স্ত্রী নিজেই যদি মারা যায়, সে ক্ষেত্রে কেবল ইমাম শাফেয়ী রহ. ছাড়া অন্য সব ইমামের মতে স্বামী তার ওয়ারিশ হবে।

যদি উভয়ের মধ্যে লি'আন সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের (স্বামী বা স্ত্রী) কেউ মারা যায় এবং কাজী যদি তখনো পর্যন্ত তাদের বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত না দিয়ে থাকেন তাহলে সে ক্ষেত্রে দু'টি রেওয়ায়াত রয়েছে :

---

১৮৫. আল-কুরআন, ৩৫ : ১৮।

www.amarboi.org

**প্রথম রেওয়ায়াত :** তারা কেউ কারো ওয়ারিশ হবে না। এটি ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম যুফার রহ. এর মত। যুহরী, রাবীআ ও আওযাঈ থেকে প্রায় একই মত বর্ণিত হয়েছে। কারণ, লি'আনের স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে চিরদিনের জন্য হারাম করে দেয়া। অতএব, বিচ্ছিন্নতার জন্য বিচ্ছেদ করে দেয়া বিবেচ্য বিষয় নয়। যেমনটি দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

**দ্বিতীয় রেওয়ায়াত :** কাজী যতক্ষণ না তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন ততক্ষণ তারা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তার দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মত। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন। শুধু লি'আন দ্বারাই যদি বিচ্ছেদ হয়ে যেতো তাহলে তাঁর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল না।

স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের লি'আন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই যদি বিচারক তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেন তাহলে বিচ্ছেদ হবে না এবং তাদের পরস্পরের উত্তরাধিকারিত্বও বাতিল হবে না। এটা অধিকাংশ ফিকহবিদের মত।

ইমাম আবু হানীফা ও তার দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. বলেন, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে তিন বার লি'আন করার পর যদি বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেন তাহলে বিচ্ছেদ কার্যকর হয়ে যাবে এবং একে অন্যের ওয়ারিশ হওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, উভয়ের পক্ষ থেকেই লি'আনের সর্বাধিক অংশ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এর আগেই যদি বিচ্ছেদ করে দেয়া হয় তাহলে বিচ্ছেদ কার্যকর হবে না এবং পরস্পর ওয়ারিশ হওয়ার বিষয়টিও বাতিল হবে না।[১৮৬]

শাফেয়ী ফিকহবিদ শায়খ আবু মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত আছে যে, লি'আনের কারণে লি'আনকারী ও তার সন্তানের মধ্যকার উত্তরাধিকারিত্ব বিলুপ্ত বা বাতিল হবে না।

## কাউকে নিজের বংশজাত বলে স্বীকৃতি দান করলে তার প্রাপ্যতা

ইতোপূর্বে ধারাবাহিকভাবে যেসব ওয়ারিশদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কেউ যদি বর্তমান না থাকে তাহলে একটি মতানুসারে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মালের প্রাপ্য হবে অথবা পূর্বোল্লিখিত মতভেদ অনুসারে যাকে নিজের বংশজাত বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার প্রাপ্য হবে অথবা যার অনুকূলে এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের ওসিয়ত করা হয়েছে তার প্রাপ্য হবে।

---

১৮৬. আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১২১-১২২; আল-মাবসূত, খ. ২৯, পৃ. ১৯৮, দারুল মা'রিফা সং; রাওদাতুত তালেবীন, খ. ৬, পৃ. ৪৩, আল-মাকতাবতুল ইসলামিয়্যা সং; মিনাহুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৭৫২।

www.amarboi.org

**বংশজাত বলে স্বীকৃতিদান দুই প্রকার :**

**প্রথম প্রকার :** স্বীকৃতি দানকারীর নিজের বংশের বলে স্বীকৃতিদান। আর তাহলো সরাসরি নিজের বংশজাত বলে স্বীকার করা। অথবা কাউকে পুত্র অথবা বাপ অথবা মা বলে উল্লেখ করা। এ ধরনের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে যদি স্বীকৃতির শর্তাবলী (যা ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন) পূরণ হয় তাহলে তা বিশুদ্ধ বা নির্ভেজাল স্বীকৃতি এবং সে ক্ষেত্রে স্বীকৃতিদানকারীর সাথে পুত্র বা বাপ হওয়ার বিষয় স্বীকার করা হয়ে থাকলে তার উক্ত বংশজাত হওয়া সাব্যস্ত হবে। অতএব, তার (স্বীকৃতি দানকারীর) মৃত্যুর পর তার অন্য পুত্রদের মত সেও তার ওয়ারিশ হবে। এ ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা জায়েয (বৈধ) নয়।

**দ্বিতীয় প্রকার :** স্বীকৃতি দানকারীর নিজের নয়, বরং অন্যের বংশজাত বলে স্বীকৃতি দেয়া। অর্থাৎ এমন আত্মীয়তার স্বীকৃতি দেয়া যা স্বীকৃতিদাতা ও যার অনুকূলে স্বীকৃতি দেয় হচ্ছে তাদের দুই জনের মধ্যে মাধ্যম হবে। যেমন : কোনো ব্যক্তি অন্য একজনের অনুকূলে একথা স্বীকার করলে যে, সে তার ভাই অথবা চাচা বা দাদা। এধরনের স্বীকৃতির দ্বারা বংশ পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং এটা প্রত্যাহার করাও জায়েয। তবে এ ক্ষেত্রে স্বীকৃতিদাতার সাথে আচরণ হবে তার স্বীকৃতির দাবি অনুসারে। অতএব, আর্থিক বিষয়ে স্বীকৃতিদাতার স্বীকৃতি যথাযথ হবে যদি তা স্বীকৃতিদান শুদ্ধ হবার শর্ত অনুযায়ী হয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে অন্যের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই।

অতএব, কেউ যদি দুই পুত্র সন্তান রেখে মারা যায় এবং উক্ত দুই পুত্রের একজন যদি তৃতীয় আরো এক পুত্রের স্বীকৃতি দেয়; কিন্তু অন্য পুত্র তা অস্বীকার করে তাহলে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পুত্রের স্বীকৃতিদাতা পুত্রের কাছে হক বা প্রাপ্য অধিকার সৃষ্টি হবে। সেই অধিকার হলো, সে স্বীকৃতিদাতা পুত্রের মিরাসে অংশীদার হবে। তবে স্বীকৃতিদাতা পুত্র স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পুত্রকে কতটুকু দেবে সে পরিমাণ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, যার জন্য বংশের স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে তার বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে বংশ স্বীকৃতিদাতা যা লাভ করত তার অতিরিক্ত যা তিনি পেয়েছেন তা তাকে (বংশ পরিচিতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে) দিয়ে দেয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ওয়ারিশ সূত্রে পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বংশ স্বীকৃতিপ্রাপ্তকে দিয়ে দেবে। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, সে যা লাভ করেছে তার অর্ধেক দিয়ে দেবে। কারণ স্বীকৃতিদাতা তার স্বীকৃতির দাবি অনুসারে স্বীকৃতিপ্রাপ্তকে যেন বলছে, আমি এবং তুমি আমাদের পিতার মিরাসে সমান অংশীদার। অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ভাই যা লাভ করেছে তার অবস্থা এরূপ যেন তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে অথবা কোনো জালেমের হস্তগত হয়েছে। অতএব, আমার কাছে যা আছে তাতে আমরা দুইজন সমান অংশীদার।



www.amarboi.org

ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর দলীল হচ্ছে, স্বীকৃতিদাতা তার প্রাপ্ত মিরাসে বাড়তি যতটুক আছে সেটাই দিতে স্বীকৃত হয়েছে। অতএব, স্বীকৃতির অতিরিক্ত কিছু দেয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়, যেমনটা সে তাকে নির্দিষ্ট কোনো জিনিস দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে হতো।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মত হচ্ছে, বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃতিদানকারীর জন্য এরূপ কিছু করা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক কিনা, সে বিষয়ে দু'টি মত আছে। বিশুদ্ধতর মত হচ্ছে, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ, এ স্বীকৃতির মাধ্যমে তার বংশগত পরিচয় প্রমাণিত হয় না। আর যে ক্ষেত্রে তার বংশ পরিচয়ই প্রতিষ্ঠিত হয় না সে ক্ষেত্রে সে ওয়ারিশও হবে না। অপর মতটি হচ্ছে, তার জন্য তা  বাধ্যকতামূলক। আর নৈতিক দিক থেকে কতটা দেয়া আবশ্যক সে সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত দু'টি পদ্ধতি এখানে কার্যকর হবে।

মৃত ব্যক্তি যদি এক পুত্র রেখে যায় এবং সেই পুত্র তার একজন ভাই আছে বলে স্বীকার করে তাহলে উক্ত স্বীকৃতির ভিত্তিতে স্বীকৃত ব্যক্তির বংশ পরিচয় প্রমাণিত হবে না। কারণ, সাক্ষীর নিসাব (প্রয়োজনীয় সংখ্যা) অসম্পূর্ণ। তবে স্বীকৃতিদাতার মিরাসে সে (স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) অংশীদার হবে এবং স্বীকৃতিদাতার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হবে, সে যা লাভ করেছে তার অর্ধাংশ তাকে প্রদান করা। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে : একটি মত হচ্ছে, এর মাধ্যমে না তার বংশ পরিচিতি সাব্যস্ত হবে, না মিরাস প্রাপ্তি ওয়জিব বা অত্যাবশ্যকীয় হবে। অপর মতটি হচ্ছে, এর মাধ্যমে বংশ পরিচিতি সাব্যস্ত হবে এবং মিরাসও সে প্রাপ্ত হবে।

শাফেয়ী ফিকহবিদদের নিয়ম-বিধান হলো, যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তার স্বীকৃতির ফলে বংশ পরিচিতি সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মিরাসেও সে অংশীদার হবে।[১৮৭]

**ওয়ারিশ না থাকাবস্থায় কারো অনুকূলে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত করা হলে**

ইতিপূর্বে বর্ণিত পন্থা অনুযায়ী মৃতের কোনো ওয়ারিশ না থাকলে অথবা যাকে অন্যের বংশজাত বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এমন কেউও না থাকলে হানাফী ও হাম্বলীদের মতে যার অনুকূলে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওসিয়ত করা হয়েছে সেই সমুদয় সম্পত্তি লাভ করবে। কারণ, হানাফী ও হাম্বলী ফিকহবিদগণ এটাকে বায়তুলমালের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। তারা এ অবস্থায়

---

১৮৭. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৯৬৯, প্রথম সংস্করণ; ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৫৬, হালাবী সং; আর রাওদাহ, খ. ৪, পৃ. ৪২৩, আল-মাকবাতুল ইসলামী সং.; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ১৪৪-১৪৬; আল-মুহায্যাব লিশ-শীরাযী, খ. ২, পৃ. ৩৫৩।

www.amarboi.org

ওসিয়ত এ জন্য জায়েয রেখেছেন যে, এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তির ওসিয়ত কার্যকর না করা ছিল ওয়ারিশদের হকের কারণ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে যখন কোনো ওয়ারিশই বর্তমান নেই তখন প্রতিবন্ধক শেষ। তবে মালেকী ও শাফেয়ী ফিকহবিদগণ এ অবস্থায় এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত জায়েয মনে করেন না। কেননা, যিনি এ অনুমতি দেয়ার অধিকারী তিনি এখানে অনুপস্থিত।[১৮৮]

**তাখারুজ (التَّخَارُجُ)**

التَّخَارُجُ (তাখারুজ) শব্দের আভিধানিক অর্থ শরীকগণের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কেউ একটি জিনিস এবং কেউ আর একটি জিনিস নিয়ে নেয়া। যেমন: কেউ ঘর নিয়ে নিল আর কেউ জমি নিলো।[১৮৯]

পরিভাষায় 'তাখারুজ' হলো, ওয়ারিশগণের মধ্যে এভাবে আপোস করে নেয়া যে, তাদের কাউকে নির্দিষ্ট একটি জিনিসের বিনিময়ে মিরাসের বাইরে রাখা। এ ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট জিনিসটি পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্য থেকে হোক বা বাইরে থেকে হোক তাতে কিছু এসে যায় না।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলো, হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী ফিকহবিদদের মতে সর্বাবস্থায় এটা জায়েয।

হাম্বলী ফিকহবিদগণ পুরাতন মিরাসের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থাকে জায়েয মনে করেন। কিন্তু নতুন ও সদ্য পরিত্যক্ত মিরাস সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন যে, উভয়পক্ষ যদি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকে তাহলে জায়েয; কিন্তু আপসকারী হকদার ব্যক্তি যদি বিষয়টি সম্পর্কে না জানেন তাহলে তা জায়েয নয়, নিষিদ্ধ।

পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে যদি সোনা অথবা রূপা অথবা উভয়টিই থাকে তাহলে তা লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান (তৎক্ষণাৎ হস্তগত করা এবং নির্দিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সমতা) মেনে চলা জরুরী।

**মুনাসাখা (الْمُنَاسَخَةُ)**

মুনাসাখা (الْمُنَاسَخَةُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ক্রমাগত ও ঘুরেফিরে আসা, ধারাবাহিকতা। ওয়ারিশদের 'তানাসুখ' (التَّنَاسُخُ) এ থেকেই গৃহীত। কারণ, এ ক্ষেত্রে প্রথম মৃতের অবস্থা অনুসারে মিরাস বন্টিত হয় না; বরং দ্বিতীয় ও পরবর্তী মৃতদের অবস্থা অনুসারে বন্টিত হয়।[১৯০]

---

১৮৮. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ৫৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৩৩৬; তৃতীয় মুদ্রন, হালাবী, শারহু রাওদুত তালেব, খ. ৩, পৃ. ৩৩, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা সং; ইবন আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪১৭-৪১৮' মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৭, দারুল আরুবা সং।

১৮৯. আল-কামূস।

১৯০. আল-মিসবাহুল মুনীর।

www.amarboi.org

পারিভাষিক অর্থে তানাসুখ বলতে বুঝায়, কোনো ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশ বণ্টিত হয়ে তার হস্তগত হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হওয়ার কারণে উক্ত প্রাপ্য অংশ তার ওয়ারিশদের কাছে স্থানান্তরিত হওয়া।

কেউ মারা যাওয়ার পর তার পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার পূর্বেই কোনো ওয়ারিশ মারা গেলে দু'টি অবস্থার যে কোনো একটি দেখা দেবে : হয়তো প্রথম মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণই দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে অথবা তাদের মধ্যে এমন কেউ ওয়ারিশ হবে যে প্রথম মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ ছিল না। যখন দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হুবহু প্রথম ব্যক্তির ওয়ারিশগণই হবে তখন বিদ্যমান ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বণ্টনই যথেষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হবে যে, প্রথম মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তি জীবিতই ছিল না এবং পরিত্যক্ত সম্পদ প্রথমে প্রথম মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে এবং পরে দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, ওয়ারিশদের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কোনো ব্যক্তি যদি একই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ও কন্যাদের রেখে মারা যায় এরপর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বেই তাদের কেউ মারা যায় এবং উক্ত ওয়ারিশ ভাই-বোন ছাড়া তার যদি আর কোনো ওয়ারিশও না থাকে তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাদের মধ্যে একবার বণ্টন করাই যথেষ্ট। বণ্টনের নীতি হবে একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।

আর দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যে প্রথম মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না তাহলে জরুরী হলো, প্রথম মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা। অতঃপর দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির প্রাপ্ত অংশ শরয়ী বিধান মোতাবেক তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। যেমন : কোনো ব্যক্তি এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেল। এরপর তাদের মধ্যে মৃতের পরিত্যক্ত মিরাস বণ্টনের পূর্বেই পুত্র মারা মারা গেল এবং সে রেখে গেল এক বোন ও এক কন্যাকে। এ ক্ষেত্রে প্রথম মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি পুত্র ও কন্যার মধ্যে বণ্টিত হবে এবং একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান হবে। অতঃপর পুত্রের প্রাপ্ত অংশ তার পুত্র ও বোনের মধ্যে বন্টিত হবে। উভয়ের প্রত্যেকে অর্ধাংশ করে পাবে। মুনাসাখাতে এ নিয়মেই মিরাস বণ্টিত হবে।[১৯১]

---

১৯১. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ২৫৯।

www.amarboi.org

## মিরাসের হিসাব

মৃতের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদের ওয়ারিশ যদি একজন হয় এবং সে 'আসাবা' (عَصَبَةٌ), 'যাবিল ফুরূয' (ذَوِي الْفُرُوضِ) বা 'যাবিল আরহাম' (ذَوِي الْأَرْحَامِ) যে শ্রেণীর ওয়ারিশই হোক না কেন সম্পদ ভাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

যদি ওয়ারিশ কয়েকজন হয় তাহলে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে এবং প্রত্যেক ওয়ারিশ তা থেকে তার প্রাপ্য অংশ লাভ করবে। ওয়ারিশদের মিরাস বন্টনের জন্য নিচের বিষয়গুলো জরুরী।

**প্রথম বিষয় :** উপস্থিত মাসআলার সমাধানের জন্য 'যাবিল ফুরূয' বা নির্ধারিত হকদারদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ সমূহ জানতে হবে। আর তা নির্ভর করে মিরাসে 'যাবিল ফুরূয'দের অবস্থা জানার সাথে সাথে অন্যান্য ওয়ারিশদের অবস্থাজানার ওপর।

**দ্বিতীয় বিষয় :** বিচার্য মাসআলাটির মূল সংখ্যা অবগত থাকা। অর্থাৎ সর্বাধিক ছোট যে সংখ্যাটি দ্বারা ভগ্নাংশ ছাড়াই ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করা যাবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা। এটা ওয়ারিশদের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন হবে। কেননা, ওয়ারিশগণ হয় বংশগত 'আসাবা' (الْعَصَبَاتُ النَّسَبِيَّةُ) হবে, অথবা 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের হকদার) অথবা উভয় গ্রুপ থেকেই হবে। ওয়ারিশদের সকল ব্যক্তি যদি শুধু 'আসাবা' হয় তাহলে তাদের ব্যক্তিদের সংখ্যাকে মূল মাসআলা ধরে নেয়া হবে এবং মৃতের সম্পত্তি তাদের ব্যক্তিদের সংখ্যা অনুপাতে তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যেমন : তিন পুত্র অথবা তিনজন সহোদর ভাই অথবা বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে 'মিরাস' বন্টনের মূল সংখ্যা হবে তিন। প্রত্যেকে এক তৃতীয়াংশ করে পাবে। অনুরূপ ভাবে তাদের সংখ্যা যদি এর অধিক হয় এবং তাদের সাথে এমন কোনো নারী থাকে, যে তাদের কারণে 'আসাবা' হয়েছে তাহলে প্রত্যেক পুরুষকে দুইজন নারীর সমান ধরতে হবে এবং তাদের সংখ্যা অনুসারে 'মিরাস' বন্টন করা হবে। যেমন : দুই পুত্র ও তিন কন্যার ক্ষেত্রে মাসআলার সমাধানকারী সংখ্যা হবে সাত। দুই পুত্রের প্রত্যেকে পাবে সাত ভাগের দুই ভাগ এবং তিন কন্যার প্রত্যেকে পাবে সাত ভাগের এক ভাগ করে। আর সহোদর তিন ভাই ও সহোদর চার বোনের ক্ষেত্রে মাসআলা হবে দশ দ্বারা। প্রত্যেক ভাই পাবে দুই দুশমাংশ বা দশ ভাগের দুই ভাগ করে এবং প্রত্যেক বোন পাবে এক দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ করে।

ওয়ারিশ হিসেবে যদি একজন বংশগত 'আসাবা' একজন 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের হকদার) এর সাথে থাকে তাহলে মূল মাসআলা স্বাভাবিক

www.amarboi.org

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে হবে, যা থেকে 'যাবিল ফুরূয'দের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ জানা যায়। যেহেতু নিম্নবর্ণিত নির্ধারিত অংশসমূহ অর্থাৎ অর্ধাংশ $\frac{১}{২}$, এক চুতর্থাংশ $\frac{১}{৪}$ দুই তৃতীয়াংশ $\frac{২}{৩}$, এক তৃতীয়াংশ $\frac{১}{৩}$ ও একষষ্ঠাংশ $\frac{১}{৬}$ উল্লেখিত ভগ্নাংশসমূহ থেকে অধিক হয় না বা অতিক্রম করে যায় না তাই এ ক্ষেত্রে মূল মাসআলা এসব ভগ্নাংশের বাইরে হবে না।

বিভিন্ন প্রকারের 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের হকদার) যদি একাকী অথবা বংশগত 'আসাবা' (আসাবা নাসাবিয়া)র সাথে ওয়ারিশ হয় তাহলে মূল মাসআলা সাধারণ ভগ্নাংশের হর এর লবকে দ্বিগুণ করে প্রাপ্ত সংখ্যা দ্বারা হবে। অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ বিষয় জানা যে, ভগ্নাংশসমূহের হর গুলোর লব এর দ্বিগুণ সংখ্যার যে কোনো মাসআলাই প্রাথমিকভাবে সাতটি সংখ্যার বাইরে নয়। আর সেই সাতটি সংখ্যা হচ্ছে : ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪।

যদি জানা থাকে যে, মাসআলাটিতে 'আওল' (عول) বা 'রদ্দ' (رد) আছে সে ক্ষেত্রে মূল মাসআলা এ সব সংখ্যা থেকে আলাদা হবে। এ সব সংখ্যার মধ্যে প্রথম পাঁচটি সংখ্যা নির্ধারিত অংশসমূহ নির্দেশ করে। এর পাঁচটি সংখ্যা সাধারণ ভগ্নাংশগুলোর হর থেকে গৃহীত হয়েছে এবং ১২ সংখ্যাটি নির্ধারিত অংশের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ $\frac{২}{৩}$, এক তৃতীয়াংশ $\frac{১}{৩}$ ও এক ষষ্ঠাংশ $\frac{১}{৬}$ এর সাথে $\frac{১}{৪}$ সংযুক্ত করে তার লসাগু থেকে গৃহীত হয়েছে।

নির্ধারিত অংশসমূহের প্রথম প্রকার (অর্ধাংশ $\frac{১}{২}$, এক চতুর্থাংশ $\frac{১}{৪}$ ও এক অষ্টমাংশ $\frac{১}{৮}$ এবং সংখ্যা ২৪ উল্লেখিত নির্ধারিত অংশসমূহের দ্বিতীয় প্রকারের সাথে $\frac{১}{৮}$ এর লসাগু থেকে গৃহীত।

২৪ সংখ্যাটিকে মিরাসের মাসআলাসমূহের মূল বা উৎস হিসেবে গণ্য করা হলে পূর্ববর্তীগুলোর প্রয়োজন আর থাকে না এবং তা অধিকতর সহজও বটে। বিবেচনাধীন মাসআলাটি জানা একান্ত প্রয়োজন, যাতে পরিত্যক্ত সম্পদে প্রত্যেক ওয়ারিশের অংশসমূহ জানা সম্ভব হয়।

**তৃতীয় বিষয় :** পরিত্যক্ত সম্পদের হকদার প্রত্যেক ওয়ারিশের অংশের সংখ্যা সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। ওয়ারিশ যদি নির্ধারিত অংশের প্রাপক হয় তাহলে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে তার প্রাপ্য অংশসমূহের সংখ্যা হবে তাই, যা মূল মাসআলার সংখ্যাটিকে তার ভগ্নাংশের (যা তার প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ নির্দেশ করে) সাথে গুণ করলে পাওয়া যাবে। সুতরাং মাসআলায় যদি বাপ ও মা থাকে তাহলে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। অতএব, মূল মাসআলা হবে তিন দ্বারা। আর যদি কোনো 'আসাবা' থাকে এবং পরিত্যক্ত সম্পদে তার জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে সব 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের প্রাপক)কে তাদের প্রাপ্য

www.amarboi.org

অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই তাদের (আসাবাদের) প্রাপ্য অংশের সংখ্যা। তাই ওয়ারিশদের মধ্যে যদি স্ত্রী ও বাপ থাকে তাহলে মাসআলা হবে চার দ্বারা। কারণ, স্ত্রীর প্রাপ্য এক চতুর্থাংশ বা চার ভাগের এক ভাগ। অতএব, সে পাবে এক অংশ এবং বাপ তিন অংশ।

**চতুর্থ বিষয় :** পরিত্যক্ত সম্পদের এক অংশের (سهم) পরিমাণ জানা। এক অংশের পরিমাণ হচ্ছে, মূল মাসআলা বা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করার পর প্রাপ্ত ভাগফল। তবে শর্ত হচ্ছে, অংশসমূহ ও মাসআলার সংখ্যা সমান হতে হবে। যেমন : স্বামী, এক পুত্র ও এক কন্যা ওয়ারিশ হলে মাসআলা হবে চার দ্বারা। স্বামী পাবে এক অংশ, কন্যা এক অংশ এবং পুত্র দুই অংশ।

**পঞ্চম বিষয় :** পরিত্যক্ত সম্পদে প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্ত অংশসমূহের পরিমাণ জানা। এটাই পরিত্যক্ত সম্পদের কাঙ্খিত ফল। এটা পাওয়া যায় পরিত্যক্ত সম্পদের এক অংশের পরিমাণকে প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্ত অংশসমূহের সাথে গুণ করলে। এরপর পূর্ব বর্ণিত নিয়মে প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্ত অংশসমূহের যোগফলকে এক সাথে যোগ করে তার যোগফলকে মূল মাসআলার সাথে তুলনা করলে তিনটি অবস্থা পরিলক্ষিত হবে :

(ক) মোট অংশ (সর্বমোট অংশের যোগফল) মূল মাসআলার সমান হলে তা হবে মাসআলা আদেলা বা সমান। কারণ, প্রত্যেক ওয়ারিশ মিরাস থেকে হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়াই তার অংশ গ্রহণ করেছে। যেমনঃ মাসআলাতে স্বামী ও সহোদর বোন থাকার ক্ষেত্রে হয়।

(খ) নির্ধারিত অংশসমূহের ওয়ারিশদের সংখ্যা যদি মূল মাসআলার সংখ্যা থেকে অধিক হয় তাহলে মাসআলা 'আওল' হবে। যেমন : স্বামী ও সহোদর বা বৈমাত্রেয় দুই বোনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

(গ) 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশসমূহের হকদার)দের অংশসমূহের যোগফল মুল মাসআলার সংখ্যা থেকে কম হলে এবং 'যাবিল ফুরূয'দের প্রাপ্য অংশসমূহ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের হকদার কোনো বংশগত 'আসাবা' না থাকলে সে ক্ষেত্রে মাসআলায় 'রদ্দ' (رد) হবে। খ ও গ নম্বর মাসআলা দু'টি অর্থাৎ 'আওল' (عول) ও 'রদ্দ' (رد) সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

**বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত মিরাস সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা**

ফারায়েজের কিছু কিছু মাসআলা বিশেষ বিশেষ নামে আখ্যায়িত হয়েছে এবং পরিচিতি পেয়েছে তার সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও বিধি-বিধানের কারণে। এর মধ্যে কিছু মাসআলার বিধি-বিধানের ব্যাপারে ফিকহবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং কিছু মাসআলার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

www.amarboi.org

**প্রথম মাসআলা** 'মুশাররাকাহ' অথবা 'হিমারিয়্যা' অথবা 'হাজারিয়্যা' অথবা 'ইয়াম্মিয়্যা'। মাসআলাটির বাস্তব রূপ হলো, কোনো নারী স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় দুই ভাই অথবা বৈপিত্রেয় দুই বোন অথবা বৈপিত্রেয় এক ভাই ও এক বোন এবং দুইজন সহোদর ভাই রেখে মারা গেল। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম ও ফিকহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান।

হযরত আলী, আবু মূসা আশআরী ও উবাই ইবনে কাব রা.-এর মতে, স্বামী পাবেন পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা এক তৃতীয়াংশ। আর সহোদর ভাইয়েরা কিছুই পাবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তএবং বিশুদ্ধতর রেওয়ায়াত অনুসারে এটা ইমাম আহমদেরও মত।

হযরত উসমান ও যায়েদ রা.-এর মতে, বৈমাত্রেয় ও সহোদর উভয় প্রকার ভাইদেরকেই মিরাসের হকদার করা হবে এবং পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ তাদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে দেয়া হবে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর প্রাপ্য অংশ সমান হবে। ইমাম শুরাইহ, ছাওরী, মালেক ও শাফেয়ী রহ.ও এর সাথে একমত।

প্রথম দিকে হযরত উমর রা. সহোদর ভাইদের মিরাসে অন্তর্ভুক্তির সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু পরে তিনি তার এ মত প্রত্যাহার করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে দু'টি রেওয়ায়াত আছে। তার মধ্যে সুস্পষ্ট রেওয়ায়েতটি অন্তর্ভুক্তির পক্ষে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকেও দু'টি রেওয়ায়াত আছে। তার মধ্যে সুস্পষ্ট রেওয়ায়াতটি অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে।

এই মাসআলাটিকে তাশরীকের মাসআলা (مَسْأَلَة التَّشْرِيك) বলার কারণ হলো, এ মাসআলা অনুসারে সহোদর ভাইবোন বৈপিত্রেয় ভাই বোনের সাথে মিরাসে অংশীদার হয়। এটিকে **হিমারিয়্যা, হাজারিয়্যা ও ইয়াম্মিয়্যা** মাসআলাও বলা হয়। কারণ, বর্ণিত আছে যে, এ মাসআলাটি সম্পর্কে হযরত উমর রা.এর কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি এ ক্ষেত্রে সহোদর ভাইদেরকে বৈপিত্রেয় ভাইদের সাথে মিরাসে অংশীদার না করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। তখন সহোদর ভাইয়েরা তাকে বললো: ধরুন, আমাদের পিতা কি গাধা ছিল, এবং অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা বলল, আমাদের পিতা কি সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকা পাথর ছিল? আমরা সবাইকি একই মায়ের সন্তান নই? এ কথা শুনে হযরত উমর রা. তার প্রথম সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে তাদের (সহোদর ভাইদের)কে মিরাসে হকদার করার ফতোয়া প্রদান করলেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি ইতোপূর্বে তো এর বিপরীত ফতোয়া দিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন : সেটা ছিল আমার পূর্বের সিদ্ধান্তএবং এটা হচ্ছে আমার বর্তমান সিদ্ধান্ত।

www.amarboi.org

আল-মাবসুত গ্রন্থকার মিরাসে অংশীদার করার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার পর বলেছেন, সহোদর ভাইদের মিরাসে অংশীদার করার এ সিদ্ধান্ত ফিকহী (ফিকহ শাস্ত্রের) দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবহ। কারণ, মিরাসের প্রাপ্যতা নির্ধারিত হয় নৈকট্য ও সম্পর্কের বিবেচনায়। মায়ের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে (সন্তানেরা) সবাই সমান। পিতার মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহোদর ভাইয়েরা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সুতরাং এই বাড়তি সম্পর্ক ও অগ্রাধিকারের কারণে তারা মা-শরীক (বৈপিত্রেয়) ভাইদের চেয়ে অগ্রগণ্য না হলেও অন্তত তাদের সমান তো হবে। তারা মা-শরীক ভাইদের চেয়ে অগ্রগণ্যতা ও অগ্রাধিকার না পাওয়ার কারণ শুধু এই যে, পিতার পক্ষ থেকে মিরাসে সম্পৃক্ততা হয় 'আসাবা' হওয়ার কারণে। আর পিতার কারণে 'আসাবা' হওয়ার ক্ষেত্রে মিরাসে তাদের প্রাপ্যতা পিছিয়ে দেয়। হ্যাঁ, তবে মায়ের মাধ্যমে সম্পৃক্ততা অবশিষ্ট ও বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে তারা সবাই (সহোদর ও মা-শরীক ভাই) সমান।

তাশরীক বা অংশীদার করার সমর্থকগণ মা-শরীক ভাই বোন ও সহোদর ভাইবোনের পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মিরাস লাভের ক্ষেত্রে সবাইকে সমান গণ্য করেছেন। কেননা, তাদের 'মিরাস' প্রাপ্তি মায়ের সন্তান হওয়ার কারণে। এ বিধান অনুসারে তারা সবাই সমান হকদার। তাই 'মিরাস' থেকে তাদের প্রাপ্য অংশ এক তৃতীয়াংশকে দুই শ্রেণীর ভাইদের মধ্যে সমান দুই অংশে ভাগ করে দেয়ার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়।

অংশীদারিত্বের সমর্থনে তাদের কয়েকটি দলীল নিম্নরূপ :

**প্রথম দলীল** : মায়ের সন্তানদের মধ্যে কেউ চাচার পুত্র হলে তার 'আসাবা' হওয়ার বিষয় বাতিল সত্ত্বেও মায়ের আত্মীয়তার কারণে সে অংশীদার হতো। তাই আপন ভাই ততোধিক শক্তিশালী আত্মীয়তার কারণে অংশীদার হবে।

**দ্বিতীয় দলীল**: এ মাসআলাটিতে সহোদর ভাইবোন ও মা-শরীক বা বৈপিত্রেয় ভাইবোনের সমাবেশ ঘটেছে এবং তারা 'মিরাস' লাভের হকদার। তাই মা-শরীক ভাইবোন যখন ওয়ারিস তখন সহোদর ভাইবোনও ওয়ারিশ হবে, ঠিক স্বামী না থাকলে যেটা হতো।

**তৃতীয় দলীল** : উত্তরাধিকার লাভের ভিত্তি হচ্ছে, শক্তিশালী আত্মীয়তাকে দুর্বল আত্মীয়তার ওপর অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দান করা। শক্তিশালী আত্মীয়তার সর্বনিম্ন অবস্থা হলো দুর্বলদের সাথে মিরাসে অংশীদারিত্ব লাভ করা। মিরাসের ক্ষেত্রে এমন কোনো মূলনীতি বা বিধান নেই যে, দুর্বল আত্মীয়ের কারণে শক্তিশালী আত্মীয় বঞ্চিত হয়ে যাবে আর সহোদর ভাইবোন মা-শরীক ভাইবোনের চেয়ে শক্তিশালী।[১৯২]

---

১৯২. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ২৪১-২৪৮।

www.amarboi.org

এ ক্ষেত্রে সহোদর ভাইদেরকে 'মিরাসে' শরীক না করার সমর্থক যারা তাদের কয়েকটি দলীল নিম্নরূপ :

প্রথম দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

"যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সমঅংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশে; এটা যা ওসিয়াত করা হয় তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়"।[১৯৩]

সর্বসম্মত মতে, এ আয়াতের অর্থ বিশেষভাবে মা-শরীক (বৈপিত্রেয়) ভাই-বোন। এ ব্যাপারে সব মুফাসসির একমত। এ আয়াতে হযরত উবাই ও সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. এ কিরাআত (পাঠ) وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّه থেকে এটাই জানা যায়। অতএব, সহোদর ভাইদেরকে মা-শরীক ভাই বোনদের সাথে 'মিরাসে' শরীক করা এ আয়াতের নির্দেশনার পরিপন্থী কাজ। এভাবে অন্য একটি আয়াতের বিরোধিতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। সে আয়াতটি হচ্ছে : وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ "আর যদি ওয়ারিসদের মধ্যে কয়েকজন ভাই-বোন থাকে তাহলে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান"।[১৯৪] কারণ, এ আয়াতে উল্লেখিত إِخْوَة শব্দের অর্থ মা-শরীক ভাই বোন ছাড়া অন্য সব ভাই বোন। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান হবে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অংশীদার করার সমর্থকগণ পুরুষ ও নারীর অংশ সমান বলছেন। অতএব, তা এ আয়াতের পরিপন্থী।

**দ্বিতীয় দলীল :** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَلحقوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "প্রাপকদেরকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটাত্মীয় পুরুষদের জন্য"।[১৯৫] এ হাদীস অনুসারে নির্ধারিত অংশের প্রাপক ওয়ারিশদেরকে তাদের অংশ প্রদানের (নির্দেশের) দাবি হলো, এ মাসআলায় মা-শরীক ভাই-বোনের প্রাপ্য পূর্ণ এক তৃতীয়াংশ। কারণ, তারা 'যাবিল ফুরূযে'র অন্তর্ভুক্ত। তাই এর মধ্যে সহোদর ভাই-বোনের অন্তর্ভুক্তি এ হাদীসের পরিপন্থী।

---

১৯৩. আল-কুরআন, সূরা নিসা ৪ : ১২।

১৯৪. আল-কুরআন, সূরা নিসা ৪ : ১৭৬।

১৯৫. হাদীসটির বিশ্লেষণ পূর্বে করা হয়েছে।

www.amarboi.org

**তৃতীয় দলীল :** এ মাসআলায় যদি মা-শরীক ভাই-বোনদের মধ্যে কোনো একজন থাকে এবং তার সাথে বহু সংখ্যাক সহোদর ভাই বর্তমান থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে এ মর্মে ইজমা বিদ্যমান যে, মা-শরীক ভাই-বোন লাভ করবে ছয় ভাগের এক ভাগ এবং অন্য ভাইয়েরা লাভ করবে তিন ভাগের এক ভাগ।

বহু সংখ্যক সহোদর ভাইয়ের চেয়ে মা-শরীক একজন সন্তানের যখন এতটা অগ্রাধিকার তখন দুইজন মা-শরীক সন্তানের সহোদর ভাইদেরকে বঞ্চিত করা জায়েয হবে না কেন?

**'গারাওয়ান' অথবা 'গারীমাতান' অথবা 'গারীবাতান' অথবা 'উমারিয়াতান'**

মাসআলাটির বাস্তব চিত্র হলো, একজন মহিলা স্বামী, মা ও বাপ রেখে মারা গেল অথবা একজন পুরুষ মারা গেল এবং সে তার স্ত্রী, মা ও বাপ রেখে গেল। প্রথম মাসআলাটির ক্ষেত্রে চার ইমাম এ মর্মে একমত যে, স্বামী পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক অংশ পাবেন এবং মা পাবেন স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের এক ভাগ।

দ্বিতীয় মাসআলাটির ক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ এবং মা পাবেন স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ তথা তিন ভাগের এক ভাগ। উভয় ক্ষেত্রেই পিতা পাবেন স্বামী অথবা স্ত্রী ও মায়ের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ।

এর কারণ হলো, যে সব পুরুষ ও নারী 'মিরাসে'র এক তৃতীয়াংশের হকদার হয় স্বামী ও স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির হকদারও হবে তারাই। যেমন : সহোদর অথবা বাপ-শরীক (বৈমাত্রেয়) ভাই-বোন। তবে সে ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, একই মর্যাদার পুরুষ ও নারী একই সাথে ওয়ারিশ হলে পুরুষের প্রাপ্য অংশ নারীর প্রাপ্য অংশের দ্বিগুণ হবে। অতএব, স্বামীর সাথে মা ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে মাকে পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) দেয়া হলে সে পিতার চাইতেও সম্মানজনক অবস্থানে চলে যাবে। অথচ স্ত্রীর সাথে পিতা ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের প্রাপ্য অংশ দ্বিগুণ ছিল না। এ ক্ষেত্রে কারো পক্ষ থেকে এ আপত্তি উত্থাপিত হওয়া উচিত নয় যে, তারা উভয়ে (বাপ মা) পুত্রের সাথে ওয়ারিশ হলে তাদের প্রাপ্য অংশ সমান হয়ে থাকে। কারণ, ফিকহবিদগণ যখন বলেন, এটা 'নিয়ম-বিধান' তখন দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো ফরযের গণ্ডি থেকে কোনো কিছুকে বাইরে গণ্য করা উক্ত নিয়ম-বিধানের পনিপন্থী নয়, যেমনঃ মা-শরীক ভাই বোন তথা নারী ও পুরুষের প্রাপ্য অংশ সমান হওয়ার বেলায়ও নয়।

এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন : দু'টি (মাসআলার) ক্ষেত্রেই মা সম্পূর্ণ তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন।

www.amarboi.org

এর সপক্ষে তিনি মহান আল্লাহর এ বাণী : وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (এবং মা ও বাপ তার ওয়ারিশ হলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ) দলীল হিসেবে পেশ করেন।[১৯৬] তা ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ...أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (নির্ধারিত অংশের প্রাপকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটাত্মীয় পুরুষদের (আসাবা) প্রাপ্য।[১৯৭] আর এ ক্ষেত্রে পিতা 'আসাবা'। অতএব, 'যাবিল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের প্রাপক)দের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পিতার প্রাপ্য, যা আল-আযবুল ফায়েদ গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেছেন। আল-মুগনী গ্রন্থকার বলেন : এ দু'টি ক্ষেত্রে দলীল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের সহায়ক। তবে তার এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামের 'ইজমা' বিদ্যমান।

আলোচনাধীন এ মাসআলা দু'টিতে যদি বাপের স্থলে দাদা থাকে তাহলে মা পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) পাবে। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মাযহাব এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত দু'টি রিয়ায়াত-এর একটি।

কুফাবাসী ফিক্হবিদগণ এটিকেই স্বামী সম্পর্কিত মাসআলায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, দাদার সাথে ওয়ারিস হলেও মা অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) লাভ করবে, ঠিক যেমন বাপের সাথে ওয়ারিশ হলে পেয়ে থাকে। এটিই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় রেওয়ায়াত। উক্ত রেওয়ায়াত অনুসারে তিনি দাদাকে বাপের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে প্রথম রেওয়ায়াতে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে (বাপের স্থানে দাদা থাকলে মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে) তার কারণ মহান আল্লাহর বাণী فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (মায়ের প্রাপ্য তিন ভাগের এক ভাগ)। এ ক্ষেত্রে আয়াতাংশের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হয়নি যাতে মাকে বাপের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান অনিবার্য না হয়। কারণ, নৈকট্যের দিক দিয়ে তারা উভয়ে সমান। তবে দাদার ক্ষেত্রে তারা উক্ত আয়াত وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (এবং মা ও বাপ তার ওয়ারিশ হলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ) এর বাহ্যিক অর্থটাই গ্রহণ করেছেন। কারণ, মা ও দাদা নৈকট্যের দিক দিয়ে সমান নয়।

---

১৯৬. আল-কুরআন, সূরা নিসা ৪ : ১১।

১৯৭. পূর্বে টীকায় হাদীসটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

মাসআলাটিকে 'গারাওয়ান' বলার কারণ, এটি খ্যাতি ও পরিচিতির বিচারে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় ছিল। 'গারীমাতান' বলার কারণ হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকে ঋণ দাতার মত। আর পিতা-মাতা ওয়ারিশদের মত যারা স্বামী ও স্ত্রীর অংশ দেয়ার পরে সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ পেয়ে থাকেন। 'গারীবাতান' বলার কারণ, এটি ফারায়েজ শাস্ত্রে একটি দুর্লভ, অপ্রচলিত ও অস্বাভাবিক বিষয়। আর 'উমরিয়াতান' বলার কারণ হলো, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.ই সর্ব প্রথম এ দু'টি মাসআলার ক্ষেত্রে মাকে অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশ এবং পরবর্তীকালের আলেমগণ তার এ সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।[১৯৮] আরো কিছু ব্যতিক্রমী মাসআলা আছে যার উল্লেখ পূর্বেই হয়েছে। আলোচ্য মাসআলা দু'টির উল্লেখও ইতোপূর্বেই হয়েছে, তবে বিশদ আলোচনা ছাড়াই। সে জন্য আলাদাভাবে সে দু'টির আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

**আল-খারকা ( ফাটল যুক্ত)**

মাসআলাটির চিত্র হলো, মা, দাদা ও বোন। একে 'খারকা' বলা হয় এ জন্য যে, এ মাসআলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম নানা মতে বিভক্ত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর মতে, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সম্পদ পুরোটাই পাবে দাদা। যায়েদ রা. বলেন, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সম্পদ তিন ভাগ করে দাদা ও বোনের মধ্যে বণ্টিত হবে। হযরত আলী রা. এর মতে, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, বোন পাবে অর্ধেক এবং অবশিষ্ট অংশ পাবে দাদা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ বিষয়ে দু'টি বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনা অনুসারে বোন পাবে অর্ধেক এবং অবশিষ্ট অংশ মা ও দাদা অর্ধেক করে লাভ করবে। অন্য বর্ণনা অনুসারে যা হযরত উমর রা. এর মত, বোন পাবে অর্ধেক, মা এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অংশ পাবে দাদা। এ মাসআলাটিকে উসমানিয়া বলা হয়। কারণ,হযরত উসমান রা. একাই এ ব্যাপারে 'ইজমা' এর সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অংশ দাদা ও বোনের মধ্যে অর্ধেক করে বণ্টিত হবে। কথিত আছে যে, এ কারণেই এর নাম খারকা অর্থাৎ ফাটলযুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়াও এটাকে 'মুছাল্লাছাতু উসমান', 'মুরাব্বাআতু ইবনে মাসউদ', 'মুখাম্মাসাতু শা'বী'

---

১৯৮. আস-সিরাজিয়্যা, পৃ. ১৩২ ও ১৩৪; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৫৫; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪১০ ও ৪১১, দারুল ফিকর সং.; আত-তুহফা মা'আশ্ শারওয়ানী, খ. ১, পৃ. ৪-৫।

www.amarboi.org

(রাদিয়াল্লাহু আনহুম)ও বলা হয়। কারণ, এ বিষয়ে হাজ্জাজ শা'বীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, এতে পাঁচজন সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ আছে। এতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর মত অন্তর্ভুক্ত করলে এটি 'মুসাদ্দাসা' হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

**মারওয়ানিয়্যা**

মাসআলাটির চিত্র হলো, বিভিন্ন প্রকারের ছয় বোন ও স্বামী। এ ক্ষেত্রে স্বামী পাবে অর্ধেক, আপন দুই বোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ), মা-শরীক (বৈপিত্রেয়) দুই বোন পাবে এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) এবং বৈমাত্রেয় দুই বোন কিছুই পাবেনা। মূল মাসআলা হবে ছয় দ্বারা এবং এর 'আওল' হবে নয়। একে 'মারওয়ানিয়্যা' বলার কারণ হলো মারওয়ান ইবনুল-হাকামের শাসন আমলে এ মাসআলা প্রথম সামনে আসে এবং "গাররা" বলার কারণ হলো, এটি সবার মাঝে অতি পরিচিত ছিল।

**হামযিয়্যা**

মাসআলাটির চিত্র হলো, সমমর্যাদার তিন দাদী-নানী, এক দাদা বা নানা ও তিন জন বিভিন্ন প্রকারের বোন (অর্থাৎ সহোদর বৈমাত্রেয় বৈপিত্রেয়)। এ মাসআলার বিষয়ে হযরত আবু বকর রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, দাদী-নানীগণ পাবে এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) এবং অবশিষ্ট অংশ পাবে দাদা বা নানা। মূল মাসআলা হবে ছয় দ্বারা এবং এর 'তাসহীহ' (تصحيح) বা বিশুদ্ধকরণ হবে আঠার দ্বারা। হযরত আলী রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, সহোদর বোন পাবে অর্ধেক, বাপ-শরীক (বৈমাত্রেয়) বোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ, দুই তৃতীয়াংশকে পূর্ণতা দানের জন্য দাদী বা নানীদের জন্য এক ষষ্ঠাংশ এবং দাদা বা নানার জন্য এক ষষ্ঠাংশ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি বিরল রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে যে, নানী পাবে এক ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্টাংশের পুরোটাই নানা বা দাদা পাবে। যায়েদ রা. বলেছেন, দাদী বা নানীরা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ এবং অবশিষ্টাংশ দাদা বা নানা, আপন বোন এবং বৈমাত্রেয় বোনদের মধ্যে চার ভাগ করে বন্টিত হবে। বাপ-শরীক বা বৈমাত্রেয় বোন যা পাবে তা পরে আপন বোনকে ফিরিয়ে দেবে। মূল মাসআলা হবে ছয় দ্বারা আর তার 'তাসহীহ' বা বিশুদ্ধকরণ হবে বাহাত্তর দ্বারা এবং তা আবার সংক্ষিপ্ত হয়ে ছত্রিশ দ্বারা হবে। নানী-দাদীগণ পাবে ছয়, সহোদর বোন পাবে তার নিজের অংশ এবং (বৈমাত্রেয়) বোনের অংশ মিলিয়ে পনের এবং দাদা বা নানা পাবে পনের। এটাকে 'হামযিয়্যা' বলার কারণ হলো, এ বিষয়ে হামযা আয-যাইয়াতকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

## দীনারিয়্যা

মাসআলাটির চিত্র হলো, স্ত্রী, দাদী বা নানী (جدة), দুই কন্যা, বারোজন ভাই ও একজন সহোদর বোন। তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি হচ্ছে ছয়শ দীনার। দাদী বা নানী পাবে এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের একভাগ) একশ' দীনার। দুইকন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) চারশ দীনার এবং স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ (আট ভাগের এক ভাগ) পচাত্তর দীনার। অবশিষ্ট আছে পঁচিশ দীনার। প্রত্যেক ভাই পাবে দুই দীনার এবং বোন পাবে এক দীনার। এ কারণে মাসআলাটিকে 'দীনারিয়্যা' বলা হয়। এটাকে 'দাউদিয়্যা'ও বলা হয়। কারণ এ মাসআলার বিষয়ে দাউদ আত-তাঈকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এভাবেই বণ্টন করেছিলেন। এতে বোনটি ইমাম আবু হানীফা রহ.এর কাছে এসে বললো, আমার ভাই মারা গেছে। তার পরিত্যক্ত অর্থের পরিমাণ ছয় শ' দীনার। তা থেকে আমি মাত্র এক দিনার পেয়েছি। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করেছেন কে? সে (বোনটি) বললো, আপনার ছাত্র দাউদ তাঈ। তিনি বললেন, সে তো বে-ইনসাফী করে না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: তোমার ভাই কি দুইজন কন্যা সন্তান রেখে মারা গিয়েছে? সে জবাবে দিলো, হ্যাঁ'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাই কি দুইজন স্ত্রী রেখে গিয়েছে? সে বললো, হ্যাঁ'। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাইকি বারোজন ভাই রেখে গিয়েছে? সে বললো, হ্যাঁ'। ইমাম আবু হানীফা বললেন, তাহলে এক দীনারই তোমার প্রাপ্য। এটি একটি দুর্বোধ্য মাসআলা। তাই প্রবচন হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি ছয়শ' দীনার ও সতের জন ওয়ারিশ রেখে মারা গেল। ওয়ারিশদের মধ্যে একজন পেল মাত্র এক দীনার।

## আল-ইমতিহান

মাসআলাটির চিত্র হলো, চার স্ত্রী, পাচ দাদী বা নানী, সাত কন্যা এবং নয়জন বাপ শরীক (বৈমাত্রেয়) বোন। মূল মাসআলা হবে চব্বিশ দ্বারা। স্ত্রীদের জন্য এক অষ্টমাংশ (আট ভাগের এক ভাগ) তিন অংশ, তিন জন দাদী-নানী পাবে এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) চার অংশ, সাত কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) ষোল অংশ এবং বোনদের জন্য অবশিষ্ট এক অংশ। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্য অংশ ও ওয়ারিশদের সংখ্যার মধ্যে যেমন সামঞ্জস্য নেই, তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর ওয়ারিশদের সংখ্যার মধ্যেও সামঞ্জস্য নেই। তাই একটিকে অপরটি দ্বারা গুণ করা প্রয়োজন। এ কারণে চার দ্বারা পাঁচকে গুণ করলে গুণফল হবে বিশ, বিশকে সাত দ্বারা গুণ করলে গুণফল হবে একশ চল্লিশ, একশ চল্লিশকে নয় দ্বারা গুণ করলে গুণফল হবে এক হাজার দুইশ ষাট এবং এটাকে মূল মাসআলা চব্বিশ দ্বারা গুণ করলে গুণফল হবে ত্রিশ হাজার দুইশ' চল্লিশ। এ সংখ্যাটি দ্বারা মাসআলাটির 'তাসহীহ' বা বিশুদ্ধি হবে। ইমতিহান (পরীক্ষা)

www.amarboi.org

বলার কারণ হলো : বলা হবে এক ব্যক্তি কয়েক প্রকারের ওয়ারিশ রেখে মারা গেল। প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিশের সংখ্যা দশ জনের কম। এ ধরণের মাসআলার বিশুদ্ধি ত্রিশ হাজারেরও অধিক সংখ্যা দ্বারাই সম্ভব।

## মামুনিয়্যা

মাসআলাটির চিত্র হলো, মা, বাপ ও দুই কন্যা সন্তান। পরে একটি কন্যা মারা যায় এবং সে তার ওয়ারিশদের রেখে যায়। এ মাসআলাটিকে মামুনিয়্যা আখ্যায়িত করার কারণ হলো, (খলীফা) মামুন বসরায় কাজী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকছামকে তার সামনে পেশ করা হয়। অল্পবয়সী হওয়ার কারণে মামুন তাকে অবজ্ঞার পাত্র মনে করে আলোচ্য মাসআলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম তাঁকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, বলুন তো, প্রথম মৃত ব্যক্তি পুরুষ ছিলেন, না নারী? এ কথা শুনে মামুন বুঝে ফেললেন যে, মাসআলা সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে। তখন তিনি তাঁকে কাজী হিসেবে নিয়োগ করলেন।

প্রথম মৃত ব্যক্তির পরিবর্তনে এ মাসআলার সমাধানও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এর বিশদ বর্ণনা হচ্ছে : প্রথম মৃত ব্যক্তি পুরুষ হবে অথবা নারী। যদি পুরুষ হয় তাহলে প্রথম মাসআলা ছয় দ্বারা হবে। দুই কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) এবং মা ও বাপ পাবে এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের একভাগ) করে। এরপর দুই কন্যার কোনো একজন যদি মারা যায় তাহলে সে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যাবে এক বোন, দাদা (পিতার পিতা) ও দাদী (পিতার মা) কে। সে ক্ষেত্রে দাদী পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। অবশিষ্ট পুরোটা পাবে দাদা এবং হযরত আবু বকর রা. এর মত অনুযায়ী বোন কোনো অংশ পাবে না। হযরত যায়েদ রা. বলেন, দাদী পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ এবং অবশিষ্ট সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করে দাদা ও বোনের মধ্যে বন্টন করা হবে। এ ভাবে মুনাসাখা সঠিক হবে। আর যদি প্রথম মৃত ব্যক্তি নারী হয় তাহলে সে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যাবে এক বোন, নানী (মায়ের মা) এবং নানা (মায়ের বাপ)। এ ক্ষেত্রে নানী (মায়ের মা) পাবে ছয় ভাগের একভাগ, বোন পাবে (পুরো সম্পদের) অর্ধেক এবং অবশিষ্ট সম্পদও 'রদ্দ' (পুণর্বণ্টন) এর কারণে বোন ও নানী লাভ করবে। আর 'ইজমা'র সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নানা বঞ্চিত হবে। মুখতার গ্রন্থের ভাষ্য 'এখতিয়ারে' এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।[১৯৯]

–প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

১৯৯. আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, খ. ৬, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

www.amarboi.org

Design & Printing : **An-Noor**
01712510726, 01670837659